CCE-H04284-10-P28676

74

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী
আপনার ভাগ্যের
ঈশ্বরের কাজ করছে।

P28676

আমাদের লটারী
পরিচালনা করে এবং পুরস্কার
বিতরণ করে শেষ হয়ে যায় না।
আপনার ভাগ্যের ঈশ্বরপ্রদত্ত
হিসাবে আমরা নিশ্চিত ভাবে
বিশ্বাস করি যে আপনার অর্থোপার্জন
ইচ্ছার কোন অপব্যয় হবে না।

★ প্রথম পুরস্কার (একটি)
১,০৪,০০০ টাকা (বণ্টনে অথবা
টিকিটের মূল্য—একটি সিরিজের
সবকটি পাবার মত)
দ্বিতীয় পুরস্কার (দুইটি)
১০০০ টাকা—প্রতিটি (অন্য দুটি
সিরিজে একই নম্বরের জন্য)

(তিনটি) তৃতীয় পুরস্কার
৫০,০০০ টাকা—প্রতিটি (প্রত্যেক
সিরিজে একটি করে, একটি টি. বি.
সেট অথবা একটি মুদ্রার সাথে)
(৩০৬টি পর্যন্ত) চতুর্থ পুরস্কার
১০০০ টাকা—প্রতিটি
(১০০০টি প্রত্যেক সিরিজে)
(৩০০০টি পর্যন্ত)
১০০ টাকা—প্রতিটি ষষ্ঠ পুরস্কার
(১০০টি প্রত্যেক সিরিজে)
(৩০০০টি পর্যন্ত)
২০ টাকা—প্রতিটি পঞ্চম পুরস্কার
(১০০০টি প্রত্যেক সিরিজে)
বিক্রেতাদের জন্য প্রাকি ডিস্ক
(৩০০ পর্যন্ত) ৫০ টাকা—প্রতিটি
(১০০টি প্রত্যেক সিরিজে)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী
প্রতিটি ড্রয়ের পঞ্চম টিকিটের দাম

শারদীয় অমৃত ১৩৮৩

সূচীপত্র

CENTRAL LIBRARY

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১১	সম্পাদকীয়	
১২	বাঙালী মানসে দুর্গোৎসব	
১৪	সব শেষের জন	
১৯	আনন্দবাজারের ইতিকথা	
২৯	শ্রেষ্ঠের প্রস্তুত পরাশর উপন্যাস।	
৫১	খোকনের প্রথম ছুটি	
৫২	নবীন যুগের আত্মকাহিনী	
৫৪	প্রবন্ধ	

ডাঃ প্রণব মনোরঞ্জন নাথের লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরযোগ্য

বোম্বাই

শুভ সংস্করণ মূল্য

[illegible]

চিকিৎসা

আশ্চর্য

কাছে

পৃষ্ঠা

হেড

ইন্দ্রা পাবলিশার্স

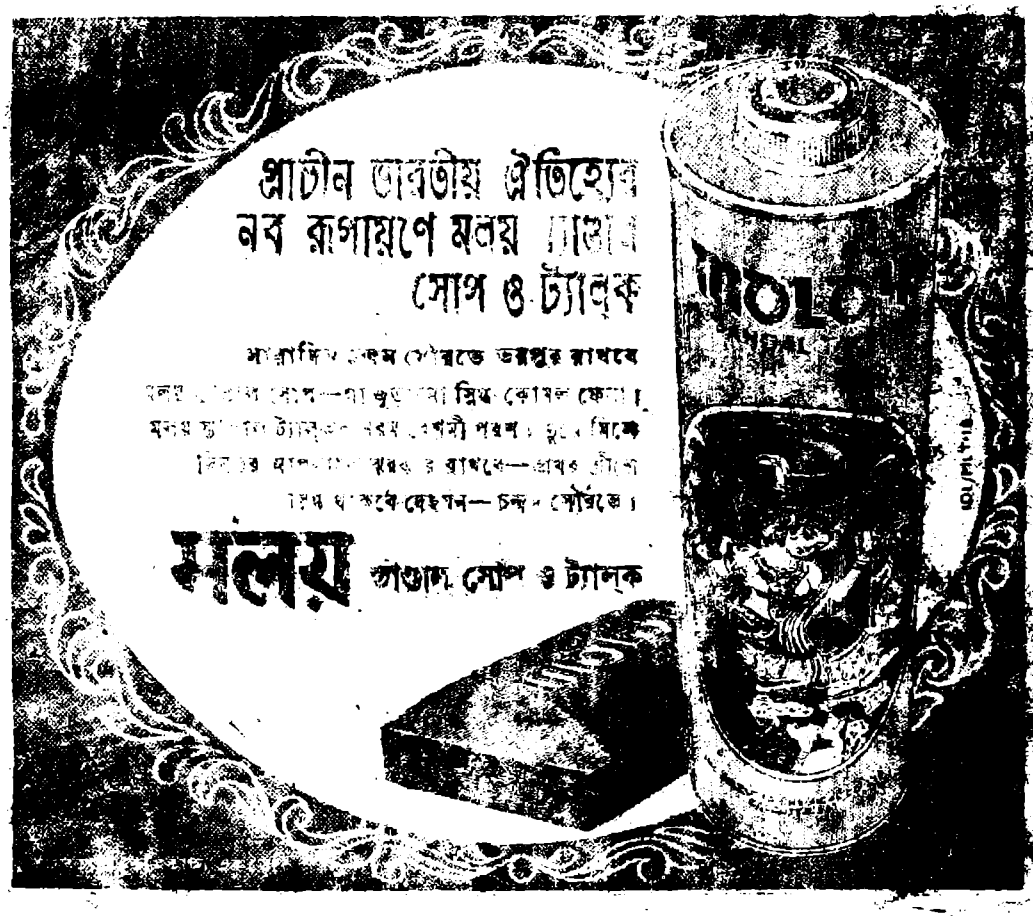

আপনার চুল সুন্দর ও সতেজ রাখতে

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

সুপ্রাচীন সূত্রের বহু-পরীক্ষিত ক্যান্থারাইডিনের সাথে প্রাকৃতিক চন্দন তেল মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এই কেশ তেল—অপরিসীম যত্নে ও সতর্কতায়। একমাত্র উদ্দেশ্য—আপনার চুল যাতে সুন্দর ও সতেজ হয়ে বাড়তে পারে।

অনবদ্য এই কেশ তেলের প্রস্তুতকারক

বেঙ্গল কেমিক্যাল

ভারতে এই তেলের বিক্রয় সর্বাধিক

ACII/BC 5/76 BEN

সূচীপত্র

কবিতা — [illegible]

৫। আমার কলকাতা আবহমান।

উজ্জ্বল শিশু ও মহিলাদের ত্বকে বিশেষভাবে কিন্তু উজ্জ্বল মুখ করতে কস্টমাইজড স্নোম মিথাইল পাউডার ব্যবহার করুন। ঘামে ও ঘর্ষণে! [illegible]

লাইজেল

[illegible]

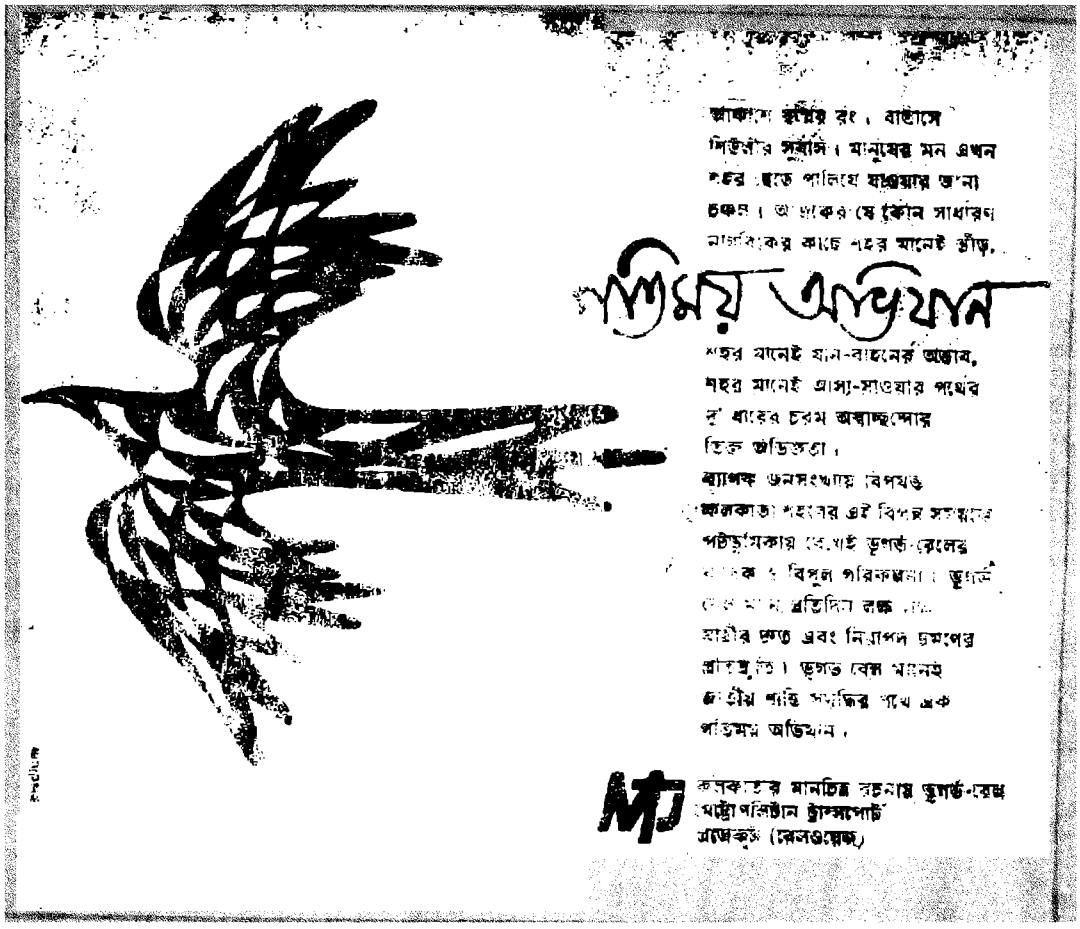
আকাশে ধূসর রং, বাতাসে
শিউরীর সুবাস। মানুষের মন এখন
শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য
চঞ্চল। এ অবস্থায় যে কোন সাধারণ
নাগরিকের কাছে শহর মানেই খাঁচা,
পরিময় অভিযান
শহর মানেই যান-বাহনের অভাব,
শহর মানেই আস্য-সাওয়ার পথের
দু ধারের চরম অস্বাচ্ছন্দ্যের
চিত্র অভিজ্ঞতা।
ব্যাপক জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত
কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়ের
পটভূমিকায় দেখাই ভূগর্ভ-রেলের
পরিকল্পনা। ভূগর্ভে
প্রতিদিন লক্ষ
যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ চলাচলের
প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই
জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক
পরিমল অভিযান।
MJ
কলকাতার মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মাল্টিপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

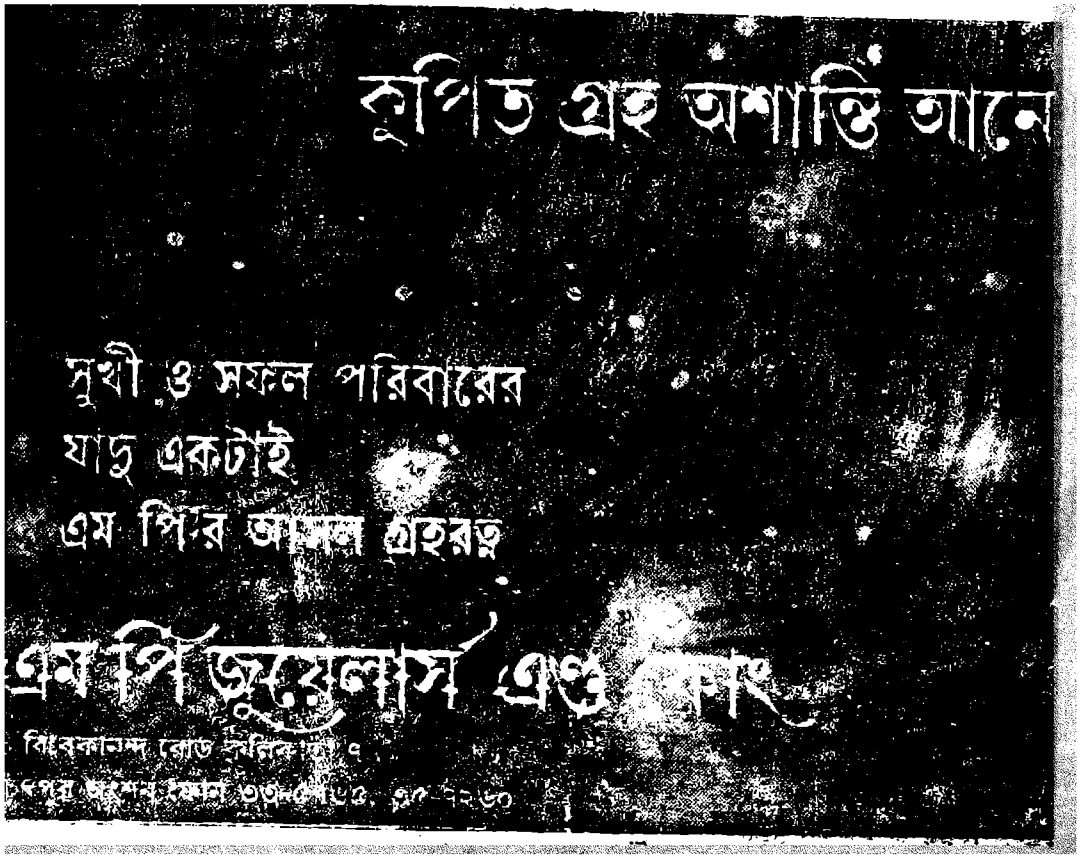
কুপিত গ্রহ অশান্তি আনে
সুখী ও সফল পরিবারের
যাদু একটাই
এম পির আসল গ্রহরত্ন
এম পি জুয়েলার্স এণ্ড
বিবেকানন্দ রোড হ্যারিসন রোড ৭
ফোন ৩৩৯-৭৬৫৫, ৩৯-৭২৬০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১০৪	সাক্ষাৎকার রাজনারায়ণ বসু	(গল্প)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
১০৫	ফুলকিয়ার জন্য	(গল্প)	শ্রীপ্রফুল্ল রায়
১১২	প্রায়োপবেশন	(গল্প)	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
১১৬	মৌন রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে		শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
১১৮	চাঁদ ডুবে গেলে	(উপন্যাস)	শ্রীআনন্দ বাগচী
১৪৭	রাজনারায়ণ-রবীন্দ্রনাথ : গুরু-শিষ্য কেন		শ্রীঅমিয়সূদন ভট্টাচার্য
১৫০	মিষ্টি জ্বালা	(গল্প)	শ্রীজ্যোতিরীন্দ্র নন্দী
১৫৩	সম্পদ	(গল্প)	শ্রীদেবল দেববর্মা
১৫৮	এক বন্ধু পড়ে আছে	(গল্প)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
১৬৫	না জানি কতেক মধু গ্রাম নামে আছে গো		শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৮	তিন সাঁঝ লক্ষ্মীর পা	(উপন্যাস)	শ্রীচাণক্য সেন

শাস্ত্রীয় সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, তবলা, সেতার, গীটার, বেহালা ও নৃত্য শিক্ষা-কেন্দ্র ও পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা ও শিক্ষাদানে প্রধানতঃ

শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ

এবং

শ্রীঅখিল বন্ধু ঘোষ

শিশু বিভাগ :—৮ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত।

বিশিষ্ট বেতারশিল্পী দ্বারা পরিচালিত

মেট্রোপলিটন কলেজ

২৪১।১ ডাঃ হাঃ রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪

নোভা ব্রিলিয়ান টাইন

লক্ষ লোকের পছন্দ

শুকনো, বিশৃঙ্খলিত কেশ কখনই আপনার রূপের বিকাশ করে না। সারাদিনে বারবার আপনাকে কেশে চিরুণী বুলাতে হয় যা খুবই কষ্টদায়ক। আপনার কেশে সামান্য নোভা ব্রিলিয়ানটাইন মাখান তারপর দেখুন কত আশ্চর্যজনক ফল পাচ্ছেন। আপনার বিশৃঙ্খলিত কেশ কেমন পরিপাটি করে আচরান আছে ও আপনার রূপের কি সুন্দর বিকাশ হয়েছে। নোভা ব্রিলিয়ানটাইন-এর সুগন্ধ আপনার মনে আনন্দ এনেছে। আপনি আপনার শরীরের যে কোন অংশেই মাখতে পারেন। নোভা ব্রিলিয়ানটাইন ছাড়া অন্য কোন জিনিষ এর পর্যায়ে নাই।

নকল থেকে সাবধান হন।

দ নোভা কোম্পানী

এল বি এন মার্গ ভান্ডুপ, বোম্বাই—৪০০০৭৮

For over 50 years, beautiful women have relied on Afghan Snow for their complexion care and skin protection

Afghan Snow offers better humectant properties to ensure full replenishment of the moisture lost from the skin.

The special ingredients and the high percentage of emollient in Afghan Snow prevent chaffing, dryness and and darkening of the facial skin.

Regular use of Afghan Snow keeps your face healthy, soft, young and beautiful.

AFGHAN SNOW

The top selling face cream for over 50 years

E. S. Palanwala

Bombay-400 086

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান স্টাকিস্ট ঃ **মেঃ ফিরোজ অ্যাণ্ড কোম্পানী**

৫৪, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১; ফোন ঃ ২৩-৫৯৩০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৯৫	আকাশের নীচে	(গল্প)	শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৯	বিশালতার কেন্দ্র ভূমি	(গল্প)	শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
২০৬	লোনালী	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২২৮	জুই	(গল্প)	শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
২৩৩	দিরাডিপার	(গল্প)	শ্রীশওকত ওসমান
২৩৬	সুখের অসুখ	(গল্প)	শ্রীসুধাংশু ঘোষ
২৪৩	আগামী দিনের সেই মানুষ— তুমি	(গল্প)	শ্রীশৈলেন রায়
২৪৫	বেঁচে আছি	(গল্প)	শ্রীতারাপদ রায়
২৪৯	নতুন বাসা	(গল্প)	শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
২৫২	শুধু গলার রঙ	(গল্প)	শ্রীতারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়
২৫৪	নারীবর্ষ	(গল্প)	শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

অলংকরণ : শ্রীধ্রুব রায়, শ্রীনিতাই ঘোষ, এবং শ্রীমনোজ বিশ্বাস।

দাম আট টাকা ॥ সডাক সাড়ে নয় টাকা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত বাংলা ভাষায়

প্রশ্নোত্তরে

ডিজেল ইঞ্জিন

পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ

এতে আছে : * ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যসূত্র * ডিজেল ইঞ্জিনের দোষ-ত্রুটি ও তার সংশোধন * পেট্রোল ইঞ্জিন সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের বিবরণ * হটভাল্ব সিস্টেম সেমি-ডিজেল ইঞ্জিনের বিবরণ * সিলিণ্ডার হেড, সিলিণ্ডার লায়নার, পিস্টন রিং * ক্রাঙ্ক শাফ্‌ট ফ্লাই হুইল ও বিয়ারিং * ইন্‌লেট এবং এগজস্ট ভাল্ব * ফুয়েল ইঞ্জেকশন পাম্প * ইঞ্জেকটার *ফুয়েল অয়েল * বায়ু এয়ার কম্প্রেসার * স্টার্টিং লুব্রিকেশন * ওয়াটার সার-কুলেটিং বা কুলিং সিস্টেম * ড্রাই ডকিং * হর্স পাওয়ার * কয়েকটি ধাতুর পরিচয় * মোটর গাড়ী এবং ট্রান্সমিশন * এয়ার এক্সটিং গুইসার * বিদ্যুৎ * ক্লিয়ারেন্স * মেট্রিক প্রণালী ইত্যাদি তথ্যসমৃদ্ধ অসংখ্য চিত্রসহ পেট্রোল ও ডিজেল ইঞ্জিনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সহ।

মূল্য : পনের টাকা

V.P.P. -তে বই নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ অন্ততঃ ৫-০০ টাকা অগ্রিম সহ order পাঠাবেন। অগ্রিম ছাড়া V.P.P. পাঠানো হয় না।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—
১ম খণ্ড—৯ম সংস্করণ ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—
২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—
৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—৯ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
(বেকন-হিউম) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—কাণ্ট ১৬-০০
ধর্মদর্শন (Religion) ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান— ১০-০০
(Social Psychology)
আধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ১৫-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান— (with statistics)
৪র্থ সংস্করণ ২২-০০
C.U. B.A. Edu. Hons Qu. (1963-78)
— Prof A. K. Mitra 8.00

শিক্ষক শিক্ষণ

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—
১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও
পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস— ১৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস—১৬-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৪-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান—
২য় সংস্করণ ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—
অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত
উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান—
—অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও গীতা সেন
উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা—অধ্যাপক
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা—অধ্যাপক সেনগুপ্ত,
ঘোষ ও হালদার

BP ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫।১এ কলেজ রো, পিন—৭০০০০৯
ফোন : ৩৪-৭২৩৪

ভিটামিনের অভাবের ফলে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার জন্য

ডাক্তাররা খেতে বলেন সেই সমস্ত ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ যা আপনি পাবেন রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে-তে

আজকাল আমাদের জীবন আগের মত নয়, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। যা পাওয়া যায় তাও তেমন পুষ্টিকর আর তাজা নয়। সকালের জলখাবার আর দুপুরের আহার তাড়াতাড়ি সারতে হয়। পুষ্টির দিক থেকে সেসবও যথেষ্ট নয়। পুষ্টির এই অভাব আর তার ওপর অফিসে ঘরে আর কারখানায় কাজের চাপ—আপনি সহজেই ক্লান্তি আর অবসাদ বোধ করেন।

ভিটামিনের এই অভাব পূরণের জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হল রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে যাতে রয়েছে সুষম আহারের জন্য আবশ্যক ১১টি ভিটামিন আর ৫টি খনিজ পদার্থ।

মাত্র একটি রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে প্রত্যহ সকালে খান। ক্লান্তি দূর করার এই হল সেরা উপায়।

রোশ

ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে

ট্রেড মার্ক

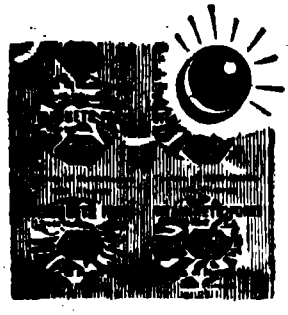

'বড়ির আকারে টনিক'

প্রত্যেক দিন সকালে মাত্র একটি রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে দিনে ২০ পয়সারও কম খরচে।

স্থানীয় ঠিকানা আলাদা।

RR-83

শারদীয়

অমৃত

১৩৮৩

উৎসব প্রাঙ্গণে

রবীন্দ্রনাথের শরৎ-বন্দনা আজ আর হয়তো আক্ষরিক অর্থে মেলে না কিন্তু শরৎকালে আমাদের মনে এখনো যে ভাবাবেগ জাগে তা প্রায় একই রকম। বন্যা বৃষ্টি বা বাজার দর নিয়ে বিব্রত থাকি আমরা। তবু পরশুরাম যাকে বলেছেন, রৌদ্রে কাঁসার রঙ ধরা, সকাল বেলায় সে-রঙের দেখা মিললে অতিবড় বেরসিক বাঙালিরও মনে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর জাগে।

সত্যি, দুর্গোৎসবের মতো এত বড় জাতীয় অনুষ্ঠান আমাদের জীবনে আর একটিও নেই। পাহাড়ের গায়ে যেমন নানাদিক থেকে ছুটে-আসা অজস্র ঝরণা মিলিত হয়ে নদীর ধারায় নেমে আসে সমতলে, বাঙালিরা যেন সেইরকম প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত আবেগ নিয়ে মিলিত হয় শারদোৎসবের জাতীয় আবেগে।

কেনাকাটা ও ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করা থেকে ছুটিতে বাইরে যাবার তাগিদ যেন এ-সময়ে হয়ে ওঠে সর্বব্যাপী। নানা পার্কে ও রাস্তায় শুরু হয় পূজামণ্ডপ তৈরি, কুমোরটুলিতে শত শত দুর্গা-প্রতিমায় লাগানো হয় তুলির শেষ টান—পূজা-সংখ্যাগুলির মনোরম বিজ্ঞাপনে চাঞ্চল্য দেখা দেয় পড়ুয়া মহলে। শারদোৎসব একই সঙ্গে জামা-জুতো, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বাংলাসাহিত্যের এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

আমরাও আমাদের সাধ্যমতো উপাচার নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেই জাতীয় মিলনের আঙিনায়। আমাদের প্রয়াস যদি কিছুমাত্রও তৃপ্তি দেয়, ধন্য বোধ করব।

বাঙালী মানসে দুর্গোৎসব

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের মধ্যে, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের মধ্যে, ভুক্তি ও মুক্তির মধ্যে সেতু রচনা করেছেন। এই সেতুর নাম ধর্ম্ম। মহর্ষি কণাদের মতে মানুষ ধর্ম্মচর্য্যার দ্বারাই পার্থিব সম্পদ ও সর্ব্বোত্তম মঙ্গল লাভ করে থাকেন।

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ মানুষের চতুর্ব্বর্গের কথা বা চারটি পুরুষার্থের কথা বলেছেন। চতুর্ব্বর্গ বলতে বোঝায়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। মানুষ প্রথম জীবনে ধর্ম্মাচরণ করবে, তারপর ধর্ম্মের সঙ্গে অবিরোধে অর্থাৎ ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থ ও কামের সেবা করবে, তারপর সর্ব্বপ্রকার ভোগ থেকে বিরত হয়ে বৈরাগ্যের সাধন অবলম্বন করবে এবং অন্তিমে যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে, এই ছিল ভারতের সনাতন আদর্শ।

যা হোক, ভারতের ঋষিগণ একথা অস্বীকার করেন নি যে, মানুষের জীবনে জৈব প্রবৃত্তির তাড়না আছে, ভুক্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, জিজীবিষা (বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা), বলোল্লিপ্সা ও জিগীষা (শত্রুজয়ের কামনা) আছে, আবার এমন স্বল্পসংখ্যক মানুষও আছেন যাঁদের ভেতর মুমুক্ষা বা মুক্তির কামনাও তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু মানুষ ভুক্তির আকাঙ্ক্ষাই করুক, আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই করুক, শুধু নিজের চেষ্টায় যে তাঁর বাসনা পূর্ণ হবার নয়, এ সত্যও যুগে যুগে সে অনুভব করেছে, আর এই জন্যেই সে ভোগমোক্ষদায়িনী মহাশক্তির শরণ গ্রহণ করেছে।

আমরা বর্ষে বর্ষে প্রতি পল্লীতে সাম্বৎসরিক দুর্গোৎসবের আয়োজন করি আবার অনেকের গৃহে পুরুষানুক্রমে শ্রীদুর্গাদেবীর পূজার আয়োজন হয় কিন্তু বাঙালী হিন্দুর এই জাতীয় উৎসবের—কালির এই অশ্বমেধ যজ্ঞের তাৎপর্য্য আমরা অনেকটা বিস্মৃত হয়েছি। বাস্তবিকপক্ষে জগন্মাতার পূজার প্রস্তুতি আরম্ভ হয় পিতৃপক্ষে তর্পণের মন্ত্রের ভেতর দিয়ে। এই তর্পণের মন্ত্রের চেয়ে উদারতর বা মহত্তরভাবে পরিপূর্ণ মন্ত্র কোথাও উচ্চারিত হয়েছে কিনা, আমরা জানি না। এই মন্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য হচ্ছে—সর্ব্বজীবে ঐক্যানুভূতি না হলে মৈত্রীভাবনায় প্রতিষ্ঠিত না হলে আমরা মাতৃপূজার অধিকারী হই না।

বাঙালী-চরিত্রে যে শৈব-সত্তা আছে দুর্গোৎসবের মধ্যে তার পরিচয় আছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাংলার চন্ডীমন্ডপ যখন চন্ডীপাঠকের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মুখরিত হয়ে ওঠে, তখন ভক্ত সাধক গললগ্নীকৃতবাসে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে রোমাঞ্চিত হন, মধুকৈটভ-বধ মহিষাসুর-বধ ধূম্রলোচন-বধ চন্ডমুন্ড-বধ রক্তবীজ-বধ শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ প্রভৃতির কাহিনী এবং কাব্যাংশে অতুলনীয় ভাব-গম্ভীর দেবীস্তুতি তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করে অসুর-নাশিনী বরাভয় দায়িনী দেবীর চরণে আত্মসমর্পণ করেন, অপরদিকে, আগমনী ও বিজয়ার গান শ্রবণ করে তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় এবং তিনি জগজ্জননীর ভেতর নিজের স্নেহময়ী কন্যাকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হন। পতিগৃহবাসিনী কন্যার সঙ্গে মিলনের আনন্দ এবং আসন্ন কন্যাবিরহের বেদনা তাঁর অন্তরকে বাৎসল্য-রসে আর্দ্র করে তোলে। এরূপ দুর্গোৎসব যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই দুর্গোৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবী চৌধুরাণী আমাদের দেশে যে বীরাষ্টমী উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন, সেই উপলক্ষ্যে বাংলার তরুণেরা শারীর-চর্চ্চা ও নানাবিধ আত্মরক্ষামূলক ব্যায়াম প্রদর্শন করতেন; বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ বাংলার বরেণ্য সন্তানগণ আমাদিগকে নবযুগের উপযোগী সমষ্টিগত শক্তিসাধনায় দীক্ষাদান করে এক বীর্য্যবান ও শক্তিমান জাতিরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে কমলাকান্ত দেখেছেন, তাঁর দেশমাতৃকাই দিগভুজা শত্রুমর্দ্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী দুর্গা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। তাই কমলাকান্তের কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই—

'উঠ মা হিরণ্ময়ি সপ্তভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা! দেবি দেবানুগ্রহীতে, এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা!'

কমলাকান্ত যদি অতীতের হিরন্ময়ী বঙ্গভূমির ভেতর দেবী দশভুজাকে দেখে থাকেন, তবে সত্যানন্দ তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন সর্ব্বার্থসাধিকা অনাগত কালের জননী জন্মভূমির মধ্যে। এই অনাগত যুগেই ব্রাহ্মণশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি ও শূদ্রশক্তিও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। বাঙ্গালীর এই অভিনব ভাবকল্পনা তাঁর দুর্গাপ্রতিমার ভেতর রূপায়িত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগে আমাদিগকে সন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছেন, তাঁর ঋষি-দৃষ্টিতে যে মন্ত্র উদ্ভাসিত হয়েছে, সেই মন্ত্রই অগণিত তরুণকে হাসিমুখে মৃত্যু-বরণ করতে শিক্ষা দিয়েছে। তাই 'বন্দে-মাতরম্' গানের শতবর্ষ-পূর্ত্তি উপলক্ষে আমরা দিব্যধামবাসী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের প্রণতি নিবেদন করি। কবি গোবিন্দ দাসের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—

'তুমিই সাজালে ভাষা শ্যাম সুষমার,
*
কল্পনা-কালিন্দী-তটে, গড়িলে
আনন্দমঠে,
ভারত ভবিষ্য স্বর্গ সুমেরু
হিমার।
শিখালে সন্তান-ধর্ম্ম জননীর
প্রিয়-কর্ম্ম,
মহাবীর সত্যানন্দ মহাপ্রাণতার;
তুমি সাজাইলে ভাষা অনন্ত
ভোগার।'

*

আজ আমাদিগকে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে শক্তি-সাধনার তাৎপর্য্য নতুন করে অনুধ্যান করতে হবে। আমাদের এই বাংলা শ্রীরামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, মহারাজ নন্দকুমার দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অগণিত শক্তিসাধকগণের পদরেণুপূত,—শক্তিসাধনায় আমাদের এই উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করেই আমাদিগকে আবার একাক্ষর মহামন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দুর্গোৎসব যেন শুধু বাহ্যাড়ম্বরে পর্য্যবসিত না হয়, আমরা যেন জগজ্জননীর চরণে শরণ গ্রহণ করে সকল ভয়-ভাবনাকে অতিক্রম করতে পারি, যেন শ্রীরামপ্রসাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি—

'এ সংসারে ডরি কারে
রাজা যার মা মহেশ্বরী,
আনন্দে আনন্দময়ীর
খাস তালুকে বসত করি।'

আর সেই সঙ্গে যেন বলতে পারি—

'মন কেনরে ভাবিস এত,
(ও মন) মাতৃহীন বালকের মতো,
ফণী হয়ে ভেকে ভয় এ যে বড়
অদ্ভুত,
ওরে তুই করিস কালের ভয়
হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুতা!'

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ
সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমো
নমঃ।।

সব রকমেই ভাল বাল্ব
ফিলিপ্‌স বাল্ব

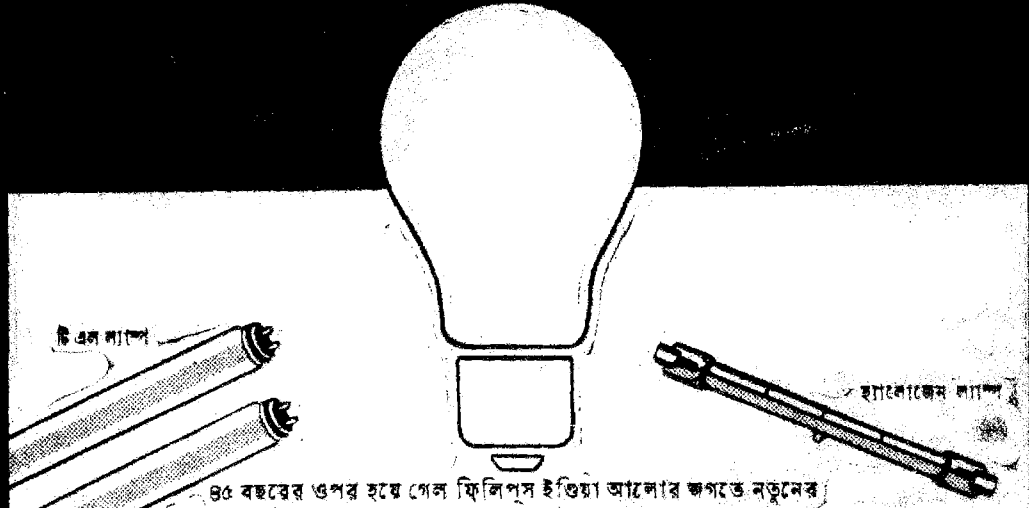

৪৫ বছরের ওপর হয়ে গেল ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া আলোর জগতে নতুনের প্রবর্তন করে আসছে। যখনই আরো দক্ষ, আরো কম খরচের আলোর জন্যে, আলোর নতুন উৎসের প্রয়োজন হয়েছে, ফিলিপ্‌স-ই প্রথম এনে হাজির করেছে নতুন ল্যাম্প!

১৯৩৮ সালে শুরু হয়েই, ফিলিপ্‌স – গৃহ, বাণিজ্য, শিল্প এবং বিশেষ উদ্যোগের জন্যে ল্যাম্পের প্রবর্তন করে এসেছে। ভারতে, একমাত্র ফিলিপ্‌সই দিয়েছে এত রকমারি আলো – যার ক্রমবিন্যাস হতে থাকবে দেশের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে।

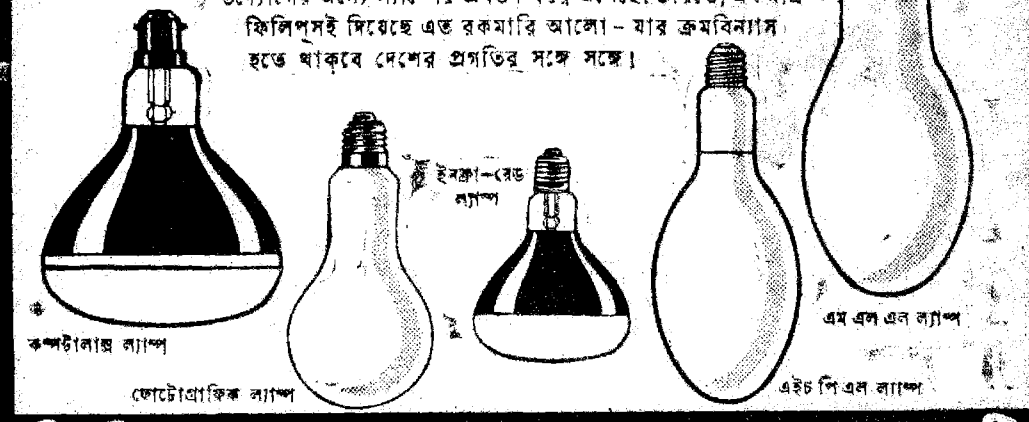

ফিলিপ্‌স – ল্যাম্প ও আলোর জগতে অগ্রণী

PHILIPS

ফিলিপ্‌স

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

PHL-938

সবার শেষের জন

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমার ছোট মেয়ে তোতা আমাকে খুকনি দেয়। 'বাবা, তুমিও কি ওর মতো এক চোখ কানা? আরেক চোখে ছানি? এই দ্যাখ কেমন টেরাবাঁকা সেলাই করেছে। হা হা হা হা। এই জুতো পায়ে দিয়ে তুমি বেরোবে?'

বড় মেয়ে মিতা বলে, 'শুনেবেন, জ্যাঠামশায়, বাবার কাণ্ড। নতুন জুতো কিনে দিলে বাবা তুলে রাখবেন, পরবেন না। ওই পুরো না জুতো আমরা কতবার ফেলে দিয়েছি। উনি কুড়িয়ে এনে সারবেন। মাহাঙ্গুকে দিয়ে সারাবেন। ওই তো কাজের ছিরি। ওই পুরোনো জুতো সারাতে যত খরচা হয়েছে তা দিয়ে দু' জোড়া নতুন জুতো কেনা যায়।'

জ্যাঠামশায় অর্থাৎ আমার বন্ধু লেনিন হেসে বলেন, 'ওকে গান্ধীবাদে পেয়েছে। ওই বুর্জোয়া বিভ্রান্তি থেকে ওকে মুক্ত করতে না পারলে নতুন জুতো কি ও কোনো দিন পায়ে দেবে? নতুন সমাজও তেমনি আকাশে তোলা থাকবে। মাটিতে নামবে না। এই-তালি দেওয়া সমাজের গায়ে তালির পর তালি পড়বে।'

তোতা-মিতার মা ততক্ষণ রূপ-কথার সঙ্গে কথা বলছিলেন। জুতোর দিকে নজর পড়ায় তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'মাহাঙ্গুর কীর্তি যাদুঘরে রাখবার মতো। গৃহস্থের সংসারে মানায় না। জানেন, দিদি, মাহাঙ্গু হচ্ছে একটি হিন্দুস্থানী। মুচি। এক চোখ কানা। আর এক চোখে ছানি। কাজ পায় না, উনিই জোগান। জোগাবেন কী করে, যদি পুরোনো জুতো পায়ে না দেন, যদি সে জুতো সাতদিন অন্তর সারাতে না ছুঁচ। আর-সব মুচি যার জন্যে আট আনা পায় মাহাঙ্গু পায় তার জন্যে এক টাকা। কারণ তার সময় লেগেছে দু'গুণ। উনি বলেন, দোষটা তো মাহাঙ্গুর নয়। ও তো ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করেনি। কাজেই ওটা ওর ন্যায্য পাওনা। আমি যদি বলি যে ওটা আমাদের ন্যায্য দেনা নয় তা হলে উনি রাসকিনের দোহাই দেবেন।'

'রাসকিন ওটা পান যীশুর কাছ থেকে। আর গান্ধীজী ওটা পান রাসকিনের কাছ থেকে। আর অনাদি ওটা পেয়েছে গান্ধীজীর কাছ থেকে। দু হাজার বছরের পুরোনো মতবাদ। খাপ খাবে কেন নয়া দুনিয়ার গায়ে? বা পায়ে।' রূপকথায় হেসে উড়িয়ে দেন।

আমি আপনভোলা অন্যমনস্ক মানুষ। লেখার কাজ নিয়ে যখন ব্যাপৃত থাকি তখন কেউ আমার ধ্যানভঙ্গ করলে আমি বিষম রাগ করি। রুইদাসরা—আমি ওদের মুচি বলিনে, ওটা অপমানকর—আমাকে জ্বালায়। কেবল একজন বাদে। সে ওই মাহাঙ্গু। আমি ঘরে বসে কাজ করছি, বারান্দা খালি, সে বারান্দায় পা দিতেও সাহস পায় না, পাছে আমার বাড়ী অশুচি হয়। যদিও আমি ওকে অভয় দিয়েছি যে আমরা কেউ জাত মানিনে তবু ও তো মানে। মানে বলেই গাছতলায় ওর ঝোলাটি কাঁধ থেকে নামায় ও কখন আমার সময় হবে তার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করে। একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর এক সময় আমার কানে আসে। 'মাহাঙ্গু।'

'ওঃ। মাহাঙ্গু? আচ্ছা, হাম আতেহেঁ।' বলে আমি আরো পাঁচ সাত মিনিট ওকে খাড়া রাখি। তারপর দু তিন জোড়া জুতো বার করে দিই। পালিশের কাজ। দরকার হলে সারানোর কাজ। ফী বারেই ও একটা না একটা মেরামতির কাজ খুঁজে পাবেই। শুকতলা ক্ষয়ে গেছে। সেলাই খুলে গেছে। চামড়া ফেটে গেছে। এমনি সব ফৈকল্লা ওর কানা চোখে ধরা না পড়ুক ছানি-পড়া চোখ এড়ায় না। আমি বলি, আচ্ছা, বনাও। ও তখন অখণ্ড মনোযোগে বানায়। আমিও ফিরে এসে আমার বানানোর কাজে অখণ্ড মনোযোগ দিই।

আমারই মতো ওর কাঁচাপাকা চুল। তবে আমাকে ওর মতো সারাদিন কাজের ধান্দায় টহল দিয়ে ঘুরতে হয় না। সারা অঙ্গে খরা বর্ষা শীত পোহাতে হয় না। খাবার যথাকালে আমার মুখের সামনে পৌঁছয়। আমার যা অভাব তা সময়ের অভাব। আর ও বেচারার সময় যেন ফুরোতেই চায় না। কাজ কোথায়? কে দিচ্ছে? দিলে তো তখুনি বিদায় দিয়ে দেবে। ধরিয়ে দেবে দু আনা কি চার আনা। তাতে কি অত বড়ো সংসারের পেট ভরে? আমার সঙ্গে ওর একটা অলিখিত বন্দোবস্ত। ও যত ইচ্ছা সময় নেবে। কাজ সারা হলেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, আমাকে ডাকবে না। জানালা দিয়ে তাকালে পরে নজরে পড়বে কয়েক জোড়া জুতো বারান্দায় তোলা। একটি মানুষ গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। নিচে মাটির উপরে পাতা একটা লোহার ফর্মা। চামড়া, পেরেক ইত্যাদি টুকিটাকি। কয়েক কৌটো বুট পলিশ। একটা পুরোনো ময়লা ঝোলা, মোটা ক্যানভাসের কি চটের।

'ক্যা, মাহাঙ্গু? কাম খতম?' আমি বাইরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'হুজুর' বলে ও একটি শব্দে উত্তর দেয়।

আমি অত খুঁটিয়ে দেখি নে সেলাইটা সিধে না বাঁকা, শুকতলাটা পুরো মাপের না খাটো, তালিটা নতুন চামড়ার না পুরোনো চামড়ার। আমার অত সময় কোথায়। আর মাহাঙ্গু লোকটা অক্ষম হতে পারে, অসাধু নয়। ওর যেটুকু বিদ্যে তাতে ওর চেয়ে ভালো আশা করা যায়

না। ও তো শহরের বা কারখানার কারিগর নয়। বেহারের মুঙ্গের বা ভাগলপুরের দেহাতী চর্মকার। এখন নিবাস বোলপুর।

সময়ের দাম কাকে বলে ও জানে না। আমি জানি। তাই ওকে আমি আমার হিসাবমতো পারিশ্রমিক দিই। সেটা হয়তো অন্যের তুলনায় বেশী। কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে ও আমাকে অবাধে লিখতে দিয়েছে, মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমার লেখা মাটি করেনি যেটা কমবয়সী রুইদাসরা অবুঝের মতো করে। ওরা আসে ঘোড়ায় চড়ে। চড়াও হয় যখন তখন। আমি ওদের সাফ বলে দিই যে মাহাশ্‌ থাকতে আর কেউ আমার পছন্দ নয়। মাহাশ্‌কে ওরা দেখতে পারে না। ওর বিরুদ্ধে যা তা বলে। আমি ভাগিয়ে দিই।

কিন্তু ছিল এর পেছনে আরও একটা কথা। সেটা একটা তত্ত্ব। আমি বিশ্বাস করি যে মাহাশ্‌র জীবনই আদর্শ জীবন। ও কাউকে শোষণ করে না। কারো কাছে বিবেক বাঁধা দেয় না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন আনে দিন খায়। কাল কী খাবে তা চিন্তা করে না। যীশু খৃষ্ট যেমনটি চেয়েছিলেন। আর গান্ধীজী যেমনটি চান। যীশু যাদের বলেছেন সব শেষের জন মাহাশ্‌ হচ্ছে তাদেরই একজন। তারা কাজ করতে চাইলেও কাজ পায় না, পায় বেলাশেষে। তবু তারাও পাবে সকলের সমান মজুরি। দৈনিক আয় হবে সকলের সমান। কেউ যদি কানা হয়ে থাকে বসে থাকাটা তার ইচ্ছার অভাব নয়, তার ক্ষমতার অভাব। তার দরুন তার রোজগারের কর্মতি যেন না হয়। দিনের শেষে যেন হয় সব শ্রমিকের সারাদিনের রোজগারের সমান।

রাসকিনের 'আনটু দিস লাস্ট' পড়ে গান্ধীজীর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি তার অনুবাদের নাম রাখেন 'সর্বোদয়'। তা না রেখে রাখা উচিত ছিল 'সব শেষের জন'। কেননা জোর দেওয়া হচ্ছে সমাজের দুর্বলতম অংশের উপরে, যারা মেহনত করতে রাজী অথচ মেহনতের সুযোগ যাদের কম কিংবা তার বিনিময়ে প্রাপ্তি যাদের যথেষ্ট নয়। মাহাশ্‌ একটা প্রতীক। কিংবা একজন প্রতিনিধি। আমি চেষ্টা করছি ওকে অন্যান্য রুইদাসের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতে। নইলে ও হেরে যাবে। না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

আমার কৈফিয়ৎ শুনে বৌদি বলেন, 'এটা কিন্তু ঠিক নয় যে মাহাশ্‌ সেলাই টেরাকোটা করেও সমান মজুরি পাবে। আজকাল এমন মিস্ত্রী তুমি কজন পাবে যে ইচ্ছে করে কামাই করে না দেরিতে আসে না ফাঁকি দেয় না? অক্ষম বলে মাহাশ্‌কে তুমি ছাড় দিতে পারো কিন্তু ফাঁকিবাজরাও অক্ষম বলে তোমার দাক্ষিণ্যের সুযোগ নেবে অনুদি। মাহাশ্‌কে তুমি বাঁচাতে চাও বাঁচাও। কিন্তু ওটা তোমার ব্যক্তিগত নীতি। সমষ্টিগত নীতি অত নরম হলে চলবে না।'

দাদা তার লেনিন-মার্কা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'হিন্দু সমাজ যাদের পায়ের তলায় রেখেছে আর বুর্জোয়া শ্রেণী যাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে তাদের সমস্যা কি ওভাবে মিটতে পারে কখনো? করুণাসাগর বিদ্যাসাগর হয়ো তুমি কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো কিন্তু কয়েক কোটিকে বাঁচাতে পারবে কি করে? আর সেই কয়েকজনকেই বা সমাজে তুলতে পারবে কি শুধু হরিজন আখ্যা দিয়ে? চোয় দ্যাখ সাঁওতালদেরও কর্মাভাব ও অন্নাভাব কিন্তু হিন্দু সমাজের নিচের তলা না হয়ে ওরা ওদের সমাজেরই একমাত্র তলা। তাই আর কারো কাছে ওদের মাথা হেঁট নয়। ওই যে সাঁওতাল মেয়েরা তোমাদের রান্নাঘরেও ঢোকে ও যদি মাহাশ্‌র বৌ হতো তাহলে কি ওর মত সাহস হতো?'

মাহাশ্‌ তখনো বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আমি ওকে ডেকে বলি 'সিলহাই সিধা নেহি হুয়া। খোলকে ফির ভি বনাও।'

আমার হিন্দী শুনে সবাই হেসে ওঠে। মাহাশ্‌র মাথা আরো হেঁট হয়। ও যে ঠিকমতো সেলাই করতেও পারে না এটা ওর পক্ষে লজ্জার কথা।

আমি আমার ছেলেবেলায় ফিরে যাই। তখনকার দিনে আমাদের শহরের মুচিরাই আমাদের জুতোর মাপ নিয়ে যেত আর তাই দেখে নতুন জুতো বানিয়ে দিত। খুব যে আরাম হতো পরে তা নয় তবু জিনিসটা খাঁটি স্বদেশী বলে বাবার কাছে পেতো সমাদর। কারো কারো মতে প্রশ্রয়। পরে অবশ্য চীনা-বাড়ীর তৈরি জুতোও পরেছি। খুব আরামের। কিন্তু ইদানীং কারখানায় তৈরি জুতোই পরি। দুঃখ হয় এ কথা ভেবে যে দেশের কারিগর শ্রেণীটাই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শুধু মেরামতি করেই তো কারিগর হওয়া যায় না। কিংবা শুধু জুতো পালিশ করে। কারিগরকে শ্রমিক বানিয়ে কি উন্নতি হয় না অবনতি? ঘোড়া পিটিয়ে গাধা?

আমাদের দুই বন্ধুর চিন্তা একদা একই খাতে বইত। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বরেনদা ঝুঁকেছেন শিল্পবিপ্লবের দিকে, তার পরের ধাপ সমাজবিপ্লবের দিকে। আর নিভাদিকেও ভজিয়েছেন যে রুশদেশে টলস্টয় যা পারলেন না লেনিন তা পারলেন। অতএব ভারতকেও টলস্টয় মার্গ বা গান্ধী মার্গ ত্যাগ করে লেনিন মার্গ বরণ করতে হবে। তবে ওঁরা কেউ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেননি। ওঁরা যে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সোপান। অযোধ্যাদের সঙ্গে ওদের মিলতে বাধা। এখনো ওঁরা জবাহরলালের সঙ্গেই আছেন। একদিন ওঁকেও লাল করবেন এই আশায়।

'আমি করুণাসাগরও নই, বিদ্যাসাগরও নই তবে আমি নিজে একজন কারিগর বলে কারিগর শ্রেণীটাকে ভালোবাসি। তাই শিল্পবিপ্লবকে মনে করি পরধর্ম। আর সমাজবিপ্লবকে স্বধর্ম। তোমার সঙ্গে মিল হবে কি করে বরেনদা? আমরা যে দিন দিন দূরে চলে যাচ্ছি পরস্পরের কাছ থেকে।' আমি আক্ষেপ করি।

'তুমি যদি শিল্পবিপ্লবকে রুখতে না পেরে থাক তবে সমাজবিপ্লবকেও রুখতে পারবে না অনাদি। এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে? তোমার ওই মাহাশ্‌র জন্যে আমার মাথায় অন্য পরিকল্পনা আছে। ওকে আর ওর মতো সবাইকে রিক্রুট করে আমরা একটা লেবার আর্মি গঠন করব। তেমনি চাষীদের নিয়ে একটা ল্যান্ড আর্মি। দেশে নবশূন্য হলে আর্মি থাকবে, একটা ত সৈনিকদের আর্মি। আর একটা শ্রমিকদের। আরও একটা কৃষকদের। কোনোটিতেই জাতপাত মানা হবে না। কে যে ব্রাহ্মণ কে যে মেথর তা চেনবার উপায় থাকবে না। ইউনিফর্মের আড়ালে ঢেপে রাখলেও রাখতে পারো, ট্রেপির আড়াল টিকি। কিন্তু সবাইকে সব কাজে হাত লাগাতে হবে, যখন যেটা দরকার। শুচি অশুচির প্রশ্ন তুললেই জেল। জেলে গেলে সকলেই সমান। কয়েদীর পোশাক পরে মেথরের কাজও করতে হবে বামুনের ছেলেকে। আর রান্নার ভার থাকবে মুসলমানের উপরে। পরিবেশনের ভার খৃষ্টানের উপরে। অনশন করলে সেটাও হবে একটা অপরাধ। সকলে যা খাবে তুমিও তাই খাবে। তবে গোরু শূওরের বাছবিচার থাকবে। কিন্তু ওটাও যুদ্ধ-কালে নয়। যুদ্ধে বার বার হেরে ওটুকু যদি আমরা শিখে না থাকি তো আবার পরাধীন হব। যে এতে বাধা দেবে তাকে কোর্ট মার্শাল করে বিশ্বাসঘাতকের যে শাস্তি সেই শাস্তি দেওয়া হবে। হাসছ যে?' দাদা বৌদিকে শাসান।

যুদ্ধকালেও আমি গোমাংস খাব না, তোমার জন্যে রাঁধতেও পারব না, কমরেড। আমার কপালে আছে ফায়ারিং স্কোয়াড। আর তোমার কপালে রিপত্নীক দশা। সাময়িকভাবে অবশ্য।' বৌদি তামাশা করেন।

ওদিকে মাহাশ্‌র উপর কড়া নজর রেখেছিল তোতা। সে এসে খবর দেয় যে সেলাই এইবার সিধে হয়েছে। আমি যাই ওর পাওনা চুকিয়ে দিই। দুবার সেলাই করেছে বলে ও কিছু উপরি প্রত্যাশা

কুকমী

শীর্ষে ছিল শীর্ষেই আছে

নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার-এ কুকমী গুঁড়ো মশলা প্রথম শ্রেণীর ("ক্লাস-এ") সুবর্ণপদক লাভ করেছে।

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ কোয়ালিটি কন্ট্রোল কর্তৃক প্রদত্ত একমাত্র উচ্চমানের অকৃত্রিম গুঁড়ো মশলা হিসাবে ট্রেডের স্বীকৃতি ও সম্মানপত্র লাভ করেছে।

পদক ও সম্মাননাভে আমরা আনন্দিত—
কিন্তু অসংখ্য সুখী অনুরাগীদের
সহযোগিতাই আমাদের অমূল্য পুরস্কার!

রন্ধন এমন একটি শিল্প যেখানে চাতুরী অথবা যাদুর কোন স্থান নেই। আমাদের তৈরী কুকমী গুঁড়ো মশলা বর্ণে, গন্ধে, স্বাদে যে-কোনও রান্নাকে অপরূপ ক'রে তোলে।

সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে তৈরী কুকমী গুঁড়া মশলা সঠিক ওজনে, ন্যায্য দামেই পাবেন।

গুরু পত্তাবী ক'রে কুকমীর ক্রমবর্ধমান, অনন্য জনপ্রিয়তাই কুকমীর সুদক্ষ উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

পদক ও সম্মানে তারই স্বীকৃতি।

প্রস্তুতকারক :
কমল চন্দ্র কম্পু (ক্যাইস)
প্রাইভেট লিমিটেড
২৩৫ হরি মোহন রোড, কলিকাতা-৭০০০৭০
গোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫
ফোন : ৩৩০৯১৫ • ব্রাঞ্চ : কানপুর

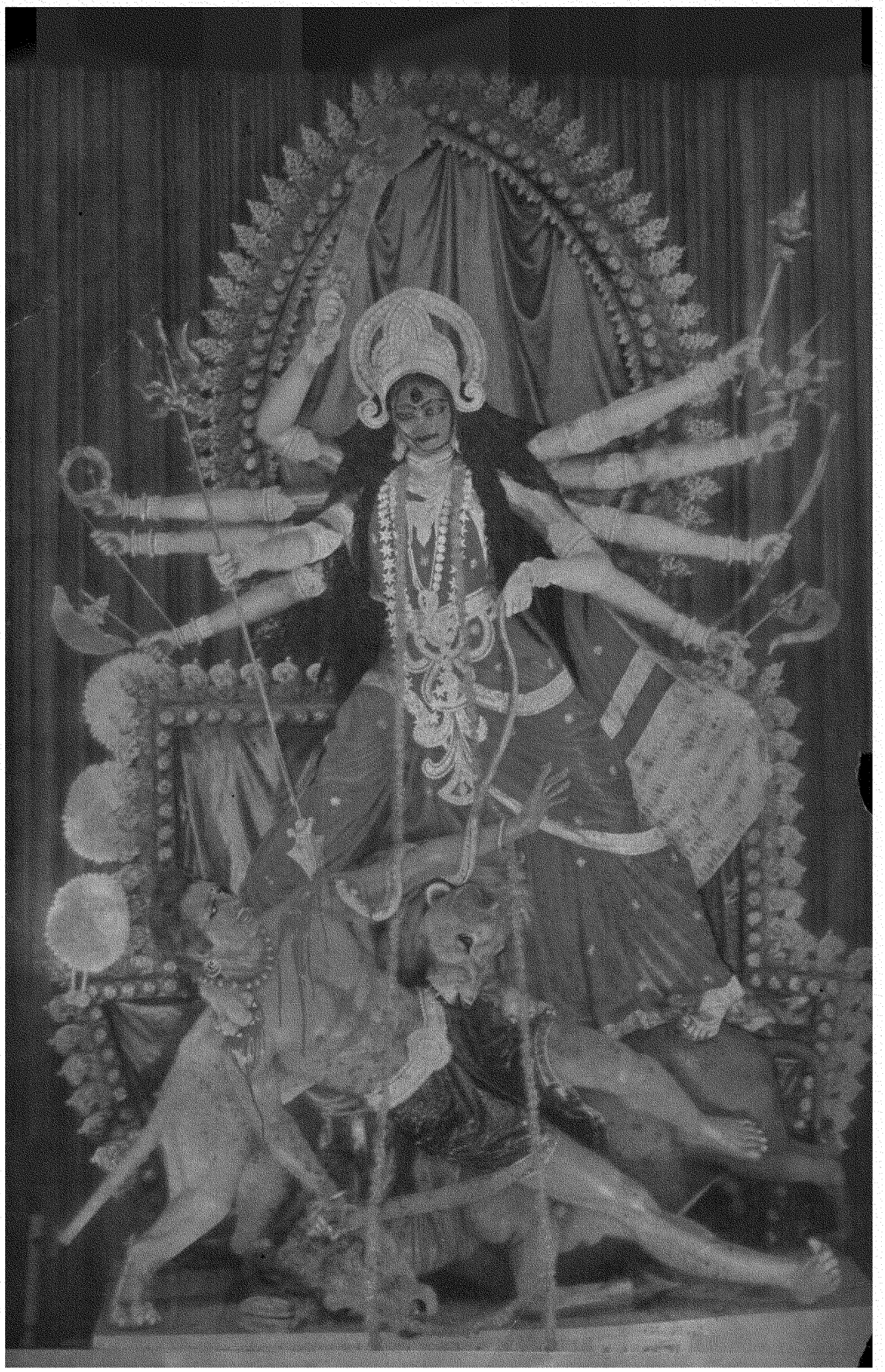

করেছিল। দোষটা তো ওর নয়, ওর চোখের। আমি ওর প্রত্যাশা পূরণ করি। ও সেলাম ঠুকে ঝোলাটি কাঁধে তুলে নেয়।

'উপরি পাওনার খবরটা জানাজানি হয়ে যায়। মিতা বলে 'আমি জানতুম। ভুল করলেও মজুরি কাটা যায় না, বরং মজুরি বাড়িয়ে নেওয়া যায়। বাবা এখন থেকে তুমি এসব মার হাতে ছেড়ে দাও। মারও দয়ার শরীর কিন্তু মা তোমার মতো নরম নন। চ্যারিটি করতে চাও চ্যারিটি করো। বলো, আমি দান করলুম। কিন্তু তা তো নয়, এটা হলো দেনাপাওনার ব্যাপার।'

আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু শুনছে কে? সকলের মুখেই এক কথা। কাজটা যেমন হবে মজুরিটাও তেমনি হবে। ভুল কাজের জন্য খেসারৎ দেবে যে ভুল করেছে সে। উল্টে আমি যদি দিই তবে ওর শিক্ষা হবে কী করে? ও সাবধান হবে কেন?

'আমার লেবার আর্মিতে আমি কড়া হব। নরম হব না।' বরেনদা বলেন। 'দৃষ্টিক্ষীণতার দরুন মাহাঙ্গুকে মোটা কাজ দেওয়া হবে। সূক্ষ্ম কাজ না। কিন্তু কাজ অনুসারেই পাওনা। শ্রমিকদের দিতে হবে ফ্রুট অব লেবার। তার কমও না, তার বেশীও না। ধনিকরা কম দেয় সেইজন্যে ধনতন্ত্র খারাপ। কিন্তু ধর্মিকরা যদি বেশী দেয় তবে ধর্মতন্ত্রও কি ভালো? কর্ম অনুসারে ফল কর্মফল। এইটেই শাশ্বত নীতি। এই নীতি কোনো পক্ষই লংঘন করতে পারবে না।'

'শ্রমিক যদি অন্ধ হয়, অক্ষম হয় তাহলেও না?' আমি আপত্তি জানাই।

'আহা শোন সবটা।' বরেনদা দাড়িতে হাত বুলোন। 'কর্ম অনুসারে ফল মেনে নিলেও একটা নূনতম মজুরী থাকবে। তার সঙ্গে মিলিয়ে একটা নূনতম খাটুনিও। আলসেমি আমি বরদাস্ত করব না। তোমাকে ডাকবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানবে এটা খাটুনির মধ্যেও পড়ে না অবসরের মধ্যেও না। এটা হচ্ছে আলকারা। চাই ডিসিপ্লিন।'

'ডিসিপ্লিন শুনে আমি শিউরে উঠি। 'তোমরা কি ইটেলেকচুয়ালদেরও ডিসিপ্লিন শেখাবে?'

'আলবৎ। তোমাকে আর তোমার মত সাহিত্যিকদেরও।' বরেনদা হাসেন। 'তবে তোমাদের নিয়ে আরও একটা আর্মি গঠন করা হবে না। তাহলে তো সব কটাকেই কোর্ট মার্শাল করতে হয়। তোমাদের নিয়ে রাইটার্স ইউনিয়ন।

তার চেয়ে আমি মিতার মার দিকে তাকিয়ে বলি, ফায়ারিং স্কোয়াডই শ্রেয়।

না, শ্রেয় নয়। তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, তুমি লিখতেই ভুলে যাবে। পাল্টেরবাকের মতো।

।। দুই ।।

এর পরে আমার বিদেশযাত্রা। সে সময় যে নতুন জুতো কেনা হয় সে জুতো পুরোনো হতে বেশ কয়েক বছর লাগে। আগেকার পুরোনো জুতো আমার মাসেকের অনুপস্থিতিতে কী জানি কেমন করে হাওয়া হয়ে যায়।

বেচারা মাহাঙ্গু! পুরোনো জুতো না থাকলে বা নতুন জুতো পুরোনো না হলে তো মেরামতির প্রশ্নই ওঠে না। কী নিয়ে সে দন্টার পর ঘণ্টা কাটাবে? ভুল করারই বা উপলক্ষ কোথায়? নতুন জুতোর কালি লাগায়, তাও আমারি দেওয়া কালি। বুরুষ করে, তাও আমারি দেওয়া বুরুষ। তার রোজগার আর পাঁচজনের চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। কিন্তু কতটুকু বেশি? চার আনার জায়গায় আট আনা। এক টাকা দু টাকা তো নয়। পুরোনো জুতোই ছিল লক্ষ্মী। পুরোনোর উপর নতুন তালি লাগিয়েই ওর নবান্ন।

রোজগার বাড়ানোর জন্যে রোজ রোজ আসাও আমি পছন্দ করিনে। ওতে আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটে। আমিও তো একজন কর্মী। হপ্তায় একবার কি দু বার আসতে বলি। পরে একদিন লক্ষ করি যে তার আর তেমন চাড় নেই। সে কখনো আসে, কখনো কামাই করে, কখনো অপেক্ষা করে, কখনো নিঃশব্দে চলে যায়। যা পায় তার জন্যে অতদূরে আসা বা অতক্ষণ থাকা বোধহয় পোষায় না। বিশেষত খরা বর্ষায়।

মাহাঙ্গুর কি অসুখ করেছে। অনেক দিন ওকে দেখিনি। ভজুয়া রুইদাসের মুখে শুনি মাহাঙ্গু আজকাল বোলপুরের আশে পাশে যা পায় তাই দিয়ে দিন গুজরান করে। কমজোরী আদমী। তাকত নেই। মাথা ঘোরে। ইচ্ছা করে ওকে ডেকে পাঠাতে। কিন্তু কোথায় সেসব পুরোনো জুতো! আমার হারানিধি! নতুনের তো পুরোনো হতে ঢের দেরি। অসময়ে ওর হাতে পড়লে ও ফুঁড়ে ফুঁড়ে নষ্ট করবে।

মাহাঙ্গুর কথা একরকম ভুলেই গেছি। সব শেষের জন বলতে ওই একজনই ছিল আমার সামনে। ওর চেয়ে অক্ষম, ওর চেয়ে অবনমিত, ওর চেয়ে শোষিত মানুষ শত শত আছে কিন্তু একই সঙ্গে অক্ষম তথা অবনমিত তথা শোষিত একটি মানুষকে প্রত্যক্ষ করলে তো বলব, এই আমার সব শেষের জন। তাছাড়া আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই অপরাজিত, মানুষ যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খায়। কারো কাছে হাত পাতে না। আমার কাছে যা পেত তা ওর মেহনতের ফল। আমার দাক্ষিণ্য নয়। লোভ আমি ওর মধ্যে লক্ষ করিনি। আর আলস্য? না, আলস্যও নয়। আমাকে বিরক্ত করতে চায় না বলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মিলটনের উক্তি— "He also serves who stands and waits."

আমাদের পাড়ার বৈজু মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠালেও আসে না। গেট ভাঙ্গা পড়ে রয়েছে। বাগানে গোরু ছাগল ঢুকছে। হঠাৎ মিস্ত্রীর দর্শন পেয়ে আমি মন্তব্য করি, পুবের সূর্য আজ পশ্চিমে উদয় যে!

সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, সর্বনাশ হয়ে গেছে, হুজুর।

কার সর্বনাশ? তোমার? আমি তো হাঁ।

না, মালিক, আমার নয়। আমার আপনার জেলার ভাই বেরাদরের সর্বনাশ। এখন ওরা খাবে কী? কেমন করে ওদের পেট চলবে? সব কটা তো নাবালেগ। ওই একজনই ছিল রোজগেরে মরদ। জানাজানাশ কি কর কোথে বেরোতে পারে? হুজুর ওকে অনুগ্রহ করতেন। এই বিপদে হুজুরই ভরসা। বৈজু আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে।

'কার কথা বলছ, মিস্ত্রী?' আমি উদ্বেগে অস্থির।

কেন, মাহাঙ্গুর। ও হো হো হো বলা যায় না, হুজুর। বলা যায় না। চোখেও দেখা যায় না, হুজুর, চোখেও দেখা যায় না। এইমাত্র আমি ওর লাশ দেখে আসছি। চাপা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে গাড়িয়ে দিয়ে কী যে করে রেখে গেছে মোটর লরি! ও কি মাহাঙ্গু!

মাহাংগু বলে কি চেনা যায় ওকে! পুলিশ এসে তদন্ত করছে। নিয়ে যাবে লাশ কাটা ঘরে। আহা রে, বেচারা! অমন সাচ্চা আদমি আমি দেখিনি, মালিক। ওর কপালে এই ছিল! মিস্ত্রী আমার পা জড়িয়ে ধরে।

তা কী করে ঘটনাটা ঘটল? আমি সামলে নিয়ে সুধাই।

হুজুরকে বলতে শরম লাগে। বেশী নয়, মাহাংগু একটু আধটু শরাব পিত। বেশী নয়, রোজ দশ আনার। কাল ছিল ঝড়-বাণ্টি অন্ধোকার। কাঁপা মানুষ টলতে টলতে বাড়ী ফিরছিল। নেশার ঘোরে রেহুঁশ। হঠাৎ মোটর লরির সঙ্গে মুখোমুখি। লরির সামনের বাতি দুটো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তবুধো লোকটা দুই বাহু তুলে হুংকার ছেড়ে লরির দিকেই এগিয়ে গেল। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল যাদের একটু হুঁশ ছিল। ওকে টেনে সরিয়ে নেবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। ডেরাইভার শালা গাড়ী নিয়ে উধাও। নম্বরটাও কেউ টুকে নেয়নি। ও রাস্তা দিয়ে তো কাঁহা কাঁহা মুলুকের লরি যাওয়া আসা করে। কে জানে কার লরি! সে একনিঃশ্বাসে বলে যায় আর চোখের জল মোছে।

আমার মুখ দিয়ে কথা সরে না। আমি যেন পাথর হয়ে গেছি। এর কি কোনো প্রতিকার আছে? এই অন্যায়ের? ড্রাইভারটাকে ধরতে পারলে বছর দুয়েকের মতো ফাটক। কিন্তু মাহাংগু তো আর প্রাণ ফিরে পাবে না। হায়, হায়, কেন এমন হলো!

হুজুর তো জজ ছিলেন। হুজুর এক লাইন লিখে দিলেই কাজ হবে। পুলিশ ও শালাকে পাকড়িয়ে এনে হাজতে পুরবে। নয়তো আমরাই পাকড়াব আর বদলা নেব। আমরা এখন আজাদী পেয়ে গেছি। আমরাই ওকে ফাঁসিতে লটকাব। সে রাগে গজরাতে থাকে। মাহাংগুরই সমবয়সী। তেমনি কাঁচাপাকা চুল। কিন্তু বলিষ্ঠ পুরুষ।

আমি ওকে ঠাণ্ডা করি। আশ্বাস দিই যে পুলিশ নিশ্চয়ই লোকটাকে পাকড়াবে ও হাকিম নিশ্চয়ই জেলে পাঠাবেন।

'কেন, হুজুর? ফাঁসি হবে না কেন? মানুষ মারবে, নিজে মরবে না? তা হলে বলেছে কেন, যেমন কর্ম তেমনি ফল?' সে জবর প্রশ্ন করে।

আমি এখন এর কী জবাব দিই। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর সুধাই আচ্ছা, বৈজু, দশ আনার মাল টেনে কি অত নেশা হয়? তুমি ঠিক জানো দশ আনা?

ঠিক জানি, হুজুর। ও খুব হিসাবী আদমি ছিল। একটুকুও এদিক ওদিক হতো না। দেশী মালে নেশা বেশী হুজুর। সে সবজান্তার মতো বলে।

আমার মাথায় তখন ঘুরছে, মাহাংগু যে রোজ দশ আনা খরচ করত তার কী পরিমাণ আমার দেওয়া মজুরি? মদ খেয়ে ওড়ুবে জানলে কি আমি অমন মুক্তহস্ত হতুম? হয়ে কি ওর ভালো করেছি? আবার ভাবি, ওড়াবে না-ই বা কেন, যদি হকের পাওনা হয়ে থাকে? আমি বিচার করবার কে? জজ হয়েছি বলে কি পাপপুণ্যের জজ হয়েছি?

ওর আত্মার সদগতি হোক। এপারের পাপ এপারেই পড়ে থাক। এপারের পুণ্য ওপারের সাথী হোক। আমি মনে মনে প্রার্থনা করি।

মাঝে মাঝে ভাবি মাহাংগুর কথা। পরণে খাটো ধুতী, খাটো কুর্তা। তার উপর একটা চাদর জড়ানো। মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ বোধহয় গেছে মায়ের কৃপায়। বসন্তকে গ্রামের লোক বলে মায়ের কৃপা। মা শীতলার। মাহাংগু তার হ্যান্ডিক্যাপ নিয়ে লড়াই করে গেছে আজীবন। এমন যোদ্ধা কজন আছে যাদের পানদোষ নেই? সেইজন্যেই তার প্রাণ যাবে এটা কিন্তু আমি মেনে নিতে পারিনে। কী নিষ্ঠুর নিয়তি!

অমিতাভ চৌধুরী

আনন্দবাজারের ইতিকথা

কবি নিশিকান্ত অনেকদিন আগে গান বেঁধেছিলেন আনন্দবাজার নিয়ে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে পণ্ডিচেরির বাসিন্দা হওয়ার পরও সেই গান চালু ছিল বিশ্বভারতীর ছাত্রদের মুখে মুখে। বছর ত্রিশ আগে আমি যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলাম, তখনও শাল-বীথির সামনে দল বেঁধে হাঁটা তরুণ-তরুণীর মুখে শুনেছি সেই গানের কলি—'চল চল দেখবে মজা আনন্দ-বাজারে, ছেলেমেয়ে বেচে কেনে কাতারে কাতারে।'

হাসির গান। মজার গান। বাংলা আধুনিক কবিতার অন্যতম পুরোধা, সাধক কবি নিশিকান্ত রায়চৌধুরী এমনি অসংখ্য মজার গান লিখেছিলেন সেকালের শান্তিনিকেতন জীবন নিয়ে। যেমন শান্তিনিকেতনে ঢোকার মুখে মন্দিরের লাগোয়া গোলগাল ভালধরজ বাড়ির অধিবাসী মোটাসোটা বেঁটখাটো তেজেশচন্দ্র সেন সম্পর্কে তাঁর লেখা গানের প্রথম দুটি লাইন হল—

—'শান্তিনিকেতনে আমি নতুন মানুষ এসেছি; সেথায় গোলবাড়িতে গোলবাবুকে দাড়ি কামাতে দেখেছি।'

তখন পুরোনো আশ্রমের মাস্টার-মশাইরা থাকতেন লাইন বাঁধা ব্যাঙতে এক জায়গায়! গরু পল্লীতে। ক্ষিতিমোহন সেন জগদানন্দ রায় নেপালচন্দ্র রায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিচরন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁদের প্রত্যেকের চালচলন ধরন-ধারণ নিয়ে বাঁধা নিশিকান্ত সংগীত এখনও জনপ্রিয় শান্তিনিকেতনে। পিকনিক বা একসকার্সনে কেউ না কেউ তাঁর গরু-পল্লী-বন্দনা গাইবেই। ক্ষিতিমোহন সেন মশাই সম্বন্ধে ছিল—

তারপরেতে দাদা ক্ষিতি
দেখে তাঁরে লাগে ভীতি
খোয়াই বেড়ান নিতিনিতি
পাছুতে যান তিনজনা।
(বলে জানাই শোন না জাননা জাননা)

বঙ্গীয় শব্দ কোষ রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে—

তারপরেতে বাবু হরি
লিখেন বাঁস ডিকসনারি
সদাই আছেন কলম ধরি
আজীবন সাধনা।। (জাননা জাননা)

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা সত্য-চরণ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে—তারপরেতে দাদা সত্য, লাইব্রেরির কাজে মত্ত, ম্যালেরিয়ায় ভোগেন নিত্য, তবু ছুটি মিলল না।। নেপালচন্দ্র রায় সম্পর্কে—তারপরেতে দাদা নেপাল চকচকে তার মাথা কপাল ভলি বল নো। জগদানন্দ মাথা কপাল ভলি বল বদনা। জগদানন্দ অম্বুরি তামাকের গন্ধ ইত্যাদি।

সে অন্য কাহিনী। বলছিলাম আনন্দ বাজারের কথা। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার শান্তিনিকেতন নিয়ে যেসব কথা লিখেছিলেন নিশিকান্ত সেই ট্রাডিশান আজও চলিয়াছে, কোথাও তাহার পরিবর্তন ঘটে নাই।' বারো মাসে আঠারো পার্বণের দেশ শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রধান পরব আনন্দবাজার। বর্ষামঙ্গল বৃক্ষ রোপণ বসন্তোৎসব পৌষমেলার কথা আজ সবাই জানেন, দল বেঁধে বাইরের লোক ওই সব উৎসবে যোগ দিতে যানও কিন্তু আনন্দবাজার এখনও তেমন 'জগৎ জোড়া' খ্যাতি পায়নি। উৎসবটি নিতান্তই ঘরোয়া শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত নিজস্ব।

আগে বুঝতে পারিনি এখনও বুঝেছি এই আনন্দবাজার ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশীকে স্বদেশী করার আর একটি দৃষ্টান্ত। 'ফেট' বলে একটা বস্তু আছে বিদেশে এবং এখানকার ইংগবঙ্গ সমাজে। কোন একটা সৎ কাজে টাকা তোলার জন্যে আট আনার জিনিস আটষট্টি টাকায় বিক্রি করা হয় একদিনের বিলাসী মেলায়। তাছাড়া থাকে নাচ-গান হল্লা। বেলেল্লাপনার বড়াতি অংশ কচাং করে কেটে রবীন্দ্রনাথ ওই 'ফেট' ব্যাপারটাকে দিয়েছেন নতুন রূপ, বানিয়েছেন পুরোপুরি ভারতীয় এবং ওর গায়ে যে কোন বিলিতি গন্ধ আছে আজ তা বোঝার উপায় নেই। মেলার অনেক লাভের টাকা সৎ কাজে

খরচ করার মূল নীতিটুকু কিন্তু একই আছে।

আনন্দবাজার অভিনব। বাইশে পৌষমেলার খুদে সংস্করণ। তার মেয়াদ একদিনের। ধরা বাঁধা দিন নেই। পুজোর ছুটির ঠিক আগটায় শরৎকাশ যখন আসর জমিয়ে বসে। শউলি গাছের তলায়, কাশফুলের আগায়, নীল আকাশে, শাদা মেঘের ভেলায় ঠিক যখনই বাজে ছুটির বাঁশি সেই সময়টায় বসে আনন্দবাজার।

এই একদিন-কা-মেলার ক্রেতা-বিক্রেতা ঠিকাদার ডেকরেটার ছাত্র-ছাত্রীরা। পুরানো লাইব্রেরি আর সিংহ সদনের মাঝখানময় গোর প্রাঙ্গণ তারই ভিতর বসে সারি সারি দোকান। শ্যামকুটীরের বারান্দা সত্য কুটির শ্যামলী কুটির

পুরানো ঘন্টাতলা পূর্ব তোরণ পশ্চিম তোরণ—কোন কিছুরই সম্মুখভাগ বাদ যায় না। কোন দোকান একার, কোনটি দলের, কোনটি বিভাগের। পাঠভবন শিক্ষাভবন বিদ্যাভবন কলাভবন সংগীত-ভবন —সকলেরই আলাদা আলাদা। এবং আলাদা বলেই চলে ভবনে ভবনে জোর প্রতিযোগিতা।

বেশির ভাগই খাবার দোকান। তাছাড়া থাকে সার্কাস ম্যাজিক জ্যোতিষী লটারি, বন্দুকের তাক, খেলনার ফুলের হাতের কাজের দোকান। এক মাস আগে থেকে চলে জোর প্রস্তুতি। কে কী করছে সবই গোপন রাখার চেষ্টা হয়। বিকিকিনির পর খরচখরচা বাদে যার যা লাভ হয় সব জমা পড়ে কর্তৃপক্ষের হাতে। সব টাকা যায় দরিদ্র ভাণ্ডারে যে যত বেশি দিতে পারে তার তত আনন্দ—সবার কাছে জয়জয়কার।

মেলার দিন ভোরবেলা থেকে ব্যস্ততার সীমা থাকে না। বাড়ি থেকে হস্টেল থেকে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়ে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে। আগে থাকতেই বুক বেঁধে নিজের নিজের জায়গা হয় করা। শামিয়ানা তেরপল বাঁশে চটপট উঠে যায় দোকান ঘর। আসে টেবিল চেয়ার তক্তাপোষ শাড়ি ফুলদানি হাতা বেড়ি খুন্তি ডেকচি ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুপুর বারোটার পর গোর প্রাঙ্গণের চেহারা অন্যরকম। একেবারে অন্য জগৎ। বিচিত্র নামের সব বিচিত্র দোকান যতত্র মাথা চড়া দিয়ে ওঠে। পর্দার আড়ালে একদল মেয়ে বসেছে খাবার বানাতে। চপ কাটলেট স্যান্ডুইচ পিঠে কেক সরবৎ অনেক কিছু। ছেলেরা টেবিল সাজাচ্ছে পেরেক মারছে বোর্ড টানছে। একদল ছোট্ট মেয়ে উত্তরায়ণের ফুলবাগান সাবাড় করে মালা তৈরি করে ঘুরে বেড়চ্ছে ফিরি করতে। সং বেরিয়েছে দু-চারজন। আলখাল্লা পরা আর রুদ্রাক্ষের মালা গলায় যে ছেলেটি ফকিরের

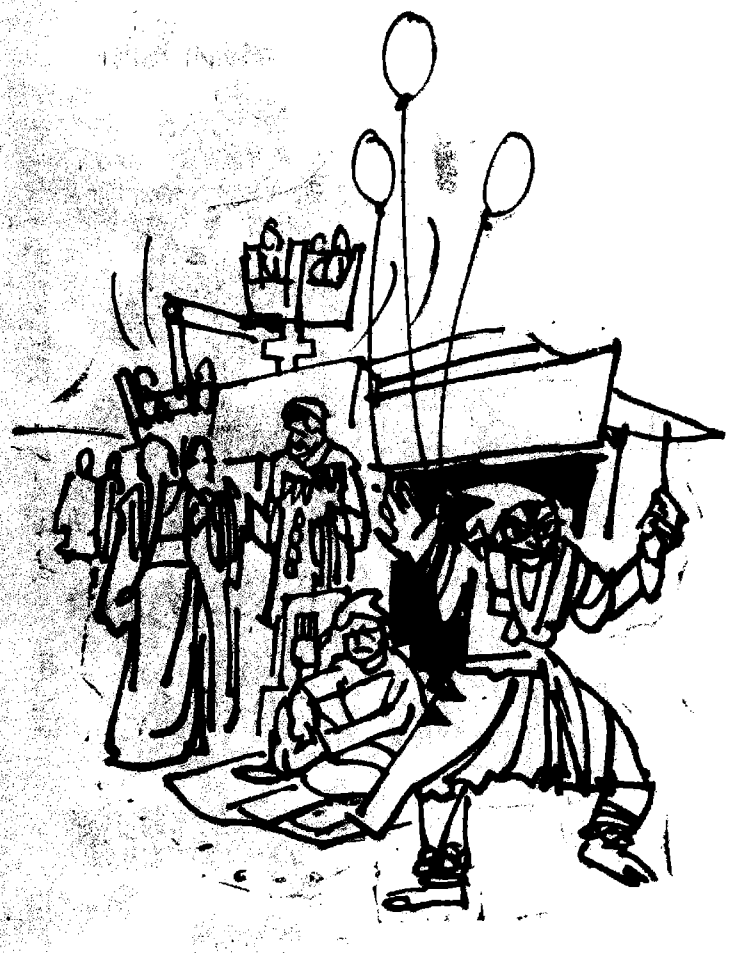

ছদ্মবেশে বসে আছে সেগুনতলায় অনেকক্ষণ পর বোঝা গেল সে পরিচিত একটি ছেলে। একগাদা গয়না আর মাথায় লাল রুমাল বেঁধে যে জিপসী মেয়ে তাক বিক্রি করছে অদ্ভুত সব কথা বলছে, তাকে চিনতে ডাক্তার দরকার পড়ে শার্লক হোমসের। সং বেরিয়েছে অনেকগুলি ফিরিওলায় ছয়লাপ। মেদিনীপুরের বন্যায় ভিক্ষামাগা দলের মতো ডি এল রায়ের সুরের ধরনে একদল ছেলেমেয়ে বিচিত্র পোশাক পরে গানের মিছিল বের করেছে শালবীথির রাস্তায়। মৌনীবাবা এক সঙ্ঘ বসে আছে পুরানো ঘন্টাতলায়। পকেটমারের অনুকরণে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু-চারজন।

আসলে পকেটমার খাবার দোকান-গুলো। এক টাকার ক্লিনিস তিন টাকা দর হাঁকতে লাজ লজ্জা নেই। গজানী-কাটরা গণেশ কাটারর মতো সে কয়েক-গুলোর নাম হওয়া উচিত গলাকাটরা। বগল বাকস হাতে একদিনের যে দোকানদার গদিতে বসে সে সত্যিসত্যিই গলা কাটা। তাছাড়া খাবারের নাম-গুলোও হয় মজার। কোথাও ফারসি কোথাও তামিল কোথাও সংস্কৃত। ওইসব ডেভিল বিরিয়ানি পানতুয়া নামের বালাই নেই। ছোলার পিঠের নাম চনক ঘন, স্যান্ডুইচ বালুকণা জাদুকরী। অবস্থা এমন দাঁড়ায় পরিবেষণকারীদেরও নাম নিয়ে গণ্ডগোলে পড়তে হয়। তাই মেনু কার্ডের পেছনে লেখা থাকে খাবারের আসল নাম। নইলে সমূহ বিপদ। কেক খাবেন শুনে আপনি অর্ডার দিলেন শাও তো হে চারখানা কৈকেয়ী—পরিবেষক নিয়ে এল ঘুগনি।

আমরা যখন কলেজের ছাত্র সব খাবারের নাম দিয়েছিলাম তামিল ভাষার অনুকরণে। কেনটা হেৎরে উন্ডা কোনটা গান্ডে মান্ডে কোনটা এড়া ইলে কোনটা পদম্পরম। খদ্দের পাকড়াতে আমরা একদল ছেলে দোকানের বাইরে চোঙ্গা লাগিয়ে কোরাসে চিৎকার পাড়ি—হেৎরে উন্ডা গান্ডে মান্ডে তৎক্ষণাৎ দলের মেয়েরা ধুয়া ধরে এড়া ইলে পদম্পরম। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ চিৎকারের জোরেই আমরা অনেক খদ্দের টেনেছিলাম। খাবার খেয়ে কোন ক্রেতাই যে সন্তুষ্ট হননি একথা হলফ করে বলতে পারি। তাছাড়া একটা ছোট্ট সিঙ্গাড়ার নাম যদি হয় কুড়ুমুড়ু তিরুকোণ তিরুত্তজমূর্তিম এবং তার দাম যদি হয় সাড়ে আঠারো আনা তাহলে ফরাসী শেফ আনিয়ে খাবার বানালেও বিস্বাদ লাগবে। অবশ্যি সব দোকানেই এক হাল। খাবারের সাইজ যত ছোট দাম তত বড়। একবার একটি দোকানের নাম ছিল ঋণংকৃত্বা। বোঝা যায়নি দোকানীরা ঋণ করে দোকান করল না ঋণ করে খেতে আসতে প্রলুব্ধ করছে।

মাস্টার মশাই বা আশ্রমের বাসিন্দা অভিভাবকদের আবার বাড়তি বিপদ। একটি দোকানে গিয়ে নিস্তার নেই। চেনা প্রায় প্রত্যেকটি দোকানেই ঢুকতে হবে এবং দফায় দফায় টাকা গচ্চা দিতে হবে। যিনি যত জনপ্রিয় ততবেশি ডাক, ততবেশি গচ্চা। বাইরে থেকে যাঁরা যান, তাঁরা মনোহারিনী, ফুলমালিনী বিচিত্র-রূপিণী পরিচারিকাদের দেখে বিপদসমুদ্রে ঝাঁপ দেন। পরিচারক পরিচারিকাদের সাজ পোশাক দোকান ও খাবারের নামের ভাবার সঙ্গে মিলিয়ে করা হত। সংস্কৃত হলে উজ্জয়িনীর মালবিকা নিপুণিকা চতুরিকা ঘুরে বেড়াত। ফারসি হলে লায়লা মালেকা আবিদারা চোখে বিদ্যুৎ হানত। স্পেনীশ হলে ট্যাঙ্গো নাচিয়ে

P28676

ভঙ্গীতে খুটখুটে হেঁটে হেঁটে। এ আকর্ষণও কম নয়। তাছাড়া আর একটি গোপনকথা জনান্তিকে বলি। প্রতিটি টেবিলে পরিবেষনে থাকে একটি ছেলে একটি মেয়ে। সেই জোড়া ঠিক করতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। শেষ পর্যন্ত লটারি করে যাদু অদৃষ্টে যেমন জুটেছে। শুধু তাই নয়, নেপথ্যে খাবার তৈরির জায়গায়ও উৎসাহ প্রবলতর হয়—উৎসাহদাত্রী সঙ্গীটি যদি পছন্দসই হয়।

এই আনন্দবাজারের শুরু শান্তিনিকেতনের সেই আদ্যিকাল থেকে। প্রথম আনন্দবাজার ১৯১৬ সালে আজ থেকে ঠিক ষাট বছর আগে। প্রথমবারে রবীন্দ্রনাথ গরহাজির। তিনি তখন জাপানে। পরের বার থেকে তিনি শান্তিনিকেতন থাকলে আনন্দবাজারে যেতেনই এবং চড়া দামের হাত থেকে তিনিও রেহাই পেতেন না। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত লটারি পুতুলের দোকান ফুলের দোকান ইত্যাদিতে যেতেন। তাঁর উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ এনে দিত। ভানু সিংহের পত্রাবলীতে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে আনন্দবাজারে তাঁর আনন্দ করার এক বিবরণ আছে। এবং চার আনার রুমাল এক টাকায় কেনার কাহিনীও তিনি বর্ণনা করেছেন চিঠিতে। এমন কথাও শুনেছি, রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে রংমাখা পরচুলাপরা গানের দল পয়সা মেগে বেড়াত।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এলে খুশি হত ক্রেতা ছাত্রছাত্রী এবং বিক্রেতা ছাত্রছাত্রী। দিলদরিয়া এই বিপুলবপু মানুষটি অকাতরে পয়সা খরচ করতেন এই খুদে-মেলায় এসে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে খাবার দোকানে ঢুকলে দাম যত চড়াই হোক না কেন, গাঁটের কড়ি গচ্চা দিতে হত না অন্য কারও। শুনেছি, জুতো বুরুশের কাজে নেমে একটি ছাত্র পরো এক টাকা আদায় করেছিল দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

আগে আনন্দবাজার বসত শালবীথি আম্রকুঞ্জ ঘিরে। এখনকার মতো গৌর প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করে নয়। প্রথমবারে মাধবী বিতানে—যেখানে জগদানন্দ রায় অঙ্কের ক্লাস নিতেন—সুধাকান্ত রায় চৌধুরী এক খাবারের দোকান দিয়েছিলেন। মাথে উর্দু পরনে পশ্চিমী পোশাক। পাগড়ি, শিলওয়ার আচকান। খাবার একটিই—কাচালু। আলুকাবলির ধরণে তেতুলজল মেশানো কাঁচা একটি আলুর গায়ে চোরকাঁটা। অঢেল বিক্রি হয়েছিল সেবার। খাবারের উৎকর্ষের জন্যে নয়, দোকানীর উর্দু বরেৎ আর মুসলমানী আদবকায়দার জোরে।

১৩২৬ সালের পুরোনো একটি শান্তিনিকেতন পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি সেকালের আনন্দবাজার পত্রিকার এক বিবরণ। সে সময় ছাত্ররা একটি জাদুঘর খুলেছিল—যার নাম দেওয়া হয়েছিল প্রত্নতত্ত্বাগার। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রমথনাথ বিশী। পত্রিকা লিখছে—

শালের ছায়াবীথিতে ছাত্রদের একটি আনন্দবাজার বসিয়াছিল। ছাত্ররা নিজেরাই নানারকম খাবারদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দোকান করিয়াছিল। অনেক ছাত্র নানাবিধ গাছের কাঁটা সংগ্রহ করিয়া একটি পরিদর্শনী খুলিয়াছিল। যে-সব ছাত্র গান গাইতে জানে, তাহারা প্রত্যেকে দোকানে দোকানে গান গাহিয়া পয়সা সংগ্রহ করিয়াছিল। আর একদল ছেলে এক প্রত্নতত্ত্বাগার খুলিয়াছিল। সেখানে ছিল রামের পাদুকা (অর্থাৎ প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দবাবুর জুতা), অশোকের হস্তলিপি (জনৈক বর্তমান ছাত্রের নাম অশোক) বুদ্ধের পাদনখকণা (জনৈক বর্তমান ছাত্রের নাম বুদ্ধদাস) ইত্যাদি। প্রত্যেক দোকানদারের লাভের অংশ অর্ধেক দরিদ্রভাণ্ডারে আর অর্ধেক পত্রিকা বিভাগের তহবিলে দেওয়া হইবে।

১৯৫০ সালে ওরেরই অনুকরণে একটি প্রদর্শনী খুলে দর্শকদের চমকে দেওয়া হয়েছিল। মোটা দক্ষিণার লোভ কারও ছিল না। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন একালের বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সেকালের কলেজের ছাত্র অমর্ত্যকুমার সেন। প্রদর্শনীতে ছিল গীতার পাণ্ডুলিপি। অর্থাৎ ছাত্রী গীতা সেনের হাতের লেখা। ছিল শিবের জটা। অর্থাৎ ছাত্র শিবকৃষ্ণ করের আঠা লাগানো চুল। আরও এই রকম বিচিত্র সম্ভার।

আনন্দবাজার চলে রাত দশটা পর্যন্ত। ওই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েক হাজার টাকার লেনদেন হয় নানা দোকানে। রাত্রে মজার মজার অভিনয়ও হয় দর্শনী দিয়ে। নাটক সাধারণত রবীন্দ্রনাথের নয়—ছাত্রছাত্রীর লেখা। ১৯৪৭ সালে আমরা সিংহসদনে নাটক নামিয়েছিলাম পরশুরামের ভুষণ্ডির মাঠে। তার ছাপানো প্রবেশপত্র এখনও আমার কাছে আছে। বন্ধুদের ফরমাশে আনন্দবাজারের দিন কয় আগে একরাত জেগে পরশুরামের গল্পটির গীতিনাট্যরূপ দিয়েছিলাম। গোটা কুড়ি গান। পরদিনই গানে সুর দেন, শান্তিদেব ঘোষ অরবিন্দ বিশ্বাস ও লোকনাথ ভট্টাচার্য। অভিনয়ে কুড়ি লোকনাথ ভট্টাচার্য, জড়ি বিশ্বজিৎ রায়, ব্রহ্মদৈত্য শুভময় ঘোষ, যক্ষ অরূপ ব্যাগচি, কারিয়াশিরেত আমি, পেতনি প্রবীর গুহঠাকুরতা, শাঁকচুনি হীরেন ভট্টাচার্য ও ডাইনি শ্যামলী মুখোপাধ্যায়। মঞ্চসজ্জা ও অঙ্গসজ্জা করতে এগিয়ে আসেন রামকিঙ্কর বেইজ ও বিনায়ক মাসোজি। নাটকটি এত জমেছিল যে, মোহনবাগান ভেটারন্স ক্লাবকে দেখাতে পরদিন আবার অভিনয় করতে হয়। শুধু তাই নয়, অনিলকুমার চন্দের উদ্যোগে পরশুরাম রাজশেখর বসুকে দেখানোর জন্যে পরবর্তী নববর্ষ উৎসব সরকারীভাবে ভুষণ্ডির মাঠে অভিনীত হয়। রাজশেখরবাবু এসেছিলেন, দেখে-

বিশ্ব-পরিবেশনা :
শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

ঘরে ঘরে প্রতি ঘরে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

দিন শুরু করুন বেশ মচমচে আর তাজা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে। স্বাদেভরা এই বিস্কুট যেমন হাল্কা, তেমনি হজম করাও সহজ। দাদু থেকে নাতি—বাড়ীর সবার জন্যে। সকালে, কাজের অবসরে চায়ের সঙ্গে—যে কোনো সময়েই ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট খেতে ভাল।

ব্রিটানিয়া
দেয় ভাল বিস্কুট—
৫০ বছরের অভিজ্ঞতায়

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিবটাস-68C.AR.3-140 BG

ছিলেন, খুশি হয়েছিলেন। তারপর অভিনীত হয় কলকাতায়—শ্রীরঙ্গম ও নিউ এম্পায়ারে।

সেই বছরই কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা করে আর একটি অভিনব নাটক—সংযুক্তার স্বয়ম্বর। মানুষকে পুতুল বানিয়ে পুতুলের ভঙ্গীতে নাচিয়ে চমৎকার প্রযোজনা। প্রযোজক ছিলেন একালের নামকরা কলাতত্ত্ববিদ ও সেকালের কলাভবনের ছাত্র জগদীশ মিত্তাল। অন্যতমা পুতুল ছিলেন সোনালী সেনরায়। পরবর্তীকালে সোনালী দাশগুপ্ত, এবং তারও পরবর্তীকালে সোনালী রোজেলেনি। বর্তমানে রোমনগরীর বাসিন্দা।

১৯৫২ সালে এই আনন্দবাজারেই আমি একটি ছড়ার দোকান দিয়েছিলাম। নাম অন্নপূর্ণা কবিতা ভান্ডার। সাইনবোর্ডের নিচে লেখা ছিল—এখানে সুলভে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফরমায়েশমতো কবিতা লেখা হয়। অর্ডিনারি চারি আনা, স্পেশাল আট আনা। সাইনবোর্ড লিখে ও এঁকে দিয়েছিলেন রাণী চন্দ। সাইনবোর্ডের উপরে ছিল সিদ্ধিদাতা গণেশের ওল্টানো ছবি। ক্যাপশন—'উল্টা গণেশায়ঃ নমঃ।

দোকানের সামনেটা সাজানো হয়েছিল দারুণ। কাউন্টারে বসেছিল আমার দুই এসিস্ট্যান্ট— অমর্ত্য সেন এবং তাঁর সহপাঠী ও বর্তমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ মৃণাল দত্তচৌধুরী। ছিল একজন রেসিপশনিস্ট—নামকরা নাচিয়ে মঞ্জুলা দত্ত। মঞ্জুলা এখনও রেডিওতে গান গায়, থাকে বার্ণপুরে স্বামীগৃহে।

কাউন্টারের পিছনে এক ঘেরাটোপের মধ্যে ছিল ফ্যাকটরি—কবিতা রচনার কারখানা, অর্থাৎ কাগজ কলম নিয়ে আমি বসে আছি। অমর্ত্য মৃণাল চেঁচিয়ে খদ্দের জোগাড় করে, মঞ্জুলা অর্ডার নেয় এবং নাম বা বিষয়, স্পেশাল না অর্ডিনারি—একটা চিরকুটে লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। ঘড়িধরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ডারমাফিক ছড়া লিখে আমি পসার জমিয়েছিলাম। সব মনে নেই, শুধু মনে আছে ৮৭টি ছড়া লিখেছিলুম সেবার। তারপর মাথা এমন ঝিমঝিম করতে লাগল, দোকানপাট ফেলে পালিয়েছিলুম অন্যত্র।

আমার খদ্দেরদের মধ্যে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর প্রবোধ বাকচি, অনিলকুমার চন্দ, রাণী চন্দ, সেকালের চিত্রতারকা সুপ্রভা মুখার্জি, একালের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট দেবকান্ত বরুয়া, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। দেবকান্ত বরুয়া সম্পর্কে দু লাইন মনে আছে—

গড়িয়ে চলেন গড়িয়ে বলেন
গড়গড়ানো ভাব,
নিন্দুকেরা নাম দিয়েছে
নরম কচিডাব।

ডঃ প্রবোধ বাকচি যখন এলেন, মিলের খাতিরে তাঁকে 'সাকচি' পাঠিয়ে শেষ করলাম 'ত্রাহি ত্রাহি ডাকছি' দিয়ে। সুপ্রভা মুখার্জি সম্পর্কে লেখা ছড়া পরে অন্যভাবে লিখে অন্যত্র ছাপিয়েছি। সেবার লিখেছিলাম—

হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দিয়ে
মিষ্টিমধুর সম্ভাষণ,
ঠোঁটের রঙে শাড়ির রঙে
জি সি লাহার বিজ্ঞাপন।

'শান্তিদেব ঘোষ, একটুতেই ফোঁস'—এই কথাটি লেখাতে শান্তিদা আমার উপর ফোঁস করে ওঠেন নি, কিংবা অনিলকুমার চন্দের গায়ে বদ গন্ধ দেওয়াতেও অনিলদা ক্ষুণ্ন হন নি। বুঝেছিলেন সবই মিলের খাতিরে। তবে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপদে ফেলেছিলেন আমাকে। স্পেশাল আট আনা ফেলে দিয়ে ফরমাশ করলেন 'আমার নামে চাই চৌপদী।' চৌপদী লেখার হাঙ্গামা

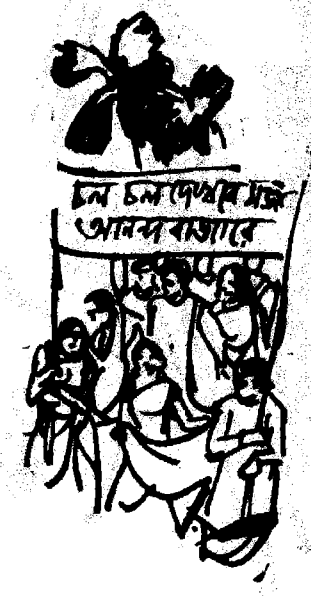

অনেক। আমি ছোট চারটি পদ তৎক্ষণাৎ লিখে বললাম, এটাই চৌপদী—

রথীন্দ্রনাথ,
আজ তার সাথ
মোর মোলাকাৎ।
আমি কুপোকাৎ।

আর একজন খদ্দের এসে ফরমাশ দিলেন 'কমানিটি প্রজেক্ট' নিয়ে ছড়া বানাতে হবে। তখন দেশে সবে চালু হয়েছে এই প্রজেক্ট। আমার মাথায় বজ্রাঘাত। কী লিখি? হাতে সময় পাঁচ মিনিট। সময় পেরোলেই পয়সা বাতিল। অবশেষে মাথার চুল ছিঁড়ে কলম কামড়ে অতি কষ্টে লিমেরিক লিখলাম—

প্রজেক্ট কমানিটি,
নামটা খিটিমিটি।
ঢালছে টাকা দেদার
রামা, শ্যামা কেদার
টাকার লুটোপুটি।

আর এক খদ্দের ফরমাশ দিলেন ভারতে মার্কিন সাহায্য নিয়ে ছড়া বানাতে হবে। ঠং করে কাউন্টারে ফেলে দিলেন স্পেশাল রেট আট আনার আধুলি। ঘেরাটোপের ফাঁক থেকে দেখলাম ক্রেতাটি চেনা—কম্যুনিস্ট। তাঁকে খুশি করার জন্যে লিখলাম—

ডলার মোড়া চার কিনে
টোপ ফেলেছে মার্কিনে।
মিলে সকল পড়শিতে
আটকে গেছি বড়শিতে।
ডিসেম্বরের ভর শীতে
রাত কাটাব জার্কিনে।

আরও অনেক ছড়া। সব মনে নেই। তা না থাকুক, আমাদের কালের আনন্দ বাজারের স্মৃতি মনে গেঁথে আছে। সেই দোকান সাজানো, সেই খাবার বিক্রি, সেই সং সেজে রাস্তায় রাস্তায় নাচন কোঁদন—কোনদিন ভুলব না। ভুলব না মেলার শেষে ফাঁকা দোকানে বসে আড্ডা মারা, গান গাওয়া। সারাদিনের ক্লান্তির পর কেউ মাটিতে কেউ চৌবাসে, কেউ বেঞ্চিতে হাত পা ছড়িয়ে বসেছি। তারই মধ্যে কেউ কেউ পয়সার হিসাব মেলাচ্ছে, কাপ প্লেট গুনছে। অন্য দোকান থেকে দল বেঁধে একে একে আসছে অন্য ভবনের ছেলেমেয়েরা। সবাই গোল হয়ে বসে পড়েছে। তারপর শুরু গান। গানের পর গান। গানের পালকা। একটার পর একটার পর একটা।

একটানা কোলাহলের পর শালবীথি তখন চুপ। গোর প্রাঙ্গণ চুপ। শান্ত দেহে ক্লান্তি। পুরানো লাইব্রেরির বারান্দা থেকে ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত উদ্দাম কণ্ঠস্বর—আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, ভবের পদ্মপত্রে জল—'।

এই গানের সুর এখনও কানে বাজে, এখনও হঠাৎ বুকে চমক লাগায়। এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে এখনও দেখি, ঠিক একই ভাবে আমাদের ছেলেমেয়েরা বয়সীরা আনন্দবাজারের পর গোল হয়ে বসে গান গাইছে। মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। ওই নতুন যৌবনের দূতদের সঙ্গে আমি আর কোনদিন বসতে পারব না, ওদের কচি গলার সুরে আর গলা মেলাতে পারব না।

তা না পারি, মনে মনে বলি, 'আমরাও গান গেয়েছিলেম, আমরাও খেলা খেলেছি। —কেননা দূরে রজনীর স্বপন লাগে আজ নূতনের হাসতে।'

প্রেমের প্রান্তে পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

উপন্যাস

"চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণের কোনো খণ্ডিত পুঁথি কি এখন পাওয়া যায়?

বৈয়াকরণ শাকটায়ন যে চান্দ্র ব্যাকরণের কাছে ঋণী, সে-ব্যাকরণ কি চন্দ্রগোমীরই রচিত 'অসংজ্ঞক ব্যাকরণ'?

চন্দ্রগোমী কি সত্যিই নাগার্জুন শূন্যবাদের অনুগামী চন্দ্রকীর্তির শিষ্য?"

ওপরে যা লেখা হয়েছে তা পড়তে পড়তে মাথা যদি কারুর একটু গুলিয়ে যায়, তাহলে তাকে দোষ দেবার কিছু নেই।

গোয়েন্দা গল্প পড়তে বসে ভুল করে পুরাতত্ত্ব গবেষণার কোনো সন্দর্ভের পাতা খুলে ফেলা হয়েছে বলে যদি সন্দেহ হয়, সেটাও সহজেই মার্জনীয়

ওরকম সন্দেহ হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

আমারও হয়েছিল। আর কাগজে ছাপার অক্ষরে ওই কথাগুলি পাঠ করে নয়, ভারতবর্ষের সর্বজনবিদিত বিখ্যাত এক আচার্য পণ্ডিতের পাঠাগারে মেঝের ওপর পাতা বিচিত্র নকসার চৈনিক মাদুরে বসে নিজের কানে পরাশর বর্মা আর আমি ছাড়া ও-কক্ষের তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে প্রশ্নোত্তরে ওই জাতীয় আলোচনা শুনে।

আচার্য দেব তখনও এ-ঘরে আসেননি! তাঁরই অপেক্ষায় আমরা তিনজন তাঁর পাঠাগারে বসে আছি। কিন্তু আমি ঠিক আচার্যদেবের অপেক্ষায় বসে আছি বললে সত্যের একান্ত অপলাপ হবে। আমি তাঁর জন্যে এখানে অপেক্ষা করে নেই, তাঁর দেখা পাওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নিয়ে এখানে আসিওনি।

তবু কেন যে এই সমাবেশে আমি উপস্থিত তা আশা করি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না।

হ্যাঁ, পরাশরের জন্যেই আমার এই বিড়ম্বনা।

সে নাছোড়বান্দা হয়ে একরকম জোরজুলুম করে আমায় ধরে নিয়ে এসেছে।

আসবার আগে অবশ্য প্রলোভন দেখিয়েছে অনেক।

তার সঙ্গে গেলে নাকি এমন কিছু জানতে শুনতে পারব যা আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাইরে। যেন সে আশ্বাসের গ্যারাণ্টি হিসেবেই আমার পকেটে একটা ছোট খাম গুঁজে দিয়ে বলেছে, —এখন থাক। সময় পেলে আজ রাত্রে পড়ে দেখো।

তার এসব ভুজুং-ভাজুং-এ অনায়াসে আমি বশ হতে পারতাম, কিন্তু হাতের একটি জিনিষ দেখে আমার টনক গোড়াতেই নড়ে গেছে।

সন্ত্রস্ত হয়ে তার সব সাধাসাধি আর লোভ দেখানো তাই ঠেকাতে চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য।

পরাশরের হাতে যে জিনিষটি দেখেছিলাম সেটি একটি বই।

ছোটখাট চটি পকেটবই নয়। রঙীন মন-মাতানো ছবির মলাটের দেশী কি বিদেশী উপন্যাস টুপন্যাসও নয়। দাঁতভাঙা নামের ভাষাতত্ত্বের একটা থান ইঁটের আকারের বই।

পরাশরের হাতে কবিতার বইটা তবু কিছুটা গা-সওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের কেতাবটা গোড়াতেই রীতিমত সন্দিগ্ধ করে তুলেছে।

পরাশর যেখানকার একেবারে সৃষ্টিছাড়া যে অভিজ্ঞতার লোভ দেখাচ্ছে ওই ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে তার কোন সংশ্রব থাকলে আমার আর এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

পরাশরের অনুরোধ কাটাবার সমস্ত চেষ্টা যে বিফল হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে যাঁর বাড়িতে এসে একাধারে তাঁর পাঠাগার ও বসবার ঘরে মেঝের মূল্যবান মাদুরের আসনে বসে আছি, পুরাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি ভারতের বাইরে সারা বিশ্বে ছড়ানো। নাম না করলেও অনেকেই হয়ত বুঝতে পারবেন বলে নামটা আর করলাম না।

আচার্যদেবের পাঠাগারে বসে আছি খুব কমক্ষণ নয়। পরাশরের তার পণ্ডিতী আলোচনায় মগ্ন হয়ে সময়ের খেয়াল হয়ত নেই, আমি কিন্তু ঘরে ঢোকবার পর থেকে দরজার মাথায় দেয়াল-ঘড়িটার ওপর আগাগোড়াই নজর রেখেছি।

তাতে এক মিনিট দু মিনিট করে পুরো সাতাশ মিনিট এ পর্যন্ত কেটেছে।

শুধু ঘড়ির কাঁটার দিকে অবশ্য নয়, পরাশরের সঙ্গে যিনি এইসব দাঁতভাঙা আলোচনা চালাচ্ছেন ঘরের সেই তৃতীয় ব্যক্তিটির দিকেও মনোযোগ না দিয়ে পারি নি।

মনোযোগ দেবার মতই ব্যক্তি অবশ্য! শুধু মনোযোগ দেবারই নয়, বেশ একটু বিস্মিত কৌতূহল অনুভব করবারও।

ব্যক্তিটি পুরুষ নয় নারী, এবং বাঙালী বা ভারতীয় নয়, বিদেশী যুবতী।

বিদেশ বলতে কোন দেশের তা অবশ্য তাঁকে দেখে বলা সম্ভব নয়। তাঁর পোষাকটা আর একটু বেখাপ্পা হলে তাঁকে বিশ্ব নাগরিক হিপি ভাবা

মেত। কিন্তু দেশী-বিদেশীর অদ্ভুত সংমিশ্রণ হলেও সে পোষাকে সযত্ন অযত্নের ছাপ নেই। একটু যেন জীর্ণ পুরনো মনে হলেও নিম্নাঙ্গের চলচলে সায়ার মত আবরণ আর ঊর্ধ্বাঙ্গের বেদিয়ানী কোর্তার ধরনের পোষাক দুটি নোংরা ময়লা নয় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাথায় চূড়ো বাঁধা সাদাটে যাকে বলে প্ল্যাটিনাম চুল পারিপাট্য না থাকলেও একটু ছিরি ছাঁদ আছে আর প্রসাধন বিহীন মুখখানাও শ্রীহীন নয়। কোন দিক দিয়েই নিখুঁত না হলেও গড়ন পেটন সবশুদ্ধ জড়িয়ে যত ক্ষীণই হোক কেমন একটু মোহিনীভাবই মেয়েটির আছে বলে মনে হয়।

এ সব দিয়ে আর যাই হোক তার জাতি কুলশীল ত জানা যায় না। পোষাক চেহারা দিয়ে যা সম্ভব নয় তার ভাষা দিয়ে তা বুঝব তারও উপায় নেই। বিদেশী মেয়েটি ইউরোপীয় কোনো ভাষায় নয় কথা বলছে আমাদেরই বাংলা ভাষায়। এবং বলছে একেবারে স্বচ্ছন্দে।

উচ্চারণে সামান্য একটু-আধটু আড়ষ্টতা আর টান অবশ্য আছে। কিন্তু তা থেকে তার মাতৃভাষা অনুমান করবার মত ক্ষমতা আমার অন্তত নেই।

দেয়াল ঘড়িতে সাতাশ মিনিট আধ-ঘণ্টায় গিয়ে পৌঁছেছে ইতিমধ্যে। আচার্যদেব আজ আর কখন আসবেন! তার এত দেরী করার কারণ কি।

ঘরের বাইরের করিডর দিয়ে যে দু একজন পরিচারককে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করাটা এখন অন্যায় হবে না। কিন্তু জিজ্ঞেস করবে কে?

আমার পক্ষে সেটা কি শোভন হবে না। আর পরাশর যেরকম তন্ময় হয়ে আলোচনা চলাচ্ছে তাতে আচার্যদেবের আসতে দেরী [illegible] কোনো অস্থিরতা [illegible] বলে মনে হয় না।

[illegible] কথাটা মাথার মধ্যে একটা [illegible] গেল।

পরাশরের হঠাৎ পুরাতত্ত্ব নিয়ে এত মত্ত হবার সহজ ব্যাখ্যাই কি আমার সামনে মূর্তিমতী হয়ে বসে আছে?

কিন্তু কে ইনি? এঁর সঙ্গে পরাশরের আলাপ পরিচয় হল কোথায়?

আর এতদিন বাদে হৃদয় ঘটিত ব্যাপার যদি পরাশরের একটা ঘটেই থাকে তার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অভিজ্ঞতার লোভ দেখিয়ে আমায় সঙ্গে আনবার দরকারটা কি?

আমার কি সাক্ষী হিসেবে রাখা? কিসের সাক্ষী?

এক একজন মানুষ অবশ্য একটু বেশী মাত্রায় যাকে বলে লোক-দেখানে স্বভাবের থাকে। প্রেমের জাগরণের মত নিভৃত গভীর ব্যাপারও তারা কাউকে না জানিয়ে শুনিয়ে সুখ পায় না।

কিন্তু পরাশর অমন সস্তা একজিবিশনিষ্ট ত কোনো কালেই নয়। বিশেষত প্রণয় ঘটিত ব্যাপার এতকাল বাদে তার জীবনে যদি ঘটেই থাকে সেটাকে সে পারত পক্ষে গোপন রাখতেই চাইবে।

তাহলে কিছু না জানিয়ে শুনিয়ে আমায় দেখবার সুযোগ দিয়ে আমার অনুমোদনটা নেওয়াই কি তার উদ্দেশ্য?

সেটা হওয়া অসম্ভব নয়। পরাশর নেহাৎ ছেলে-ছোকরা ত আর নয়। প্রথম যৌবন পার হতেই চলেছে বলা যায়। এ বয়সে এরকম একটা কিছু ঘটলে একটু সাবধানে পা বাড়ানোই ভালো। এর ওপর মেয়েটি যখন বিদেশী তখন নিজের পছন্দ অপছন্দ ছাড়া পাকা বুদ্ধির কারুর সমর্থন টাওয়াটা পরাশরের পক্ষে উচিতই হয়েছে।

নিজের দায়িত্বটা বুঝে মেয়েটিকে বেশ একটু খুঁটিয়েই এবার লক্ষ করলাম।

ফিল্মে নামবার মত সুন্দরী না হলেও একটা চটক যে চেহারায় আছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চটকটা একটু নয় আছে বেশ বেশী মাত্রাতেই। আর সেটা শুধু মুখ চোখের নয় সমস্ত শরীরের। পোষাকের বর্ণনা আগেই করেছি। সেই কিছুটা ইরাণী বেদিয়ানীদের ধরনের গায়ের খোলা কুর্তা আর তার তলায় সায়া আর লঙ্গির মিশ্রণের জেল্লাহীন বিনা বাহারের বেশবাসের ভেতর দিয়েই দেহ সৌষ্ঠবের মাদকতা কেমন করে ফুটে বেরুচ্ছে তা বলা শক্ত। হয়ত মেঝের ওপর বসার অনভ্যস্ত ভঙ্গির দরুন দেহের প্রচ্ছন্ন রেখার এখানে এখানে একটু ইঙ্গিতই তার জন্যে যথেষ্ট।

এ রকম মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া পরাশরের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর শুধু চেহারায় চটকই নয়। মেয়েটির মুখ চোখ বুদ্ধির দীপ্তিটাও বেশ স্পষ্ট। তার কাছে যা সম্পূর্ণ বিদেশী সেই ভাষায় বেশ একটু কষ্ট করে কথা বলতে হলেও অবাধে এতক্ষণ ধরে যে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সেইটেই ত আশ্চর্য।

কথা যা বলছে ভাষাটা বাংলা বলেও তা আমার কাছে অবশ্য পুরোপুরি গ্রীক।

সব কথায় কানই দিচ্ছি না। মাঝে মাঝে দু-একটা যা কানে আটকে যাচ্ছে সেই কটিই মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

যেমন পরাশরের কি একটা প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটিকে বলতে শুনেছি—না আমি আচার্যদেবের কাছে 'কাশিকা বৃত্তি' সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।

এ কথার উত্তরে পরাশর যা বলেছে তাতেও অবশ্য আমার চক্ষু স্থির।

পরাশর বলেছে—কাশিকাবৃত্তি ত বামন আর জয়াদিত্য দুজনের এক সঙ্গে লেখা?

মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে।

পরাশর তাতে আবার বলেছে—কিন্তু কাশিকা বৃত্তিতে না বলে অনেক কিছু চুরি করে দুই পণ্ডিত চন্দ্রগোমী কি চান্দ্র ব্যাকরণের নাম পর্যন্ত করেননি। ...

এতখানি শোনবার পর আমার কানের ফটো আপনা থেকে যেন বুজে গেছে।

মাথাটা গুলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে একবার এমন সন্দেহও জেগেছে যে ব্যাপারটা আগাগোড়া আমায় বোকা বানাবার ফিকির না ত? দুজনে মিলে আগে থাকতে সড় করে রেখে এই সব হিংটিং ছট্ আউড়ে আমায় হকচকিয়ে দেওয়াই এদের মজা!

এ সন্দেহটা অবশ্য মনের মধ্যে উঁকি না উঠতেই সকৌতুকে উড়িয়ে দিয়েছি। পরাশর ও মেয়েটি বৌদ্ধ যুগের গুরু-গম্ভীর বিষয় নিয়েই আলোচনা করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরাশর হঠাৎ এ বিষয়ে কবে থেকে উৎসাহী হয়ে উঠল?

এ মেয়েটির সঙ্গে তার কি আগে থাকতেই আলাপ হয়েছিল?

সে রকম কোনো লক্ষণ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। দুজনে দাঁত ভাঙ্গা তত্ত্ব নিয়ে আলাপ চালাচ্ছে কিন্তু কেউ কাউকে একবার নাম বা পদবী ধরেও সম্বোধন করেনি।

তাতে দুজনেই দুজনের অজানা মানুষ ধরে নিতে হয়। কিন্তু সে রকম হলে শিষ্টাচার মত আলাপের আগে পরাশরের পরিচয়টা দেওয়া নেওয়াই উচিত ছিল!

তার বদলে খানিকটা বসে থাকবার পর কোন রকম ভূমিকা না করেই দুজনে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে।

ছুটিতে বেড়ানোর পয়সা বাঁচাতে আমাদের এক বছর লেগেছিল

আর সে পয়সা খোয়াতে লেগেছিল মাত্র এক মিনিট!

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে! ছুটির খরচের টাকা ট্র্যাভ্‌লার্স চেকে বদলে নেবার জন্যে তখনই আমার ওঁকে জোর করা উচিত ছিল। বলেও ছিলাম, কিন্তু ওঁর ধারনা আমি বড় বেশী সাবধানী, তাই আর জোর করিনি।

তারপর যা হবার তাই হল···ছুটির প্রথম দিনেই আমার স্বামীর পকেট মারা গেল, সেইসঙ্গে আমাদের ছুটির খরচের পুরো টাকাও!

এবছর আমরা 'পয়সা ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টী' সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি!

হ্যাঁ, **স্টেট ব্যাঙ্ক ট্র্যাভ্‌লার্স চেক!** হারালে, চুরি গেলে বা নষ্ট হলে, আপনি আপনার টাকা ফেরত পাবেন। পুরো টাকা!

- এই সুবিধে, সারা দেশময় ছড়ানো স্টেট ব্যাঙ্কের ৫,৬০০টি শাখা ও তার সহযোগীদের কাছে পাওয়া যায়।
- ২০,০০০টি সুবিধেজনক জায়গায়—যেমন, হোটেল, দোকান, রেস্টুরেন্ট, এয়ারলাইন অফিস, প্রধান প্রধান রেলস্টেশন এবং স্টেট ব্যাঙ্কের সকল অফিস ও সহযোগীদের অফিসে, স্টেট ব্যাঙ্ক ট্র্যাভ্‌লার্স চেক গ্রাহ্য।
- এর জন্যে কোনো কমিশন লাগে না।
- কেবল আপনি প্রতিস্বাক্ষর করলে অর্থাৎ আপনি একবার সই করলে এ চেক ভাঙানো যায়—সুতরাং একমাত্র আপনিই এর টাকা পেতে পারেন।
- যত দিনে চান ব্যবহার করতে পারেন—এ বিষয়ে কোনো সময়-সীমা নেই।

৫০ টাঃ, ১০০ টাঃ আর ৫০০ টাকার ট্র্যাভ্‌লার্স চেক পাওয়া যায়।

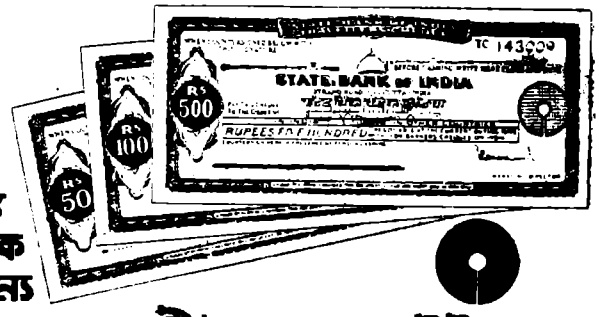

স্টেট ব্যাঙ্ক ট্র্যাভ্‌লার্স চেক আপনার জন্যে 'পয়সা ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টী'

PIN CODE FOR FAST MAIL

স্টেট ব্যাঙ্ক

SBI-14-203

কথা আগে বলেছে অবশ্য মেয়েটি। আমাদের আগে থাকতে সেই ঘরের মেঝেয় বসে ছিল।

মেয়েটি আগে কথা বলাতে পরাশরের পক্ষে সুবিধে হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মেয়েটি অচেনা অজানা একজনের সংগে আগ বাড়িয়ে কথা বলল কি করে?

এটা কি তার আধা হিপি হওয়ার লাইসেন্স।

না আচার্যদেবের পাঠাগারের আবহাওয়ারই ওটা গুণ? এর ভেতর এসে বসলে ও সব ভুয়ো আদব-কায়দার কোনো মানে থাকে না! পরাশর আর মেয়েটির সোজা-সুজি আলাপ শুরু করতে তাই বাধেনি।

মেয়েটির সংগে পরিচয় না থাকলেও সে যে পরাশরের অচেনা নয় তা অবশ্য কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বোঝা শক্ত হয়নি।

পরাশর কোথাও না কোথাও মেয়েটিকে দেখেছে আর তারপর তার সংগে আলাপ করবার সুযোগ খুঁজে আচার্যদেবের বাড়িতে আজ এসে হাজির হয়েছে।

আগে থাকতে মেয়েটিকে না চিনলে আমাকেও আজ সংগে করে ধরে আনার মানে থাকত না। নিজের পছন্দটা পরাশর আমাকে দিয়ে একটু যাচাই করাতেই চায়।

তা করবার জন্য তার হোড়-জোরটা দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা নেহাৎ ভাসাভাসা সাময়িক কিছু নয়। পরাশরের তীরটা আচমকা একটু গভীরভাবেই বিঁধেছে। একটু দেখা পাওয়া যায় আলাপ করবার সুযোগের জন্যে তাকে আমায় নিয়ে পণ্ডিত শিরোমণি এই আচার্যদেবের বাড়িতে ছুটে আসতে হয়েছে তাই। পরাশরের হঠাৎ পুরাতত্ত্ব নিয়ে মেতে ওঠার পেছনে কি আছে এখন আর বোঝা শক্ত নয়।

এখানে এসে আর কিছু না হোক কাছাকাছি বসে একটু কথা বলার সৌভাগ্য পরাশরের হয়েছে।

তারপর অবশ্য অনেক ধাপ বাকি। পরস্পরের নাম ধাম জানা থেকে, দেখা শোনার সুযোগ করে নেওয়া ইত্যাদি ধাপগুলো ত আগে না পেরোলে নয়।

তাতে আমার কাছে কোন সাহায্যের আশা কি পরাশর করে?

আশা তার পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু মেয়েটির নামটা পর্যন্ত না জেনে কি-ই বা করতে পারি আমি?

মেয়েটি এতক্ষণের মধ্যে বেশ কয়েক-বার আমায় লক্ষ্য অবশ্য করেছে। আমায় আমাগোড়া চুপ করে থাকতে দেখে খুব একটা সম্ভ্রম মেশানো ধারণা নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে হয় নি।

তা না হোক্। এতক্ষণের ধারণাটা একটু শুধরে দেবার ব্যবস্থা এবার করলাম। সেই সংগে মেয়েটির পরিচয় যাতে জানা যেতে পারে সে রকম একটা চেষ্টাও।

ঘরের দেয়াল ঘড়িটার দিকে এ পর্যন্ত বহুবারই তাকিয়েছি। এখন তাকানোটা স্বরব করে তুলে বেশ অধৈর্যের সংগে নিজেকেই যেন বললাম। —দশটা ত বাজতে চলল। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়?

পরাশর ও মেয়েটি তাদের আলোচনা থামিয়ে তখন আমার দিকে তাকিয়েছে।

পরাশরের দিকে সোজা তাকাইনি। তার চোখে হয়ত একটু ভ্রূকুটি থাকতে পারে। কিন্তু মেয়েটির মুখে ইষৎ হাসির আভাস।

সেইটেকেই সহানুভূতি বলে ধরে নিয়ে সোজাসুজি বললাম, —আমরা ত প্রায় চল্লিশ মিনিট এসেছি। আপনি ত আরো আগে এসেছেন। অপেক্ষা করে আছেন কতক্ষণ!

আগের অধৈর্য প্রকাশটা বাংলায় করে থাকলেও এবার ইচ্ছে করেই ইংরেজি ব্যবহার করেছি।

কথাগুলো সোজা। প্রশ্নটার মধ্যেও জটিল কিছু নেই। কিন্তু মেয়েটি তাতেই অমন হতভম্ব হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবে ভাবতে পারিনি।

আমার কথাটা হয়ত একটু ভুল বুঝেছে ভেবে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে মাফ চাইবার ভঙ্গিতে বললাম, —আমি শুধু আপনি আমাদের চেয়েও আরো কতক্ষণ অপেক্ষা করছেন তাই জানতে চেয়েছি।

মেয়েটির মুখ তাতেও কিন্তু যেমন বিমূঢ় বিব্রত ছিল তেমনিই রইল। সেই সংগে একটু কেমন যেন অসহায় ও করুণ।

কি এমন অন্যায় অশোভন কথা বলে ফেলেছি কিছুই না বুঝতে পেরে, এবার নিজেই রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে সাহায্যের জন্যে পরাশরের দিকে ফিরে তার শরণ নিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মেয়েটির কথায় চমকে তার দিকে তাকালাম।

মেয়েটি বেশ একটু সংকোচের সংগে পরিষ্কার বাংলায় তখন বলছে, —অনুগ্রহ করে আমায় মাপ করবেন। আমি ওই ইংরেজিটা জানি না।

ইংরেজি জানেন না! —প্রথম বিস্ময়ে কথাটা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যাবার পরই নিজের মূর্খতায় লজ্জা পেলাম। বিদেশী ইওরোপীয় মেয়ে হলেই ইংরেজি অবশ্যই জানবে বলে ধরে নেওয়াটা যে কতখানি নির্বুদ্ধিতা তা তখন ভালো ভাবেই বুঝে মার্জনা চাইতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার সুযোগ মিলল না।

মেয়েটি তখন নিজেই কুণ্ঠিতভাবে কৈফিয়ৎ দিয়ে চলেছে, —দেখুন আমি আর্জেনটিনার মেয়ে। স্প্যানিশের সংগে ফ্রেঞ্চ জার্মান এমন কি ইতালিয়নও একটু আধটু বলতে পারলেও ইংরেজিটা আমায় শেখা হয়নি। আপনাদের বাংলা ভাষাটা অবশ্য আমি আমার প্রাচ্য পুরাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্যে সংস্কৃত পালির সংগে সামান্য একটু শিখেছি। আপনি ইংরেজিতে কি বললেন বুঝতে না পেরে ওরকম চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই তাতে আমায় অসভ্য ভেবেছেন। আমার সে অনিচ্ছাকৃত অভদ্রতার জন্যে মাপ চাইছি আবার।

অনিচ্ছাকৃত, আর অভদ্রতা এই দুটি শব্দে সামান্য একটু হোঁচট খেলেও মেয়েটির গড় গড় করে এতখানি বাংলা বলে যাওয়ায় তখন আমি অবাক আর অভিভূত।

যে পরাশর এতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নীরব শ্রোতা হয়েই ছিল সে এবার একটু গম্ভীর ভাবেই মন্তব্য করলে, —শুনুন, মাপ চাইলে আমার বন্ধুরই চাওয়া উচিত। পৃথিবীটা যে ইংরেজদের খাস তালুক নয় এ খবরটা এখনও ও জানে না।

মেয়েটির সংগে আমিও এ কথায় হাসলাম।

কিন্তু সেই সংগে পরাশরের ওপর একটু রাগও হল। এমন একটা সুযোগ পেয়েও নষ্ট করতে হয়। আমাকে খোঁচা দেবার ছুতোয় আমায় নামটা বলে দিলে ক্ষতি কি ছিল? শেষ কথাটায় আমার বন্ধু জানেনা-র মধ্যে কৃত্তিবাস নামটা অনায়াসে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত, আর তাহলে কথার পিঠে কথা এসে মেয়েটির নাম ধাম জানার একটা সুবিধে কি হত না?

এত কাণ্ডের পর নামটাই যে অজানা হয়ে রইল!

।। দুই ।।

শেষ পর্যন্ত তা কিন্তু রইল না।

সেই দিনই সকালে এক সংগে অত-গুলো সুযোগ হয়ে যাবে তা ভাবতে পারিনি।

আচার্যদেবের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য অবশ্য হয় নি। পঁতাল্লিশ মিনিটের পর আরো মিনিট পনেরো অপেক্ষা করবার পর জানা গেল, আচার্য-দেব একটা জরুরী মিটিং-এ কোথায় আটকে পড়েছেন। বাড়ি ফিরতে তাঁর দেরী হবে। বাড়িতে ফোন করে তাই দর্শনপ্রার্থী কাউকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বারণ করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বাড়ির একজন ওপরের সে ফোনের সংবাদ আমাদের জানিয়ে গেলেন।

খবরটা শুনে পরাশর আর মেয়েটি রীতিমত হতাশ। এক সংগেই বাইরে যেতে যেতে মেয়েটি তার সমস্যার কথা জানালে। আচার্যদেবের কাছে কয়েকটা জরুরী বিষয় জেনে না নিলে যে জন্যে সে ভারতবর্ষে এসেছে সে কাজই সে শেষ করতে পারবে না। অথচ আজ নিয়ে

বলেছিলেন নাকি তার সঙ্গে বসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আচার্যদেব শেষ পর্যন্ত এমনি ভাবেই অন্য কিছুতে আটকে পড়ে কথা রাখতে পারেন নি।

কথা বলতে বলতে আচার্যদেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা তখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। এর পর বিদায় নমস্কার জানিয়ে যে যার পথে যাবার পালা।

পরাশরের এখনো পর্যন্ত এই মুহূর্তটাকে কাজে লাগাবার কোনো লক্ষণ নেই দেখে নিজেকেই গায়ে পড়া হয়ে কথাটা তুলতে হল।

আপনি যাবেন কোন দিকে? —মেয়েটিকে বাংলাতেই জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি! —মেয়েটি যেন এ প্রশ্নে একটু—আমি—আমি উত্তর দিকেই যাব।

সেই সন্ধ্যা আর একটা যা প্রশ্ন করলে তা আমি তার মুখ থেকে আসতে পারে বলে ভাবিনি।

মেয়েটির জিজ্ঞাসা হল, —আচ্ছা এখান থেকে আপনাদের ওই কি বলে মিনি বাস পাওয়া যায় না?

পাওয়া যাবে না কেন! —মেয়েটির মিনিবাসে যেতে চাওয়ায় অবাক হলেও বিস্ময়টা গোপন করে বললাম, —কিন্তু এখন অফিসের সময়। উত্তরমুখো কোনো বাস ট্রামই ত খালি পাওয়া যাবে না। তা আপনি যাবেন কতদূর?

তা যাব একটু দূর। —মেয়েটি কুণ্ঠিত ভাবে—জানালে, —সেই দমদমের কাছে।

দমদমের কাছে শুনে সত্যিই একটু দমে গিয়ে যখন এই ভিড়ের সময়ে সেখানে পৌঁছোবার একটু সুলভ ও সুবিধাজনক বাস রুটের কথা ভাবছি, পরাশর ছুতক্ষণে বেপরোয়া হয়ে একটা চলতি ট্যাকসি ডেকে থামিয়ে ফেলেছে।

কাজটা বীরোচিতই হয়েছে সন্দেহ নেই, সিভ্যালরির পরিচয় দিতে এইটুকু না করে উপায় ছিল না। কিন্তু আমি তখন নিজের পকেটের অবস্থা জেনে দমদম পর্যন্ত ট্যাকসির মিটারের নির্দেশ অমান করে শঙ্কিত না হয়ে পারি নি।

যে মেয়ে দমদম যাবার জন্যে মিনিবাসের খোঁজ করে তাকে ট্যাকসি ডেকে দেওয়াটা সত্যিই উপকার করা কি না তাও ভাববার বিষয়।

ট্যাকসি দাঁড়াতে দেখে সেই জন্যেই মেয়েটিকে কেমন একটু ইতস্ততঃ করতে বোধ হয় দেখলাম।

পরাশর অবশ্য ততক্ষণে ট্যাকসির দরজা খুলে ধরে ডাকছে, —আসুন।

মেয়েটি একটু দ্বিধাভরে ধীরপদে ট্যাকসিতে গিয়ে উঠল ততক্ষণ আমি পরাশর এরপর কি করবে ভেবে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম। পরাশর কি মেয়েটিকে ট্যাকসিতে উঠিয়ে ছেড়ে দেবে?

না, তা পরাশর দিলে না। মেয়েটি ভেতরে গিয়ে ওঠবার পর আমার গুঁড়ি মারতে যেন অধৈর্য দেখিয়ে বললে, —কই! এসো কৃত্তিবাস?

আমি! —অকপট বিস্ময়ের সঙ্গে একটু ভীত ভাবেই পরাশরের দিকে চাইলাম, —আমায় ডাকছ কেন? আমার এখন অতদূরে দমদমে যাওয়ার একটু অসুবিধে আছে!

অসুবিধে আবার কি?—পরাশর এবার হাত ধরেই আমায় ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে পাশে এসে বসে ড্রাইভারকে দমদম যাবার নির্দেশ দিলে।

পরাশর এমনভাবে আমাকে নিয়ে ট্যাকসিতে ওঠায়, তাড়ার ভাবনাটা থেকে তখন মুক্তি পেয়েছি। মেয়েটির ফেরবার সমস্যা মেটাবার সঙ্গে তার ঠিকানাটাও জেনে আসার এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়াই তার পক্ষে আহাম্মকি হত।

কিন্তু যার জন্যে এত করা সে মেয়েটির প্রতিক্রিয়াটা কি সেইটেই ত বোঝা যাচ্ছে না।

—তিন—

গড়িয়াহাট রোড ধরে গাড়িটা তখন উত্তরের দিকে চলেছে। সেই দক্ষিণ কলকাতায় ট্যাকসিতে ওঠবার পর থেকে মেয়েটি কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে সমানে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে।

হরিদাস স্যানাল প্রযোজিত
মাধবী চক্রবর্তী নিবেদিত
আসন্ন মুক্তি পথে!
শরৎচন্দ্রের
রমের সুমতি
চিত্রনাট্য : বীরু মুখার্জী
পরিচালনা : গুরু বাগচী
সংগীত : কালীপদ সেন
শ্রেঃ মাধবী - নির্মল - বিকাশ - ভানু - সীতা - গীতা
মাঃ জমিদার - মাঃ দীপংকর ও মাঃ শান্তনু

রমেন ভট্টা * প্রভাস মল্লিক প্রযোজিত
পি. এম. প্রোডাকসন্সের
মুক্তি পথে
সুমিত্রা ছাড়া
পরিচালনা : গুরু বাগচী ॥ সংগীত : কালীপদ সেন
শ্রেঃ পার্থ - মহুয়া - দিলীপ - শিবাণী - সমর - সন্ধ্যা
নীলিমা - পদ্মা ও বিকাশ রায়
বিশ্ব-পরিবেশনায় : মেঘ পিকচার্স। কলিঃ ৭২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

যাঁরা চায়ের সমঝদার তাঁদের চাই

লিপটন গ্রীন লেবেল ঃ অনুপম এর সুবাস, কারণ— এর সবটাই দার্জিলিঙ্ চা।

দার্জিলিঙের চামু পাহাড়ের গায়ে গাঢ় সবুজ গালিচের মত বিছানো রয়েছে অনেকটি চা বাগান। দুনিয়ার কোথাও তাদের তুলি নেই। চায়ে অপূর্ব সুবাস ফুটিয়ে তুলতে হলে ঠিক যেমনটি জল, আলো আর হাওয়া দরকার, একমাত্র দার্জিলিঙের সুহেলি মেঘা পাহাড়েই তা মেলে। তাই দার্জিলিঙের চা সারা দুনিয়ায় অদ্বিতীয়। লিপটনের গ্রীন লেবেলে আপনি তা পাচ্ছেন। যাঁরা চায়ের সমঝদার, এক চুমুকেই যাঁরা ধরতে পারেন, তাঁদের কাছে এই চা মেরা দার্জিলিঙ্ চা। যে অপূর্ব সুবাস অন্য আর কোন চায়ে নেই, তাই পাবেন লিপটন গ্রীন লেবেলে।

লিপটন গ্রীন লেবেল চা—অতুলনীয় যার সুবাস

বপুটি আমার নেহাত শীর্ণ নয়। পেছনের সীটে তিনজনে পাশাপাশি বসার জন্যে একটু ঘেঁষাঘেঁষিই হয়েছে। মেয়েটির সুগঠিত দেহের কিছু কিছু অংশের স্পর্শ এড়াবার তাতে উপায় নেই।

দেহের সে স্পর্শ দিয়ে মনের কথা ত আর বোঝা যায় না। গেলে হয়ত তাতে খুশি হবার মত কিছু পেতাম না।

পরাশর তার পরিবহণ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু এ সমাধান তার ঠিক মনঃপূত না হওয়ারই কথা। মেয়েটি থাকে সেই দমদমে। সেখানে যাবার জন্যে নিজে থেকে সে মিনিবাসের খোঁজ করেছে। তার মানে তার আর্থিক সঙ্গতি তেমন যথেষ্ট নয় বলেই ত মনে হয়।

পরাশর নিজে থেকে ট্যাকসি ডেকে তাকে পৌঁছে দেবার জন্যে সঙ্গী হওয়ায় মেয়েটির সে দিক দিয়ে এখন অবশ্য বিব্রত হতে হবে না, কিন্তু কোথায় সে থাকে তা জানাবার উৎসাহ তার নেই এমনও ত হতে পারে।

দমদমে কোথায় থাকবার আস্তানা সে পেয়েছে তা অবশ্য জানি না, তবে তার পোষাক-আশাক দেখে জায়গাটা ডেকে দেখাবার মত নয় বলেই ত মনে হয়।

ঠিক হিপিদের পর্যায়ে মেয়েটি পড়ে না বটে, কিন্তু হিপিরা যেখানে সেখানে যদি থাকতে পারে, মেয়েটির পক্ষে নিতান্ত সাধারণ কোনো আশ্রয়ে থাকা ত তাহলে অসম্ভব নয়।

আপত্তি না করলেও তার সেই ঠিকানাটুকু বাধ্য হয়ে জানাতে হচ্ছে বলেই হয়ত মেয়েটির হঠাৎ এই মনমরা আনমনা ভাব!

তাতে লোকসান অবশ্য আমাদেরই। আমাদেরই মানে আসলে পরাশরেরই। এতক্ষণ একসঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়েও পরিচয়টা গভীর করা পরাশরের আর হয়ে উঠল না।

মেয়েটির থাকবার জায়গাটা সে দেখে আসবে বটে, কিন্তু গোড়াতেই এমনভাবে সুর কেটে যাবার পর আবার নতুন করে জমানো আর কিছু না হোক সহজ নিশ্চয় হবে না।

এ ব্যাপারে বন্ধু হিসেবে আমিই বা কি করতে পারি ভেবে পেলাম না।

গায়ে পড়ে আলাপ যে না করা যায় তা নয়। তাতে আমাকে বেশ খেলো হতে হলেও বন্ধুর খাতিরে তা আমি হতে প্রস্তুত। কিন্তু আলাপটা সুরু করব কি নিয়ে?

পরাশরের মত পুরাতত্ত্ব কি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে ছিটেফোঁটা জানাশোনা থাকলেও তাই দিয়ে আলাপটা সুরু করতে পারতাম। কিন্তু এসব বিষয়ে আমার যা বিদ্যে তাতে দন্তস্ফুট করলে শুধু হাসির খোরাকই যোগাবে।

আলাপ সুরু করার ও-পথ সুতরাং বন্ধ। মেয়েটি বলেছে সে আর্জেন্টিনার মেয়ে। ওই আর্জেন্টিনা দিয়েই কথাটা সুরু করব নাকি?

আর্জেন্টিনা সম্বন্ধেও বেশী কিছু যে জানি তা নয়, তবে তার রাজধানীর নামটা আর দু-একটা খবর জানা আছে। তাই নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ব বলে একটু নড়েচড়ে বসতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম।

প্রথমে নিজের কানটাকে বিশ্বাস করতেই একটু বাধল। তারপর বিস্ময়ের আর শেষ রইল না।

যা শুনছি তা মিথ্যে নয়। মেয়েটিই নিজে থেকে কথা বলছে আর ক্ষোভ কি বিরক্তি নয় বেশ একটু কৌতুক মেশানো গলায়।

কৃত্তিবাসবাবুকে বড় বেশী শাস্তি হচ্ছে বুঝতে পারছি!

মেয়েটি শুধু নিজে থেকে কথাই বলে নি, আমার নামটাও ঠিক মত উচ্চারণ করে টিপ্পনি করেছে।

নামটা সেই একবার পরাশর বলেছিল ট্যাকসিতে ওঠবার সময়। তাতেই এতক্ষণ মনে রাখাই ত যথেষ্ট। তার ওপর ওই কৌতুকের সুরটুকু।

এরপর আর আমায় পায় কে? অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে মিনিট দশেকের মধ্যে নামটাম সবই বার করে ফেললাম।

মেয়েটির নাম এলসা। আর্জেন্টিনায় বাড়ি। সেখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ নিয়ে ভারতবর্ষের গুপ্ত-যুগের কয়েকজন বৌদ্ধ আচার্য পণ্ডিতদের সম্বন্ধে গবেষণা করে থিসিস লিখতে এখানে এসেছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের কয়েকটি জায়গায় ঘুরে সেখানকার কাজ শেষ করেছে। এখন বাংলাদেশের কাজই তার বাকি। এখানকার কাজ শেষ করতে নানা কারণে দেরী হচ্ছে। তবু আশা করছে, হপ্তাহ দু-একের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফিরে যেতে পারবে।

এলসার পরিচয় যেটুকু পেলাম তা এমন কিছু নতুন কি আশ্চর্য নয়। আজ কালকার দিন বিদেশ থেকে যেসব ছেলে-মেয়ে ভারতবর্ষে পড়তে শুনতে কি বেড়িয়ে যেতে আসে তাদের অনেকের কাহিনীই এই ধরনের।

কিন্তু এরপর যা জানলাম তা সত্যিই চমকে একবারে বিমূঢ় করবার মত।

ট্যাকসি এরোড্রোমের রাস্তায় অনেক দূর তখন চলে এসেছে। ড্রাইভার টার্মিন্যালের দিকেই গাড়ি চালাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এলসা বারণ করে বললে,—না, ওদিকে নয়।

ওদিকে নয় তা আগেই জানতাম, কিন্তু সত্যিই যাবে কোথায়? এরোড্রোমের এলাকা ছাড়ালে অবশ্য কিছু কিছু বাগানবাড়ি গোছের কলকাতার সম্পন্ন মানুষের বিশ্রামকুঞ্জ গোছের আছে। তারই একটিতে আশ্রয় যোগাড় করেছে নাকি এলসা?

না, সে রকম কোথাও নয়।

নিজেই নির্দেশ দিয়ে এলসা যেখানে ট্যাকসি নিয়ে গিয়ে থামাল, তার সামনের দোকানটা দেখে আমার অবস্থা চক্ষু-স্থির।

।। চার ।।

এ ত যাকে বলে পাঁচতারা মার্কা আমীর ওমরাহদের থাকবার হোটেল!

এলসা এখানে থাকে?

নেহাৎ সাধারণ অবস্থাপন্ন কাপড়ের আশা-হিপি গর বেশবাস খানিক আগে এখানে আসবার জন্যে যে মিনিবাসের খোঁজ করছিল, সেই পুরাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে আসা মেয়ের আস্তানা হল এই হোটেল!

পরাশর ট্যাকসির মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়ে দিলে। সেবার সময় ভেবেছিলাম মেয়েটি আপত্তি করবে। তা সে করলে না। কিন্তু আমাদের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিতে দিল না। তাদের কৃতিবাসে কয়েক মিনিটের জন্যে একবার অন্তত পা দিয়ে একটু কফি খেয়ে যেতে নিমন্ত্রণ জানালে।

নিজের পোষাক-আশাকের কথা ভেবে এই বাদশাহী হোটেলে সে নিমন্ত্রণ রাখবার খুব ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু পরাশরের দেখলাম একেবারে 'ভাত খাবি? না আঁচাব কোথা' গোছের অবস্থা।

বলতে না বলতে রাজী হয়ে সে প্রায় আমাদের সকলের আগে সেভাবে হোটেলে গিয়ে ঢুকল সেটা তখন আমার একটু খারাপই লেগেছিল।

কিন্তু পরে মনে হয়েছে যে তখন অমন করে না গেলে সেনর বারোহার সঙ্গে আলাপই হত না। আর সেটা এক দিক দিয়ে লোকসানই হত।

কারণ সেনর বারোহা এমন একজন মানুষ আজকের দুনিয়ায় যাদের একটা নতুন যুগের প্রতিনিধি বলা যায়। এ কাহিনী লিখতে লিখতে তাঁর পরিচয়টা ধীরে ধীরে সবই প্রকাশ পাবে। আপাততঃ এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে তিনি

দার্জিলিঙে
সর্বাধুনিক আকর্ষণ

ইউথ হোস্টেল

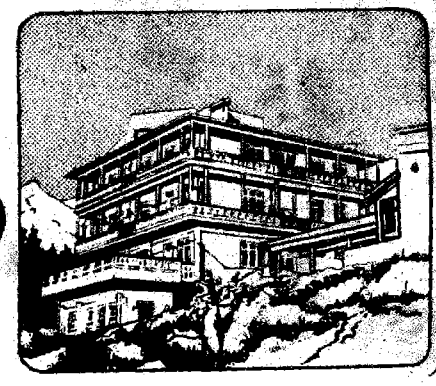

তরুণ বন্ধুদের আর ভাবনা নেই। চলুন দার্জিলিঙ। ছুটির কটা দিন আনন্দ ও হৈ-হুল্লোড়ে স্বপ্নের মতই কেটে যাবে। আর এইজন্যে রয়েছে ইউথ হোস্টেল। ম্যালের খুব কাছে চমৎকার পরিবেশে। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সমেত হিমালয়ের অনেক তুষারমৌলী শৃঙ্গ আপনার নজরে আসবে, দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন না। অথবা পায়ে হেঁটে চলুন সন্দাকফু এবং ফালুট কিংবা যেখানে খুশি।

ইউথ হোস্টেলে কয়েকজনে মিলেমিশে থাকার ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। ঘরগুলি রুচিসম্মত ভাবেই সাজানো-গোছানো। আর ভাড়াও নামমাত্র। মরশুমে (এপ্রিল-জুন ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) মাথা পিছু ৫ টাকা মাত্র এবং অন্যসময়ে মাথা পিছু ৪ টাকা। একা বা দল বেঁধে আসুন—যেমন খুশি। কটা দিন আনন্দে আর আরামে কাটিয়ে যখন ফিরবেন, দেখবেন এ কটা দিনের স্মৃতি আর মন থেকে মুছতে চাইছে না।

ওয়ার্ডেন,
ইউথ হোস্টেল, দার্জিলিঙ

রিজার্ভেশনের জন্য যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ-বাগ (ইস্ট)
কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন : ২৩-৮২৭১
গ্রাম : TRAVELTIPS
পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার
শিলিগুড়ি, ফোন : ২১১১৮

YCTB/83/76

দেখাতেই দেশ বা বিদেশের কোন মানুষ আমার এমন কৌতূহল জাগায়নি।

সেদিন বারোহার সঙ্গে হোটেলে ঢোকবার দেউড়িতেই প্রায় দেখা। তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। আমাদের ঠিক নয়, এলসাকে দেখেই এক মুখ হেসে বিদেশী যে ভাষায় তাকে সম্ভাষণ করলেন সেটা স্প্যানিশ বলেই মনে হল।

এলসা হেসে দাঁড়িয়ে তখনই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে। পরিচয় কি যে দিলে তা অবশ্য বুঝলাম না। হয়ত, পরাশরের পরিচয় দিলে বাংগালী একজন বড় পণ্ডিত গবেষক বলে আর আমাকে পরাশরের বন্ধু ও কলকাতায় একজন গণ্যমান্য কেউ হবার গৌরব দিলে।

পরিচয় যাই দিক, বারোহার দিক দিয়ে হৃদ্যতার তাতে অভাব হল না। বাইরে যাওয়া তার মাথায় উঠল, আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে কফিবারেই সঙ্গী হল আমাদের।

বারোহা অবশ্য ইংরেজী ভালো রকমই জানে। সত্যি কথা বলতে গেলে, নামটা না বলে প্রথমেই আলাপ করলে তার ইংরাজি শুনে সে যে ইংরেজ বা মার্কিনী নয়, তা বুঝতেই পারতাম না।

মানুষটা অবশ্য অনেক দিক দিয়েই লক্ষ্য করবার মত। এলসা হোটেলের দরজায় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই আমাদের ঢোকবার মুখে আর সকলের মধ্যে তার চেহারাটা চোখে পড়েছিল।

না পড়াটাই আশ্চর্য। ইস্পাত-তীক্ষ্ণ চাবুকের মত চেহারা যাকে বলে বারোহার ঠিক তাই। নামটা জানবার পর সে চেহারায় একটা হদিসও পেয়েছি। বারোহা স্পেনের মানুষ। সে দেশের বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে প্রাণ তুচ্ছ করে শুধু একটা লাল কাপড় আর নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে পা চালানোর কৌশল আর ক্ষিপ্রতায় যারা লড়ে বারোহা-র শিরায় সেই টেরিয়াডর-দের রক্তই নিশ্চয় বইছে। তাই সাদাশিখে প্যান্ট সার্টেও তার চলা-ফেরায় যেন চিতার মত সঠাম প্রাণীর সংহত বলিষ্ঠতা ফুটে বার হচ্ছে।

পোষাক আশাক বা চেহারায় তেমন জৌলুস না থাক, ইংরাজি না জেনেই এলসা এখানে বেশ জনপ্রিয় দেখলাম।

কফিবারে কফি খাবার সময় অনেকেই তাকে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। মঁসিয়ে রেনোয়া নামে একজন ফরাসী প্রৌঢ় তার ভাগনীকে নিয়ে খানিকক্ষণ ত আমাদের টেবিলে বসে এক পাত্র করে কফিই খেয়ে গেলেন।

এঁদের সকলের সঙ্গেই এলসা তাঁদের ভাষাতেই আলাপ চালালে। বারোহার সঙ্গে যেমন স্প্যানিসে, রেনোয়া আর তার ভাগনীর সঙ্গে তেমনি ফরাসীতে। শুধু ইংরাজিটা সে কেন যে শেখেনি সেইটা আশ্চর্য।

কফি খাওয়া পর্ব শেষ করে হোটেল থেকে কলকাতা ফেরবার সময় বারোহাও সেই কথা বলে দুঃখ করলে।

হোটেল থেকে আমরা তার গাড়িতেই কলকাতায় ফিরছিলাম। কফি খাওয়ার পর এলসার কাছে বিদায় নেবার সময় সে নিজে থেকেই আমাদের কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কথা বলেছে।

এটা তার অতিরিক্ত কিছু সৌজন্য নয়। এলসা আর আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার আগে সে কলকাতায় যাবার জন্যেই বেরিয়ে আসছিল। এলসাকে দেখে ও আমাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় যাওয়াটা কিছুক্ষণ স্থগিত থেকেছে মাত্র।

বারোহার গাড়িটা রীতিমত খানদানি ও বিরাট। কোন আপত্তি না শুনে সে তার সঙ্গে সামনের সীটেই আমাদের বসিয়ে নিয়েছে। গাড়িটা যা চাউস তাতে জায়গায় অকুলান কিছু হয় নি।

হোটেল থেকে কলকাতার দিকে আসতে আসতে বারোহার মোটামুটি পরিচয় পেয়েছি। বারোহা নিজেই তা দিয়েছে। সে মূল স্পেনের লোক তবে স্পেনে নয় দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে থেকেই তার ব্যবসা চালায়। ব্যবসা তার জৈব সার গুয়ানো নিয়ে। পেরু ও চিলির পশ্চিম প্রান্তের কয়েকটা দ্বীপে হাজার হাজার বছর ধরে সামুদ্রিক পাখিদের দৌলতে সে জৈব সার রাশি রাশি জমা হয়ে আছে।

এক কালে সে সারের চাহিদা আর কদর যা ছিল, ফার্টিলাইজারে কৃত্রিম নাইট্রোজেন সার তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর থেকে তা অনেকটা কমলেও গুয়ানোর ব্যবসায় এখনো লোকসান নেই।

বারোহার কাছে অবশ্য তার ব্যবসাই ধ্যান জ্ঞান নয়।

বছরে নমাস সে মনপ্রাণ দিয়ে ব্যবসা করে। তারপর তিনমাস ছুটি নিয়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। এই ঘুরে বেড়ানোই তার নেশা।

বারোহা মানুষটা সত্যিই বুঝলাম নিতান্ত সরল। নইলে মাত্র খানিকক্ষণের আলাপে আমাদের কাছে এত কথা বলে ফেলবে কেন?

তার কথার খেই ধরেই একবার জিজ্ঞাসা করলাম,—সে আগে কখনো ভারতবর্ষে এসেছে কি না।

না আসি নি—হেসে বললে বারোহা—না এসে খুব ভুল করেছি।

তার মানে ভারতবর্ষ আপনার ভালো লাগছে?

ভালো লাগছে মানে!—বারোহা যেন অবাক হল,—এদেশ ভালো না লেগে পারে! আমার ত মনে হয় আমি আগের জন্মে এদেশেই কোথাও জন্মেছিলাম।

আগের জন্মে এদেশে জন্মেছিলেন—আমি হেসে উঠলাম—তার মানে জন্মান্তরে আপনি বিশ্বাস করেন।

আগে করতাম না। এদেশে আসবার পর করি—একটু থেমে বারোহা সামনের দুটো গাড়িকে নিপুণভাবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার বললে,—আপনার দেশ যত দেখছি তত যেন একটা অজানা আকর্ষণ আমায় টানছে মনে হচ্ছে।

কিন্তু এবার আমি একটু উল্টো না গেয়ে পারলাম না,—এরকম হোটেলে থেকে, এরকম মোটরে চড়ে যা দেখছেন তা ঠিক আসল ভারতবর্ষ নয়।

হ্যাঁ,—বারোহা একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—এলসাও তাই বলে। বলে, আসল ভারতবর্ষকে জানতে হলে ক্যাডিল্যাক চড়ে বড় বড় সদর রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে কিছু জানা যায় না। কিন্তু আমার উপায় কি বলুন। আমার ছুটির আর এক মাস আর বাকি! এক মাসের মধ্যে এবারের মত ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে যতটা পারি আমায় দেখে যেতে হবে। এ গাড়িটা তাই আমি আসার আগে থাকতে জাহাজে এখানে আনিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। এলসা এ গাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু তার ঠাট্টা শুনলে আমার আর ভারতবর্ষ বেড়ানোই হয় না। আমি ত' তার মত এ দেশ নিয়ে পড়াশুনা আর গবেষণা করতে আসি নি। শিকড় গজিয়ে কোথাও বসে থেকে আমি করব কি?

একটু হেসে বললাম—কিন্তু মিস এলসাও ত এখানে থাকছেন না। কদিন বাদেই ওঁকে আর্জেন্টিনায় ফিরে যেতে হবে বললেন।

তাই বলেছে নাকি আপনাদের!—বারোহা যেন একটু অবাক হয়েই বললে—আমিও জানতাম এখান থেকে ওর এখন যাবারই ইচ্ছে নেই। একটু থেমে একটু যেন দুঃখের সঙ্গে বললে,—আর্জেন্টিনায় কোন ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপের টাকায় এখানে গবেষণার কাজ করতে এসেছে। সেই স্কলারশিপের মেয়াদ হয়ত শেষ হয়ে গেছে। তাই নিরুপায় হয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ—বারোহার গলায় এবার হালকা কৌতুকের সুরের তলায় একটু স্নেহ কোতুকের আভাস পেয়েছি—আমি কত করে আমার সঙ্গী হয়ে দেশটা আমায় যথাসম্ভব চেনাতে বলি। বলি যে, তাহলে আমরা দুজনে দুজনের পরিপূরক হই। এলসা ইংরেজী জানে না, আর আমি জানি না এদেশের কোন ভাষা। দুজনে এক সঙ্গে থাকলে এদেশের ওপর-মহল নিচের-মহল কোথাও আমাদের ঠেকতে হবে না। তা আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়।

বারোহা-র সরল উচ্ছ্বাসের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল করে ভেতরে ভেতরে বেশ একটু চঞ্চল না হয়ে পারলাম না।

আচার্যদেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাকসি নেবার পর থেকে এ পর্যন্ত পয়সার কোনো কথা একরকম বলে নি বললেই হয়। সে মাঝে মাঝে তার কবিতার ভাবনায় কি কোনো সমস্যার জট খোলার জন্যে আনমনা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু এতক্ষণ ধরে এরকম নীরবতা ত তার পক্ষে স্বাভাবিক নয় মোটেই।

এলসা সম্বন্ধে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে বেশী রকম দুর্বল হয়ে পড়ার জন্যেই কি তার এমন ভাবান্তর? কন্দর্প আর কার্তিকে মেশানো চেহারার এই বারোহাকে এলসার অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে জেনে মনের ভেতর একটা ঘা খেয়ে সে এমন গুম হয়ে গেছে!

আর কিছু না হোক তার উদাসীন ভাবটা একটু ভাঙবার চেষ্টায় বারোহা-র কথার জের টেনে বললাম,—মিস এলসার ইংরেজী না জানায় একটু অসুবিধে হয় নিশ্চয়ই।

না। অসুবিধা আর কি?—বারোহা এলসার হয়ে বললে,—আপনাদের এখানে ইংরেজির এখনো খুব চল, কিন্তু সারা দুনিয়ায় আমাদের স্প্যানিশ-এর প্রসার বড় কম নয়। গোটা দক্ষিণ আমেরিকাই স্প্যানিশের রাজত্ব বলতে পারেন। আর স্প্যানিশের সঙ্গে ফরাসী জানলে ত সভ্য সমাজে কোথাও ঠেকবার কথা নয়।

নিজের ভাষার গৌরব নিয়ে বারোহা-র অহংকারে একটু আমোদই পেয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা, মিস এলসা আপনার কাছে আমাদের কি পরিচয় দিয়েছেন বলুন ত।

কেন?—বারোহা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—ভুল কিছু দিয়েছে!

কি দিয়েছে না জানলে ভুল কি না বলব কি করে?—হেসে বললাম,—স্প্যানিশে মিস এলসা কি বলেছেন তাত বুঝতে পারি নি।

হ্যাঁ, তা ত বটে! বলে বারোহা একটু গম্ভীর হবার ভাব করে বললে, আপনাদের পরিচয় যা দিয়েছে তা কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়।

তাই নাকি? আমিও গম্ভীর হলাম,—কি বলেছেন কি?

এলসা বলেছে,—বারোহা আর হাসি চাপতে পারলে না,—আপনারা দুজনে পুলিশের লোক, এলসার পেছনে লেগেছেন কিছু একটা ব্যাপারের সন্ধানে।

কথাটা বলে বারোহা তখন হাসছে। এতক্ষণে পরাশরকে একবার যেন সজাগ হয়ে মুখ ফেরাতে দেখে আমি একটু ভরসা পেলাম। তাই বারোহার হাসিতে যেন ক্ষুণ্ণ হবার ভান করে বললাম,—আশ্চর্য! একথা মিস এলসা জানলেন কি করে?

না, না!—হাসতে হাসতেই বারোহা আমায় আশ্বস্ত করে বললে,—এলসা তা বলেনি। ও বলেছে, আপনারা দুজনে কোনোখানে বোধহয় অধ্যাপনা করেন। আপনি বোধহয় ইতিহাস ভূগোল গোছের কিছুর আর আপনার বন্ধু পুরাতত্ত্বের। ঠিক ও নাকি জানে না। আজই নাকি আপনাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছে।

একটু থেমে বারোহা আবার জিজ্ঞাসা করলে—ভুল কিছু বলেছে এলসা?

না, না ভুল কিছু বলে নি। আমি হেসে জানালাম।

আপনারা নিজে থেকে ওকে ট্যাকসি ডেকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছেন বলে ও যে কৃতজ্ঞ সে কথাও এলসা তখন জানিয়েছে। সুতরাং আমি একটু ঠাট্টা করলাম বলে ওকে ভুল বুঝবেন না।

না, ভুল বুঝব কেন?—ব্যস্ত হয়েই বারোহা-কে আশ্বস্ত করলাম।

গাড়িটা তখন বেলেঘাটা হয়ে পার্ক-সার্কাসে এসে পৌঁছেছে। পরাশর এতক্ষণে তার নীরবতা ভঙ্গ করে গাড়িটা থামাতে অনুরোধ করলে। বারোহা গাড়ি থামাবার পর বিদায় নিয়ে নেমে যেতে যেতে খুশি মনেই বললাম,—আপনার নামটা শুনে প্রথমই আমার কার কথা মনে হয়েছিল জানেন?

কার কথা?—একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে বারোহা।

মনে হয়েছিল আপনাদের বিখ্যাত সেই লেখক পিও বারোহা-র কথা। আপনার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ টম্বন্ধ আছে নাকি! পদবীটা এক কি না, তাই ভাবছিলাম।

পদবী এক!—একটু থেমে থাকার পর সজোরে হেসে উঠে বারোহা যেন আমাকেই লজ্জা দিলে। পদবী এক হলেই সম্বন্ধ থাকবে কেন! না, না ও নামের কোনো লেখকের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই।

বারোহা গাড়ি নিয়ে চলে যাবার পর পরাশরের দিকে ফিরলাম। সে তখনো

The world had nothing before it got zero

India introduced the concept. The Sanskrit name for the figure was Śūnya meaning void. India was the first to use it in the modern form. The earliest inscription dates back to 800 A.D. But there is evidence in Indian scriptures that the zero was used centuries before.

In this and other spheres Indian talents have enriched the world. We at L&T try to continue the tradition by enriching life through industrial development. We design, manufacture and instal plant and equipment for every vital industry—steel, cement, fertilizer, paper and pulp, nuclear. Leading companies like Toyo Engineering, Snam Progetti, Humphreys and Glasgow, Davy Powergas have called on us for complete engineering, manufacturing and construction services in and outside India.

Who are we? A major industrial complex strategically located to serve the developing world. The success of our service lies in the individual talents of over 10,000 people in our network of offices all over India.

LARSEN & TOUBRO LIMITED

P. O. Box 278, Bombay 400 038

যেন কেমন অনামনস্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, হঠাৎ এখানে গাড়ি থামাতে বললে কেন? বরোহা ত শহরের মাঝখানেই যাচ্ছে। সেখানে কোথাও ত নেমে যেতে পারতাম।

তা পারতাম। তবে এখানে একটু কাজ আছে।

এখানে কি কাজ—একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

উত্তর যা শুনলাম তাতে নিজের শ্রবণ শক্তিতেই প্রথম সন্দেহ জাগল। এখানে এক জায়গায় একটু হাত দেখাব। —বললে পরাশর।

— পাঁচ —

পরাশর হাত দেখাবার জন্যে এখানে নেমেছে! কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারি নি। হাত দেখাবে পরাশর! সব আজগুবী দুর্বলতা ত কোনদিন তার ছিল না। সে কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

কিন্তু সত্যিই সে যখন মিনিট দশেক হাঁটিয়ে একটা গলি গোছের রাস্তার একটি দোতলা বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল, তখন তার নতুন দুর্বলতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না।

বাড়িটার পরিচয় ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত তার সর্বাঙ্গে লাগানো নানা বিচিত্র সাইনবোর্ডেই ঘোষিত। দুধারের দেয়ালে ষটচক্র সুষুম্না কান্ড ইত্যাদি কি সমস্ত দেহরহস্যের ছবি আঁকা বোর্ড ঝোলানো। দরজার মাথায় প্রকান্ড সোনালী হরফে লেখা বোর্ড। তাতে উঁচু-করা জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা—নিখিল বরেণ্য যোগসিদ্ধ জ্যোতিষচক্রবর্তী শঙ্কর মহারাজ। বাংলার চেয়ে আরো বড় ও উঁচু হরফ ইংরেজি। তাতে অবশ্য আর একটু সংক্ষেপে প্রথম লাইনে লেখা 'শঙ্কর মহারাজ, অ্যাস্ট্রলজার সুপ্রিম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' আর তার নিচের লাইনে লেখা 'রীডস্ ইওর লাইফ লাইক এ বুক।'

শঙ্কর মহারাজের পসার কি রকম ও কাদের মধ্যে তা ওই গলির ভেতরই দাঁড় করানো দুটি দামী মোটরেই বোঝা যায়।

মক্কেলদের একজন আমরা ওপরে যাবার মুখেই নেমে এসে গাড়িতে উঠলেন।

দুজনেই বয়স্যসী বিদেশী মেম-সাহেব। তাঁদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুনে এটুকু বোঝা গেল যে তাঁরা জ্যোতিষ চক্রবর্তীর কাছে নতুন আসছেন না।

নাতি প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাবার পর আরেক যে মক্কেলকে অত্যন্ত কৃতার্থভাবে বিদায় নিতে দেখলাম তিনিও শ্বেতাঙ্গ।

এতে এইটুকু অন্ততঃ বোঝা গেল যে শঙ্কর মহারাজের খ্যাতিটা দেশের চেয়ে বিদেশেই বেশী না হোক কম নয়।

জ্যোতিষ চক্রবর্তীর প্রশস্তী বেশ একটু বেশী বলে ওপরে সাধারণ প্রার্থীর ভিড় একেবারে নেই। আমাদের আগের শ্বেতাঙ্গ মক্কেল চলে যাবার পর আমরাই শুধু সেখানে রইলাম।

শঙ্কর মহারাজের কাছে পরাশর একেবারে অচেনা নয় দেখলাম। কাছে গিয়ে বসতেই একটু যেন সকৌতুক ভৎর্সনার সুরে মহারাজ বললেন আবার কি হল?

আজ্ঞে হাতটা এবার একটু দেখুন। —বলে পরাশর তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

হাত দেখতে হবে না। —জ্যোতিষ চক্রবর্তী হাত ঠেলে দিয়ে বললেন —আমি তোমার মুখেই সব দেখতে পাচ্ছি। অপেক্ষা করো এক মিনিট।

জ্যোতিষ চক্রবর্তী যতক্ষণ পরাশরের মুখ দেখলেন তার মধ্যে আমিও তাঁকে তখন দেখে নিলাম।

ভক্তি না হোক সম্ভ্রম জাগাবার মত চেহারা বটে। দামী গালিচের ওপর পাতা জাজিমের আসনে দুধারে মখমলের তাকিয়া নিয়ে যেন ছোটখাট পাহাড়ের মত বসে আছেন। লোমশ বুকের ভাঁজ ভুঁড়ির ভাঁজ সবই দেখবার মত। এই দেহের অনুপাতে বিরল কেশ মুন্ডটাও বিরাট। মুখটি পরিপাটি করে কামানো ও কপাল থেকে গাল গলা ও বুক পর্যন্ত বিচিত্র সব তিলক চিহ্ন আঁকা।

বিদেশীদের কাছে এই চেহারায় একটা উদ্ভট আকর্ষণ থাকতে পারে কিন্তু পরাশরের এখানে ভাগ্য গণনার জন্যে আসা যে কল্পনাতীত। এরকম আজগুবী খেয়াল কেমন করে তার হতে পারে। জ্যোতিষ চক্রবর্তীর পরের কথায় তার কিছুটা হদিশ অবশ্য পেলাম।

মুখে ইষৎ কৌতুকের কুঞ্চন নিয়ে শঙ্কর মহারাজ বললেন—হুঁ অবস্থা বেশ সঙ্গীন দেখছি। রোগটা একেবারে সাংঘাতিক ভাবে চেপে ধরেছে। আশা ভরসা কিছু দিতে পারছি না। মঙ্গল আর কেতুর সংযোগ পেয়ে বিপক্ষকে একেবারে অপরাজেয়। তবে...না না' দাঁড়াও দাঁড়াও! বুধ আর শুক্রকে যদি বক্রী করা যায়। এমনিতেই দেখছি অবস্থানে শনির দৃষ্টি পড়েছে। স্থান-ত্যাগের ব্যাকুলতা দেখা যাচ্ছে তাই। সিদ্ধিলাভ ত্বরান্বিত করবার তাই চেষ্টা। শনির অপ্রসন্নতার সঙ্গে বুধ আর শুক্রকে যদি বক্রী করা যায় তাহলে—তাহলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হতেও পারে।

পরাশরের মুখটা গোড়া থেকেই লক্ষ করছিলাম। শঙ্কর মহারাজ তাঁর গণনার সিদ্ধান্ত জানাতে শুরু করার পর থেকে বেশ একটু ম্লান থাকবার পর এতক্ষণে তা একটু যেন উজ্জ্বল হতে দেখলাম।

স্থান ত্যাগের ব্যাপারটা যথার্থই ভাবছে বলছেন? — বলে পরাশর এবার উৎসুকভাবে জ্যোতিষ চক্রবর্তীর দিকে চাইল।

আমার গণনা ত তাই বলে—হেসে বললেন শঙ্কর মহারাজ—বুধ আর শুক্রকে বক্রী করবার ব্যবস্থা যদি চাও ত করা যেতে পারে।

আজ্ঞে অনুগ্রহ করে তাই করবেন। বলে ব্যাগ খুলে করকরে একটা একশ টাকার নোট বার করে জ্যোতিষ মহারাজের পায়ের কাছে নামিয়ে দিলে পরাশর।

তারপর ভক্তি ভরে প্রণাম করে আমার সঙ্গে নিচে নেমে আসবার সময় তার মুখের ভাব দেখে মনে হল এতক্ষণে সে যেন একটু বল ভরসা পেয়েছে।

ভেতরটা তখন আমার তেতো হয়ে গেছে।

তবু রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাকসি নেবার পর থেকে তার বাড়িতে পরাশরকে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত জোর করে নিজেকে চেপে রেখে-ছিলাম।

তার বাড়িতে পৌঁছে ট্যাকসি ছেড়ে দিয়ে তার বাইরের ঘরে গিয়ে পা দেবার পর আর নিজেকে রুখতে পারলাম না।

তোমার এই অধঃপতন এখন হয়েছে— গলাটা যতদূর সম্ভব রুক্ষ রেখেই বললাম—প্রেমে কি আর কেউ কখনো পড়ে না।

পরাশর তখনও তার সোফায় গিয়ে বসেনি। আমার কথায় আর গলার স্বরে বেশ একটু নাড়া খেলেও সব বুঝেও যেন না বোঝার ভান করে যেন অসহায়ভাবে আমার দিকে চাইল।

সে চেহারা দেখে মায়া-দয়া কিন্তু আমার হল না।

আগের মতই ঝাঁঝের সঙ্গে বলে গেলাম—তোমার এমন মতিভ্রম ধরেছে যে জ্যোতিষীদের কাছে ভালবাসায় জেতবার মন্তর নিতে গেছ!

আমি ... আমি—পরাশর একটু যেন থতমত খেয়ে দুর্বল প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলে বললে—আমি প্রেমে পড়েছি!

দিনের আলোর মত যা স্পষ্ট তা এখনো অস্বীকার করছ।—এবার একটু সহানুভূতির সঙ্গেই বললাম—তোমার চেহারা চাল-চলন কথাবার্তা সব যে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিচ্ছে।

একটু থেমে তার প্রেমে পড়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলো তার সামনে ধরে দিলাম—তোমার আজকের সারা সকালের কাণ্ড-কারখানা দেখলেই তোমার অবস্থা বুঝতে যে কারুর বাকি থাকে না। আচার্যদেবের বাড়িতে যাওয়ার পর থেকে সকাল তুমি প্রায় একেবারে যে মানুষের মুখে সারাক্ষণ খই ফোটে সে হঠাৎ কিসে মন বোবা হয়ে যেতে পারে! প্রায় শুধু হঠাৎ ভালোবাসায় পড়লে। ভালবাসায় খোঁড়া যেমন পাহাড় ডিঙোয় ভীরু কাপুরুষ সাহসী বীর হয়ে ওঠে, তেমনি বাচাল বোবা হয়ে যায়, বুদ্ধিমান হয়ে যায় বোকা, যেমন তুমি হয়েছ। তা না তুমি ভালবাসায় কি হবে জ্যোতিষীর কাছে যাও। তাও ওই রকম ভণ্ড বুজরুক নতুন নেশা ধরা সাহেব- মাথায় হাত বুলিয়ে যে ব্যবসা ফাঁপাচ্ছে। তার ওই বুরুকীতে বিশ্বাস করে তার সাহায্য নিতে তুমি আবার অতগুলো টাকা সঁপে দিয়ে এলে আহাম্মকের মত।

এতক্ষণ এত যে কথা শোনালাম পরাশর তাতেও একেবারে চুপ। বুঝলাম মনে মনে সে নিজের অন্যায়টা বুঝে রীতিমত লজ্জা পেয়েছে।

এবারে তাই সহানুভূতির সঙ্গে ভালো কথাটাই তাকে জানালাম। বললাম,—শোনো, তোমার ওই জ্যোতিষী বলুক তার চেয়ে খাঁটি কথা তোমায় শোনাচ্ছি। তোমার হঠাৎ প্রেমে পড়ে যাওয়াটা ...তবে বয়স বাড়ার রাগটা এমনি ...জানি। ...না ...যে

...ভাবে ...ধরে ...দিচ্ছি

...সময় ...ঢেপ ...দোষ ...দিচ্ছি এই

...ভাবেই ...তাই ...তোমায়

...একটা ...ভরসা ...হোক ...টান

...কন্দর্পকান্তি ...ওপর একটুও

...বারোহার ...এবার ...নেই!

তুমি তাই বলছ! —পরাশর অবিশ্বাসের সঙ্গে বললে—তুমি কি করে!

বোকা ত জলের মত তোমার ...ভালোবাসা ...বোঝা যায়। কললাম ...হাত-পা ...হঠাৎ ...ন অবশ ...বারোহার ...ঢেলা

জগতে তাতে লোকনিন্দার ভয়ও নেই। সুতরাং তোমার এই অসময়ের বেয়াড়া রোগ যদি কাটিয়ে না উঠতে পারো তাহলে বলব বারোহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভয় করবার তোমার কিছু নেই।

এই তোমার মত? — পরাশর মনের খুশিটা মুখে আর লুকোতে না পেরে উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করলে।

হ্যাঁ এই আমার মত! তোমার জ্যোতিষীর কথায় তুমি গুলি মারতে পারো! বলে পরাশরের কাছ থেকে বন্ধুকৃত্য করবার বেশ একটা তৃপ্তি আর গর্ব নিয়েই সেদিন নিজের বাসায় ফিরলাম।

বেলা তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। আমার পত্রিকার কয়েকটা দরকারী কাজের কাগজপত্র টেবিলের ওপর পড়ে আছে দেখলাম। কিন্তু সেগুলো এখন সারতে হলে স্নান খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠবে। সেগুলো তাই বিকেলের জন্যে স্থগিত রেখে স্নান করবার জন্যে গায়ের জামাটা খুলতে গিয়ে পরাশরের সকালবেলা পকেটে গুঁজে দেওয়া কাগজটা হাতে ঠেকল।

সেটা পকেট থেকে বার করে এনে প্রথমে তা আমাকে দেবার মানেটাই বুঝতে পারলাম না।

খামে ভরা চিঠি-টিঠি নয়। কোন একটা ছাপানো পত্রিকা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ভাঁজ করে মোড়া একটা পাতার টুকরোই মনে হল প্রথমে। তারপর ছেঁড়া কাগজটার এক পিঠে ছাপা হরফের ওপরেই বড় বড় করে ধ্যাবড়া কলমে লেখা কটা কথা দেখতে পেলাম। অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে অন্য কাগজ না পেয়েই পরাশর বোধহয় ছাপানো পত্রিকার পাতার এই ছেঁড়া ফালিটা তার কাজে লাগিয়েছে।

কিন্তু ও কাগজে আমার বাড়ি ফিরে পড়বার জন্যে যা লিখেছে তাতেই ত মেজাজটা ঠিক রাখা শক্ত হল।

পরাশর লিখেছে,—এলসা মেয়েটি ঠগ। ভালো করে লক্ষ্য করে থাকলে প্রমাণগুলো মনে করে রেখে আমায় জানিও।

এ লেখাটুকু পড়বার পর মেজাজ একেবারে খিঁচড়ে যায় কি না?

আমি যে আহাম্মকের মত এতক্ষণ তার প্রেমে পড়াটা নিশ্চিত বলে ধরে নিয়ে তাকে ভর্ৎসনা আর উপদেশ দিতে বক-বক করে মরেছি, বিন্দুমাত্র তার প্রতিবাদ না করে পরাশর তাহলে সেগুলো মজা করে উপভোগ করেছে!

এর শোধ তাকে যেমন করে হোক দেবই প্রতিজ্ঞা করে ভালো করে পড়বার জন্যে ছেঁড়া কাগজটা আর একবার তুলে ধরলাম। কিন্তু পরাশরের লেখা কথাগুলোর আগে আরেকটা জিনিষ যা সেখানে চোখে পড়ল তাতে কেমন একটা ধোঁকা লাগল মনে।

কাগজের ফালিটা যেভাবে তাড়াহুড়ো ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, তাতে একদিকে একটা ছবির খানিকটা অংশ কাটা অবস্থায় থেকে গেছে।

ছবিটা একটি বিদেশী মেয়ের। ছবিটা শুধু নয় তার নিচের লেখা নামের অংশটুকুও মাথার মধ্যে কোথায় যেন অস্পষ্ট টনক নাড়ালো। নামটায় যতটুকু ওখানে পাওয়া গেছে তা হল,—বারবারা চেরিল.....

কোথায় দেখেছি এ ছবিটা? কোথায় পেয়েছি এ নাম?

কোন পত্রিকা থেকে পাতাটা ছেঁড়া হয়েছে তাও যদি বুঝতে পারা যেত!

সে পত্রিকা বা অন্য যেখানেই হোক ও ছবি আর নাম আমার যে চোখে পড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। শুধু তাই নয় ছবিটা আর ওই নামের সঙ্গে একটা কি খুব অসাধারণ ব্যাপারও জড়িত হয়ে আছে।

সেটা কি মনে করবার চেষ্টায় পরাশরের ওপর অভিমানটাও খানিক বাদে যেন চাপা পড়ে গেল।

পরাশরকে কি তার বাসায় ফোন করে পত্রিকা থেকে ছবির অংশটা ছিঁড়েছে জিজ্ঞাসা করব?

না, সেটা এখন আর সম্ভব নয়। সে কথা জিজ্ঞাসা করতে গেলে পরাশরের ওই লেখাটুকুর শোধ আর নেওয়া হবে না।

না, আমি নিজে নিজেই ও ছবিটা কি সূত্রে কোথায় দেখেছি তা ভেবে বার করব। যে পর্যন্ত তা না পারি নিজে থেকে পরাশরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখব না।

বার করতে ঠিকই পারলাম শেষ পর্যন্ত। তবে সেদিন নয়। তার পরের দিন সকালবেলা আচমকা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

সমাধানটা যখন হল তখন আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবনায় একেবারে অস্থির হয়ে আছি। কারণ তার কিছুক্ষণ আগে ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে পরাশরের কাছ থেকে অদ্ভুত বেয়াড়া এক ফোন পেয়েছি।

—ছয়—

ফোনে একেবারে তাড়াহুড়ো ডাক।

কৃত্তিবাস! শোনো এখুনি একবার আমার সঙ্গে বেরুতে হবে। তৈরী হয়ে নাও।

এখুনি যেতে হবে মানে? কোথায় যেতে হবে? কেন?

সে সব কথার কোনো উত্তর নেই। শুধু আগের চেয়ে আরো একটু অস্থির গলায় পরাশর জানালে,—আমি আধ ঘন্টার মধ্যে তোমার ওখানে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

শোনো শোনো! ফোনে যথাসাধ্য চিৎকার করলাম। কিন্তু শুনবে কে? নিজের কথাটুকু বলেই পরাশর ফোন নামিয়ে দিয়েছে।

হয়ে ওঠে তা বলাই বাহুল্য। মিঃ সেন্গারকে তৎক্ষণাৎ তারা ফোন করে জানিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানায়। মিঃ সেন্গার অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তখনই হোটেলে চলে এলেও ব্যাপারটা নিয়ে বেশ একটু মুস্কিলে পড়েন। মঁসিয়ে লেরো তখন অবশ্য ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর ভাগনী ইতিমধ্যে অনেকটা সুস্থবোধ করছে বলে তাঁর জন্যে কোনো ডাক্তার পাঠাবার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসল দুর্ভাবনা হয়েছে মিঃ বারোহাকে নিয়ে। মিঃ বারোহা সেই একবার ডাক্তারের জন্যে ফোন করার পর একেবারে চুপ হয়ে গেছেন। বার বার তাঁর ঘরে রিং করেও কোনো সাড়া তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি যেন একবার ফোন করেই ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে হয়। ঘুমিয়ে পড়ার বদলে অজ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনাও যে থাকতে পারে সে কথা ভেবেই ম্যানেজার তখন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছেন।

এই পর্যন্ত শুনেই বারোহা একটু যেন লজ্জিতভাবে বাধা দিয়ে বললে—অজ্ঞানই কি হয়ে গিয়েছিলাম? কে জানে! আমার কিন্তু রিসেপশনে ফোন করার কথাও কিছু মনে নেই।

ম্যানেজারকে তার পর একটু আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলে বারোহা—যাই হোক, আমি যখন আর সাড়াশব্দ করিনি তখন আমার ফোনটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরেই করা বুঝেই নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

তা কি পারি!—ম্যানেজার একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই প্রতিবাদ জানালেন,—আপনার বিষয়ে কি করা উচিত সেইটেই তখন দারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপনি সত্যি অসুস্থ হলে যথাসাধ্য চিকিৎসা আর শুশ্রূষার ব্যবস্থা আমাদের না করলে নয়। অথচ আমাদের কোনো বোর্ডারকে মাঝ রাতে বিনা কারণে জাগিয়ে বিরক্ত করার অধিকার আমাদের নেই। তবু মঁসিয়ে লেরোও নিজের আর তার ভাগনীর অসুস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন বলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক কিছু নয় বলেই ধরে নিতে বাধ্য হলাম। আপনাদের সম্বন্ধে হোটেলের দায়িত্ব খাবার আর পানীয় নিয়ে। খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনারা যা খেয়েছেন, তা একেবারে সন্দেহাতীতভাবে নিরাপদ নির্দোষ খাবার, কারণ সমস্ত হোটেলেই সেই এক খাবার পরিবেশিত হয়েছে আর তাতে বিন্দুমাত্র কুফল কারুর হয়নি।

খাবার না হলে দোষ কি তাহলে পানীয়ের?

সে সম্ভাবনাটা মাথায় এলেও আমল একরকম দিইনি বললেই হয়। আমাদের হোটেলের চেয়ে বিশুদ্ধ একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় দেশ-বিদেশের সেরা হোটেলের পক্ষেও দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এ-হোটেলে প্রথম শ্রেণীর জিনিষ ছাড়া নিরেস কিছু এক ফোঁটাও কখনো আসে না।

তাহলে কি মাত্রার বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে?

সত্যি কথা স্বীকার করছি, মিঃ বর্মা ভোর রাত্রে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় ফোন করার আগে ওদিক দিয়ে কিছু ভাবিইনি।

মিঃ বর্মা ভোরবেলা আপনাকে ফোন করেছিলেন? উনি হোটেলের এ-ব্যাপারের কথা জানলেন কি করে?—আমার বিস্মিত প্রশ্নটাই বারোহার মুখ দিয়ে বার হল।

হ্যাঁ!—ম্যানেজার বিমূঢ় মুখেই স্বীকার করলেন,—ওঁর ফোন পেয়ে আমি ওই কথা ভেবেই বেশী হতভম্ব হয়েছি। প্রথমে অবশ্য অধিকারের বাইরে এরকম নাক গলাবার স্পর্ধার জন্যে ওঁকে জাহান্নমে যেতে বলার ইচ্ছেই হয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি ওঁর যুক্তি শুনে ওঁর প্রস্তাবে রাজী না হয়ে পারিনি।

কি যুক্তি দিয়েছেন মিঃ বর্মা! আর কি প্রস্তাব করেছেন?—এবারও আমায় কৌতূহলটাই প্রকাশ করলে বারোহা।

আমাদের মত হোটেলের সুনামের পক্ষে এরকম ঘটনা যে অত্যন্ত সর্বনাশা ক্ষতিকর, আর তার মূলে কি আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বার করে সে জড় যে নিঃশব্দে এখনি সরিয়ে ফেলা দরকার, তা জানিয়ে উনি আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছেন।

সে-সাহায্য আপনার পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়, বুঝতে পারছি,—নিজের অসুস্থতা যেন ভুলে গিয়ে একটু হেসে উঠে বললে বারোহা।—কিন্তু এখনো সেই প্রশ্নটারই উত্তর পাওয়া গেল না। মিঃ বর্মা হোটেলের এ ব্যাপারের কথা রাত না পোহাতে জানলেন কি করে? হোটেলের অন্য কোন বোর্ডারও ত এখনো এ বিষয়ে বোধহয় কিছু জানে না!

তা ত জানেই না। ম্যানেজার বললেন,—তবু মিঃ বর্মা কেমন করে হোটেলের বাইরে থেকে এ খবর পেলেন উনি আসবামাত্র আমি জিজ্ঞাসা করেছি। তাতে উনি যা উত্তর দিয়েছেন ওঁর মুখেই শুনুন।

সত্যি রহস্যটা কি তা বলবেন মিঃ বর্মা।—জিজ্ঞেসা করলে বারোহা।

— নয় —

রহস্যটা জানতে চান?—বেশ একটু গম্ভীর মুখেই বললে পরাশর—তাহলে শুনুন। এসবকিছু জানতে পেরেছি জ্যোতিষের গণনায়।

জ্যোতিষের গণনায়!—বিস্ময়ে আমিও প্রকাশ না করে পারলাম না!

হ্যাঁ, জ্যোতিষের গণনায়। এই দেখুন না জ্যোতিষের আর একটা গণনার কথা আপনাদের শোনাচ্ছি।—পরাশর আমার কাছ থেকে গালা দেওয়া খামটা চেয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ভেতরকার কাগজটা পড়তে পড়তে বললে—আপনাদের হোটেলের দোতালার সবচেয়ে ভালো সুইটটা আজ খালি হবার কথা আছে। কিন্তু তা হবে না। মিঃ র‍্যাথবোন আর তাঁর স্ত্রী আরো পাঁচদিনের জন্যে সুইটটা বুক করবেন। আর তার মধ্যে ওঁদের একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। সেইটেই ঠেকাবার জন্যে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে!

আপনি জ্যোতিষের গণনার জোরে এসব ভবিষ্যদ্বাণী করছেন!—বারোহা বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়েই জিজ্ঞাসা করলে—র‍্যাথবোন দম্পতির মধ্যে দুর্ঘটনা কার হবে আর কি ধরনের তা আপনার জ্যোতিষের গণনায় কিছু পাচ্ছেন?

গণনা ত আমার নয়!—পরাশর তার হাতের কাগজটা দেখতে দেখতে বললে—আমি একজন অসামান্য জ্যোতিষীর কাছ থেকে এসব 'টিপস' মানে হদিস পাই। তাঁর এ কাগজ থেকে যা পাচ্ছি তাতে দুর্ঘটনা মিস্টার বা মিসেস র‍্যাথবান যে কোনো জনেরই হোতে পারে। দুজনেরই একসঙ্গে হওয়াও অসম্ভব নয়। আর দুর্ঘটনাটা আপনাদের যা হয়েছে তারই একটু বড় সংস্করণ!

তার মানে?—বারোহা আর ম্যানেজার দুজনেই প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে

স্কাইলার্ক
একমাত্র ISI মার্ক
আলট্রামেরীন ব্লু
স্কাইলার্ক নীল
একটু দিলে জলে
কাপড় হয়ে ওঠে ঝলমলে

FREE
প্রতি ২৫ গ্রাম
প্যাকেটের সাথে
একটি উইমকো ম্যাচ
পরিবেশক
অনিল এজেন্সিজ
সিটি অফিস ৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১, ফোন-২২-৪১১৯

উঠলেন—এ হোটেলে আবার এইরকম বিষক্রিয়া গোছের ব্যাপার দেখা যাবে, আর তা হবে আরো গুরুতর?

একটু থেমে বারোহা একটু তীক্ষ্ণস্বরেই পরাশরকে প্রশ্ন করলে,—এবারে আমাদের যা হয়েছে তা কোনো বিষ থেকেই হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? কিন্তু বিষ আসবে কোথা থেকে? মিঃ সেণ্ডার সমস্ত খাদ্য আর পানীয়ই চেক্ করে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। তাতে কোন বিষ থাকতেই পারে না।

তাতে না থাক্—পরাশর গম্ভীর হয়েই জানালে,—আপনারা যা খেয়েছেন পান করেছেন তার মধ্যেই বিষ ছিল।

কেমন করে থাকবে! —বারোহা বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে,—আমাদের খাবার আর ড্রিংকে বিষ দেবে কে, আর কি উদ্দেশ্যে?

তাই এখন খুঁজে বার করতে হবে! —বললে পরাশর।

আপনি আমাদের হোটেলের রেস্তোরাঁর ওয়েটার বা বারবয়দের সন্দেহ করছেন কি?—মিঃ সেণ্ডার বেশ তীক্ষ্ণস্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন।

না, তা করছি না! —শান্তভাবে জানালে পরাশর।

তাহলে!—উত্তেজনায় বিছানা থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ পেটে যেন একটা ব্যথা বোধ করে বারোহা মুখটা একটু বিকৃত করে আবার বিছানায় বসে পড়ল।

আপনি মিছিমিছি অত উত্তেজিত হবেন না মিঃ বারোহা। —পরাশর কাঁধে হাত রেখে তাকে শান্ত করতে চাইলে।

ফল কিন্তু উল্টো হল। বারোহা সাময়িক ব্যথাটা ঝেড়ে ফেলে আবার সোজা হয়ে বসে বললে,—আমার এ উত্তেজনা মিছিমিছি বলছেন! আপনি যা বলছেন তার মানেটা নিজেই তলিয়ে বুঝেছেন। আপনার মতে আমাদের খাবার বা পানীয়ে বিষ অতি অবশ্য কিছু ছিল। সে বিষের জন্যে এ হোটেলের ব্যবস্থা বা লোকজন দায়ী নয়। তার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে নাকি যে আমাদের খাবারে বা ড্রিংকে আমাদের পার্টির কেউই বিষ মিশিয়েছে? কিন্তু পার্টির চারজনই আমরা যে অসুস্থ সেটা হিসেবে ধরেছেন?

মিস এলসার অসুস্থ হওয়ার খবর অবশ্য আমি এখনো পাইনি। —জানালেন মিঃ সেণ্ডার।

খবর না পেলেই তিনি সুস্থ মনে করার কোনো কারণ নেই।

—ম্যানেজারের মন্তব্যটা সংশোধন করলে বারোহা,—মিস এলসার কোনো খবর না পাওয়া ত আরো ভাবনার ব্যাপার বলে আমার মনে হচ্ছে। তিনি হয়ত আমাদের চেয়ে বেশী অসুস্থ বলে কোনো খবর দিতেও পারেন নি?

না, তিনি অসুস্থ নন। —বাধ্য হয়েই প্রতিবাদ জানালাম।

অসুস্থ নয়! আপনি কি করে জানলেন। একটু সন্দিগ্ধ ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে বারোহা।

জানলাম, আমি তাঁকে সুস্থ শরীরে ওপরের ল্যাণ্ডিং-এ নিচে নামবার লিফ্‌টের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখেছি বলে।

সেই অত সকালে আপনি নিজের কামরায় যাবার সময় তাঁকে ল্যাণ্ডিং-এ দেখেছেন! —মিঃ সেণ্ডার সবিস্ময়ে বললেন, —কিন্তু মিস এলসা ত সে লিফ্‌টে নিচে নামেন নি। আমি আর মিঃ বর্মা ওই লিফ্‌টে ওপরে আসব বলেই অপেক্ষা করছিলাম। লিফ্‌ট ত কোথাও না থেমে সোজা নিচে নেমে এসেছে।

তাহলে তিনি বোধহয় কিছু ভেবে তাঁর কামরাতেই আবার ফিরে গেছেন!—বারোহা বললে,—তাঁর কামরায় একবার ফোন করে দেখলে ত পারেন।

হ্যাঁ, তাই করুন।—বললে পরাশর, নম্বর ত চারশ' পঁচিশ।

চারশ' পঁচিশ শুনে মনে মনে একটু চমকালাম। পঁচিশ মানে একেবারে আমার পাশের কামরা। আমাকে ঠিক ছাব্বিশ নম্বরেই ঘর দেবার মধ্যে সেদিক দিয়ে কোনো অর্থ আছে নাকি?

মিঃ সেণ্ডার তখন এলসার ঘরে ডায়াল করে কোনো সাড়াই কিন্তু পাচ্ছেন না। ফোনটা ধরে রেখেই তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন,—এ ত শুধু রিং-ই হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না।

তাহলে মিঃ ভদ্র আর কাউকে দেখে এলসা মনে করে ভুল করেননি ত?—সন্দেহ প্রকাশ করলে বারোহা।

না, সে-ভুল হওয়াও সম্ভব নয়,—বললেন ম্যানেজার,—ও ফ্লোরে এলসার বয়সী বা চেহারার কোনো মেয়েই নেই।

লিফ্‌টের জন্যে ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়িয়ে থাকলেও কোন কারণে হয়ত তখন না গিয়ে এলসা পরে নেমে গেছে মনে করে নিচের রিসেপশন কাউণ্টারে খোঁজ নেওয়া হল এর পর।

না, মিস এলসা নিচে নামেই নি বলে সেখান থেকে জানা গেল।

তাহলে তার কামরাতেই খোঁজ করতে যেতে হয়। —উদ্বিগ্ন হয়ে বললে বারোহা।

তা যাওয়া যাবে খন, পরে—বললে পরাশর,—আপাততঃ উপরের তলায় একবার ফোন করে দেখুন ত মিঃ সেণ্ডার,

ওপরের তলায় ফোন করে দেখব—ম্যানেজার বেশ অবাক,—সে কি!

নিচে না নেমে থাকলে ওপরে গেছে ভাবাই স্বাভাবিক নয় কি! —পরাশরের গলায় একটু যেন প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

কিন্তু ওপরতলায় ফোন করা হবে কাকে! —জিজ্ঞাসা করলে বারোহা।

র‍্যাথবোনদেরই করে দেখুন।—নির্দেশ দিলে পরাশর।

র‍্যাথবোনদের? বারোহার গলায় তার অবিশ্বাসের সুরটা অস্পষ্ট রইল না।

কিন্তু র‍্যাথবোনদের কামরাতেই এলসার খবর পাওয়া গেল। সে কিছুক্ষণ আগে ও-কামরাতেই গেছল। এই মিনিট দুয়েক হল নিজের কামরায় নেমে গেছে।

মিস এলসার হঠাৎ র‍্যাথবোনদের ঘরে যাবার মানে! —ভুরু কুঁচকে নিজের বিমূঢ়তাটা বুঝিয়ে বারোহা এবার সোজাসুজি পরাশরকেই চেপে ধরতে চাইল,—কিন্তু আপনি সবকিছু জড়িয়ে যে রকম একটা শয়তানী ষড়যন্ত্র কল্পনা করছেন, এই সবেমাত্র দিল্লীর ওই শৌভরাজের দল ধরা পড়ার পর নেহাৎ গবেট ছাড়া কারুর পক্ষে সেরকম কিছু করা কি সম্ভব? খবরের কাগজে কাগজে এখনো ত সে দলের নানা খবর বার হচ্ছে। কি করে তারা টুরিস্ট সেজে নিরীহ সরল অন্য টুরিস্টদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের বিষ দিয়ে অজ্ঞান করে যথাসর্বস্ব লুট করত সে বিবরণ ত এখন কারুর অজানা নয়। সদ্য সদ্য ওই ঘটনার পর ওই এক প্যাঁচ দিয়ে বাজিমাৎ করার কথা কোনো আহম্মকও নিশ্চয় ভাববে না।

আহাম্মকেরা পারবে না বলেই অতি বুদ্ধিমানেরা ভাববে! —পরাশর তার নিজস্ব ব্যাখ্যা শোনালে,—সাধারণের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত বলেই এই সময়টাই তারা বেছে নেবে একই প্যাঁচ খাটাবার জন্যে।

না। আমায় মাপ করবেন মিঃ বর্মা: —নিজের মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে বললে বারোহা—আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যচ্ছে। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

বোঝবার চেষ্টা এখন তাহলে করবেন না। —পরাশর উপদেশের সুরেই বললে,—আপনি শুধু একটু সাবধানে থাকবেন।

আমি সাবধানে থাকব'— পরাশরের কথায় বারোহা আমাদের মতই হতভম্ব,—আমারও এখনো ভয়ের কিছু আছে নাকি? কাল রাত্রের ব্যাপারেও তা কেটে যায় নি?

না, মিঃ বারোহা!—বেশ গম্ভীর হয়েই জানালে পরাশর, — আপনার আসল বিপদ এইবারই আসছে। আর র‍্যাথবোনদের চেয়েও তা অনেক গুরুতর।

বলেন কি? —বারোহার মুখ দেখে মনে হ'ল পরাশরের কথাটা ঠাট্টা না সত্যি সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। হেসে উঠবে না ভয় পাবে ঠিক করতে পারছে না তাই।

বারোহার এ প্রতিক্রিয়াটা পরাশর লক্ষ্য করল কিনা বুঝতে পারলাম না। ম্যানেজারের দিকে ফিরে সে তখন তাঁকে আরেকবার এলসার ঘরে ফোন করতে বলছে।

আবার মিস এলসার ঘরে!—ম্যানেজার একটু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন

ক্ষেতে আর কারখানায়
প্রগতি আর প্রাচুর্যের স্রোত বয়
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান)

কিন্তু পরাশর সে আপত্তি খণ্ডন করে বললে—এতক্ষণে মিস এলসা নিজের ঘরেই ফিরেছেন বলে মনে হচ্ছে। ও'কে ফোন করে শুধু বলুন যে বিশেষ একটা জরুরী প্রয়োজনে আপনি দুজন সঙ্গীকে নিয়ে ও'র সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।

দেখা করতে যদি না চান?—রিসিভারটা তুলে ধরেও ডায়াল করবার আগে ম্যানেজার তাঁর সন্দেহটা জানালেন।

আপত্তি করলে ভিন্ন ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আপত্তি করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।—আশ্বাস দিলে পরাশর।

পরাশরের আশ্বাস মতই এলসাকে ফোন করলেন ম্যানেজার। হঠাৎ তাঁর মুখে হিন্দী শুনে প্রথমটা অবাক হবার পরই মনে পড়ল এলসা ইংরেজী জানে না। ফোনে ম্যানেজারের কথা থেকে বোঝা গেল পরাশরের অনুমানই ঠিক। এলসা দেখা করতে আপত্তি জানাল না, এমনকি দেখার উদ্দেশ্য বা ম্যানেজারের সঙ্গীদের নামও জানতে চাইল না।

এলসার কামরাতেই এবার গেলাম যাবার আগে কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বারোহা শুধু একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে জানালে,—আপনাদের সঙ্গে আমিও যদি থাকতে পারতাম।

তার জন্যে দুঃখ করবেন না।—তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেল পরাশর,—যা যা কথা ওখানে হবে সব আপনি আমার বা মিঃ অত্রের মুখে জানতে পারবেন। আচ্ছা শেষবারের মত বলে যাচ্ছি সাবধানে থাকবেন।

—দশ—

এবারে লিফট দিয়েই উঠে এলসার ঘরে পৌঁছোবার পর তার দরজায় বেল টিপতে হল না। দরজা খুলে এলসা নিজেই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

ম্যানেজারের সঙ্গে আমাদের দেখে মুখে তার কোনো ভাবান্তর কিন্তু দেখা গেল না। ম্যানেজার দরজা থেকেই আমাদের পরিচয় দেওয়া সুরু করেছিল। এলসার কামরায় গিয়ে বসবার পর ম্যানেজার হঠাৎ হিন্দী ছেড়ে ফরাসী ধরায় প্রথমটা বেশ চমকেই গেলাম। তারপর ম্যানেজারের এ ভাষা বদলের মানেটা অস্পষ্ট রইল না।

ফরাসী আমি জানি না। তবে বলতে বা লিখতে না পারলেও দু'চারটে কথা একটু আধটু জানা আছে। ম্যানেজারের ফরাসীতে দখল আমার চেয়ে খুব বেশী নয়। তিনি কোনোরকমে ভুল ভাল শব্দে যা বোঝাবার চেষ্টা করলেন সেটা হ'ল এই যে [illegible] কোথা থেকে উড়ে আসা এক [illegible] উপদ্রব। হোটেলের এক [illegible] গোলমালের কথা কেমন করে [illegible] ফলে এখন জুলুম করে মাতব্বরি করছি। হোটেলের সুনামের খাতিরে আমাদের অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে। সেই জন্যেই বাধ্য হয়ে আমাদের আবদার শুনে এ সময়ে এঘরে আমাদের আসতে হয়েছে। মিস এলসা এ ত্রুটি যেন ক্ষমা করেন।

এলসা যেরকম নির্বিকার মুখ করে আমাদের দিকে একবারও না তাকিয়ে এসব কথা শুনে গেল ও তারপর একটু হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার উদ্দেশ্য জানতে চাইল তাতে তার অভিনয় ক্ষমতারও তারিফ না করে পারলাম না।

এলসার হাসিমুখের প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বেশ একটু নীরস গলায় যা বলল তাতে কিন্তু আমি রীতিমত স্তম্ভিত।

কোনোরকম ভণিতা না করে সে বললে,—হিন্দী, ফরাসী হয়েছে এবার সাধু বাংলায় আমাদের উদ্দেশ্যটা শুনুন। উদ্দেশ্যটা, আপনাকে এখনি এ হোটেল শুধু নয় এই দেশই ছেড়ে যেতে অনুরোধ করা।

একথাতেও এলসার মুখের হাসি একটু মুছেও গেল না। আগের মতই প্রসন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে,—এ অনুরোধের কারণ নিশ্চয় আছে?

তা আছে বইকি—পরাশর গম্ভীর হয়েই বললে,—সেগুলো কি আপনি শুনতে চান!

হ্যাঁ, শুনলে নিজের সম্বন্ধে একটু জ্ঞান লাভ হতে পারে।

তাহলে এক এক করে শুনুন,—পরাশর যেন আঙুলে গুণে বলতে আরম্ভ করলে,—আপনি ভারতীয় যুব-তন্ত্রের ছাত্রী নয়, এলসা আপনার নাম নয়, আর্জেন্টিনা থেকে আপনি আসেন নি।

দাঁড়ান, দাঁড়ান!—এলসা কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে বললে,—আপনাদের পরিচয়ের ফিরিস্তি বেশ লম্বা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এসব কথা শোনাবার অধিকার আপনার কি যদি জিজ্ঞাসা করি?

তাহলে আপনাকে সোজা আমাদের সঙ্গে এখানকার হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।—পরাশর একটু কড়া গলাতেই বললে,—সেটা চাইছি না বলেই আপনাকে নিজের মান নিয়ে আগে থাকতে সরে পড়বার সুযোগ দিচ্ছি।

অনেক ধন্যবাদ!—এলসা হেসেই বললে,—তবে আমার প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ কেন, সেটাও ত জানতে ইচ্ছে করে!

ধরুন, ধরুন.....পরাশরকে এবার জবাব দিতে থতমত খেতে দেখে উত্তরটা আমারই দিয়ে দিতে ইচ্ছে হ'ল। ইচ্ছে হ'ল বলি,—অনুগ্রহের কারণ অসময়ে অপাত্রে একটু দুর্বলতা, এটা বুঝতে পারছেন না?

আমার কিছু বলা হ'ল না, পরাশরেরও তার তোৎলামি সারলো না। তার আগে ম্যানেজার মিঃ সেণ্গারই স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন। কথা বাংলা বোঝা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হলেও, কিছু কিছু শব্দ আর পরাশরের কথা বলার ভঙ্গি মানে তাঁর কাছে খুব অস্পষ্ট থাকে নি।

পরাশর বিরূপ হ'তে পারে জেনেও, তাতে তিনি নিজের অধৈর্যটা গোপন করবার চেষ্টা না করে বললেন,—সকাল থেকে হোটেলের কাজ-কর্ম কিছুই আমার দেখা হয় নি। আপনাদের যা বলবার যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে মিস এলসাকে আর বিরক্ত না করে আমরা যেতে পারি।

না, না আপনি নারাজ হবেন না মিঃ সেণ্গার!—পরাশর কিছু বলার আগে এলসাই আমাদের অবাক করে জানালে,—এঁরা আমার বন্ধু লোক। আপনার কাজ থাকলে মিছিমিছি আর আপনাকে আটকে রাখব না।

এঁরা বন্ধুলোক!—উচ্চারিত ভাষায় না হলেও মুখের ভাবে এই বিমূঢ় বিস্ময়টুকু পুরোপুরি ফুটিয়ে ম্যানেজার হতভম্বের মত চলে যাবার পর, পরাশরই প্রথম মুখ খুলল।

তার গলার স্বর কিন্তু আগের মতই রুক্ষ। জিজ্ঞাসা করলে—আমরা যখন বন্ধুলোক তখন কালকের পার্টির রহস্যটা এবার একটু ভাঙবেন?

পার্টির রহস্য! পার্টির আবার রহস্য কি আছে? চারজনের একটু খেয়াল হয়েছিল তাই একসঙ্গে খেয়ে দেয়ে একটু আনন্দ করেছি।

আনন্দ করেছেন? আনন্দের পরিণাম কি হয়েছে তা কিছু জানেন? জানেন যে আপনি ছাড়া অপর তিনজনই রাত্রে বেশ অসুস্থ আর অল্প বিস্তর বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল!

তাই নাকি!—এলসা যেন অবাক,—আশ্চর্য! কই আমার ত কিছু হয় নি।

এই কিছু না হওয়াটা আশ্চর্য শুধু নয়, আরো কিছু।

আরো কিছু?—এলসা ভুরু কোঁচকালে,—আরো কি?

রীতিমত সন্দেহজনক।

এলসা এ কথায় কি বলতে যাচ্ছিল পরাশর তাকে হাত তুলে থামিয়ে বললে,—শুনুন মিস এলসা। মিছে কথা কাটাকাটি করে কোনো লাভ আর নেই। আপনার সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আমাদের জানা হয়ে গেছে। অভিযোগের ফিরিস্তি আপনার বিরুদ্ধে সত্যিই অত্যন্ত লম্বা, সেগুলি মুখে বলার সময় না নিয়ে কাগজে এই লিখে এনেছি।

পকেট থেকে সত্যিই একটা লম্বা খাম বার করে এলসার হাতে দিয়ে পরাশর বললে,—ধীরে সুস্থে এটা পড়বার সুযোগ খানিক বাদেই আপনাকে দেব। তার আগে আপনার কামরাটা একটু সার্চ করতে চাই।

সার্চ করবেন আমার ঘর!—এলসা যেন অবাক,—সার্চ করবার তল্লাসী পরোয়ানা এনেছেন?

আপনার মত মেয়ের ঘর তল্লাস করবার জন্যে সার্চ ওয়ারেণ্ট লাগে না।—পরাশর তাচ্ছিল্যভরে বললে,—তাছাড়া আমি শুধু আপনার এ-কামরায় দেরাজ আলমারীগুলো দেখব। লুকোবার মত

সুন্দর বাথরুমের প্রতীক

VITREOUS
হিন্দুস্থান স্যানিটারীওয়্যার
এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
ভারতের সর্বাধিক বিক্রীত ও সর্বাধিক রপ্তানীকৃত বাথরুম সরঞ্জাম

সোমানী-পিলকিংটনস্ লিমিটেড
হিন্দুস্থান স্যানিটারীওয়্যার-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান

সোমা প্লাম্বিং ফিক্সচার্স লিমিটেড
হিন্দুস্থান স্যানিটারীওয়্যার-এর পূর্ণ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

২, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

কিছু থাকলে আপনি তা সরিয়ে রাখতে পারেন।

না, সরিয়ে রাখবার আমার কিছু নেই। আপনি ইচ্ছে করলে সমস্ত কামরাই খুঁজে দেখতে পারেন।—রেগে উঠেই যেন এলসা ঢালাও স্বাধীনতা দিলে পরাশরকে।

পরাশর কিন্তু সারা ঘর তল্লাসী করল না। এমন কি দেরাজ আলমারীও খুলল না। তার বদলে প্রথমেই কামরার ড্রেসিং টেবলের কাছে গিয়ে প্রসাধনের জিনিষের বিভিন্ন কৌটো আর জার নাড়তে নাড়তে একটি ছোট শিশি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলে,—এটা কি?

পরীক্ষা করলেই যখন জানতে পারবেন, তখন লুকিয়ে লাভ নেই।—বললে এলসা—ওটা বিষ?

কিরকম বিষ! মানুষ মারা যায়?

তা মাত্রা বেশী হলে তাও যেতে পারে।—এলসা স্বীকার করলে,—তবে সাধারণ মাত্রায় কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান করে দেয় মাত্র।

আপনার অকপটতার জন্যে ধন্যবাদ। পরাশর যেন ব্যঙ্গ করল,—আপনার বন্ধুকেও তারিফ। গোপন কোথাও না রেখে চোখের ওপর রেখে লুকোবার সবচেয়ে চতুর ব্যবস্থা করেছেন।

প্রশংসাটা আপনাকেও ফিরিয়ে দিচ্ছি, এলসার গলার স্বরও একটু বাঁকা,—অন্য কোথাও না খুঁজে প্রথমেই যে খোলা জায়গায় নজর দিয়েছেন সেটাও আপনার বাহাদুরী।

আচ্ছা এসব তারিফের লেনদেন এখন থাক—পরাশর ড্রেসিং টেবলেরই একটা দেরাজ খুলে বললে,—আপনার এ ড্রয়ারের এই ছোট আলবামটাও দামী মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ওটাতে খুব বিরল কিছু ছবি আছে।

তাহলে ওটাও আমায় নিতে হবে।—পরাশর অম্লান বদনে বললে,—তবে এখন দেবার দরকার নেই। তার কারণ আমরা আজ রাত্রে এই কামরাতেই থাকছি।

এই কামরাতেই আমার সঙ্গে থাকছেন,—এলসার গলাটা বিমূঢ়তাতেই যেন তেমন তীক্ষ্ণ হতে পারল না।

না, আপনার সঙ্গে নয়।—পরাশর ব্যাখ্যা করলে, আজ রাতটা কামরা বদল করে আপনাকে আমার বন্ধু কৃত্তিবাসের ঘরেই থাকতে হবে।

না, আমি তা থাকব না।—এলসা জোর প্রতিবাদ জানালে।

না থাকতে চাইলে আপনাকে এখনই অনেক বিশ্রী জবাবদিহির দায়ে পড়তে হবে। তার চেয়ে বিনা ঝামেলায় ঘরটা বদল করাই ভালো নয়কি?

এ আপনাদের অন্যায় জুলুম!—নিরুপায় বলেই এলসার গলাটা কেমন করুণ শোনালো।

এ জুলুম না করে আমাদের উপায় কি?—প্রায় নির্মম ভাবেই বললে পরাশর—আপনার বন্ধু সহায় সাথী কে বা কারা, আজ আশা করি জানতে পারব।

আমার কাছ থেকে ঘরের চাবিটা এবার নিয়ে এলসাকে দিয়ে পরাশর আবার বললে,—পালাবার চেষ্টা আপনি করবেন না জানি। তবু শুনে রাখুন, এ হোটেলের চারিধারেও বটেই এখান থেকে যাবার আসবার সমস্ত রাস্তাই আজ আমাদের নজরবন্দী। নেহাৎ ইঁদুর বেড়াল না থাকলে সে পাহারা এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

এবার কোনো উত্তর না দিয়ে দেরাজ আলমারী থেকে কয়েকটা তার নিতান্ত দরকারী জিনিষ একটা হ্যান্ড ব্যাগে ভরে এলসা চলে যাবার পর পরাশর আমার দিকে ফিরে বললে,—আজ রাতটা জেগে কাটাবার জন্যেই তৈরী থাকো। বারোহাকে যে কথা দিয়েছিলাম তা রেখেই আমি আসছি—

— এগার —

নাটকের যবনিকা সে রাত্রেই পড়ল।

ঘুম কাটাবার জন্যে ক্যানটিন থেকে কড়া কফি আনিয়ে খেয়ে টেবল ল্যাম্পের পাশে একটা ডিভানে শুয়ে এলসার কামরা থেকে পাওয়া একটা ডিটেকটিভ নভেল পড়বার চেষ্টা করছিলাম।

এ সব সময়ে পরাশরের কবিতা লেখার কথা। কিন্তু সে চেষ্টা না করে সে পাশের অন্য টেবিলে বসে এলসার ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ারে পাওয়া অ্যালবামটা একটু যেন অতিরিক্ত মন দিয়ে দেখছিল।

রাত তখন বারোটা বাজে। এয়ার-কণ্ডিশনারের মৃদু আওয়াজ ছাড়া ঘরে আর কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ পরাশর আলবাম রেখে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের সব কটা বাতি নিভিয়ে দিলে। পরাশরের কান আমার চেয়ে খাড়া। বুঝলাম সে নিশ্চয় সন্দেহজনক কোন শব্দ বাইরে পেয়েছে।

সেই অনুমানটা ঠিক। কয়েক সেকেণ্ড বাদেই ঘরের দরজায় মৃদু টোকা শোনা গেল। সেই সঙ্গে দেখা গেল দরজার তলা দিয়ে লম্বা একটা চিরকুট কাগজ কে ঠেলে দিচ্ছে।

কাগজটা টেনে নেবার পর পরাশরের টর্চের আলোয় সেটা তার সঙ্গে পড়লাম। তাতে অত্যন্ত জড়ানো হাতে লেখা,—আমি দারুণ বিপদ মাথায় নিয়ে তোমাকে দুটো কথা জানাতে এসেছি। দরজাটা খুলে আমায় দু মিনিটের জন্যে ভেতরে যেতে দাও।

ওপরে যেমন সম্বোধন নেই নিচে তেমনি কোনো সই নেই। এ কার হাতের লেখা? দরজার বাইরে কে?

আমি রীতিমত ভাবিত হলেও পরাশর বিনা দ্বিধায় দরজাটা খুলে দিলে। আলোটা অবশ্য না জেলেই।

দরজা খুলে দিতে যে ঘরে ঢুকল করিডরের আলোতে তার কাঠামটা দেখেই বুঝলাম বারোহা বলে চিনলাম।

বারোহা অন্ধকার দেখে একটু দ্বিধা-ভরেই ঘরে ঢুকে বললে,—ঘরটা অন্ধকার কেন এলসা। আলোটা জ্বালো।

পরাশর আলোটা জ্বাললে সেই মুহূর্তেই। এলসার বদলে আমাদের দুজনকে দেখে বারোহার অবস্থা তখন বেশ কাহিল। নিজেকে সামলাবার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও একটু ধরা গলায় শুধু বলতে পারলে—আপনারা! এ ঘরে?

হ্যাঁ আমরাই! পরাশর ওই সাড়ে ছ ফুট লম্বা মানুষটাকে যেন নাবালক হিসেবে দেখে ব্যঙ্গের সুরে বললে,—তা এ ঘরে এত রাত্রে কেন এসেছেন? এলসার সঙ্গে গোপন অভিসারের মতলবে?

না, না। আমায় বিশ্বাস করুন—বারোহা কাতর প্রতিবাদ জানালে,—এলসার সঙ্গে আমার সে-রকম সম্বন্ধ নয়। আমি শুধু।

ওই পর্যন্ত বলে বারোহা একটু থামতেই পরাশর যেন ঠেলা দিয়ে বললে,—আমি শুধু বলে থামলেন কেন? আমি শুধু, কি বলতে যাচ্ছিলেন?

বলতে যাচ্ছিলাম যে—আপনারা আমাকে সন্ধ্যাবেলা যা বলে এসেছিলেন তা শুনে আমি সত্যি মিস এলসার জন্যে ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। তাই লুকিয়ে ওকে একটু সাবধান করে দিতে এসেছিলাম।

সাবধান করতে এসেছিলেন না আপনার চিরশত্রুর হদিশ পেয়ে তাকে শেষ করতে! পরাশর কড়া গলায় বললে—কিন্তু কি আজ আপনাকে সকালে বলে দিলাম? বলেছিলাম না যে,—আপনার মাথার ওপর একটা মস্ত বিপদের ফাঁড়া ঝুলছে। এমন করে এ ঘরে এসে সে বিপদ এখন ত সঙ্গীন করে তুলেছেন।

সঙ্গীন করে তুলেছি!—বারোহা হতাশ স্বরে বললে,—কিন্তু আপনারা থাকতে এ ঘরে আমার বিপদ হবে কেন? আপনারা আমায় রক্ষা করবেন না!

বিপদ আপনার যে নিজের ডাকা!—পরাশর নির্মমভাবে বললে—তার আমরা রক্ষা করব কি করে।

যে আলবামটা খানিক আগে সে দেখছিল, সেইটে বারোহার হাতে তুলে দিয়ে পরাশর আবার বললে—দেখুন দেখি এ ছবিগুলো চিনতে পারেন!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্লুকো বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার
সুস্বাদু সাথী

ব্রিটানিয়া

বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

ব্রিটানিয়া গ্লুকো বিস্কুট এত ভাল লাগে কেন? কারণ, এর বিশেষ পুষ্টিকর গুণ। বাচ্চারা তাদেরকে খুব ভাল পুষ্টির জন্য খেতেও পারে। ব্রিটানিয়া গ্লুকো বিস্কুট খাইয়ে বাড়ন্ত বাচ্চাদের সুখে রাখার উপায়টি।

বারোহা অ্যালবামটা খুলে ছবিগুলো তাচ্ছিল্যভরে একটু দেখেই সেটা মুড়ে ফেলে বললে—হ্যাঁ পারি—। এগুলো। আমারই ছবি। কিন্তু তাতে কি বলতে চান কি?

কথাটা শুনে শুধু নয়—গলার স্বরটা তেও আমি যেন চমকে উঠলাম। সেই বারোহাই আমাদের সামনে অ্যালবাম হাতে বসে আছে। কিন্তু গলার আওয়াজ থেকে মুখের ভাব ও দেহের ভঙ্গিতে এ যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

পরাশরেরও এ চমকটা লাগল কি না জানি না—কিন্তু তার কথায় সেটা প্রকাশ পেল না।

আমার মতই চাপা বিদ্রূপের সুরে সে বললে,—বলতে চাই এই যে—অতি বুদ্ধিমান হওয়ার বিপদ একটু বেশী। এই সেদিন দিল্লীতে চার্লস শোভরাজের দল ধরা পড়ার পরই ও জাতীয় শয়তানী আবার হওয়া সম্বন্ধে কেউ সাবধান থাকবে না ধরে নিয়ে তুমি খুব চতুর ফাঁদই এখানে পেতেছিলে। প্রথমে নিজেই যেন বিশ্বের শিকার হয়েছে এমনভাবে প্রেস বিহার্সাল দিয়ে জমিটা ভালোভাবে তৈরী করে নিয়েছিলে। তোমার লক্ষ্য র‍্যাথবোন-এরা ছিল না। ওদের নাম আমি তোমার একটু ধোঁকা দেবার জন্যই করেছিলাম। তোমার আসল লক্ষ্য হল মঁসিয়ে লেরো। প্রচুর দামী জিনিষ নিয়ে খেলা তার এক রকম রোগ। এ হোটেলে তাকে বধ করবার জন্যেই তুমি জাল পেতে বসেছিলে। একটা কথা শুধু তুমি ভুলে গেছলে যে—ডালে ডালে যারা চরে তাদের ওপরেও পাতায় পাতায় চরবার মানুষও আছে।

আর সেই পাতায় পাতায় যারা চরে—তাদেরও মরণ হয়, অতিবুদ্ধির অহঙ্কারে!

একেবারে চাবুকমারা গলার কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে পিস্তল বার করে বারোহা ঘরের বাল্বের দিকে ছুঁড়ে সেটা ফাটিয়ে দিলে।

তারপর গাঢ় অন্ধকারে তার হিংস্র শাসানি শোনা গেল—আমি এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করলে মশা-মাছি মারার দ্বিধাটুকুও আমি যে করব না এইটুকু শুধু জানিয়ে যাচ্ছি। যে যেখানে আছ সেখান থেকে এক পা নড়বে না।

এই হুকুমটা তোমার ওপরও রইল!

হঠাৎ তীব্র একটা চোখ-ধাঁধানো জোরালো টর্চের আলো বারোহার ঠিক মুখের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্যভাবে এই কথাগুলো শুনতে পেলাম। কথাগুলো একটি মেয়ের গলার—আর সে মেয়ে যে এলসা তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পরাশর কামরার অন্য একটা আলো জেবলে দেওয়ায় তা বুঝতে পারলাম।

এলসার এক হাতে টর্চ আর অন্য হাতে বারোহার ঠিক কপাল লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরা পিস্তল।

এলসা শুধু একা নয় তার সামনে আর একটি যে মেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে মঁসিয়ে লেরো-র ভাগনী বলেই চিনলাম।

আলো জ্বলবার পরই এলসার আবার কড়া আদেশ শোনা গেল,—তোমার পিস্তল ফেলে দাও বারোহা। তুমি যত বড় লক্ষ্যভেদী-ই হও, তুমি জানো যে তোমার হাত ঘুরিয়ে পিস্তল ছোঁড়ার আগেই তোমার মাথার ঘিলু এই রিভলভারটা নোংরা করে দেবে। ফেলো পিস্তলটা।

বারোহা দু চোখে অগ্নি বৃষ্টি করেও পিস্তল ফেলে দিতে এবার বাধ্য হল।

জিনেৎকে টর্চ ধরা হাতে ঘৃণাভরে বারোহার দিকে ঠেলে দিয়ে এলসা এবার বললে, —এই নাও তোমার যোগ্য সহচরীকে বুড়ো লম্পট মঁসিয়ে লেরোকে কাবু করবার জন্যে ভাগনী বলে সুধা-দাসী করে নিজেই যাকে তুমি জুটিয়ে দিয়েছিলে।

এ নাটক দেখতে দেখতে সন্ধ্যে তখন আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। পরাশরের কথায় আমার চমক ভাঙল। বারোহার ফেলে দেওয়া পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে সে আমায় বললে, —সাবধানের মার নেই! আর কিছু না পাও ওপর থেকে মিস এলসার স্কার্ফ টার্ফ কিছু এনে গুণধরের হাত দুটো একটু বেঁধে ফেলো দিকি!

পাশের ঘরে বাঁধবার কিছু খোঁজবার জন্যে যেতে যেতে একটা কথা শুধু না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। —আচ্ছা মিস এলসার রহস্যটা দু কথায় একটু বলবে? উনি কি আমাদেরই আরক্ষী বাহিনীর কেউ? তুমি কি ওঁকে চিনতে?

এলসা হাসল, আর সংক্ষেপেই উত্তর দিলে পরাশর, —না উনি ইন্টারপোল।

বিশ্ব পুলিশ সংস্থার একজন বড় গোয়েন্দা। প্রায় দু বছর ধরে নানা দেশে নানা বেশে বারোহাকে চোখে চোখে রেখে থাকে বলে রাঙা হাতে ধরবার জন্যে পেছনে লেগে আছেন। আর তাঁকে চেনার কথা জিজ্ঞাসা করছ? ওঁকে চিনতে দেরী হয়েছে বলেই এ ব্যাপারটা এতদূর গড়াতে পেরেছে।

* * *

পাঁচতারা হোটেলের সব ঝামেলা চুকে টুকে যাবার পর পরাশরের সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করতে করতে একদিন জ্যোতিষ চক্রবর্তী শঙ্কর মহারাজের কথা জানতে চেয়েছিলাম। পরাশর হেসে বলেছিল, —আরে উনিইতঃ চর চরাবার চাঁই। জ্যোতিষ সেজে দেশী বিদেশীদের পেটের খবর বার করে আমাদের জন্যে জমা করে রাখেন। এরপর একটু ধোঁকায় ধাঁধায় পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, —আচ্ছা তোমাদের এই আন্তর্জাতিক ঠগ ধরার ব্যাপারে আমাকে অমন ধড়াচূড়ো পরিয়ে নিয়ে গেছলে কেন বলো ত! আমি তোমাদের কোনো কাজে ত' লাগিনি।

যাঃ! তোমায় না নিয়ে গেলে এ বৃত্তান্তের কথক হত কে! আমি কি আবার নিজের জবানীর দায়ে পড়ব নাকি!

বন্ধু বাৎসল্য এর পর আর রাখা যায়!

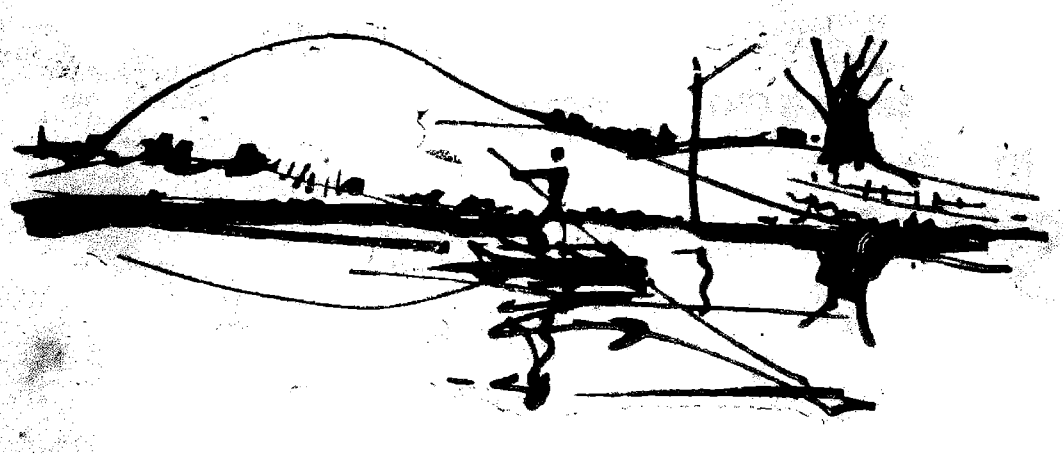

খোকনের প্রথম ছবি

বনফুল

খোকন এখন বড় হয়েছে। ক্লাস টেন-এ পড়ে। ছবি আঁকার দিকে খুব ঝোঁক হয়েছে তার। সে যখন খুব ছোট ছিল কাগজের উপর রঙীন পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কাটত। তারপর ক্রমশ বড় হল, স্কুলে গেল। স্কুলে ড্রইং শেখানো হত। ড্রইং শিখতে লাগল খোকন। টুল, টেবিল, চেয়ার, কলসী, কাপ এমন কি একটা গরুও এঁকে ফেললে একদিন। তারপর ড্রইং বুক থেকে কপি করে করে অনেক ছবি আঁকল সে। নানারকম ছবি। যেখানেই সে ছবি দেখত, দেখে দেখে এঁকে ফেলত। একদিন তার ড্রইংয়ের মাস্টার মশাই বললেন—প্রকৃতি থেকে ছবি আঁকো।

খোকন জিজ্ঞেস করলে—'প্রকৃতি থেকে?'

'হাঁ, তোমার চারপাশে তো অনেক ছবি ছড়িয়ে আছে। সেইগুলো দেখে দেখে আঁক না এবার। তোমার বাড়ির সামনেই তো চমৎকার গাছ আছে একটি। তার ছবিটা এঁকে ফেল একদিন—'

খোকন সত্যি সত্যি এঁকে ফেলল একদিন ইউক্যালিপটাস গাছটাকে। মাস্টার মশাই বললেন—'চমৎকার হয়েছে। আরো আঁকো। তোমাদের বাড়ির ছাদ থেকে যে পুলটা দেখা যায়, সেটা আঁকতে পারবে?'

'পারব—'

পুলের ছবিটা দেখেও খুব প্রশংসা করলেন মাস্টার মশাই। বললেন—'চারপাশে যা দেখবে এঁকে ফেলবে। খুব বড় চিত্রকর হবে তুমি।'

খোকন মহা উৎসাহে আঁকতে লাগল ছবি। কিন্তু কিছুদিন পরে সে নিজেই বুঝতে পারল—ঠিক হচ্ছে না। সূর্যের যে ছবিটা এঁকেছে সেটা তো সূর্যের মত নয়। সূর্যের দীপ্তি তো ছবিতে ফোটেনি। গোলাপ ফুলের ছবিতে কি গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য ফোটাতে পেরেছে সে? পারেনি। প্রকৃতির ছবি ঠিক আঁকা যায় না। একদিন তো মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল খোকন। একদিন সে দেখল আকাশে একটা মেঘ হাতীর মত। ঠিক যেন একটা হাতি পিছনের দুপায়ে ভর করে শুঁড় তুলে আছে। খোকন তাড়াতাড়ি তার ড্রইং খাতায় ছবিটা আঁকতে লাগল। আঁকা শেষ হবার পর মিলিয়ে দেখতে গেল ঠিক হয়েছে কি না। গিয়ে দেখে—হাতি নেই, প্রকাণ্ড একটা কুমীর শুয়ে আছে। হাতি কুমীর হয়ে গেছে।

খোকনের বাবার একজন বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে থাকেন। একদিন তিনি খোকনদের বাড়িতে এলেন।

খোকনের বাবা তাঁকে বললেন—'খোকনও ছবি আঁকছে।'

'তাই নাকি। দেখি দেখি—'

খোকন সগর্বে তার ড্রইংখাতাগুলো নিয়ে এল।

'ওরে বাস, অনেক ছবি এঁকেছো দেখছি—' একে একে উল্টে উল্টে ছবিগুলো দেখতে লাগলেন তিনি। প্রশংসা করলেন, কিন্তু বললেন—'তোমার ছবি কই? এ সবই তো কপি করেছ। তুমি বড় হয়ে ক্যামেরা নিয়ে যদি এদের ফোটো তোল তা হলে এগুলো আরও নিখুঁত হবে। এগুলো সব নকল করা ছবি। তোমার নিজের আঁকা ছবি কই?'

খোকন অবাক হয়ে গেল।

'নিজের আঁকা ছবি? তা কি করে আঁকব?'

'চোখ বুজে বসে কল্পনা করো। কল্পনায় যা দেখবে সেটাই এঁকে ফেল।'

চিত্রকর চলে গেলেন।

খোকন একদিন নিজের ঘরে চোখ বুজে বসে রইল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সে। খোকন ঠিক করল এই অন্ধকারেরই ছবি আঁকবে। কালো রং আর তুলি নিয়ে শুরু করে দিল আঁকতে। ড্রইং খাতার একটা পাতা কালো রংয়ে ভরে গেল।

তারপর সেটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খোকন। এটা কি রকম ছবি হোল? এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তবু।

তারপর হঠাৎ দেখতে পেল ওই কালোর ভিতরই একটা মুখ রয়েছে। চোখও আছে। অদ্ভুত হাসি সে চোখে।

নিজের প্রথম সৃষ্টির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল খোকন।

অজিত ধরের বৈঠকখানা। ধর মশায় পঞ্চশ্রী হয়েছেন, তদুপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া। খাওয়া অত্যুত্তম হবে, সন্দেহ নেই। রান্নাঘরে মাংস রাঁধছে, সুবাস এই এতখানি দূরেও নাকে আসে। গল্প হচ্ছে —নহুষ দাশ নামজাদা কুস্তিগির, এই তল্লাটেরই মানুষ, তার গল্প। বলছে লম্বাচওড়াগোছ একজন, হাতে গলায় এক-বোঝা মাদুলি, ধাক্কা দিলে পড়ে যাবে এমনি হাড্ডিসার চেহারা। হলে কি হবে —রূপকথায় সেই যে সুতোশঙ্খ সাপের কথা শোনেন, মানুষটি তাই—সুতোর মতো দেহ থেকে শঙ্খের আওয়াজ। হাঁ, জানে বটে গল্প জমাতে। বৈঠকখানায় তিলধারণের জায়গা নেই। শ্রোতাদের নিশ্বাস পড়ে কিনা পড়ে!

পুজোর সময় সদরের উপর বারো-য়ারি মেলা। খুব জাঁকজমক। তার মধ্যে একদিন কুস্তি প্রতিযোগিতা হল। নহুষ দাশও এসে কুস্তি লড়ল। কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। প্যান্ডেল-এর চিপল দিয়ে ছড়ছড় করে জল পড়ছে। তা সত্ত্বেও নহুষের নামে বিষম ভিড়! পাঁচ পাঁচটা বাঘা পালোয়ানকে নহুষ একের পর এক ভূতলশায়ী করে একে-বারে তুলোধোনা করে ছাড়ল। অনু-রাগীরা নহুষকে কাঁধে তুলে নাচাচ্ছে। মফস্বলের শহরটুকু জুড়ে তোলপাড়।

বাসে ফেরা। লাইনের শেষ বাস রাত সাড়ে আটটায় ছাড়ে। আপাতত বৃষ্টি নেই, কিন্তু আকাশ মেঘে থমথম করছে। জোর তুফান আবার, লক্ষণে মালুম হচ্ছে! এক উকিলবাবুও যাচ্ছেন, আর তাঁর ভাগনী। বাস কব্জা-জবাব দিয়ে দিল, পথের কি অবস্থা হয়েছে জানা নেই—রাত্রিবেলা দুর্যোগের মধ্যে তারা যাবে না। উকিলবাবুদের অথচ না গেলেই নয়। ভাগনীর বিয়ের এক উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ এসেছে, সকালবেলা পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে হাজির হবেন। অনেক দূর—এলাহাবাদ থেকে আসছেন তাঁরা, দুর্যোগ মাথায় করে উকিলবাবু তাই ভাগনী নিয়ে যাচ্ছেন।

অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর অবশেষে এক চেনা ট্যাকসি মিলে গেল। কলকাতার বাবু-ট্যাকসি নয়—ঝড়ঝাপটা কাদাজল এরা আমলের মধ্যে আনে না। যাবার জন্য নহুষও ঘোরাঘুরি করছে। উকিল-বাবু মেলায় তাকে দেখেছেন, চিনতে পারলেন। বললেন, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তোমার গ্রাম তো পথে পড়বে, সেইখানে নেমে যেও।

ভাগনীকে বললেন, রাতবিরেতে আকাশের এই অবস্থায় এমনি একটি শক্ত ছেলে সঙ্গে থাকা ভাল। কি বলিস রে লতা?

ওরে বাবা! নহুষ চমক খেয়ে যায়। এই দৈর্ঘ্য এইরূপ প্রস্থ, লতা হলেন এই বস্তু—নুয়ে নুয়ে চলেন, 'সখি আমায় ধরো ধরো' এইরূপ গতিক। মামার প্রস্তাবে ললিতলবঙ্গলতাটি হাঁ-না—কিছুই না বলে ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিল। উকিলবাবু নহুষকে আহ্বান করলেন : উঠে পড়ো বাবা, ড্রাইভারের পাশে ঐখানটায় বোসো।

চলল ট্যাকসি—টিকিয়ে টিকিয়ে যাচ্ছে। মাইল চারেক গিয়ে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। এগোনোর উপায় নেই। আজকের ঝড়ে ডালপালা সমেত এক আমগাছ পথের উপর পড়েছে। আশে-পাশে চাষীদের বাড়ি। ড্রাইভার গিয়ে খোশামুদি করে, টাকার লোভ দেখায় : কুড়ুলে ডালপালা কেটে গাড়ি যাবার মতো একটু পথ করে দাও। পথে পড়ে থাকলে হবে না, জরুরি দরকার আমা-দের। নড়ানো গেল না—বর্ষারাত্রে অন্ধ-কারে কাঁথা ছেড়ে উঠতে বয়ে গেছে তাদের।

তখন নহুষই গিয়ে পড়ল। অত বড় গাছের গুঁড়ি বেড়ের মধ্যে আসে না তো মাথার দিক ধরে টানে। ট্যাকসির হেড-লাইট জেলে রেখেছে, এরা সব দেখছে, চোখের মণি বিস্ময়ে বাতাবিলেবুর সাইজে এসে গেছে। গায়ের জোর, দেখা যাচ্ছে, দৈত্যদানোর সমতুল্য—আবগাছ গড়িয়ে পাশের পগারে নিয়ে ফেলল : রাস্তা পরিষ্কার। উকিলবাবু শতকণ্ঠে সুখ্যাতি করছেন। ড্রাইভারও তাজ্জব। ভাগনী লতাই কেবল মুখ বাঁকিয়ে রয়েছে।

নহুষের গ্রামের কাছাকাছি এসে আবার বিপদ। গ্রামের জল বিলে পড়ে—সেখানটা একটুকু নড়বড়ে কাঠের পুল। জলের তোড়ে পুলের তক্তা ভেসে গেছে। উকিলবাবু নহুষকে বললেন, তুমি তো এসে গেলে বাপু—একটুখানি হেঁটে বাড়ি গিয়ে উঠবে। বিলের মধ্যে আমা-দের এখন কি উপায়?

উপায় দেখতে নহুষ সেই বিলের জলে নেমে পড়ল। ড্রাইভারও নেমেছে।

ছপছপ ছপছপ করে জল ভেঙে এদিক-ওদিক দেখে। জোর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল আবার। ঘুরে এসে নহুষ বলে, হবে। কায়দা পেয়ে গেছি, গড়ানে জায়গা—গাড়ি বিলে নামাব। এই জায়গাটুকু জলের মধ্য দিয়ে ঠেলে নিয়ে গাড়ি ওপারের রাস্তায় তুলে দেওয়া যাবে। ড্রাইভারও হাত লাগাবেন, অসুবিধা হবে না।

গাড়ি অতএব যতদূর হালকা করা যায়—উকিলবাবু নেমে পড়লেন। কিন্তু আসল ভাবনা যাকে নিয়ে—লতা নামবে না, জলকাদা ভাঙতে সে নারাজ। বলে, সর্দিতে এমন ধরা ধরবে—কাল তাহলে মাথা তুলতেই পারব না।

নহুষ সমর্থন করে বলল, অন্য বিপদও আছে উকিলবাবু। গতরের দিকে নজর দিতে নেই, তবু ওজনে বেশ খানিকটা তো আছেন—ধরুন, বিলে হাঁটতে গিয়ে কাদায় কোমর অবধি তলিয়ে গেল, টেনে তোলা মুশকিল হবে তখন। কপিকল ছাড়া সম্ভব হবে না—রাতদুপুরে হড়্ড হড়্ড করে কাঁহাতক তখন কপিকল খুঁজে বেড়াই। তার চেয়ে অনুমতি করুন, কাদাজল পার করে আমিই ওঁকে ওদিককার বটতলায় বসিয়ে রেখে আসি।

লতাকে আলটপকা তুলে নিয়ে পালোয়ান নহুষ জল ভেঙে চলল। একলা হাতে রাস্তার সেই আমগাছ সরানোর মতন এ-ও এক দানবীয় কাণ্ড—উকিলবাবু ও ট্যাকসি ড্রাইভার মুগ্ধ হয়ে দেখছে। একবার সামান্য পা হড়কাল। লতা অমনি খাঁক করে ওঠে : দেখেশুনে হাঁটতে পারেন না? নহুষের প্রচণ্ড বাসনা জাগে, ইচ্ছে করে পড়ে গিয়ে ললনাকে কাদার মধ্যে আস্টেপিষ্টে গড়াগড়ি খাওয়ায়। কিন্তু নিশিরাত্রে নিজেরও তো কষ্টভোগ। সেটা না করে শেষমুখে খেলা দেখায় একটুখানি। যেন হাত গলে বেরিয়ে গেছে এমনিভাবে ছেড়ে বলের মতন তৎক্ষণাৎ আবার লুফে ধরল। আঁউ-আঁউ করে লতা পড়বার ভয়ে নহুষকে এঁটে ধরেছে জোঁকের মতন।

কদিন পরে। অপরাহ্নে নহুষ বাড়ি ফিরে দেখে, গাইগরুটা সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে আছে—চিটেপানা পেট। অর্থাৎ চরে খেয়ে গরুর আজ মোটেই পেট ভরেনি। তাহলে? কী করা যায়, কী খাইয়ে পেট ভরাবে সে এখন? নহুষ ইতস্তত তাকায়—ঘাসটাস কোন দিকে দেখা যায় না, বাঁশঝাড় একটা সামনে। বাঁশ তো বাঁশই সই—প্রকাণ্ড এক বাঁশ নুইয়ে সে গরুর মুখে ধরল। মহানন্দে গরু বাঁশের পাতা খাচ্ছে।

পথের উপর থেকে হেনকালে প্রশ্ন আসে : পালোয়ান নহুষ দাশ মশায়ের বাড়ি তো এই?

হ্যাঁ—বলে নহুষ ঘাড় নাড়ল।

বাড়ি আছেন তোমার বাবু?

নহুষকে এ-বাড়ির চাকর ঠাউরেছে। মেনে নিয়ে নহুষও তেমনিভাবে জবাব দিল : বাবুর কাছে কি দরকার? কোত্থেকে আসছেন আপনি?

বুধবার রাত্রে আমার বোন আর মামা সদর থেকে বাড়ি এলেন। নহুষবাবুও সেই ট্যাকসিতে ছিলেন। ছিলেন ভাগ্যিস, মামারা সুতালাভাঙ্গি তাই পৌঁছতে পারলেন। পথের মধ্যে পালোয়ান মশায় অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করেছেন, মামার মুখে সর্বক্ষণ সেইসব গল্প—

নহুষ বলে, সে না-হয় হল। কিন্তু আপনার দরকারের কথা কিছু তো বললেন না। বাবুকে কি বলব?

আমি ভীমসেন সামন্ত। নামটা পালোয়ান মশায় জানলেও জানতে পারেন। এক লাইনের মানুষ—আমিও অল্পসল্প কুস্তি লড়ে থাকি। ওঁর সঙ্গে এক-হাত লড়ে দেখব, বাজী করে এসেছি।

বেশ তো, বেশ তো—বলে নহুষ স্ফূর্তি দিচ্ছে।

ভীমসেন বলে, অতবড় কুস্তিগিরের লড়া—কপাল গুণে জিতে যাই তো পাথরে পাঁচ কিল। হারি তো বোনকে ওঁরই হাতে সমর্পণ করব। আর বোনের নামে হাজার দশেক টাকা আছে, সে-ও ওঁর হাতে পড়বে।

নহুষ পুলকিত হয়ে বলে, খুব ভাল। অর্ধেক রাজত্ব রাজকন্যা—ডেকে দিচ্ছি বাবুকে, নিশ্চয় তিনি লড়বেন। ততক্ষণ আপনি দয়া করে বাঁশটা ধরে থাকুন। গরুতে বাঁশপাতা খাচ্ছে, ছাড়বেন না কিন্তু—

রাজি হয়ে ভীমসেন বাঁশের মাথা ধরল। যেই না নহুষ ছেড়ে দিয়েছে, সড়াক করে বাঁশ উপরে উঠে গেল। টনটনে খাড়া। হাত ছাড়েনি ভীমসেন—বাঁশের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও শূন্যে উঠে গেল। দুলছে বাঁশের আগায়, আর্তনাদ করছে, বাঁশ টেনে ধরো ও-ভাই, নামিয়ে নাও—

আচমকা গল্প থামিয়ে বক্তা বলল, শিকল নড়ল না?—হুঁ, তাই। উঠুন মশায়রা, জায়গা হয়েছে।

হেলথ-সেন্টারের নতুন ডাক্তার বিজয় হালদার শ্রোতাদের একজন। তিনি বললেন, উঠব কি রকম? ভীমসেন বাঁশের মাথায় ঝুলতে লাগল—

ঝুলুক গে। সারা রাত ধরে ঝুলুক। আমাদের কি তাতে? মাংস ধরে গিয়েছিল, নতুন করে চাপাতে হল। রাত হচ্ছে বলে আপনারা সব উঠি-উঠি করছিলেন—গিন্নিমা বললেন, যাও, গিয়ে জমিয়ে রাখো গে, একজনেও না উঠে পড়েন।

বড় বড় দাঁত মেলে একগাল হেসে বলে, পেরেছি কিনা বলুন।

বিজয় ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন : নহুষ দাশ আছেন এখনো?

আমিই তো নহুষ দাশ। আত্ম-কাহিনী বলছিলাম এতক্ষণ।

বলেন কি! আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখে বিজয় বলেন, আপনি কুস্তিগির?

ক্ষেপেছেন? ভাল করে হাঁটতেই তো পারিনে—বাঁ-পায়ে একটু টান আছে, লাঠি ধরে বেড়াই।

আচ্ছা, লতা নামে সেই যে মেয়েটি—মশায় কি বিবাহিত?

নহুষ বলে, আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে—বলি, মেয়ে কি বঙ্গদেশে এতই সস্তা?

ডাক্তার রাগ করে বললেন, আগাগোড়া বানানো গল্প—তাই আপনি আত্মকাহিনী বললেন।

নহুষ বলে, আত্মকাহিনীর হিড়িক পড়ে গেছে ডাক্তারবাবু। নামি দামি লেখকমশায়রাও এই কর্মে কোমর বেঁধেছেন। লেখেন সব বানানো গল্প, নাম দেন আত্মকাহিনী। এই নামে কাটে ভাল।

সহজ ছন্দের হৃদয়স্পর্শী কবিতার সংকলন

কাব্য সুষমা

ইন্দু দাঁ দাম—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :
"কবিনিবাস"—"মমতা"
৫৯, পারমার রোড, ভদ্রকালী,
উত্তরপাড়া, হুগলী।

প্রভাত কার্যালয় :
২নি, নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলিকাতা-৯

নাম 'সুন্দরী'।

কে, কবে, কোথায় যে নামটুকু রেখে-ছিল, কেউ জানে না। কেউ জানে না, কবে, কোথায় কার ঘরে তার জন্ম। ও যেন 'আপনাতে আপনি বিকশিত'—হয়ে ওঠা সুরলোকের উর্বশী। প্রভেদ শুধু, উর্বশী সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্য আপনার মধ্যে পুঞ্জীভূত করে বিকশিত হয়ে উঠে-ছিল, 'সুন্দরী' বেছে নিয়েছে যত কুশ্রীতা, যত রকম আবিলতা।

নামটায় পর্যন্ত সেই সুর। বেসুর বলাই ঠিক। সব নিয়ে 'সুন্দরী' একটি প্রবঞ্চনা।

আমার প্রবঞ্চনাটা শুরু হয় নাম থেকেই।

সকালের জলযোগ নিয়ে টেবিলে বসেছি, উঠানের ওদিকে খিড়কির দোরে গুটি তিনচার ভীরু টোকার সঙ্গে কচি গলার একটি মিষ্টিডাক। বধূমাতা পাশে বসে ছিলেন, বললেন—'ওরে সুন্দরী' এসেছে, দোর খুলে দে।'

নাতনীরা মোটামুটি সুন্দরীই আমার, তবে নামের অলঙ্কার সাধারণই। একেবারে এরকম কোষমুক্ত 'সুন্দরী' নাম নিয়ে এ আবার তাদের কেমন সঙ্গিনী—বড়, মেজো, ছোট যারই হোক —কৌতূহলী দৃষ্টিটা দোরের ওপর গিয়ে পড়ল। 'এলো পোড়ারমুখী!'—বলে বড় নাতনীই এগিয়ে গেল। অন্তরঙ্গ সখীত্বের মধু ভৎর্সনা মনে করে আরও কৌতূহলীই হয়ে উঠেছি, সুন্দরী চৌকাঠ ডিঙিয়ে একপা ভেতরে এসে দাঁড়াল।

আমার ছোট নাতনীটির চেয়েও অনেক ছোট; বয়স, পাঁচ থেকে সাতের মধ্যে যে কোনটা। কালো, খর্ব, পেটটা একটু মোটা। মাথায় অবিন্যস্ত কাঁকড়া চুল, চাপা নাক, উঁচু কপাল। একটু ব্যতিক্রম, এই টিপি-কপালের নীচে, এখানকার আদিবাসীদের ধাঁচে চোখ দুটি একটু টানা, ভাসাভাসা; সেও পরিবেশের অসামঞ্জস্যে কেমন যেন কোথা থেকে চুরি করাই মনে হয়।

পরনে একটা ছোট ছেলের হাফ-প্যান্ট, ছেঁড়া, অন্তত দু সাইজ বড়, গায়ে একটা ঐ রকম ছেঁড়া শার্টজ, অন্তত এক সাইজ ছোট; মোটা পেটের ওপর বেশ একটু টাইট।

নাতনী দুখানা রুটি, কিছু তরকারি দিয়ে এসে বলল—'নে, খা। নিয়ে যাবিনি, খবরদার!'

'সুন্দরী'র হাতে একটা ভাঙ্গা সানকি আর এলুমিনিয়মের তোবড়ানো গেলাস। খাবারটা নিয়ে বসে গেল। বড় নাতনীর ফরমাসে ছোটটি জল দিয়ে এল।

ওরা চলে গেলে বধূমাতা আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—'বাপ-মা নেই। আদিবাসী, কি বিহারী, কি বাঙ্গালী কেউ জানে না। এখানকার পাঁচমিশুলি ভাষায় বোঝবারও তো জো নেই। চেয়ে চিন্তে খায়, দুবার আসে, হোল তো তিনবার। তবে একরকম আমাদের বাড়িতেই শুধু। আজকাল আর কেউ দিতে চায় না ওকে...'

প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইতে বড় নাতনীই জবাবটা পূরণ করে দিল, বলল —'ওমা, তা জানো না? এদিকের রাজ-কন্যের দিলদরিয়া মেজাজ যে! বিলিয়ে দেয়। জামা-প্যান্ট পর্যন্ত। নিজেদের বাতিল ব্লাউস, স্কার্ট কেটে ফিট করে তোয়ের করে দিয়েছি। রাজকন্যের দাতব্যে যায়। কপালে এই লেখা, কে কি করবে বলো?'

এই আমার সুন্দরী'-সন্দর্শনের প্রথম অধ্যায়। মাস আষ্টেক পরে যখন দ্বিতীয়বার আসি এখানে, তখন একটু পরিবর্তন হয়েছে, অবশ্য, ঐ কাঠামোয় যতটুকু সম্ভব। সেকথা বলবার আগে আর একটা কথা—

আমার ধারণা ছিল, সুন্দর অ-সুন্দরকে দেখতে পারে না, আলো যেমন দেখতে পারে না অন্ধকারকে। তারপর 'সুন্দরী'ঘটিত ব্যাপারটুকু দেখে এখন আমার মত বদলেছে, আলো আঁধারের সূত্র ধরেই। ভেবে দেখলাম, মিলিয়েও দেখছি, আলো তো অন্ধকারকে আলো-কিত করতেই চাইবে, নিজের দীপ্তি তার মালিন্যের মধ্যে ঢেলে দিয়ে।

দ্বিতীয়বার মাস আষ্টেক পরে যখন এলাম, তখন 'সুন্দরীর' যেন একটু পরিবর্তন হয়েছে। তবে, ঐ যেমন বললাম, ঐ কাঠামোয় যতটুকু সম্ভব: তার সে কতটুকুই বা? হয়তো আমার দেখারই ভুল। পেটটা একটু চেপে গিয়ে

থাকবে। নাক, মুখ, কপাল, রং, ছাট-পাকানো চুলের বোঝা—এসবের আর কত উন্নতি সম্ভব?

হ্যাঁ, অঙ্গাভরণের দিকটা যেন একটু ভালো। একটু পরিষ্কার, অনেকটা গায়ে ফিট করাও।

আরও একটা যা পরিবর্তন, তা আমায় একটু বিস্মিতই করল।

'সুন্দরী' এদিকে এসেছিল দুপুরে, ভাত খেতে। মাংস হয়েছিল। বধূমাতা মাংস আর দু-একটা তরকারি যা দিলেন—বড় নাতনীই দিয়ে এল—তার মধ্যে ভাতের সঙ্গে মাংসে বেশ পরিতোষের সঙ্গে খেয়ে, জল খেয়ে হাত গুটিয়ে আর একটু জল চাইল 'সুন্দরী'। বধূমাতা যখন প্রশ্ন করলেন—'তরকারি যে ফেলে রাখলি?'—বেশ সহজভাবেই একটু নাকটা সিঁটকে বলল—'ফ্যাক ফ্যাক করছে; কি করব?'

বধূমাতা বললেন—শুনলেন সেজো-কাকা?...আপনার বড় নাতনী এই রকম দাঁড় করিয়েছে। জামা শেলাই করে করে দেয়, আর ওদিকে...'

'হ্যাঁ, আর দিলুম! রাজকন্যের দাস-পুত্রের জন্যে!...'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। কোথায় কি যেন একটা রয়েছে যা চিন্তায় ধরা যায় না, বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ওর কথায় বললাম—'আহা, তা দিয়ে যা। রাজকন্যে—সে তো তোকেই পেয়ে দিদি।'

কিন্তু নাতনী যে শেষ পর্যন্ত এতটা এগিয়ে যাবে সেটা ভেবে উঠতে পারি নি। এইবার সেই কথাতেই আসি।

ওরই বিবাহ। আমি জোগাড়যন্ত্র করবার জন্যে কিছু আগে চলে এসেছি। পরে দিন কতকের ছুটি নিয়ে ওদের বাবা সবাইকে নিয়ে আসবে। যেদিন এল, আবার একটু বিস্ময়, দেখি, ওদের সঙ্গে বড় নাতনীর গা ঘেঁষে যেন একটু আড়াল হয়ে 'সুন্দরী'। আমায় দেখে যেন একটু গুটিয়েও গেল। ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠেই থাকবে আমার। তবে বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছে, ওরা আসতে, বিবাহবাড়ির আনন্দ-কলরবে একটা নূতন উচ্ছ্বাস এসে পড়েছে, তখন আর কোন প্রশ্ন করলাম না। 'সুন্দরী' অন্ততঃ সাজগোজে আর একটু পরিচ্ছন্ন, মিলিয়েই গেল সবার মধ্যে।

অবসর পেয়ে বধূমাতাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম—'কি করেছ বৌমা? ওটাকে নিয়ে এসেছ, কোন্ জাত, কি বৃত্তান্ত কেউ জানে না।-পথের ভিখিরীই তো? আমার কথা বাদ দিতে পার, তবে গিন্নিরা রয়েছেন, টের পেলে ...এদিকে তো দিব্যি মিশেও গেছে...

'কি করব মেজোকাকা? আপনার নাতনীর জিদ। না নিয়ে এলে আর যা বলেছে, আপনার না শোনাই ভালো।'

একটু ওদিকে গামছা-সাবান নিয়ে স্নান করতে যাচ্ছিল, চারিদিকে বিরে-বাড়ি—তাড়াহুড়া, নজর পড়ে যেতে ডেকে নিলাম। এসে দাঁড়ালে গলা নামিয়ে বললাম—'একি কাণ্ড করেছিস দিদি, সুন্দরীটাকে নিয়ে আসতে গেলি কেন?'

'এ্যাঁ!... সুন্দরী?'—একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল—'পাঠিয়ে দাও পোড়ারমুখীকে...'

'তা কি হয়? কে এখন তিনশ মাইল দূরে গিয়ে ওকে রেখে আসে বল?'

'আমায় বললে—কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে ওর আজকাল জান না তো—আমায় বললে—'কে আমায় খেতে দিবে? এসে দেখবি মরে পড়ে আছি।'

হঠাৎ চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। আজ-কাল বিষাদে-উল্লাসে এই রকমই হয়েছে ওর। 'পাঠিয়েই দাও।'—বলে হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিল? বললাম—দাঁড়া, শোন। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি—পাশের এক গেরস্তবাড়ির বাপ-মা-মরা মেয়ে, তোদের বাড়িতেই থাকে...

'তাই হবে।'—বলে মুখটা গোঁজ করে চলে গেল। বধূমাতাকে বললাম—'এইভাবেই চালিয়ে দিও কথাটা। এখন সদ্য সদ্য এসেছে, তবে পরে উঠবে কথাটা। মিটে যাবে'খন ঐতেই। আহা, ছেলেমানুষ, দেখত শুনত, কথাটা লেগেছে বুকে।'

মিটেও গিয়েছিল একরকম। বেশ মিলেমিশে গিয়েছিল 'সুন্দরী', তারপর সমস্যাটা এমন বিপুল আকারে হঠাৎ এসে দেখা দিল যে, বিবাহবাড়ির আর সবের মধ্যে 'সুন্দরী-সমস্যাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল।

বিবাহের দিনের কথা। বরপক্ষ আগের দিন সন্ধ্যায় এসে গেছে। সকালে দুদিকে 'আশীর্বাদ' হয়ে গিয়ে, গায়ে-হলুদের পাটও চুকে গেছে, মেয়ের মা হিসাবে বধূমাতার ওপরই চাপটা বেশি, একবার ছুটাছুটির মধ্যে হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে, এগিয়ে এসে নীচু গলায় বললেন—'আপনাকেই ডেকে দিতে বলছি তখন থেকে...আপনার নাতনী কী আর এক জিদ ধরে বসেছে, কী যে হবে!...'

মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

আমি কয়েক দিনে ওর মন মেজাজ অনেকটা বুঝে গেছি। অনেকগুলিকেই তো একে একে বিদায় করলাম। শান্ত-কণ্ঠেই বললাম—'এতো ঘাবড়াবার কি আছে? চলে যাচ্ছে মারা কাটিয়ে তার চেয়ে বেশি আর কি করবে?

—গলাটা একটু খাটো করে এলে থাকবে। আমার ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—'ব্যাপার কি?'

'এখন জিদ ধরেছে, 'সুন্দরী'কে নিদ্‌কানে করতে হবে, তা না হলে...'

'নিদকনে!...সুন্দরী!'

স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে গেলাম। তারপর আবার মনটা গুছিয়ে নিয়ে বললাম—'তাকে একবার ডেকে আনতে পারবে?'

'আমি নিজেই ধরে নিয়ে আসছি।'

'বেঁধে আনতে যেও না যেন। মনটা আজ ওর পালকাই থাকবে।'

বধূমাতা সঙ্গে করে নিয়ে এলে বললাম—'একি আবার এক উল্টুটে জিদ ধরে বসেছিস দিদি?'

'কি?'

—জানা কথাই। মুখটা গোঁজ করে রইল। বললাম—'সুন্দরী' নাকি নিদকনে হতে চাইছে?'

—একটু উলটে করেই বললাম।

'ও চাইবে কেন?'

'তবে?'

আবার মুখটা গোঁজ করে নিয়ে একটু আড়চোখে ওর মার দিকে চাইল। বললাম—'তুমি একটু বাড়ির ভেতর যাও মা। আমাদের নাতনী-ঠাকুরদাদার কথার মধ্যে থাকবার দরকার নেই।'

উনি চলে গেলে বললাম—'কি ব্যাপার বল্ আমায়। 'সুন্দরী' নয়তো তুই নিজে হতে বলেছিস?'

চুপ করে রইল। আলগা দিতে মুখ তুলেই দৃষ্টি আমার মুখের ওপর রেখে বলল—'একজনকে বেশ নিয়ে দিয়ে বিদেয় করছ, একজন একটু নিদকনে হয়েও মনের সাধ...'

ঝপ করে মুখটা গোঁজ করে নিল। টপটপ করে দু-তিন ফোঁটা জল মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

ধক্ করে বুকে লেগে কথাটা একেবারে স্তব্ধ করে দিল আমায়। কিছুক্ষণই মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তারপর আবার ভালো করে মনটা গুছিয়ে নিয়ে বললাম—'পাত্র যদি রাজি না হয়? টের পেয়ে যদি উঠেই পড়ে হঠাৎ?'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
(শ্রীম কথিত)
সাধারণ—৪৫৲ (প্রতি সেট) কাপড়ে—৫০৲ (প্রতি সেট)
শ্রীম'র ঠাকুরবাড়ী
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা—৬

তওক্ষণে ও-ও মনটা গুছিয়ে নিজে থাকবে। রূপ বেশ একটু জেরা ফাটিয়ে বলল—ইস, সাধ্যি তার?'

নাতনী-ঠাকুরদার সহজ সম্পর্ক ফিরে এসেছে। আমি একটু হেসেই বললাম—'ও, বুঝেছি, পাত্র নিজের চোখে দেখেছে, তারই জোর!'

'থাক ঠাট্টা, সে ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের ভাবতে হবে না।'

একটু চুপ করেই রইলাম। আর কিছু উপায় আছে?...কিছু তো মাথায় আসছে না আমার। বললাম—'বেশ, যা খুশি করগে। মাঝখান থেকে 'সুন্দরী' বেহাত করে না নিলেই হোল। এখনও তো একেবারে মুঠোর মধ্যে আসেনি।'

পরে টের পাই সঙ্গিনীদের গোপন সলাতে ভেতরে ভেতরে সব ঠিক করে নিয়েছিল।

আমায় ওরা 'বাসর ঘর' দেখতে নিমন্ত্রণ করেছিল, ঠাকুরদার সুবাদেই। সাজানো-গোছানো হয়ে গেলে গিয়ে দাঁড়ালাম দরজার কাছে।

বাসরঘর কখনও দেখা হয়নি জীবনে, দুঃখের বিষয় হোক, বা সুখের বিষয়ই হোক। দেখলাম, এ যেন স্বর্গের খানিকটা নীচে নামিয়ে আনা। রূপে, আলোয়, সুবাসে, সুবেশে, কিসে নয়? নাতনীর বিবাহ, সে-হিসাবে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে বাধা নেই। রূপের এমন রূপ কখনও দেখিনি। আর, একটা অভিনবত্ব—অন্য সর্বত্রই—নিমন্ত্রণে, প্রেক্ষাগৃহে—যেখানেই রূপের সমাবেশ, সেখানে রূপোর সঙ্গে আরও কিছু থাকে মিশে; বাসরঘরে রূপ থাকে যেন একটিমাত্র ভাব নিয়ে—উচ্ছল আনন্দের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরা। চোখ যেন ঝলসে যায়। কেউ কমল, কেউ গোলাপ, কেউ ডালিম, কেউ সূর্যমুখী, সবারই যেন একটি কথা—'আগে আমায় দ্যাখো'।

কাকে দেখি? কত দেখি?

তারপর যেন ক্লান্ত হয়েই দৃষ্টি এক-স্থানে আটকে গেল। তীব্র আলোতেই এতক্ষণ পড়েনি নজরে।

না, একেবারে অতটা করা হয়নি।

নিদকনে ঠিকই আছে নববধূর পাশে বসে। একটি ফুটফুটে বেশ আসর-সাজানো ছোট মেয়ে। ঘিন্নিমুখ ছুঁচলো, ডাগর ডাগর চোখ মেলে আছে তাকিয়ে।

তার একটু তফাতে...ও কে! 'সুন্দরী'ই না?

'সুন্দরী'-ই তো!

অত ফুলের সমারোহের মধ্যে 'সুন্দরী' যেন একগাছি অপরাজিতার মালা; একটি সোনার থালায় জড়োসড়ো করে রাখা। একটি হলদে রঙের শাড়িতে মোড়া। কালো রঙের ওপর পাউডারে অপরাজিতারই নীল আভা ফুটে বেরিয়েছে। কিছু কনে-চন্দনের ফুটকি, চুলগুলো আঁচড়ে একটা জরির 'বো'। তাতে আর কতটুকু হয়?

কিন্তু একটা বিষয়ে 'সুন্দরী' অনন্যা, সত্যই অ-পরাজিতা—

যেখানে আর সবার মুখে একটিমাত্র ভাব উদ্বেল, একটি ফুল একটিমাত্র ভাব নিয়ে ফোটা, সেখানে 'সুন্দরী'র মুখে হর্ষ, লজ্জা, আশা, আশঙ্কা, এতর মধ্যে যেন নিজেকে নূতন করে পাওয়ার বিস্ময়—আরও কিসব ভীড় করে রয়েছে বুঝে ওঠা যায় না। থৈ পাওয়া যায় না।

'সুন্দরী' আর সবাইকে দিয়েছে নিষ্প্রভ করে।

ঠিক যেমনটি চাই!

পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদের তৈরী আপনার একান্ত নিজস্ব ফ্ল্যাট অথবা বাড়ী।

সুলভ মূল্যে সহজ কিস্তিতে চমৎকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ আপনার হতে পারে। ২৫০০টি এইরকম ফ্ল্যাট তৈরী করে বিক্রী করা হয়েছে। আরও ২৫০০টির কাজ প্রায় শেষ।

পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ
১০, ক্যামাক স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৭

CA/HBD/78

কবিতা

মুড়িমুড়কি খই ॥ বিষ্ণু দে

থেকে থেকে নিসর্গই ডাক দেয়,—
মানবজীবনে তাই একমাত্র স্বাভাবিক,
কি বয়সে কিবা রোগে!
তা না হ'লে মৃত্যুরই কোথায় বা নিজ সম্পূর্ণতা?
বলো হে সঞ্জয়!

ধরনধারণ দেখে চেখে, চেটে, শুনে,
আর সর্বত্রই কমবেশি ভুক্তভোগে
সবেতেই মনে হয় সকলেরই সন্দেহ সংশয়।
কি বলো হে? ইতরতা বিশ্বময়?
সকলেই যে বিশ্বের একান্ত কাঙাল!

তার নির্বুদ্ধিতা অদ্ভুত ব্যাপ্তিতে ও প্রাবল্যে
শুধু মানুষকে নয়, সসাগরা পৃথিবীকে
বিষাক্ত যে সে ঐ
নির্বোধ কারণে আর হয়তো বা
ধর্মীয় ভাষার ঘোরা মুখে বললে বলতে হয় :

মুখ্য পাপে আমরা তোমরা সকলেই দায়ী
আর সকলেই বিশ্বরূপ ঐ মুখে দেখে
আর লুব্ধ শোকে খায়—
যে যেখানে পায়—হাড়গোড় মাথামুড়ু
মুড়িমুড়কি খই।।

ক্ষরিত মৃত্যু ॥ মণীন্দ্র রায়

আমাকে গ্রাস করার আগেই
তার চোখের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম
পায়ের তলার বালি।

মেহগনির শরীরে তারপর আমি
দাঁড়াতে চাইলাম শত শিকড়ের স্পর্ধায়;
বুকে চোখ বসানো কবন্ধের বিপুল হাত মেলে
ছুটে এল সে ঝড়ের নিশ্বাসে।

সভয়ে ডুবে গেলাম আমি হাজার ফুট সমুদ্রে
তারা-মাছের রূপকথায়;
স্তব্ধতার বুকে লেজের ঝাপট মেরে
সামনেই জেগে উঠল তার ঘনিষ্ঠ অন্ধকারের
তিমির চোয়াল।

ফিরে এলাম তখন আমার
আদ্যিকালের এই টেবিলেই—
ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে
কবিতার একটা লাইন,
আর সেও ধরা দিল তার দ্বিতীয় লাইনের চুম্বকে।

প্রাণঘাত এই আমার খেলার
ক্ষরিত মৃত্যুর লাল পাথর দিয়ে
আংটি তৈরি করো না।

হিংসে ॥ শুভাষ মুখোপাধ্যায়

যাবার আগে মিটিয়ে নেব
যার যার সঙ্গে আড়ি

উঠলে ঝড় ছুটব বাইরে
তারপরে তো বাড়ি

ঠিক করি নি কিসে যাব
হেঁটে না সাইকেলে

ঝুনঝুনালে পকেটে পয়সা
মাটিতে দেব ফেলে

মাটি কাঁপছে, কাঁপুক—
চল্ রে ঘোড়া,
হাতে তুলেছি চাবুক

মুখপুড়িটা তাকাচ্ছে দ্যাখ,
বলছে, আ মর্ মিনসে

ও কিছু নয়, বুঝলি না রে
হিংসে হিংসে হিংসে।।

শিয়রের তারা আর দেখা যায় না ॥ অরুণ মিত্র

শিয়রের তারা আর দেখা যায় না, ভালোবেসে
সসাগরা পৃথিবীর খেলনাটা সে
বোলাত চোখের সামনে। তখন কি দেয়ালা!
তাকে খোঁজা মানে বিস্তর পিছিয়ে যাওয়া
পলিঘুঁজি ভি-আই-পি শড়ক ধরে বরাবর;
একটুখানি রোদ হয়তো আড় হয়ে পড়ে থাকে
যেখানে রাতের মুখ টেনে নেয় মাঝখানের কথাগুলো;
সবই নিস্তব্ধতা। তবু এক সরু জল
হিরণ্ময় যেন রক্তধারা, সে ঠিক নিয়েই যায়
প্রথম স্পন্দনে। ঐ তো রওনার চিহ্ন!
অতঃপর হাতড়ে হাতড়ে ফেরা অত পথ, যার
দুধারে পাঁচিলে কাঠে মৃত চোখ আঁকা।
সামনের ফটক বন্ধ। বেরিয়ে পড়বার সেই
সংকেত কি ফুটে আছে আদিম আকাশে?
পাল্লা নাড়া দিলে আবার পুরোনো শব্দ
ওঠে, উঠে ডুবে যায় চন্দ্রাচরে।

অরণ্যের প্রাণীরা

দিনেশ দাস

আমরা আলোর প্রাণী। ওরা অন্ধকারের :
আমরা দিনের, ওরা রাত্রির।

বনেজঙ্গলে গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে
কত শত লতাপাতা গাছপালা,
শাল-সেগুনের পাতাগুলি দুলছে হাতির কানের মত :
সাপ, ব্যাং, শেয়াল, কুমির, হরিণ, নেকড়ে
মিশে আছে প্রকৃতির শরীরে।
আমরা যেন ঘরছাড়া, বিশৃঙ্খল।

ওরা অন্ধকারের জীব, আমরা আলোর সংস্কৃতির।
পশুপাখির সংস্কৃতি নেই, কে বলল?
ওদের মধ্যে হয়তো কালোয়াতের জন্ম হয়নি
কিন্তু ওদের বিচিত্র কণ্ঠ
কবি-শিল্পীদের নিত্য প্রেরণা দেয়।

যেমন ক'রে গাছের পাতা সূর্যের আলো পান করে
তেমনই অরণ্যে হিংসার জিভ দুর্বলের রক্ত শোষে,
কিন্তু তা একান্ত জৈবিক প্রয়োজনেই,
মানুষের সুলভ হাততালি কুড়োবার জন্যে নয়।

ওরা রাত্রির প্রাণী, আমরা দিনের আলোর :
ওরা কিন্তু উন্মাসিক নয়,
ওরা জন্ম থেকে ভদ্র ব'লে
কেউ অপরের ব্যাপারে নাক গলায় না,

তাই জঙ্গলে ওদের কাছে এনে
আমাদের উঁচু কপাল নীচু হয়,
প্রাচীন ভালবাসার একটি অনুভূতি
স্নিগ্ধ মেঘের মত আমাদের মনে ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা আলোয় বাস করি, ওরা অন্ধকারে :
প্রকৃতির নাড়ীতে-গড়া ঘরে
ওরা নির্ভুলভাবে ঘোরেফেরে,
কিন্তু আমরা যখন অরণ্যের অন্ধকার থেকে
আলোর জগতে ফিরে আসি,
তখন নিজেদের চেনা-ঘরই খুঁজে পাই না।

কিন্নক ॥ হরপ্রসাদ মিত্র

বাঁয়ে বোধাবাঈ-মহল, সামনে বীরবল
লাল পাথরের বড়ো গম্বুজী বাড়িটায়
থাকতেন নাকি থাকবেন, কথা ছিল কী?
কে জানে কেমন ছিল ফতেপুরশিক্রি!

এখন সবুজ টিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে,
দেবদারু ধরে গাঢ় সবুজের ঝংকার!
রোদে ঝলমল রাঙা পাথরের জাফরি,
পশ্চিমে ঢালু আকাশ ডুবছে খসরে,
ডাইনে যেখানে এখন বাগানে দোপাটি,
ক'বছর আগে সে ছিল গোলাপ-চত্বর।

ঐ দেখা যায় চারগম্বুজী বাড়িটা—
যা দিওয়ানীখাশ ছিল আকবর-বাদ্‌শা'র।
এবং আরও দক্ষিণে আমদরবার
লাট-কার্জন ভাঙা জাফরিটা সারিয়ে
কার গৌরব হারাতে নারাজ কে জানে,
কে জানে কেমন ছিল ফতেপুরশিক্রি!

শিশমহলের আঙুরলতার সামনে,
পাঁচমহলের প্যাগোডার পাঁচতলাতে,
প্রমোদ-কূজনে মেলে কতো মন বারবার,
আহা ইহকাল বিগত দিনের দর্শক!
আনমনে সেই উঠোনে দাবার ছকটার
দেখি নেই আর সুন্দরীদের মূর্তি।
ক্লিক ক'রে যায় কার হাতে কোন্ ক্যামেরা
এক ফোটাতেই বেদনা এবং ফুর্তি।

কী জানি কেমন ছিল ফতেপুরশিক্রি!

পুরোনো শিরায় ॥ শঙ্খ ঘোষ

তোদের জন্য রাখিনি উঠোন
আমার তো ছিল মাঠ
নিজেকে সেদিন মনে হয়েছিল
অদম্য সম্রাট!

তোদের দুপায়ে বেঁধেছি শিকল
পদ্মা ছিল আমার
এখন যদিও চূড়া পড়ে গেছে
চরে পড়ে আছে হাড়।

তোদের মুখের নিষ্ফল ছায়া
ওড়ে বিকেলের দিকে—
পাঁজর? না কি ও লোহার গরাদ
ঘিরে আছে বন্দীকে?

আমার আঙুলে লেগে আছে আজও
সব সনাতন প্রথা
দুই হাতে গড়ে তুলিনি কিছুই
এত ছিল অন্ধতা!

শুধু বসে দেখি জলের আড়ালে
তোদের চোখের ঘৃণা
বহু বছরের পুরোনো শিরায়
টংকার তোলে কি না!

যেমন উদ্ভিদ ॥ অরুণ সান্যাল

কিছু আছে অন্তরালে প্রত্যাশাপীড়িত ক্ষুধা,
যেমন উদ্ভিদ? নাকি নাই?
ওষধি ও বুনো গুল্ম ছেয়ে যায় শ্যাওলা-ধরা
ভিতে ও গাঁথনিতে।
রঙিন কাঁচের মধ্যে সূর্যালোক, বাগানে মার্বেল নারী,
জোয়ারায় উচ্ছ্বসিত হাসিতে ছিল অলোকসামিনী তারা
ভীরু পা জাজিমে কবে দেখেছিলাম, এখন খাঁ খাঁয় দেখছি
অনামা লতায় ডৌলে নখর আল্পনা আঁকা
রেণু বৃষ্টি চুঁয়ে থাকা সবুজ দেয়াল।
মনে পড়ছে, তাহলে কি আমারো বুকের মধ্যে বিষ ছিল
তক্ষক নিঃশ্বাস পাতে গোক্ষুর ফণায়
দ্রুত ছোবলে চলেছে চলচ্ছবি
নারীর চিবুক, পায়ে আলতায় পুরুষবুক চিরে দেওয়া নখ

কিছু কি তাহলে আছে অন্তরালে, অন্ধকারে,
কে জানে, কি জানি
আমারো কি জানা ছিল মানুষ আগ্রাসী হয়ে
আবিশ্ব উদ্ভিদ তরুময়?

বুকের গহন স্তরে অরণ্য জাগর থাকে ছায়াচ্ছন্নতায়,
থাকে পাথর পাহাড়,
হঠাৎ বিদ্যুৎ লাফে উপত্যকা পার হয়,
ডিঙোয় ঝর্ণার সিঁড়ি
হয়তো বাঘের দাঁতে জয়ী হয় কিংবা হয় না,
মধ্যরাতে চাঁদের খিল খিল হাসি পাখির ডানায় হাসে
শিঙে তাকে বিঁধে নিয়ে বটের ঝুলন্ত ডাল ভিক্টি গ্রাফ
হাঁ-মুখে খেলায়

কিছু অন্তরালে আছে প্রত্যাশাপীড়িত ক্ষুধা,
যেমন উদ্ভিদ? নাকি গাছ?
হঠাৎ দক্ষিণ থেকে ঝরাপাতা তাড়িয়ে দৌড়িয়ে আসে
বুনো মোষ লবণ উৎসারে,
মাঠময় ঝরে রর গুঁড়ো গুঁড়ো পাহাড়ের হাড়
মানুষ তা পলি বলে, কেবল নদীই জানে
পাথুরে দেয়াল ভাঙা শ্রম

পাখি জানে, হিমবাহ কেন সমতলে যায় কেন বহে যাওয়া
শিশুর টলমল হাঁটা থেকে ক্রমে যুবতীর পায়ের পাতায়
মলো স্রোতে
যেমন উদ্ভিদ।

ফুল ফোটা পর্যন্ত কৃষ্ণ ধর

উড়নচণ্ডী হাওয়া সব ঝরাপাতা ঘূর্ণিতে ওড়ায়
ন্যাড়া গাছটা শহরে গলির মোড়ে খালি মাথা নাড়ে
তার নিচে বসে থাকে ভিখিরি মেয়েটা
কোথাও নড়ে না সে এখানেই আস্তানা বারোমাস।

একদিন দস্যিপনা থামবে হাওয়ারও
খর রোদ্দুরের জ্বালা জুড়োবে বর্ষার জল
ন্যাড়া গাছটার ডালে গজাবে নতুন পাতা
ফুলটুল পাখিরাও আসবে সম্ভবত।

সে আশায় দিনভর রাতভর তার বসে থাকা
ন্যাড়া গাছটার তলায় শহুরে গলিতে
কখন ফুটবে ফুল পাখিরা ফিরবে সন্ধ্যেবেলা
হাড্ডিসার মেয়েটা বারোমাস
মড়া আগলে পড়ে থাকে যেন

বিষনীল লখিন্দর জামার আশায়।

একটি চলচ্চিত্রকে মনে রেখে ॥ মৃণাল বসু চৌধুরী

বলেছিলে—
যখন চাঁদ
তার তৃষ্ণার্ত হলুদ গাধাদের নদীতীরে ছেড়ে দেয়
যখন পুবকোণ থেকে আসা আলোয়
সমস্ত অরণ্য জুড়ে ফুল ফোটে
সেই নীরব প্রত্যুষে.....
তখন

উন্মত্ত সূর্যের প্রতারণায় ক্লান্ত শরীর
তোমার বন্দনা স্তোত্রের ভাষা খোঁজে
মরুভূমি পেরিয়ে ধর্মকাম পদযুগল
পশুতীর্থের দিকে যেতে চায়
পক্ষপাতী অন্ধকার ঢেকে রাখে যজ্ঞস্থান
হোমাগ্নি জ্বলার আগেই উত্তরীয় খসে পড়ে
নেমে আসে নির্বাসিত ঘুম

আর সেই পরিপূর্ণ ঘুমের ভেতর
প্রতিদিন আরো দূরে চলে যায় আকাঙ্ক্ষিত উষা
চলে যাও তুমি আমার
নিঃসঙ্গ প্রাচীন ইহকাল

অ্যান্টিক ॥ নবনীতা দেব সেন

দুটো একটা খুলে ফ্যালো
ফেলে দাও ক্ষয়া বল্টু-নাট
অকর্মণ্য বল-বেয়ারিং। জামেয়ার শাল নয়
যন্ত্র মাত্র। রিফুর ওপারে।
যা-ই পুরাতন, হায়, তা-ই নয় মহার্ঘ, জগতে।

যদি পুনর্জন্ম চাও, ফেলে দাও
ব্যবহৃত যকৃৎ, ফুসফুস, বানাও নতুন।
বুকে ভরো তরতাজা শ্যামল মোবিল
ব্রেকে ও গীয়ারে ঢালো তাজা তেল।
বডি রং করো। শৃঙ্খল, শলাকা, দণ্ড,
চক্র ও বন্দুক—সমস্ত বদল করো।
বডি ও এঞ্জিন—দুইই ফিট্ রাখা চাই,
ঝকঝকে মসৃণ লোহ, নিটোল, নিখাদ।
জীবনযাত্রার দায়ে, দুটো একটা মর্চে-ধরা পার্ট
ফেলে দাও, প্যাংক্রিয়াস, হার্ট...

দুঃখ শুধু যা-ই অভিনব, হায়, তা-ই নয় মহার্ঘ, জগতে।
চিররক্ত স্রোতে
যন্ত্র-যন্ত্রী সব ঝরে যায়
কেবল ত্রিকাল জুড়ে অনিরুদ্ধ
স্মৃতিই স্বরাট্।
দীপ্যমান স্মৃতি ঝলসায়।

আমায় তুমি অভয় দাও

রাম বসু

আমায় তুমি অভয় দাও

ভিতরের দিকে তাকাতেও ভয় করে
আহত স্বর্গ, বিস্ফোরণের ধোঁয়া
গলা টিপে ধরে
বিদ্যুৎ নখে খোঁটে
পক্ষকোরক, কাতর দু' চোখ ডোবে
কাদায় লাড়ায় গলিত হীরায়, ভাসে
পুষ্পের শব, স্তব
ভিতরের দিকে তাকাতেও ভয় করে

আমায় তুমি অভয় দাও

মহাকাশে ঢেউ, আলোকিত চরে শঙ্খ
শূন্যের দোরে টোকা দিয়ে সরে যায়
এদিকে পাহাড় সিংহের ডাকে ফাটে
কর্কশ জিভে চরণচিহ্ন চেটেপুটে নেয় ধুলো
ময়লা আকাশ দগদগে ঘায়ে, মন
অনাথ, নিরাশ্রিত
পায়ে পায়ে হাঁটে সন্ধ্যার দিকে একা
ভিতরের দিকে তাকাতেও ভয় করে

আমায় তুমি অভয় দাও

করবো কি করে? দর্পণ পারা-ঝরা
রূপ রূপহীন কিছুই ভাসে না, ফাঁকা
জ্যোতিচক্রের আবর্তনের বিম্ব
কপালের মরা তুলসীতলায়
গিরগিটি হয়ে বুকে হেঁটে যায়
অবসাদে দেহ ঝড়ে ভাঙা বাতিঘর
মরিয়া সাগর প্রহেলিকা-আলো মাখে
ভিতরের দিকে তাকাতেও ভয় করে

আমায় তুমি অভয় দাও।

শহীদ ॥ গোপাল ভৌমিক

এক বুক গ্লানি নিয়ে পথ চলা
রোজ বুকে হাঁটা
অনেকের ধাতে সয়
তাইতো জীবন চলে হোক না খুঁড়িয়ে।

কচিৎ কখনও কেউ অসন্তোষে ভুগে
অন্য কোন মানে খোঁজে,
ভালবাসে যাকে তার
সব কিছু নিজ রঙে নেয় সে ছাপিয়ে।
ক্লেদমুক্তি চায় যদি ভালবাসা
পায় কি সহজে?
বুকে হাঁটা বাধা দেয়
কে যেন চোখের থেকে কেড়ে নেয় নিদ।

বাঁধা বুলি কপচাতে পারে না সে বলে
বেদনায় নীল হয়
এবং তারপর পথ বেয়ে
যন্ত্রণার হাত ধরে হয় সে শহীদ।

ভিয়েনার স্মৃতি

মানস রায়চৌধুরী

১ পাথরের জানলা খুলে বুকে আসে আলো
বলেছিলে, এইভাবে রাত্রি শেষ হবে,
এখন পাখির মতো সকলেরই চোখে দীপ্ত আভা
তার ঠোঁট উচ্চারণ করে—
'কই তুমি? কোথায় তোমার উষ্ণ মুঠি?'
এই তো কাছেই আছি—এই বনে ঘরে এসে পড়ি
আশ্চর্য জানলার মতো আলোর ভুবন খুলে দিলো
অনন্তে ঝাঁপিয়ে পড়ো, দুবাহু তোমাকে নেবে বুকে।

২ টুপি খুলে বাইরে চলে যাই
যেখানে এখন ক্রুদ্ধ তুষারের তৃণে
পশমের আস্তরণে ঢেকে ফেলি হাড়
এভাবে দুর্ভাগ্য ঢাকা পড়ে.....
পিছনে তোমার মুখ উষ্ণ রাখে টেবিলে মোমবাতি
এক সারি পানীয়ের কাঁচ
শূন্য, শূন্য, শূন্যতায় যেন
শীতরাত্রি করে তোলে হেমন্ত হলুদ
আমার যাওয়ার পথ উধাও উদ্ভীন
কার কাছে ত্যাগ স্বীকারের কথা বলি,
তুমি রান্নাঘরে নীচু উনুনে রুটির রঙ দ্যাখো
'যদি ফিরে আসি ভোর হবে'—
অন্ধকার জানালায় অভিমানে সমাচ্ছন্ন চাঁদ।

পুঁজি ॥ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

পাবার আশা তো ছেড়েছি অনেকদিন,
হারাতেও তাই মন যে শঙ্কাহীন।

খেউড়-মণ্ড মত্ত মাকাল-শাখে,
মেলা-প্রাঙ্গণে খেলা দেখাবার শখ,
বহির্বিশ্বে বিশ্বাধরার ডাকে
বামাক্ষ্যাপা উদ্দণ্ড উদ্দালক!
হইচই আর হাঙ্গামে ডোবে গলা,
দিনেমার দিশা দিগন্তে নির্জলা!

পাঠিয়েছিলাম তাকে তো অনেক চিঠি,
তারপর গেছি বাগান দেখতে কত,
কখনো নরম, কখনো বা উদ্ধত
দিয়েছে জবাব বহুরূপী গিরগিটি!
সামনে তো নয়, পিছনেই হবে বুঝি—
মনে পড়ে আজ—হারিয়েছে সব পুঁজি!

কেন ॥ বিজয়া মুখোপাধ্যায়

আসে, থাকে, যায়, চলে যায়
আর আসে না, কখনও আসে না।
বিশ্বাসে ভরে না মন
অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চা দেয় না প্রমাণ
কেন যায়, কেন যায়, কেন?
আমরা কারণ চাই, যুক্তি চাই, হাতে-নাতে বোঝা
বোঝাতে পারে না শাস্ত্র, কি মানুষ,
অথবা প্রকৃতি
ছেঁদো কথা ভরা ঝুলি, অনুভবহীন বোধ
ভয়ার্ত বিহ্বল।
অকালে প্রস্থানদণ্ড কেন পাবে নিদোষ জাতক,
অনিয়ম কেন তুলবে প্রায়ই তার ভয়ংকর হাত?
আমরা বিচার চাই
আমরা কিছু গো-মূর্খ মানুষ
যে-আমরা বুঝি না কেন কেউ কেউ কখনও ফেরে না।

দুঃখ ॥ শান্তনু দাস

তুমি অনায়াসে সরিয়ে দাও দুঃখ,
মানে দুঃখের শরীর
যেমন বেলা পড়লে শরীর থেকে সরিয়ে নিই শীতের পোষাক,
যেমন চড়ুইভাতির পর অনায়াসে রেখে যাই—
বিপন্ন উনুন।

ভালোবাসার আরেকটা নাম কি কেউ দিয়েছিলো
দুঃখ?
সেকি ঈশ্বর, না মালতী না পারুল?
সবার বুকের মধ্যে দুঃখের খাঁজে
চাঁসনালার মতো হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়বে জল,
না কি দেয়ালের ধ্বস ভেঙে অশ্রু।

আসলে তুমি-ই, মানে মালতী বা সন্ধ্যা, পারুল,
তোমাদের চুল বুক জরায়ুর গোপন দেরাজে
কুয়াশার মতো কিছু দুঃখ জমা থাকে,
যাকে ঘিরে সুখের শরীর।
তাই কি উড়িয়ে দাও, শরীরের ভাঁজ থেকে
নরম পালক?
যেমন বেলা শেষে বিপন্ন উনুন।
শীতের পোষাক।

নিজেকেই গুণ টেনে নিয়ে যাও তুমি,
হাতে নিয়ে দুঃখের পারানি।

ভূগোল পড়া ॥ রত্নেশ্বর হাজরা

পৃথিবী আকারে গোল—ঠিক ঠিক গোল নয়
কমলালেবুর মতো দুই দিক চাপা
এমতো সিদ্ধান্ত আছে কপাটের পাশে রাখা
একখণ্ড বইয়ের ভিতর—
ভূগোল পড়েছি কবে ছেলেমানুষের মতো—
মুখস্ত করেছি, কিন্তু এখন সে, বয়স মনে নেই
ঈষৎ ছায়ার মতো সত্য ও মিথ্যায় মিলে
সে-সকল প্রতিপাদ্য ভূগোলেই আছে।
কোথায় গমের ক্ষেতে গম ফলে খুব বেশি—শেফিল্ড কোথায়
আজ মনেও পড়ে না
বরং গমের ক্ষেত কখন সোনালী হবে
সেকথা জানার জন্য পাঠাই পাখিকে—
পঞ্জিকার পাতা খুলে দেখে নিই ভূমণ্ডলে
প্রাকৃতিক মহিমায় সেটা কোন মাস
এবং ঋতুর কথা জেনে নিতে ভালো লাগে
রোদ্দুরের স্বাস্থ্য দেখে ফেরার সময়।
দেখি ভূগোলের পাতা শ্রাবণ বৃষ্টিতে ভেজে
উড়ে যায় নৈঋতের মৌসুমী প্রবাহে ভিজে ভিজে
শেফিল্ড শহর জুড়ে ছড়ায় তৃণের ভূমি—তার মধ্যে ছুটে যায়
বাচ্চা সহ অলৌকিক ঘোড়া.....
ভূগোলের বই থাকে কপাটের পিছে পড়ে
পৃথিবী কেমন গোল পৃথিবীই জানে
কমলালেবুর রঙ শহরে হলুদ হয়—জেব্রা লাইন মুছে দিয়ে
ছেঁড়া মতো হেঁটে যায় সরলবর্গীয় বনভূমি।

সৃষ্টি ॥ সুশীলকুমার গুপ্ত

জানি—সে তোমারই সৃষ্টি। বেদনার রুক্ষ মাটি কেটে
তুমিই করেছ তাকে প্রজাপতি, তোমার বাগানে
ফুলে ফুলে খেলিয়েছ, নিয়ে গেছ গূঢ় অভিযানে
বিচিত্র হাওয়ার পথে, যেখানে আকাশ ঘরে ওঠে
মেঘরৌদ্ররসায়নে ফোটাতে স্বপ্নের শিল্পকলা;
তারি স্পর্শে জাগিয়েছ জীর্ণ বেড়া, ঘাসের কঙ্কালে
বর্ণের সমুদ্র; যত দ্বিধা ছিল ছায়ার আড়ালে
গড়েছ তাদের দিয়ে চেতনার আশ্চর্য মেখলা।

আজ তাকে কেন তুমি দিলে ঠেলে রূঢ় উপেক্ষায়?
সে কঠিন হিমে কাঁপে আবর্জনা স্তূপের শিখরে,
শীর্ণ ম্লান হ'য়ে শুধু নাড়েচাড়ে অতীতের স্মৃতি।
অন্যবিধ খেলা নিয়ে তুমি মত্ত সুবর্ণ তুফায়;
প্রচ্ছদ যতই হোক দীপ্ত তবু শূন্যতা অন্তরে,
অথচ তাকেই নিলে হতে পারে শ্রেষ্ঠ কারুকৃতি।

মানচিত্র ॥ প্রতিমা রায় সেনগুপ্ত

ভোরের ঘর মুছে ফেলে পুরোনো স্মৃতির টুকরোকে
পরিত্যক্ত মৃতদেহে ঝুলতে থাকে কার্ণিশ-পোড়া পাখা।

তেমনি করেই

স্রোতের মধ্যে অনিশ্চিত কিছু ঢেউ এসে
ভরিয়ে দিয়ে যায় হৃদয়ের খাঁড়ি খুপরিগুলো।

মাঝখান থেকে
সৃষ্টি হয় কয়েকটি জল-বিভাজিকা বন্ধ্যা আর চোরা পাহাড়।

কে তোমায় বলে দেবে

পলাশ মিত্র

কথার সোহাগে নয় বুকের উত্তাপে এসো কাছে।
কতোবার বলেছি তো
মাটিতে জলের রেখা দেখা যাবে
মাটির কাছেই যদি থাকো ঃ
নির্জন সন্ধ্যায় তুমি
তরঙ্গিত কোলাহল কেন যে জাগাও
কে তোমায় ব'লে দেবে?

মন্দিরের ঘণ্টা বাজে
প্রার্থনার হল বুঝি শেষ ঃ
নবীন প্রেমিক আজ পূর্বমুখী
নীরব স্তম্ভিত রূপে।

তোমার বাগানে ফুল ঝ'রে যায় ঘনিষ্ঠ সকালে
অন্তরঙ্গ মাটিতেই লগ্ন হয়ে থাকে সবকিছু।
কে তোমায় ব'লে দেবে?

যদি তুমি ॥ গৌতম গুহ

যদি শব্দগুলি নিয়ে চলে যাও
আজীবন যে শব্দ রক্তে ফুটেছে, যে শব্দ একে একে
যুদ্ধে জেতা রাজার মুকুট
শোভায় বিভায় তুলনা পাওয়া ভার
এই দিব্য বিভাগুলি যদি তুমি চুরি করে খিল খুলে
দূরে চলে যাও—

আমার আকাশে অমলহৃদয় এক পাখি উড়ে উড়ে
শব্দ দিল এক।
একবার জ্যোৎস্নার দিনে নির্জলা উপোসী মা ডেকে বলেছিল
বকু দুটো বাতাসা কিনে দে—
স্নেহাদেশ কণ্ঠস্বরে অবিনাশী কত শব্দ উড়ে এল যেন
মায়ের বাতাসার মতো মিষ্টি শব্দগুলি এখনো রেখেছি
আশা আছে সসাগরা এ-পৃথিবী
একদিন আনন্দলাবিনী হবে

রক্তহাতে গুণ্ডার মতো শব্দগুলি তুমি ছুঁড়ে দাও
বিষাক্ত জঞ্জালে।

স্বপ্নের মেরুর ওপারে

রুদ্রেন্দু সরকার

ভালোবাসার উষ্ণ স্রোতে তুমি ভেসে গেলে
প্রত্যয় আর স্বপ্নের মেরুর ওপারে—
যেখানে ভালোবাসা নীড় বাঁধে
সেই কুয়াশা দ্বীপের খোঁজে
তুমি কত কালি ফুরিয়েছিলে?—

এখন স্তব্ধ রাত্রি
হিংসা-প্রতিহিংসার দ্বন্দ্বযুদ্ধে
অতীত কমলালেবুর স্মৃতি বিষণ্ণ মলিন—
আকাশের নীল টেবিলে
জ্যোৎস্নার বন্দী হবার সময়
উৎসুক সেই দৃষ্টিগুলো আপসা দিশাহীন।

হঠাৎ বাগানে ফোটা ফুল
প্রত্যয়ের রঙে লাল গোলাপ,
আর বিষণ্ণ মনের স্মৃতি পলাশ,
পাশাপাশি স্নেহ বিনিময়ে স্থির এখন।

না, এ প্রতীক

পরেশ মণ্ডল

টানলে রেখা, দিলে রঙ,
জেগে উঠল পথ—পথের মতো,
তার বুকে ইচ্ছার টেরাকোটা,
বয়ে চলল নদী,
তার জলে আত্মজ ছলনা।

পাথরকে পাথর বলেই জানি,
তুমি বললে, না,
এ প্রতীক।

বয়ে চলল নদী, জেগে উঠল পথ,
পড়ে রইল পাথর।
জীবন বহতা, অভিব্যক্তি
স্থবির শপথ।

ঐ দিনটা ॥ মৃগাঙ্ক রায়

ব্রীজের নিচে
দূরপাল্লার ট্রেন হুইশিল বাজায়
আর আকাশের কানায় কানায়
উথলে ওঠে দুঃখের ফেনা।
ছেলেটা দাওয়ায় বসে ধারাপাত পড়ে,
কাক ডাকে, পিঠকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে
হাই তোলে পাড়ার কুকুরটা,
থানায় মন্থর ঘণ্টা বাজে।

ভোর। সোহাগী বাইজীর জানালায়
চৌকো আলো নিভে গেলে
পাঁড়েজী খড়ম পায়ে গঙ্গাস্নানে যায়,
ঘরের চাবিটা গলায় দড়ি দিয়ে
নাভির মুখে ঝুলে থাকে।
ছেলেটা একমনে পড়ে।
কাক ডাকে।

একটু পরে আরও কয়েকটা ট্রেন
হুইশিল বাজিয়ে চলে যাবে,
মাঠের মধ্যে পুকুরটা
হীরে-বসান আংটির মত ঝিলিক দিয়ে উঠবে,
লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে পৃথিবীর ওপর;
একটু পরে কাগজের সুদর্শনচক্র হাতে
যুদ্ধ খেলতে যাবে ছেলেটা।

ও ট্রেন, ছেলেটাকে তুই নিয়ে যা,
নইলে ঐ যে ঐ দিনটা আসছে
ওই একদিন গিলে খাবে ওকে।।

ঈশ্বরী পাটনী

দীপেন রায়

মৃত্যু আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল হাওড়ার ব্রিজে
বলেছিল—ওই জল
সমুদ্রের অগাধ অতলে নেমে গেছে ঃ
দে তুই ঝাঁপ দে।

দেখতে দেখতে কমলে-কামিনী
সেই উচ্ছ্বসিত ফেনা
সব অন্ধকার গিলে ফেলে
উগরে তুললো জগন্নাথ ঘাটে
বিশাল ঢেউয়ের চূড়ায় ভাসমান জীবন্ত শরীর।

যেন শুয়ে আছি সৃষ্টির আদিতে
একা বটপত্রে নক্ষত্রপুরুষ
ব্রহ্মাণ্ড ছাতার মতো রামধনুর বিপুল বৈভবে
সকালের রোদ পড়ে হয়েছে ঈশ্বর।

আমি যাকে ফিরিয়ে দিয়েছি
সে আমার ইচ্ছামৃত্যু

আমি যাকে ফেরাতে পারিনি,
সে আমার প্রেম
ঘরে দোরে আভুবন পৃথিবী সৈকতে
সমুদ্র দেখাবে বলে
সে হয়েছে ঈশ্বরী পাটনী।

সা

কেকারবের প্রতীক

চিরাচরিত যা কিছু, এখানে এসে আধুনিক হয়ে ওঠে!

কর্ণাটিক ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারা ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিখ্যাত করেছে। অনেক সাঙ্গিতিক শব্দ দুই ধারাতেই সমভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে সঙ্গীতের ধারা মুখে মুখেই চলে এসেছে। বংশ পরম্পরায় "শ্রুতি"ই তাকে ধরে রেখেছে।

সেই রকম, আমাদের দেবানগরে মিল যে কাপড় তৈরী করে, তার উৎকৃষ্টতা চলে এসেছে বংশ পরম্পরায়, সময়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে। চিরাচরিত সূতির থেকে শুরু করে, সূক্ষ্ম বুননের কাপড়। এখন আমরা দেবানগরে মিলে উৎকৃষ্ট ব্রেন্ডস তৈরী করছি, যেটি আপনার অর্থের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠ সওদা।

Suchitra সুচিত্রা এইচ.টি ভয়েল শাড়ী

Lasya লাস্য ২ × ২ ফাব্রিক্স

Pushpanjali পুষ্পাঞ্জলি কেডিক শাড়ী

দেবানগর

উৎকৃষ্টতা যেখানে দীর্ঘস্থায়ী হয়

দি দেবানগরে কটন মিলস লিমিটেড, দেবানগরম্ কর্ণাটক

THOMAS/BCM/176/ Ben

উপন্যাস

আবার সমুদ্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আবার সমুদ্র

ভিড়ে পড়ুন—দুর্দান্ত গোছের কোনো প্লট পেয়ে যাবেন বলে দিলাম।

দীপু সরকারের কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো কিনা সোমেন মিত্তির তাও ভেবেছেন। কিন্তু লোকটাকে সামনাসামনি দেখলে সাংঘাতিক আদৌ মনে হয় না। কৌতুক-ছোঁয়া ওই গভীর দৃষ্টির মুখোমুখি হলে বিপরীত কিছুই বরং ভাবতে ইচ্ছে করে। তাকে নিয়ে এদিকের মজলিশের চাপা গরম ভাবটা সে টের পায়। দুদিন দীপু সরকারকে জোর করে চেয়ারে ঠেলে বসিয়ে দেবার পর তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে কেন যেন নিজেই লজ্জা পেয়েছেন সোমেনবাবু। মনে হয়েছে, কেন কি করছেন ভদ্রলোকের তাও অগোচর নয়।

কিন্তু আজ দীপু সরকারকে ঠেকায় কে? এতদিন বাদে ঝুনো লেখকের কল্পনা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে ভাবছে। সুবাসভাব প্রধান মোহন চৌধুরী তার সহযোগী প্রযোজক উপেন হালদার, ক্যামেরাম্যান অজিত শ্রীমল সুরকার নিশীথ কর, সহনায়িকা থেকে নায়িকা হবার সাধ সাধ ষোল আনা সেই মঞ্জু দত্ত, এমনকি অনেক প্রত্যাশার ভাবী নায়িকা নূপুর ব্যানার্জিও হালকা বিস্ময়ে সোমেনবাবুর দিকে চেয়ে আছে। দীপু সরকারের মিস্টার আউল দি ফিল-সফার এই বিদিশার তিনতলাতেই এক-ঘরের সুইট নিয়ে আছে সেটা যেন বিচিত্র খবর, আর যে একটি দুটি অতিথিকে তার কাছে আসতে দেখা যায় তারা মেয়েছেলে—এ যেন একেবারে অভাবনীয় খবর!

মজার গরমে দীপু সরকার আর একদিকে চেয়ে থাকলেও সোমেন মিত্তির ফিরলেন তার দিকে। একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিন তলার সুইটে থাকলে ভদ্রলোক রোজ ভাবী বাগটা এখানে বয়ে আনেন কেন? গায়ের কোর্তাটাই বা ঘরে ছেড়ে রেখে আসে না কেন?

গেলাসের বাকিটুকু গলায় ঢালা শেষ। দীপু সরকারের। আসর জমানোর নতুন খোরাক পেয়ে অদূরের বয়ের উদ্দেশ্যে দু আঙুলের টুড়ি ঠুকলো মোহন চৌধুরী। বয় ছুটে এসে গেলাস বদলে দিয়ে গেল। অতএব কৃতজ্ঞতার দায়েও লেখককে কোণ-ঠাসা করা দরকার দীপু সরকারের। তার মুখ গম্ভীর, কোটরাগত চোখে হাসির ঝিলিক।—আপনার গল্পের নায়ক-নায়িকারা হয় মেলে নয়তো তফাতে হটে—দু'কথায় ঝপ করে সেটা বলে না দিয়ে একশ দুশ পাতার ভনিতা চালান কেন? আবহাওয়া টইটুম্বুর পাকা করে তোলার জন্য কিনা?

তার বক্তব্য উপসংহারে গড়ানোর অপেক্ষায় সোমেনবাবু চুপ। তার পাশের চেয়ারে নূপুর ব্যানার্জি বিব্রত একটু। সোমেনবাবুর প্রতি অঢেল ভক্তিশ্রদ্ধা তার পিছনে লাগাটা সে-ই শুধু বরদাস্ত করতে চায় না। তাছাড়া দীপু সরকারের প্রায় সব কথাতে ওই মেয়ের বিরক্তি। সভাব অনুসকলে উৎসুক।

—এও ঠিক তাই বুঝলেন? দীপু সরকার গেলাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে ঠক করে টেবিলে রাখল সেটা।—ওই পেটমোটা ব্যাগ, ওই বেশবাস ওই হাব ভাব সবই তাকে ঘিরে স্রেফ একটা অ্যাট মসফিয়ার তৈরি করার জন্য। মিস্টার আউল তার জীবনের গল্পে নিজেকে নায়ক সাজিয়ে রেখেছে—সে-গল্পের শাঁস বার করতে গেলে দেখবেন ওই তিনতলার একখানা ঘর আর একটা দুটো মেয়ে-ছেলের যাতায়াত, ব্যস্।

দীপু সরকার লেখা-পড়া জানা ছেলে, এম-এ পাশ। মদের মাত্রা না বাড়া পর্যন্ত অনেক ভারী কথাও বেশ হালকা করে বলতে পারে। ইস্কুল মাস্টারি ছেড়ে কিছু একটা কলাবিশারদ হয়ে বসার আশায় ছবির জগতে ভিড়েছিল। কিন্তু কললক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত তাকে পরিপূর্ণ একখানা কলা দেখিয়েই ছেড়েছে নায়ক। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আর অনেক তোষা-মোদের তেল ঢেলে গাল-ভরা নামের কিছু দায়িত্ব কপালে জুটেছে। প্রোডাকশন ম্যানেজার। এক কথায় হরেক রকমের হুজ্জৎ কাঁধে নিয়ে যোগানদারীর কাজ, আর সেই সঙ্গে টাকা যারা ঢালছে তাদের মন যুগিয়ে চলার কাজ। সখেদে নিজেই সে এ-সব কথা সোমেনবাবুকে বলেছিল একদিন।

আর সকলের মতো কথার ফানুসে হাসির বোল তোলার মানুষ নন সোমেন-বাবু। ফিরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন-ও দুটো খবর তোমাকে কে দিলে?

—যে-ই দিক, আধখানা বড় নোট টেবিলে ছাড়ুন, এ-খবর ছেড়ে শ্যাম-সুন্দরের নাড়ির খবর টেনে বার করে আপনার সামনে ফেলে দিচ্ছি। আর রসের খবর ছেড়ে শুধু দু-চারটে গদ্য কথায় যদি মন ভরে, একখানা পেঁচো নোট তার ওই পেয়ারের বেয়ারার পকেটে গুঁজে দিন, সে-ও সাদাসাপটা ভাবে সাহেবের তিন-তলার ঘরের নম্বর আর তার হেস্যালিপনার কিছু রসদ আপনার জ্ঞানে ঢুকিয়ে দেবে।

দীপু সরকারের আধখানা বড় নোট বলতে পঞ্চাশ টাকার নোট, আর পেঁচো নোট বলতে পাঁচ টাকার নোট। পরের পকেটের টাকা-কড়ি সে লোভ্টবৎ দেখে থাকে, কিন্তু নিজের পাঁচ টাকা ছেড়ে পাঁচ সিকের ওপরেও প্রগাঢ় মমতা। অতএব শ্যামসুন্দরের অর্থাৎ এত আলোচনার ওই মানুষটার খবর জানার জন্য সে তার পেয়ারের বেয়ারার পকেটে পাঁচ টাকা ছেড়ে পাঁচ পয়সাও গুঁজেছে এমন সম্ভাবনা মাথায় আসছে না। বখ-শিসের আশায় বেয়ারাটা হয়তো বা সবে মুখ খুলেছিল আর ওটুকু খবর পাচার করার পরেও হাতে কিছু না আসতে বুদ্ধিমানের মতো মুখ শেলাই করেছে। অন্যথায় ওটুকু খবর পেয়ে দীপু সরকার তুষ্ট হবার পাত্র নয়।

মোহন চৌধুরীর আমেজ-লাগা মগজে এবারে আর এক সম্ভাবনার আলোড়ন ঘটে গেল। হাতের গেলাসটা দিয়ে টেবিলে ঠুক-ঠুক শব্দ করল বার দুই, তারপর চোখের পাতা টান করে সোমেন মিত্তিরের দিকেই ফিরল। —কি রকম সাস্পিশাস্ ব্যাপার মনে হচ্ছে মশাই—বড় দরের স্মাগলার-টাগলার নয় তো.. বাঙালী কিনা তাও তো ঠিক বোঝা যায় না, আর ওই ব্যাগটাতেই বা কি আছে কে জানে—সব্বক্ষণ ওটা বুকে বেড়ায় কেন?

এই টেবিলের হালকা বাতাসে হঠাৎ যেন গুমোট ধরল একটু। মন্তব্য শোনার আশায় ক্যামেরাম্যান অজিত শ্রীমল, সুর-কার নিশীথ কর, সহ নায়িকা মঞ্জু দত্ত আর ভাবী নায়িকা নূপুর ব্যানার্জীর জোড়া-জোড়া চোখ সোমেন মিত্তিরের দিকে ঘুরেছে। বোমাঞ্চকর কিছু শুনলে নায়িকার মুখশ্রীর ভাবান্তর অনুধাবনের চেষ্টা সহযোগী প্রযোজক উপেন হাল-দারের—তার দুচোখ নূপুর ব্যানার্জীর মুখের ওপর। শুধু দীপু সরকারের হাড়ের খাঁজের উদ্ভাসিত দৃষ্টিটা তখনো মোহন চৌধুরীর মুখখানাকেই আঁকড়ে আছে।

স্মাগলার ছেড়ে অনেক রকম চরের মেয়ে-পুরুষের আনাগোনা স্বাভাবিক এ-সব জায়গায়। সোমেনবাবুর অন্তত তা নিয়ে বাড়তি কোনো উদ্দীপনার হেতু নেই—কারণ তার হাতে কোকাকোলার গেলাস। তবু যে-লোকের প্রসঙ্গে আলো-চনা তার সম্পর্কে কোনো অজ্ঞাত কারণেই যেন কৌতূহল একটু আছেই। তাই মোহন চৌধুরীর এই নয়া সন্দেহটা কল্প-নায় ওই লোকের মুখের ওপর ফেলে একটু নাড়াচাড়া করে দেখছিলেন সোমেন-বাবু—সম্ভব কি সম্ভব না। আজকের এই জটিল যুগে সুন্দর মুখ আর সাই হোক ভিতরের দর্পণ নয় সকল ক্ষেত্রে।

এটুকু নীরবতার ফাঁকে যাকে বলে অ্যাকশন শুরু করে দিল দীপু সরকার। হঠাৎ দেখা গেল উবুড় হয়ে নিজের মাথাটাকে টেবিলের নিচে ঢোকাচ্ছে সে। ফলে সকলের জোড়া জোড়া চোখ আবার তার দিকে। এমন কি উপেন হালদারেরও নায়িকার প্রতি মনোযোগে ছেদ পড়েছে।

কিছু একটা অস্বস্তিতেই বুঝি মোহন চৌধুরীর ঊর্ধ্ব অঙ্গ নড়েচড়ে উঠল একটু। তারপর ব্যাপারটা বোঝা গেল। উবুড় হয়ে টেবিলের নিচে মাথা গলিয়েও দীপু সরকার মোহন চৌধুরীর পায়ের নাগাল পায়নি। এক পায়ের হাঁটুর নিচের স্পর্শটুকু নিয়ে টেবিলের তলা থেকে মাথা বার করে হাতটা কপালে ঠেকালো। চোখের ঘোর-লাগা ভাব দুটো তেমনি উদ্ভাসিত।

—জবাব নেই মোহনদা! উঃ, এ-দিকটা মাথায়ই আসেনি আমাদের কারো। শালা ধর্মযাজকের মতো আলখাল্লা পরে কোন্ মতলব হাঁসিল করে এখানে এসে মদ গেলে কে জানে! ওই মোটা ব্যাগ খুললে তার মধ্যেও সাংঘাতিক কিছু বেরুবেই আমি বলে দিলাম—

সাময়িক উত্তেজনাটুকু জারিয়ে নেবার জন্যেই হয়তো এবারে যে-যার গেলাস তুলে লম্বা চুমুক লাগালো। এমন কি দেখা দেখি মঞ্জু দত্ত আর নূপুর ব্যানার্জীও তাদের সফ্‌ট ড্রিংকএর গেলাস হাতে তুলে নিয়েছে। মঞ্জু দত্ত আসরে মদ খায় না, কিন্তু বাড়িতে যে খায় এ নাকি দীপু সরকারের চাক্ষুষ দেখা। আর নূপুর সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণী, এখন মদের গন্ধে নাক সিঁটকোয় কিন্তু একদিন মদ ওকে খাবে। দুর্বল মুহূর্তে তার এ-সব অন্তরঙ্গ আলাপও আবার সোমেন মিত্তিরের সঙ্গেই। নিজের স্বার্থেই ভদ্রলোক কখনো-সখনো ওর পিছনে দু'দশ টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করেন না। অনেক রকমের রসদ থাকে ওর ঝুলিতে। তাছাড়া প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে ওর হাত দিয়ে পাঁচশ্তির টাকা দিতে হলে সকলকেই কিছু অন্তত খসাতে হয়। এবারেও ক্ল্যাকের বাকি টাকা সোমেনবাবুর হাতে দিয়ে নিরীহ আবেদনের সুরে বলেছিল, আপনার হাত খালা তো দিব্যি গরম হল, এবার আমার হাতটা ধরে দেখুন সার—কি বেজায় ঠাণ্ডা।

সেদিনও সোমেন মিত্তির একলা তাকে এই বিদিশায় নিয়ে এসেছিলেন।

সকলের হাতের গেলাস প্রায় এক-সঙ্গেই টেবিলে নেমে এলো আবার। জয়ের উদ্দেশ্যে এবারে আরো জোরে দু আঙুলের মেজরাজী তুড়ি ঠুকে মোহন চৌধুরী তাকে হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে দিল।

অভ্যস্ত বেয়ারা এ-ভাষা জলের মতো বোঝে। দীপু সরকারের গেলাসে তৃতীয় দফা আর বাকি চারজনের গেলাসে দ্বিতীয় দফা নতুন রসদ এলো। অপর তিনজনের সফ্‌ট ড্রিংকএর গেলাস-গুলোকে বেয়ারাবাও বিরক্তি বা করুণার চোখে দেখে। থেমটার আসরে এসে ঘোমটা টানার মতো ভাবে।

সোডার বোতলের ছিপি খুলে-খুলে বয় সামনে রাখছে। লোকটা বাঙালী। কিন্তু মোহন চৌধুরীর তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলার মেজাজ নয় এখন। জানালার ধারের ছোট টেবিলটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, উও সাহাব আজ নহী আয়েঙ্গে?

বয় জবাব দিল, আসবেন বোধহয়... রোজই আসছেন—

—উন্‌কা নাম কেয়া হ্যায়?

—বড়ুয়া সাহেব।

শুনেই দীপু সরকারের গর্তে ঢোকা দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠতে চাইল।

—বুঝুন এবার। অসমীয়া টসমীয়া হবে নিশ্চয়—

বাঙালী না হওয়াটাই যেন তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ কিছু। বয়ের উদ্দেশ্যে মোহন চৌধুরী আবার প্রশ্ন ছুঁড়ল, সাহাব ইহাঁই রহতে হ্যায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সোডার বোতলের ছিপি খোলা শেষ। জবাবটা দিয়েই নির্লিপ্ত মুখে প্রস্থান করল সে। দু'হাতের চেটোয় নিজের গেলাসটা আয়েস করে ধরে দীপু সরকার বলল, ও-ব্যাটার মুখের সেলাই কাটতে হলে পকেটে কিছু গুঁজে দিতে হবে মোহনদা, এমনিতে হবে না—আমি চেষ্টা করেছিলাম।

আসর আরো একটু গরম করে তোলার জন্যেই প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে সোমেন মিত্তির আরো একটু বাড়তি ভাবনায় মধ্যে ডুবলেন যেন। নিজের মনেই বলে-লেন, অনেক কিছুই হতে পারে...যে দিন-কাল পড়েছে। বে-আইনী চলান ছেড়ে মেয়ে চলানের ব্যবসাও তো কম ফেঁপে ওঠেনি সর্বত্র—দিন কয়েক আগে একটা ইন্টারন্যাশনাল রিংএর খবর তো বাগলেই বেরিয়েছিল। চিন্তাচ্ছন্ন দু'চোখ এবার দীপু সরকারের মুখের ওপর। —যে মেয়েছেলেরা ওই ভদ্রলোকের কাছে আসে তাদের মধ্যে কি-রকম খবর নিয়েছ?

যা ভেবেছিলেন তাই। প্রশ্নের জবাব পেলেন না। মন্তব্যটাই ওদের মগজে কেটে বসছে। বিশেষ করে মোহন চৌধুরী, দীপু সরকার আর সহযোগী প্রযোজক উপেন হালদারের। তিন জোড়া ঘোলাটে চোখ তাঁর মুখের ওপর হোঁচট খেল এক-প্রস্থ, তারপর একসঙ্গে নূপুর ব্যানার্জীর দিকে ঘুরে গেল।

এতক্ষণে যেন রহস্যের রোমহর্ষক হদিস কিছু মিলেছে। ওদের ধারণা, একে বারে নির্ভুল জায়গাটিতেই আঙুল ফেলেছেন সোমেন মিত্তির। তা যদি হয় তো এ-টেবিলের অব্যর্থ শিকার ওই এক জনই। তিন-জোড়া চোখের এই নিগূঢ় বিশ্লেষণের ধাক্কায় বেচারা নূপুর ব্যানার্জী অস্বস্তিতে উসখুস করে উঠল একটু। পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি পুরুষ-দের এতখানি বিচ্ছিন্ন মনোযোগ মঞ্জু দত্ত হ্যাংলামি ভাবছে। আধখানা ঘাড় বেঁকিয়ে সে-ও নূপুরকেই দেখছে।

দুশ্চিন্তায় কিনা বলা যায় না মোহন চৌধুরীর গলার স্বর মোটা শোনালো একটু। বিশ্লেষণরত দু-চোখ তখনো নূপুরের মুখের ওপর। —শুনলে?

সামান্য বিব্রত মেশানো সচকিত ভঙ্গিতে মুখ তুলে নূপুর ব্যানার্জী বলল, শুনলাম তো। তা সে যাই হোক না কেন তাতে আমার কি? আমি কি কচি খুকী নাকি।

মোহন চৌধুরী বা উপেন হালদারের আমেজ-লাগা চোখে কচি খুকীর মতো লাগছে না আদৌ। ফলে কিছুটা নিশ্চিন্ত কিছুটা বা পরিতৃপ্ত চাউনি তাদের। কিন্তু এ-কথার পরেও হাল-ছাড়া মুখেই গোল পাকিয়ে বসল দীপু সরকার। সে বলে উঠল, আপনার নায়িকার বিবেচনা বুঝুন মোহনদা—যেন ওই সব লোক কচি খুকীদের ধরবার জন্যেই এইসব জায়গায় জাল বিছিয়ে বসে! সামান্য ম্যানেজার হলেও আমি এটুকু জানি, একবার ওদের খপ্পরে পড়লে অতি বুদ্ধিমতী মেয়েদেরও মগজ ব্যাবসা ধোলাই হয়ে যায় যে তখন তারা দিনের আকাশে রাতের চাঁদ দেখে আর নিজের আপনার জনকেও শত্রু ভাবে।

ততোধিক বিরক্তিতে নূপুর ব্যানার্জি ঝটকা মেরে বলে উঠল, ওঃ, উনি তো সবজান্তা হয়ে বসে আছেন একেবারে!

ওরা দুজন এরকমই পরোক্ষে কথা ছোঁড়াছুড়ি করে, সামনাসামনি তক্ক করে না। এ ব্যাপারটা সোমেন মিত্তির আগেও লক্ষ্য করেছেন। প্রতিষ্ঠিত চিত্র তারকারা সামান্য প্রোডাকশন ম্যানেজার ছেড়ে এ-লাইনের হোমরাচোমরাদেরও খুব একটা পরোয়া করে না। কিন্তু নতুন তারকাদের বিপরীত রীতি। সকলকেই তারা কম-বেশি খুশি রেখে চলে। কিন্তু নূপুর ব্যানার্জির আচরণের ব্যতিক্রম শুধু এই প্রোডাকশন ম্যানেজারটির অর্থাৎ দীপু সরকারের বেলায়। তাকে ঠেস দেবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না বড়। আর সকলের কাছে সেটা উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু রসদের গুণে হোক বা যে কারণেই হোক মোহন চৌধুরীর মগজে দুশ্চিন্তার আঁচড় পড়েছে আপাতত। একটা কিছু ভাবনা মাথায় ঢুকলে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে ছাড়েন না। এই কারণে অন্তরঙ্গজনেরা বাহবাও দিয়ে থাকে তাকে। সামনের গেলাস তুলে ছোট একটা চুমুক দিয়ে ভারী চাউনিটা এবারে লেখকের দিকে ঘোরালো সে। টেনে টেনে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে ব্যাপারখানা কি দাঁড়াল?

সময় নেবার অছিলায় সোমেন মিত্তির কোকাকোলার গেলাস মুখে তুললেন। এই ফাঁকটুকু কেউ না কেউ ভরাট করতে চাইবেই। দীপু সরকারের এটা তৃতীয় গেলাস, জবাবও আগ বাড়িয়ে সেই দিল। গলার স্বরে বাড়তি জোর দিয়ে বলল, ব্যাপার জটিল না হলে আপনি ভাববার মানুষ নয় মোহনদা, আর আমিও গোড়া থেকেই বলে আসছি ওই লোক সাংঘাতিক একজন না হয়ে যায় না—একলা একখানা টেবিল দখল করে সমস্তক্ষণ এদিকে চেয়ে-চেয়ে সে যে

কিছু একটা মতলব ভেঁজে চলেছে সেটা এখন বোধহয় সকলেই বুঝছেন।

সওয়ালের শেষ মন্তব্যটা নূপুর ব্যানার্জির মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে দীপু সরকার তার গেলাস তুলে নিল।

সমাধানের সাদাসিধে দিকটাই মাথায় এলো ক্যামেরাম্যান অজিত শ্রীমলের। সে বলল, আমরা আমাদের টেবিল চেঞ্জ করলে কি হয়?

নির্লিপ্ত শুধু সোমেন মিত্র। শ্রীমলের পরামর্শটা এতবড় এক জটিল ব্যাপারের ওপর এক বালতি জল ঢেলে দেবার মতো জলো লাগল বাকি সকলের। বিনা বাক্যব্যয়ে মোহন চৌধুরীই সেটা প্রথম বুঝিয়ে দিল। হাতের গেলাস নাড়তে নাড়তে সদয় দৃষ্টিটা শ্রীমলের মুখের ওপর তুলল একবার। আর এই দৃষ্টির মর্ম অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে ও-দিক থেকে দীপু সরকার বলে উঠল, ইন্টারন্যাশনাল শত্রু নিয়ে কারবার আর আপনি ক্যামেরার একখানা এস্-শট ঝাড়লেন বটে মশাই!

আবহাওয়া অনুযায়ী চিন্তা ভাবনা তবু মজু দত্তর। নূপুরের ও-পাশ থেকে সে প্রস্তাব করল, আই বি-তে একটা উড়ো টেলিফোন করে দিলে কি হয়—এসে খোঁজ খবর করুক।

সহযোগী প্রযোজক উপেন হালদার লোকটা এমনিতে কথাবার্তা খুব বেশি বলে না। লোহা-লক্কড়ের কারবারে ফেঁপে ওঠা বাড়তি টাকা নির্ভরযোগ্য সুড়ঙ্গ পথে চালান করার তাগিদে মোহন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ। এই নতুন পথে রংএর ছড়াছড়ি, কিন্তু পথের ঘাট-ঘোট ভালো জানা নেই বলেই ব্যবসায়ী মন সর্বদা সন্দিগ্ধ একটু। নতুন বয়েসের কালে রংদার মেজাজ ছিল ভদ্রলোকের। দোলে আর পূজা-পার্বণে নেশার ঝোঁকে একটু বেশি মাত্রায় হৈ-হুল্লোড় মারামারি করে একাধিক বার হাজত বাসের গৌরব অর্জন করেছে। সে সব মুখরোচক গল্পও এই আসরে দীপু সরকারের মুখ থেকেই শুনেছে সকলে। গল্পের শেষে লোহাকে তেলে জারানোর মতো গদগদ মুখ তার।—বা-ব্বা! সে-সব দিনে উপেনদা যাকে বলে পাড়ার হীরো.....মেজাজ বিগড়ালেই ডাইরেক্ট অ্যাকশন, আঙুল তুলে না ডাকলে আমরাও কাছে ঘেঁষতে পেতাম না।

শুনে নতুন পার্টনারকে একটু তারিফ তখন মোহন চৌধুরীও করেছে। তার ভারী মুখে হাসির খাঁজ পড়েছে, আর মোটা শরীর অল্প অল্প দুলেছে। উপেন হালদারের দেহের কাঠামো সত্যিই বেশ মজবুত এখনো। হাতের গেলাস মুখে তোলার ফাঁকে তার লব্জা লব্জা চোরা চাউনি নূপুর ব্যানার্জির মুখের ওপর ওঠা-নামা করেছে। আর, সকলের অগোচরে দীপু সরকার এক-চোখের একটা রসালো বাণ নিক্ষেপ করেছে সোমেন মিত্তিরের দিকে। ভাবখানা, তেলে লোহা ভেজে কিনা দেখে নিন সার।

উপস্থিত সংকটে সকলের এই মিনমিনে ভাবটা আদৌ পছন্দ নয় এ-হেন উপেন হালদারের। মঞ্জু দত্তর উড়ো টেলিফোনের প্রস্তাব বাতিল করে পাথর চিবুনো গুরু-গম্ভীর স্বরে সে বলে উঠল ধড় থেকে ওই লোকটার মাথাটা ছিঁড়ে আনার ব্যবস্থা করলে কি হয়? সঙ্কল্পবদ্ধ একটা আঙুলের নিশানা জানলার ধারের ওই শূন্য টেবিলটার দিকে।

ডাইরেক্ট অ্যাকশনের এমন প্রস্তাব কেউ আশা করেনি। সকলেই ভেবাচাকা খেয়ে গেল একটু।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবহাওয়ার নাটকীয় পরিবর্তন এক প্রস্থ।

হল-এর ও-প্রান্তের দরজা দিয়ে বিতর্কিত মানুষটির পদার্পণ। ও-দিক থেকে ঢোকার কারণ স্পষ্ট। পিছনে ল্যাভেটরি। ভেজা মুখ রুমালে মুছতে মুছতে ভিতরে ঢুকেছে। গায়ে সেই সাদা কোর্তা। হাতে মোটা ব্যাগ। তাকে দেখা মাত্র বশংবদ বেয়ারাটা সেলাম বাজিয়ে ছুটে এগিয়ে গেছে। আজ দেরি হয়ে গেছে বলেই হয়তো লোকটা অর্থাৎ বড়ুয়া সাহেব সার্ভিং ডেস্কএর সামনে দাঁড়িয়ে বেয়ারাকে অর্ডার পেশ করছে।

সোমেন মিত্তির ঘড়ি দেখলেন। রাত পৌনে ন-টা। ড্রিংক সরবরাহের মিয়াদ রাত সাড়ে ন-টা পর্যন্ত। ঠিক ন-টা পনেরয় ম্যানেজার তার ডেস্ক ছেড়ে ও-মাথা থেকে এ-মাথায় আসতে আসতে বার কয়েক ঘোষণা করবে, ইটস নাইন ফিফটিন, অর্ডার ইওর লাস্ট ড্রিংক প্লীজ।

যত রাত খুশি বসে খাওয়া চলবে, কিন্তু টেবিলে রসদ মজুত রাখার শেষ সময় রাত সাড়ে ন-টা।

এক-আধ দিন এমনি দেরি হয়ে গেলে বড়ুয়া সাহেবকে একসঙ্গে পাঁচ-ছ-টা গেলাস আর গোটা তিন চার সোডার বোতল টেবিলে সাজিয়ে বসতে দেখা গেছে। বাত হওয়ার দরুণ আজও বোধহয় বেয়ারাটাকে সেই রকমই কিছু নির্দেশ দিচ্ছে।

কিন্তু সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে দীপু সরকার যে-কাণ্ডটা করে বসল, দেখে সকলেরই চক্ষু স্থির এই টেবিলের। নিজের তৃতীয় গেলাসের আধা-আধি সাবার। ঘোর কিছু লেগেছিল। বুকের পাটাও দ্বিগুণ হঠাৎ। দূরের সার্ভিং-টেবিল থেকে বড়ুয়াসাহেব এদিকে ফেরার আগেই নিজের আধ-খাওয়া গেলাসটা হাতে নিয়ে দীপু সরকার উঠে দাঁড়াল। তারপর জানালার পাশের ওই একক-টেবিলের দিকে এগুলো।

সকলে বিমূঢ় এমন যে কেউ বাধা দেবার অবকাশ পেল না। অর্ডার পেশ করে বড়ুয়া সাহেব এদিকে পা বাড়িয়েছে।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেল আবার কারণ দীপু সরকার ততক্ষণে গেলাস টেবিলে রেখে চেয়ারটা দখল করে বসেছে।

প্রায় মিনিটখানেক লোকটা দাঁড়িয়েই রইল চুপচাপ। এদিক থেকে জোড়া-জোড়া বিস্ফারিত চোখ তার মুখের ওপর। চোখের সামনে টেবিল আর চেয়ার বেদখল হতে দেখে কিছুমাত্র বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ মনে হল না তাকে। বরং কৌতুক মাখা চোখে সে-ও যেন উপভোগ্য ব্যাপার দেখছে কিছু। কালো-ঘেঁষা মুখখানা আরো মিষ্টি লাগছে। ব্যাপার বোঝার চেষ্টায় আশ-পাশের আরো কেউ কেউ ওদের দুজনকেই ফিরে ফিরে দেখছে। পরনে সাদা ঢোলা কোর্তা আর হাতে পেট-মোটা ব্যাগ—জানালার ধারের একক-আসনের ওই বড়ুয়া সাহেবকে আগেও অনেকেই লক্ষ্য করেছে হয়তো।

কিন্তু দীপু সরকার নির্বিকার। গেলাসে একটা ছোট চুমুক দিয়ে সেটা আবার টেবিলে রেখে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল সে।

পলকা কমনীয় গাম্ভীর্যে বড়ুয়া সাহেব এদিকেই পা বাড়ালো আবার। কিন্তু গতি এত মন্থর এখন যে, ওই ছোট টেবিলে পৌঁছনোর আগেই পিছনে ট্রে হাতে বয় হাজির। ট্রে-তে পাঁচটি গেলাস পাঁচ পেগ রঙিন রসদ।

এদিক থেকে সকলকে একটু অবাক করে দীপু সরকারের উদ্দেশে চাপা গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল নূপুর ব্যানার্জি, আঃ, হচ্ছে কি? উঠে এসো বলছি!

বড়ুয়া সাহেব তখন ওই ছোট টেবিলের তিন গজের মধ্যে। কথাগুলো ঠিক ঠিক কানে না যাক, রমণীর ঘাড় ফেরানো ঝাঁঝালো মুখশ্রী ঠিকই লক্ষ্য করেছে। নূপুরের দিকে সরাসরি চেয়ে, অল্প হেসে আর অল্প মাথা নেড়ে যেন আশ্বস্ত করতে চাইল তাকে। নূপুর ব্যানার্জি ভাইতেই থতমত খেল একটু। অজ্ঞাতকুলশীল মানুষটার আসল লক্ষ্য এই মেয়েটাই এ-ধারণা এই টেবিলের কারো কারো আরো বদ্ধমূল হল বোধ হয়। গায়ে পড়ে ভাব জমানোর চেষ্টার এটাই যেন প্রথম সূচনা।

কোটরাগত দু-চোখ বড় করে তোলার চেষ্টা দীপু সরকারেরও। বড়ুয়া সাহেব তার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। একটু ঝুঁকে তার পায়ের কাছেই হাতের মোটা ব্যাগটা রাখল, তারপর টান হয়ে দাঁড়াল। পিছনে ট্রে হাতে বয়। তার মুখখানা দেখলে মনে হবে বিপন্ন যেন সে-ই।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে আছে। বড়ুয়া সাহেব আধ দীপু সরকার। এ-টেবিলের সকলের নিঃশ্বাস রুদ্ধ। চোখে চোখ রেখে বড়ুয়া সাহেব নিঃশব্দে বড় করে হাসল হঠাৎ, আর, তারপরেই টুপ করে হাসিটা নিভিয়ে দিয়ে গম্ভীর আবার। দীপু সরকারও

অবিকল তাই করল, কিন্তু তার হাসিটা ছেঁচি কাটার মতো মনে হল।

আধখানা ফিরে বড়ুয়া সাহেব স্থানমূর্তি বয়ের ট্রে থেকে একটা গেলাস তুলে নিল। গেলাসের রঙিন পদার্থটুকু নির্জলা গলায় ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আপাদ-মস্তকে আপনা থেকেই যেন ঝংকার উঠল একটু। তারপর স্থির আবার।

এবারে দীপু সরকারের পালা। সেও নিজের গেলাস তুলে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার তিন ভাগ গলায় ঢেলে দিয়ে মুখে একটু চেষ্টাকৃত বিকৃতি ফোটালো। তারপর গেলাস ঠক করে টেবিলে রেখে মুখ তুলে তাকালো। অর্থাৎ পরের মহড়ার জন্য প্রস্তুত সে।

বোবার মতো বসে এ-টেবিলের সকলে নির্বাক প্রহসন দেখছে একটা।

হাতের শূন্য গেলাস বয়ের ট্রেতে রেখে এবারে দু হাতে দুটো নতুন গেলাস তুলে নিল বড়ুয়া সাহেব। বাঁ হাতের গেলাসের জিনিস উপুড় করে দীপু সরকারের গেলাসে ঢেলে দিল। তারপর আগের মতো আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটিয়েই গম্ভীর আবার।

এই বদান্যতার জন্য দীপু সরকার প্রস্তুত ছিল না হয়তো। সামান্য থমকে গেলাসটা তুলে নাকের কাছে ধরল। লম্বা করে ঘ্রাণ নিল। তারপর ভদ্রলোকের দিকে মুখ তুলে খুশি মুখেই তার হাসিটা নকল করতে চেষ্টা করল।

এই অঙ্কের নাটকের সবাক মোচড়। বাঁ হাতের খালি গেলাস ট্রেতে রেখে ডান হাতের গেলাস দীপু সরকারের মুখের কাছে একটু দুলিয়ে স্পষ্ট বাংলায় বড়ুয়া সাহেব বলল, এটুকুও নির্জলা গলায় ঢেলে দেবার পর আমি যদি আপনাকে তুলে ওই জানলা গলিয়ে নিচে ফেলে দিতে চেষ্টা করি তাহলে দোষ আমার হবে না এই ড্রিঙ্ক-এর?

ভদ্রলোকের গলার স্বর গুরু-গম্ভীর অথচ মিষ্টি। এ টেবিল থেকেও স্পষ্ট শোনা গেল। আর তার ফলেই যেন ডবল চুপ সকলে।

ওদিকে হতচকিত মুখ দীপু সরকারের। তার নেশা আর মজা দুই-ই উঠে যাওয়ার দাখিল। —বা রে! জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন মানে! মগের মুলুক নাকি—

জবাবে হাতের গেলাস প্রথমবারের মতোই আবার গলায় উপুড় করল লোকটা। তারপর সামান্য ঝংকার তুলে সেটা ট্রে-তে রেখে টান হয়ে দাঁড়াল। ঢোলা কোর্তার বাঁ-হাতের আস্তিন ডান হাতে করে কনুইয়ের ওপর টেনে তুলতে তুলতে বলল, কোন্ মুলুক দেখাই ছাক—

—দেখুন মশাই, ইয়ারকির জায়গা নয় এটা—

মুখের কথা শেষ না হতে দীপু সরকার চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর টেবিল থেকে নিজের গেলাস তুলে নিয়ে লোকটাকে এক রকম ঠেলেই এ টেবিলের দিকে যাওয়া করল। এ দিকের কারো মুখে রা নেই এখনো। সকলেই দেখছে লোকটাকে।...শ্যাম সুশ্রী মুখখানা নিঃশব্দ হাসিতে ভরাট হয়ে গেল। ঝক-ঝকে দু পাটি দাঁতের আভাস দেখা গেল। হাসিটা সুন্দরই বটে। চেয়ারে বসতে বসতে ওই হাসির সঙ্গে সামান্য মাথাও নাড়ল নৃপুর ব্যানার্জীর দিকে চেয়ে। যেন বলতে চাইল, নিছক মজা ছাড়া আর কিছু নয়, কিছু মনে কোরো না—

নিজের নিরাপদ আসন দখল করে ঈষৎ উত্তেজনায় দীপু সরকার বলে উঠল, সাহস কত! কি বলল শুনলেন না আপনারা? বলল, আমাকে তুলে জানলা গলিয়ে নীচে ফেলে দেবে।

শুনেছে সকলেই। এখনো চুপ।

চাপা উত্তেজনায় দীপু সরকারও এক লম্বা চুমুকে তার গেলাস খালি করে ঠক করে টেবিলের ওপর রাখল। অর্থাৎ বড়ুয়া সাহেবের দেওয়া জিনিসটুকু প্রায় নির্জলাই জঠরস্থ করল সে। তারপর ঠোঁট আর জিভ দিয়ে চপ-চপ শব্দ বার করল দু-তিনটে। মাথা নীচু করে চাপা গলায় আবার বলল, ব্যাটা খাঁটী স্কচ্ খায়—ওই পাঁচ ছ' পেগের দামই তো দেড়শ দুশো টাকা। কি ভাবে কত টাকা রোজগার করে কে জানে!

বিদিশা কেন, নিজের পয়সায় ওই বিলিতি দ্রব্যের খদ্দের সর্বত্রই নামমাত্র। বেশির ভাগই দিশির মধ্যে বাছাই চলে—দাম যার বিলিতির সিকি ভাগও নয়। অতএব দীপু সরকারের বিস্ময়ও নিছক জলীয় কারণে নয়।

...লোকটা এখনো এদিকেই চেয়ে আছে আর মিটিমিটি হাসছে। ওই হাসির ফাঁকে শুধু একজনেরই দাক্ষিণ্য লাভের চেষ্টা যে— এ-চিন্তাটা প্রায় সকলেরই মনে এঁটে বসার দাখিল এখন। শুধু সোমেন মিত্তিরই কিছু ভাবছেন না, লোকটাকে ভালো করে দেখে নিচ্ছেন।

চোখোচোখি হতে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। কারো অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখে ধীরেসুস্থে ওই টেবিলের দিকে এগোলেন।

এই নাটকের জন্যেও প্রস্তুত ছিল না কেউ। ওই টেবিলের বড়ুয়া সাহেবও না। কৌতুক-ছোঁয়া দু চোখ সোমেনবাবুর মুখের ওপর।

তার মুখোমুখি টেবিলের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সোমেন মিত্তির। অভিবাদনের মতো করে সামান্য মাথা নাড়লেন একটু।

জবাবে লোকটিও তাই করল।

হালকা সুরে সোমেনবাবু বললেন, কালও আপনার আগে এখানে এসে উপস্থিত হতে পারলে এই চেয়ার আর টেবিল আমার দখলে আসবে.. ওই জানলাটা কত বড় দেখার ইচ্ছে থাকল।

হঠাৎ বোকা-বোকা মুখ করে লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে রইল কয়েক পলক। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে অদূরের বয়ের উদ্দেশ্যে নরম সুরেলা শিস দিল একটু। বয় দৌড়ে এলো।

একটা আঙুল তুলে সামনের দিকটা দেখিয়ে সে হুকুম করল, কাল ওখানে আর একটা চেয়ার দেবে, এই সাহেব বসবেন।

এত বড় পরিবেশে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা মানুষ হয়তো সোমেনবাবু একাই। তবু সাহেব বলা হল। বিমূঢ় বয় জো-হুকুম জানিয়ে প্রস্থান করতে লোকটার দু চোখ আবার তাঁর মুখের ওপর। একটা সখ্যতাসূচক ফয়সলাই হয়ে গেল যেন।

তার চোখের কৌতুক মুখের দিকে ছড়াচ্ছে।

সোমেন মিত্তিরও হাসিমুখেই ফিরলেন আবার।

তাঁর এত দিনের নীরব পর্যবেক্ষণ এই রাতে একটা পরিণামের দিকে গড়ালো যেন।

।।দুই।।

পর দিন ছেড়ে পরের সাত দিনের মধ্যেও সোমেন মিত্র বিদিশায় হাজিরা দিতে পারলেন না। সন্ধ্যার স্নানটা বেশ কিছু দিন ধরে বেশি রাতে সারতে হচ্ছিল। সর্দি-জ্বরে পড়ে গেলেন। ফলে স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের শাসনে অনিয়মে অভ্যস্ত মানুষটাব পায় বেড়ি। ফাঁক পেয়ে স্ত্রীর সরব অনুযোগ, রাত দশটা নেই এগারোটা নেই সিনেমার দল নিয়ে পড়েছেন উনি—যে বয়সের যা, অত সইবে কেন!

হেসে ফেলে মায়ের কোপে পড়ার ভয়ে ছেলেমেয়ে এদিক-ওদিক সরে যায়। মায়ের সামান্য একটু দুর্বলতার খবর তাবাও রাখে। বয়েসেব অনুযোগ মিথ্যে নয়। সোমেন মিত্রর বয়েস প্রায় ছাপ্পান্ন এখন। কিন্তু বয়েসের তুলনায় শবীব একটু বেশি মজবুত। সেই কারণেই ভিতরে ভিতবে একটু চাপা অস্বস্তি মহিলার। প্রথম জীবনে অনটনের মধ্যে কাটিয়েছেন। তাই সিনেমার কনট্রাকট থেকে থোকে থোকে টাকা এলে খুশিই হন। মনের সাধে এখন অনেক রকমের কর্তব্য করে তৃপ্তি পান। কিন্তু স্বামী-টিকে ওই সিনেমা-অলাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দেখলে স্বস্তি বোধ করেন না খুব। এই রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে এসে হানা দেওয়াটাও পছন্দ করেন না। অনেক দিন বলেছেন, ঘরে বসে লেখা হল গিয়ে কাজ তোমার, বই ছাপা হলে যাদের পছন্দ হবে তারা টাকা দিয়ে ছবির রাইট কিনে নিয়ে যাবে —ফুরিয়ে গেল। ওদের সঙ্গে অত মাখা-মাখির দরকার কি তোমার! এরপর লোকে বলবে সিনেমা সাহিত্যিক।

স্ত্রীর অনুযোগ একেবারে মিথ্যে না হোক, পুরোপুরি সত্যিও নয়।

সত্যি নয় এই কারণে, বাজারে কম করে পঞ্চাশখানার ওপর চালু উপন্যাস আছে সোমেন মিত্তির। বছরের মধ্যে সেগুলোর কোনটার না কোনটার এডিশন হচ্ছেই, আর সব মিলিয়ে এই খাতেও মাস গেলে মোটা রয়েলিটি আসছে। তাছাড়া সাহিত্যিক হিসেবে পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন বলেই এ-যাবৎ অনেক পুরস্কার আর সম্মান পাওয়া হয়ে গেছে। অতএব এরপর কে কি বলবে না বলবে তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না তিনি।

কিন্তু স্ত্রীর অনুযোগের সত্যের দিকটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না তা বলে। তাঁর ইদানীংকালের লেখায় নাটকের দিকটাই প্রখর হয়ে উঠছে। ফলে ছবির জন্য তাঁর গল্পের চাহিদাও বেড়েই চলেছে। স্ত্রীর কথা মতো গল্প বেচে টাকা নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারতেন। কিন্তু নিজের লেখার ওপর মায়া আছে বলেই তা পারেন না। তাছাড়া ছবির জগৎটাকেও ভিতরে ভিতরে ভালই বাসেন। ওদের হাতে ছেড়ে দিলে গল্পের গরু গাছে তুলে দেবার ভয়। এই স্বার্থেই চিত্র-নাট্য বা নাটক রচনার ব্যাপারে নিজে থেকে সাহায্যের হাত বাড়ান—মতের অমিল হলে তর্কাতর্কি ঝকাঝকিও করেন। তার সুফলও মেলে। মিলছে। ছবির বাজারেও জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে তিনি পুরোভাগে। অতএব স্ত্রী যা-ই বলুন, তাঁর কানে তুলো পিঠে কুলো।

মোহন চৌধুরীর এই নতুন ছবির ব্যাপারে তিনি যে একটু বেশিই জড়িয়ে গেছেন এও সত্যি কথাই। তার কারণও আছে। কেউ দেখে শেখে কেউ ঠেকে শেখে—মোহন চৌধুরী ঠেকে শিখেছে আর চার বছর বাদে ফিরে আবার তার দোরে এসে ধর্ণা দিয়েছে।

ভদ্রলোকের বয়েস এখন একচল্লিশ। প্রযোজক হিসেবে পঁয়তিরিশে ছবির জগতে তার প্রথম আবির্ভাব। লেখাপড়া জানা মানুষ, মগজে বুদ্ধির ধারও কিছু ছিল। সোমেনবাবুর দুটো গল্প নিয়ে পর পর দুটো ছবি করার পরেই মাথা বিগড়লো ভদ্রলোকের, বুদ্ধির ধার নিজেকেই কাটতে লাগল। প্রথম দুটো ছবিই মোটামুটি হীট পয়সার গরমে প্রতিভার চমক দেখাবার ঝোঁক চাপল মাথায়। তাবিপ করদ্ব মতো মোসাহেবও জুটল কিছু। সোমেন মিত্তিরের তৃতীয় গল্পের চিত্রনাট্যের ওপর প্রতিভার এমন স্টীম রোলার চালানো শুরু হল যে লেখকের চক্ষু স্থির। বিতর্ক প্রথমে বিবাদের দিকে গড়ালো, তারপর ছাড়াছাড়ি। সোমেন মিত্তির টাকা ফেরত দিলেন মোহন চৌধুরী গল্প ফেরত দিল।

নিজের মগজের ওপর নির্ভর করে ভদ্রলোক আরো তিনখানা ছবি করল একপর। প্রতিভাই পথে বসালো তাকে। তিন ছবিই মার। তৃতীয় আর চতুর্থ ছবিতে প্রথম দুটো ছবির লাভের কড়ি কানা। পঞ্চম ছবিতে এক-গলা দেনা।

ঠেকে শেখা শেষ। এবারে আবার নতুন করে দু পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদ। প্রোডাকশন ম্যানেজার দীপু সরকারকে সঙ্গে করে বাড়ি এসে হাজির এক সকালে। আসন নিয়ে সোমেনবাবুর দুই হাঁটুতে তার দু হাত। চেষ্টা করেও সেই হাত সরানো গেল না।—ঘাট হয়েছে, জীবনের মতো শিক্ষাও হয়েছে। ওমুক গল্পটা তার চাই—চাই-ই চাই। এবারে লেখক যা বলবেন তাই হবে, যেমন বলবেন তেমনি হবে। সর্বব্যাপারে তাঁর অনুমোদন ভিন্ন কিছু হবে না, কিছুই হবে না।

লেখকের এত কদর দেখে দীপু সরকার অবাক একটু। চতুর্থ ছবির কাজ থেকে সে মোহন চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত। তার আগেও নাকি কার একটা বিফল ছবিতে প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছে। বলা বাহুল্য, সোমেন মিত্তির সেই প্রথম দেখলেন তাকে।

ঝোপ বুঝে বিনয়ের কোপ ঝাড়ল সে-ও।—আমারও একই দশা সার, তিনটে ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজার—তিন ছবিই মার। মোহনদা বলছিলেন, আপনি হাল ধরলে ডুবন্ত নৌকোও পাল তুলে ছোটে—এখন আপনি রাখতে হয় রাখুন, কাটতে হয় কাটুন।

হা-ভাতে মূর্তি ছেলেটাকে প্রথম দিনই বেশ চৌকশ মনে হয়েছিল সোমেনবাবুর। পরে আরো ভালো করে জানার সুযোগ হয়েছে ওকে। দু কান কাটা, চোখেরও পর্দার বালাই নেই। দরকার হলে দিনকে রাত করতে পারে। তবু ছেলেটাকে কেন যে একটু পছন্দই করেন সোমেনবাবু, নিজেও ভালো জানেন না। দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সহজেই আপনার জন হয়ে ওঠার মতো গুণ আছে একটু। দু-চার দিন আসা-যাওয়ার ফাঁকে বউদি বউদি করে স্ত্রীর সঙ্গেও খাতির করে নিয়েছে। বউদির পা দুখানা দেখলেই ওর নাকি প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। কোন পুণ্যে দাদার অর্থাৎ সোমেনবাবুর এত আয়পয় সেটা নাকি ও এখন ভালো করেই বুঝতে পারছে, কিন্তু দুঃখ এই দাদা সেটা ভুল করেও বাইরে কখনো ফাঁস করেন না, সব ক্রেডিট একলাই—হজম করে বসে থাকেন।

সিনেমাঅলাদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি পছন্দ না হলেও এই ছেলের প্রতি স্ত্রীও বিরূপ নয় খুব। মুখে অবশ্য বলেন পাজির পা-ঝাড়া একটা। কিন্তু বাড়ি এলে চা বিস্কুটও এগিয়ে দেন। প্রণাম করার জন্য ঝকাঝকি করতে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন বয়েস কত?

দীপু সরকার বলেছিল একান্ন—

সন্ত্রস্ত হয়ে স্ত্রী দুপা সরে দাঁড়িয়েছিলেন ওমা—তাহলে প্রণাম কি আবার—বয়েসে—

বাধা পেয়ে দীপু সরকার গম্ভীর। —আর যদি বলি একতিরিশ?

—তাহলে অবশ্য অনেক ছোট।

ঘটা করে বড় নিঃশ্বাস ফেলেছে দীপু সরকার। —তাহলে আমার দুর্দশা বুঝুন বউদি, একতিরিশকে একান্ন বললেও চট করে কেউ অবিশ্বাস করে না—একলার মরুভূমির মধ্যে বাস করা ছাড়া আমার কি আর কিছু উপায় আছে?

অর্থাৎ এই কারণেই জীবনে ওর দোসর জোটার আশা মরীচিকা।

স্ত্রীর হাসির ফাঁকে ও প্রণাম সেরে নিয়েছে।

মোহন চৌধুরীর নির্ভরতার আতিশয্যে সোমেন মিত্তিরের কাঁধে দায়িত্বের ভার একটু বেশিই চেপেছে। তাঁরই পরামর্শ মতো অল্প টাকায় ভালো কাজ করবে এমন ডাইরেকটর বেছে নিয়েছে। পর পর ক-রাত তার সঙ্গে বসে সোমেন বাবুই চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন। তাদের বাহবার জন্যে নয়, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই সোমেন মিত্তিরের মনে হয়েছে, স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী ঠিক ঠিক করে যেতে পারলে ছবিটা লাগবে। অস্বস্তি যেটুকু ছিল সেটা ভিন্ন কারণে। গল্পের দাম পুরো পেলেও পার্টির এখন টাকার জোর কম সেটা গোড়া থেকেই বোঝা গেছে। স্ক্রিপ্টের টাকাটা পর্যন্ত পরে নেবার চুক্তি তাঁর সঙ্গে। অনেকদিন লাইনে আছে বলে স্টুডিও ভাড়া থেকে শুরু করে অনেক ব্যাপারেই ওইরকম পরে টাকা দেবার চুক্তি মোহন চৌধুরীর সঙ্গে। ছবির কাজ এগোলে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে টাকার যোগান আসবে এই স্থির বিশ্বাসে চোখ-কান বুজে নেমে পড়েছে ভদ্রলোক।

এই কারণেই দুশ্চিন্তা সোমেন মিত্তিরের। কোন পর্যন্ত এসে ছবি আটকে যাবে বলা যায় না। তবে ভরসার কথা টাকা-অলা মানুষ আছে দুজন মোহন চৌধুরীর সঙ্গে। একজন এক সিনেমা হল-এর মালিক—তার বন্ধু। প্রাথমিক মূলধন হিসেবে সেই ভদ্রলোক পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছে মোহন চৌধুরীর হাতে। দ্বিতীয় জন লোহার কারবারের মালিক উপেন হালদার। পঁচাত্তর হাজার টাকা নগদ গুণে দিয়ে সে এ-ছবির পার্টনার হয়েছে। আরো পঁচিশ হাজার দেবে। দীপু সরকার চুপি চুপি সোমেন মিত্তিরকে বলেছে, ওই লোহার কার্তিককে ঘায়েল করার সমস্ত ক্রেডিট তার।

লোহার কার্তিক শব্দটার অর্থ দীপু সরকারের জানা নেই হয়তো। মানে কালো কুৎসিত মানুষ। উপেন হালদারের বয়েস পঁয়ত্রিশ গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা আর স্বাস্থ্যবান পুরুষটা দেখতে দীপু সরকারের থেকে খারাপ নয় অন্তত। তবে ভালো স্বাস্থ্য এখন মেদের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বটে।

যাই হোক ছবি কিছু দূর টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো টাকা এদের হাতে আছে। তারপর ব্যক্তি-প্রভাব আর ছবির আনুষঙ্গিক চটকের জোর থাকলে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে টাকার যোগান আসে এও সত্যি কথাই। মোহন চৌধুরীর ধারণা এ দুই-ই তার আছে।

তবু শুরুতে হিসেব করেই পা ফেলা হয়েছিল। নায়কের ভূমিকায় একজন নামী শিল্পীকেই বহাল করা হয়েছে। গোল বেধেছিল নায়িকা নির্বাচনের ব্যাপারে। মোহন চৌধুরীর মতে এ-দেশে নায়িকার দুর্ভিক্ষ এখন। নামী নায়িকার পিছনে ছুটতে গেলে টাকার কাঁড়ি ঢালাই সার হবে। তাদের মধ্যে কারোই যাকে বলে তেমন আর 'ইয়ে' নেই এখন। তার থেকে দর্শকের চোখ মন ভরে দিতে পারে এমন একজন নতুন মেয়ে আনা ঢের ভালো। সন্ধানে সেরকম মেয়ে আছেও একজন—নতুন আবার আনকোরা নতুনও নয় একেবারে। মেয়েটাকে পেলে একটা ভালো পাবলিসিটি স্টান্ট হবে দেখবেন—

দীপু সরকার সংশয়ের আঁচড় কাটল, বলে তো দিলেন, নূপুর ব্যানার্জিকে আপনি সিওর পাচ্ছেন কিনা দেখুন আগে—ছবিতে আবার ফিরে আসছে খবর পেয়েই অলরেডি কজনের লাইন পড়ে গেছে কে জানে।

ওদের কাছ থেকেই ভাবী নায়িকার বিবরণ পেলেন সোমেন মিত্তির আর চিনলেনও। বছর নয় আগে খুব একজন নামী ডিরেকটরের ছবিতে এক সর্বস্ব খোয়ানো বিলাসী বুড়োর ফ্রক-পরা নাতনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিল মেয়েটা। নেচে গেয়ে ওই কিশোরী মেয়েটা তার দাদুকে আগলে রাখত সর্বদা। বলতে মনে পড়ল সোমেনবাবুর। সেই ছোট্ট রোলে মেয়েটা সর্বস্তরের প্রশংসা পেয়েছিল বটে। নয়বছর বাদে সেই মেয়ে কিরকম দাঁড়িয়েছে সেটা অবশ্য ধারণা করা যাচ্ছে না। কারণ এরপর আর কোনো ছবিতে তাকে দেখা যায়নি।...এ-গল্পটা নায়িকা-প্রধান। আর সেই কারণেই লেখকের খুঁতখুঁতুনি।

সেটা বুঝেই মোহন চৌধুরী আশ্বাস দিলেন কিছু ভাববেন না, আপনার পছন্দ হলে তবে কথা. আপনার পছন্দ না হলে আমি কোনো রিস্ক নেব না, আপনার ডিসিসনই ফাইন্যাল মশাই বুঝলেন। কিন্তু একবার দেখুন মেয়েটাকে, লেখা-পড়া জানা বড় ঘরের মেয়ে চালচলন ভালো দেখতে শুনতে তো ভালোই। তার দিক থেকেও আবার গল্প পছন্দ হওয়া চাই—খুব মন দিয়ে আপনার বই পড়ছে—এগিয়ে এলে তখন ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে।

শেষের কথাগুলো সোমেন মিত্তিরের [illegible] তাঁর গল্প শুনলে অনেক নামী নায়িকাও চোখ-কান বুজে এগিয়ে আসে। এতদিনে এটুকু সুনাম আর খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন। ওই বড় ঘরের লেখা-পড়া জানা মেয়ের দেমাক আছে বলতে হবে। ভাবী নায়িকাটি ভালো নাচতে গাইতে পারে শুনেছেন, কিন্তু তাঁর বিবেচনায় এ-গল্পের নায়িকার ওই গুণ দুটি শুধু অনাবশ্যক নয় চরিত্র-বিচারে অবাঞ্ছিতও। কিন্তু তখনকার মতো সোমেনবাবু এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না।

দিন তিন-চারের মধ্যে মোহন চৌধুরীর গাড়ি আবার তাঁর দোরগোড়ায়। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল দীপু সরকার, তার পিছনে একটি মেয়ে। বছর বাইশ তেইশ হবে বয়েস। লম্বা স্বাস্থ্য ভালো গায়ের রং খুব পরিষ্কার না হলেও ফর্সাই। মুখখানা মিষ্টি, তার থেকেও মিষ্টি তার মত কালো চোখের ঠান্ডা চাউনি। কে হতে পারে সেটা মিত্তির দেখেই অনুমান করেছেন। নূপুর ব্যানার্জি। ন' বছর আগে নামী ডিরেকটারের ছবিতে যে কিশোরীর ভূমিকায় একে দেখেছিলেন তার মুখের আদল মনে নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে এই রমণী-শ্রী দৃষ্টিপ্রসন্ন হবার মতোই।

সামান্য সংকোচ সত্ত্বেও সপ্রতিভ হাসি মুখেই। দীপু সরকার সহাস্যে জিজ্ঞাসা করল কে বুঝতে পারছেন?

সোমেন মিত্তিরও হাসি মুখেই মাথা নাড়লেন। তিনি বাধা দেবার আগেই নূপুর ব্যানার্জি এগিয়ে এসে নত হয়ে পায়ে হাত রেখে প্রণাম করল।

—বোসো বোসো।

দীপু সরকার জানান দিল, আপনার বই শেষ করেই ট্যাকসি হাঁকিয়ে টালা থেকে বালিগঞ্জে ছুটে এসেছেন মোহনদার কাছে—ফাইন্যাল ডিসিশনের জন্য তিনি সোজা আপনার এখানে পাঠিয়ে দিলেন। গল্প পড়ার পর ইনি যাকে বলে একেবারে এনেমারড্ হয়ে আছেন।

সপ্রতিভ মুখে নূপুর ব্যানার্জি বলল মোহনবাবু না পাঠালেও আপনাকে দেখার আর পায়ের ধুলো নেবার জন্য এখানে আসতাম।

গলার আওয়াজও সুপুষ্ট মিষ্টি। মেয়েটি ভালো নাচতে গাইতে জানে। ছবির সেই কিশোরীর নাচ গান সোমেন বাবুর এখন আর মনে নেই। এই মেয়ের ঘরে আসা নত হয়ে প্রণাম করা বা চেয়ারে গিয়ে বসার ভঙ্গিটুকু দেখে মনে হল বেশ একটা ছন্দ যেন ওই দেহশ্রীর জুতে আছে ইচ্ছে করলেই যেন উচ্ছল হতে পারে আবার সংযমের মাধুর্যও জানে। সত্যিই ভালো লেগেছে সোমেনবাবুর।

জিজ্ঞাসা করলেন, গল্প পছন্দ হয়েছে তাহলে?

মাথা কাঁধের দিকে হেলিয়ে সায় দিল। বলল, এ-গল্পের নায়িকার রোল আপনারা আমাকে দিতে পারেন বিশ্বাস করতেও ভয় করছে।

সোমেনবাবু হাসতে লাগলেন।—রোল দেবার ব্যাপারে আমি কেউ না. এ'রাই সব—

নূপুর মাথা নাড়ল মোহনবাবু বলে দিয়েছেন আপনিই সব।

দীপু সরকার মাথা ঝাঁকিয়ে তার কথায় সায় দিল। সোমেনবাবুর প্রতি ইদানীং এদের আনুগত্য বাড়ার আরো একটু কারণ আছে। তাঁর একজন অন্তরঙ্গ আর স্নেহভাজন বন্ধু মোটামুটি চালু ডিস্ট্রিবিউটার। গল্পটা তারও পছন্দের। মোহন চৌধুরীকে নিয়ে সোমেন মিত্তির তার কাছে গেছলেন, সব শুনে সেই ডিস্ট্রিবিউটর বন্ধু ফিরে সোমেনবাবুকেই বলেছেন উনি সক্রিয়-ভাবে এই ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তবেই সে দায়িত্ব নেবার কথা ভাবতে পারে। মোহন চৌধুরী অমলানবদনে তাকে জানিয়েছে উনিই এ-ছবির আসল কর্ণধার, ওঁর পরামর্শ ছিন্ন এক পাও এগনো হচ্ছে না।

অতএব সোমেন মিত্তির সদয় থাকলে নির্ভরযোগ্য ডিস্ট্রিবিউটর হাতে পাওয়ার আশা।

দীপু সরকারের মাথা ঝাঁকানি দেখে তিনি হেসেই বললেন, তোমরা আমাকে এভাবে জড়িয়ে ভালো করছ না। নূপুরকে বললেন, তুমি তো ভালো নাচতে গাইতে পারো শুনেছি—

সঙ্গে সঙ্গে দীপু সরকারের দরাজ তালিম।—শুনেছেন কি, ন'বছর আগের সেই 'ক্ষয়' ছবিতে দেখেননি! গান অবশ্য এখন আর করে না, কিন্তু এখনকার নাচ যদি দেখতেন! গলার স্বরে প্রত্যাশার উদ্দীপনা।—আচ্ছা দাদা, এ-গল্পে ওঁর একটা নাচ কোনরকমে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না!

—ধ্যেৎ! সোমেনবাবু কিছু বলার আগেই নূপুর ব্যানার্জী বলে উঠল, নাচ ঢুকিয়ে এ গল্প মার্ডার করার থেকে আমাকে বাদ দেওয়াই ভালো।

এম এ পাস দীপু সরকারের পছন্দটা ছবির সস্তা চটকের দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু মেয়েটিকে সত্যিকারের বুদ্ধিমতী মনে হল সোমেনবাবুর। হেসে মন্তব্য করলেন, না, এ ছবিতে নাচ আসে না। ...আচ্ছা, মোহনবাবুর সঙ্গে কথা-বার্তা বলে যা হয় ঠিক করা যাবে—

নূপুর ব্যানার্জী উঠল তক্ষুণি, বাধা না মেনে আবার পায়ের ধুলো নিল। বলল, ছবিতে আসব যখন ঠিক করেছি, একদিন না একদিন আসবই দাদা.. তবে শুরুতে আপনার আশীর্বাদ নিয়ে এই গল্পে নামতে পারলে সত্যিকারের ভাগ্য জানব। ...আসলে গল্পটা আমি দু'বার পড়া শেষ করেছি কাল রাত্রে. আর তার-পর হবে কি হবে না এই আশার মধ্যে

মশার কামড়ে প্রাণ যায়!

সবচেয়ে বেশি কার্যকরী মশা বিতাড়ক

তাহলে ব্যবহার করুন

ওডোমস

লক্ষ লক্ষ লোক এর ওপর নির্ভর করেন আর এটাই ব্যবহার করেন • শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক
BALSARA বালসারা হাইজিন প্রোডাক্টস (প্রা.) লি.
৪৩,নাগীনদাস মাস্টার রোড,বোম্বাই ৪০০ ০০১।

CHAITRA BLS 45 BEN

পড়ে সমস্ত রাত ভালো ঘুমুতে পারি নি।

এরা বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সোমেন মিত্তিরের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। হাসির খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাহলে লেখা ছেড়ে ছবির রাজ্যে ঢুকলে এখন?

সোমেনবাবু হালকা সুরে পাল্টা অনুযোগ করলেন, সেই রাগেই এক পেয়ালা চা-ও দিলে না...।

—আপ্যায়নের ইচ্ছে থাকলে বলতে না কেন!...তোমার এ-গল্পে বাপু ওই আদুরে মুখ মানাবে না বলে দিলাম।

মায়ের ভয়ে মেয়ে ঘরে ঢুকতে সাহস করল না। ও-ঘর থেকেই জানান দিল, ভালো মানাবে বাবা—

মুখ ঝামটা দিয়ে স্ত্রীটি ও-ঘরের দিকে তাকালেন। সোমেনবাবু হাসতে লাগলেন।

ভিতরে ভিতরে একটু ভাবছেন তিনিও। স্ত্রীর মন্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। এ গল্পের নায়িকার মুখ আরো একটু সংযত কঠিন হলে ভালো হত। এই চরিত্রে ঘা-পোড় খাওয়া মেয়ের নরম দিকটা উবেই গেছে প্রায়। কিন্তু গৃহিণীর উক্তির সবটাই ঠিক তাও বলা যায় না। মেয়েটির কমনীয় মুখের চাউনিটা বেশ স্বচ্ছ অথচ ঠাণ্ডা। ভালো মতো তালিম পেলে হবে না এমন নয়। তবু সোমেন মিত্রর ভাবনার আরো একটু কারণ আছে। ডিস্ট্রিবিউটার বন্ধুর আশ্বাস পেয়ে কোনো নামী নায়িকাকে আনার প্রস্তাবটাও মনে এসেছিল তাঁর।

কিন্তু মোহন চৌধুরীর ইউনিটের সঙ্গে দেখা হতে সে রকম কিছু বলাই গেল না আর। দীপু সরকারের উচ্ছ্বাসের ফলে তারা ধরেই নিয়েছে লেখকের নায়িকা পছন্দ হয়েছে। সেদিন ঘর থেকে বেরুবার আগে উদগ্রীব মুখে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন দেখলেন দাদা?

সোমেন মিত্তির হেসে বলেছিলেন, ভালই তো...।

সেই ভালোটা সকলের কাছে কত গুণ ফাঁপিয়েছে যে, বলা যায় না! এদিকে মোহন চৌধুরী আর উপেন হালদার ছেড়ে অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান অজিত শ্যামলও সার্টিফিকেট দিয়েছে, চমৎকার নায়িকা হয়েছে, দর্শক যা চায় তার সব কিছুই নাকি ফোটোগ্রাফিতে চমৎকার আসবে—আর চোখের একস-প্রেশনের তো কথাই নেই। নুপুর ব্যানার্জীর নানা ভঙ্গীর কয়েকটা ছবিও ফেলে দেওয়া হল তাঁর সামনে।

অগত্যা শেষ খুঁতখুঁতুনিটুকুও বাতিল করতে হল লেখককে।

মহা সমারোহে ছবির মহরৎ হয়ে গেল। দু দফায় পাঁচ দিনের শুটিংও শেষ পরের এক মাসের মধ্যে। বিদিশার আসরে বসে মোহন চৌধুরী অল্প অল্প হাসে আর একটু একটু দোসে আর বলে, আপনার নায়িকা চমৎকার মশাই!

সহযোগী প্রযোজক উপেন হালদার মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তারও পরিতুষ্ট চাউনি নায়িকার মুখের ওপর উছলে ওঠে যেন। দীপু সরকার আনন্দে মুদু-মুদু টেবিল চাপড়ায় আর নুপুর ব্যানার্জীর মুখখানা সরাসরিই চেয়ে চেয়ে দেখে। সোমেন মিত্তিরের এখানকার এই সান্ধ্য আসর খুব যে পছন্দ তা নয়! কিন্তু ছবির রাজ্যের এই রীতি জানা আছে তাঁর। এসব জায়গায় এসে না বসলে এদের অনেকের মাথা খোলে না, আলোচনাও জমে না। গোড়াতেই লেখককে শুনিয়ে রেখেছে মোহন চৌধুরী অবকাশ বিনোদনের এ খরচা দুই প্রযোজকের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আসছে। আলোচনার প্রয়োজনে নায়িকাকে প্রায়ই ধরে আনা হয়, নায়কেরও দর্শন মেলে এক-একদিন। তবে নতুন নায়িকার জড়তা কাটানোটাই বেশি দরকার মনে করে তারা। আর সোমেন মিত্তির না আসতে চাইলে এখান থেকেই টেলিফোনে জোর তলব যায় বাড়িতে। তাছাড়া বাড়তি কিছু দায়িত্ব যখন নিতেই চলেছেন, দেখাশুনা আলাপ-আলোচনা হওয়া একটু দরকারও। সেকারণে স্টুডিওতে আসা-যাওয়াটা আরো খারাপ লাগে।

কিন্তু আসর জমে উঠলে অর্থাৎ জলীয় পদার্থের মাত্রা বাড়তে থাকলে আলোচনা খুব এগোয় না। শুরু থেকে অর্থাৎ এই গত দু মাসের মধ্যে খোদ প্রযোজক দুটিরই আচরণে বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন তিনি। বলা-বাহুল্য সে আচরণের সবটাই নুপুর ব্যানার্জীকে কেন্দ্র করে। ছবি করাটাই যেন শেষ কথা নয় এদের। নায়িকাকে নিয়ে একটু যেন চাপা রেষারেষি শুরু হয়েছে দুজনার। এ লাইনে এই চরিত্রের মানুষও দেখা আছে সোমেনবাবুর, আর স্বতঃসিদ্ধ পরিণামও জানা আছে। দায়িত্বের ঝুঁকি নেবার মুখে এই কারণেই চিন্তিত তিনি।

এই ব্যাপারে নুপুর ব্যানার্জীকে আভাসে একটু সমঝে দেবার ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠছেন না। মেয়েটাকে এখনো সত্যিই ভালো লাগে তাঁর। এই ছবি ধ্যান-জ্ঞান। ফাঁক পেলে সে-ই শুধু সোমেনবাবুর সঙ্গে অভিনয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা জুড়ে দেয়। পরামর্শ চায়। তাঁর প্রতি একটু কৃতজ্ঞও বটে মেয়েটা। তাছাড়া বলবেনই বা কি, লেখাপড়া জানা বড় ঘরের মেয়ে, চেহারা-পত্র ভালো, পুরুষের এই নির্লজ্জ স্তুতির দিকটা হয়তো ভালই জানে। তার সুবিধে ছাড়া অসুবিধে কি। আর, এ লাইনে এলে রাতের এই গোছের জমাট আসরের পরিবেশে অভ্যস্ত হতেও সময় লাগে না খুব।

তবে হালকা ঠেসের সুরে বাড়িতে একদিন দীপু সরকারকেই বলেছিলেন কথাটা। —তোমার প্রোডিউসার দুটির তোদেখি ছবির থেকে নায়িকাকে নিয়েই উৎসাহ বেশি—

ভেবেছিলেন, তড়বড় করে দীপু সরকার পাঁচটা বাজে কথা তুলে প্রসঙ্গ চাপা দিতে চেষ্টা করবে। তার বদলে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসেছে।—আপনি লক্ষ্য করেছেন! পায়ের ধুলো দিন দাদা —এই না হলে এতবড় লেখক এমনি হয়।

সোমেন মিত্র বলেছেন, এ রকম হলে আমার পক্ষে একটু অসুবিধে, ডিস্ট্রিবিউটার আমার ওপর কিছুটা নির্ভর করছে জানই তো...ছবি মনের মতো না হলে তার ওপর জোর করা কঠিন হবে।

ভেবেছিলেন, কথাগুলো দীপু সরকারেরও পছন্দ হবে না, আর তার মারফৎ ওই দুই প্রোডিউসারের কানে উঠবে। কিন্তু তার বদলে সাগ্রহে সামনে ঝুঁকেছে ও।—আপনি ওঁদের একটু সমঝে দিন না দাদা, আর নুপুরকেও একটু বলে দিন। বেলেল্লাপনা মনে হলে কেন এসবের মধ্যে থাকতে যাবেন! একথা শুনলে সক্কলের টনক নড়বে। আমাকে বলে কি হবে, প্রোডাক্-শন ম্যানেজার বলুন আর যাই বলুন, পেয়ারের চাকর ছাড়া আর কেউ কিছু ভাবে না। আর হিরোইনরা তো আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না।

ঈর্ষা এই ছেলেটাকেও তলায় তলায় কাটছে কিনা সোমেনবাবু ঠাওর করে উঠতে পারেন নি।

জ্বরের দরুন বিদিশার সান্ধ্য আসরে পর পর তিনদিন অনুপস্থিত। দীপু সরকার তাই বাড়িতে দেখতে এসেছে তাকে। বলেছে, তাড়াতাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠুন দাদা, এই কাজের সময় আপনি বিছানায় পড়ে থাকলে চলে মোহনদা দেখতে পাঠালেন, আপনার নায়িকাও খুব চিন্তিত। তাছাড়া কদিন আপনাকে না দেখে মিস্টার আউল দি ফিলসফারের চোখ আমাদের টেবিল থেকে আর নড়ছেই না বলতে গেলে। তবে গত সন্ধ্যায় আপনাদের হিরোইনটি আসেন নি বলে তার আর অতটা ইন-টারেস্ট ছিল না অবশ্য—

যাবার আগে দীপু সরকার জানান দিয়ে গেল, সেইদিনই সন্ধ্যার গাড়িতে জামসেদপুরের এক জায়গায় লোকেশন শুটিং-এর সাইট দেখতে যাচ্ছে মোহন চৌধুরীর সঙ্গে। দুদিন বাদে ফিরে এসে আবার দাদার শরীরের খবর নেবে।

কিন্তু দিন-তিনেক পরের সকালে এসে শরীরের খবর নিতে সে ভুলেই গেল। অবশ্য হ্যাটামুটি ভালই আছেন সোমেন-বাবু। দীপু সরকারের বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর, সাইট দেখা হল?

শুকনো জবাব এলো, হ্যাঁ, কাল

সকালেই ফিরেছি।...কিন্তু খবর ভালো নয় সার।

বেশি সিরিয়াস বা বেশি প্রগলভ না হলে দীপু সরকার সার বলে না। এখন সিরিয়াস।

সোমেন মিত্তির জিজ্ঞাসু নেত্রে লক্ষ্য করলেন একটু।—কি ব্যাপার?

—উপেন হালদারের নিরেট মাথায় কি ঢুকেছে কে জানে। মোহনদার ওপরে অনেক দিন ধরে তেতে আছে দেখছেন তো—কাল জামসেদপুর থেকে ফেরার পর জোর খটাখটি লেগে গেল।

—কেন?

—কেমন করে যেন জানতে পেরেছে নূপুরের ব্যানার্জীও গেছল আমাদের সঙ্গে। আসলে সেই রাগ। মুখের ওপর যাচ্ছেতাই বলে দিলে মোহনদাকে, অমথা টাকা ওড়ানো হচ্ছে কিনা সেই সন্দেহে খাতাপত্র দেখতে চাইলে। মোহনদা জাত প্রোডিউসার, এতটা বরদাস্ত করার পাত্র নন—তিনিও দু'কথা শোনালেন।

শুনে সোমেন মিত্র হতভম্ব, বিরক্তও।—এই করলে আর ছবি হয়েছে। তোমরা গেলে শুটিংএর সাইট দেখতে, নূপুরের যাওয়ার দরকার হল কেন?

দীপু সরকার ঠাণ্ডা জবাব দিল, মোহনদা প্রস্তাব করলেন, উনিও বেড়াবার সখে চলে গেলেন—

—নূপুরের বাবা মা, মানে বাড়িতে গার্জেন কেউ নেই?

—সবই আছেন। এ লাইনের দস্তুর তো জানেন দাদা, গোড়ায় গোড়ায় একটু আধটু প্রোডিউসারের মন রেখে চলতেই হয়। সামনে ঝুকল একটু।—আপনাকে আপনারজন ভাবি বলেই বলছি, কাউকে বলবেন না যেন—এক-চল্লিশ গড়িয়ে চলল মোহনদার বয়েস, কিন্তু এসব রস ভদ্রলোকের দিনে দিনে বাড়ছেই যেন... আমি সঙ্গে না থাকলে বা সন্ধ্যের পর ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে মদে ডুবিয়ে না রাখলে ভদ্রমহিলাকে একটু মুশকিলেই পড়তে হত বোধ হয়—ইউনিটের সঙ্গে ছাড়া আর তিনি এভাবে বেড়াতে বেরবেন বলে মনে হয় না।

ভিতরটা এত তিক্ত হয়ে গেল সোমেন বাবুর যে এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর রুচি থাকল না।

পরদিন একে একে দুই প্রযোজকেরই পদার্পণ ঘটল তাঁর বাড়িতে। প্রথম ঝকমকে গাড়ি হাঁকিয়ে এলো উপেন হালদার। তার বক্তব্য মোহন চৌধুরী ছবির টাকা অন্যভাবে ওড়াচ্ছে, তাকে বিশ্বাস করা এখনই অসম্ভব হয়ে উঠছে, পরে আরো তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এখন লেখক যদি তাঁর বন্ধু ডিস্ট্রিবিউটারের সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা করেন তাহলে পার্টনারশিপ ব্রেক করে একাই সে ছবি আধা-আধি টেনে নিয়ে যাবার হিম্মৎ রাখে।

সোমেন বাবু তাকে জানালেন, সেটা সম্ভব নয়, কারণ গল্প মোহন চৌধুরীর একার নামে কেনা—ফয়সলা তাঁর সঙ্গেই করতে হবে। আর এও জানিয়ে দিলেন কোনো গোলযোগের মধ্যে তাঁর থাকার ইচ্ছে নেই।

সে বিদায় হবার আধ ঘন্টার মধ্যে মোহন চৌধুরীর গাড়ি বাড়ির দরজায়। উপেন হালদারের মতো অত মাথা গরম নয় এই মানুষের। তার থেকে বুদ্ধিও বেশি ধরে। চালচলনেও আভিজাত্যের ভাব আছে। তা হলেও সোমেন মিত্তিরের চাপা রাগ এর ওপরেই বেশি। এই ভদ্রলোকের ওপর নির্ভর করেই অনেক সময় নষ্ট করেছেন, অনেকখানি এগিয়েছেন।

মোহন চৌধুরীর আগমনের উদ্দেশ্যও অনেকটা একই। তারও বক্তব্য, লোহার কারবারীর সঙ্গে জোট বাঁধাটাই ভুল হয়েছে। যাই হোক, গল্প তার নামে কেনা আর তার কোম্পানীর নামেই ছবির কাজ এগোচ্ছে। এখনো তার নিজস্ব কিছু সংগতি আছে, এখন লেখকের সেই বন্ধু ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে আরো একটু ভরসা পেলে পার্টনারশিপ নাকচ করার কথাই ভাবছে সে।

সোমেন মিত্তির বললেন, খানিক আগে উপেন হালদারও এই একই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।

শুনে কৌতুক বোধ করল যেন ভদ্রলোক।—ওই লোহার মাথায় ব্রহ্মজ্ঞের জোরে ছবি শেষ করবে।

সোমেনবাবু রসিকতার ধার দিয়েও গেলেন না। সাফসুফ বলে দিলেন, আপনারা নিজেদের মধ্যে যদি মিটমাট করে নিতে না পারেন এ ছবি আর বেশি দূর এগোবে বলে আমার মনে হয় না। সে চেষ্টাই দেখুন, নয় তো আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি, আর পারব না।

আহত মনোভাব নিয়ে প্রস্থান করল মোহন চৌধুরীও।

এর তিন দিন বাদে দীপু সরকার এসে ঝোলাঝুলি—সন্ধ্যার পরে বিদিশায় হাজিরা দিতেই হবে আজ। মিটমাটের আশায় অনেক কষ্টে আজ ওখানে আসর বসানোর ব্যবস্থা করা গেছে। সব মার মন পরিষ্কার করে নেবার এই এক সুযোগ। এর মধ্যে লেখক উপস্থিত না থাকলে মিটমাটের কোনো আশাই নেই।

সন্ধ্যায় সোমেন মিত্তিরের দরকারী কাজ ছিল কিছু। বললেন, যেতে পারি, কিন্তু আমার দেরি হবে একটু।

দীপু সরকার বলল, দেরি হলেও আসুন—অবশ্য আসুন।

সুরার প্রতিক্রিয়ার প্রগলভ দিলদরিয়া রূপটা অনেক দেখা আছে সোমেন মিত্তিরের। কিন্তু এর বিপরীত রূপটা জানা থাকলেও এমন আর কখনো দেখেন নি।

তিনি হাজিরা দিয়েছেন রাত প্রায় ন'টায়। ভিতরে পা দিয়েই জানালার ধারের একক আসনের মানুষটাকে অর্থাৎ বড়ুয়া সাহেবকে যথাস্থানে সমাসীন দেখেছেন। সামনে সারি সারি গেলাসের তিনটে খালি, একটার সদ্ব্যবহার চলছে, এবং আরো দুটো মজুত। পরনে সেই সাদা ঢোলা কোর্তা, পাশে মাটিতে সেই মোটা ব্যাগ। কৌতুক-মাখা নিবিষ্ট দৃষ্টি এদিকের অর্থাৎ মোহনবাবুদের টেবিলে। ওখান থেকেও কিছু উপভোগের রসদও মিলছে যেন। সোমেনবাবুর সঙ্গে চোখোচোখি হতে পরিচিতের মতোই সামান্য মাথা নেড়ে অভ্যর্থনা জানালো। ভাবখানা, এতদিনে আবার দেখা হল তাহলে।

সোমেন মিত্তির আজ আর কেন যেন তেমন পাত্তা দিতে চাইলেন না লোকটিকে। সামান্য মাথা নেড়ে নিজেদের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বয়কে ডেকে দীপু সরকার তাঁর জন্য সফট ড্রিংক এর অর্ডার দিল। নূপুর ব্যানার্জির পাশের চেয়ারটা হয়তো তাঁর জন্যই খালি রাখা হয়েছে। সোমেনবাবুকে দেখে মেয়েটার মুখে যেন আশার ছোঁয়া লাগল একটু। কিন্তু সোমেনবাবু তাকেও এক-রকম উপেক্ষা করেই চেয়ার টেনে নিলেন। ভিতরে ভিতরে এখন বিরূপ এর উপরেও। তাছাড়া আজ ঠিক প্রগলভ অবকাশ বিনোদনের সমাবেশ নয় এটা। সেই কারণেই আজ অন্তত দলটাকে ছোট করা উচিত ছিল। কিন্তু এক মঞ্জু দত্ত ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত আজও।

আসন নেবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সোমেন মিত্তির অনুভব করলেন ব্যাপার সুবিধের নয়। আসরের বাতাস থমথমে। পানেরও কিছু মাত্রাধিক্য ঘটেছে মনে হয়। মোহন চৌধুরী একটু বেশি দুলছে কিন্তু মুখ গম্ভীর। উপেন হালদার পাঁচ আঙুলে যে-ভাবে তার গেলাস চেপে বসে আছে তাইতেই তার ভিতরের আঁচ বোঝা যায়। নাকের ডগা লাল। ক্যামেরাম্যান অজিত শ্যামল আর মিউজিক ডাইরেকটর নিশীথ কর যেন তাদের উপস্থিতির কারণেই ম্রিয়মাণ। দীপু সরকারের কোটরের ঘোলাটে চোখে হালছাড়া ভাব। শুধু নূপুরের মুখখানাই দ্বিতীয়বার আর লক্ষ্য করলেন না সোমেনবাবু।

বললেন, কি ব্যাপার, সব এত চুপচাপ যে?

নড়েচড়ে ঠোঁটে একটু হাসি মাখাতে চেষ্টা করল মোহন চৌধুরী। বলল আর পারা গেল না মশাই ছবি ছেড়ে এখন হিসেবের জাল তৈরির ব্যাপারটা বড় হয়ে উঠছে—

দেড় হাত ফারাক থেকে উপেন হালদার ফোঁস করে উঠল, আপনি এক-

যারে মন-প্রাণ ঢেলে ছবি করছেন—কেমন ?

সচকিত সোমেন মিত্তির পাশের দিকে ঘাড় ফেরালেন একটু। ও-ধারের বড়ুয়াসাহেবের সজাগ চোখ আর কান এখনো এই বড় টেবিলের দিকে। বিব্রত সোমেন মিত্তির আবেদন জানালেন, আস্তে ?

সে-কথায় কান না দিয়ে মোহন চৌধুরীর দু-চোখ উপেন হালদারের মুখের ওপর টান হল। টেনে টেনে জবাব দিল, আমি ছবিই করছি, আপনি বরং এ-সব ছেড়ে ঝাঁকায় করে লোহা ফেরি করুনগে যান--

চেয়ার ঘুরিয়ে তার দিকে ফিরল উপেন হালদার। নেশায় আগুন ধরল বুঝি।—লজ্জা করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে ? ফান্ড ভেঙে হিরোইনকে নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন—তাকে ছবির দুল প্রেজেন্ট করছেন বেনারসী প্রেজেন্ট করছেন—এ-সব আমার জানতে বাকি ? উনি ছবি করছেন—

শাট আপ!

—ইউ শাট আপ !

—ট্রাপিড !

ঝটকা মেরে উঠতে গিয়ে উপেন হালদারের মাজার ধাক্কায় টেবিলের দু-তিনটে গেলাস উল্টে গেল। ওদিকে মোহন চৌধুরীও প্রায় নিজের অগোচরে ভারী দেহটা আধখানা টেনে তুলেছে চেয়ার থেকে। ঠিক তখনই এক হাতে তার গলা চেপে ধরল উপেন হালদার, অন্য হাত নাক-মুখ বেড়িয়ে বিপুল ওজনের ঘুষি একখানা।—স্কাউণ্ড্রেল!

একটা কাচের গেলাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল মোহন চৌধুরী। কিন্তু গলায় হাত পড়ার সময় উপেন হালদারের জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরতে পেরেছিল সে। সেই আকর্ষণে টাল রাখতে না পেরে সেও টেবিলের ওপরেই আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দুটো সোডার বোতল, আর জলের বড় জাগটা মাটিতে পড়ে চূর্ণ-চূর্ণ। সামাল দেবার চেষ্টায় উঠে পড়েছে দীপু সরকার, অজিত শাসমল আর নিশীথ কর। কিন্তু পানের মাত্রাধিক্য আর পরিস্থিতির কারণে তারাও বে-সামাল। তাদের হাতের ধাক্কায় আরো দুটো গেলাস আর দুটো বোতল মাটিতে পড়ে ভাঙ্গল।

এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যে এই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

এতবড় হল-এর সকলের চোখ এখন এই টেবিলে। কেউ কেউ চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে। বয়গুলো দৌড়ে এসেছে। ম্যানেজার অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজারও দ্রুত দুর্যোগ ক্ষেত্রে হাজির।

উপেন হালদার নিজেই দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণে দীপু সরকার আর অজিত শাসমল মোহন চৌধুরীকে টেনে তুলেছে। গেলাসের কাচে তার কপাল কেটে রক্তাক্ত। ঘুষিটা পড়েছে নাকের পাশের হাড়ের ওপর। সে জায়গাটা মারবেলের মতো ফুলে উঠেছে। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে।

টেনে তোলা হাতে মোহন চৌধুরী দু-চোখ টান করে তার শত্রুর দিকেই তাকালো প্রথম। লম্বা দম নিয়ে বলল, সোয়াইন !

উপেন হালদার আবার মাথার ওপর হাত উঁচলো। কিন্তু থাবা নেমে আসার আগে পাশ থেকে এবার সেটা ধরে ফেললেন সোমেন মিত্তির। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, বসুন চুপ করে !

বয়ের দল আর ম্যানেজার ছেড়ে এখন অনেক খদ্দেরও রণ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত। ম্যানেজারটি কেবল বলছে, ভেরি ব্যাড—ভেরি ব্যাড !

—ইয়েস, ভেরি ভেরি ব্যাড। নাও জেন্টলম্যান, কোয়ায়েটলি টু ইওর প্লেসেস প্লীজ—হি নিডস্ সাম অ্যাটেনশান।

সকলে সচকিত হয়ে দেখল, বস্তা জানলার ধারের একক আসনের ঢোলা কোর্তা-পরা লোকটি। গলার ভারী স্বরে হুকুমের আমেজ। সকলকে যার-যার জায়গায় চলে যেতে বলছে। 'হি' অর্থাৎ আহত লোকটার শুশ্রূষা দরকার বলছে।

তিন চারজন বয় আর ম্যানেজার ছাড়া আর সকলে সরে গেল। হাত ধরে বড়ুয়া সাহেব মোহন চৌধুরীকে একটা চেয়ারে টেনে বসালো।—বি কোয়ায়েট এণ্ড লেট মি সী।

চুলে হাত দিয়ে মাথাটা পিছন-দিকে হেলে ধরল মোহন চৌধুরীর। কপালে ক্ষত জায়গাটা দেখল।—জাস্ট এ মিনিট—

লম্বা পা ফেলে নিজের জায়গা থেকে পেট মোটা ব্যাগটা নিয়ে এলো। এই টেবিলের ওপর রেখে সেটা খুলে ফেলল। মস্ত ব্যাগটার ভিতরে অনেক রকমের ওষুধের শিশি, যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম, ইনজেকশানের বাক্স, ব্লাড-প্রেসার মাপার ছোট যন্ত্র, আরো কত কি।

সকলে নির্বাক দাঁড়িয়ে দেখছে। খানিকটা তুলো ছিঁড়ে একটা শিশির আরকে ভিজিয়ে পাকা হাতের তৎপর মনোযোগে কপালের ক্ষত স্থান পরিষ্কার করল। তারপর একটা সরু টর্চ বার করে কপালের ওপর জেলে ঝুঁকে দেখতে লাগল। সেটা রেখে আরক-ভেজানো তুলো দিয়ে নাকের পাশটা আর কাটা ঠোঁটও পরিষ্কার করে দিল। শেষে কপালে শাদা-মতো ওষুধের গুড়ো ছিটিয়ে তার ওপর সিউকোপ্লাস্ট এঁটে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে তাকালো একবার। মৃদু-গম্ভীর গলায় বলল, আমার মতে এরপর একটা এ-টি-এস নিয়ে নেওয়া ভালো।

ব্যাগটা গোছাতে গোছাতে ক্রুদ্ধ-বদন ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বলল, নাও ইউ মে গো। ইওর লস্ কভারড্ অ্যাণ্ড প্লেট দেম গো টু হেল!

ব্যাগ হাতে সামনে পা বাড়িয়েই থামল আবার। নূপুর ব্যানার্জির মুখোমুখি। সোমেন মিত্তির দেখছেন। নিঃশব্দে একটা ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু কাপটা এসে লাগল যেন মেয়েটার মুখের ওপর। বেচারী তাইতেই ভেবাচাকা।

লম্বা পা ফেলে নিজের টেবিলে ফিরে গিয়ে ব্যাগ মাটিতে রেখে বসল।

এবারে সকলের খেয়াল হল, উপেন হালদারের চেয়ার খালি। অর্থাৎ এই ফাঁকে কখন উঠে পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে সে। জায়গা পরিষ্কার করার জন্য আরো দুটো লোক এই টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ম্যানেজার তার পাওনা বুঝে নিয়ে প্রস্থান করল। বাকি কজনের বিদায়ের অপেক্ষায় বেয়ারা ক'টা এবং ঝাড়ুদার দাঁড়িয়ে। দীপু সরকার আর অজিত শাসমল মোহন চৌধুরীকে দুদিক থেকে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলল। তাদের পিছনে নিশীথ কর। নূপুর ব্যানার্জী দু'পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। সোমেন মিত্তিরই শুধু দাঁড়িয়ে। চোখোচোখি হতে তিনি ইশারায় চলে যেতেই বললেন তাকে।

কিন্তু ফেরার আগে নূপুরের দু-চোখ যেন আপনা থেকেই জানলার ধারের টেবিলের ওই মানুষটার মুখের ওপর ধাক্কা খেল আবার। সোমেন মিত্তিরও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। চিরে চিরে দেখার মতো করে নূপুরের দিকেই চেয়ে আছে লোকটা। চাউনি তীক্ষ্ণ, রূঢ়।

ঘাবড়ে গিয়েই নূপুর ব্যানার্জী তাড়াতাড়ি ঘুরে দরজার দিকে চলল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সকলেই চোখের আড়ালে।

সোমেন মিত্তির তখনো ওই লোকের দিকেই চেয়ে আছেন। বড়ুয়া সাহেবও দেখল তাঁকে। তারপর একটু একটু করে যেন মেজাজে ফিরতে লাগল। কৌতুক মাখা চাউনিতে ঈষৎ আপ্যায়নের আভাস।

বাঁ-হাতে একটা চেয়ার টেনে সোমেন বাবু সেদিকে এগোলেন।

॥৩॥

—আপনি তাহলে ডাক্তার?

—ইয়েস সার, এ লোফিং সাজন, ডকটর এল বড়ুয়া—লোকানন্দ বড়ুয়া। তিনি এসে বসাতে এতক্ষণের অপ্রিয় ব্যাপারটার ওপর যেন এক ঝলক খুশির আলো পড়ল। চটপট চারটে খালি গেলাস আর দুটো খালি সোডার বোতল সোমেন বাবুর সামনে থেকে তুলে এক-

পাশে মাটিতে রাখল। সেগুলো তুলে নেবার জন্য বয় ছুটে এলো। টেবিলে এখন দুটো গেলাস, একটাতে রসদ মজুত, অন্যটা হাতে। মুখের দিকে চেয়ে হাসছে অল্প অল্প।—হাউ ডুই ইউ লাইক মাই নেম সার?

সোমেন বাবু জবাব দিলেন, বেশ নতুন গোছের—

হাতের গেলাস মুখের কাছে তুলেও সামনে রাখল আবার। চাউনিটা উৎফুল্ল। —ভেরি ফানি! কেবল ছুরিই চালিয়ে গেলাম, জীবনে কোনো লোককে কোনদিন এক ফোঁটা আনন্দ দিলাম না—বাট্ আই অ্যাম লোকানন্দ।

এবারে গেলাস তুলে এই মজাটাই যেন জঠরস্থ করে নিল ভদ্রলোক। সোমেন বাবুর কেমন মনে হল, সকৌতুকে যে ছুরি চালানোর কথা বলল সেটা কেবল ডাক্তারের অপারেশনের হাতের ছুরিই নয়। এই লোকের প্রতি কেন এতদিন ধরে এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করেছেন, আজ মুখোমুখি বসে সেটুকুই বুঝে নেবার চেষ্টা সোমেন-বাবুর। হেসেই বললেন, অনেক দিন ধরে আপনাকে দেখছি, আলাপ করারও ইচ্ছে—আজ এ-রকম একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার থেকেই সুযোগটা হয়ে গেল।

—কেন, আট দশ দিন আগেই তো আপনি এ-টেবিলে বসবেন বলে শাসিয়ে গেছলেন—স্ট্রেঞ্জ, সেদিনই প্রথম আপনাকে একটু ভালো লেগেছিল—আসেননি কেন?

—অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম দিন-কতক। হাসলেন, আপনি ডাক্তার জানলে আলাপের ইচ্ছেয় আপনাকেই হয়তো খবর পাঠাতাম।...আপনি বড়ুয়া বলতে কোথাকার বড়ুয়া?

—চাটগাঁয়ের। নট ফ্রম আসাম—

—তার মানে বৌদ্ধ?

—খবর রাখেন দেখছি। চাটগাঁয়ের বড়ুয়ারা বৌদ্ধই বটে। কিন্তু আমি সবরকম ধর্মের আর সব-রকম অধর্মের একটা ইনসটিটিউশন—সামটাইমস আই কেয়ার ফর এভরিথিং, সামটাইমস আই কেয়ার ফর নাথিং। যাক, আপনার পরিচয় বলুন—আপনি তো লেখক এক-জন?

—আপনি জানলেন কি করে?

—আই কুড্ গেস্—দে টক্ অ্যালাউড অ্যান্ড দে থিংক অ্যালাউড—আই মীন আপনার ওই সিনেমার দলটি।... কি নাম বলুন।

—সোমেন্দ্র মিত্র। সকলে সোমেন মিত্তির বলে।

—সকলে বলে মানে...ইউ আর ভেরি পপুলার?

সোমেন বাবু আশা করেছিলেন নাম বলে এও চিনবে কারণ বড় ডাক্তারদের মধ্যেও তাঁর ভক্ত পাঠক কিছু আছে। বোঝা গেল এ লোক সাহিত্যের কোনো খবর রাখে না। জবাব না দিয়ে হাসলেন শুধু।

লোকানন্দ বড়ুয়া পঞ্চম গেলাস শেষ করে সেটা সরিয়ে রেখে শেষ গেলাসটা হাতের কাছে টেনে নিল। তাতে সোডা ঢালতে ঢালতে বলল, আপনি নির্জলা বসে থাকলে গল্প করা শক্ত—একটা সফ্‌ট্ ড্রিংক দিতে বলি?

অনুভব-শক্তিটা বরাবরই প্রখর সোমেন বাবুর। এই অনুভূতির আঙুলের ইশারায় অনেক অজানা অচেনা জায়গায় মাথা গলিয়ে এ-যাবত জীবনের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি। আজও এটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর মনে হয়েছে এই রাতের আলাপটুকু সূচনা মাত্র, শেষ নয়। শেষ হলে তারই লোকসান। জবাব দিলেন, একটা কোলড বীয়ারও বলতে পারেন।

এটা যেন আশা করেনি ভদ্রলোক। ইশারায় বয়কে ডেকে খুশি মুখে সব থেকে সেরা কোল্ড্ বীয়ারের অর্ডার দিলেন।—আপনি ওখানে তাহলে কোকো-কোলা আর অরেঞ্জ নিয়ে বসে থাকতেন কেন?

—আপনার মতো স্নায়ুর ওপর এত দখল আর কজনের। জুলুমের ভয়ে সাধু সাজা নিরাপদ।

স্নায়ুর ওপর দখলের কথাটা বাড়িয়ে বলেননি সোমেন বাবু। চার গেলাসের পর মোহন চৌধুরীর শ্রুষা পর্ব খানিক আগেই দেখেছেন। এখন পাঁচ গেলাসের পর দেখছেন। চোখের পাতা একটু ভারী আর মুখ একটু ফোলাফোলা লাগছে। গলার ভারী স্বরও একটু যা মন্থর লয়ের। ব্যস, এইটুকুই।

মুখের দিকে চেয়ে লোকানন্দ বড়ুয়া আবার হাসছে অল্প অল্প। —আপনি আসেন অথচ কিছু খান না দেখে গোড়ায় আপনাকেই সব থেকে বাজে মোসায়েব ভাবতাম ওই ফিল্মওয়ালাদের। পরে অবশ্য লক্ষ্য করেছি ওরা আপনাকে মান্যগণ্য করে একটু মেয়েটা তো করেই—আপনি পপুলার লেখক যখন বাজারে বই-পত্র আছে অনেক?

—সত্তর আশীখানা হতে পারে।

—স্ট্রেঞ্জ, আপনি তাহলে এ-সব সিনেমাঅলাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান কেন!

সোমেন মিত্তির ভিতরে ভিতরে ধাক্কা খেলেন একটু। তাকে জানলে বা চিনলে লোকটা আর একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলত। জবাব দেবার আগে বয় বীয়ারের বোতল আর গেলাস এনে হাজির করল। লোকানন্দ বড়ুয়া নিজের হাত-ঘড়ি দেখে নিল। সাড়ে ন'টা বাজতে মিনিট দুই বাকি। অনেকক্ষণ আগেই ম্যানেজারের লাস্ট ড্রিংক নেবার আবেদন শোনা গেছে। গেলাসে বীয়ার ঢেলে দিচ্ছিল বয়, তাকে হুকুম করল, আমার জন্য আর একটা কোল্ড ড্রিংক—কোকা-কোলা। সোমেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, এর পর পাওয়া যাবে না, আপনার জন্য আর একটা এনে রাখবে?

—না, না।

বেয়ারা ছুটে চলে গেল। সোমেন বাবু বললেন, আজ একটু বেশি খাচ্ছেন বোধহয়?

—আই ডোন্ট নো, আই হেট দিস—খেতে হয় বলে খাই।

অন্য প্রসঙ্গ ছেড়ে মানুষটার প্রতিই সোমেন বাবুর কৌতূহল আবার। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখানে কোথায় প্রাক-টিস করেন?

—রাস্তায় বা যেখানে সেখানে।

বয় আর একটা গেলাসে বরফ পানীয় আর একটা সোডার বোতল রেখে গেল। সোমেন মিত্তির হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। —রাস্তায় বা যেখানে সেখানে রোগী খুঁজে বেড়ান?

চোখের পাতা আরো একটু ভারী লাগছে। ঢিমে তালে মাথা নেড়ে জবাব দিল, অনেকটা তাই।

—এই জন্যেই সঙ্গে সর্বদা ওই ব্যাগ—আর গায়ে এই শাদা পোষাক?

—ইয়েস সার, দে হেল্প মাই কম্-মন্সেন্স ওয়েল, বিবেকের কড়া চাবুকে বলতে পারেন এ দুটোকে।

ভিতরে ভিতরে আরো একটু সজাগ হয়ে উঠলেন সোমেন মিত্তির। লোকটা যে ভারী চোখের পাতা তাঁর মুখের ওপর স্থির একটু। হাসির ছোঁয়া লেগে আছে তাতে। ওই হাসিটুকু হঠাৎ কেমন বেদনার্ত মনে হল সোমেন বাবুর। না, মুহূর্তের এই অনুভূতিটুকু ভুল হবার নয়, ভোলবারও নয়। সহজ হবার চেষ্টায় বীয়ারের গেলাস মুখে তুলে নিলেন। তারপর হালকা সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে মানে কলকাতায় এ-রকম প্রাক-টিস আপনি কত দিন ধরে করছেন?

—মাস তিনেক।

—তার আগে বাংলাদেশে মানে পূর্ব-বাংলায় ছিলেন?

সোমেন বাবু তখনো ভাবছেন বাংলাদেশের বিগত উত্থান সংঘাতে ভদ্র-লোকের জীবনে মর্মান্তিক কিছু ঘটে গেল কিনা। চাটগাঁও তো কম বিধ্বস্ত হয়নি সে-সময়।

লোকানন্দ বড়ুয়া হাতের গেলাসের ফিকে সোনালি জলে নিজেকে দেখছে। মাথা নাড়ল।—না, পূর্ব বাংলার দেশছাড়া হয়েছি সেই ছাত্র জীবন থেকে।

—তারপর?

গেলাস থেকে মুখ তুলে তাকালো। কৌতূহলের আঁচ পেয়ে চোখে খুশির আমেজ লাগল যেন একটু। গেলাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে সেটা সামনে রাখল। —তারপর ডাক্তারী পাস করা পর্যন্ত বোম্বাইতে, সেখান থেকে এফ, আর, সি, এস হয়ে আসার জন্য দেড় বছর ইংলান্ডে, সেখান থেকে ফিরে মোটা পসার জমানোর তাগিদে তারপর একটানা

অনেকগুলো বছর গোয়াতে। গেল বছর গোয়া থেকে পলায়ন, কিছু দিন দমন আর দিউতে, সেখান থেকে আবার কিছু-দিন বোম্বাই—তারপর মাস তিনেক আগে বোম্বাই থেকে এই কলকাতায়। —ব্যস?

অর্থাৎ আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? জবাবের অপেক্ষা না করে লম্বা চুমুকে গেলাস খালি করে সেটা পাশে সরালো। শেষ নতুন গেলাস কাছে নিয়ে তাতে সোডা ঢালতে লাগল। এটা সপ্তম দফা! তিন-চার দফার পরেই বহু লোকের বে-সামাল অবস্থা দেখেছেন সোমেন মিত্তির। আর মোহন চৌধুরী-উপেন হালদারের কাণ্ড তো কিছুক্ষণ আগেই দেখেছেন।

আজ সাত দফার গেলাস হাতে এই একজনকে দেখছেন। এমন স্বতন্ত্র কোনো মানুষকে আর বুঝি দেখেন নি।

চেয়ে আছে। হাসছেও অল্প অল্প। এবারের হাসিটা অন্যরকম। নিজের ভিতরের সঙ্গে যোগ নেই। প্রসঙ্গ বদলে সোজা জিজ্ঞাসা করল, যে-ছবির জন্য এত ব্যাপার সেটা আপনার লেখা গল্প?

সোমেন মিত্তির মাথা নেড়ে সায় দিলেন। —ডিস্ট্রিবিশন অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপারে আমার আরো কিছু দায়িত্বও ছিল.....।

—কি নাম গল্পের?

—পসরা।

—ইউ মীন দি গার্ল সেলস হার-সেলফ?

—সেইভাবেই তাকে ব্যবহার করা হচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিশাস সার্কল থেকে সে বেড়িয়ে আসতে পেরেছে।

মনঃপূত হল না যেন। অল্প অল্প মাথা নাড়তে লাগল। —যে দুজন মারা-মারি করল তারা প্রোডিউসিং পার্টনারস?

—হ্যাঁ।

—আর ওই যে লাভলি মেয়েটি, যার, নাম নূপুর ব্যানার্জি আই থিংক—সে হিরোইন?

নাম আর লাভলি শুনে সোমেন মিত্তিরের ভিতরে বাঁকা আঁচড় পড়ল একটা। সায় দিলেন, তাই।

—নতুন আর্টিস্ট?

—নায়িকা হিসেবে নতুন। কিভাবে একটু ইন্ধন যোগালেন সোমেন মিত্তির, মন-প্রাণ ঢেলে চমৎকার অভিনয় করছিল...।

—রিয়েলি? উৎসুক যেন।—সে ছবির বারটা বেজে গেল?

—মনে হয়।

—সী উইল বি শকট?

—খুব বেশি রকম?

—ওই দুটো স্কাউনড্রেলকে বাদ দিয়ে ছবি আপনারা শেষ করতে পারেন না?

লোকটার ভেতর বোঝার কৌতূহল না থাকলে সোমেন মিত্তির এ আলোচনা আগেই ছেঁটে দিতেন। জবাব দিলেন সেটা সম্ভব নয়, অনেক টাকার ব্যাপার।

—কত টাকার?

—চার পাঁচ লাখ।

—ওনলি? সত্যিই অবাক যেন, বম্বেতে তো শুনি সত্তর আশী লাখ টাকা খরচ হয় একটা ছবিতে। চার-পাঁচ লাখ ইজ নাথিং।

বোতলের বাকী বীয়ার গেলাসে ঢালতে ঢালতে সোমেন মিত্তির আগে একটু লঘু সুরে বললেন, আপনার তাহলে অনেক টাকা বুঝতে হবে।

মৃদু হেসে মেনেই নিল। বলল ও-রকম দু-পাঁচটা ছবি করার মতো টাকা থাকাটা বেশি কিছু নয়।...আচ্ছা যে-লোকটা মেরে বসল তার নাম কি?

—উপেন হালদার।

—হি ইজ এ রোগ। আর যে লোকটা মার খেল?

—মোহন চৌধুরী।

—হি ইজ ওয়ারস। হি ইজ এ শার্ক। দি গার্ল ইজ ফাইন উইথ হার ডেঞ্জে-রাস কারভস—আই অ্যাম শিওর হি উইল চেজ হার স্টিল। সামনের গেলাস একটু পাশে সরিয়ে সামনে ঝুঁকল একটু। ঝিম-লাগা চোখে আবার একপ্রস্ত কৌতুক উঁকিঝুঁকি দিল যেন।—আর ইউ শিওর দ্যাট সী টুক দোজ থিংস ফ্রম হিম?

এবারে একটু বিরক্তি বোধ করছেন সোমেন মিত্তির। তবু জবাব দিলেন, কি বলছেন ঠিক বুঝলাম না—

বিরক্ত যেন সে-ও।—আ.....হোয়াই? আই মীন দোজ প্রেজেনটেশানস—আপনা-দের হিরোইন ওই লোকটার কাছ থেকে হীরের দুল আর বেনারসী সাড়ি নিয়েছে?

সোমেন মিত্তির নিস্পৃহ জবাব দিলেন, নিতে পারে। নায়িকা হতে পারাটা যে মেয়ের ধ্যান-জ্ঞান, নতুন ছবিতে নেমে আর যা-ই করুক সে প্রোডি-সার চটাবে না তার হাত থেকে প্রেজেন-টেশান নেওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়—

—আই নো, আই নো। চোখের কৌতুক আরো বেশি উপচে উঠতে লাগল।—বাট হু কুড হ্যাভ ডাইভালজড দিস সুইট সিক্রেট টু দি আদার ডেভিল? হালদারের কানে খবরটা কে তুলে দিলে? আপনাদের হিরোইন নূপুর ব্যানার্জী নিজে নয় নিশ্চয়, আর যে দিয়েছে সে-ও নয়। দেন হু অ্যান্ড হোয়াই? এই মজার ব্যাপারটা আপনার মনে এলো না আপনি কি-রকম সাহিত্যিক মশাই!

সোমেন মিত্র এবার যথার্থই থম-কালেন একটু। এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাননি বটে। সঙ্গে সঙ্গে দীপু সরকারের মুখ খানাই চোখের সামনে নেমে এলো তাঁর।

পর পর দু-তিন ঢোক খেয়ে মজাটা আরো জরিয়ে নিল যেন ভদ্রলোক।

—ওই যে ভ্যাগাবন্ড-মার্কা লোকটা, দ্যাট জলি চ্যাটারবকস—কি নাম যেন?

—দীপু সরকার।

—ইয়েস—সে ছাড়া আর কে হতে পারে? কিন্তু ছবি পন্ড হতে পারে জেনেও হাংগরের খবর সে হায়নার মুখে তুলে দিতে গেল কেন? হোয়াটস হিজ গেইনস? হাসতে লাগল।—সো দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভন অ্যান্ড আরথ মাই ডিয়ার অথর।

মাথায় নিলে দিনের আলোর মতো স্পষ্টই বটে ব্যাপারটা। মনে পড়ল, বাড়িতে বসে দীপু সরকারকে একদিন তিনি বলেছিলেন, তোমার প্রোডিউসার দুটির ছবির থেকে নায়িকাকে নিয়ে উৎসাহ বেশি। জবাবে অন্তর্দৃষ্টির প্রশং-সায় দীপু সরকার তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেছল। আর তারপর সাগ্রহে ওই প্রোডিউসার দুজনকে এমন কি নূপুর ব্যানার্জীকেও একটু সমঝে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তার মাথায় কি আছে এ তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। সে-শুধু হাংগরের খবর হায়নার মুখে তুলে দেয়নি, হায়নার খবরও হাংগরের কানে দিয়েছে। এক মেয়ের কাছ থেকে দুজনকেই তফাতে হটানোর চেষ্টা ওই মূর্তির প্রোডাকশন ম্যানেজারের এমন দুর্বলতার কথা কে ভাবতে পারে।

চুপচাপ তাঁর দিকে চেয়ে একটু যেন মজাই দেখছে লোকানন্দ বড়ুয়া। তারপর প্রসঙ্গ বাতিল করে সোজা কথায় চলে এলো সে।—যেতে দিন, আমি কেবল ওই নূপুর ব্যানার্জির কথাই ভাবছি, জবর জ্যান্ত মেয়ে, বাট ডেসপিটলড টু বি সাফার—আই অ্যাম ইনটারেসটেড ইন হার ওনলি —ওর জন্য কি করা সম্ভব এখনো ভাবতে পারছি না—স্টিল.....আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলবেন।

সাত নম্বর গেলাসের প্রতিক্রিয়ায় এই লোকের ভিতরের চিত্রটা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন সোমেন মিত্র। সহজ সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় দেখা করতে বলব এই বারে?

—এখানে সুবিধে না হলে আমার সুইট-এ বসেও কথা হতে পারে—তিন-তলা, সুইট সেভেনটিন—

সোমেন মিত্র গম্ভীর একটু। আপ-নার বয়েস কত?

—আটচল্লিশ.....হোয়াই?

খুব বেশি হলে তেতাল্লিশ হবে ভেবেছিলেন। আটচল্লিশ শুনে বক্র ঝাঁঝালো সুরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল এবার। —এই বয়সে ওই মেয়ের প্রতি এত ইনটারেসটেড হয়ে লাভ হবে ভাবছেন?

খুব চিন্তা না করেই যেন জবাব দিল, হতে পারে, নইলে শুধু ওই একটা মেয়ের জন্যে আমি এখানে এভাবে আটকে গেলাম কেন.....

—এখানে আটকে গেলেন মানে?

—হ্যাঁ এখানে —বিদিশার এই সুইটে। ইটস ওনলি ফর হার।

দীপু সরকার আর মোহন চৌধুরী দলের গোড়া থেকেই এই সম্পর্ক—জানেন। সেটা যে এমন নির্লজ্জভাবে

নিজেই প্রকাশ করে দেবে ভাবেন নি। হয়তো সুরার মাত্রা বেশি হওয়ার ফল। তপ্ত রাগের সুরেই সোমেন মিত্র বললেন, আপনার জন্যে আমারও বুকের ভেতরটা টনটন করছে। ...একটা কথা জেনে রাখুন বড়ুয়া সাহেব, ছবি না হওয়ার হতাশা ওই মেয়েকে আপনার ঘরে টেনে আনবে না, আপনার যত টাকাই থাক, ওই নূপুর ব্যানার্জীও বড় ঘরের লেখা-পড়া জানা মেয়ে।

এবারে যেন তার দিকে একটু উৎসুক নেত্রে তাকালো লোকটা। শেষ গেলাসের তিন ভাগ খালি দেখে বাকিটুকু খেতে গিয়েও খেল না। গলার স্বরে সামান্য রস উপছে পড়ল যেন। বড় ঘরের লেখা-পড়া জানা মেয়ে আপনাকে কে বলল?

—আমি জানি।

—ওর বাড়ি ঘর বা কোথায় কার কাছে থাকে আপনার জানা আছে?

—না জানলেও শুনেছি।

ভারী চোখের তারায় আবার কৌতুকের ছোঁয়া লাগল যেন। কোথায় শুনেছেন? দীপু সরকারের কাছে?

বিরক্তি চাপতে পারলেন না সোমেন মিত্র। —তা দিয়ে আপনার কি দরকার?

হাসছে অল্প অল্প। আর চোখের পলক না ফেলে তাঁকে দেখছে। টেনে টেনে বলল, আপনি নিজেকে একজন পপুলার লেখক ভাবেন, কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমি ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছি।

গেলাসের বেটুকু বাকি তারও অর্ধেকটুকু উদরস্থ না করে পারা গেল না যেন। আর সামান্যই অবশিষ্ট থাকল। গলার ভারী স্বরেও কৌতুকের আমেজ। আপনি তো এ-পর্যন্ত বহু গল্প লিখেছেন স্যার, আজ আপনাকে একটা গল্প শোনাই—

বলার ধরনে এমন কিছু ছিল যে সোমেন মিত্র সত্যিই অবাক একটু।

দু আঙুলে করে টেবিলে গোটা কয়েক টক টক শব্দ করল লোকানন্দ বড়ুয়া। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি টিপটিপ করছে। কোনো একটা দেখা চিত্র ফিরে আবার দেখে নিচ্ছে যেন।

"—মাস আড়াই হবে বোধ হয় বুঝলেন...। তার দিন কয়েক আগে আমি কলকাতায় এসেছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথায় খাই কোথায় রাত কাটাই—কিছুই ঠিক নেই তখনো।

'—সেদিনটা ছিল ভ্যাপসা গরম। সকাল থেকে বেলা দুটো আড়াইটা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সেই কড়া রোদে আর গরমে গায়ের চামড়া যেন ঝলসে যাচ্ছিল। উত্তর কলকাতার দিক সেটা। ছোট একটা বার-রেস্তরাঁ দেখে ঢুকে পড়লাম। সেই দুপুরে রোদ্দুরে আমার মতো হতভাগা মার্কা লোক ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই তখন আর।

এক পাশে তিন-চারটে খুপরি কেবিন। তার একটাতে বসলাম। প্রথমে ঢক-ঢক করে এক বোতল ঠান্ডা বীয়ার খেয়ে নিলাম। তারপর অল্প কিছু খাবার খেয়ে আবার এক বোতল ঠান্ডা বীয়ার নিলাম। রোদের তাত কমার আগে আর বেরুনোর ইচ্ছে নেই।

বাট্ দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ মাই ডিয়ার অথর। সেই মেনি থিংস-এর একটার নাম বোধহয় বোগ-স্ট্রেঞ্জ কোয়েনসিডেন্স। দুজন খদ্দের এলো। তাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল কিন্তু দেখা গেল না। কেবিনের পর্দাটা ভালো করে টানা ছিল। আমার সামনের খুপরি কেবিনে তারা গিয়ে বসল। মাঝে পাতলা কাঠের পার্টিশন, ওপরটা ফাঁকা। এ-ধার থেকে কান পাতলে আর ও-ধার থেকে ফিসফিস করে কথা না বললে দুপুরের এই নির্জনে সবটাই শোনা

বিপুল ওজনের খুশি একখানা

যায়। তাছাড়া এই অসময়ে সামনের কেবিনে আর কেউ আছে তারা ভাবেনি বোধহয়।।

পনের সেকেন্ডের মধ্যে বোঝা গেল তাদের একটি ছেলে একটি মেয়ে।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, কি খাবে?

মেয়েটি বলল, ফ্রুট আইসক্রিম।

—ব্যস?

—ব্যস।

বয়কে একটা আইসক্রিম আর একটা ঠান্ডা বীয়ারের অর্ডার দেওয়া হল।

মেয়েটির গলায় অস্ফুট ঝাঁঝ। —ফের?

ছেলেটির বোঝানোর চেষ্টা, একটা তো বীয়ার শুধু, ও আবার ড্রিংক নাকি—গরমে গলা-বুক কাঠ হয়ে গেছে।

ধরে নেওয়া যেতে পারে অর্ডার নিয়ে বয় সরে গেছে। কারণ স্যুট ফুট করে ঠেস দিয়ে মেয়েটি বলল, ছবিতে নামার ব্যাপারে তুমি আবার আমাকে অবিশ্বাস করো—নিজে এইসব শুরু করেছ! এর থেকে স্কুল মাস্টারি ঢের ভালো ছিল তোমার।

ছেলেটা হাসল একটু।—আমার যা কিছু অধঃপতন সব তোমার জন্য। স্কুল মাস্টারির জন্য তমলুকে ফিরে গেলে তোমার সেই ভাশুরপতি কি করবে?

খুক-খুক করে একটু হাসল মেয়েটা। বলল, জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

মেয়েটির কথা আর হাসি দুই-ই মিষ্টি। আমি টুঁ-শব্দটি না করে কান পেতে আছি। ওরা চুপ একটু। কারণ বয় ঢুকেছে। প্লেট রাখার শব্দ। বীয়ারের বোতল খোলার শব্দ। তারপর আবার ফুটফুট কথা। বয় বিদেয় হয়েছে।

মেয়েটি বলল, তুমি বাপু আর খুঁত খুঁত কোরো না, এভাবে আর কাঁহাতক চলে? বাবার দু চোখের ছানিই পেকে গেল, মায়ের গ্যাসট্রিক আলসার বেড়েই চলেছে, ওই হতচ্ছাড়া ভাশুরপতি তো সেই থেকেই টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে—বস্তিঘরের মতো দুখানা ঘর, ভাড়া কাকি বলে তারও মালিক কথা শোনায়—ভাই বোন দুটোর তিন মাস করে স্কুলের মাইনে বাকি—এভাবে আর কিছুদিন চললে আমি পাগল হয়ে যাব। নাচের স্কুল থেকে মাইনে পাই মাত্র পঞ্চাশী টাকা—আমাদের গুষ্ঠিসুদ্ধু টানতে গিয়ে তোমারও জিভ বেরিয়ে গেল। তোমাকে বলিনি, ওই মুখপোড়া ভাশুরপতি টাকা পাঠানো বন্ধ করতে মায়ের কাছে বাবা আমাকেই দিন-রাত দুষছে—এভাবে আর চলতেই পারে না—তুমি আপত্তি করো আর যাই করো এ-ছবিতে নাববই বলে দিলাম। এ হাতছাড়া হলে আর হবে না—

মেয়েটির এত কথা বলার মধ্যে এমন একটা আকুতি ছিল মশাই সে আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। পাছে শব্দ হয় সে জন্য নিজের গেলাসেও বীয়ার ঢালছি না আমি।

একটু চুপচাপ। তারপর ছেলেটার গলা। অন্য গলা যেন।—কিন্তু আমার বড় ভয় করে। গান ছেড়ে তোমার নাচে ঢোকাটাই আমি পছন্দ করিনি। নাচের স্কুলের ওই ছুঁচোটার এরই মধ্যে তোমার দিকে চোখ গেছে। ছবিতে নামার পর তোমাকে ধরে রাখার মতো মুরোদ আমার হবে!

মেয়েটির গলায় অনুযোগের থেকেও অসহিষ্ণুতা বেশি।—ফের অবিশ্বাস? নিজের জীবনের ভয়-ডর ছেড়ে আমাকে কি ভাবে বাঁচিয়েছ সে আমি ভুলে যাব? আমাকে এত ছোট এত নীচ ভাবো তুমি!

জবাবে করুণ গলা করে ছেলেটা বলল, আর একটা বীয়ার খাই?

—আচ্ছা খাও। কিন্তু আমার কথার জবাব দাও, কি ভাবো তুমি আমাকে?

—ইয়ে...ঠিক তা নয়, ওতে একবার ঢুকে পড়লে নিজের ওপর হাত থাকে না সব সময়। বয়—!

বয় এলো। আর একটা বীয়ারের হুকুম হল। বীয়ার এলো। তার একটু বাদে মেয়েটির জোরালো চাপা গলা।

—নিজের ওপর যার হাত থাকে না তার থাকে না। আমার থাকবে। থাকবেই। সেই অসহিষ্ণুতার মধ্যেই হঠাৎ চাপা হাসি একটু।—ঠিক আছে, তোমাকে কথা দিচ্ছি, ছবি করে বেশ কিছু টাকা হাতে পেলে তোমার সেই স্বপ্নের কাবাই আমি সফল করব।

তারপরেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর মতো মৃদু শব্দ একটু। আমার ধারণা মেয়েটাই। তিন চার সেকেণ্ড...।

—যাঃ! বিচ্ছিরি গন্ধ মুখে! অস্ফুট কৌতুক।—এবারে বিশ্বাস হল?

—এ আর এমন কি, সিনেমাতেও এসব অ্যালাউড আজ-কাল।...যাক, তোমার গো দেখে প্রোডিউসার শালাদের সঙ্গে একটু অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেই রেখেছি ...সাউথ ক্যালকাটার বিদিশা চেনো, মস্ত বার আর রেস্তোরাঁ?

—ট্রামে আসতে যেতে দেখেছি।... সেখানে কি?

—ও শালাদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ও-রকম জায়গাতেই হয়। সামনের ন' তারিখে সন্ধ্যা সাতটার পর সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবার কথা। ওই লম্পট ভগিনপতির দেওয়া গয়না আর ভালো শাড়ি-টাড়ি যা আছে পরে এসো—ব্যাটারা যেন বুঝতে না পারে।

খুশি গলা।—এতখানি এগিয়ে রেখে আবার খুঁতখুঁতুনি। গোমড়া মুখ করে আছ কেন? হাসো বলছি।

—বীয়ারেও বুক ঠাণ্ডা হচ্ছে না... আমার সেই স্বপ্নের কাবো শেষ পর্যন্ত আমারই জায়গা হবে কিনা কে জানে।

—কি? ফের সেই এক কথা? এক সন্দেহ! রাগে হিসহিস করে এরপর মেয়েটা যে কথাগুলো বলে উঠল মিস্টার অথর, আমার কানের পর্দা দুটো যেন ছিঁড়েখুঁড়ে গেল, বুকের ভিতরে দগদগে গরম লোহার ঘা পড়তে লাগল। ঠিক সেই রকম হিসহিস গলা আর সেই রকম কথা আমি আরো একবার শুনেছি! সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, সেই মেয়েরই গলা সেই মেয়েরই কথা।...মেয়েটা হলছ, এই আমার বুকে হাত দিয়ে বলছি সে রকম হলে আমার যেন সব শেষ হয়ে যায়—জীবন থাকতে কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না— কেউ পারবে না—কেউ না!

সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথাটা যেন কি রকম হয়ে গেল মিস্টার অথর। একটানে কেবিনের পর্দা আধখানা সরিয়ে ফেললাম। পাশের কেবিনে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল। একটু বাদে ওরা উঠল। বেরিয়ে এলো। নিজেদের নিয়ে তন্ময় ওরা, এদিকে ফিরেও তাকালো না। আমি পাশাপাশি চলে যেতে দেখলাম দুজনকে। বিশেষ করে মেয়েটাকে দেখলাম। না, সেই মেয়ে নয়। সেই মেয়ের আগে সুন্দর মুখে, আগে যেন ভর-ভরতি, উচ্ছল। কিন্তু আমার মনে হল সেই মেয়েই। মনে হল ভিতরটা সেই রকমই। আমি কাঁপতে লাগলাম।

...বীয়ারের বোতল শেষ না করেই টাকা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ওরা দুজন ট্রাম স্টপের সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটা হাসছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওরা আমাকে দেখেও দেখল না। ট্রাম আসতে হাসিমুখে উঠে গেল ওরা। মেয়েটার এই হাসির তরঙ্গও আমার চেনা-চেনা মনে হতে লাগল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে শব্দ হল একটা। রাত সাড়ে এগারোটা। লোকানন্দ বড়ুয়া চমকে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালো। আর পর মুহূর্তে ছিটকে উঠে দাঁড়াল। উদভ্রান্ত ক্রুদ্ধ মূর্তি হঠাৎ। এক চুমুকে গেলাসের তলানিটুকু শেষ করে ঠক করে টেবিলে নামালো সেটা। সোমেন মিত্তির ভেবাচাকা খাওয়া মুখের ওপর একটা তপ্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে বিকৃত মুখে বলে উঠল, রাত সাড়ে এগারোটা—ইউ হ্যাভ স্পয়েল্ড মাই হোল নাইট—আজ ইনজেকশন নিয়ে ঘুমোতে হবে—নাও লীভ মি প্লীজ।

ঝুঁকে মোটা ব্যাগটা তুলে নিয়ে অসহিষ্ণু পদক্ষেপে হনহন করে দরজার দিকে চলল সে।

সোমেন মিত্র বিমূঢ়ের মতো বসে।

।।চার।।

দীপু সরকার আসবে আশাই করা গেছল পরদিন সকালেই এসে হাজির সে সোমেনবাবু সামনে একটা বই খুলে বসেছিলেন। পড়ছিলেন না। গতকালের ব্যাপারটাই ভাবছিলেন তিনি। অন্য দিনের মতো হাঁকডাক করে ঘরে ঢুকল না, বাইরে থেকে মিনমিন করে জিজ্ঞাসা করল, ভিতরে আসব?

—এসো। বই থেকে মুখ তুললেন। মনে মনে তাকে চাইছিলেন, তবু গম্ভীর একটু।—বোসো। কি খবর?

দীপু সরকারের মুখখানা শুকনো। রাতে ভাল ঘুমোয় নি মনে হয়। চেয়ার টেনে বসল।—খবর আর কি বলব দাদা, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, মাঝে পড়ে এই ছাপোষাদের প্রাণান্ত। আমি চোখকান কাটা মানুষ, তবু আপনার কাছে মুখ দেখাব কি করে ভাবছিলাম। আবার মনে হল এই দুঃসময়ে দাদার কাছে যাব না তো কার কাছে যাব।

ছেলেটার ভেতরটা আবার নতুন করে দেখার চেষ্টায় আছেন সোমেন মিত্তির। সুন্দর কি কুৎসিত জানেন না, কিন্তু ভিতরের সেই চেহারা যেন দেখার মতো মনে হচ্ছে কাল থেকে। বললেন, দুঃসময়ে তা মোহনবাবুর তোমার আর কি...।

—কি যে বলেন দাদা ঠিক নেই। মোহনবাবুর নেই নেই করেও যা আছে তাতে তার খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। কিন্তু আমরা? ছবি বন্ধ, কাল থেকেই কি খাব? এই বাজারে একটা কাজ জোটানো কি চাট্টিখানি কথা!

—আমরা বলতে একজন তো তুমি। ...আর কে?

দীপু সরকার থমকালো একটু।—দুর্দশা আমারই চরম সব থেকে। শুকনো মুখে হাসি টানার চেষ্টা একটু।—আপনার হিরোইন তো কাল লজ্জায় দুঃখে কেঁদেই ফেললে একেবারে। আপনার সামনে আর জীবনেও এসে দাঁড়াতে পারবে না বলছিল। ভদ্রমহিলার জন্য দুঃখ হয়, বেচারীর এত উৎসাহ এত আনন্দ সব যেন এক ফুয়ে নিভে গেল। প্রথম ছবিতে এই কাণ্ড দেখে একেবারে মুষড়ে পড়েছে।

সোমেন মিত্তির নির্লিপ্ত মুখেই দেখছেন তাকে। খুব যদি ভুল না হয়ে থাকে মুষড়ে যে এই একজন আরো বেশি পড়েছে তাও স্পষ্ট।

—চা খাবে?

—না, থাক, বউদিকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে।...কাল রাতের ব্যাপার উনি শুনেছেন নাকি?

—না।

—যে বিচ্ছিরি ব্যাপার, না শোনাই ভাল। কিন্তু কি হবে দাদা, ছবিটা হবেই না আর?

—মোহনবাবু কি বলেন?

—তিনি আর কি বলবেন, পার্টনার শিপ নাকচ করার কেস ঠুকে ওই লোহার গবেট যতটা সম্ভব তার টাকা তো আদায় করে নেবেই...এখন পর্যন্ত খরচা যেটুকু হয়েছে তার টাকা থেকেই হয়েছে। মোহনদা ছবি করার চেষ্টা ছাড়বে না অবশ্য, কিন্তু এই ধাক্কা সামলে নিয়ে আবার পার্টনার জোটানো তো সহজ নয়।...আপনার সেই ডিস্ট্রিবিউটারকে একবার বলে কয়ে দেখুন না দাদা, আপনাকে তো ভারী ভক্তিশ্রদ্ধা করেন ভদ্রলোক, যদি একটা গতি হয়—

সোমেন মিত্তির চেয়ে আছেন। এই তাগিদের মধ্যেও আন্তরিকতার অভাব নেই এটাই আশ্চর্য। হালকা করে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর?

—কি তারপর?

—গতি হলে উপেন হালদার তো আর থাকছে না, বেচাল দেখলে মোহন চৌধুরীকে রোখবার জন্য এবার কাকে দাঁড় করাবে?

ভেবাচাকা খাওয়া মুখ।—তা তার মানে!

হাসি পেলেও হাসছেন না সোমেন মিত্তির।—নুপুরকে মোহনবাবুর হীরের দল আর বেনারসী প্রেজেন্ট করাটা সত্যি?

—তা-তা সত্যি হলেই বা এরকম প্রেজেনটেশানের ব্যাপার তো এ-লাইনে আকছার হয়ে থাকে।

—হয়ে থাকলেও খবরটা উপেন হালদারের কানে তো তুমিই তুলেছ?

বেচারার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল আরো তেমনি সচকিত।—মোহনদা ফোনে আপনাকে কিছু বলেছেন?

। —না।

দীপু সরকার তড়বড় করে উঠল এবার।—আপনিও দাদা এইরকম ভেবে বসে আছেন। ওদিকে নূপুর মানে আপনাদের নূপুর ব্যানার্জিও ঠিক এই-ভেবে ক্ষেপে লাল আমার ওপর। কথায় কথায় প্রেজেনটেশনের কথাটা উপেন হালদারকে যদি বলেই থাকি সে এরকম একটা কাণ্ড করে বসতে পারে আমি ভেবেছি।

গম্ভীর মুখে বেশ জোর দিয়েই সোমেন মিত্তির বললেন ভেতরে বাইরে এতটা দূরকম হলে তোমার সঙ্গেও আমার পোষাবে না। তুমি যা করেছ বেশ বুঝে-শুনে ভেবেচিন্তেই করেছ। ঠিক কিনা?

দীপু সরকারের মাথাটা তার নিজের বুকের ওপর ঝুলে রইল খানিক। মুখ তুলে সোমেন বাবুর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখে যেন আশ্বাস পেল একটু। ব্যগ্র মুখে বলল সত্যি দাদা মেয়েটাকে নিয়ে কি যে রেষারেষি ওদের দুজনের মধ্যে যদি দেখতেন। তার ওপর মোহনদাকে ওইসব প্রেজেন্ট করতে দেখে হঠাৎ আমার মাথাটাই কেমন বিগড়ে গেল। তা বলে বিশ্বাস করুন লোহার খাটা অতখানি ডাইরেকট অ্যাকশন বাধিয়ে বসব আমি ভাবিনি। উঃ কেসিয়াস ক্লে-মার্কা একখানা ঘা ঝেড়েছে মোহনদার ওপরের দুটো দাঁত সাবার!

সোমেন মিত্তির হেসেই ফেললেন এবার। —যাক এবারে দুটো সত্যি কথা বলো দেখি। তোমার বড় ঘরের মেয়ে নূপুর ব্যানার্জি বস্তি-ঘরের মতো সে-দুখানা ঘর নিয়ে আছে তারও তো তিন মাসের ভাড়া বাকি—সে লেখা-পড়া কদ্দুর করেছে ঠিক ঠিক বলো দেখি?

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে দীপু সরকার বলল এ আপনি জানলেন কি করে?

জিগেস করছি আমি। তুমি জবাব দাও।

—সেকেন্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিল তারপর আর পড়া হয়ে ওঠেনি।

—তার বাবার দুচোখে ছানি আর মায়ের প্রাক্টিক্যাল অলসার?

আবারও হাঁ খানিক।—নূপুর আপনাকে সব বলেছে?

—জিগেস করে দেখো সে কিছুই বলেনি। ওদের সংসার তুমিই টানছ না হোক কত?

—হাঁ, একটা নাচের স্কুল খোলে ও-ও কিছু টাকা পেত এ-ছবির রয়্যালটি বরবাদ।

হালকা টিপ্পনীর সুরে সোমেন বাবু বললেন সে-তো তোমার ক্রেডিট। থাক তমলুকে তার ভগ্নিপতির ব্যাপারখানা কি খোলখলি বলো তো শুনি—

দু-চোখ ঠিকরে বেরুবার দাখিল দীপু সরকারের। যাই হোক আর যাই ঢাকার মধ্যে না গিয়ে ঘটনাটা খোলা-খুলিই বলেছে সে। প্রবৃত্তির এই নগ্ন দিকটা জানা আছে সোমেন মিত্তিরের। খুব অবাক হননি কারণ এই গোছেরই কিছু হবে ধরে নিয়েছিলেন। তবু ভিতরে ভিতরে মরিয়া ছেলেটার প্রশংসা না করে পারেননি। না তার এই হা-ভাতে চেহারাটাই সব নয়। অন্তত ছিল না।

...নূপুরের সেই জ্যাঠতুতো ভগ্নি-পতিটি তমলুকে মস্ত অবস্থার মানুষ। অনেক জমি-জমা মস্ত ব্যবসা। বয়েস নূপুরের ডবল। ভারী রসিক মানুষ। কলকাতায় এলে মেয়ের বয়সী শালীর সঙ্গে রসিকতা চলে ফাঁক পেলে গায়ে পিঠে হাত বুলোয়। নূপুর ফোঁস করে ওঠে, আবার অতবড় লোক ভগ্নিপতি তাদের অবহেলা করে না বসে তাকে পছন্দও করে। অবস্থা যেমনই হোক ছেলেবেলা থেকে নাচগানের ঝোঁক ওর: বেশি ঝোঁক নাচের। সেই নাচ দেখে ভগ্নিপতিটি মুগ্ধ।

সে-সময় নামী ডাইরেকটরের পুরনো ছবিতে নূপুরের সেই অ্যাকটিং দেখে ওই ভদ্রলোকই সব থেকে বেশি বাহবা দিয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পরেই নূপুরের বাবা বেসরকারী কেরানিগিরি থেকে রিটায়ার করলেন। সামান্য পুঁজি যা পেলেন তা ভেঙে খেলে আর কদিন। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন ভদ্রলোক।

সেই সময় দরদী ভগ্নিপতিটি এসে একরকম জোর করেই তমলুকে নিয়ে গেল। তার বাবা-মাকে ভরসা দিল তাদের এই মেয়ের জন্য কোনো ভাবনা নেই, সব ভার সে নিল। তমলুকে কলেজে পড়বে নাচ শিখবে। তারপর স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে মস্ত একজন হয়ে দাঁড়াবে —তার আগে বিয়ে নয়। তখন কত রত্ন ওর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাবে সেটা যেন সকলে দেখে নেয়। আর নূপুরের বাবা-মায়েরও দুশ্চিন্তা করে কাজ নেই, এখানে তাদের দিন চলার মতো ব্যবস্থা তমলুকে গিয়েই সে করবে।

করেছে। মাসে তিন চারশ করে টাকা পাঠিয়েছে নূপুরের বাবাকে। কোনো মাসেই হেরফের হয়নি। মানুষেরা মধ্যে দেবতা দেখেছেন নূপুরের বাবা-মা।

.....সেইখানে দীপু সরকারের সঙ্গে নূপুরের প্রথম দেখাসাক্ষাৎ। একেবারে সেই ভগ্নিপতিটির বাড়িতে। দীপু সরকার সেখানকার এক স্কুলে ইংরেজির মাস্টার। ইংরেজিরই এম-এও। মাসে দেড়শ টাকা মাইনেয় ভগ্নিপতির বাড়িতে টিউশনি করে। তার ছোট দুটো ছেলেকে পড়ায়। সেই ভদ্রলোকেরও মেয়ে বড়। সদ্যসদ্য সিনেমা ছিনে ফেলে শ্বশুর ঘর করতে পাঠানো হয়েছে।

ভগ্নিপতির স্ফীতির মাথায় ছিট। কিঙ্কালসার চেহারা। সুচিবায়ু রোগ তার ওপর। অন্দরমহলে জল ঘাটাঘাটি করেই দিন কাটে তার। বছরে ছমাস রোগে ভোগে তখন হোমিওপ্যাথি ছাড়া অ্যালোপ্যাথি ওষুধ চলে না। এমনিতে খিটখিটে মেজাজ। কিন্তু মেয়ের বয়সী খুড়তুতো বোনের অনাদর করে না। তবু ছোয়াছুঁয়ির ব্যাপারে সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত নূপুর।

ভগ্নিপতির বাড়িতে প্রথম একটা বছর প্রচুর সুখেই কেটেছে বলতে হবে। খাও দাও বেড়াও ফুর্তি করো সিনেমা দেখো আর নেচে গেয়ে বেড়াও। ভগ্নি-পতির কত যে দরাজ মন সেটা যেন এখানে এসে আরো বেশি বুঝতে সে। ভগ্নিপতি তাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল, কিন্তু ছেলেগুলো তাকে জ্বালায় শুনেই দু মাসের মধ্যে কলেজ থেকে তার নাম কাটিয়ে দিল। পড়াশুনা হওয়া নিয়ে কথা, বাড়িতে গোটা দুই প্রোফেসার রেখে দিলেই তো হবে। কিন্তু পরের এক বছরের মধ্যেও সে-প্রোফেসারের মুখ দেখা যায়নি। নূপুরও হাঁপ ফেলে বেঁচেছে। পড়াশুনার নামে তারও গায়ে জ্বর। নাচ আর গান হলেই হল। ভগ্নি-পতিও বলে ও একজন বিরাট শিল্পী হবে। এ ব্যাপারে তার কার্পণ্য নেই। বাড়িতে গানের মাস্টার আসে। আর খড়্গপুর থেকে সপ্তাহে তিনদিন এক নাম-করা অবাঙালী নাচের মাস্টারনি আসে। মাস গেলে ভগ্নিপতির মোটা খরচ এতেও।

ঘুঙুর পায়ে নূপুরের ঝমঝম নাচের আভাস দীপু সরকারের কানে আসে। কারণ এই শিক্ষার আসরও বসে এদিকের মহলেই। বিশাল চকমিলানো দালানের একেবারে ওধারের অন্দরমহলে নূপুরের দিদির কান এই নাচগানের মহড়া পৌঁছয় কিনা দীপু সরকার জানে না। তাকে তখন রোগে ধরে গেছে। মন দিয়ে পড়া করতে পারে না, ছেলে পড়াতে পারে না। কতক্ষণে বিকেল হবে কতক্ষণে টিউশানির নামে এ-বাড়িতে এসে হাজির হবে। রোজ যে নূপুরের চোখের দেখা মেলে তাও নয়। কোনদিন নাচের মাস্টার আসে না, কোনদিন গানের। অপরিণত বয়সের ছেলেদুটোও কিছু যেন বাড়তির টের পায়! তারাও বুঝে নিয়েছে মাস্টার-মশাইটি নূপুর মাসির নাচগানের ভক্ত। পড়াতে এসে পড়ানো আর হয়ে ওঠে না, উসখুস করে অন্যমনস্ক হয়। এর দাওয়াইও তাদের কাছে গোপন নেই আর। ওদের বাবা বাড়িতে না থাকলে মাস্টারমশাইকে তারা ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। পাশের ঘরে বসিয়ে মাসির নাচ দেখায়। গান শোনায়। যেদিন সেটা হয় না সেদিন মাস্টারমশায়ের রাগারাগি আর বকাঝকার ফলে দুভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কিন্তু ও বেচারারা কি করবে। এও ওরা বুঝে নিয়েছে মাসির নাচ গানের সময় বাবা বাড়ি থাকলে মাস্টার-মশাইকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া চলে না।

বাবা ইদানীং অনেকদিনই সন্ধ্যের আগে চলে আসে। তাছাড়া সপ্তাহে নাচ তিন দিন আর গান দুদিন। বাকি দুটো দিন তো বাদ এমনিতেই পড়ে যায়। আর বাবার সঙ্গে গাড়িতে চেপে মাসি একএকদিন বেড়াতেও বেরিয়ে যায়।

দীপুর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল কমল। তার একতরফা প্রেম নিকষিত হেম নয়। সর্বদা হাড়ে-পাঁজরে যন্ত্রণা একটা। রবিবারেও এ-বাড়ির সামনে এসে ঘুর ঘুর করে সে। ছাত্ররা দেখে ফেললে তাদের উপদেশ দিতে আসে। কিন্তু ছাত্রদের ছেড়ে দোতলা থেকে হয়তো আরো কেউ দেখে ফেলে। এক পিঠ খোলা চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাঝে-সাঝে হাতের চিরুনি একএকবার আছাড় খায়। চোখো-চোখি হয়ে গেলে দীপু সরকারের ঘাম হতে থাকে।

এই দেড় বছরের মধ্যে দীপু সরকারের সঙ্গে দশটা মুখের কথাও হয়নি তার। নেহাৎ ছাত্রদুটি একেবারে সামনা-সামনি ধরে নিয়ে গেলে একটা দুটো মুখের কথা। নূপুর গল্পের বই পড়তে ভালবাসে, ছাত্রের হাত দিয়ে সপ্তাহে তিন চারখানা করে বই যোগান দিয়ে আসছে দীপু সরকার। কিন্তু সেসব বইয়ের আলোচনার জন্য বা বিশেষ কোনো বইয়ের তাগিদ দেবার জন্য এমনকি বই ফেরত দেবার জন্যেও ওই দিদির মেয়ে পড়ানোর সময় একটিবার ঘরে ঢোকে না। যা-কিছু ওই ছেলে-দুটোর মারফৎ।

কিন্তু নূপুর ব্যানার্জি তার এই ভক্তের মনের খবর ভালই রাখে। আর ভিতরে ভিতরে মজা পায়। নূপুর পরে এটা নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। ওই মূর্তির একটা স্কুল মাস্টার ছেলেকে মন দেবার চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই পায় নি। কিন্তু ভক্ত অপছন্দ আর কোন মেয়ের মুখ থুবড়ে কেউ যদি পড়ে থাকে তাতে এমনকি আপত্তি। সেতো দিব্যি সমাদরে খাচ্ছে দাচ্ছে নাচ-গান নিয়ে ফূর্তিতে আছে। এমনকি বাড়িতে মা-বাবাকে দেখতে যাবারও তাগিদ বোধ করে না। সেখানকার টানা-পোড়েনের দিন এখন ভয়াবহ মনে হয় তার।

কিন্তু এই সময় থেকেই ভদ্মিনপতি ভদ্রলোকের অভিলাষের আঁচ খুব একটু একটু করে পেতে শুরু করল সে। তার স্ত্রী অর্থাৎ নূপুরের জ্যাঠতুতো দিদি মাসের মধ্যে বিশ দিন বিছানায় তখন। বিশ গজ দূর থেকে তার হাঁপের টান শোনা যায়। কিন্তু স্ত্রীর জন্য কোন রকম উদ্বেগ ভদ্রলোকের কখনো ছিল না, তখনো নেই। বরং শালীর প্রতি আদর যত্নটা তখন আরো বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে কলকাতার বাড়িতে পাঠানো টাকার পরিমাণও। এদিকে আজন্ম রুগ্না ছিট-গ্রস্ত স্ত্রীর জন্য দুঃখ করে আর নূপুরের গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে সেই দুঃখটা যেন ওর মধ্যে চালান করে দিতে চায়। বেড়াতে বেরুলে নূপুরের হাত নিজের হাতের মুঠো থেকে আর ছাড়তেই চায় না। ভদ্মিনপতির রসের দাবীতে খামচা-খামচিও যেন বেড়েই চলেছে।

এত আনন্দের মধ্যেও একটা দুশ্চিন্তার ছায়া ঘন হয়ে উঠতে লাগল।

এদিকে স্কুল মাস্টার দীপু সরকারের বেপরোয়া দিকটাও প্রকাশ পেয়ে গেল এতদিনে। মদন শরের যন্ত্রণা আর সহ্য করা যায় না। এসপার কি ওসপার। গল্পের বইয়ের মধ্যে একটা চিঠি পাঠাবার পর তিন-তিনটে দিন ঘেমে নেয়ে অস্থির। লিখেছিল সামান্য দু-চার কথাই। অবধারিত আত্মহত্যার পরিণাম থেকে সে তাকে রক্ষা করতে পারে কিনা। কারণ বিগত দুটো বছর ধরেই তার আহার নিদ্রা ঘুচে গেছে।

তিন দিন বাদে নূপুর সেই প্রথম পড়ার ঘরে এলো। চিঠি পেয়ে তার ভেতরটা আরো তিরিক্ষি মেরে গেছে। একে ভদ্মিনপতির উৎপাত তার ওপর এই প্যাঁচা মুখোর চিঠি। ছেলে দুটোর একটাকে বলল বাইরে কে যেন ডাকছে দেখে আয় তো। আর একজনকে হুকুম করল আমার বিছানার ওপর গল্পের বইটা পড়ে আছে—নিয়ে আয়।

দুজনে ঘর ছেড়ে বেরুতে ঘাম-ঝরা আধ-মরা দীপু সরকারকে দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করে নিল কয়েক পলক। বলল চিঠি পেলাম। জামাইবাবুকে দেখাবার জন্য রেখেছি। ব্যাপারটা আত্মহত্যা হবে ক হত্যা হবে ঠিক বলতে পারছি না।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। —ছোট ছোট বই ছেড়ে দুই একখানা মোটা বই আনতে চেষ্টা করবেন।

দীপু সরকার নির্বোধ নয়। এই থেকেই বুঝে নিল চিঠি ভদ্মিনপতির হাতে যাবে না। আর সেই সঙ্গে এও স্পষ্ট যে তার কোনো আশা নেই।

এরপর কলকাতা থেকে মায়ের এক-খানা চিঠি পেল নূপুর। সাধারণ দু-পাঁচ কথার পর মা লিখেছেন তোমার বাবার শরীরটা ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। ওমনি বাবার জন্য ভয়ানক উতলা হয়ে পড়ল। বাবাকে একবার দেখে না এলেই নয়। ভদ্মিনপতি বাধা দিয়েছিল, তোমার নাচ গানের ক্ষতি হবে, বাবার খবর আমি এনে দিচ্ছি।

কিন্তু নূপুর বেঁকে বসল দু-বছরের মধ্যে বাবা মাকে দেখে না। একবার যেতেই হবে তাকে। এখান থেকে এখানে ক-দিনের মধ্যেই চলে আসবে. নাচ-গানের এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

অগত্যা ভদ্মিনপতি কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে। নূপুরের মাকে বলল ওকে ছেড়ে তার রুগ্না স্ত্রী চোখে অন্ধকার দেখবে—তাছাড়া অল ইণ্ডিয়া নাচের কম্পিটিশনও এসে গেল বলে, এ-সময়ে নাচের কামাই মানে নিজের ক্ষতি।

কিন্তু টানা দু-মাসের মধ্যেও নূপুর আর বাড়ি থেকে নড়ার নাম করে না। শেষে মা-বাবা পর্যন্ত বাবার তাগিদ দিতে শুরু করলেন। এই মেয়ের ভবিষ্যতের দিকেই চেয়ে আছেন তাঁরা।

আর শেষে ভালো সত্যি নিজেরও লাগছিল না। অত প্রাচুর্যের মধ্য থেকে এখানে এসে দু-মাসের মধ্যেই হাঁপ ধরে গেছে। তাছাড়া নাচে কামাই হয়ে যাচ্ছে সে জন্যেও দুশ্চিন্তা। এও মনে হল ভদ্মিনপতি এই দু-মাসও টাকা পাঠানো বন্ধ করেনি কিন্তু তার কোপে পড়লে এটা বন্ধ হতে পারে। এই দো-টানার সময় বাড়িতে ভদ্মিনপতির চিঠি এলো বাবার কাছে। তার স্ত্রীর সংকটাপন্ন অবস্থা, সে আশা করছে এ-সময় কাছে থাকাটা যদি কর্তব্য বিবেচনা করেন, তাহলে নূপুরকে যেন পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

চিঠি পেয়ে বাবা-মা এক রকম ঠেলেই পাঠালেন তাকে। চলনদার জোটানো গেল না। নূপুরে একাই রওনা হয়ে গেল। ভয়টাই বা কি, একুশ বছর বয়েস, বাচ্চা তো আর নয়. দিনে রওনা হয়ে দিনে পৌঁছুবে, ভয়টা কিসের।

সাইকেল রিকশয় ভদ্মিনপতির বাড়ি যাবার পথে দীপু সরকারের সঙ্গে দেখা। স্থানকাল ভুলে সে রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে গেল। অতএব রিকশ থামিয়ে একটু করুণা বর্ষণের লোভ হল নূপুরের। হেসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন?

দীপু সরকার বলল, আছি আর কোথায়।

—ছেলে দুটোর পড়াশুনা হচ্ছে তো ভালো।

—ইয়ে, হচ্ছে.....তবে মাঝে মাঝে কামাই হয়ে যাচ্ছিল।

প্যাঁচা মূর্তির আরো একটু মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার বাসনা নূপুরের। হেসে বলল, বেশী কামাই করা ভালো না, আর আমার জন্য মোটা-মোটা বই বেছে আনবেন।

দীপু সরকার জানালো, আনবে। কামাই আর হবে না।

জ্যাঠতুতো বোন অর্থাৎ ভদ্মিনপতির স্ত্রীর অসুখটা সত্যিই বেশি। এখন শয্যা ছেড়ে নামেও না বড়। ভদ্মিনপতি আপ্যায়ন জানালো, শালীর নিদর্শতার অনুযোগ করল। নাচ-গানের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে খবর চলে গেল আবার। রুগ্না স্ত্রী নিজের ঘরে পড়ে থাকল,

বাড়ির বাতাসে খুশির ঢেউ উঠল আবার।

তিন সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা আরো খারাপের দিকে গড়ালো ভগ্নিপতির শরীর। দুদিন যাবৎ সংকট চলেছে। রাতের দিকে ভগ্ন হৃদয় ভদ্রলোক সান্ত্বনায় তাগিদে নিজের ঘরে ডেকে নিল নূপুরকে। তার হতভম্ব চোখের ওপরেই ঘরের দরজা রুধ করল। তারপর আকুল হয়ে ওকে বুকে টেনে নিল। বলল, এখন তুমি ছাড়া আর আমার কে থাকল—।

নূপুর কাঠ হয়ে তার বুকের সঙ্গে লেপটে থাকল খানিকক্ষণ। শেষে লোকটার হাত আর মুখ বেশি অবাধ্য হয়ে উঠতে যেন সম্বিত ফিরে পেল। প্রাণপণে ছাড়াতে চেষ্টা করল নিজেকে। কিন্তু ছাড়া পাবার জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করা হয়নি। ঠান্ডা বরফের মতো গলা করে ভগ্নিপতি বলল, আপত্তি করলে আমার অন্য উপায় জানা আছে, সেটা তোমার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার হবে, কষ্টেরও। চুপ করে থাকো, আজ মন মেজাজ সত্যি ভালো নেই আমার।

সে তাকে ধাক্কা দিয়ে নিজের শয্যায় এনে ফেলল। আর নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল। নূপুর ভয়ে সিঁটিয়ে গেল আবার। এতদিনের মধ্যে ভগ্নিপতির এমন নির্মম কঠিন পশু মূর্তি আর দেখেনি। এখন শুধু মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে যাবার অপেক্ষা।

কিন্তু ওপরওলা সদয়। ঠিক তক্ষুনি দরজায় ঘন ঘন আঘাত। বাইরে ছোট ছেলের ব্যস্ত গলা। —বাবা তুমি ঘরে কি করছ—দিদিভাই আর জামাইবাবু এসে গেছে, দিদি তোমার খোঁজ করছে—শিগগীর এসো!

প্রবৃত্তির মূলে যেন কুড়ুলের ঘা পড়ে গেল। ওকে ছেড়ে দিয়ে ভগ্নিপতি শয্যা থেকে নামল। প্রথমে ঘরের আলো নিভিয়ে তারপর দরজা খুলল। না, বাইরে কেউ নেই। খবরটা দিয়েই ছেলে চলে গেছে।

নূপুরকে বলল, চুপচাপ নিজের ঘরে চলে যাও। এই প্রথম দিনটাই মাটি। কিছু ভেব না, আবার দিন আসবে।

মুক্তি মেলার পর আত্মরক্ষার তাগিদে পাগল হবার উপক্রম নূপুর ব্যানার্জির। পরদিনই পালাবার জন্য বোকার মতো সুটকেস গোছাতে বসল সে। কিন্তু তার ওপর যে বাড়ির আধবয়সী পুরনো ঝি টাঁয় লোন দৃষ্টি আছে জানত না! সেই শুধু জামাকাপড় গোছাতে দেখেছে। দশ মিনিটের মধ্যে ভগ্নিপতি ঘরে এসে বলল, কোন রকম অবাধ্যতা দেখলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এ বাড়ির চৌহদ্দি থেকে আপাতত বেরুনোর চেষ্টাটাও বাতলানো হল। আর স্ত্রী বা মেয়ে সামান্য ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে পারে তাহলে তুমি তার দূরের এক বাগান বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

সেই দিনই গোপনে একটা চিঠি পাঠাতে চেষ্টা করল কলকাতার বাড়িতে। কিন্তু তাও পারা গেল না। সেই আধবয়সী পরিচারিকার হাতে ধরা পড়ল। সে উপদেশ দিল, ঠান্ডা হয়ে থাক গো মেয়ে—তোমার ভাগ্যি তো ভালই।

ভয়ে ত্রাসে আর হতাশায় নূপুর ব্যানার্জি পাগল হয়ে যাবে বুঝি। মরণকালে লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, দীপু সরকার তো জলজ্যান্ত মানুষ একটা। গল্পের বইয়ের আমদানী আর ফেরত দেওয়াটা অনেক দিন ধরেই দেখছে ঝি-চাকরেরা। এ-ব্যাপারে তাদের কড়া-চোখ থাকার কথা নয়। ছিলও না। তাছাড়া বাবুর ছেলেদের হাত দিয়ে বইয়ের আদান প্রদান। কতগুলো বইয়ের লিস্ট দেবার জন্য কাগজ পেনসিল চেয়ে দীপু সরকারকেই বিপদের বার্তা জানালো নূপুর। তারপর ছেলেকে সঙ্গে করে নিজে মাস্টারের ঘরে গিয়ে বলল, খুব দরকারী কটা বইয়ের লিস্ট আছে এতে পড়ে দেখবেন।

চলে এলো। ওদিকে লিস্ট পড়ে তো দীপু সরকারের চক্ষু ছানাবড়া। শুধু বিপদের বার্তাই নয়, উদ্ধারের আকুল আকুতি।

বইয়ের মধ্যেই চিঠির আদান প্রদান চলল ক-দিন। বইয়ের বাহক কর্তাবাবুর ছেলে। সন্দেহের কারণ নেই। দীপু সরকার বার বার লিখছে নিজের জীবন দিয়েও এই বিপদের ফয়েসলা করবে। কিন্তু ফয়সলার রাস্তাটাই ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে মুখোশ খুলে ফেলতে সেই আধবয়সী পরিচারিকাটি গল্পের ছলে নূপুরকে শুনিয়ে রেখেছে, কর্তা বাবু এমনিতে ঠান্ডা মানুষ কিন্তু রাগলে বাঘ। তার অবাধ্য হবার ফলে সেই কত বছর আগে একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে খুন হয়ে গেছে। পুরুষটা ছিল মেয়েটার দাদা, সে বোনকে রক্ষা করতে এসে এই ফ্যাসাদ। পুলিশ কোনো কিনারাই করতে পারল না। নূপুরকে বলেছে, খপর পেয়ে তোমার মা বাবা দৌড়ে এলেও সুবিধে হবে না বাপু, মাঝখান থেকে তাদের বিপদ ঘনাবে।

নূপুর ভেবেছিল দীপু সরকারের মারফৎ কলকাতায় বাবা মায়ের কাছে বিপদের খবর পাঠাবে। এ-কথা শোনার পর বুকের ভিতরটা হিম একেবারে।

সাত আট দিনের মধ্যে ভগ্নিপতির স্ত্রী অর্থাৎ নূপুরের জ্যাঠতুতো বোন মারা গেল। তার তিন দিনের মধ্যে ভগ্নিপতি তাকে বলল সব তো চুকেই গেল তারপর এখানকার যা-কিছু সবই তোমার।

দীপু সরকারের পরামর্শ মতো নূপুর তখনো হাসতে পেরেছে। আর কটাক্ষ বাণে বিদ্ধও করতে পেরেছে একটু। অর্থাৎ আমি হাল ছেড়েছি বাপু।

ভালমানুষ ভগ্নিপতি তাইতে বিগলিত।

দীপু বইয়ের ভাঁজে লিখেছে শ্রাদ্ধের দিন সকাল থেকে সর্বদা এক বস্ত্রে বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত থেকো।

সেই সকাল থেকেই নূপুরের বুক ঢিপ ঢিপ।

সকলে ব্যস্ত সেদিন। বিরাট আয়োজন দানসাগরের অনুষ্ঠান চলেছে। কাজ ভগ্নিপতিই করছে। অতএব সেও ব্যস্ত। বাইরে সামিয়ানা টাঙিয়ে উদাত্ত কণ্ঠের মাথুর পালা জমে উঠেছে। সকলে আহা-আহা করছে। ফটকের দারোয়ান দুটোও এক কোণে জায়গা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে।

ভগ্নিপতির ছোট ছেলে এসে খবর দিল, আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়ি থেকে গাড়ি করে মেয়েরা এসেছে মাস্টার মশাই সেই গাড়িতে বসে আছে তোমাকে 'ঘোমটা' বইটা নিয়ে এক্ষুনি একবার যেতে বলেছে।

নূপুরের বুকের তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি। কিন্তু প্রাণের দায়ে মাথা সাফ। বুঝল তক্ষুনি। ঘোমটা নামে কোনো বই তার কাছে নেই। বলল, আচ্ছা যা কোথায় যে রাখলাম, খুঁজে নিয়ে যাচ্ছি।

ও সরতেই থমকে ভাবল দুই এক সেকেন্ড। একটানে বড় সুটকেসটা খুলে ঝকমকে একটা শাড়ি বার করল। ভগ্নিপতির দেওয়া এই জবরজং শাড়িটা আগে আর পরেনি। এক মিনিটের মধ্যে সেটা পরে নিল। সুটকেসের হটুয়ায় গয়নাগুলো শুধু রেডি করা ছিল যদি নেবার ফুরসৎ মেলে। সেটাও তুলে নিল। তারপর তর তর করে নিচে নেমে আসতে আসতে মাথায় একটু বড় করে ঘোমটা টেনে দিল।

হ্যাঁ সকলের চোখের ওপর দিয়েই মন্ডপ পেরিয়ে ফটকের এধারে এলো। কেউ কেউ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মাস্টার-মশায় যে গাড়িতে করে মেয়েছেলেদের নিয়ে এসেছে সেই গাড়িতেই ঘোমটা-পরা একটি বউ উঠে চলে গেল।

গাড়ি সোজা বাজারের কাছে এসে থামল। সেখানে কয়েকটা প্রাইভেট ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। নেমে গাড়িটাকে বিদায় করা হল।

তিনবার ট্যাকসি বদল করে কলকাতায়। অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল দীপু সরকারের। চাকরিটিও খোয়াতে হল সেই সঙ্গে। কারণ আবার তমলুকে ফেরা মানেই প্রাণটি দেওয়া।

চারদিন বাদে উদার ভগ্নিপতি এক-জন অচেনা লোক মারফৎ নূপুরের প্রকান্ড সুটকেসটা কলকাতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে তার বাবার কাছে চিঠি স্ত্রীর কাজের দিন তার মেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

আশা করা যায় সে কলকাতার বাড়িতেই গেছে। ওর মতো মেয়ের দায়িত্ব সে-ও আর নিয়ে উঠতে পারছিল না। ভালই হয়েছে নিজে থেকে চলে গেছে। ওর জামাকাপড়ের বাকসটা পাঠিয়ে দেওয়া হল।

চিঠি পেয়ে বাবা রেগে আগুন। দেব-তুল্য জামাই এ-কথা লেখে কেন। কিন্তু মা-কে নূপুরের মোটামুটি বলে রেখেছে। বাবাকে সেই ভদ্রমহিলা ধমকে থামিয়েছে। কিন্তু খরচ বন্ধ হল বুঝে মাথায় আকাশও ভেঙেছে।

সোমেন মিত্তির হাসলেন।—সেই থেকে বেশি টাকা রোজগারের আশায় সিনেমা লাইনে ঘোরাঘুরি আর কৃচ্ছ্র-সাধন?

—হ্যাঁ। আর সেই থেকে নূপুরের মনে মনে আশা ছবির নায়িকা হবে। কল-কাতার এক বন্ধু আমাকে মোহন চৌধুরীর সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছিল।

সোমেন মিত্তির মনে মনে চিন্তা করে নিলেন কি। জিজ্ঞাসা করলেন, নূপুরকে নিয়ে একবার লোকানন্দ বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করবে?

—লোকানন্দ। ও, বিদিশার সেই বড়ুয়া সাহেব। তার নাম লোকানন্দ?

সোমেনবাবু মাথা নাড়লেন।

—তার সঙ্গে দেখা করে কি হবে?

—ঠিক বুঝছি না। কাল অনেক রাত পর্যন্ত কথা-বার্তা হল। বিলেত ফেরত সার্জন, গোয়ায় প্র্যাকটিস করত ...মনে হয় বেশ টাকা কড়ি হাতে আছে। সে-ই দেখা করতে বলেছে।

—আমাকে?

সোমেনবাবুর হাসি পেয়ে গেল। না নূপুরকে। তা তুমি সঙ্গে থাকলে খুব অসন্তুষ্ট হবে না বোধহয়।

—আমাদের অবস্থা জেনেও আপনি হাসছেন দাদা। দীপু সরকার ক্ষুব্ধ একটু। বিলেত ফেরত সার্জন হোক আর যাই হোক ও-ব্যাটার চোখ কোন-দিকে আমি গোড়া থেকেই জানি। ও আরো ডেঞ্জারাস মানুষ, আমরা এত-গুলো লোক দেখেও বলে কিনা আমাকে জানলা গলিয়ে নিচে ফেলে দেবে। এখন আবার কেন দেখা করতে বলেছে সেও আপনার ভালই জানা আছে। তপ্ততপে কড়া থেকে এখন আবার গনগনে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাই আর কি।

দীপু সরকার যা বলল, বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলে তা মিথ্যে মনে হয় না। কিন্তু ভিতর থেকে ঠিক সায় মিলছে না। অনেকটা নিজের মনেই বললেন, তা না-ও হতে পারে হে .....কাল রাতে লোকটার সঙ্গে অতক্ষণ কাটিয়ে সাধারণ পাঁচজনের মতো মনে হয়নি তাকে ...অদ্ভুতই লেগেছে। ভদ্র-লোকের জীবনে বড়রকমের ঘটনা আছে কিছু। গা-ঝাড়া দিয়ে আত্মস্থ হলেন যেন। ঠিক আছে, এখন যেতে হবে না, আমি ভেবে দেখি একটু। কাল-পরশুর মধ্যে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে হয়তো, তুমি দিন পাঁচ সাত পরে এসো।

।। পাঁচ ।।

মাঝে দুটো দিন গেল। সন্ধ্যা পার হলেই সোমেন মিত্তিরের ভিতরটা বিদিশার দিকে ছোটাছুটি শুরু করে। তৃতীয় সন্ধ্যায় ঘরে আর থাকাই গেল না। তবু আটটায় অর্থাৎ একটু দেরি করেই বেরিয়ে পড়লেন। বিদিশায় পৌঁছুতে সাড়ে আটটা হবে। লোকা-নন্দ বড়ুয়ার আসতে একটু দেরি হয় এক-একদিন। সেখানে গিয়ে বোকার মতো একলা বসে থাকার মানে হয় না। ও-সময় নির্দিষ্ট টেবিলে তাকে পাবেন আশা করছেন।

পেলেন।

দূর থেকে দেখেই দরাজ হাসির অভ্যর্থনা জানালো। শেষ দেখা রাত সাড়ে এগারোটার সেই হঠাৎ অসহিষ্ণু উদভ্রান্ত মানুষ যেন আর কেউ। কাছে যেতে প্রসন্ন আহ্বান। আসুন, এত দেরি?

মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসে সোমেন মিত্তির হাসি মুখেই ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যেন জানতেন আমি আসব?

অল্প অল্প মাথা নেড়ে একটু একটু হাসতে লাগল। এই হাসি আর এই চাউনি শুধু সুন্দর নয়, বুদ্ধি-দীপ্তও। —ইয়েস স্যার, বিইং অ্যান অথর, ইউ আর লাইকলি টু রান আফটার র-মেটিরিয়ালস।

অদ্ভুত লাগল জবাবটা। এ যেন অতি সহজে সোমেন মিত্তিরের ভিতরের অভিলাষটা টেনে বার করে তাঁকেই দেখিয়ে দিল। নিজের গরজে হেসে প্রায় সায়ই দিলেন সোমেনবাবু। আপনি তাহলে নিজেকে আমাদের র-মেটিরিয়াল ভাবেন?

—এতদিন ভাবিনি, সেদিন রাতে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পর থেকে ভাবছি। উৎফুল্ল ভ্রূকুটি একটু, এতকাল আমার কাছে আপনাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না মশাই, থাকলে একটা রোগ সারানো যেত বোধহয় ...অ্যান্ড কুড হ্যাভ সেভড এ লট অফ ট্রাবলস।

না বোঝার ভান করলেন সোমেন মিত্তির। —এফ আর সি এস সার্জনের রোগ?

—ইয়েস স্যার। এ সার্জন কান নট অপারেট হিমসেলফ অ্যান্ড টোয়াইস আই ফেইলড টু গেট সেফ হ্যান্ডস—আই ডেয়ারড নট ট্রাই থ্রাইস। তার পরেই হেসে সোমেনবাবুর কৌতূহলে জল ঢেলে দিল যেন। বাট ওয়েট স্যার, দি নাইট ইজ স্টিল ইয়ং। কি দেবে আপনাকে, বীয়ার?

টেবিলে আজ একটাই গেলাস। আগে এলে একসঙ্গে বেশি নেবার দরকার হয় না। এটা কত নম্বর গেলাস জানেন না। মুখ আর চোখ দেখে দুই কি বড় জোর তিন নম্বরের বেশি মনে হয় না। সোমেনবাবু বললেন, আপত্তি নেই, কিন্তু আজ আমি স্ট্যান্ড করলে কেমন হয়?

—আমার ড্রিংক-এর খরচ দেবেন! অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনল যেন। এ দেশের লেখকদের অনেক টাকা নাকি? ভালো স্কচ ছাড়া আমার চলে না, গেল সপ্তাহে শুধু ড্রিংক-এর বিল পেমেন্ট করেছি সতেরশ টাকা।

শুনে চক্ষু স্থির সোমেনবাবুর। এত খান কেন?

—খাই কোথায়, আই জাস্ট ড্রাউন মাইসেলফ। বাট বিলিভ মি, আই হেট ড্রিংকস। যেতে দিন, আমার অঢেল আছে, আপনার চক্ষুলজ্জার কারণ নেই। বয়কে ডাকতে গিয়েও কি মনে পড়তে তাঁর দিকেই ফিরল আবার।—হোয়াই নট ইন মাই রুম? আপনার খুশি হবার মতো কিছু দেখাতে পারি। এ গুড আইডিয়া, আসুন—

জবাবের অপেক্ষা না রেখে গেলাসের সবটুকু এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল। মোটা ব্যাগটা হাতে তুলে নিল।

সোমেনবাবু সানন্দেই সঙ্গ নিলেন।

বড় বড় পা ফেলে ম্যানেজারের কাছে এসে হুকুম করল, এক বোতল স্কচ, দু বোতল বীয়ার, কিছু সোডা অ্যান্ড প্লেন্টি অফ আইস—ইন মাই রুম প্লীজ!

বেরিয়ে এসে সোমেনবাবুকে সঙ্গে করে করিডোর পেরিয়ে তিন তলায় উঠে গেল। আবার একটা ছোট করিডোরের শেষ মাথায় তার সুইট। সতের নম্বর ঘর। খুব ছোটও নয় আবার খুব বড়ও নয়। মেঝেতে পুরু গালচে বিছানো, আসবাবপত্র সাজানো গোছানো। দেয়াল-ঘেঁষা গদির শয্যা, অ্যাটাচড বাথ। এদিকে মুখোমুখি বসার দুটো ফোমের চেয়ার, মাঝে বড় সড় শৌখিন সেন্টার টেবিল। তার ওপর টেলিফোন।

ঘর বন্ধ থাকলেও টিউব-লাইট জ্বালাই ছিল। ভিতরে ঢুকে আগে একটা চড়া টিউব লাইট জ্বালল লোকানন্দ বড়ুয়া। দিনের মতো শাদা হয়ে গেল ঘরটা। পাখা নিষ্প্রয়োজন কর্কশ সমস্ত তিন তলাটাই এয়ার কণ্ডিশণ্ড।

—বসুন।

হাতের মোটা ব্যাগটা শয্যার পাশে রাখল। গায়ের ঢোলা শাদা কোর্তাটা খুলে বিছানার ওপরেই ছুঁড়ে দিল। দামী টেরিকট টেরিলিনের ট্রাউজার আর জামায় ভদ্রলোকের বয়েস এখন আরো কম দেখাচ্ছে।

সামনের চেয়ারে এসে বসল। সহজ নির্বিকার উক্তি, বলল, এখানেই জমিয়ে

বসা যেতে পারে, মেয়েটাই আর আসছে না...বার-এ বসে কি হবে!... এরপর এখানেই বা আর কতদিন থাকতে ইচ্ছে করবে জানি না।

মেয়েটা বলতে নুপুর ব্যানার্জি। সৌমেন মিত্তির ভালো করে লক্ষ্য করছেন। কিন্তু কেন যেন একথা শোনার পরেও প্রবৃত্তির কদর্য দিকটা চোখে পড়ছে না।

লোকানন্দ বড়ুয়া ফোন তুলে নিল। অপারেটরের কাছে নম্বর চাইল একটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাড়া পেল।—ডকটর বড়ুয়া দিস সাইড...গুড ইভনিং মিসেস সমাজদার, লাকি আই গট ইউ! লিসন, আজ রাতে আসার কথা ছিল তো?...বাট প্লীজ নট টু-নাইট, আমি আজ একজন নামী সাহিত্যিকের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় বসে গেছি...ও ইয়েস এ গ্র্যাণ্ড ডাইভারশন...আই উইল সী ইউ টুমরো অর ডে আফটার...ও ডোণ্ট ওয়ারি, দ্যাটস অলরাইট...থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, ইউ আর সো সুইট ম্যাডাম—গুড নাইট।

রিসিভার নামালো।

রাত্রিতে এখানে একটি-দুটি মহিলার আগমনের কথাটা দীপু সরকার বলেছিল মনে পড়ল সোমেনবাবুর। ভিতরের প্রবৃত্তির দিকটা এবার যেন একটু উস্খাটনের মুখে। আবার এও ভাবছেন সেটা তেমন বড় হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল না করে তাঁকেই বিদায় কথা।

সহজভাবেই বললেন, কারো আসার কথা ছিল...আপনার অসুবিধে করলাম দেখছি।

জবাবে ওই উক্তিই করল, অসুবিধে হলে কারো আসা বন্ধ করে আপনাকে ধরে রাখব কেন। অ্যাট প্রেজেন্ট আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন ইউ সার, আই ডোণ্ট নো হোয়াই...য়াদার স্ট্রেঞ্জ!

—কি দেখাবেন বলছিলেন?

—ও ইয়েস, দেখে আপনি খুশি হবেন।

সোফা ছেড়ে উঠতে গিয়ে বাধা পড়ল। জানান দিয়ে দুটো বেয়ারা ঘরে ঢুকলো। তাদের হাতে স্ন্যাক্স, বীয়ার, সোডার বোতল, বরফ বোঝাই পাত্র, ট্রের ডিশে বাদাম শুশা টোমাটো পোটাটো চীপস। বড়ুয়া সাহেবের নির্দেশে ট্রে আর গেলাস সেণ্টার টেবলে রাখা হল, বোতলগুলো মাটিতে। টেলিফোনটা তুলে নিজেই বিছানার ওপর রেখে টেবিলের জায়গা বাড়ালো। জিজ্ঞাসা করল, খাবার তো কিছু বললাম না, আই ডোণ্ট রিকয়ার, আপনাকে কি দেবে?

—কিছু না। বাড়িতে বলে আসি নি...

চোখের ইশারায় বেয়ারা দুটো চলে গেল। তার দিকে ফিরে লোকানন্দ বড়ুয়া হাসল এবার।—ইউ হ্যাভ এ সুইট হোম দেন...ইজ্‌ ট দ্যাট? স্ত্রী আছেন নিশ্চয়?

—আছেন?

ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করল, দেখতে ভালো?

সোমেনবাবু হেসে ফেললেন, বললেন বয়েস হয়েছে, এখন আমি ছাড়া আর কেউ তেমন ভালো দেখে না! আসুন না একদিন—

হাসিতে মুখ ভরাট লোকটারও। এই হাসি সুন্দর তো বটেই, সরলও। বলল, নিশ্চয় যাব—গেলে নিজের হাতে রেঁধে আমাকে খেতে দেবেন?

—দেবেন। পানের সরঞ্জাম দেখিয়ে হাসলেন।—কিন্তু এসব দেবেন না।

—আই হেট দিজ। তেমনি উৎসুক আর কে আছে—ছেলে মেয়ে?

—দুই-ই আছে।

—দে লাভ ইউ ডিয়ারলি?

সোমেন মিত্তিরের মনে হল, এটুকু কৌতূহলের মধ্যেও যেন প্রাণের আবেগের স্পর্শ আছে। জবাব দিলেন, মনে তো হয়...।

হাসছে অল্প অল্প। একটা বীয়ারের বোতল খুলে নিজেই গেলাসে ঢেলে গেলাস আর বোতল তাঁর সামনে রাখল। হুইস্কির বোতল খুলে নিজের গেলাসে বেশ খানিকটা ঢেলে নিল। গেলাসে সোডা মেশাতে মেশাতে বলল, আপনার লেখা থেকেই মনে হয়েছে ইউ আর এ হ্যাপি ম্যান অ্যাণ্ড ইউ ওয়ান্ট টু সী আদারস হ্যাপি টু। ওয়েট আই হ্যাভ এগেন ফরগটন—

উঠে শিয়রের কাছের বুক সেল্ফ থেকে পাঁচ-পাঁচটা বই টেনে বার করল। বুক-সেল্ফটা আগেই চোখে পড়েছিল সোমেনবাবুর, সবগুলোই মোটামোটা ডাক্তারি বই-এ ঠাসা ভেবেছিলেন। কিন্তু হাসি মুখে লোকানন্দ বড়ুয়া বইগুলো তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিতে তিনি সত্যিই অবাক। পাঁচটাই তাঁর লেখা উপন্যাস! তার মধ্যে শুধু একখানা ছাড়া কোনোটাই খুব নামী উপন্যাস নয়।

—কিনলেন নাকি এগুলো?

সোফায় বসে গেলাস হাতে তুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকালো।—ওই রাতে অতক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করার পর হঠাৎ একটু সাহিত্য চর্চার ঝোঁক চাপল। সকালে বেরিয়ে হাতের কাছে আপনার যে কখানা বই পেলাম কিনে ফেললাম। তারপর এ দুদিন ভ্যাগাবনডাইজিং ছেড়ে এর মধ্যে চারখানা বই পড়েও ফেলেছি—আর একখানাও ধরেছি।

সোমেনবাবুকে অবাক করতে পেরেই যেন 'চীয়ার্স' বলে গেলাসে লম্বা চুমুক লাগালো একটা। তারপর হৃষ্ট মন্তব্য করল, বাংলা নভেল এর আগে কখনো পড়েছি বলে মনে পড়ে না, মেন্টাল মেক-আপ-এর অভাব।...আর বাইরে বাইরে কাটানোর ফলে সময়ও হয়নি সুযোগও হয়নি।...দেশের স্কুলে পড়তে বাংলা আমার খুব প্রিয় সাবজেক্ট ছিল, অলওয়েজ গট হাই মার্কস, নইলে এতদিনে এই ল্যাংগুয়েজই আমার ভুলে যাবার কথা। কিন্তু দিব্যি পড়ে গেলাম!...মন্দ লাগল না, কিন্তু ওই যে বললাম, পড়ে মনে হল আপনি সুখী মানুষ, জটিল যুগের খুব বেশি খবর রাখেন না।

সোমেন মিত্র ভিতরে ভিতরে একটু আহতই হলেন। নাম হওয়ার পর থেকে বিপরীত মন্তব্য শুনেই অভ্যস্ত। তবু হেসেই বললেন, কম সময়ে তাগিদের লেখাও অনেক লিখতে হয়, আমার বরাতে আপনার সিলেকশন খুব ভালো হয়নি...এগুলোকে আমি নিজেই তেমন উঁচু দরের লেখা বলে মনে করি না। যে বইটার কিছু নমুনা আছে সেটা তুলে দেখালেন।—এটা পড়েছেন?

ঝুঁকে দেখে নিল।—হ্যাঁ, অন্যগুলোর তুলনায় ওটা স্মোটামুটি ভালই! স্টিল, আই এক্সপেকটেড মোর রাইট!...এভরিথিং ইজ সো রিয়েল, আই ফাইণ্ড নাথিং আনকমন।

—আনকমন বলতে...কি চান? অবাস্তব কোনো চরিত্র বা ঘটনা?

দু-চারটে বাদাম তুলে নিয়ে চিবুতে লাগল। নিজের লালচে চুলের ঝাঁকে হাত চালালো। একবার।—অবাস্তব ইজ নট দি এগজাকট ওয়ার্ড।...হোয়াট আই মীন ইজ পারহ্যাপস এ সর্ট অফ অ্যাবসার্ড লাইফ স্টোরি—রিয়েল বাট অ্যাবসার্ড।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে সোমেন মিত্তির ভিতরে ভিতরে সজাগ একটু। অভ্যস্ত ষষ্ঠ অনুভূতি সক্রিয় হয়ে উঠছে। আপাত পরিত্যক্ত ছবির গল্প সম্পর্কে আগ্রহ থাকলে কেবল সেটাই অর্থাৎ 'পসরা' বইখানাই কেনা এবং পড়া হত। হঠাৎ এতগুলো বই কিনে পড়ে ফেলার উদ্দেশ্য আর যাই হোক ছবির গল্পের মান যাচাই নয়। তাহলে?

...তাহলে যে আগ্রহ নিয়ে সোমেন বাবুর এই লোকের ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে আসার চেষ্টা, এরও তাঁর প্রতি তেমনি কোনো আকর্ষণের অজ্ঞাত কারণ ঘটেছে। আজও বারএ দেখা হতে বলেছে, তিনি আসবেন জানাই ছিল, কারণ লেখকরা র-মেটিরিয়ালের পিছনে ছুটেই থাকে আর বলেছে, এতকাল তার কাছে লেখকদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, থাকলে একটা রোগ সারানো যেত—কুড হ্যাভ সেভড এ লট অফ ট্রাবলস। আরো কিছু বলেছে যা তখন দুর্বোধ্য মনে হয়েছে সোমেনবাবুর। এখনো স্পষ্ট নয় কিছুই, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে তাঁকে নিয়ে এই লোকের মাথার মধ্যে কিছু একটা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। সেই কারণেই হঠাৎ এতগুলো বই কিনে ফেলা আর দু-দুটো দিন ঘর ছেড়ে না বেরিয়ে ধৈর্য ধরে পড়ে ফেলা।

বীয়ারের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সোমেনবাবু তাকে শুনিয়ে তার কথাগুলোরই পুনরুক্তি করে নিলেন একবার, অ্যাবসার্ড লাইফ স্টোরি...রিয়েল বাট

অ্যাবসার্ড! হেসে নিজের দুর্বলতা স্বীকারই করে নিলেন যেন।—দেখুন, লোক-চরিত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞান-গম্যির গণ্ডীটা সত্যিই খুব বড় না— সেরকম দেখিও নি শুনিও নি—অথচ আপনি যা বললেন, খুব ভালো লাগছে।...দুই-একটা নজির যদি মনে আসে বলুন না শুনি?

ভিতর থেকে একটা অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি যেন ঠেলে উঠল হঠাৎ। সেটা ফিরে আবার তল করার জন্যেই যেন গেলাস হাতে উঠল। সবটুকু জঠরস্থ করে গেলাস নামালো। শরীরটাকে একবার ঝাঁকিয়ে চাঙ্গা করে নিতে চাইল বোধ হয়। হুইস্কির বোতল তুলে নিল আবার। গেলাসের মুখে উপুড় করল। এবারের মাপটা আরো একটু বড় ছাড়া ছোট নয়। বার-এ সোমেনবাবু তাকে সাত পেগ পর্যন্ত খেতে দেখেছেন। আজ তিনি আসা পর্যন্ত সেখানে তিন পেগ যদি হয়ে থাকে তবে এখানে দুবারের মাত্রাতেই বাকি চার পেগ হয়ে গেল বলে অনুমান।.....আইস কনটেনার থেকে গেলাসে কয়েক টুকরো বরফ ফেলা হল। সোডা ঢালা হল।

সোমেনবাবু চুপচাপ দেখছেন।

—আপনার সেই হিরোইন, আই মীন নন্দর ব্যানার্জির খবর কি?

প্রসঙ্গ বদলে সাহিত্য-প্রসঙ্গে ছেদ টানা হল বুঝতে পারলেন।—ছবি বন্ধ হওয়ায় খুব মুষড়ে পড়েছে শুনলাম। ক্যানাকাটিও করেছে নাকি.....।

—সিলি! তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন—কি হল?

—তার সঙ্গে দেখা হয়নি। দীপু সরকারকে বলে দিয়েছি।

—নিয়ে আসবে?

সোমেন মিত্তির —মাথা নাড়লেন। —বোধহয় না।

—কেন?

বিব্রত মুখ করে সত্যি জবাবটাই দিয়ে বসলেন।—যা পোড়-খাওয়া ছেলে... হুট্ করে আপনাকেই বা বিশ্বাস করে কি করে বলুন!...বলছিল তপ্ত কড়া ছেড়ে এখন গনগনে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাই আর কি।

প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন সোমেন মিত্তির। সুরার প্রতিক্রিয়ায় মুখ লালচে দেখাচ্ছে এখন একটু। চোখের পাতাও ভারী হয়ে আসছে। একথা শোনার পর আবার একটা অসহিষ্ণুতা ঠেলে উঠতে চাইল যেন।—ইনটিগিং রাসকেল! সী উইল বি এগেন ইন দি হ্যান্ডস অফ ওয়ান অব দোজ শার্কস আই টেল ইউ —হি কান্ট প্রোটেক্ট হার।

সমস্ত মুখ বিরক্তিতে ছাওয়া। গেলাস তুলে আবার একটু চুমুক দিল। দু-টুকরো শশা চিবুলো। তারপর কয়েকটা বাদাম। মাথাটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে রইল খানিক। মিনিটখানেক বাদে মাথা তুলে সোজা হল আবার। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মুখ। সোমেনবাবুর মুখের দিকে তাকালো। দুই ভুরুর মাঝে কুঞ্চন রেখা পড়ল একটা দুটো।—আচ্ছা মিস্টার অথর, আমার সম্পর্কে আপনার নিজের ধারণাটা কি রকম?

মানুষটাকে অনাবৃত করে দেখার এ-ই যেন বড় সুযোগ। কোনো প্যাঁচ-ঘোঁচের ধার ধারেন না এমনি মুখখানা করে তিনিও চেয়ে রইলেন খানিক। বললেন, আমি এখনো অ্যাবসার্ড লাইফ স্টেটমেন্টের কিছু নজির শোনার অপেক্ষায় বসে আছি...রিয়েল বাট অ্যাবসার্ড... সেটা না শোনা পর্যন্ত ঠিকঠাক বলতে পারছি না।

চাউনিটা মুখের ওপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। অভিজ্ঞ সার্জন রোগীর কোনো গোপন উপসর্গের মূল খুঁজছে যেন। দেখা হল। বিমনা একটু। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে বড় জানালাটার কাছে গেল। চুপচাপ নিচের দিকে চেয়ে রইল খানিক। ফিরল। সেখান থেকেই সোজা তাকালো আবার। ক্ষোভ বা বিরক্তি নেই, কিন্তু দৃষ্টি গভীর। নিজের সোফার পিছনে এসে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে বলল, ইউ আর রেভার সার।...ইয়েস আই ওয়ানটেড টু টেল ইউ সামথিং...অ্যান্ড দ্যাটস মাই ডিজিজ্।

দেয়ালের সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। সুইচ টিপে পর পর ঘরের দুটো বড় আলোই নিবিয়ে দিল। অন্ধকারের ধাক্কাটা ভালো করে লাগার আগেই নীল আলো জ্বলে উঠল একটা। খুব ফিকে মিষ্টি নীল। মুহূর্তের মধ্যে ঘরের বাতাসও বদলে গেল যেন। রহস্য-ছোঁয়া নীলাভ প্রশান্তি একটা।

লোকানন্দ বড়ুয়া নিজের সোফায় এসে বসল।

।। ছয়।।

এই পৃথিবীতে উনিশশ উনতিরিশ সালের এক অদ্ভুত আগন্তুক আমি লোকানন্দ বড়ুয়া। শুনেছি সেটা অপয়া বছর। দেশজোড়া ইকনমিক ডিপ্রেশন, ট্রেড ডিপ্রেশন আর শিক্ষিত বেকার ছেলেদের হাহাকারের বছর সেটা। অপয়া যে তার সব থেকে জ্বাস্ত নজির আমি—শ্বাস-ওঠা মায়ের পেট চিরে আমাকে ভূমিষ্ঠ করানো হয়েছে। আমার জন্মের আগে থেকে মায়ের জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান আর হয়ও নি। পৃথিবীর মুখ দেখতে হলে শুধু মা নয় বাবাও একজন দরকার। শুনেছি আমারও বাবা ছিল একজন। আমি আসার পনের দিন আগে কড়ে নৌকোডুবি হয়ে কর্ণফুলির জলে তার দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবু আমি নির্বিঘ্নে আসতে পেরেছি, এই পৃথিবীর আলো বাতাসের মুখ দেখেছি। আমার জানতে ইচ্ছে করে সেই বছরে সেই মাসে সেই দিনে আর সেই মুহূর্তে আরো কত লোক জন্মেছে আর তাদের কি হয়েছে। জানার উপায় নেই।

সেই চাটগাঁয়েই কাকা কাকিমার কাছে মানুষ আমি। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হত মানুষের খোলসের মধ্যে আমি অদ্ভুত জীব একটা। কাকা আমাকে ভালবাসত খুব। কিন্তু তার ওপর আজও রাগ আমার। কারণ অনেক ভেবেচিন্তে অনেক মাথা ঘামিয়ে লোকানন্দ নামটা নাকি সে-ই রেখেছিল।

আচার আচরণে কাকা খাঁটি বৌদ্ধ। সেখানকার কলেজের পালি প্রোফেসার সে। অনেক জায়গা জমির মালিক। সে-মালিকানার ভাগ আমারও ছিল কিনা সে-প্রশ্ন কখনো ওঠেনি। তার দুই ছেলে আর দুই মেয়ে সকলেই আমার থেকে ছোট। সকলে আমাকে বাড়ির বড় ছেলে ভাবে। ফাঁক পেলে কাকা আমাকেই ডেকে ভালো ভালো উপদেশ দেয়। তথাগতের দুঃখনিবৃত্তির অষ্টাঙ্গবাণী কানে দেয়। সৎ চিন্তা; সম্যক দৃষ্টি; সৎ সংকল্প; প্রিয়ভাষণ; সদাচারণ; সর্বজীবে অহিংসা; সংযম আর আত্মিক সাধনের মহিমা ব্যাখ্যা করে। নিয়মিত উপাসনায় বসা হয়, প্রচুর ধূপধুনো জ্বলে গুমগুম চমরির ঢোল বাজে ঢিমেতালে ঝাঁঝর বাজে। পাঁচ বছর বয়েস থেকে উপাসনার সময় কাকার পাশে আমাকেও গিয়ে বসতে হয়। মন দিতে পারলে ভিতরটা বেশ ভরাট ভরাট লাগত।

কিন্তু কাকার থেকে ঢের বেশি ভালো লাগত আমার চাটুজ্জে জেঠুর কথা শুনতে। কাকার প্রাণের বন্ধু কিন্তু কাকার থেকে অনেক বড় বয়সে। বাবাকেও নাকি খুব ভালবাসত চাটুজ্জে জেঠু। অনুভব করতে পারতাম সেই ভালবাসা আমাকে ঘিরে আছে। কাকার থেকেও চাটুজ্জে জেঠুকে বেশি পছন্দ করতাম। দেশে-বিদেশে মশলা চালানের মস্ত কারবার তার। টাকা পয়সার ছড়াছড়ি, কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই যে বাইরে থেকে বোঝা যাবে। সেই ভদ্রলোকের অন্যরকম কথা। পাপ আছেই, থাকবেও। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে পাপ। সোজা রাস্তা হল সেটা কবুল করে ফেলা। নিজেকে শুনিয়ে নিজের কাছে কবুল করা, বিশ্বস্ত আপনার জনের কাছে কবলে করে যার গান করিস তার কাছে কবুল করা। দোষ পুষে রাখলি তো মরলি। বলে ফেলবি স্বীকার করে ফেলবি দেখবি ভেতর-বার ঝরঝরে পরিষ্কার।

অন্যায় করলে এই কবুল করা বা স্বীকার করার নেশা আমার অস্থি মজ্জায়। কবুল করে ফেলার পর শান্তি স্বস্তি। আর সেটা না পারা পর্যন্ত ভিতরে একটা বাতাসের অকটোপাস যেন টুঁটি চেপে ধরে থাকে। পরে কোথায়

পড়েছিলাম কনফেশন অফ সীন কামস্ গ্রম দি অফার অফ মারসি। আমার কাছে মারসি বলতে শান্তি। ভিতরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। ওই কথাগুলোর মধ্যেও যেন সেই শান্তি আর মুক্তির সন্ধান।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকে আমার যা চরিত্র, কত কনফেস করব, কত কবুল করব? আর সেটা করার মতো বিশ্বস্ত জনই বা সর্বদা পাব কোথায়? আমার মধ্যে দুই বিপরীত সত্ত্বা। একটা স্বাভাবিক বুদ্ধি স্বাভাবিক মায়া-মমতায় জড়ানো। অন্যটা একেবারে উল্টো। অন্ধ নিষ্ঠুর সর্বধ্বংসী—কোনো যুক্তির ধার ধারে না।...একটা পাখির বাচ্চা গাছ থেকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে আমি সেটা হাতে তুলে নিয়েছি। আমার বয়েস তখন এগারো বারো। কি নরম আর কি সুন্দর পাখির বাচ্চাটা, ওটা বুকের ধুকপুকুনি আমার আঙুলের ডগায় তিরতির করে লাগছে। ভিতরটা দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল, শেয়াল কুকুরের মুখ থেকে বাঁচিয়ে কোথায় রাখব এটাকে। হঠাৎ ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল দে আছাড় মেরে শেষ করে। ভিতরের আর এক সত্ত্বা আর্তনাদ করে উঠল, না না না না!

...কিন্তু যা হবার ততক্ষণে হয়ে গেছে। পাখির বাচ্চাটা চৌচির হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সাইকেলে চাপা পড়া একটা কুকুর বাচ্চাকেও শুশ্রূষা করতে করতে হঠাৎ ওইভাবে শেষ করে দিয়েছিলাম। পরে যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে আসতে এসব স্বীকার করার তবু লোক মিলেছে। আমার কান্না দেখে আর কষ্ট দেখে চাটুজ্জে জেঠু হেসেছে। বলেছে এই বয়সে এরকম দুর্মতি অনেকেরই হয় তুই কষ্ট পেলি কবুল করলি—তোর মন পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু ওই বয়েস থেকে আমার মধ্যে আরো যেসব দুর্মতি দানা বেঁধে উঠছে সেসব কবুল করার লোক পাব কোথায়? সেই গোপনতা ফাঁস হলে আমার অস্তিত্বই বা থাকবে কেমন করে? মেয়েছেলে আমার কাছে তখন থেকেই একটা রহস্যের মতো! লোকে জন্মায় কেন, কি করে জন্মায়। কে যে বলে দিত এর উত্তর আছে মেয়েছেলের দেহে। সুযোগ সুবিধে পেলে ছোট ছোট মেয়েগুলোকে ধরে আমি যেন চিরে চিরে বিশ্লেষণ করতে চাইতাম। নিজের বয়সেরটো বোন দুটোও এজন্যে ভয় পেত আমাকে। ছোটদের ছেড়ে স্বাভাবিক-ভাবেই বড় মেয়েদের দিকে চোখ গেছে তারপর। ওদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেখার নিষ্ঠুরতা আমাকে পেয়ে বসছে। অন্ততঃ-স্বত্ত্বা মেয়ে দেখলে পেট ফালাফালা করে দেখতে ইচ্ছে করে কি আছে। কিন্তু এ সবের ফলে নিজের ভিতরের বিপরীত যন্ত্রণাটাও কম নয়। এর থেকে মুক্তি পাব কেমন করে। কার কাছে কবুল করব সব? যখন অসহ্য লাগত ছুটে কর্ণফুলির ধারে চলে যেতাম। একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে নদীর জলের দিকে চেয়ে প্রায় চেঁচিয়েই ভিতরের পাপ উজাড় করে দিতাম—আমি এই-এই করেছি—এই-এই ভেবেছি।

হ্যাঁ তাতেও যেন অনেক শান্তি, অনেক স্বস্তি।

আশ্চর্য সব সত্ত্বেও এই আমি লোকানন্দ ষোল বছর বয়সে স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করলাম। আমার চারপাশের সকলে আমার মধ্যে একটা ভারী ভালো ছেলেকে আবিষ্কার করে ফেলল। আর চাটুজ্জে জেঠুর বিধবা ভগ্নি বাইশ বছরের শুভাদি তো আনন্দের চোটে আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে দু' গালে দুটো চুমোই খেয়ে বসল। শুভাদির গায়ের রং কালো কিন্তু বেশ মিষ্টি মুখখানা। জ্ঞান বয়েস থেকেই শুভাদিকে আর তার মা-কে চাটুজ্জে বাড়িতে দেখছি। ষোল বছর বয়সে শুভাদির বিয়ে হতে দেখেছি। দু' বছর আগে বিধবা হবার পর মামার কাছেই পাকাপাকি আশ্রয় নিয়েছে। শুভাদির মা তার আগেই চোখ বুজেছে। শুভাদির মতো এত টান আর বোধহয় কারো ওপর ছিল না আমার। শুভাদি বলত তুই আমার ভক্ত হনুমান। আবার বকাবকিও করত প্রায়ই, তুই আমার দিকে অমন ভ্যাব ভ্যাব করে চেয়ে থাকিস কেন? কি দেখিস?

আমার তখন ভেতর চাপা। বলতাম তোমাকে দেখতে আমার ভালো লাগে।

শুভাদি বলত বড় হলে তুই একটা অপদার্থ হ্যাংলা হয়ে যাবি।

সেই আমি ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছি শুভাদির আনন্দ হবারই কথা। কিন্তু ও-ভাবে আদর করে কি সর্বনাশ যে করে বসল শুভাদি তার ধারণাই নেই। আমি কর্ণফুলির দিকে দৌড়ে পালালাম।

দু'বছর বাদে আই এস-সি পরীক্ষা দিলাম। প্রথম দুই একজনের মধ্যে হব জানা কথা। কিন্তু এ দু-বছরে আমার ভিতরের পুরুষ ছেলেটাকে চেনা-জানা অনেক মেয়েই চিনতে শুরু করেছে। একটা অমোঘ আকর্ষণ আমাকে তাদের কাছে টেনে নিয়ে যেত। তারা হাসাহাসি করত। নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটিপি করত। আমাদের বাড়ির বা চাটুজ্জে জেঠুর বাড়ির অল্প বয়সী পরিচারিকারাও আমার চোখের ভাষার আঁচ পেত। মুচকি হেসে প্রশ্রয়ও দিত কেউ কেউ। বিপরীত সত্ত্বার চাবুক খেয়ে ছুটে যেতাম কর্ণফুলিতে। নিজের ওপর আক্রোশে বালিতে মুখ ঘষে ছাল তুলে ফেলতে চাইতাম।

ঠিক-ঠিক বুঝত না কেবল শুভাদি। তার কাছেই আমার সব থেকে বেশি গোপনতা বলেই সব থেকে বেশি সহজতর অভিনয়। বই আর জ্যাম-জ্যামরুল নিয়ে তাকে আদিখ্যেতার ঘর খুঁজতাম। দু-বছরের বড় শুভাদির রাগ দেখাতে গিয়ে হাসত।—তুই একটা পাগল। মেয়েছেলের গায়ে এ-ভাবে হাত দেয়।

সাত চল্লিশের গোড়ার দিক সেটা। দেশ জুড়ে মারামারি কাটাকাটির হিড়িক পড়ে গেছে। পূব বাংলায়, পশ্চিম বাংলায়, বাইরেও অনেক জায়গায়। সেই মারামারি কাটাকাটি দেখে আমার গায় জ্বর আসত, আর কে যেন বলত, সব ধ্বংস হয়ে যাক, তুই চেয়ে-চেয়ে দেখ। চাটুজ্জে জেঠুও হিন্দুরা পালাচ্ছে। শুভাদিরা সুযোগ পেলেই কলকাতা চলে যাবে। আই এসসি পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছি। কারণ আর চাটুজ্জে জেঠু ঠিক করে ফেলেছে আমি বম্বে যাব ডাক্তারি পড়তে। বম্বেয় এক শালা সেখানকার মেডিক্যাল কলেজের নামকরা প্রোফেসার। চিঠি লেখালিখি করে তার সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা হয়েছে। আমার ডাক্তারি পড়ার সমস্ত খরচাও থোক তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি গেলে আমার নামে সে-টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। আগামী পরশু আমার রওনা হবার ব্যবস্থা পাকা।

দুপুরে শুভাদির ঘরে শুভাদির সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। আমি কিছুই করছিলাম না, আমি কেবল শুভাদিকে দেখছিলাম। আমার হৃৎপিণ্ডে শাসনের চাবুক পড়ছিল আবার যন্ত্রণার মতো একটা লোভের দাপাদাপি চলছিল। শুভাদি একটানা মুখ করে যাচ্ছিল, আর কোনদিন দেখা হবে কিনা এই দুর্যোগে কে কোথায় ভেসে যাবে কে জানে।

সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি চারবার চান করা অভ্যাস শুভাদির। নইলে মাথা গরম হয়। এক সময় বলল, তুই বোস আমি চান করে আসি, মাথা কিমঝিম করছে।

চলে গেল। মাথার মধ্যে হঠাৎ কি রকম হয়ে গেল আমার। উথাল-পাথাল কাণ্ড যেন। উঠে পড়লাম। ভিতরের বারান্দার কোণে বাথরুম। দরজা বন্ধ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। দরজায় কান পাতলাম। ঝর-ঝর জলের শব্দ। রেলিংএর ফাঁক দিয়ে বাথরুমের পিছনের দিকটা দেখলাম। কাঁচের শার্সির খানিকটা ভাঙা। এদিকটা বাগান আর গাছগাছড়া বোঝাই বলেই ওটা সারাবার তাগিদ বোধ করেনি কেউ।

নিজের ওপর আর কোনো দখল নেই। নির্জন দুপুরে শয়তান ভর করেছে মাথায়। রেলিং টপকালাম। আলসে ধরে ধরে শার্সির দিকে এগোলাম। পড়লে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর পরোয়া তখন কে করে?

পৌঁছেছি। তারপর স্থান-কাল ভুলে গেছি।

ধরা পড়ে গেলাম। দাদির দিকে চোখ পড়তে বিধবা ঝাঁটকে উঠে নেজদি ভিজা গামছায় বুক চাপা দিল।

আমি কাঁপতে কাঁপতে রেলিং ধরে ঘরে চলে এলাম। কিন্তু কি যে হল তারপর। পালাতে পারলাম না। উড়তে চড়তে পারলাম না। কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুভাদি এলো। পরনে শুকনো শাড়ি ব্লাউস, ভেজা চুল ভেজা মুখ। সোজা কাছে এসে ঠাস ঠাস করে দু-গালে দুই চড় ধরিয়ে দিল। —কেন? কেন? আমি কত বড় না তোর থেকে! ভিতরে ভিতরে তুই এই!

সব শেষ হয়ে গেছে বুঝেও কেউ বাঁচার আশা করে না। করে না বলেই বলতে পারলাম। বলে উঠলাম, আমি এর থেকেও ঢের খারাপ—তোমাকে একেবারে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে আমার—অনেক দিন থেকে করে। আমি বইএ পড়েছি, মায়ের হাত না পড়লে, মায়ের ছোঁয়া না পেলে মায়ের বুকের দুধ না খেলে অনেক ছেলের এ-রকম রোগ হয়। ধরা পড়েছি ভালো হয়েছে, এ রোগ নিয়ে আমার আর বাঁচার দরকার নেই—আমি আর বাঁচতে চাই না চাই না—তোমার ঘেন্নার ফল তুমি কালকের মধ্যে দেখতে পাবে।

চলে যাবার জন্য ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়েছি। শুভাদি শক্ত হাতে আমার হাত ধরে ফেলল। টেনে বসিয়ে দিল আবার। বিমূঢ় চাউনিটা বদলাতে লাগল। নতুন করে দেখছে যেন আমাকে। দেখছেই। দেখছেই। তার কালো মুখ লাল হয়ে উঠছে। ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। সেই নিঃশ্বাস আমার চোখে মুখে লাগছে।

হাত ছেড়ে দিল। —বোস। আসছি।

দ্রুত চলে গেল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই ঘুরে এলো আবার। মুখ আরো লাল। একটুও শব্দ না করে দরজা বন্ধ করল। খিল এঁটে দিল।

.....আধ ঘণ্টা বাদে সেই দরজা আমি খুলেছি। বজ্রাহতের মতো বেরিয়ে এসেছি। সোজা কর্ণফুলির ধারে। আশ্চর্য, দুপুরের ওই আকাশ এখনো আমার মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে না। নদীতে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতরে অনেক দূরে চলে গেলাম। কিন্তু অত জলের গভীরেও আঠারো বছরের একটা ছেলের জায়গা হল না। কর্ণফুলি আমাকে যেন ঠেলে ঠেলে তীরে নিয়ে এলো।

.....বম্বেতে পাঁচ বছরের মেডিকেল কোর্স পাঁচ বছরেই শেষ হয়েছে। প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হইনি কখনো। ভিতরের চরিত্র বদলায়নি। কিন্তু সে-চরিত্র নিজেই অনেকটা বিশ্লেষণ করতে পারি। ভিতরের ওই অন্ধ আবেগটার নাম ইড। আমি তার শিকার। সে অন্ধ আত্মধ্বংসী, সর্বধ্বংসী। কম-বেশি সকলেরই থাকে সেটা। ইগোর নিচে চাপা পড়ে থাকে। ইডকে আমি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিই না। তার ওপর দিয়ে ইগোকে সবল-প্রবল করে তোলার চেষ্টায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাই।

ছুরি হাতে নিলে সব শেষ করে দেবার উল্লাসে মেতে উঠতে চায় ভিতরের কেউ। সেটা জানা আছে বলেই ভিতরের আর একজন ঢের বেশি সাবধান ঢের বেশি সংযত। এই সাবধানতা আর সংযম উল্টে আর পাঁচজনের চোখে প্রতিভা আর বিচক্ষণতার লক্ষণ।

বম্বেতে যে মানুষটিকে আমি সব থেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম তিনি আমাদের মেডিসিনের প্রোফেসার ডকটর দিবাকর চ্যাটার্জি। বাঙ্গালী হলেও বরাবর এদিকের মানুষ। কথা-বার্তায়ও অবাঙ্গালীর টান এসে গেছে। তিন বছরের মতো খুব কাছে পেয়েছিলাম তাঁকে। ছাত্র হিসেবে আমাকে একটি রত্ন ভাবতেন তিনি। বাড়ি গেলে আদর করে খাওয়াতেন। নামজাদা ডাক্তার ভালো পসার। আমার চতুর্থ বছরের শুরুতে প্রিন্সিপালের সঙ্গে কি নিয়ে খটাখটি লাগল তাঁর জানি না। চাকরি ছেড়ে সপরিবারে গোয়া চলে গেলেন। সেখানে বড় একটা নার্সিং হোম ফেঁদে বসার ইচ্ছে। বড় ডাক্তার যখন, সেখানে জম-জমাট পসার হতেও সময় লাগবে না। বড় বড় মক্কেলের তাগিদে আগেও তিনি বহুবার বম্বে থেকে গোয়ায় পাড়ি দিয়েছেন। আর পকেট বোঝাই করে টাকা এনেছেন।

বম্বেতে থাকাকালীন আমি ঘন-ঘন ডকটর চ্যাটার্জির বাড়ি যেতাম থার্ড ইয়ারের শেষের মাথায় পৌঁছে। একটা বই আনার ব্যাপারে হঠাৎ গেছলাম একদিন। তারপর মাঝে মাঝে যাওয়া শুরু করলাম। তারপর প্রায়ই।

আমার সেই জ্ঞানার্জনের আড়ালে লক্ষ্য একটি মেয়ে। ডকটর চ্যাটার্জির একমাত্র মেয়ে সুমিত্রা চ্যাটার্জি। আমার বয়েস তখন একুশ সুমিত্রার সতের। ফ্রক পরে, সালোয়ার কামিজ পরে মেয়ে-পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হৈ করে বেড়ায়। টেনিস খেলে। সাঁতার কাটে। ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসে। চোখের কোণ দিয়ে আমাকে দেখে আর তুচ্ছ করে। ওর বাবার ভালো ছাত্র বলে পরিচয় দেওয়াটাই যেন অবজ্ঞার কারণ। আমার দুই সত্তার একটা ভদ্র-তার মুখোশ এঁটে বসে থাকে, অন্যটা সমস্ত নখদন্ত মেলে ওকে গ্রাস করতে চায়। দ্বিতীয় অভিলাষটা দিনে দিনে বাড়তে থাকল।

মেয়েটা বেশ লম্বা, সুশ্রী। মাথার চুল কাঁধের নীচে নামতে দেয় না। তার চোখের তারায় আমন্ত্রণ। চোখের ভাষার প্রত্যাখ্যান। আমি প্রত্যাঘাতের দলে। আমার ঘন-ঘন যাতায়াতের কারণটা তার খুব অগোচর নয়, সোজা মুখের দিকে চেয়ে সতের বছরের সুমিত্রা চ্যাটার্জি তাও বুঝিয়ে দেয়। আর আচরণে বুঝিয়ে দেয় ভালো ছাত্র-দের সে এমন কিছু ভালো চোখে দেখে না।

ডকটর চ্যাটার্জি গোয়ায় চলে যেতে আমারই মেজাজটা সব থেকে খারাপ হয়ে গেল কেন সেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম আমি। তখনো এক অন্ধ আক্রোশে ওই মেয়ের দেহ আমি ফালা ফালা করে ফেলতে চেয়েছি। সুমিত্রার অবজ্ঞা ভরা দুই চোখে তখনো মজা উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। তার যেন জানতে বুঝতে কিছু বাকি নেই।

ফাইন্যাল ইয়ারে উঠে গোয়ায় গেছি গুরু দর্শনে। ডকটর চ্যাটার্জি সত্যি-কারের খুশি আমাকে দেখে। নিজের বাড়িতেই ছাত্রকে ধরে রাখলেন ক-টা দিন। মিসেস চ্যাটার্জি আনুষ্ঠানিক আদর যত্ন করলেন। মিস চ্যাটার্জি প্রথমে না চিনতেই চেষ্টা করল। চেনার পর আরো বেশি তুচ্ছ করল। পর্তুগীজ আমলের ফিট-পোর্ট গোয়া ঢালা ফুর্তির জায়গা। বাতাসে অঢেল ফুর্তির রসদ সেখানে। তার সময় কোথায় বাড়ির অতিথির কাছে দু-দণ্ড এসে বসার বা কথা বলার। বাবার অর্থাৎ ডকটর চ্যাটার্জির মেজাজ-পত্র উগ্র একটু। শুধু তার সামনেই মেয়ে নরম যা একটু, দুনিয়ায় আর কাউকে কেয়ারই করে না।

শুরু থেকেই পসার জাঁকিয়ে বসেছেন ডকটর চ্যাটার্জি। নার্সিং হোমও স্টার্ট হয়ে গেছে। আসার সময় মেয়ের সামনেই বলে দিলেন, ভালো পাশ করে এখানেই চলে এসো। ভালো প্র্যাক-টিসের ব্যবস্থা আমিই করে দিতে পারব। নার্সিং হোম থেকেও অনেক সুবিধে পাবে।

আমি ভালো ছেলের মতো মাথা নাড়লাম। আমার ধারণা সুমিত্রা মনে মনে আমাকে মুখ ভেংচালো। আমিও যে ভালো ছুরি চালাতে শিখেছি ও সেটা তখনো জানে না।

পরের বছর পাশ করলাম। সেই প্রথমই হলাম। ডকটর চ্যাটার্জিকে চিঠি লিখে জানাতে তিনি গরম আশী-র্বাদ পাঠালেন। ছ-মাসের ট্রেনিং ডিউটির পর রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে সোজা এখানে চলে এসো।

ইতিমধ্যে বম্বেতে আর একটা মেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আবার। নাম সুনন্দা কারলেকার। মস্ত বড়লোকের মেয়ে। বাপের কাপড়ের মিল। সখের ডাক্তার হওয়া তার। আগাগোড়া ফার্স্ট

হওয়া ছাত্রের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে অনেক দিন ধরেই একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। পড়া বোঝার তাগিদে প্রায়ই বাড়িতে ধরে নিয়ে যেত। আর আমার প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হত। আশ্চর্য সুমিত্রাকে দেখলে যেমন একটা পশু ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইত, এর বেলায় তেমন হত না। ভালো লাগত। আমার ভিতরের দুই সত্তার একজন সুনন্দা কারলেকারকে আঁকড়ে ধরতে চায়, আর একজন সুমিত্রাকে গ্রাস করতে চায়। আমার বয়েস তখন চব্বিশ চলছে। সুনন্দার বাইশ হবে। এক সন্ধ্যায় এক সঙ্গে দুজনে পড়ার বইয়ের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে আমি আচমকা এক কাণ্ড করে বসলাম। ওর মুখটা ঘুরিয়ে ধরে সোজা একটা চুমু খেয়ে বসলাম।

এই অসম সাহস দেখে সুনন্দার দুই চক্ষু কপালে। রাগের চোটে আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকালো, গালাগাল করল। কিন্তু আমি দু'দিন ডুব মারতে আবার নিজেই এলো আমার কাছে। তখনো ভয়ে কাছে ঘেঁসত না, পড়ার সময় দু'হাত ফারাকে বসত। তবু ভিতরে ভিতরে কাছাকাছিই আসছিলাম আমরা। ওর সান্নিধ্যে আমার ভিতরের স্নিগ্ধ দিকটাই পুষ্ট হয়ে উঠছিল। সুমিত্রা চ্যাটার্জি বেঁচেই গেল বোধ হয়। আমি বিলেত যাওয়ার কথা বললে সুনন্দা চোখ পাকাতো। —খবরদার। একসঙ্গে যাব দুজনে।

কিন্তু তা হবার নয় বলেই যা হবার হঠাৎই হয়ে গেল। এক একটা মেয়ে দেখলে আমার ভিতরটা চনমন করে উঠত সেটা ও লক্ষ্য করে থাকবে। সমুদ্রের ধারে মুখোমুখি বসে গল্প করছিলাম দুজনে। কম করে তিন হাত তফাতে বসেছে ও। বলেছে, তুমি যে রকম শয়তান, বিশ্বাস নেই। সেদিন ও বলল, ক'টা মেয়ের মাথা খেয়েছ আজ পর্যন্ত সত্যি করে বলো তো?

এই পলকা কথাবার্তার ফাঁক দিয়েই কি যে হয়ে গেল আমরা জানি না। একটা যন্ত্রণা বুকের তলায় পুষতে পুষতে সেটা পুরনো হয়ে গেছে বটে, কিন্তু একটুও মিলিয়ে যায়নি। বুকের তলায় হঠাৎ হঠাৎ শব্দশূন্য কান্না যেন গুমরে গুমরে ওঠে।

বললাম ওকে। যার নাম কনফেশন। নিজের মুক্তির তাগিদে বললাম শুভাদির সমস্ত কথা। এক বর্ণও গোপন করলাম না।

শোনার পর সুনন্দার মুখ থমথমে। উঠে দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে বলল, আঠোর বছর বয়েস থেকে এ-রকম লম্পট তুমি!

হনহন করে চলে গেল। কিন্তু অনেক কাল বাদে আমি যেন একটা বড় মুক্তির স্বাদ পেলাম। পরদিন সুনন্দার বাড়ি গেলাম। কবুল করা হয়ে গেলে মনের জোর বাড়েই। আমার সেই জোর।

দরোয়ান ফটক আগলালো। ভিতরে ঢোকা চলবে না। বললাম, মিসি বাবাকে ডাকো তাহলে। দরোয়ান জবাব দিল মিসি বাবা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে বলেছে।

স্নেহ বা ক্ষমা পেলে উল্টো হত। মনে মনে সেদিন সুনন্দা কারলেকারকেও অন্ধ রোষে বিদীর্ণ করতে করতে চলে এলাম।

ছ' মাসের মাথায় রেজিস্ট্রেশন হতে আমার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে বিদেশে যাবার স্কলারশিপও পেয়ে গেলাম। এফ আর সি এস করতে যাব। রওনা হবার আগে গোয়ায় এলাম গুরু দর্শনে। কেন যে এলাম সে শুধু আমিই জানি।

ডক্টর চ্যাটার্জি ভারী খুশি। বার বার বললেন আমি একটা ছেলে বটে। শাসিয়ে বললেন, এফ আর সি এস করে এই গোয়াতেই ফিরে আসা চাই—গোয়া ইজ ইওর প্লেস। তার নার্সিং হোম আর পসার দুই তখন আরো জমজমাট।

আমার তখন চব্বিশ, অতএব সুমিত্রার কুড়ি। দেখতে এখন আরো ভালো হয়েছে, সর্বাঙ্গ যেন আরো তীক্ষ্ণ আরো ইঙ্গিত-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তার কাছ থেকে এতটুকু সাড়া পেলে আমি সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতাম হয়তো। বাইরে যাওয়া হত না। কিন্তু তার চারদিকে তখন অনেক স্তাবক। সে আমাকে পাত্তা দেবে কেন? বিশেষ করে সেই সতের বছর থেকে যখন জানে আমার গুরুভক্তির পিছনে আসল টানটা কোথায়।

চোখকান বুজে এবার ডক্টর চ্যাটার্জীর কাছে মনের বাসনা ব্যক্ত করে ফেললাম। রাগী মানুষ আরো রেগে উঠবেন হয়তো, কিন্তু এসপার ওসপার একটা না করে ফেললেই নয়।

রাগের বদলে অবাক হয়ে মুখের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন তিনি। তার পর বললেন, আই থিংক সী হ্যাজন্ট গট দ্যাট মাচ লাক। ওর মা বলছিল, একটা ছেলেকে ও পছন্দ করছে—দ্যাট ডিস্কাস্টিং বয়। আই নেভার ইনটারফিয়ার। আই লাইক ইউ—হলে আমি খুশি হব। বাট ইটস অল ইওর লাক। ইংল্যাণ্ডে কতদিন থাকবে?

—বছরখানেকের মধ্যে হয়ে যাবে আশা করছি।

—এক বছর আর ক'টা দিন। মন দিয়ে কাজ শেষ করে এসো। তারপর যদি সুযোগ থাকে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব।

সেই সর্বগ্রাসী অন্ধ আক্রোশ নিয়ে ফিরে এলাম। মনে মনে ওই অদেখা ডিস্কাস্টিং বয়ের বুকে ছুরি বসাতে থাকলাম। সুমিত্রার অ্যালবাম থেকে এবারে তার একটা ফোটো সরাতে পেরেছিলাম। সেটা বার করে বাসনার জ্বলন্ত আগুনে তাকে আহুতি দিতে লাগলাম।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরতে এক বছরের জায়গায় দেড় বছর গড়িয়ে গেল। সেখানকার বড় হাসপাতালে ছ'মাস হাতপাকিয়ে তারপর ফিরলাম।

আমার কৃতিত্ব দেখে ডক্টর চ্যাটার্জী জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। রাগটা মানুষটার এত আনন্দ তাঁর স্ত্রী বা মেয়ে কমই দেখেছে।

কিন্তু আমি অবাক। এই এক বছরে ডক্টর চ্যাটার্জী'র মাথার সব চুল পেকে সাদা।

তিনি বললেন, পরে জানবে সব। বিরাট দুর্যোগ গেল মাথার ওপর দিয়ে। এখানকার মানুষদের ভালবাসা আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।

দুর্যোগই বটে। এমন হতে পারে কখনো কল্পনা করিনি। এই প্রৌঢ় বয়সে ডক্টর দিবাকর চ্যাটার্জী প্রায় একটা বছর জেলে আটকে ছিলেন। আমি বিলেত চলে যাবার মাস তিনেক বাদে পর্তুগীজ পুলিশ দপ্তর হঠাৎ এই মানুষটির সম্পর্কে তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত ক' বছর ধরে ভারতের দিক থেকে গোয়া লিবারেশন মুভমেণ্ট-এর যে হাওয়া উঠেছে, তিনি নাকি তার পৃষ্ঠপোষকদের একজন। তলায় তলায় বহু টাকা দিচ্ছেন, নার্সিং হোমের নিরাপদ আওতায় রেখে 'অবাঞ্ছিত' লোকদের আশ্রয় দিচ্ছেন। পর্তুগীজ পুলিস এ-সবের অকাট্য প্রমাণ নাকি কিছু কিছু পেয়েছে।

ফ্রি-পোর্ট পর্তুগীজ গোয়া একদিকে স্মাগলারদের স্বর্গরাজ্য, অন্য দিকে অঢেল ফূর্তির সাগর দ্বীপ। ফলে এখানকার হোমরা-চোমরাদের একটা বড় অংশ মুক্তি-ফুর্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। আর পর্তুগীজ শাসন বা কুশাসন তো এখানে অনড় হয়েই থাকতে চায়। তবু তলায় তলায় মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ জোরদার হয়ে উঠেছিল ঠিকই।

আর নিঃশব্দে টাকা-কড়ি এবং আশ্রয় দিয়ে আন্দোলনের মানুষদের ডক্টর চ্যাটার্জী যে সাহায্য করছিলেন তাও ঠিক। এই গোপন ব্যাপারটা মিসেস চ্যাটার্জী বা সুমিত্রা চ্যাটার্জীরও জানা ছিল না। সেই কারণেই ডক্টর চ্যাটার্জীর বিস্ময় কম নয়। পর্তুগীজ পুলিসের কানে এ খবর তুলে দিয়ে এমন বিশ্বাসঘাতকতা কে করতে পারে তিনি ভেবে পেলেন না। যাইহোক, তাঁর মতো এতবড় ডাক্তার গোয়া বা দামন দিউতে নেই। আর হাতে-নাতে ধরার মতো এমন কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণও পর্তুগীজ সরকারের হাতে ছিল না। টাকার জোরে আর এখানকার জনসাধারণের দাবির চাপে মাস চারেক আগে ছাড়া পেয়েছেন।

এত দিন নার্সিং হোম চালিয়েছে তাঁর অধীনের অন্য ডাক্তাররা। আর অ্যাড-

মিনিস্ট্রেশন দেখেছে নাকি মিসেস চ্যাটার্জী আর তার মেয়ে সুমিত্রা চ্যাটার্জী।

ডকটর চ্যাটার্জীর এত বড় অঘটনের খবর শুনে আমি কি একটুও দুঃখিত হয়েছিলাম? না। কারণ গোয়াতে যেদিন পা দিলাম সেদিনই ডকটর চ্যাটার্জী আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মেয়ে অলমোস্ট এনগেজড—প্রভাকর ডি'কস্টার সঙ্গে বিয়ে হয়তো এতদিনে হয়েই যেত—হঠাৎ একটা বছর এই পুলিশের গন্ডগোলের মধ্যে পড়ে যেতে আটকে গেছে।

বিয়ে আটকানোর জন্য পর্তুগীজ পুলিসকে আমি মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম কিনা জানি না। সুমিত্রার বয়েস এখন বাইশ। শরীরটা এখন আগের মতো অত ধারালো বা ছিপছিপে নয়। খুব সামান্য মোটার দিকে ঘেঁষেছে। সব মিলিয়ে আমার চোখে ও এখন আরো সুন্দর আরো পেলব। তাকে দেখামাত্র আমার সেই অন্ধ অবুঝ সত্তা সর্বাঙ্গে ছোবল মারার জন্য সাপের মতো হিসহিস করে উঠেছে। কে প্রভাকর ডি'কস্টা আমি জানি না। এখনো তাকে চোখে দেখিনি। কিন্তু পাকে-চক্রে বিয়েটা যখন আটকে গেছে আর ও বিয়ে হবে না। হতে পারে না। কেন হবে না, কেমন করে হবে না সেটা পরের মাথা ঘামানোর ব্যাপার। কিন্তু হবে না, হতে পারে না।

আমি আসার এক-ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বিশ্রাম করতে বলে ডকটর চ্যাটার্জী নার্সিং হোমে গেছেন। তাঁর শরীর এখনো সুস্থ নয় খুব, তাই মিসেস চ্যাটার্জী একলা ছাড়েন না তাঁকে। আমার প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করে তিনিও সঙ্গে গেছেন।

চাকর-বাকর আয়া ছাড়া বাংলোয় এখন আমি আর সুমিত্রা। তার ঘর জানি। কিন্তু না-জানার মতো করে হঠাৎই তার ঘরে ঢুকলাম। ও-দিক ফিরে সুমিত্রা টেলিফোনের নম্বর ডায়েল করছিল। আয়নায় আমাকে দেখে মাঝ-পথেই আঙ্গুল থেমে গেল। রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল।

—ও...আই অ্যাম সরি।

বললাম বটে কিন্তু চলে এলাম না। চোখে চোখ রেখে কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে নিজের ভিতরটা দেখিয়ে দিতে চাইলাম তাকে। ও কতটুকু দেখল জানি না। সহজ অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ?

এতদিনের মধ্যে কেউ আমরা আপনি-তুমির মধ্যে যাই নি। বাক্যালাপ তো ছিলই না বলতে গেলে। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি ঝুলিয়ে মুখের দিকে চেয়ে একটু মজা দেখল যেন সুমিত্রা। বলল, ভালো। বিলেত ঘুরে এসে তুমি একটু মানুষ হয়ে গেছ দেখছি...।

হেসে মাথা ঝাঁকালাম। —এর মধ্যে তুমি আর কতটুকু দেখলে। আসার সময় সেখানকার কত মেয়ে কেঁদে-কেটে সারা। —তবু বেপরোয়া উক্তি শুনে সুমিত্রা আরো মজা পেল যেন। হেসে ফেলল। —এখানে কারো সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধা নেই, এলে কেন?

—এলাম তোমার বাবা মানে আমার গুরুদেবকে কথা দিয়েছিলাম, তাই।

সুমিত্রার চোখে সংশয়ের একটু ছায়া নামল যেন। শুধু ওই রাশ-ভারী বাবাটিকে ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকে পরোয়া করে না সে। তা ছাড়া লিব-মুভমেন্টএ নাম জড়ানো আর চুপচাপ একটা বছর জেলে কাটিয়ে আসার ফলে এই বাবাটিকে এখন আরো একটু ভয়ের চোখে দেখে সে। শংকার ছায়া দূর হতেও সময় লাগল না অবশ্য। বাবার কাছে গোপন কিছু নেই, আর কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বাবা এই লোককে প্রশ্রয় দিতে পারে না। হেসেই বলল, তোমার গুরুভক্তি সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো।

ডকটর চ্যাটার্জী তাঁর বাংলোর কাছেই আমার জন্যে বাড়ি ঠিক করলেন একটা। নিজে তদারক করে নিচের তলায় চেম্বার করে দিলেন। আর মোটা মাইনেয় নার্সিং হোমে হেড সার্জন করে বসালেন আমাকে। মাইনে ছাড়াও অপারেশন পিছু বাড়তি প্রাপ্য। এ-ব্যাপারে কার্পণ্যের হেতু নেই, কারণ সার্জন হিসেবে আমার নামও এখন ঘোষণার যোগ্য।

দিন-কয়েকের মধ্যেই প্রভাকর ডি'কস্টার সমস্ত বিবরণ আমার জানা হয়ে গেল। তার আগে প্রোফেসারের বাংলোতে সুমিত্রার সঙ্গে একাধিক দিন দেখেছি তাকে। ঝকঝকে মস্ত বিদেশী গাড়ি হাঁকিয়ে সুমিত্রাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেও দেখেছি। সেই ফাঁকেই আমার দিকে চেয়ে সুমিত্রা মুখ টিপে হেসেছে। যেন বলতে চায়, গুরুভক্তি সিকেয় তুলে বিলেতে যারা কাড়াকাড়ি করছে তাদের কাছেই ফিরে যাও—এখানে কোনো আশা নেই।

প্রভাকরের সঙ্গে ডকটর চ্যাটার্জীই প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। আমারই বয়সী, আমার থেকেও সুপুরুষ সন্দেহ নেই। শিক্ষিত, মার্জিত। তার বাবা জন ডি'কস্টা এখানকারই মানুষ। মা মহারাষ্ট্রের মেয়ে। প্রভাকর মহারাষ্ট্রীয় নাম, তার সঙ্গে ডি'কস্টা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জন ডি'কস্টা নাম-করা একসপোর্ট-ইমপোর্ট মার্চেন্ট। অঢেল পয়সা। তিন মাস হল হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে ভদ্রলোক। তার তিন ছেলে এখন ব্যবসার মালিক। তারা ব্যবসা দেখছে। কিন্তু আসলে দেখছে বড় দুই ছেলে। প্রভাকর ডি'কস্টা স্পেশাল ওয়ার্ক আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মস্ত পান্ডা। দু হাতে টাকা ওড়ায় আর হৈ-চৈ করে বেড়ায়, তাই বহুজনের প্রিয়।

হুট করে বাবা মারা না গেলে হয়তো এই ক'মাসের মধ্যেই সুমিত্রার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেত।

আমার শিরায় শিরায় রক্ত ফুটেছে আবার। ও-বিয়ে হবার নয় বলেই ডকটর চ্যাটার্জীকে জেলে যেতে হয়েছে। ও-বিয়ে হবার নয় বলেই জন ডি'কস্টা স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে।

প্রভাকর ডিকস্টাকেও সরে যেতে হবে। হবেই। কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব হবে ভেবে পাই না বলেই মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে সর্বদা। দুবেলাই ডকটর চ্যাটার্জীর বাংলোয় আসি আমি। ফাঁক পেলে অসময়েও আসি। সুমিত্রার কাছে প্রভাকরের পঞ্চমুখে প্রশংসা করি। প্রশংসা ডকটর চ্যাটার্জীর কাছেও করি। আমার উদারতা দেখে তিনি খুশি হন।

কিন্তু সুমিত্রা বিশ্বাস করে না। আমার যখন-তখন ওদের বাংলোয় আসাটা সে সরল চোখে দেখে না। আমার ভিতরের অভিলাষ ও বুঝতে পারে। আমার এই দুটো চোখের হিংস্র তন্ময়তাও একাধিক দিন ওর চোখে ধরা পড়েছে। রাগে মুখ লাল হতে দেখেছি তখন। সেদিন চুপচাপ ওকে বাগানে বসে থাকতে দেখে নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বেশ কাছে। দু-হাতের থাবা নিশপিশ করছিল। ও টের পেয়ে চমকে উঠেছিল। তারপর ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল। —কি ব্যাপার? এখানে?

আমি হেসে হেসে রসিয়ে বলেছিলাম, তোমার বাবা ঘুমুচ্ছেন দেখলাম। ফিরে আসতে গিয়ে দেখি এই নিজ্জন্নে তুমি এখানে। মনে হল, দশটা একলা পুরুষ ছাড়া পূর্ণ হয় না। প্রভাকরকে হাতের কাছে পেলে তাকেই ঠেলে পাঠাতাম।

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে ও বলে উঠল, বাবার কাছে খুব ভালো ছেলে সেজে আছ তাই থাকোগে যাও—আমার সঙ্গে বেশি রসিকতা করতে এসো না!

ওদের এই বিশাল বাংলোর যত্নতত্ত্ব আনাগোনা আমার। কখন কে এলো গেল সব সময় তার হদিসও মেলে না. দুদিন বাদে ওর বাবার কাছে বসে-ছিলাম। লক্ষ্য করলাম, একটু দূরে থেকে সুমিত্রা খর দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। দেখছে না, দু-চোখ আমার মুখটা যেন ফালাফালা করছে। তার কারণ অনুমান করতে পারি। ওর ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপর মাঝে মাঝে যে দুটো মোটা শৌখিন ফোটো অ্যালবাম পড়ে থাকে তার একটার থেকে তিনখানা ছবি খোয়া গেছে। সেই তিনখানা ছবিতেই রঙ্গনায় তনু মাধুর্য অনাবৃত অনেকখানি। সুমিত্রার এ-রকম ছবি কোনো স্টুডিওও তোলা হতে পারে না। হয়তো প্রভাকর তুলেছে। সেই ফোটো তিনটে খোয়া গেছে দেখে ও হয়তো প্রভাকরকেই ভেবে

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

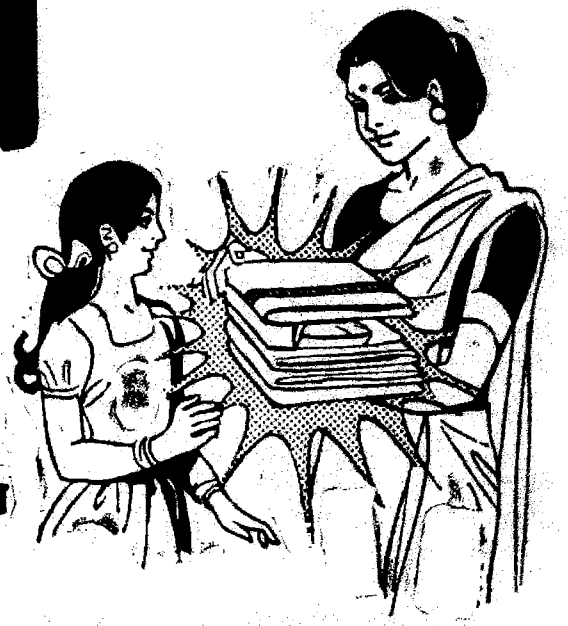

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মুলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi hpma 6A/73 BEN

ধরেছিল প্রথম। সে অস্বীকার করার জন্যেই হয়তো এই শ্যেন-পর্যবেক্ষণ।

ঈশ্বরের থেকে শয়তান সহজে সোসর হয়। আমি শয়তানকে ডেকেছি। ডাকছি। ডক্টর চ্যাটার্জির কল্যাণে সাজন হিসেবে এই দু-মাসের মধ্যে আমারও নাম-ডাক কম নয়। সার্জন লোকানন্দ বড়ুয়ার হাতে ছুরি নাকি ছবির মতো চলে। কঠিন অপারেশনের ওপর মরণ বাঁচন নির্ভর এমন একজন রোগী এলো নার্সিং হোমে। লোকটি প্রায় বৃদ্ধ। পর্তুগীজ পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তাদের একজন। প্রাণের দায় বড় দায়। ভর্তি হয়েই বাজে লোকের বাজে কথায় পড়ে ডক্টর চ্যাটার্জিকে জেলে আটকে রেখে এক বছর ধরে হয়রান করা হয়েছিল বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল। আর তাই শোনামাত্র শয়তান পথ দেখিয়ে দিল আমাকে।

গুজব শুনেছিলাম, এখানকার জনা-কতক বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোকই চুপিসারে ডক্টর চ্যাটার্জির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। গোয়া স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের স্বার্থের হানি। অপারেশন করব আমি। তাই আমার প্রতি এই পদস্থ অফিসারটির আরো বেশি আনুগত্য। শয়তানের ইশারা পেয়ে তার সঙ্গে ভাব জমালাম আমি। তারপর ডক্টর চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে প্ররোচনা-চক্রে কারা ছিল তাদের নাম জানতে চাইলাম। আসলে আমি একটা নামই শুনতে চাই। না পেলেও ওই নাম আমি নিশ্চয় জুড়ে দিতাম। কিন্তু শয়তান সহায়, না পাব কেন? জীবন-মরণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে জেনে অফিসারটি যে ক'টি শাসালো নাম ব্যক্ত করল, তাদের একজন এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট মার্চেন্ট জন ডি'কস্টা।

প্রভাকর ডি'কস্টার বাবা জন ডি'কস্টা।

ডক্টর চ্যাটার্জির অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল জন ডি'কস্টা।

প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড-এর বাড়বাড়ি অবস্থার রোগী ওই অফিসার। বাঁচার থেকে মরার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু আমি তাকে বাঁচার অবধারিত আশ্বাস দিয়েছি। আর বলেছি সুস্থ হবার পর আমার একটা আরজি তাকে রাখতে হবে —ডক্টর চ্যাটার্জি আমার গুরু-ভাই মণ্ডলের জন্যেই এই অনুরোধ।

শয়তান সহায়। আমি জানি এ রোগী বাঁচবেই।

জীবনে এত যত্ন করে আর কটা অপারেশন করেছি আমি জানি না। বাঁচল। ক্রমে সুস্থ হল। তার কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নেই। সেই কৃতজ্ঞতার হাতে যাবার আগে ডক্টর চ্যাটার্জিকে জানিয়ে দিয়ে গেল, ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তা করার গোপন অভিযোগে যারা তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিল, বিগত এক্স-পোর্ট ইমপোর্ট মারচেন্ট জন ডি'কস্টা তাদের বিশেষ একজন। আর তার যে ছোট ছেলেটার সঙ্গে চ্যাটার্জি সাহেবের মেয়ের ঘনিষ্ঠতা—সেই প্রভাকর ডি'কস্টার সম্পর্কেও পুলিশের খবর ভালো নয়।

শেষেরটুকু আমার কথায় বিশ্বাস করে বলেছে।

প্রথমটুকু শুনেই ডক্টর চ্যাটার্জির কানের পর্দায় যেন বোমা ফেটেছে। ছিটকে বাড়ি চলে এসেছেন তিনি। তার-পর ক'টা দিন সত্যিকারের এক পুরুষের দুর্জয় রাগ আর ক্ষোভ দেখেছি আমি। মুখ কালো করে সুমিত্রা তবু প্রতিবাদের চেষ্টা করেছিল একটু। বলেছিল, বাপের অন্যায়টা তুমি ছেলের ঘাড়ে চাপাতে চাইছ কেন?

বাইরে গোবেচারা মুখ করে বসে আমি।

ভিতরে দ্বিগুণ গর্জন।—শাট্ আপ! হি ইজ এ ট্রেটরস সন দ্যাটস এনাফ! আর কিছু জানার আমার দরকার নেই! তবু তার সম্পর্কেও ভালো কিছু শুনিনি আমি! এরপর তুমি একটি কথা বললে আমি জানব আমার মেয়ে নেই—সী ইজ ডেড! ডেড!

বলার আর দরকার হল না। সর্বত্র কেমন করে যেন রটে গেল, কে ট্রেটর, কোন ছেলের বিশ্বাসঘাতক বাপ ডক্টর চ্যাটার্জির মতো দেবতুল্য মানুষকে জেলে পাঠিয়ে দেশের অমঙ্গল করতে চেয়েছে। সোশ্যাল ওয়ার্কার আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাণ্ডা প্রভাকর ডি'কস্টাকে নিয়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে। তিন দিনের মধ্যে সে গোয়া থেকেই নিপাত্তা।

হঠাৎ এ-ভাবে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কি করে সুমিত্রা চ্যাটার্জি ভেবে পায় না। তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে আমাকে। ভিতর দেখে নিতে চেষ্টা করে। এতবড় খবরটা তার বাবা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে তাও শুনেছে নিশ্চয়। তবু আমাকে অবিশ্বাস। আমার প্রতি অকরুণ।

তার এই মেজাজের ওপর দিয়ে মেজাজ চড়ালেন ডক্টর চ্যাটার্জি। মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। বললেন, এবারে যে-বিয়ে দিতে পারছেন সেটা শুধু তার ভাগ্যি নয় তার বাবারও ভাগ্যি।

বিয়ে হয়ে গেল। সুমিত্রা চ্যাটার্জি সুমিত্রা বড়ুয়া হল।

এখন আমার শুধু নিরীহ স্বামীর ভূমিকা। কিন্তু সুমিত্রা আমাকে নিরীহ ভাবল না। তার বদ্ধ বিশ্বাস এই সব-কিছুর পিছনে আমার বড় রকমের কিছু ষড়যন্ত্র আছে। বিয়েতে আপত্তি করল না বটে, ভিতরটা তার তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ হয়ে থাকল।

আমার ঘরের প্রথম রাতেও সে কঠিনই থাকতে চেয়েছে। হয়তো বা এতকালের প্রতীক্ষার পর আমার দখল নেবার ব্যাপারটা নগ্ন স্থূল কলাকৌশল বর্জিত লাগছিল তার। আর তাইতেই হয়তো কিছু মনে পড়ে গেছল। স্নায়ুতে ধাক্কা দেবার মতো করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে-ছিল, আমার ঘরের এ্যালবাম থেকে ফোটো চুরি করেছিল কে?

তার দিক থেকে সমর্পণের অন্তরায় যেন এটুকুই। তাকে ছেড়ে দিয়ে শয্যা থেকে নেমে এলাম। স্যুটকেস খুলে ছবি তিনটে বার করে সামনে ধরলাম।—এ গুলোর কথা বলছ?

রাগে দু-চোখ ধক-ধক করতে লাগল তার। আবার গায়ে হাত দিতে ছিটকে সরে যেতে চাইল। তারপর কিছুটা ভয়ে কিছুটা বা হতাশায় আমার ভিতরের ঠাণ্ডা প্রায়-নিষ্ঠুর মানুষটার হদিস পেল বোধ হয় সে। হাল ছাড়ল। বিস্মৃতির রসাতলে ডুবে যাবার আগেও দু-চোখ টান করে আমাকে দেখে নিতে লাগল।

না, তার দিক থেকে বিয়েটা সুখের হয়নি। আমার প্রতি সন্দিগ্ধ। অবিশ্বাস। ক্ষোভ। এখানো তার ধারণা যা ঘটেছে তার বাইরে আরো কিছু আছে যা সে জানে না। বললে যদি ওর মন পেতাম বলে দিতাম। গোপনতা আমারও ভালো লাগে না। এখানে কর্ণফুলি না থাক, চারদিকে সমুদ্র। তার কোলে নিজেকে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলার মতো অকপটে কিছু স্বীকার করে ভিতরটা হালকা করে নেবার তাড়না বোধ করি। কিন্তু সুমিত্রা কর্ণফুলিও নয়, সমুদ্রও নয়।

তার বাবা সে-রকম শক্ত মানুষ না হলে এ বিয়ে ভেঙে যেত। বিয়ের পর তার বাবা যে আমার প্রতি আরো স্নেহ-প্রবণ আরো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন তাও সুমিত্রার অগোচর নয়। ফলে যুদ্ধ-মন্ত্রীর মতো কিছুটা আপোসের রাস্তাই ধরল সে। এইখানেই জিৎ তার। আমি স্নেহ মায়া মমতার কাঙাল। ভোগের কাঙাল। তাছাড়া তার ভোগের দোসর হিসেবেও আমাকে তুচ্ছ করতে পারেনি সে। অনেক রাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে, স্বেচ্ছায় বিস্মৃতির অতলে ডুবতে চেয়েছে।

একটু একটু করে দুজনের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠছে মনে হয়। আমি আনন্দে আত্মহারা। বিয়ের এগারো মাসের মধ্যে সুমিত্রার সন্তান-সম্ভাবনার সময় এগিয়ে এলো। ভারী মাস। অনাগত শিশুকে ঘিরে আমাদের প্রীতির বন্ধন যেন আরো শক্তপোক্ত হয়েছে। আমি বাতাসে ডানা মেলে সাঁতার কাটছি।

ট্রাজেডির নায়ক নিজের কবর নিজে খোঁড়ে নাকি। সেই অমোঘ অদৃষ্ট আমারও।

সন্ধ্যার পর সুমিত্রার কাছে বসে ছিলাম। ফোনে নার্সিং হোম থেকে অ্যাকসিডেন্ট কেস আসার খবর পেলাম একটা। সংকটাপন্ন অবস্থা। অ্যাকসিডেন্ট যার তার নাম প্রভাকর ডি'কস্টা—

টেলিফোনেই আঁধকে উঠলাম আমি। —প্রভাকর ডিকস্টা!

আঁতকে উঠল সুমিত্রাও। চেঁচিয়ে উঠল, কি হয়েছে? কি হয়েছে তার?

কোন কথা না বলে তৈরি হয়ে নিলাম। সুমিত্রা ছুটে এসে গাড়িতে উঠল, সেও যাবে। বাধা দিলাম না।

সত্যিই সাংঘাতিক ব্যাপার। একটা ট্রাক-এর সঙ্গে হেড-অন কলিশন। যারা স্বচক্ষে দেখেছে তাদের রিপোর্ট প্রচণ্ড স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল প্রভাকর ডিকস্টা। মাথা ফেটে চৌচির। বুকের আঘাতও মারাত্মক। জ্ঞানের লেশমাত্র নেই।

দুহাতে মুখ ঢাকা করে ঝুঁকে পড়লাম। কেন অ্যাকসিডেন্ট বোঝা গেল না। মদে চুর হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমার করার কিছু ছিল না। ভোর রাতের মধ্যে সব শেষ। পরদিন পোস্ট মর্টেম রিপোর্টেও অতিরিক্ত মদ্যপানের খবর বেরিয়েছে।

সুমিত্রা অঝোরে কাঁদছিল। আমি নিঃশব্দে তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম।

হঠাৎ কান্না থামিয়ে ও বলে উঠল, কিন্তু প্রভাকর তো মদ কখনো ছুঁতো না, আগে? কখনো খেত না! আমি জানি! এর আর কি জবাব: আমি নিরুত্তর। আমার দু হাত জড়িয়ে ধরে সুমিত্রা আকুল হয়ে বলে উঠল তোমার যে সন্তান আসছে তার দিব্যি আজ তুমি সত্যি কথা বলো! বলো যে কলঙ্ক মাথায় করে প্রভাকর চলে গেছল তা সত্যি কি না? আমার বাবাকে তার বাবাই জেলে পাঠিয়েছিল কিনা?

—সত্যি পাঠিয়েছিল।

—বাবা সেটা জানল কি করে?

আমার অন্তরাত্মায় কে যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল স্বীকার করো কবুল করো—সমস্ত গোপনতা উজাড় করে মুক্তির বাতাস নাও। যে স্ত্রীকে তুমি ভালবাসো তার কাছেও যদি স্বীকার করার এই মুহূর্তটি নষ্ট করো তাহলে গোপনতার ওই কাঁচ ঘর আর কোনদিন ভাঙ্গা যাবে না আর কোনদিন ভাঙ্গতে পারবে না!

অকপটে বললাম সব। গোপনতার কাঁচঘর ভেঙ্গে দিলাম। ফুসফুস ভরাট করে মুক্তির নিঃশ্বাস নিলাম।

—অ্যান্ড রেজাল্ট? এ ডিজাস্টার! এই মুক্তির এত দাম জানতাম না।

ঘরের বাতাসও থেমে আছে বুঝি। স্তব্ধ থমথমে মুহূর্ত গোটা কতক।

হঠাৎ সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল লোকানন্দ বড়ুয়া। উদভ্রান্ত চাউনি। সেই আগের রাতের মতোই চেঁচিয়ে উঠল সাড়ে এগারোটা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি! ইউ মাস্ট লীভ মি নাও—ইউ মাস্ট! আই হেট দ্যাট আওয়ার অফ দি নাইট! তার আগে আমাকে ঘুমোতে হবে না ঘুমোতে পারলে ইনজেকশন নিতে হবে। আপনি যান! এক্ষুনি চলে যান!

সোমেন মিত্র আজও একটা বড় রকমের ধাক্কা খেয়েই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

।। সাত ।।

পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে কাটানোর পর আর ধৈর্য থাকল না। সোমেন মিত্র বিদিশার বার-এ টেলিফোন করে ডকটর বড়ুয়ার খোঁজ করলেন। শুনলেন তিনি আসেননি এখনো। তাঁর ঘরেও নেই।

এ-সময় ঘরে থাকবে না জানা কথাই। কি ভেবে সোমেনবাবু নিজের নাম আর ফোন নম্বর দিয়ে অনুরোধ করলেন বারএ আসার সঙ্গে সঙ্গে ডকটর বড়ুয়াকে যেন এই নম্বরে একটা টেলিফোন করতে বলা হয়।

এত কালের লেখক সোমেন মিত্র সত্যিই যেন একটা আবসার্ড লাইফ স্টোরির তিন রাস্তার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে গেছেন। এত কৌতূহল এখন যে রাতে ভালো ঘুম হয়নি। এমন বিচিত্র মানুষও আর দেখেছেন কিনা জানেন না। কালও রাত সাড়ে এগারোটার আগে হঠাৎ যে উদভ্রান্ত মূর্তি দেখেছেন তার মেজাজ না বুঝে আজ আবার গিয়ে হাজির হতে পারছেন না।

টেলিফোনের জবাব এলো রাত সাড়ে দশটায়। বিদিশার ম্যানেজার জানাচ্ছে ডকটর বড়ুয়া এই মাত্র তাঁর ঘরে ফিরেছেন। তিনি খবর দিতে বললেন সামনের তিন চারদিন ব্যস্ত থাকবেন তিনি—পরে তিনিই মিস্টার মিত্রকে টেলিফোন করবেন।

এই বার্তাও আশা করেননি সোমেন মিত্র। নিজের ওপরেই বিরক্ত একটু টেলিফোন না করলেই ভালো হত। ওখান থেকে টেলিফোন না পেলে হুট করে তাঁর গিয়ে হাজির হওয়াও মুশকিল এখন।

পরের চার দিনের মধ্যেও টেলিফোন এলো না। কিন্তু বিকেলে অপ্রত্যাশিত-ভাবে দীপু সরকার আর নূপুর ব্যানার্জি এসে হাজির। আর তাদের মুখ দেখেই সোমেনবাবুর মনে হল খবর আছে।

নূপুরের আজকের বেশবাস বা প্রসাধনে বাড়তি জেল্লস নেই। সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন। এতেই যেন মেয়েটাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। নত হয়ে পায়ের ধুলো নিতে সোমেনবাবু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন ছবি বন্ধ হল বলে বেজায় মন খারাপ শুনলাম।

নূপুর কিছু বলল না। জবাবটা দিল দীপু সরকার। —মন খারাপ বলে মন খারাপ! এখন আবার একটু আশার ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। কাল মোমবাতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তিনি জানালেন আর একজন ফিনানসিয়ারের সঙ্গে কথা-বার্তা অনেকটা এগিয়েছে। ম্যাচিওর করলে সামনের মাসেই কাজ শুরু করে দেবেন বললেন। ...কিন্তু আমরা যে দাদা এদিকে অথৈ জলে পড়ে গেলাম একেবারে! আপনার ওই বিদিশার লোকানন্দ বড়ুয়া পাগল কি আর কিছু—কিছুই বুঝতে পারছি না! আজ সন্ধ্যায় আমাদের আপনাকে সঙ্গে করে তার ওখানে যাবার কথা যাব কি যাব না সেই পরামর্শ করতেই আপনার কাছে আসা। নূপুরের দিকে ফিরল দাদাকে বলো না সব—কিছু লজ্জা করতে হবে না দাদা আমাদের ব্যাপার-স্যাপার সব জানেন।

মেয়েটা বিব্রত বোধ করতে লাগল। সোমেনবাবুর ভিতরটা উন্মুখ হয়ে উঠেছে আবার। দীপুকেই তাগিদ দিলেন তুমিই বলো না শুনি—তাঁর সঙ্গে কোথায় দেখা হল?

দীপু জবাব দিল গত চারদিন ধরেই ঘন্টার পর ঘন্টা দেখা হচ্ছে—প্রথম দেখা হয়েছিল রাস্তায় উঁচু রাস্তার রোগী দেখছিলেন—তারপর থেকে দেখার আর কামাই নেই। নূপুরের বাবা মায়ের কাছে সে এখন দেবদূতের মতো কেউ।

যেভাবে বলল—নূপুরের মুখে লালের আভাস আর বিরক্তিরও। —তুমি তো ভালো কাউকেই দেখো না। ...না দাদা ভদ্রলোক খুব অদ্ভুত বটে কিন্তু খারাপ মনে হয় না আমার।

দীপু মন্তব্য করল ভালো হলেই ভালো।

সোমেন মিত্র তাগিদ দিলেন ব্যাপার-খানা কি খুলে বলবে?

দীপু সরকার বলে গেল। সোমেন-বাবু কান পেতে শুনলেন।

...তিন দিন আগে সকাল নটা দশটার সময় উত্তর কলকাতার একটা রাস্তার ফুটপাথ ধরে ওরা দুজন যাচ্ছিল। দীপু আর নূপুর। মন মেজাজ কারোই ভালো ছিল না। ফুটপাথে জনাকতক লোকের ভিড় দেখে পাশ কাটাতে গিয়ে দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের একটি কঙ্কালসার মেয়েছেলে বসে আছে। তার পাশে একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ে শুয়ে। খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়েটা ছটফট করছে। পাশে তার কঙ্কালসার মা কাঁদছে। পেট-মোটা ব্যাগ খুলে মেয়েটার চিকিৎসায় বসে গেছে আমাদের লোকানন্দ বড়ুয়া। তার গায়ে সেই ঢোলা শাদা কোর্তা। তাই দেখতে ভিড় জমে গেছে রাস্তায়। সকলে পাদ্রী ডাক্তার গোছের কেউ ভাবছে তাকে।

চিকিৎসা কতক্ষণ আগে থেকে শুরু হয়েছে দীপুরা জানে না। বড়ুয়া সাহেব

একটা ইনজেকশন দিল মেয়েটাকে। মেয়েটা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠতেই ডাক্তারের এক ধমক খেয়ে চুপ। তারপর তেমনি ধমক খেয়েই মেয়েটার মা কাঁদতে কাঁদতে জানালো গাঁয়ের খুব গরিব গেরেস্ত ঘরের বউ সে স্বামী তাদের খেতে দিতে না পেরে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। পেটের জ্বালায় দুদিন আগে ভিক্ষে করে খাবে বলে মেয়ের হাত ধরে শহরে এসেছে। আজ হঠাৎ মেয়েটার এরকম অবস্থা।

ডকটর বড়ুয়া রাগত মুখে ভিড়ের দিকে ফিরে তাকিয়েই দীপু আর নূপুরকে দেখতে পেল। ভিড় করা লোকদের ধমকে সরানো আর হল না। ওদের দেখে বেজায় খুশি। দীপুর ধারণা নূপুরকে দেখে খুশি। বলল—দেখা যখন হয়ে গেল তোমাদের কপালে আজ দুঃখ আছে, রোষো। দীপুকে হুকুম করল একটা ট্যাকসি ধরতে।

আধ মিনিটের মধ্যেই ট্যাকসি মিলল। ময়লা জামা পরা ছোট মেয়েটাকে পাঁজা কোলে করে উঠে দাঁড়াল বড়ুয়া সাহেব। তার মাকে ডাকল এসো।

মেয়েছেলেটা হকচকিয়ে যেতে আবার ধমকে উঠল ফুটপাথে মরে লাভ কি নিজেও গেছ মেয়েটাকেও আধমরা করেছ—এসো তাড়াতাড়ি।

দীপু আর নূপুরকে বলল—এসো তোমরা। আমার ব্যাগটা আনো।

মেয়েটাকে পাঁজা কোলে করেই ট্যাকসির পিছনের সিটে বসল সে। জড়সড় মেয়েছেলেটা তার পাশে বসল। সামনে ড্রাইভারের পাশে পেট মোটা ব্যাগ হাতে দীপু তার পাশে নূপুর। এই লোকের পাল্লায় পড়ে ওদের ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু নেই যেন।

বড়ুয়া সাহেবের নির্দেশে উত্তর কলকাতা ছাড়িয়ে বারাসতের দিকে চলল ট্যাকসি। বহুক্ষণ চলার পর কাঁটা তার আর জংলাগাছের বেড়া দেওয়া বেশ খড়সড় একটা এলাকার মধ্যে ঢুকে গেল ট্যাকসিটা। ভিতরে অনেকগুলো ছনের ঘর আবার ছোট একটা পাকা দালানও আছে। ভিতরে সবজির বাগান আর পুকুরও দেখা গেল।

একটু বাদেই বোঝা গেল এটা অনাথ ভবন একটা। মিসেস সমাজদার নামে এক প্রৌঢ়া মহিলা চালাচ্ছেন এটা।

নামটা শোনা মাত্র সোমেন মিত্রর মনে পড়েছে বিদিশায় সেই রাতে মিসেস সমাজদার নামই এক মহিলার সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল বড়ুয়া সাহেবের—তাকে সেই রাতে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল।

রোগী কোলে বড়ুয়াকে ট্যাকসি থেকে নামতে দেখে মিসেস সমাজদার আর আরো দু-তিনটি মহিলা ছুটে এলেন। বড়ুয়াসাহেব একটা খুপরি ঘরে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল তার মাকেও সেখানে বসতে বলল।

তারপর আপিস ঘরে এসে একটা লম্বা প্রেসকৃপশন লিখে মিসেস সমাজদারের হাতে দিল। বলল—এই অনুযায়ী ওষুধ আর পথ্য যেন পড়ে। মেয়েটার অবস্থা ভালো না। সে আবার সন্ধ্যার পরে এসে দেখে যাবে। আর মেয়েটার মায়েরও একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলল।

তারপর যে কান্ড করল দেখে দীপু আর নূপুরের চক্ষু স্থির। উঠে দাঁড়িয়ে পাঁয়ের লম্বা আলখাল্লা সরিয়ে দু পকেট থেকে তিন পাঁজা নোট বার করল। সব ব্যাঙ্ক থেকে তোলা আনকোরা একশ টাকার বান্ডিল বড় বান্ডিল দুটোর বিশ হাজার—ছোটটায়ও কম করে হাজার তিনেক হবে।

দশ দশ হাজারের বান্ডিল দুটো বড়ুয়াসাহেব মিসেস সমাজদারের হাতে এমনভাবে দিল যেন দশ টাকার নোট দুটো। ছোট বান্ডিলটা আবার ট্রাউজারের পকেটে রাখতে রাখতে বলল—আপনি ব্যস্ত হয়েছিলেন জানি কিন্তু গোয়ার ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাটারা এখানকার ব্যাঙ্কে অ্যাডভাইস পাঠাতে দেরি করল। যাক এরপর একবারে যা দেবার দিয়ে যাব—ইউ নিডলট বদার।

দীপু আর নূপুরকে ডেকে নিয়ে আবার সেই ট্যাকসিতেই ফেরা হল। এবার তিনজনেই পিছনে বসল ইচ্ছে করেই দীপু সামনে গেল না। অতগুলো করকরে টাকা দিতে দেখে দীপুর মাথা ঝিম-ঝিম করছে বটে তবু সামনে বসলে পিছনে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখাটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। তারা দু পাশে দুজনে মাঝে নূপুর। লোকানন্দ বড়ুয়া নূপুরের দিকে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রইল শেষ বিচ্ছিরি করে জিজ্ঞাসা করল এই রোদে প্রোডিউসার খুঁজতে বেরিয়েছিলে?

নূপুর জবাব দিল না। তারও বোধহয় বিশ হাজার টাকা ওভাবে দিয়ে আসতে দেখে মাথা ঝিমঝিম করছিল। একটু বাদে বড়ুয়াসাহেব আবার কড়া করে বলল—তোমাকে দেখা করতে বলেছিলাম এলে না কেন?

নূপুর হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে। তখন দীপু বলল—সোমেনবাবু বলেছিলেন কিন্তু সে—ই নূপুরকে কিছু জানায় নি। বড়ুয়াসাহেব তখন দীপুকেই খেঁকিয়ে উঠল কেন?

দীপু বলল— সে বিবেচনা করছিল।

বড়ুয়াসাহেব বলল—ইউ আর আন অ্যাস।

শুনে দীপুর ইচ্ছে করছিল গাড়ি থামিয়ে নূপুরকে নিয়ে নেমে যায়। কিন্তু তখনো কলকাতা ঢের দূর আর লোকটার ট্রাউজারের পকেটে অনেক টাকা—তাই পারা গেল না। অন্তত শ'খানেক টাকা আজ তার ভয়ানক দরকার—নূপুরদের জন্যেই দরকার। পাকে প্রকারে সেটা জানানো যায় কিনা ভাবছিল।

এরপর বড়ুয়া সাহেব আর একটাও কথা বলল না। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে নূপুরকে দেখতে লাগল। দেখে যেন রাগও হচ্ছে মজাও পাচ্ছে। দীপু যে পাশে বসে আছে তাও ভুলে গেল একএকবার ওর মুখ থেকে পা পর্যন্ত বেয়ে বেয়ে নামতে লাগল তার চোখ দুটো।

এ জায়গায় নূপুর চাপা বিরক্তিতে বলল—বাজে অসভ্যতা কোরো না।

দীপু জবাব দিল আমি যেমন যেমন দেখেছি আর শুনেছি বলে যাচ্ছি।

গাড়ি উত্তর কলকাতায় আসতে বড়ুয়া সাহেব নূপুরকে হুকুম করল ড্রাইভারকে তোমার বাড়ির রাস্তা বলে দিও। নূপুর ভেবাচাকা খেয়ে দীপুর দিকে তাকালো। আর ঠিক সেই সময়েই দীপুর মাথায় মোক্ষম বুদ্ধিটি এলো। বলল—ঠিক আছে, ভালই হয়েছে—আমরা তো ডাক্তারের খোঁজেই বেরিয়ে ছিলাম উনি গেলে উনিই মাসিমাকে একবারটি দেখে যেতে পারবেন।

ওদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে বড়ুয়া সাহেব নূপুরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মায়ের তো গ্যাসট্রিক আলসার?

যা-ই হোক, নূপুর মাথা নাড়ল, তাই।

বড়ুয়াসাহেব ফস করে তক্ষুণি আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবার চোখের ছানির অবস্থা কি?

দু'জনেরই ওদের মাথা ঘুরে যাবার দাখিল। তারপর দীপু ভাবলো সোমেন বাবুর মুখ থেকে শুনে থাকবে। সে-ই জবাব দিল, এখন আর একেবারেই দেখতে পান না।

—ইউ শাট আপ! বড়ুয়া সাহেব থামোখা ধমকে উঠল তাকে। তারপর আধখানা ঘুরে বসল। মাথাটা নূপুরের মুখের দিকে ঝুঁকল একটু। দীপু ঘাবড়ে গেল দিনে দুপুরেই কিছু একটা কান্ড না করে ফেলে।

এ-জায়গায় চোখ মুখ লাল করে নূপুর দীপুকে নীরবে শাসালো।

আরো ঝুঁকে চোখ ঘোরালো করে বড়ুয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করল, দ্যাট স্কাউন্ড্রেল স্টিল রানিং আফটার ইউ?

উপেন হালদারের কথা বলল কি মোহন চৌধুরীর কথা দুজনের কেউ বুঝল না। নূপুর সভয়ে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল।

এক-গাদা বিল ওঠা সত্ত্বেও ট্যাকসিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বড়ুয়া সাহেব নূপুরদের ভেঙে-পড়া দু-ঘরের একটাতে ঢুকল। নূপুরের

মা সত্যিই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না এখন। দশ মিনিট অন্তর অন্তর কিছু মুখে না দিলে অসহ্য যন্ত্রণা। অন্য সময়েও যন্ত্রণা। তিনি এক চৌকিতে শুয়ে। অন্য চৌকিতে নূপুরের বাবা। উনি ড্যাব ড্যাব করে তাকান, কিন্তু কিছুই দেখেন না।

...হ্যাঁ ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে অনেক যত্ন করে নূপুরের মা-কে দেখেছে সেটা দীপু অস্বীকার করতে পারে না। আর রোগের সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অজস্র কথাও জিজ্ঞাসা করল। আর ক্রমে মুখখানা থমথমে হয়ে উঠতে লাগল তার। এক রোগী দেখা শেষ করে উঠে নূপুরের বাবারও দু-চোখ টেনে দেখল, তারপর টর্চ ফেলে দেখে মুখখানাকে ভেংচি কাটার মতো করল।

পাশের ঘরে এনে একটা ভাঙা চেয়ারে বসতে দেওয়া হল তাকে। সেই চেয়ারে একটা পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো গলায় নূপুরকে ধমকে উঠল, মা বাবার এই অবস্থা আর তুমি ছবিতে নামবে বলে প্রডিউসার খুঁজে বেড়াচ্ছ ?

এবারে নূপুরও জবাব দিল, তা না হলে চিকিৎসা করব কি দিয়ে ?

চেয়ার থেকে পা নামিয়ে ওটাতে বসে পড়ল। রাগে গরগর করছে তখনো। ব্যাগ থেকে প্যাড বার করে এক-গাদা লিখে যেতে লাগল। এক দুই করে এক পাতা লেখা শেষ করে নূপুরের হাতে দিল, এই ওষুধ আর এই ডায়েট চলবে—এ শুধু আজকের জন্যে। কাল সকালের মধ্যে পেটের একস-রে করতে হবে—গ্যাসলিক নয়, পেপটিক আলসার মনে হয়। আমি আজকের মধ্যেই কোথাও আরেঞ্জমেন্ট করে কাল সকালে আসব। বাঁচাতে হলে অপারেশন করতে হবেই মনে হচ্ছে—আর সে অ্যারেঞ্জমেন্টও দু-তিন দিনের মধ্যেই করতে হবে। —তোমার বাবাকে কোনো চোখের ডাক্তার দেখানো হয়েছে ?

নূপুর বলল, শিগগীর হয়নি।

ওয়ার্থলেস ! রাগ করে উঠে চলে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে গিয়ে কোর্তা সরিয়ে ট্রাউজারের পকেটে হাত দিল। একশ টাকার ছোট বান্ডিলটা বেরিয়ে এলো। না গুণে আন্দাজে মাঝামাঝি জায়গায় ধরে দু'হাতে টেনে দুভাগ করে ফেলল নোটগুলো। তারপর আলগাগুলো নিজের পকেটে রেখে পিন-আঁটা ভাগটা নূপুরের হাতে গুঁজে দিল। বলল, কাল সকাল আটটার মধ্যে আসব, মা-কে নিয়ে রেডি থেকো।

লম্বা পা ফেলে চলে গেল। দীপু গুণে দেখল উনিশখানা একশ টাকার নোট !

...পরদিন ঠিক সকাল আটটাতেই ট্যাকসি নিয়ে এলো। নিজেই নূপুরের মাকে প্রায় আলতো করে তুলে নিয়ে ট্যাকসিতে বসালো। তাঁর দুদিকে বড়ুয়া সাহেব আর নূপুর। সামনে দীপু।

কোনো বড় রেডিওলজিস্টের চেম্বার হবে। বার বার বেরিয়ান মীল খাইয়ে এক-গাদা একস-রে নিতে নিতে বেলা আড়াইটা গড়িয়ে গেল। বড়ুয়া সাহেব রেডিওলজিস্টএর হাতে চারখানা একশ টাকার নোট দিয়ে বলল, কাল সকালের মধ্যে চাই—ইটস ভেরি ভেরি আরজেন্ট।

ট্যাকসিতে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

পরদিন মানে পরশু বিকেল চারটের এসে হাজির। সেখান থেকে আধঘন্টার মধ্যে নূপুরের মা-কে তুলে নিয়ে মাধ্য-কলকাতার এক নার্সিং হোমের কেবিনে।

দীপু সরকার খবর নিয়েছে কেবিন আর নার্স ধরে দিনে একশ পনের টাকা চার্জ। পনের দিনের টাকা আগাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ওপর ওষুধ আর অপারেশনের মোটা ফী লাগবে।

এখানেই শেষ নয়। কালও বিকেলে লোকানন্দ বড়ুয়ার ট্যাকসি নূপুরের বাড়ির দরজায় হাজির। এবারে ওর বাবার পালা। সে ভদ্রলোককেও একজন বড় চোখের ডাক্তারের কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কথা-বার্তা আগেই বলা ছিল মনে হয়। চোখের বড় ডাক্তারকে কত গুণে দিতে হয়েছে দীপুরা জানে না।

পনের মিনিটের মধ্যে চোখের বড় ডাক্তার তার পরীক্ষা শেষ করে হাস-পাতালে অ্যাডমিশনের অ্যাডভাইস লিখে দিয়েছে। বড় হাসপাতালের চোখের বিভাগের বড় কর্তা সেই ডাক্তার ভদ্র-লোক।

আজ সকালে নূপুরের বাবাকে সেই হাসপাতালের কেবিনে চালান করা হয়েছে। তখনো বড়ুয়াসাহেব সঙ্গে ছিল। দশ দিনের কেবিন ভাড়া আর আনুষঙ্গিক খরচা আগাম গুণে দিয়েছে।

তারপর ট্যাকসি চেপে নূপুর আর দীপুকে নিয়ে আবার নূপুরদের বাড়ি। ভাঙা চেয়ারে বসে এক-গাল হেসে বড়ুয়া সাহেব নূপুরকে বলেছে, নাও ম্যাডাম, ইউ হ্যাভ ডান ইওর লিটল জব —এখন তুমি তোমার ছবির কথা ভাবতে পারো।

এ-জায়গায় মন্তব্যের সুরে দীপু বলল, ও-কথার জবাবে নূপুর বুদ্ধি-মত্তীর মতো একটা কাজ করল। কেঁদে ফেলল।

তার ভ্রূকুটি এড়িয়ে দীপু সরকার বলল, যাবার আগে বড়ুয়া সাহেব হুকুম করে গেল, আজ সন্ধ্যার পর আপনাকে নিয়ে আমরা যেন তাঁর ওখানে অর্থাৎ বিদিশায় যাই—আর বলল, ছবির আলোচনা যদি হয় সেখানেই হবে। আমি তো হতবুদ্ধি দাদা, নূপুর বায়াস—এখন আপনি বলুন কি করব। মানুষ এত সহজে এত টাকা কি করে খরচা করতে পারে তাও ভেবে পাই না। লোকটার কত টাকা !

লোকানন্দ বড়ুয়া সাদর অভ্যর্থনা জানালো সকলকে। দীপু দোতলার বারান্দা একবার উঁকি দিয়েছিল। সেখানে তাকে না দেখে তিন তলার সুইটএ আনা হয়েছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, এক মুখ হেসে মাথা ঝাঁকালো। সোমেন বাবুকে বলল, ওয়েলকাম স্যর। নূপুরের দিকে চাউনিটা থমকালো একটু। সামান্য ভ্রূকুটি তারপর, ভালই দেখাচ্ছে কিন্তু এতটা স্লেন ভালো লাগে না।

সুপুষ্ট হাত বাড়িয়ে অনায়াসে ওর একখানা হাত ধরে ভিতরে নিয়ে এলো। পিছন থেকে দীপু সরকার ঘাড় বেঁকিয়ে সোমেন বাবুর দিকে তাকালো।

নূপুরকে পরিপাটি শয্যায় কুশন বসিয়ে দিল।—বি কমফরটেবল। সোফা দুটো দেখিয়ে বাকি দুজনকে বলল, সীট ডাউন জেন্টলমেন। জানলার পুরু পর্দা দুটো হ্যাচকা টানে সরিয়ে দিয়ে হাওয়া চলাচলের পথ সুগম করল। পাখার স্পীডও আর একটু বাড়িয়ে নূপুরের পাশেই বসল। দীপু সরকারের মুখ আবার গম্ভীর একটু।

নূপুরের দিকেই একটু ঘেঁষে বসেছে ডকটর বড়ুয়া, ফলে বসাটা আরো ঘনিষ্ঠ লাগছে। —বাবা-মা-কে দেখতে গেছলে ?

—মায়ের কাছে দুপুরে গেছলাম, বিকেলের দিকে বাবাকে দেখে ওঁর কাছে এসেছি।

ওঁর কাছে অর্থাৎ লোকের কাছে। পলকা থমকের সুরে বড়ুয়া সাহেব বলল, ফিরবে তো টালা ছাড়িয়ে কোন এক ধ্যাড়ধেড়ে জায়গায়, আসতেই আটটা বাজালে !

উঠে টেলিফোনে রুম সার্ভিস ডেকে ফিরে আবার বসতে গিয়ে দীপু সর-কারের দিকে চোখ গেল। পলকা ভ্রূকুটি আবার একটু। সোমেন বাবুর দিকে চেয়ে বলল, দীপুর কাঁধে এখন ভয়ানক দায়িত্ব—

সোমেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল...।

মুখখান দেখছেন না। নূপুরের বাবা-মা হাসপাতালে, পাহারা দেবার জন্য রাত ওকে এখন নূপুরদের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে—কামেলা না!

নূপুরের মুখ লাল। দীপু সর-কারও না হেসে পারল না।

বেয়ারা আসতে বড়ুয়া সাহেব হুকুম করল, বিশ মিনিটের মধ্যে এই ঘরে ডিনার চাই, ম্যানেজারকে বলা আছে,

কুইক। আর একটা ছোট সেন্টার টেবিল আনবে—চেয়ার দরকার নেই।

বেয়ারা চলে যেতে হৃষ্ট মুখে বলল, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই রাত্তিরে খাওয়া হয় না—আজ চারটি জুটবে।

বিদেশায় এলেও এই ঘরে বসে ডিনার সারা হবে দীপু সরকার আশা করেনি। বলেই ফেলল, আবার এখানে টানা-হেঁচড়া না করে আমরা নিচে গেলেই তো হয়।

বড়ুয়া সাহেব চটপট জবাব দিল, হয়, কিন্তু সেখানেও জলীয় বলতে জল ছাড়া আর কিছু পাবে না—এগ্রিড?

মুখ দেখেই বোঝা গেল অনেক দিন বাদে একটু ভালো তরল রসদের আশায় ছিল বেচারা। হাসতে চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি ড্রিংক ছেড়ে দিলেন নাকি?

ঈষৎ রুক্ষ জবাব।—আমি ছাড়ব কেন। ইউ শুড।

প্রকারান্তরে বলে দেওয়া, তোমার অবস্থায় মদ খাওয়া সাজে না। দীপুর মুখ দেখে সোমেন বাবুর মনে হল সে না ওঠে বেরোতে চায় এরপর। নৃপুরকে দেখে কিন্তু একটুও অখুশি মনে হল না তাঁর। বড়ুয়ার দিকে চেয়ে সেই মুহূর্তে অন্য কৌতূহল সোমেন বাবুর। আজকের রাত সাড়ে এগারোটায়ও এই লোকের মূর্তি বদলাবে কি?

তিনজন বেয়ারার তৎপরতায় সরঞ্জাম সহ পনের মিনিটের মধ্যেই ডিনার এসে গেল। এ-ব্যবস্থায় কার্পণ্য নেই। চিকেন সুপ, ফুল চিকেন রোস্ট অ্যান্ড ব্রেড, ভেজিটেবল স্যালাড আর পুডিং। বেয়ারাদের বিদায় করে খুশি মুখে বড়ুয়া নৃপুরকে বলল, এসো, আমরাই অতিথি সেবা করি।

সুপ শেষ হতে দুটো সেন্টার টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসা হল। বড়ুয়ার দিকে চেয়ে সত্যিকারের খুশির খাওয়া দেখছেন সোমেন মিত্তির। খেতে খেতে সেই খুশিতে টান ধরালো দীপু সরকার। সোমেন বাবুর দিকে চেয়ে বলল, ছবির আলোচনাটা এবারে একটু সেরে নিলে হত দাদা.....

জবাবে সোমেন মিত্তির তাকালেন বড়ুয়ার দিকে। নৃপুরের প্রত্যাশা-মাখা দুচোখও তার দিকেই। কিন্তু ওই লোকের মুখে বিরক্তির ছায়া। নৃপুরকে বলল, খাসা রোস্ট করেছে, বাজে কথায় কান না দিয়ে পেট ভরে খেয়ে নাও। নইলে চৌদ্দ মাইল যেতে যেতে আবার খিদে পেয়ে যাবে।

চাপা অসহিষ্ণুতার দরুণই যেন নৃপুরের বাড়ির দশ মাইল পথটাকে চৌদ্দ মাইল করে দিল। হঠাৎ এই মেজাজ কেউ আশা করেনি। প্রায় নিঃশব্দেই খাওয়া চলল এরপর। শেষ কোর্স পুডিংএ হাত পড়েছে সকলের। কোন্ দেশের খাওয়া কি-রকম লোকানন্দ বড়ুয়া সে-প্রসঙ্গে টুকটাক দুই একটা কথা বলছে। শেষে ডিশ নামিয়ে দীপু সরকারের দিকেই তাকালো। —ছবির কি আলোচনা?

একটু আমতা-আমতা করে দীপু সরকার বলল, মোহনদা অন্য এক ফিনান্সিয়ারের সঙ্গে কথা-বার্তায় কিছুটা এগিয়েছেন, কিন্তু আপনি ইন-টারেসটেড হলে...

বাধা পড়ল। —কিসে ইনটারেসটেড হব? ওই হাঙ্গরের পেটে টাকা ঢালব?

বেজার মুখ করে দীপু সরকার বলল, কিন্তু গল্প তো তাঁর কেনা, তাঁকে একেবারে বাদ দিয়ে এ-ছবি হবে কি করে?

—হবে না। সাদাসাপটা জবাব। সে-সব গল্পও আমার পছন্দ নয়।

নৃপুর নির্বাক, বিমর্ষ। লেখককে একবার দেখে নিয়ে দুচোখ কপালে তুলল দীপু সরকার। —পসন্দার মতো গল্প আপনার পছন্দ নয়!

—নো-নো! গলার স্বর আরো যেন অসহিষ্ণু। —সী হ্যাজ সীন্ এনাফ অফ ভিশাস সার্কল।

ড্যাব-ড্যাব করে দীপু সরকার লেখকের দিকে তাকালো প্রথম। গল্পের নিন্দে শুনেও ভদ্রলোক চুপ করেই আছেন। নৃপুরের শুকনো মুখখানা দেখে নিয়ে বড়ুয়া সাহেবের দিকেই ফিরল আবার। তারও সহিষ্ণুতায় চিড় খেয়েছে। নিরীহ মুখ, করুণই বলল, কলকাতার শহরে ভিশাস সার্কল-এর আর অভাব কি, নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব বার-বার নিজের। যাক, আপনি তাহলে আমাদের ডেকেছিলেন কেন?

—ওনলি টু টেল ইউ দ্যাট ইউ আর অ্যান্ অ্যাস! তপ্ত মুখে উঠে এসে জোরে কলিং বেলএর বোতাম টিপে ধরল। যদি দরকার পড়ে সে-জন্য একটা বেয়ারা বাইরেই অপেক্ষা করছিল। সে ঘরে ঢুকতে আঙুলের ইশারায় টেবিল পরিষ্কার করতে বলল। নৃপুরের কাছে এগিয়ে এলো আবার।—অনেক দূর যেতে হবে আর রাত কোরো না, ট্যাক্সিতে যাবে—টাকা আছে সঙ্গে?

উঠে দাঁড়িয়ে নৃপুর তাড়াতাড়ি ঘাড় কাত করল। আছে।

অপমানে মুখ কালো করে দীপু সরকারও উঠে দাঁড়িয়েছে। সোমেনবাবুর দিকে তাকাতে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন তিনি এখন যাচ্ছেন না।

নৃপুর পা বাড়াতে লোকানন্দ বড়ুয়ার দুহাত তার দুই কাঁধে। মুখ গম্ভীর, চাউনি গম্ভীর।—ডোন্ট ওয়ারি টু মাচ, তোমার ভাবনা আমি ভাবছি—আন্ডারস্টান্ড?

বুঝুক না বুঝুক নৃপুর তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। কাঁধ থেকে হাত নেমে আসতেই দরজার দিকে পা বাড়ালো। দীপু সরকারের মুখ আরো কালো গম্ভীর।

তারা যাবার তিন-চার মিনিটের মধ্যে বেয়ারারা সরঞ্জামগুলো সরিয়ে ঘর পরিষ্কার করে চলে গেল। লোকানন্দ বড়ুয়া তখন রাস্তার দিকের একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। ওদের দেখার জন্য হতে পারে, এমনিও হতে পারে।

ফিরল।

সহজভাবেই সোমেন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আজ ড্রিংক বাদ পড়ল, আপনার ঘুমের অসুবিধে হবে না।

—না। দরকার হলে অন্য ব্যবস্থা আছে। মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। —আর ইউ হার্ট?

সোমেনবাবু বিস্মিত যেন।—কেন?

—আই ডোন্ট লাইক দ্যাট সী উইল বি দেয়ার এগেন...সী ইজ আমবিশাস অ্যান্ড হি ক্যান্ট প্রোটেক্ট হার। আপনার গল্পের নিন্দে করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

চেয়ে আছেন সোমেন মিত্তিরও। বললেন, গল্পের গর্ব আমি করছি না। ...এখনো আমি অ্যাবসার্ড লাইফ স্টোরির কোনো জায়গায় বসে আছি।

অপলক দুটো চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির একটু। চাউনি গভীর, কিন্তু অন্তর্মুখি যেন। সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। সাদা আলো দুটো নিভে গেল। ঘোর-লাগা হালকা নীল আলো জ্বলল।

।।আট।।

কেবল রাগ আর ঘৃণা, রাগ আর ঘৃণা গলগল করে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল সুমিত্রার ভিতর থেকে। যেটুকু মন বোঝাবুঝি হয়েছিল দুজনের সে-যে এত মিথ্যে ভাবা যায় নি। প্রভাকরের সঙ্গে তার বিয়ে নাকচের জন্য আমি দায়ী, মদ ছুতো না প্রভাকর ডিকন্টা—এখন তার বেহুঁশ মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোর জন্য আমি দায়ী। প্রকারান্তরে আত্মহত্যাই করেছে সে—সেই আত্মহত্যার জন্য শুধু আমিই দায়ী।

তখনকার মতো আর নিজের বাড়িতেও ধরে রাখা গেল না সুমিত্রাকে। বাপের বাংলোয় চলে গেল। ডকটর চ্যাটার্জী ভাবলেন ছেলেপুলে হবার আগে মায়ের কাছে এসে থাকতে চায়। সে তার বাবাকে কিছু বলেনি, কিন্তু মায়ের সহানুভূতি যে পেয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে জামাইয়ের প্রতিও সে-ভদ্রমহিলার আচরণ বদলেছে। স্বামীর ওপর জোর থাকলে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতেন। কিন্তু ভদ্রলোক সরল পুরুষ, বুদ্ধিমান। জামাইয়ের ওপর তাঁর স্নেহ আর নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। আমি তাঁর ডান হাত। হার্টের সামান্য গোলযোগে ভুগে ওঠার পর এতবড় নার্সিং হোমের সব দায় দায়িত্ব নিশ্চিন্ত মনে

উৎসবের দিন, উপহারের দিন

আনন্দঘন উৎসবে উচ্ছল হবার দিন এল। এল খুশীর রঙে মনকে রাঙিয়ে তোলার দিন। প্রিয়জনকে উপহার দেবার এই তো সময়। জীবন বীমার সুরক্ষা এক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার। অনন্য, অমূল্য···সোনার চেয়ে দামী। একমাত্র জীবন বীমাই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের গ্যারাণ্টী দেয়—জীবনকে আনন্দময় করে তোলে।

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

LIC/36a/81

কাপড় দেখেই কি তার গুণ বিচার করা যায়?

হ্যাঁ, যায়।
কিঁ ভাবে তা বলি শুনুন।

খুব সোজা। কাপড়ের ওপর 'টেরীন'® ট্রেডমার্ক আছে কিনা ভাল ক'রে দেখে নিন। কারণ, তাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি পাচ্ছেন আমাদের দ্বারা আগেভাগেই পরীক্ষিত পলিয়েস্টারের কাপড়। তার মানে—'টেরীন' পলিয়েস্টার ফাইবারের নির্মাতা কেমিক্যালস অ্যাণ্ড ফাইবার্স অফ ইণ্ডিয়া (ক্যাফি) দ্বারা পরীক্ষিত নিখুঁত কাপড়। একটি পরীক্ষার কথাই ধরুন—কাপড়ে ভাঁজের দাগ প্রতিরোধের পরীক্ষা।

এই পরীক্ষায় ২ মিনিটেই আমরা বুঝতে পারি আপনার দিনের কর্মব্যস্ততার পরও জামাকাপড় কেমন পরিপাটি থাকবে।

আমরা কাপড়ের একটা টুকরো নিয়ে সেটা ভাঁজ ক'রে আমাদের শিরলে-ক্রীজ-রিকভারি টেস্টারের ওপর বসিয়ে দিই। তার ওপর এক মিনিট পর্যন্ত একটা ওজন চাপিয়ে দেওয়া হয়। এক মিনিটের মধ্যে ভাঁজের দাগ প্রতিরোধ করার জন্যে কাপড়কে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর ভাঁজের কোণ মাপা হয়। সেটা আমাদের গুণমানের অনুযায়ী না হলে কাপড়ে 'টেরীন' ট্রেডমার্ক লাগান হয় না।

'টেরীন' কাপড় কেনা মানে— আপনার পয়সার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার।

তার কারণ, আপনি যাতে পয়সা খরচ ক'রে সেরা কাপড় পান তার জন্যে আমরা কাপড় নানা ভাবে পরীক্ষা করতে কোন কসুর রাখি না। আমরা শুধু কাপড়ের ভাঁজের দাগ প্রতিরোধ করার শক্তিই পরীক্ষা করি না, কাপড়ের ঘষাঘষি সহ্য করার ক্ষমতা, কাপড় যাতে কুঁকড়ে না যায় তার পরীক্ষা···আরও অনেক পরীক্ষা করি আমরা। এর মধ্যে যে-কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কাপড়ে 'টেরীন' ট্রেডমার্ক পড়ে না।

আমরা কাপড় বিশেষভাবে পুঙখানুপুঙখ পরীক্ষা করি বলেই আপনি 'টেরীন' ট্রেডমার্ক লাগানো একমাত্র বাছাই বাছাই কাপড়ই পান। এসমস্ত কাপড় তৈরী করেছে কয়েকটি নির্বাচিত উৎকর্ষ সচেতন মিল—সেই সব মিল যারা ডিজাইন আর বুনটের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে নতুন রেওয়াজ আর হাল ফ্যাশানের কাপড়। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা—এসব মিলের কাপড় উত্তীর্ণ হয়েছে কঠোর গুণমান পরীক্ষায়—আমাদের।

কাপড়ে 'টেরীন' ট্রেডমার্ক দেখে নেবেন— আপনারই স্বার্থে।

TERENE

®'টেরীন'—কেমিক্যালস অ্যাণ্ড ফাইবার্স অফ ইণ্ডিয়া

পি এন বি-তে আসুন, প্রত্যেকের পছন্দমতো অনেক আকর্ষণীয় জমা প্রকল্প আছে

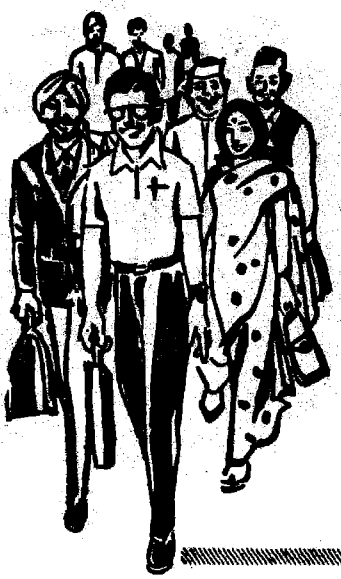

হোল লাইফ মান্থলি ইনকাম : প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সাত বছরের জন্যে জমান; তারপর সারা জীবন ধোরে কিস্তির সমপরিমাণ টাকা 'পেনসান' নিন এবং উত্তরাধিকারীদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করুন—আপনার আসল টাকায় হাত পড়বে না।

মাল্টি-বেনিফিট অ্যাণ্ড ওল্ড এজ ডিপজিট : কুড়ি বছরের জমায় আপনার টাকা বছরে 31.6% হারে বাড়বে; পাঁচ হাজার টাকা দাঁড়াবে 36,640 টাকায়। একশো বা তার বেশি টাকা 13 থেকে 241 মাসের জন্যে জমা দেওয়া যায়।

রেকারিং ডিপজিট : আজই ভবিষ্যতের সংস্থান করুন। 12 থেকে 252 মাসের জন্যে পাঁচ টাকা বা তার গুণিতকে কিস্তি জমা দিতে পারেন।

স্পেশাল ফিক্সড্ ডিপজিট : আপনার ফিক্সড্ ডিপজিটের ওপর মাসিক সুদ নিন; 61 মাসের জন্যে 30,000 টাকা জমা রাখলে মাসে মাসে 250 টাকা সুদ পাওয়া যায় অথচ আসলে হাত পড়ে না।

অটোমেটিক এক্সটেনশান ডিপজিট : আপনার ফিক্সড্ ডিপজিটের সুদ ছাড়বেন না। আমাদের স্থায়ী নির্দেশ দিয়ে রাখুন, মেয়াদ শেষ হোলে আমরা নিজেরাই 'রিনিউ' করিয়ে দেব।

ডিপজিট-লিঙ্কড্ হাউসিং লোন : নিজের বাড়ী করার স্বপ্ন থাকলে তা সাকার করার জন্যে আজ থেকে নিয়মিতভাবে মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা জমিয়ে যান; মেয়াদশেষে আপনি যত টাকা জমা দিয়েছেন আমরাও ঠিক সেই পরিমাণ টাকা বাড়ী করার জন্যে আপনাকে ধার দেব।

স্টুডেন্ট ডিপজিট : ছাত্রছাত্রীদের বয়স চোদ্দ বা তার বেশি হোলে তারাও নিজেদের নামে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে আর নিজেরাই চেক কাটতে পারে।

বিশদ বিবরণের জন্যে আমাদের নিকটতম শাখায় চোলে আসুন :

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

7618

আমার ওপর ছেড়ে দিতে পেরেছেন। সার্জন হিসেবেও জামাইয়ের প্রতিভা তাঁর গর্বের কারণ।

আমি বাংলোয় যাই। কিন্তু সুমিত্রা কাছে আসতে চায় না। তার দু'চোখে ঘৃণা ঠিকরোয়। আগুন ঠিকরোয়। আমারও নরম মন কঠিন হয়ে আসছে। ও সেটা বুঝতে পারে। রমণী-দেহের প্রতি আমার ক্ষুধা আর লোলুপতার দিকটা ভালই জানে। কিন্তু নিজেও যে ভোগ আর পরিতৃপ্তির দোসর হয়ে ছিল—সেটাই অসহ্য রাগের ব্যাপার এখন। একদিন আমাকে বলল, একটা কথা আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, এরপর আমি আর ছেলেপুলে চাই না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আমাকে কি করতে বলো?

ও রেগে গিয়ে জবাব দিল, তুমি যা খুশি করো—তুমি জাহান্নমে যাও!

আমি বললাম, যা-খুশি আমি করেই থাকি আর আমার মতো লোক জাহান্নমেও একলা যায় না সে-তো তুমি জানোই।

জানে। আবার আমার কবলে পড়লে মুক্তি নেই ভাবছে। বড় ডাক্তারের মেয়ে। আপাত-উপায় একটা নিজের মাথাতেই এলো। সরোষে জানান দিল, যেটা আসছে এসে গেলে আর যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করবে—সে-সময় অপারেশন করিয়ে নেওয়া সহজ।

সেই ভুলটাই করলাম। সন্তান-বাৎসল্য কাকে বলে জানি না। তখনো ভোগ জানি শুধু।

মেয়ে হল। ভারী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। মায়ের থেকেও সুন্দর। নিজের লোকানন্দ নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখলাম অলকানন্দা। মেয়ের দাদু বললে খাসা নাম। সুমিত্রা নাক কুঁচকে বললে, রাবিশ!

ছমাস চলে যায় সুমিত্রা বাপের বাংলো ছেড়ে আসে না। শেষে স্ত্রী আর মেয়ের আচরণ দেখে ডক্টর চ্যাটার্জী হয়তো আঁচ করলেন কিছু। জামাইয়ের মেজাজও তিরিক্ষি দেখছেন তিনি। একদিন ডেকে সোজাসুজি জিজ্ঞাস করলেন কি ব্যাপার?

অকপটে বললাম সব।

শুনে তিনি মেয়ের ওপরেই রেগে আগুন। বেহিসেবী মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোর ফলে প্রভাকর ডিকস্টার অ্যাকসিডেন্ট—এখবর তো জানেনই। বললেন, তোমার দ্বারা প্রকাশ হোক আর যার দ্বারাই হোক, বিশ্বাসঘাতকের ওই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতাম আমি! তুমিই সতর্কতা বার করতে পেরেছ বলে তোমার প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ আমি। ডোন্ট ওয়ারি মাই সান, এভরিথিং উইল বি অলরাইট।

পরদিনই মেয়ে আর নাতনিকে নিজে আমার হেপাজতে দিয়ে গেলেন।

সুমিত্রার ঘৃণা বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ বাড়তেই থাকল। আমি ডাইনে গেলে সে বাঁয়ে চলে। ভালো বললে মন্দ ভাবে। সব কিছুতে আমার কপটতা দেখে। আমার ঘরের শান্তি তছনছ করে দিতে পারলে আর কিছু চায় না।

আমি সহ্য করি। অসহ্য হলে দুই-একটা ঝাঁকুনি-টাকুনি দিয়ে বসি। তখন চুপ। তখন ভয়। রাতের শয্যা সে আলাদা করে নিয়েছে। পৃথক ঘরে শোয়। মেয়ে থাকে আমার জিম্মায় আর এক ঘরে।

কিন্তু ঘর পৃথক করে আমাকে তফাতে রাখা যাবে না সুমিত্রা জানতই। তবু প্রথম রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল। কিন্তু পায়ের আঘাতে সে-দরজা কেঁপে উঠতে নিজেই খুলে দিয়েছে। যত বিমুখ, আমার লালসার মত্ততা তত্তো বেশি। ও সেটা অত্যাচার ভাবে। লাম্পট্য ভাবে। দু'চোখে গলগল করে ঘৃণা ঠিকরোয়। আমার উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনা ততো বাড়ে।

সুমিত্রা আমার দুর্বলতার সন্ধান পেল মেয়েটা একটু বড় হয়ে উঠতে। ডক্টর চ্যাটার্জীর শরীর ভাঙছে, তাই আমার দায়িত্ব বাড়ছে, খাটুনি বাড়ছে। সার্জন হিসেবেও আমার এত নাম-ডাক যে ফুরসত মেলা ভার। তার মধ্যেই মেয়েটাকে একটু দেখার জন্য, তার সঙ্গে একটু খেলা করার জন্য ছুটে ছুটে ঘরে চলে আসি।

এ-সব লক্ষ্য করেই হাতে একটা নতুন অস্ত্র পেল যেন সুমিত্রা। মেয়ের ভালো-মন্দের দিকে বেশি রকম মনোযোগ দেখা গেল তার। তার সেই ভালো-মন্দের বিবেচনাটা আমার বিবেচনার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার আসার সময় হলেই মেয়েকে সে আমার সঙ্গে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। সকালে আদর করতে দেখলে সে ওকে পড়ানো বা খাওয়ানোর জন্যে টেনে নিয়ে যায়, আমি যা নিষেধ করব ও তাতেই প্রশ্রয় দেবে।

পাঁচ সাত বছর বয়েস থেকেই মেয়েটা তার বাবা মায়ের বিরোধ অনুভব করতে শিখল। আট ন'বছর বয়সে তো বেশ ভালই টের পেল। আমি প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত, নার্সিং হোম নিয়ে ব্যস্ত—আমাকে আর কতটুকু সময় পায় মেয়েটা? মায়ের মন্ত্রণায় কান-মন পেকে উঠছে তার।

সুমিত্রার বাবার শরীর খারাপ যাচ্ছিল, কিন্তু হুট করে আগেই মা মারা গেল তার। আমি তখন একটা বড় কেস নিয়ে দামনে চলে গেছি। শাশুড়ীর পেটে টিউমারের খবর আমার জানার কথা নয়। হঠাৎ বাড়াবাড়ি যন্ত্রণা হতে তাঁকে নার্সিং হোমে আনা হয়। আমাকে টেলিফোনে না পেয়ে টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু সে-টেলিগ্রামও সময়ে হাতে পড়েনি আমার। ফলে আসতে একদিন দেরী। অন্য সার্জনের হাতে অপারেশন হল শেষ পর্যন্ত। সময়ে অপারেশন হলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু আমার প্রতি একটা চ্যাটার্জীর অত্যধিক দুর্বলতার কারণেই সেটা হল না।

আমি এসে দেখলাম সব শেষ। ডক্টর চ্যাটার্জী ভেঙে পড়ে বললেন, তুমি থাকলে হয়তো বাঁচানো যেত।

কিন্তু সুমিত্রা ফুঁসে উঠল। তার যত রাগ গিয়ে পড়ল আমার ওপর। মেয়ের সামনেই চিৎকার করে বলতে লাগল, আমার জন্যেই তার মা মরেছে—টেলিগ্রাম না পাওয়া-টাওয়া সব ভাঁওতা। আর কেস হাতে নিয়ে সেখানে কোথাও ফুর্তি তে মেতেছিলাম বলেই টেলিফোনে সন্ধান মেলেনি।

দশ বছরের অলকানন্দাও জানল বাবার জন্য তার দিদা চলে গেল।

কাজে ডুবে আছি। বাড়ি দমবন্ধ লাগে সময় সময়। টান কেবল অলকানন্দা। যত দিন যাচ্ছে মেয়েটা ততো সুন্দর হচ্ছে। মায়ের প্ররোচনায় অনেক সময় সন্দিগ্ধ চোখে দেখে আমাকে। খুব সহজ সরল লোক ভাবে না আমাকে।

ডক্টর চ্যাটার্জীর সেরিব্রাল স্ট্রোক হল দু'বছর বাদে। অনেক ঝোঁকাঝুঁকির পর সে-যাত্রা সামলে উঠেছিলেন। চোখ বুজলেন তিনমাস পরের হার্ট অ্যাটাকে। কিন্তু প্রথম বারের বিপদ সামলে উঠেই তিনি বিষয় আশয় লেখা-পড়া করে দেবার ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছিলেন। ...আর সেই সুযোগে আমি একটা বড় রকমের ছুরি চালিয়েছিলাম। স্পষ্ট করে তাঁকে বলেছিলাম, তাঁর অবর্তমানে এ নার্সিং হোমের হাল কি হবে আমি জানি না। সব-কিছু হাতে পাবার পর সুমিত্রা ডিভোর্সের রাস্তা নেবে বলেই আমার বদ্ধ ধারণা। তিনি আছেন বলেই এখনো সে সেটা পারছে না। তখন আমি প্র্যাকটিস কোথায় করব জানি না, কিন্তু তার মালিকানার নার্সিং হোমে যে থাকব না সেটা ঠিক।

মেয়ের সঙ্গে আমার বনিবনা হলই না ডক্টর চ্যাটার্জী খুব ভালো করেই জানতেন সেটা। সেই কারণে আমার প্রতি আরো বেশি সহানুভূতি তাঁর। ওই মেয়ের কারণে অলকানন্দাও যে বাপের প্রতি বিরূপ তাও বুঝতেন ভদ্রলোক। কিন্তু তা বলে এ-রকম চরম বিচ্ছেদের আশংকা তিনি করেন নি।

তারপরেই উকিল আর সাক্ষীসাবুদ ডেকে পাকা লেখা-পড়া করে ফেললেন। নার্সিং হোম তার প্রাণের জিনিস। তাঁর অবর্তমানে এর আট আনার মালিক আমি লোকানন্দ বড়ুয়া, চার আনার মালিক নাতনি অলকানন্দা বড়ুয়া, আর বাকি চার আনার মালিক এখানকার বিশ্বস্ত কর্মীরা—এই নার্সিং হোম এত বড় করে তুলতে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁরা। মেয়ে সুমিত্রা বড়ুয়া শুধু বাপের বাংলো আর নগদ টাকার মালিক হবে। নার্সিং

হোমের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব থাকবে না। আর মেয়ের অবর্তমানে সেই বাংলো আর নগদ টাকাও শুধু অলকানন্দা বড়ুয়াই পাবে।

তার মৃত্যুর পর সেই রেজিস্টার্ড উইলের সমাচার শুনে সুমিত্রার দুচোখ কেবল ধক ধক করে জ্বলেছে আর জ্বলেছে।

সকলে মিলে ওই বাংলোতেই উঠে আসা হয়েছে তারপর।

...টাকা এত রোজগার করে ঘেন্না ধরে গেছে। টাকার স্তূপ জমছে। কিন্তু চাইলেও অবকাশ মেলে না। কাছে দূরে যেখানে হোক বড় অপারেশনের কেস হলেই আমাকে ছুটতে হবে। কেউ ছাড়তে চায় না। হাতে পায়ে ধরে।

আমার কোনো দাম নেই কেবল নিজের স্ত্রীর কাছে। মেয়েও আমাকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। মায়ের মেজাজ দেখে আর আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসে। কিন্তু বাবারও ভিতরের মেজাজ একটু আধটু অনুমান করতে পারে হয়তো। ওর তেরো বছর বয়সে মায়ের মতোই কিছু একটা অশালীন উক্তি করার ফলে আমার হাতের এক চড় খেয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল। ওর মা চিৎকার করে উঠেছিল, ও খুনী! খুনী! কত বড় খুনী আমি ছাড়া কেউ জানে না! কেন কাছে যাস?

হ্যাঁ, আমার মাথায় হঠাৎ-হঠাৎ ছেলেবেলার সেই খুন চাপত—যখন আমি পাখি মারতাম, কুকুর মারতাম, ধ্বংস দেখতে চাইতাম।

সেই ভয়েই আমি আরো স্থির, আরো সংযত। চড় মারার পর মেয়েকে বুকে চেপে ধরেছিলাম। ভুল করেছিলাম।

অলকানন্দার ষোল বছর বয়েস হতে আমার টনক নড়ল। আরো সুন্দর আরো মিষ্টি হয়েছে। ওর সর্বাঙ্গ জুড়ে যেন একটা অদ্ভুত আমন্ত্রণ দানা বেঁধে উঠছে। বাংলোর বাইরে আর ভিতরেও ছেলে ছোকরাদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। অলকানন্দা তাদের সঙ্গে মেশে, হৈ-হৈ করে বেড়ায়। আমি অস্বস্তি বোধ করি।

স্ত্রীকে বলতে সে মুখ ঝামটা দিল, বেশ করে! ওর বয়সে তুমি কি ছিলে কে দেখতে গেছে!

মেয়ে পাশের ঘর থেকে হাসি চেপে পালাচ্ছে দেখলাম।

আঠের বছর বয়সে একটা ছেলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা চোখে পড়তে লাগল আমার। বছর বাইশ তেইশ হবে ছেলেটার বয়েস। দেখতে সুন্দর। নাম সনি পার্কার। তার বাপ বোম্বাইয়ের মানুষ, গোয়ায় ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। স্বাধীন ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেও গোয়ায় এই সব ব্যবসায়ীদের ভালো চোখে দেখি না আমি। অনেকের অনেক রকম নিষিদ্ধ কারবারের সঙ্গে যোগ। আমার চোখে এ-ছেলেটা আরো অপদার্থ। সে নাকি আর্টিস্ট। ছবি আঁকে।

ছবি কখন আঁকে আমি জানি না। সর্বক্ষণ বাড়িতে আড্ডা দেয়। সিগারেট ফোঁকে। যেখানে সেখানে দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। অলকানন্দা রাত করে বাড়ি ফেরে। সনি পার্কার তাকে পৌঁছে দিয়ে যায়। মেয়ের মন জয় করতে পেরেছে ভেবে আমাকে খুব একটা পরোয়া করে না। আমার বদ্ধ ধারণা ও একটা ভ্যাগাবন্ড-মার্কা ছেলে। টাকার লোভে এসে জুটেছে।

আরো এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ অলকার বয়েস যখন উনিশ, ওদের ঘনিষ্ঠতা এত বেড়ে গেল যে আমার ছেড়ে বাইরের লোকের চোখেও বিসদৃশ ঠেকত। অনেক শুভার্থী জন আমাকে জিজ্ঞাসা করত, ওই সনি পার্কারের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি কিনা।

আমার মন বুঝতো বলেই সুমিত্রা আরো বেশি আসকারা দিত। আমাকে শুনিয়ে বলত, চমৎকার ছেলে। শিল্পীর মর্যাদা সকলে কি বুঝবে। মেয়েকে বার কয়েক সামলে দিতে ফল উল্টো। আরো ছ'মাস না যেতে সে আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ওই সনি পার্কারকেই বিয়ে করতে যাচ্ছে সে। এটা ওদের দুজনেরই স্থির সিদ্ধান্ত একেবারে।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, ও একটা বাজে ছেলে। তার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না।

অলকানন্দা বলল, সনি কত ভালো ছেলে তুমি জানো না। আমি তাকে ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসে। বিয়ে তার সঙ্গেই হবে।

আমি বললাম, ভালবাসা-টাসা কিছু নয়, ও এসে জুটেছে টাকার লোভে।

অলকানন্দা জবাব দিল, তোমার এক পয়সাও দেবার দরকার নেই তাহলে। দাদু আমাকে যা দিয়ে গেছে তাই দিও। কিছু না পেলেও সনির তোমার টাকার ওপর এক ফোঁটাও লোভ নেই।

এমনি রেষারেষির মধ্যে আরো ছ'মাস কেটে গেছে। অলকানন্দার বয়েস কুড়ি। মাকে বলেছে এবারে শিগগীরই বিয়ে হবে ওদের।

আমি তখনো বলেছি, আমার আপত্তি আছে। ভাগাবন্ডের ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না।

...কিন্তু এক ব্যাপারে আমার ভুল হয়েছে। অলকানন্দা আমারই মেয়ে, আমারই মতো অবুঝ, বেপরোয়া আর দুঃসাহসী। এদিক থেকে ওর মায়ের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ।

একদিন শুনলাম রাগে শাদা হয়ে হিসহিস করে মার মাকে বলছে, বাবাকে বলে দিও সে মত দিক আর না দিক আমি কেয়ার করি না! আমি সনিকে ভালবাসি, সনি আমাকে ভালবাসে—এ বিয়ে হবেই। হবে হবে হবে। আমার জীবন থাকতে কেউ সনিকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না।

সোমেন মিত্র উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন। লোকানন্দ বড়ুয়া হঠাৎ থেমে যেতে সামনে ঝুঁকলেন একটু। দেখলেন, কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে ভদ্রলোকের সমস্ত মুখ। ঘামছে। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতেও বিষম কষ্ট হচ্ছে যেন।

ঘাবড়ে গিয়ে সোমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

বিড়বিড় করে লোকানন্দ বড়ুয়া জবাব দিল, সেই কথা—ঠিক সেই রকম কথা—এক দুপুরের বারে বসে নূপুর বলছিল দীপুর সরকারকে আর আমি ওদের সামনের কেবিনে বসে শুনছিলাম। দীপুর অবিশ্বাস দেখে রেগে গিয়ে নূপুর বলে উঠেছিল, এই বুকে হাত দিয়ে বলছি, সে-রকম হলে আমার যেন সব শেষ হয়ে যায়—জীবন থাকতে কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না—কেউ পারবে না—কেউ না!

আমার কানের পর্দা হঠাৎ সেদিন ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, অন্য মেয়ে নয়, অলকানন্দার কথাগুলোই ফিরে আবার শুনলাম আমি। কেবিন থেকে ওরা বেরুবার সময় পর্দা সরিয়ে নূপুরকে দেখলাম আমি। তারপর ছুটে বাইরে এসেও দেখলাম। অলকানন্দার মতো অত সুন্দর নয়। কিন্তু তারও সর্বাঙ্গে যেন পুরুষ-এর দু চোখ টেনে নেবার মতো কিছু আছে। আমন্ত্রণের ইশারা আছে। আর ভিতরটা আরো বেশি এক-রকম মনে হল ওদের। নইলে এক কথা একই রকম করে দুজনেই বলে কি করে? আমার চোখে নূপুর আর অলকানন্দা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

সোমেন মিত্র নির্বাক। এখনো অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন দেখছেন লোকটার চোখে-মুখে।

হঠাৎ চমকে উঠে লোকানন্দ বড়ুয়া জিজ্ঞাসা করল, কটা বাজল?

হাতঘড়ি দেখে আশ্বাসের সুরে সোমেনবাবু বললেন, দেরি আছে, পৌনে এগারোটা।

সোফায় মাথা এলিয়ে দিল আবার। —আচ্ছা, আপনি যান আজ।

...কাল আসব?

ওটুকুতেই বিরক্ত। বলে উঠল, প্লীজ ডোন্ট ডিসটার্ব মি আনটিল আই ফিল লাইক টকিং। আপনার টেলিফোন নম্বর আছে আমার কাছে—খবর দেব। প্লীজ লিভ মি নাও অ্যান্ড ডোন্ট মাইন্ড।

।। নয় ।।

এবারের টেলিফোন পরের পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেও এলো না। অপেক্ষায় থেকে থেকে সোমেনবাবুর বিরক্তি ধরে গেল। কি একটা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দুদিনের জন্য তাঁর কলকাতার বাইরে যাবার কথা। ভাবছেন ফোন তুলে কেবল এ-কথাটাই বড়ুয়া সাহেবকে জানিয়ে দেবেন কি না!

এই ভাবনার ফাঁকে দরজার বাইরে দীপু সরকারের খুশি মুখখানা দেখা গেল। সোমেনবাবু দরাজ আহ্বান জানালেন, এসো এসো—কদিন ধরেই ভাবছি তুমি আসবে।

দীপু সরকারের সেই আগের মতোই হাসি-মাখা সুতৎপর হাব-ভাব। চেয়ার টেনে বসে বলল, কটা দিন একটু ছোটাছুটির মধ্যে ছিলাম, সময় পাইনি—

সোমেনবাবু বললেন, খবর ভালই মনে হচ্ছে যেন?

—তা আপনার আশীর্বাদে একটু আশার মুখ দেখা যাচ্ছে। মোহনদার সঙ্গে সেই ফিনানসিয়ারের ফাইন্যাল এগ্রিমেন্ট হয়েই গেছে বলতে পারেন। ডেট-ফেট ঠিক মতো পেলে সামনের মাস থেকেই আবার শুটিং শুরু করা যাবে।

শুনে কেন যেন খুব উৎসাহ বোধ করলেন না সোমেন মিত্তির। জিজ্ঞাসা করলেন, নূপুর খুশি?

—খুশি হবে না কেন। মোহনদা তাকে পাকা আশ্বাস দিয়েছেন এবার ছবি শেষ হওয়ার আগে আর থামা নেই। আর কথা আদায় করে নিয়েছেন, এ-ছবি হয়ে গেলে পর পর তাঁর আরো দুখানা ছবিতে কাজ করার আগে নূপুর অন্য লোকের কন্ট্রাকট নেবে না। মোহনদার বাড়িতে জোর আসর বসেছিল কাল।

একটু চুপ করে থেকে সোমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ডকটর বড়ুয়ার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?

—দেখা! বিরক্তিতে দীপু সরকারের গর্তের চোখ ঠেলে বেরুতে চাইলো।—সেই তো নূপুরের গার্জেন হয়ে বসেছে এখন—দেখা হবে না! রোজ দেখা হচ্ছে, রোজ উপদেশ ঝাড়ছে, রোজ হম্বিতম্বি করছে! এখন কি করে তাকে কাটতি দেওয়া যায় সেটাই ভাবনা আমাদের।

একটুও ভালো লাগল না কথাগুলো। জিজ্ঞাসা করলেন, আবার ছবি শুরু হচ্ছে তিনি জানেন?

—ক্ষেপেছেন! নূপুরের অবশ্য বলার ইচ্ছে ছিল। তার আশা এখনো যদি লোকটা টাকার থলে নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু আমি আর ঝামেলার মধ্যে নেই মশাই—মোহনদা যদি হাঙ্গর হয় তো আপনার ওই বড়ুয়া আস্ত কুমীর একখানা—বুঝলেন?

—বুঝলাম, তবে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

—পারলেন না, কেমন? এতদিন নূপুরও পরেনি। তার বাবা-মায়ের জন্য এর মধ্যে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছে। নার্সিং হোম আর হাসপাতালে রোজ দেখতেও যায় তাদের। ছানি অপারেশনের আগে বাপের ডায়বেটিস বেরুনোর ফলে অপারেশন পিছিয়েছে—কেবিন খরচ বেড়েছে—তাও অম্লান বদনে দিয়ে দিচ্ছে। ও-দিকে মা-তো আরো মাসখানেকের আগে বেরুতেই পারবে না নার্সিং হোম থেকে—নূপুরের হাতে আরো এক-কাঁড়ি টাকা গুঁজে দিয়েছে সেই জন্য। এই লোককে বোঝা কি এত সহজ? তদারকের নাম করে বাড়ি এসে যখন নূপুরের গা সেঁটে বসত, আর যখন তখন হাত ধরত আর নিজের হাত ওর কাঁধের ওপর চালান করত—তখনো পর্যন্ত বুঝতে কষ্ট হয়েছে। কিন্তু কাল রাতে বোঝা হয়েছে। নূপুরও খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছে কাল রাতে—বুঝলেন? এরপর আর আমি ওকে নূপুরের ধারে কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছি না—অপমান কি করে করতে হয় আমারও জানা আছে! গাধা বলা বার করছি—

এ-সব শুনে আর এই রাগ দেখে সোমেনবাবুই হকচকিয়ে গেলেন একটু। জিজ্ঞাসা করলেন, কাল রাতে কি হয়েছে?

নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল দীপু সরকার। ওই লোকের প্রতি লেখকেরও একটু দুর্বলতা আছে ভেবে—তাই খবর শোনাতেই এসেছে সে।

—কাল আপনার বড়ুয়া সাহেবের পদার্পণ ঘটেছিল রাত ন-টার সময়।

—কোথায়?

—কোথায় আবার, নূপুরের বাড়িতে। সঙ্গে এক-রাশ ভালো ভালো খাবারের প্যাকেট। এসে বলল, আজ সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি হয়েছে, খাওয়াও হয়নি—আজ রাতে আর তার এখান থেকে নড়ার ইচ্ছে নেই—খেয়েদেয়ে এখানেই ঘুম লাগাবে। নূপুরকে বলল, কিছু ব্যস্ত হতে হবে না, যেখানে হোক আমাকে একটু মাথা রাখার জায়গা করে দিলেই হবে।

ব্যস্ত হতে হবে না বললেই হয় কি করে? দু চোখে রাগ ছড়িয়ে দীপু বলে গেল, বিশেষ করে যে লোক বিদিশার অমন একখানা ঘরে থাকে। বাবার চৌকিতে পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিল তার জন্য—পাশে মায়ের চৌকিতে আমার ব্যবস্থা। এতদিন আমি ওর ভাই দুটোর সঙ্গে পাশের ঘরে শুতুম নূপুর থাকত এই ঘরে। খাওয়া-দাওয়ার পর যে-যার শুয়ে পড়া গেল। আমার তো মশাই পেটে ভালো দানা পড়লে বিছানায় গা দিতে না দিতে ঘুম। সেই ঘুম ভাঙল সকাল ছ-টায়। চোখ তাকিয়ে দেখি বড়ুয়া সাহেবের বিছানা খালি।

সোমেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু রসিয়ে থামল যেন। তারপর আবার শুরু করল। —ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি একেবারে সাদাটে মুখ করে নূপুর দাওয়ায় বসে আছে। দেখেই বোঝা যায় সমস্ত রাত জেগে কাটিয়েছে। বড়ুয়া সাহেব কোথায় জিজ্ঞাসা করতে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। কোনরকমে বলল, চলে গেছে। শেষে আমার জেরায় পড়ে গলগল করে সব বলে ফেলল। কি করেছে লোকটা রাত্তিরে, ভাবতে পারেন?

কি শুনবেন ভেবে সোমেন মিত্তির সত্যিই শংকিত একটু এবারে।

—রাত ঠিক কত হবে তখন নূপুর বলতে পারল না, তবে এগারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। ও-সব জায়গায় সেটাই নিঝুম রাত। নূপুরের ঘুম আসছিল না, চুপচাপ ছবির কথাই চিন্তা করছিল। ওদিকের দেয়ালের ধারে ভাই দুটো ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হল, দরজার কাছে কেউ যেন দাঁড়িয়ে। দরজার দিকে পাশ ফিরেই শুয়েছিল তখন। তারপরেই সর্বাঙ্গ কাঠ একেবারে। অন্ধকার সত্ত্বেও লোকটাকে চিনল। সে ভিতরে ঢুকল। একপা, দু-পা করে নূপুরের দিকে এগলো। খুব কাছে এসে দাঁড়াল। নূপুর জেগে আছে আর চেয়েই আছে অন্ধকারে বুঝবে কি করে? বেচারীর অবস্থা বুঝুন, অত গরমে গায়ে একটা জামা পর্যন্ত নেই। সিঁটিয়ে পড়ে রইল। বড়ুয়া আস্তে আস্তে ওর মুখের দিকে ঝুঁকল। ভয়ে নূপুর এবার দু চোখ বুজে ফেলল। লোকটার গরম নিঃশ্বাস ওর গালে মুখে লাগছে।

প্রায় আধ মিনিট ওই রকম থেকে লোকটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি আস্তে আস্তে চলে গেল।

দীপু সরকার চলে যাবার পরেও সোমেন মিত্তির নির্বাক বসে। সব-কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। যাবার আগে দীপু সরকার বলে গেল, ঘরে কাল রাতে ওই ভাই দুটো না থাকলে কি-যে হত সে ভাবতে পারে না। সোমেন মিত্তিরের সমস্ত ভেতরটা এর প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। কিন্তু যা শুনলেন তাও যে একেবারে দুর্বোধ্য। কি বলবেন তিনি?

ফোনও আর করা হল না। বিকেলের দিকে মোহন চৌধুরীর ফোন পেলেন একটা। একটা খবরও নেওয়া হয় না বলে হালকা অনুযোগ। তারপর সেই আশার আর খুশির বার্তা। শিগগীরই তার বাড়িতে সকলকে নিয়ে আলোচনার বৈঠক বসবে একটা, লেখকের তখন না এলেই নয়—ইত্যাদি।

দুদিন বাদে বাইরে থেকে ঘুরে এসে বিকেলের দিকে সোমেনবাবু কি কাজে বেরিয়েছিলেন একটু। ফিরতে সন্ধ্যা। স্ত্রী জানান দিলেন, তোমার লোকানন্দ বড়ুয়া এর মধ্যে দুবার ফোন করেছিলেন। গলার স্বরে খুব উতলা মনে হল। দুবারই বললেন, আসা-মাত্র যেন ফোন করা হয়—জরুরী দরকার।

লোকানন্দ বড়ুয়ার খবর লেখকের মুখে স্ত্রীও কিছু কিছু শুনেছেন ইতিমধ্যে। তাই তাঁরও আগ্রহ।

ফোন করতে বিদিশার ম্যানেজার জানালো, ডক্টর বড়ুয়া এইমাত্র একটু কাজে বেরিয়েছেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবেন। তিনি বলে গেছেন, মিস্টার মিত্র যেন রাত আটটায় বিদিশায় আসেন—এখানেই ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফোন রেখে স্ত্রীর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে সোমেনবাবু শুধু বললেন, রাতে ডিনার সেখানে।

স্ত্রী মন্তব্য করলেন, পাগল আর কাকে বলে—ফোনের গলায় মনে হল কি যেন সাংঘাতিক ব্যাপার।

।। দশ ।।

ভিতর থেকে ভারী গলা ভেসে এলো, কাম ইন প্লীজ!

সোমেন মিত্র সতের নম্বর ঘরে ঢুকলেন। রাত তখন সাড়ে আটটা।

ঘরে মুখোমুখি সোফায় বসে পড়লেন। হাত বাড়িয়ে হুইস্কির বোতলটা টেনে নিয়ে এবারে ছিপি খুলেই গলায় ঢেলে দিল খানিকটা। মুখ বিকৃত হল একটু। বোতল রেখে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল। এবারে বিরক্তি-মাখা গলার স্বর।—সাড়ে আটটা বেজে গেল ওরা এখনো আসছে না কেন? এরপর কখন আসবে কখন খাবে কখন বাড়ি যাবে?

সোমেন মিত্র অবাক।—ওরা মানে, দীপু আর নূপুর?

—তা ছাড়া আবার কে।

—ওদের পেলেন কোথায়?

—সকালে গেছলাম।

—ওরা আসবে বলেছে?

—দীপু বাড়ি ছিল না। নূপুর বলেছে আসবে। সী ওয়জ্ এ বিট্ ডিফারেন্ট দিস মর্ণিং, আই ডোন্ট নো হোয়াই।...নটা বাজতে কুড়ি, এখনো আসছে না কেন ওরা?

লোকটার গরম নিঃশ্বাস ওর গায়ে মুখে লাগছে.....

কিন্তু ঘরের মালিকের দিকে চোখ পড়তে সোমেন মিত্তির অস্বস্তি বোধ করলেন একটু। সমস্ত মুখ থমথমে। মাথার চুল উসকো খুসকো। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। সোফার সামনের সেন্টার টেবিলে হুইস্কির বোতল আর গেলাস। গেলাসে জল বা সোডা কিছুই নেই। লালচে মুখ। অর্থাৎ ওই কাঁচা তরল পদার্থ বেশ খানিকটা উদরস্থ হয়েছে।

—বসুন। জানলার কাছে গিয়ে নিচের রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন একটু। ঘরে দাঁড়াতে সোমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন আপনার শরীর অসুস্থ নাকি?

...নো, হোয়াই?

—অন্য রকম লাগছে...।

বার দুই পায়চারি করল। সোমেনবাবুর মনে হল, কিছু একটা যন্ত্রণা মাড়িয়ে চলেছে। বিড়বিড় গলার আওয়াজও কানে এলো।—আজ অন্যরকম দিন...দ্যাট ড্যাম্ন ফেটফুল নাইট...দিস টুয়েন্টিনাইন্থ ডে অফ জুলাই—এ দিনটাকে ক্যালেন্ডার থেকে একেবারে মুছে দিতে পারলে দিতাম।

সোমেন বাবু বলে দিতে পারতেন ওরা আসবেও না। বলা গেল না।

নটা বাজল। লোকানন্দ বড়ুয়া একবার উঠছে, জানলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, পায়চারি করছে, আবার এসে সোফায় বসছে।—স্ট্রেঞ্জ...কেন আসছে না বলুন তো?

—হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছে।

ওবল বিরক্ত।—আটকে থেকে মানে? এখানে ডিনারের ব্যবস্থা হয়ে আছে জানে। তাছাড়া আটকে গেলে ফোনে খবর দেবে না কেন?

বলি বলি করে এবারেও কিছু বললেন না সোমেন মিত্র।

সোয়া নটা বাজল। সাড়ে নটাও। ক্রমেই ভদ্রলোকের মুখ থোরালো হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে কি যেন একটা আতঙ্ক এঁটে বসছে। বার বার একটাই কথা গলা দিয়ে বেরুচ্ছে, স্ট্রেঞ্জ...ভেরি স্ট্রেঞ্জ।

অসহিষ্ণু হাতে রিসিভার তুলে নিল। রুম সার্ভিসকে ধমকেই উঠলেন, ডিনার ফর টু! ইয়েস্, দ্যাটস্ রাইট—ফর টু ওনলি।

বোতল থেকে আবার খানিকটা কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢালল। ব্যাপার দেখে সোমেন বাবু ঘাবড়েই যাচ্ছেন।

বেয়ারারা দু'জনের খাবার সাজিয়ে দিল। সোমেন বাবু লক্ষ্য করছেন, লোকটা সুপ খানিকটা খেল। ডিশ সুদ্ধু খাবারগুলো নাড়াচাড়া করল শুধু—সবটাই প্রায় পড়ে থাকল। চোখে মুখে সেই দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক আরো এঁটে বসছে। হঠাৎ—হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে জানলার দিকে তাকাচ্ছে। ভয়াবহ কিছু যেন চোখে ভাসছে তার।

খুব সাদাসিধেভাবেই সোমেন বাবু বললেন এবার, ওদের ছবিটা খুব শিগগীরই আবার শুরু হচ্ছে জানেন তো?

লোকানন্দ বড়ুয়া সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল প্রায়।—হোয়াট্! সী ইজ্ ইন্ দি গেম এগেইন! এতক্ষণ এ কথা কেন বলেন নি আমাকে! আর ইট শিওর?

—হ্যাঁ। মোহন চৌধুরী ফোনে বলেছেন। দীপু সরকারও বলে গেছে...

—ও.....দ্যাট্ আস অফ অ্যান ইডিয়ট! কিন্তু নূপুর আমাকে কিছু বলল না কেন—কিচ্ছু জানালো না কেন?

উঠে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা করল বার কয়েক। কালো মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে। মনে হল কাঁপছে মানুষটা। আর এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় হাড় পাঁজর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে বুঝি।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো। সোমেন বাবুও নিজের ঘড়ি দেখলেন। রাত দশটা পনের।

—আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে—জাস্ট্ নাও—উইল ইউ কাম উইথ মি সার?

—কোথায়?

—ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম প্লীজ! উইল—ইট্স দ্যাট্ ফেটফুল নাইট আন্ড দ্যাট ড্যাম্ন আওয়ার ইজ ফাস্ট আপ্রোচিং। আই আম শিওর সী ইজ ইন ডেঞ্জার—সী মাস্ট বি—অর হোয়াই সুডন্ট সী কাম?

সোমেন বাবুকে একরকম ঘর থেকে ঠেলে নিয়ে বেরুলো সে। সোমেন মিত্তির আর আপত্তি করলেন না, কারণ এমন একটা মানসিক সংকটের মুখে লোকটাকে একলা ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ ভাবলেন না। না, নূপুর সম্পর্কে তাঁর কোনো আশঙ্কাই নেই।

ট্যাকসি ড্রাইভারটাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলল লোকানন্দ বড়ুয়া। এত রাতে রাস্তাও অনেকটা ফাঁকা। ট্যাকসি যখন নূপুরদের বাড়ির দরজায় দাঁড়াল—ঘড়িতে এগারোটা দশ।

দরজার সামনে আবছা অন্ধকারে দীপু সরকার দাঁড়িয়ে।

লোকানন্দ বড়ুয়া লাফিয়ে নামল।

পিছনে সোমেন বাবু। কাছে আসতে দীপুর মুখখানাও খুব শুকনো মনে হল। এত রাতে এই দুজনকে দেখে হকচকিয়ে গেছে।

চাপা গর্জন করে উঠল লোকানন্দ বড়ুয়া।—নুপুর কোথায়?

আমতা আমতা করে দীপু বলল, নটা সাড়ে নটার মধ্যেই তো ফেরার কথা। এখনো আসছে না কেন বুঝছি না···।

দু হাতের থাবায় দীপুর দু কাঁধ ধরে একটা বিষম ঝাঁকানি দিয়ে লোকানন্দ বড়ুয়া ঝাঁঝিয়ে উঠল, কোথায় গেছেন সে? কোথা থেকে ফেরার কথা?

—মো-মোহনদার ওখানে ... ছবির ব্যাপারে কি একটা দরকারে আসতে বলেছিলেন...আর কিছু টাকাও...

—শাট্ আপ রস্কেল! আবার প্রবল ঝাঁকুনি দুটো।—ওর কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে তোমার আমি গায়ের ছাল-চামড়া তুলে নেব! কোথায়? সেই স্কাউনড্রেল কোথায় নিয়ে যেতে পারে ওকে?

এ-মূর্তি দেখে দীপুর চোখে মুখেও একটা অজ্ঞাত ভয়। শুকনো ঠোঁট জিভে ঘষে বলল, মাণিকতলার দিকে ওঁর আর একটা বাড়ি আছে, সেখানে হতে পারে...।

শেষ হবার আগেই ধাক্কা মেরে ট্যাকসির দিকে ঠেলে দিল তাকে।—ওঠো। কুইক।

সে সামনে। সোমেন বাবু আর লোকানন্দ বড়ুয়া পিছনে। ঘড়িতে এগারোটা সতের।

কিন্তু ছোটার দরকার হল না। টালার বড় ব্রিজটা অর্ধেক পেরুতেই লোকানন্দ বড়ুয়া চিৎকার করে উঠল, রোখো! স্টপ!

ব্রেক কষে ট্যাকসি দাঁড়িয়ে গেল।

দরজা খুলে নেমে রীজের ধারের রেলিং-এর দিকে ছুটল লোকানন্দ বড়ুয়া। হ্যাঁ, বুক উঁচু কার্নিশে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন। মেয়েই বটে। দীপুকে সঙ্গে করে সোমেন বাবুও দ্রুত এগিয়ে গেলো সেদিকে।

লোকানন্দ বড়ুয়া এক হ্যাচকা টানে মেয়েটাকে একেবারে বুকের ওপর নিয়ে এলো। পর মুহূর্তে অন্য হাতের এ-পিঠ ও-পিঠ দিয়ে ঠাস ঠাস করে নুপুরের দুই গালে দুই চড়।—কি করছিলি এখানে তুই? এত রাতে একলা দাঁড়িয়ে এখানে কি করছিলি?

লোকানন্দ বড়ুয়া চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করছে আর উত্তেজনায় নিজেই কাঁপছে থর থর করে।

সোমেন মিত্র দেখছেন নুপুরের সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু। মাথার চুল অবিন্যস্ত। কাঁধের ওপর শাড়ির আঁচলটা এলোমেলো। কাঁধের নিচে ব্লাউসের খানিকটা ছেঁড়া দেখা যাচ্ছে। সকলকে দেখে হোক, বা চড় খেয়ে হোক বা ওই কথা শুনে হোক—নুপুর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ।

আবার অল্প একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লোকানন্দ বড়ুয়া সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল তাকে। ঝুঁকে মুখ দেখছে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।—ডিড্ হি টু ইউ এনি হার্ম?

কাঁদতে কাঁদতেই মাথা নাড়ল নুপুর। না।

—ওয়াজ হি ড্রাংক? ডেরী?

এবার মাথা নেড়ে সায় দিল। হ্যাঁ।

দাঁতে দাঁত চেপে লোকানন্দ বলল, সেই জন্যেই সাধের সঙ্গে সাধ্যের যোগ ছিল না। তার পরেই নুপুরের মাথাটা টেনে নিয়ে আদর করল একটু। বার দুই পিঠ চাপড়ে ধরা গলায় বলল, ডোন্ট ক্রাই মাই গার্ল, ডোন্ট...দি ওয়ারস্ট ইজ ওভার...ইউ উইল বি অলরাইট নাও...কাম কাম...ডোন্ট ক্রাই।

প্রগাঢ় মমতায় তাকে ধরে নিয়ে ট্যাকসিতে তুলল। নিজেও উঠল। ও-পাশে সোমেনবাবু। দীপু সরকার সামনে উঠতে যেতেই লোকানন্দ বড়ুয়া ধমকে উঠল তাকে।—তুমি কোথায় যাচ্ছ? গেট ব্যাক হোম—বাড়ি খালি থাকবে? সী নিডস সাম অ্যাটেনশন, কাল সকালে এসো!

দীপু সরকার বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। ট্যাকসি বেরিয়ে গেল।

সমস্ত পথ এক হাতে নুপুরের কাঁধ জড়িয়ে ধরে বসে থাকল লোকানন্দ বড়ুয়া। মাঝে মাঝে পিঠ চাপড়াচ্ছে আর আদরের সুরে বলছে, ডোন্ট ওয়ারি মাই ডিয়ার...ইটস অল ওভার...ডোন্ট ক্রাই।

সোমেন মিত্র ঝুঁকে দেখছেন। গাড়ির আবছা অন্ধকারেও প্রশান্ত সুন্দর দেখাচ্ছে লোকানন্দ বড়ুয়ার কালো মুখখানা। এত সুন্দর যেন আর কখনো দেখেননি।

বিদিশার তিন তলার সতের নম্বর ঘর। রাত বারটা তিরিশ। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। গদীর শয্যায় শুয়ে নুপুর অঘোরে ঘুমুচ্ছে। লোকানন্দ বড়ুয়া নিজের হাতে তাকে দুটো স্লিপিং পিল খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছে। সাদা আলো নিভিয়ে নীল আলো জেলেছে। শব্দ না করে ঘরের সোফা দুটো তুলে বাইরের করিডোরে এনে পেতেছে। তার একটাতে সোমেন মিত্র বসে আছেন। অন্যটাতে ডকটর বড়ুয়া এসে বসছে এক-একবার। আবার উঠে ঘরে যাচ্ছেন নুপুরকে দেখতে। মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তবু যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না লোকটা। বার বার উঠে দেখতে যাচ্ছে। আলতো করে নুপুরের কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে

শেষবারের মতো দেখে এসে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে এসে সোফায় গা ছেড়ে দিল। আর উদ্বেগ নেই। ভয় বলতে নেই।

।। এগারো ।।

অলকানন্দা বলেছিল, সে সনিকে ভালবাসে, সনি তাকে ভালবাসে—এ বিয়ে হবেই হবে। বলেছিল, ওর জীবন থাকতে কেউ সনিকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না।

আমি সার্জন লোকানন্দ বড়ুয়া এফ আর সি এস ওদের এই ভাল বাসাবাসির ব্যাপারটার কানাকড়িও দাম দিইনি। কিন্তু আমার ভুল, সমস্ত ব্যাপারটাই আমি সনি পার্কারের দিক থেকে দেখেছিলাম। আমার বদ্ধ বিশ্বাস, সে একটা ভাগাবণ্ড। টাকার লোভে মেয়েটার কাছে এসে জুটেছে। ওকে মোহগ্রস্ত করেছে। তাই মেয়ের কাছে সনির ভালবাসাটা যদি আমি ঠুনকো প্রমাণ করে দিতে পারি, তাহলেই অলকানন্দার প্রেম-জ্বর ছেড়ে যাবে।

অঢেল টাকা আমার। প্রতিপক্ষেরও সীমা পরিসীমা নেই। সামান্য ইশারায় নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল জনা তিনেক লোক। তারা টাকার জাল ফেলতে লাগল ওর সামনে। টোপ ফেলে ফেলে অন্য মোহ বিস্তার করে মাথা ঘুরিয়ে দিতে লাগল ওর। দেড় মাস যেতে না যেতে দেখা গেল সনি পার্কার মদে বেহুঁস হয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকে, জুয়া খেলে, আর খারাপ মেয়েছেলে নিয়ে আনন্দে মশগুল হয়ে থাকে। অলকানন্দা দেখে, পাগলের মতো ছুটে যায়, আবার পাগলের মতোই হতাশ হয়ে ফিরে আসে। আসবেই। কারণ আমার ওই তিন লোক টাকার বৃষ্টি করছে ওর মাথায়, আনন্দ আর ফূর্তির রসদ জুগিয়ে জাহান্নমের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। আবার শাসাচ্ছেও, বন্ধুদের ছেড়ে ভালো ছেলের মতো সংসারী হতে গেলে ওর বুকে ছুরি বসাবেই তারা। বন্ধুদের সঙ্গে থেকে যতো খুশি ফূর্তি করো, যতো খুশি মজা লোটো।

তাকে ফেরাবার আশায় অলকানন্দা যখন শেষবারের মতো তাকে ফেরাতে গেল, সনি পার্কার তখন মদে চুর হয়ে এক মেয়ের কোলে শুয়ে আর একটা মেয়েকে আদর করছে। অলকানন্দাকে দেখে সনি অশ্লীল গালাগাল করে উঠল একটা। সঙ্গীরা তাকে এই রকমই শিখিয়ে রেখেছিল।

অলকানন্দা পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এলো।

আমি সার্জন লোকানন্দ বড়ুয়া আড়াল থেকে ওর মুখখানা দেখি আর হাসি। ক্রমেই ওর সেই সুন্দর মুখ ঘোরালো আর ধারালো হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে কোনরকম সন্দেহ করার কারণ

নেই। কিন্তু আমার দিকেও ও ওভাবে করেই তাকায়। ওর মায়ের সঙ্গেও কথা-বার্তা বন্ধ।

সেদিন একটা ইমারজেন্সি অপারেশন সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরছি। সাড়ে এগারোটা বাজতে মিনিট দুই বাকি। বাড়ির কাছেই একটা মস্ত কালভার্টের ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে আমার। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই ড্রাইভ করে আসছিলাম। দেখি কালভার্টের একেবারে ধারে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে অলকানন্দা। কালভার্টের নিচে এক মাইল জোড়া বিশাল লেক।

গাড়িটা পলকের জন্য একটু স্লো করলাম শুধু। কিন্তু থামালাম না। হেডলাইট দেখে অলকানন্দা একবার ঘুরে তাকালো। আমার গাড়ি তার না চেনার কথা নয়।

কালভার্ট ছাড়াবার আগেই কি মনে হতে সর্বাঙ্গে বিষম একটা ঝাঁকানি। এ-সময় ও এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কোনো খারাপ মতলব নেই তো? কিন্তু পর-মুহূর্তে সেই চিরকালের শয়তান ফিস-ফিস করে উঠল, যা-খুশি হোক, যা-খুশি করুক—চলো তুমি!

সবে কালভার্ট ছাড়িয়েছি। আবার ঘড়ি দেখেছি। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা।

ঝপাং করে বেশ বড় রকমের শব্দ একটা। সেই মুহূর্তে মাথায় আকাশও ভেঙে পড়ল বুঝি। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। গাড়িটা নিজের অগোচরেই নিশ্চল।

নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম কালভার্টের ওপর দিয়ে।

মেয়ে যেখানে ছিল—নেই। অলকানন্দা নেই।

চিৎকার করে আমি কি আকাশটা চিরে দিতে চেয়েছিলাম? নইলে দেখতে দেখতে অত রাতেও লোকজন এসে গেল কি করে?

প্রায় ঘন্টা দেড়েক লেকের জল তোলপাড় করে অলকানন্দার দেহ পাওয়া গেল। তাকে ডাঙ্গায় তোলা হল। তার ঢের আগে সব শেষ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু যখন পোস্টমর্টেম হবেই। পরদিন রিপোর্ট এলো। জলের আঘাতে এবং জলে ডুবে মৃত্যু। কিন্তু ওটুকুতেই শেষ নয়। রিপোর্টে আরো কিছু ছিল।

সী ওয়াজ ক্যারিইং।...আর্লি স্টেজ অফ প্রেগনেনসি। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আত্মহত্যা করেছে।

সুমিত্রা কপাল চাপড়ে কাঁদছে! বুক চাপড়ে কাঁদছে। আমার কাছে এসেই মাথা খুঁড়ছে। বলছে, আমার দোষ, তবে আমার দোষ, আমাকে তুমি মেরে ফেলো। আমাকে তুমি মেরে দাও। তোমার কথা শুনে ওই বিশ্বাসঘাতকটাকে প্রশ্রয় না দিলে আজ আমার কোল এভাবে খালি হয়ে যেত না। তোমার কথা সত্যি হবে জানলে মেয়েকে আমি আগলে রাখতে পারতাম। সব আমার দোষ, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো না, আমাকে তুমি মেরে ফেল।

সুমিত্রার কান্না, এই অব্যক্ত যন্ত্রণা আর অনুশোচনা থেকেই হয়তো একদিন মুক্তি তার।

কিন্তু আমার কি হবে?

আমার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। বুকের তলায় একরাশ কালো বাষ্প ফেঁপে উঠছে, রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সব গ্রাস করে জমাট বাঁধছে। দম বন্ধ করে দিচ্ছে। কোনদিন সেটা নড়বে না সরবে না গলবে না। ওটা আমাকে তিলে তিলে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। ধ্বংস করবে। কিন্তু তখনো আমার অন্তরাত্মা এক নিঃসীম গোপনতার কবরের তলায় অনাগত কাল ধরে গুমরে কাঁদবে।

আমার সামনে সুমিত্রা মাথা খুঁড়ছে আর কাঁদছে।

আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত অস্তিত্বের মূল ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিতে শুরু করেছে কেউ। সেখানেও একটা আর্তনাদ শুরু হয়েছে। এলোপাথারি ঝড় উঠেছে। ভিতরের সেই আর্তনাদ আমার কানের পর্দা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করে দিচ্ছে। —স্বীকার করো, আবারও কবুল করো, মতোর হাতুড়ির ঘায়ে এই শেষ বারের মতো গোপনতার কাচঘর ভেঙে দাও। সুমিত্রা বড়ুয়া সমুদ্র নয়, কর্ণফুলি নয়—তবু স্বীকার করো, তবু কবুল করো! কি হবে ভেবো না, মৃত্যুও যদি হয় তাতেও শান্তি, তাতেও মুক্তি। কিন্তু না যদি পারো তাহলে সমস্ত জীবন ধরে আরো কঠিন মৃত্যু—অফুরন্ত মৃত্যু—ঢের ঢের বেশি ভয়াবহ মৃত্যু।

সোজা হয়ে বসলাম আমি। সুমিত্রার গায়ে হাত দিয়ে তাকেও ঠেলে তুললাম। তার চোখের ভিতর দিয়েই আমি নির্জন কর্ণফুলির দিকে ছুটলাম। সমুদ্রের দিকে ছুটলাম।

বললাম, দোষ তোমার নয়। সব দোষ আমার। আমার জন্যেই অলকানন্দা চলে গেল।

সেই শোকের মুখেও কথাগুলো বোধহয় অস্বাভাবিক ঠেকল সুমিত্রার কানে। —তোমার দোষ কেন? তুমি কি করেছ?

—অলকানন্দার দিক থেকে ব্যাপারটা ভাবি নি আমি। তার সেদিনের কথাও আমার মাথার মধ্যে ছিল না।

সুমিত্রা আকুল। —কি মাথায় ছিল না? কি বলেছিল ও?

—অলকানন্দা বলেছিল, ও সনিকে ভালবাসে, ওর জীবন থাকতে কেউ সনিকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না।

সংশয়ে কুটিল হয়ে উঠছে সুমিত্রার চোখ-মুখ। কিন্তু আমার সামনে তখনো কর্ণফুলি। তখনো সমুদ্র।

—কিন্তু তোমার দোষ কেন? তুমি কি করেছ?

—আমি শুধু সনি পার্কারের দিক থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছি। সনির ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করিনি। আমার এ অবিশ্বাসে ভুল ছিল না। লোভের ফাঁদে ফেলে অনায়াসে সনি পার্কারকে আমিই সরিয়ে দিয়েছি।

সুমিত্রার চোখে জল নেই। তীক্ষ্ণ তীব্র হিংস্র চাউনি।

আমার সামনে তখনো কর্ণফুলি। তখনো সমুদ্র।

অকপটে শেষটুকুও কবুল করলাম। বললাম সেই রাতে ফেরার সময় লেকের কালভার্টে অলকানন্দাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। অত রাতে ও ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ভেবে আমার খটকা লেগেছিল। ইচ্ছে করলেই গাড়ি থামিয়ে ওকে আমি জোর করে তুলে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু তার বদলে আমার চলে আসার ঝোঁক চাপল। কালভার্ট পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যা হবার হয়ে গেল।

এবারের কনফেশনের ফল? আরো ঢের ঢের বড় ডিজাস্টার।

আহত হিংস্র বাঘিনীর মতোই সুমিত্রা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। তারপর ক্ষিপ্ত আক্রোশে পুলিশে খবর দিতে ছুটল। মেয়ের আত্মহত্যায় ইন্ধন জোগানোর নালিশ। হ্যাঁ, পুলিশ তার সাধ্যমতো টানা হেঁচড়াও করল আমাকে নিয়ে। কিন্তু বিচারক সনি পার্কারকে লোভের ফাঁদে ফেলাটা আত্মহত্যায় প্ররোচনা বলে ভাবল না।

কিন্তু সুমিত্রার হিংস্র আচরণে আর খবরের কাগজের কল্যাণে গোয়ার ছেলে-বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলে তাই জানল, তাই ভাবল। সকলের সরব আর নীরব ধিক্কারে সুনাম আর আভিজাত্যের চূড়া থেকে একেবারে ধুলোয় নেমে এলাম।

তারপর নিঃশব্দে নার্সিং হোমের ভার অন্যের হাতে দিয়ে আর ব্যাঙ্কের সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাতের অন্ধকারে একদিন আমি গোয়া থেকে হারিয়ে গেলাম। এক বছর বাদে আজ আবার সেই রাত। সেই উনত্রিশে জুলাই। হাড়-পাঁজর গুঁড়োনো সেই রাত সারে এগারোটা অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।

কিন্তু আজ ইনজেকশন ছাড়াই আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

।। বারো ।।

এত বড় একটা ধকল গেছে কাল, আজ সমস্ত দিন আর বিরক্ত না করে সন্ধ্যার পর বিদিশায় টেলিফোন করলেন সোমেন মিত্তির। সেখান থেকে যে জবাব এলো শুনে হাঁ।

—ডকটর বড়ুয়া? ও হি হ্যাজ চেকড্ আউট।

—হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন? কখন?

—আজ বিকেলেই।

রিসিভার রেখে হতভম্বের মতো বসে রইলেন খানিক। তারপর নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে দক্ষিণ কলকাতা থেকে সোজা উত্তর কলকাতায় ছুটলেন।

নূপুরের বাড়িতে নূপুর বসে আছে মাথা গোঁজ করে। তার সামনেই দীপু সরকার বসে আছে চুপচাপ।

আমাকে দেখে নূপুর মুখ তুলল একবার। তার বড় বড় দু চোখে জল টলটল করছে।

দীপু সরকার বলল, বসুন। তারপর বিব্রত মুখে যেন স্বীকারই করল কিছু। বলল, এমন অদ্ভুত মানুষ সত্যি জীবনে দেখিনি দাদা।

—কি হয়েছে?

শুনলেন কি হয়েছে। দীপুর প্রত্যেকটা কথা মনে গেঁথে থাকার মতো।

আজ সকাল সাড়ে আটটায় নূপুরকে নিয়ে লোকানন্দ বড়ুয়া এখানে চলে এসেছে। তার এত হাসি খুশি মূর্তি ওরা আর দেখেনি। ভালো ভালো খাবার কিনে এনেছে। ওদের সকলকে খাইয়েছে নিজেও ফূর্তি করে খেয়েছে। তারপর হঠাৎ দীপুকে জিজ্ঞাসা করল, চার পাঁচ মাস আগের এক দুপুরে একটা বার-রেস্তরাঁর কেবিনে বসে শুনেছিলাম ছবিতে নামতে দিতে চাও না বলে নূপুর তোমাকে বলছে, বেশ কিছু টাকা হাতে এলে ছবি করা ছেড়ে সে তোমার স্বপ্নের কাবাই সফল করবে। সেই কাবাটা কি?

লজ্জা পেলেও দীপু সরকার বলেছে কি সেটা। তখন ছবি-টবি মাথায় ছিল না ওদের। স্বপ্ন দেখত, টাকা হলে বেশ সুন্দর ছিমছাম বাড়ি হবে ওদের একটা। সামনে ফুলের বাগান থাকবে আর পিছনে একটু তরি-তরকারির বাগান। আর দুখানা বড় ঘর থাকবে বাইরের দিকে। তার একটা হবে দীপুর ক্লাস ঘর। ছেলেরা আসবে, পড়বে। অন্যটা হবে নূপুরের নাচ-গান শেখানোর ঘর। মেয়েরা আসবে। নাচ শিখবে, গান শিখবে।

দীপুর পিঠ সজোরে চাপড়ে লোকানন্দ বড়ুয়া বলে উঠেছে, ওয়াণ্ডারফুল।

বেলা এগারোটার মধ্যে খেয়েদেয়ে ওদের নিয়ে ট্যাকসি হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর সোজা চৌরঙ্গীর এক বিরাট ব্যাঙ্কের সামনে ট্যাকসি থেমেছে। ওদের নিয়ে লোকানন্দ বড়ুয়া ব্যাঙ্কে ঢুকেছে। একেবারে ম্যানেজারের ঘরে।

এক ঘণ্টার মধ্যে যে-কাণ্ড হয়ে গেল, নূপুর আর দীপু সরকার দুজনেই থ। হাতে নিজেদের নামের পাস বইটা দেখেও বিশ্বাস করবে কি করবে জানে না। লোকানন্দ বড়ুয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা ওদের দুজনের নামে জমা পড়েছে।

লোকানন্দ বড়ুয়া তর্জনী তুলে দীপুকে বলেছে, সব তোমাদের নয় কিন্তু। এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা নূপুরের বাবা-মায়ের চিকিৎসার জন্য থাকল মনে থাকে যেন।

আবার ট্যাকসি হাঁকিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে ওদের। তারপর ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দেড়েক থেকে, হৈ-চৈ করে চলে গেছে। তার আগে খসখস করে একটা কাগজে কি লিখে খামে পুরে সেটা নূপুরের হাতে দিয়ে বলেছে, এটা তোমাদের লেখককে দিয়ে দিও।

সে চলে যাবার ঘণ্টা দুই আড়াই বাদে নূপুরের কেমন খটকা লাগল। কেন বা কি সেটা জানে না। দীপুকে পাঠালো বিদিশায় ফোন করতে — লোকানন্দ বড়ুয়াকে বলতে, সন্ধ্যায় তারা যাচ্ছে— তাকে না দেখে নূপুর থাকতে পারছে না।

দীপু খবর নিয়ে এলো, হোটেল থেকে ফোনে তাকে জানানো হয়েছে, খানিক আগে ডকটর লোকানন্দ বড়ুয়া হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন—কোথায় গেছেন তারা জানে না।

নূপুর কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই খামটা সোমেনবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

প্রিয় লেখক,

আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার তিনবারের কনফেশন ব্যর্থ হয়েছে। আশা করছি এবারে হবে না। দোষে-গুণে আমি যা, ঠিক তাই নিয়েই যেন সকলের বিচারের সামনে দাঁড়াতে পারি। আমি আবার বিশ্বাস করি, পাপ স্বীকারের সঙ্গে অবধারিত ক্ষমার যোগ, বৃহৎ শান্তির যোগ। এখন আমার সামনে আবার কর্মফুলি। আবার সমুদ্র। গুড বাই মিস্টার অথর।

—লোকানন্দ বড়ুয়া

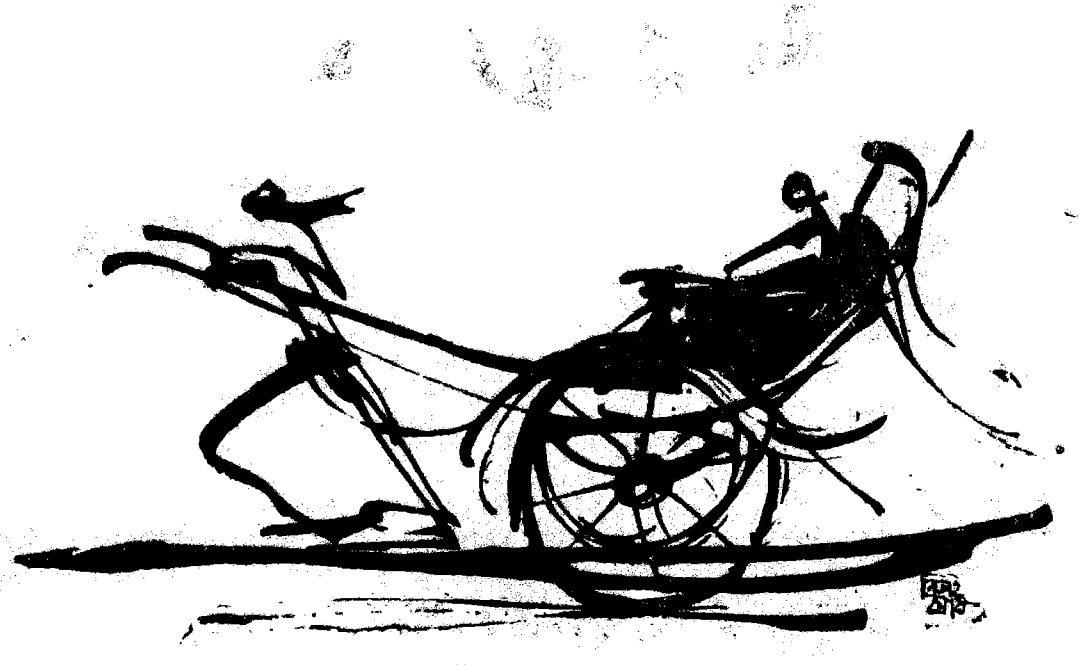

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনকে ঠিক সাক্ষাৎকার পর্যায়ে ফেলা যায় না। সাক্ষাৎকার বলতে বোঝায় আগে দেখি নি বা চিনতাম না এমন অবস্থায় দেখা হয়ে গেল। অনেক ক্ষেত্রে কতকটা আকস্মিক-ভাবে। চেনা-শোনার স্থায়িত্ব যেখানে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার একে বলা উচিত নয়। তবু যে বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধকে এই পর্যায়ে ফেললাম তার কারণ একটা লেখার জন্য একটা পর্যায় নির্ধারণ করা যায় না।

আমি কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে জিলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে যখন সেখানে আসি বসু মহাশয় প্রতিষ্ঠানটির হেড মাস্টার। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ, যুবক বলাই উচিত কিন্তু চরিত্রে ও বুদ্ধিতে যে শ্রেষ্ঠত্ব দেখা দিয়েছিল তার ফলে বয়সের তুলনায় তাঁকে বড় মনে হতো। মাঝ বয়সে তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী তিনি। আগেই তাঁর নাম খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য জানা ছিল। কলকাতার বন্ধুরা বলেছিল যাচ্ছ যাও বাঘের মুখ থেকে ফিরলে সৌভাগ্য বলে জেনো। তাই খুব ভয়ে ভয়ে স্কুলে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে প্রণাম করলাম। আমার চেয়ে তিনি দশ বছরের বড়, প্রণাম করলে করতে পারি। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, এ কি কবস ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে কায়স্থকে প্রণাম করস তায় আবার ব্রহ্মজ্ঞানী। আমি বল্লাম যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তাঁর চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ আবার কে। বাস, এই একটি উত্তরেই তাঁর মন জয় করে নিলাম। তিনি পিঠ চাপড়ে বললেন, বোস বোস, বেশ বলেছ, আর সঙ্গে সঙ্গে হাসি। সে কি হাসি। শুনেছি আগে ঐ হাসির ধমকে চাপরাশি বেয়ারা ছুটে আসতো। এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

তারপরে বাসা নিয়েছ কোথায়, মানে উঠেছ কোথায়?

আজ্ঞে কোথাও উঠি নি, একেবারে ধুলো পায়ে রাজদর্শন করতে এসেছি।

শুধু রাজ নয়, রাজ এবং নারায়ণ এবং বন্ধু। তা দর্শন তো হল, বাসা পরে খুঁজে নিয়ো আপাততঃ রাজপ্রাসাদে থাকো, ভয় নেই ব্রহ্মজ্ঞানীর রান্না খেতে হবে না, বাসায় বিশুদ্ধ পাচক ব্রাহ্মণ আছে, তোমার মতো এমন অনেকেই মাঝে মাঝে আসেন কিনা। যাও আমার বেয়ারার সঙ্গে বাসায় গিয়ে স্নানাহার করে বিশ্রাম করো গে, আমি তোমাকে খাতায় হাজির বলে ধরে নেব।

এই প্রথম দর্শন ও কথোপকথন। একে কি সাক্ষাৎকার বলে ধরা যায়। যখন সাক্ষাৎকার বলে বর্ণনা করেছি বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মধুসূদনের সঙ্গে।

কিন্তু এই সামান্য ক' মিনিটেই তিনি আমার মন জয় করে নিলেন।

তারপরে যতদিন তিনি সেখানে ছিলেন আমি ছিলাম তাঁর ঘোড়া। সহকর্মীরা বলাবলি করতো সৃষ্টিধরের ব্রহ্মজ্ঞানী হতে আর বড় দেরী নাই। আমি বলতাম সে তো ভাগ্যের কথা। রাজনারায়ণবাবু অসুস্থতার জন্যে চাকুরি থেকে বিদায় নেবার পরেও কিছু দিন সেখানে ছিলাম তবে বেশী দিন নয়। সংসার করি নি, কোন দায়িত্ব ছিল না, বিশেষ আমার মধ্যে ছিল এক ভবঘুরে, বেশী দিন কোথাও সে টিঁকে থাকতে দিত না। সত্যি কথা বলতে কি আমি ছিলাম অদৃষ্টের হাতের বড়ে, যে দিকে চালাতো সে দিকে চলতাম।

কিন্তু এ কি করছি, আমি কি বসু মহাশয়ের জীবনী লিখছি না আমার আত্মবৃত্তান্ত লিখছি। লিখতে বসেছি একটি সাক্ষাৎকার, তবে এত ধান ভানতে শিবের গীত কেন। অনেক হয়েছে এবারে নিজেকে সংহত করা যাক একটি ঘটনার মধ্যে। তখন সিপাহী বিদ্রোহের সময়। এখন (১৯০৫ সালে) শুনতে পাই সিপাহী বিদ্রোহ নাকি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। এখনকার দৃষ্টিতে হয় তো সেই রকম প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তখনকার দৃষ্টিতে সিপাহী বিদ্রোহ কি রকম উপলব্ধি হয়েছিল তাই আজ বলবো।

কিন্তু তার আগে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, বসু মহাশয় সরকারী চাকুরি করলেও সরকার ঘেঁষা মনোভাব তাঁর ছিল না। দেশের প্রতি মমতা ও দেশের পরাধীনতার গ্লানি তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতেন। কাজেই সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপারটিকে কি দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন তার গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য, আর যাই হোক এটা তাঁর কাছে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে যে মনে হয় নি নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে তা বুঝতে পারা যাবে।

মীরাট, দিল্লীতে, লখনৌ শহরে কানপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে খবর এসে পৌঁছায়। সব খবর একদিনে আসে না, পর পর আসে আর তাতেই বেশী করে ভয় ধরিয়ে দেয়। স্কুলের বিশ্রাম কালে শিক্ষকরা সবাই গিয়ে জোটে হেড মাস্টারের ঘরে—আজকার খবর কি স্যার? তিনি বলেন, আজ তো নানাসাহেব বিদ্রোহে যোগ দিয়েছেন বলে লিখছে। বলেন কি স্যার? দিল্লীর বাদশা নাকি আবার স্বহস্তে শাসনভার নিয়েছেন? গুজব তো সেই রকম। আমাদের বাংলাদেশেও কি গোলমাল হবে নাকি? মনে তো হয় না। কেন স্যার? আরে বাঙালী যে আজ ৪০।৫০ বছর ধরে ইংরাজি শিক্ষা পেয়েছে। এই রকম উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে চলতে বসু মহাশয় মনে করিয়ে দেন তোমরা সবাই প্যান্টলুনের তলে ধুতি পরে আসছ তো। সিপাহীদের চোখে প্যান্টলুন পরা লোক মানেই সাহেব, গায়ের চামড়ার রং যেমনি হোক। শহরে আবার এক পল্টন রাজপুত সিপাহি আছে।

ফটো কার্তিকচন্দ্র দে বিশ্বাস

হেড পণ্ডিতমশায় বলেন, স্যার খবর শুনলাম কালকে কর্নেল সাহেব সিপাহিদের সকলকে জমায়েৎ করে একখানা থালার উপরে ধানদূর্বা রেখে স্পর্শ করিয়ে শপথ করিয়েছে তারা বিদ্রোহ করবে না। তবে কি জানেন স্যার—এ-সব লোক-দেখানো শপথের কতটা মূল্য জানি না।

সেকেণ্ড মাস্টার স্থানীয় লোক, তিনি অনেক খবর রাখেন। বললেন—স্যার, আসল ভরসা কর্নেল সাহেবের উপপত্নী। সকলে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো কেন? তিনি হলেন রাজপুত মহিলা! রাজপুত সিপাহীরা তাঁকে বড় মান্য করে; তাঁর কথাতেই নাকি তারা শান্ত আছে। হেডমাস্টার বললেন, সে যাই হোক আপনারা ধুতি পরে আসতে ভুলবেন না যেন, সঙ্কটকালে ঐ ধুতিই শেষ ভরসা। তারপরে তিনি হেড-পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বলেন—গলায় উপবীত আছে তো! আপনার গায়ে কেউ হাত তুলবে না। হেডপণ্ডিত ভীতভাবে বলেন, স্যার এ আবার কি হাঙ্গামা হল। বেশ চাকরি-বাকরি করছিলাম, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ছিলাম এক রকম। আরে যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন, এ ঝড়ের আগুন নিভতে কতক্ষণ।

নানারকম গুজব রটে। সাহেবরা ধুতি-চাদর পরা শিখছে, সেই সঙ্গে শিখছে চাপরাশি আরদালির কাছে বাংলা বুলি।

কংসাবতীর ঘাটে বড় বড় পাল্সী বেঁধে রাখা হয়েছে, নদীতে একটু জল পড়লেই সঙ্কটকালে নৌকা খুলে দিয়ে সোজা পাড়ি দেবে কলকাতার দিকে। বিলিতি কাপড়ের এজেন্ট এক সাহেব কয়েক দিন আগে এখানে এসেছিল, পরনে ধুতি-চাদর আর তার মাথায় নাকি প্রমাণ সাইজের এক শিখা। কয়েকদিন আগে মেদিনীপুরে জমিদারি কোম্পানীর কাছারীতে বোমা ফাটিয়েছিল, অমনি চারদিকে রব উঠে গেল, এসেছে—এসেছে

পালাও পালাও। সাহেবরা তখন খানা খেতে বসেছে—তাদের হাত থেকে ছুরি-কাঁটা ঝন-ঝন করে পড়ে গেল। শহর-শুদ্ধ লোক তটস্থ। ম্যাজিস্ট্রেট ব্রডহার্স্ট সাহসী লোক, সারা রাত বগি গাড়ী চালিয়ে শহর পাহারা দিয়ে বেড়াতেন।

এমন সময় একদিন স্কুলের হেড কেরানী মাইতিবাবু এসে হেড মাষ্টারকে বললো—স্যার শুনে এলাম সিপাহিরা বাজারে টাকা বদলে মোহর কিনছে। অনেকের মতে এটা বিদ্রোহের আসন্ন লক্ষণ, মোহর বহন করে নেওয়া সহজ। খবর শুনে সকলেরই মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হল। এমন সময় তখন বেলা বারোটা হবে, স্কুল যথারীতি চলছে—বাজারের দিকে বিষম গণ্ডগোল শোনা গেল, সঙ্গে ব্যাণ্ডের বাজনা আর সিপাহিদের কুচকাওয়াজের রব। আর সন্দেহ নাই। সিপাহিরা শহর আক্রমণ করতে আসছে। মুহূর্তমধ্যে স্কুল ভেঙ্গে গেল। পালাও পালাও। বিপদকালে পালাবার জন্যে আমরা একটা পথ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম। ঠিক বিপদকালেই কারো মনে পড়ল না পথটা। ছেলেরা বেঞ্চির নীচে, টুলের নীচে, জলের জালার আড়ালে লুকোলো। ততক্ষণে সকলেরই প্যাণ্টলুন কোট অন্তর্হিত, ধুতি শার্ট প্রকট। হেডপণ্ডিত মশায়ের মোটা পৈতের গোছা শার্টের উপরে দণ্ডায়মান। একজন চীৎকার করে উঠলো—সরাও , সরাও। আরে কি সরাবে? ইংরাজি বইগুলোর উপরে সিপাহিদের বড় রাগ। হেডপণ্ডিত খানকতক সংস্কৃত বই এমনভাবে ছড়িয়ে রাখলেন যাতে সহজেই চোখে পড়ে। একজন টীচার আমার কানে কানে বললেন—হেড স্যারকে রক্ষা করা কঠিন হবে। তিনি যে ভাইয়ের বিধবা বিবাহ দিয়েছেন সিপাহিরা জানে। আর শুনছিলাম, কলকাতায় সিপাহিরা বিদ্যাসাগরকে আটক করেছে।

এমন সময়ে একজন বেয়ারা ছুটে এসে খবর দিল জন্মাষ্টমীর মিছিলের আওয়াজ স্যার, কোন ভয় নাই। শুনবামাত্র মুহূর্তমধ্যে আমাদের ধুতি অন্তর্হিত ও প্যাণ্টলুন প্রকট হল। ছাত্ররা বেঞ্চির তলা থেকে বের হয়ে উপরে উপবিষ্ট হল, এবং আই মেট এ লেম ম্যান ইন দা লেন বিজাতীয় ভাষায় স্কুলগৃহ ধ্বনিত হল। ফিরে এলো আবার ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজ রাজত্বের উপরে প্রত্যয়।

এ আজ চল্লিশ বছরের কথা। ঘটনাকালে সকলেই ভয় পেয়েছিলাম। তার পরে অবশ্য ভুলে গিয়েছিলাম, মাঝে মাঝে যখন মনে পড়তো খুব একচোট হাসতাম। আমাদের আচরণ হাস্যকর ছাড়া আর কি। তবু হঠাৎ আজ চল্লিশ বছর পরে যে এত করে মনে পড়লো তার কারণ স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় এখন শিখেছি বিদ্রোহ—প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তখন সকলেরই কাছে ব্যাপারটা ছিল একটা অবাঞ্ছিত হাঙ্গামা, গাঁওয়ার সিপাহিদের কাণ্ড, কেউ ওর মধ্যে দেশপ্রেম দেখতে পায়নি—এমন কি পরবর্তী কাল যাকে 'জাতীয় ভাবের পিতামহ'—আখ্যা দিয়েছে তিনিও পাননি। কালাতারে কি দৃষ্টিভেদ। কিন্তু এজন্য তাঁর উপরে আমার শ্রদ্ধা এতটুকু কমেনি। এই ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে আমি গুরুতুল্য জ্ঞান করি। তিনি মেদিনীপুরের চাকুরি ছেড়ে দেবার কিছু পরেই আমিও চাকুরি ছেড়ে দি। এখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই, সংসার করিনি—সরকারী সামান্য পেন্সনে বেশ চলে যায়। যেখানে যাই কারো আতিথ্য গ্রহণ করি। রেল ভাড়া ছাড়া আর বড় খরচ নাই। এবারে কাশীতে গিয়ে ভাবলাম আর কেন গেরুয়া পরিধান করি না কেন, আর কিছু না হোক ধোবার খরচটা বাঁচবে। কিন্তু তার আগে একবার আনুষ্ঠানিক গঙ্গাস্নান আবশ্যক। দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে স্নান সেরে ওঠবার সময় শুনলাম, সেই পুণ্য প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণে একজন গান করছে—'মন না রাঙ্গায়ে যোগী রাঙ্গালো বসন।' তখনি মনে হল এ সংগীত তো আমার উদ্দেশ্যেই গীত, কই মন তো রাঙ্গানো হয়নি। গেরুয়া কাপড় পরা আর হল না।

তার পরদিন রওনা হলাম দেশের মুখে। ঝাঁসি ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই হঠাৎ মনে হল কাছেই তো দেওঘরে থাকেন আমার গুরুপ্রতিম রাজনারায়ণ। এত কাছে এসে তাঁকে উপেক্ষা করে যাওয়া অনুচিত, একবার সাক্ষাৎ করে যাই। তখনি নেমে ছোট লাইনের গাড়ীতে চাপলাম। কিন্তু তাঁর ঠিকানা তো জানি না। গাড়ীর মধ্যে এক পাণ্ডা-ঠাকুর ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে। তিনি হেসে বললেন, আরে বোসবাবুতো দোসরা বৈজনাথ আছেন। যাকে জিজ্ঞাসা করবেন—বাংলে দেবে তাঁর কুঠি। সত্যই তাই। দেওঘর ষ্টেশনে নেমে জিজ্ঞাসা করতে করতে অনায়াসে তাঁর বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। কেবল একটি আশঙ্কা ছিল মনের মধ্যে—এত কাল পরে কি আমাকে চিনতে পারবেন। বাড়ীর কাছে গিয়ে দেখি কয়েকজন লোক, পোষাক দেখে বুঝলাম বাঙ্গালী অবাঙ্গালী দুই-ই আছে।

রাজনারায়ণ বাবু আছেন?

একজন ইঙ্গিতে বড় হলঘরটা দেখিয়ে দিলেন। কেউ বাধা না দেওয়ায় অনায়াসে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু এ কি! একখানি পালঙ্কের উপরে শয়ান আমার গুরুতুল্য সাধুপুরুষ, চক্ষু মোদিত—মুখমণ্ডলে অপূর্ব শান্তি। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল, মাথাটাও বোধকরি ঘুরে উঠেছিল, দুই হাতে শক্ত করে খাটের বাজু ধরে ফেললাম। কয়েক মিনিট তাঁর মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থেকে প্রণাম করে বেরিয়ে চলে এলাম। তখনো কেউ প্রশ্ন করলো না, খুব সম্ভব ভাবলো তাঁর অগণিত ভক্তের একজন হবে। ভাবলে মিথ্যা হতো না। আমি আর দাঁড়ালাম না। সোজা ষ্টেশনে এসে গাড়ীতে বসলাম। কি ভাবছিলাম? কাশীতে গঙ্গাতীরে শোনা সেই গানটির সার্থকতা ভাবছিলাম, মন রাঙ্গানো হয়েছে বলে আর তাঁর বসন রাঙ্গাবার প্রয়োজন হয়নি। গাড়ী চলতে শুরু করলো। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো, আর মনের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে রইলো তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার।

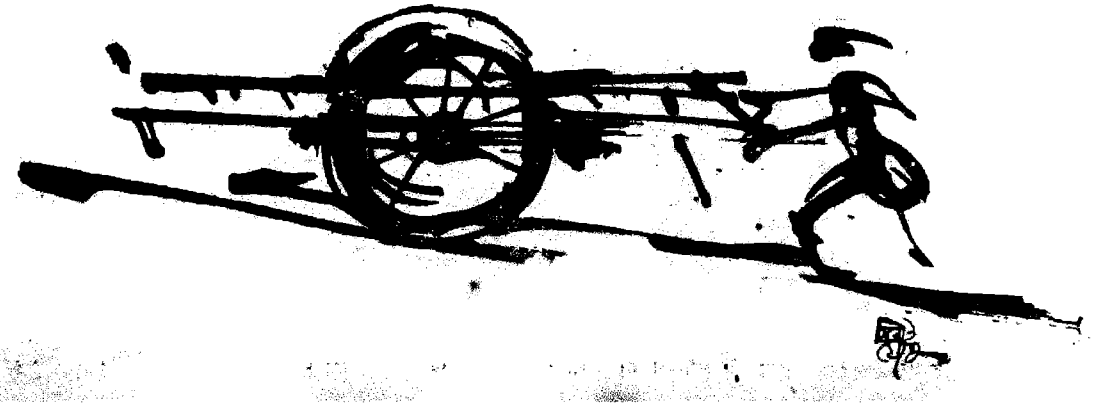

ফুলকিয়ার ডাক

প্রফুল্ল রায়

উঁচু টিলাটার মাথায় উঠতেই ডাকটা শুনতে পেল ধর্মু, 'হেই রুখো, রুখো, রুখ যা-ও-ও-ও-ও—'

গলার স্বরটা খুবই চেনা। ধর্মু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই ফুলকিয়াকে দেখতে পেল।

টিলাটার ঢালে তেমন গাছপালা নেই। কাঁটাকারির কিছু ঝাড় আর বেঁটে বেঁটে ত্রিভঙ্গ চেহারার কয়েকটা সীসম গাছ এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সে-সবের ফাঁক দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে উঠে আসছিল ফুলকিয়া।

এখন দুপুরও না, আবার বিকেলও না। সময়টা দুইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় থমকে রয়েছে।

গরম কাল শেষ হয়ে আসছে। আর দশ-পনের দিনের মধ্যেই বর্ষা নেমে যাবে। এখানে—মধ্যপ্রদেশের এই বস্তার জেলার আকাশে এর ভেতরেই টুকরো টুকরো ছন্নছাড়া মেঘ হানা দিতে শুরু করেছে। বর্ষার আগে আগে এই সময়টায় রোদে তাত নেই, তার গায়ে ঝলসে-ওঠা ছুরির ধারও নেই। তখন-কার রোদ বাসি হলুদের মতো ম্যাড়-মেড়ে।

ধর্মু যে টিলাটার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে তার পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড একটা গাঁ চোখে পড়ে, তার নাম তিরুকোট। ফুলকিয়ারা তিরুকোটে থাকে। ধর্মু অবশ্য ওখানে থাকে না, তার গাঁ এখান থেকে চার মাইল উত্তরে বরবোলি তালুকে।

টিলাটার পুব দিকে আধ মাইল হেঁটে গেলে বস্তার জেলার রিজার্ভ ফরেস্ট বা সংরক্ষিত বনের সীমানা শুরু হয়েছে। ছোট-বড় এবং মাঝারি নানা মাপের অগুনতি পাহাড়ের গায়ে বাস্তারের এই রিজার্ভ ফরেস্ট। বন-ভূমির মাথায় ছোঁড়া ছোঁড়া রঙীন কাগজের টুকরোর মতো নানা রঙের হাজার হাজার পাখি উড়ছে।

আকাশে মেঘ মরা রোদ বা ঝাঁক ঝাঁক পাখি কিংবা দূরের পাহাড় আর ফরেস্টের গাঢ় সবুজ রঙের ঘন জঙ্গল কোন দিকেই লক্ষ্য নেই ধর্মুর। একদৃষ্টে, প্রায় পলকহীন ফুলকিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে সে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুকের ভেতর পাহাড়ী নদীর দুরন্ত ঢলের মতো কিছু একটা বয়ে যেতে লাগল।

ধর্মুর পুরো নাম ধর্মু সিং, জাতে তারা রাজপুত ক্ষত্রিয়। কয়েক পুরুষ ধরে ধর্মুরা মধ্যপ্রদেশ বস্তার জেলায় রয়েছে। অনেক কাল এখানে থাকতে থাকতে তাদের চাল-চলন আচার-ব্যবহার এখানকার মতোই হয়ে গেছে।

ধর্মুর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। লম্বা প্রায় ছ ফুট। সরু কোমর, চ্যাটালো বুক, শক্ত চওড়া কাঁধ। হাত দুটো জানু ছাপিয়ে নেমে গেছে। এক পলক তাকিয়েই টের পাওয়া যায় সে একজন দুর্দান্ত বলশালী জোয়ান।

ধর্মুর মুখ লম্বাটে। খাড়া নাকটা সটান তার কপাল থেকে নেমে এসেছে, তার দু-ধারে ঘন-পালকে-ঘেরা চোখ। ঝাঁকড়া চুল অযত্নে আর অবহেলায় পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। গালে চার পাঁচ দিনের চোখা দাড়ি। গায়ের রঙ পোড়া রোজের মতো। রোদে পুড়ে জলে ভিজে তার চামড়া টান হয়ে গেছে। তবু সব মিলিয়ে সে দারুণ আকর্ষণীয়।

ধর্মুর পরনে এই মুহূর্তে ময়লা চাপা চুস্ত আর ঢোলা খাকী কুর্তা। পিঠের দিকে কুর্তার তলায় একটা দেশী বন্দুক বাঁধা রয়েছে। বন্দুকটার মতো বুকের দিকের কুর্তার তলায় টোটার মালাও বাঁধা।

ধর্মু একজন 'পোচার'। তার কাজ হল বে-আইনিভাবে বাস্তার জেলার সংরক্ষিত বনে ঢুকে লুকিয়ে-চুরিয়ে জন্তু-জানোয়ার মারা। তারপর সেই সব জন্তুর ছাল-দাঁত-নখ ভূপাল শহরে গিয়ে সাহেবদের কাছে বেচে আসা। বরবোলি তালুকে তাদের অল্প কিছু জমিজমা আছে। কিন্তু বিরাট সংসার—বুড়ো মা-বাপ ছোট ছোট তিন-চারটে ভাই-বোন। অথচ রোজগার করার লোক বলতে ধর্মু ছাড়া আর কেউ নেই। এদিকে সামান্য দু-চার বিঘে জমিতে

যে গেঁহু ফলে তাতে সবার দু মাসের খোরাকও হয় না। কাজেই চুরি করে রিজার্ভ ফরেস্টে ঢুকে জন্তু-জানোয়ার না মারতে পারলে উপোষ অবধারিত। মাসে একটা চিতল হরিণ কি বাঘ মারতে পারলেই ধর্মুর কোনরকমে চলে যায়। কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। অনেক সময় দিনের পর দিন হানা দিয়েও একটা চুহা বা খরগোশ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ফরেস্ট গার্ডদের হাতে যে কোন সময় ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। এখন যে নতুন রেঞ্জার সাহেব এসেছে সে দারুণ কড়া অফসর (অফিসার)। গোটা সংরক্ষিত বনটা যেন তার বাপের সম্পত্তি। বাঘ-ভাল্লুক মারা তো দূরের কথা, গাছের একটা পাতা খসালে আর তা যদি তার চোখে পড়ে গুলি মেরে মাথার চাঁদি উড়িয়ে দেবে।

যাই হোক আজও রিজার্ভ ফরেস্টে যাচ্ছিল ধর্মু। সাত দিনের মধ্যে অন্তত দুটো বাঘ তাকে মারতেই হবে।

উপোষ থেকে বাঁচবার জন্য এবার জংগলে হানা দিচ্ছে না ধর্মু। ঘরে যে গেঁহু আর মাইলো আছে তাতে একটা মাস চোখ বুজে চলে যাবে। তবু সে যে রিজার্ভ ফরেস্টে যাচ্ছে তার একমাত্র কারণ ফুলকিয়া। কিন্তু কারণ-টার কথা পরে।

বরবোলি তালুক থেকে রিজার্ভ ফরেস্টে যেতে হলে তিরুকোট গাঁয়ের পাশের এই টিলাটা পেরুতে হয়। ফরেস্টে যাবার এটাই একমাত্র রাস্তা। ফি মাসে কম করে আট-দশবার জংগলে যায় ধর্মু। আর যখনই যায় ফুলকিয়া তাকে ঠিক ঠিক দেখে ফেলে। মেয়েটা যেন দিন-রাত হাজারটা চোখ মেলে তিরুকোট গাঁয়ে বসে থাকে। ধর্মুকে একবার দেখলেই হল, দৌড়ে কাছে চলে আসে।

...ধর্মু তাকিয়েই ছিল, তাকিয়েই ছিল, ফুলকিয়াকে দেখতে দেখতে তার বুকে কেমন ঢল বয়ে যাচ্ছিল চোখ দুটো তেমনি খুশিতে ঝকমকিয়ে উঠল। সেই সংগে দুঃখের পাতলা একটু ছায়াও মিশে আছে।

একটু পরেই টিলা বেয়ে ওপরে উঠে এল ফুলকিয়া। তার বয়স সতের-আঠারো। গায়ের রং পাকা গমের মতো। পাতলা কোমর, যমজ পাহাড়ের মতো তার বুক, কোমরের তলায় বিশাল উপত্যকা।

পালের মতো মুখ ফুলকিয়ার, সরু থুতনি। নাকটা মোটার ধার ঘেঁষে। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঢেউ। চুলগুলো জারিওলা রঙিন ফিতে দিয়ে একবেণী করে বেঁধে পিঠের উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। খঞ্জন পাখির চোখের মতো তার চোখ দুটো ছটফটে।

ফুলকিয়ার পরনে কাঁচ আর পুঁতি বসানো রং-চংয়ে ঘাঘরা আর ঢোলা কামিজ। হাতে রুপোর কাঙনা, গলায় রুপোর জবরজঙ হার আর কানে জালিকাটা প্রকান্ড ঝুমকো।

এতটা চড়াই বেয়ে ওপরে উঠে আসার জন্য ফুলকিয়া হাঁপিয়ে গিয়ে-ছিল, জোরে জোরে এবার শ্বাস পড়ল তার। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, ঘাড়ে-কপালে-গলায় দানা দানা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের দেহাতী হিন্দীতে ফুলকিয়া বলল, 'কী ব্যবস্থা করলে? আর কতদিন তিরু-কোটে পড়ে থাকব?'

ধর্মু হাসল। তারপর ফুলকিয়ার দিকে ঝুঁকে বলল, আর বেশি দিন পড়ে থাকতে হবে না। সাত দিনের ভেতর দুটো বাঘ যেভাবে হোক মারবই মারব। ভূপালে সাহিবরা রয়েছে, তাদের কাছে বাঘের ছাল-নখটখ নিয়ে গেলে দু হাজার রুপেয়া মিলবে। ক্যাশ টু থাউজেন্ড রুপীজ। তখন জরুর তোকে আমার কাছে নিয়ে যাব।' ভূপালে সত্যিকারের সাদা চামড়ার সাহেবদের কাছে জন্তু-জানোয়ারের ছাল-টাল বেচতে গিয়ে দু-চারটে ইংরেজি বুলি শিখে ফেলেছে ধর্মু। এই নিয়ে তার বেশ গর্বও রয়েছে। সেটা সে চেপে রাখে না।

ভারী গলায় ফুলকিয়া বলল, দেখা হলেই তো তুমি আমাকে বাঘ-ভাল্লুক দেখাও। এই করে করে পাঁচ বরিষ (বছর) কাটিয়ে দিলে।'

এবার আর আমার কথার নড়চড় হবে না দেখে নিস।

'সব বারই তো ওই এক কথা বলছ। আমি বিশোয়াস (বিশ্বাস) করি না।'

'এবারটা বিশোয়াস কর। শিউজী কসম—'

ফুলকিয়া ধর্মুর বিয়ে-করা বউ। দশ বছর আগে তার বয়স যখন পনের-ষোল আর ফুলকিয়ার সাত-আট তখন তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিন রাত শ্বশুর-বাড়িতে থেকে তিরুকোটে বাপের কাছে চলে গিয়েছিল ফুলকিয়া। ওদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিবাহিতা মেয়ে যুবতী হবার পর আবার স্বামীর কাছে ফিরে যায়। যদ্দিন না সে যুবতী হচ্ছে তাকে বাপের ঘরে থাকতে হয়।

পাঁচ বছর আগে যুবতী হয়েছে ফুলকিয়া। তার বাপ সে খবরটা ধর্মুদের পাঠিয়েও দিয়েছে। এই খবর পাবার পর ধর্মুদের যা করা উচিত, ছিল তা হল ফুলকিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসা।

এই সময়টা যে যার সাধ্যমত শ্বশুর-বাড়ির লোকদের নানা রকম উপহার-টুপহার আর প্রণামী দেয়। তারপর বউকে দামী শাড়ি এবং গয়নায় সাজিয়ে কেউ মখমলে-মোড়া ঢুলিতে, কেউ হাতীর পিঠে চড়িয়ে বাজনা-টাজনা বাজিয়ে পতাকারি (আতস বাজি) ফাটাতে ফাটাতে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়।

কিন্তু ধর্মুরা ফুলকিয়াকে নিয়ে যেতে পারে নি। তার কারণ ফুলকিয়া খুবই বড় ঘরের মেয়ে। তার বাপ তিরুকোট তালুকের মুখিয়া অর্থাৎ এক নম্বর মানুষ। লোকটার যেমন অঢেল পয়সা তেমনি প্রচন্ড দাপট। মাইলের পর মাইল জুড়ে তার ক্ষেতি-বাড়ি। আশে--পাশের বিশ পঞ্চাশটা তালুকের মধ্যে একমাত্র তারই পাকা তিনতলা হাবেলি রয়েছে। আর আছে দুশো তাগড়া মোষ, পঞ্চাশ-ষাটটা বয়েল গাড়ি, গোটা পনের গাদা বন্দুক। ধান আর গেঁহুর গোলা যে কত, গুনে শেষ করা যায় না। দশ-বিশজন বাদ দিলে তিরুকোট তালুকের সব মেয়ে-পুরুষই তার জমিতে পেটে-ভাতায় প্রায় সারা বছর খেটে যায়।

অবস্থার এত ফারাক তবু ফুল-কিয়ার বাপ গুলিক সিং যে ধর্মুর সংগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল তার একটু জোরালো হেতু আছে। গুলিক সিং ভয়ানক গোঁড়া রাজপুত ক্ষত্রিয়, নিজের জাত ছাড়া অন্য জাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না। অথচ আশে-পাশের তিরিশ-চল্লিশটা তালুকের মধ্যে ধর্মুরা ছাড়া আর কোন রাজপুত ক্ষত্রিয় নেই। অবশ্য রায়পুর শহর বা দুর্গ কিংবা জগদলপুরের দিকে খোঁজ করলে নিশ্চয়ই স্বজাতের ভালো ছেলেটেলে পাওয়া যেত। কিন্তু গুলিক সিং মেয়েকে দারুণ ভালবাসে, ফুলকিয়াকে বিয়ে দিয়ে সে বেশি দূরে পাঠাতে চায় না; কাছাকাছি রাখতে চায় যাতে ইচ্ছা করলেই দেখে আসতে পারে। তা ছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে, ধর্মুরা গরীব। তাই তার ইচ্ছা ছিল বিয়ের পর দামাদকে (জামাইকে) নিজের কাছে এনে ঘর-জামাই করে রাখবে। একান্তই যদি না হয় কিছু জমিজমা ভয়েস-বয়েল দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। কিন্তু তার এই শেষ হিসেব দুটো মেলে নি। গরীব হলেও ধর্মুর আত্মসম্মান জ্ঞানটা খুবই বেশি। ঘর জামাই হওয়ার চাইতে বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করাটা তার পক্ষে অনেক সোজা কাজ। আর যদি দাঁড়াতেই হয় নিজের ক্ষমতায় দাঁড়াবে; শ্বশুরের করুণার ওপর নির্ভর করে নয়।

ফুলকিয়া যুবতী হবার পরও ধর্মু যে পাঁচটা বছর চুপচাপ আছে সেটা এই জন্য। মনে মনে তার জেদ রীতিমত জাঁকজমক করেই সে ফুলকিয়াকে নিজের ঘরে দিয়ে আসবে। গুলিক সিং যেন নাক কুঁচকে বলতে না পারে, এমন ঘরে মেয়ে দিয়েছি যে ভিখিরির মতো নিয়ে গেল।

জেদ থাকা এক কথা আর সেটা কাজে করে দেখানো আরেক কথা। ধর্মু পাঁচ বছরের মধ্যে এমন টাকা জমাতে পারে নি যাতে সবার চোখে তাক লাগিয়ে বউকে ঘরে নিয়ে আসতে পারে।

এদিকে ফুলকিয়া কিন্তু আশ্চর্য হয়ে উঠেছে। বছর তিন চারেক আগে ধর্মু যখন 'পোচারের' কাজ শুরু করল তখন থেকে প্রায়ই ফরেস্টে যাবার জন্য তিরকোটে আসছে। প্রথম প্রথম তাকে দেখে কাছে ঘেঁষত না ফুলকিয়া; দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসত। তারপর আস্তে আস্তে তার লজ্জা কাটল। ধর্মুকে দেখতে পেলেই এখন সে ছুটে আসে।

ফুলকিয়া বলল আগেও তো তুমি কতবার শিউজীর কসম খেয়েছ।

ধর্মু হকচকিয়ে গেল। কথাটা মিথ্যে বলেনি ফুলকিয়া। খুব ক্লান্তভাবে তার কাঁধে আঙুল রেখে ধর্মু বলল, ঠিক আছে, এই তোকে ছুঁয়ে কসম খাচ্ছি, এবার নিয়ে যাব, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব।'

ফুলকিয়া বলল, সচ্?'

'তোকে ছুঁয়ে কুটে বলতে পারি!'

'তোআমোল হচ্ছে?'

'বিলকুল না।'

ধর্মুর বুকের কাছে ঘন হয়ে এল ফুলকিয়া। একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে আধফোটা গলায় বলল, 'আমার আর ভালো লাগছে না।'

বুকের কাছে ফুলকিয়ার নিঃশ্বাস পড়ছে। শিরায় শিরায় রক্ত তোলপাড় করে ঢেউ উঠতে লাগল ধর্মুর। সে কী বলবে ভেবে পেল না।

ফুলকিয়া আবার বলল, 'সব মেয়েই সাদির পর সমুরালে (শ্বশুরবাড়ি) গিয়ে থাকে। আমিই শুধু বাপের ঘরে পড়ে আছি।' তার গলার স্বর ধীরে ধীরে বুজে এল।

ধর্মু ফুলকিয়ার কানের কাছে মুখ এনে গাঢ় গলায় বলল, আর মোটে কটা দিন তো—'

'না—'

কী না!

'না—' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল ফুলকিয়া।

আদরের গলায় ধর্মু জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তোর?'

'আজই আমাকে নিয়ে চল।'

'এভাবে নিয়ে যাওয়া যায় নাকি?'

'আমি তোমার কোন কথা শুনব না। খালি বাহানা, বাহানা আর বাহানা।' বলেই ধর্মুর বুকের ভেতর দুরন্ত স্রোতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলকিয়া। তারপর অদ্ভুত এক আবেগে তার বুকে গাল আর ঠোঁট ঘষতে লাগল।

আগে আর কখনও এভাবে ধর্মুকে জড়িয়ে ধরেনি ফুলকিয়া। তার এরকম অস্থিরতাও দেখা যায়নি।

ফুলকিয়ার নরম উষ্ণ ঠোঁট আর গাল বুকের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ক্রমাগত আশ্চর্য এক আকুলতা নিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। পাহাড়চূড়ার মতো তার অটুট বুক পাঁজরের কাছে ধীরে ধীরে বিঁধে যাচ্ছে। ধর্মুর মনে হতে লাগল, তার শ্বাসপ্রশ্বাস এবার বন্ধ হয়ে যাবে। শরীরের সব শক্তি জমাট ঘুমিয়ে আসছিল, মাথার ভেতরটা প্রচণ্ড নেশার ঘোরে যেন ঝিম ঝিম করে চলেছে। নিজের অজান্তেই কখন যে ধর্মু দু-হাতে ফুলকিয়াকে জড়িয়ে ধরেছে সে নিজেই জানে না।

অনেকক্ষণ পর ধর্মু বলল, 'এবার ছাড়—'

ফুলকিয়া ধর্মুকে ছাড়ল না। তার বুকের ভেতর গোটা শরীরটাকে গুঁজে রেখে গলার ভেতর আদুরে মেয়েপায়রার মতো শব্দ করল, 'না—'

'ছাড়—'

'না।'

বিকেল হয়ে এল। এরপর জঙ্গলে ঢুকলে অন্ধেরাতে কিছু দেখতে পাব না। আর জানোয়ার মারতে না পারলে তোকে তোর বাপের ঘর থেকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে দেরি হয়ে যাবে।

তবু আরো কিছুক্ষণ ফুলকিয়া ধর্মুর বুকের সঙ্গে মিশে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলল, 'আমি আর একেলী থাকতে পারব না।'

ধর্মু বলল, 'একেলী কেন? তোর বাপের ঘরে কত লোকজন—'

'তুমি তো কাছে নেই। যত লোকজন থাক, একেলী লাগে না?'

গভীর গলায় ধর্মু বলল, 'হ্যাঁ, লাগে। আর কটা দিন। স্রিফ কটা দিন—' তাড়াতাড়ি ফুলকিয়ার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ধর্মু। তারপর উঠে বলল, যাই—'

দু চোখে আশ্চর্য যাদু নিয়ে তাকিয়ে রইল ফুলকিয়া। সম্মোহিতের মতো তাকে দেখতে দেখতে ফিসফিসিয়ে আবার বলল ধর্মু, 'যাই—'

'আচ্ছা। লেকেন মনে রেখো সাত রোজ দেখব। তার ভেতর যদি আমাকে না নিয়ে যাও গলায় রাশি দেব।'

ফুলকিয়ার গালে মুখ ঠেকিয়ে ধর্মু বলল, 'সাতদিনের মধ্যেই তোকে নিয়ে যাব। তুই ঘরে যা। আমি চলি।' বলে আর দাঁড়াল না; টিলার মাথা থেকে পুবদিকের ঢাল বেয়ে নিচে নামতে লাগল। বিকেলের ছায়া ঘন হবার আগেই তাকে রিজার্ভ ফরেস্টে পৌঁছতে হবে।

অনেক দূরে, বনের সীমানার কাছাকাছি গিয়ে ধর্মু একবার পেছন ফিরল। দেখল, ফুলকিয়া তখনও স্বপ্নে দেখা কোন ছবির মতো টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর হৃৎপিণ্ড সমুদ্রে ঝড় ভেঙে পড়ার মতো দুলতে লাগল। মনে মনে ধর্মু প্রতিজ্ঞা করে ফেলল আজ বাঘ না মেরে ফরেস্ট থেকে বেরুবে না। ফুলকিয়াকে সে কথা দিয়েছে সাত দিনের ভেতর নিজের কাছে নিয়ে যাবে।

এক সময় ফুলকিয়ার দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে আস্তে আস্তে ধর্মু বনভূমিতে ঢুকে গেল।

চারদিকে বিশাল বিশাল সব গাছ। অর্জুন কেঁদ গরাণ জারুল পিয়াশাল ইত্যাদি। জঙ্গলের মাথায় ছাতা ধরে আছে তারা। এই গাছগুলো যেন বনভূমির অলঙ্কার। এ ছাড়া রয়েছে নানা রকমের সব লতা—সোনাঙ্ক, তেলাকুচ, চাঁইড়। প্রত্যেকটা গাছকে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। আর আছে প্রচুর ছোট বড় ঝোপঝাড়।

জঙ্গলের মাথায় গাছের ডালপালা আর পাতা এত ঘন যে আকাশটা ভালো করে দেখা যায় না। তবে সে-সবের ফাঁক দিয়ে যে আলোটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসেছে তাতে বনভূমির ভেতরটা বেশ স্পষ্টই।

কেউ কোথাও নেই। নির্জন অরণ্যে শুধু ছোট ছোট গাদিল পোকারা ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝিঁঝিরা একটানা ডেকে যাচ্ছিল। ঝিঁঝিস্বর চারদিকের নির্জনতা যেন দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

জঙ্গলে ঢুকলেই ধর্মুর স্নায়ুগুলো দারুণ সজাগ হয়ে যায়। মনে হয় রক্তবাহী শিরাগুলো ক্ষেষে-বাঁধা ছিলার মতো টান-টান হয়ে গেছে। খুব সতর্কভাবে এ-ধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে সে এগিয়ে যাচ্ছিল।

এই সতর্কতা অকারণে নয়। রিজার্ভ ফরেস্টে জন্তু-জানোয়ার মারা নিষিদ্ধ। মাঝে মাঝে ঢেঁড়া পিটিয়ে এই কথাটা

চারদিকের লোকজনকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া নতুন রেঞ্জার সাহেব এবং তার শ-খানেক ফরেস্ট গার্ড সব সময় বন্দুক তাক করে জঙ্গলের ভেতর চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার তাদের চোখে পড়ে গেলে নিস্তার নেই। হয় ধরা দিতে হবে, আর পালাতে গেলে গুলি খাওয়া অবধারিত।

ঝোপঝাড় বা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কোন ফরেস্ট গার্ড বা রেঞ্জার সাহেব স্বয়ং তার ওপর নজর রাখছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপঝাড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল ধর্মু। তারপর পিঠের সঙ্গে বাঁধা বন্দুকটা খুলে আকাশের দিকে উঁচিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করল।

এটা ধর্মুর অনেক দিনের কৌশল। জঙ্গলে ঢুকে খানিকটা যাবার পরই সে ফাঁকা আওয়াজ করে আবহাওয়াটা বুঝে নেয়। তাতে লাভ হয় এই, ফরেস্ট গার্ড বা রেঞ্জার সাহেব কাছাকাছি থাকলে বন্দুকের আওয়াজ পেয়েই চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসে। তাদের পায়ের শব্দ কানে গেলে পালানো সহজ হয়।

আজ কিন্তু কেউ দৌড়ে এল না। তার মানে আশেপাশে কেউ নেই। অবশ্য বন্দুকের আওয়াজে গাছের মাথা থেকে হাজার হাজার পাখি ডানা ঝাপটিয়ে চিৎকার করতে করতে উড়ে গিয়েছিল। ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারা আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। দু-একটা বুনো শুয়োর হুড়মুড় করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে দূরের একটা ঝোপের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর বনভূমি আবার চুপচাপ।

লক্ষণটা মোটামুটি ভালই মনে হচ্ছে। ধর্মু আর দাঁড়াল না। বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই গভীর জঙ্গল-এর দিকে এগিয়ে চলল।

ধর্মু এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানে কোথাও সমতল জায়গা নেই। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। চড়াই আর উতরাইতে রিজার্ভ ফরেস্টটা এখানে ছড়িয়ে আছে।

খানিকটা হাঁটবার পর দূরে ফাঁকা-মতো একটা জায়গা চোখে পড়ল। সেখানে ঝর্ণার তিরতিরে স্রোত বয়ে গেছে। একটা প্রকাণ্ড চিতল হরিণ ঝর্ণায় মুখ দিয়ে জল খেয়ে যাচ্ছিল। হরিণটার গায়ের রং খয়েরি; তার ওপর সাদা সাদা গোল ফুটকি মাথায় ডালাপালাওলা ঝাড়ালো শিং। লোমগুলো নরম সিল্কের মতো মসৃণ।

হরিণটাকে দেখতে দেখতে ধর্মুর চোখদুটো চকচকিয়ে উঠল। ওটার চামড়া আর শিং নিয়ে গেলে ভূপালের সাহেবরা ভালো দাম দেবে।

বন্দুক কুঁদোটা কাঁধের কাছে আটকে নলের মাছিতে চোখ রেখে হরিণটাকে তাক করল ধর্মু। কিন্তু গুলিটা ছুঁড়বার আগেই অঘটন ঘটে গেল। কি ভেবে জল থেকে মুখ তুলে সাঁ করে ঘাড়টা ঘোরালো হরিণটা। দূরে ধর্মুকে দেখেই কানদুটো খাড়া করল। তারপর একটা লাফ দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো চোখের পলকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেজাজটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল ধর্মুর। আজকের প্রথম শিকার, তাও কিনা ফসকে গেল। কিছুক্ষণ দারুণ বিরক্তভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল সে। সেই ফাঁকা জায়গা আর ঝর্ণাটা পেরিয়ে সে পুব-দক্ষিণে হেঁটেই চলেছে, হেঁটেই চলেছে। কিন্তু না হরিণ, না ভাল্লুক, না বাঘ—কিছুই আর চোখে পড়ছে না। জঙ্গলের যাবতীয় জন্তু-জানোয়ার যেন আজ ষড়যন্ত্র করেছে, আজ কিছুতেই ধর্মুর বন্দুকের পাল্লার ভেতর আসবে না।

ধর্মু আগেও লক্ষ্য করেছে প্রথম শিকার ফসকানো মানেই দারুণ একটা অপয়া ব্যাপার। সেই দিনটা একেবারে বেফায়দা নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্মু একবার ভাবল, আজ আর কিছু হবে না। শুধু শুধু না ঘুরে ফিরে যাওয়াই ভাল। পরক্ষণেই সে ঠিক করে ফেলল, না, ফিরবে না। দিনের আলো এখনও অনেকখানিই রয়েছে। এই গরম-কালে রোদও থাকবে বহুক্ষণ। সন্ধ্যে পর্যন্ত না দেখে ফেরার কোন মানে হয় না। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে যেতে লাগল।

এবার মাঝে মধ্যে দু-চারটে খরগোস চোখে পড়ছে। সাদা ধবধবে, আশ্চর্য নরম আর তুলতুলে এই নিরীহ ছোট্ট প্রাণী-গুলো কোন ঝোপ থেকে বেরিয়ে আচমকা ধর্মুকে দেখেই রীতিমত অবাক হয়েই যেন থমকে যাচ্ছে। তারপর লম্বা লম্বা কানগুলো সটান খাড়া করে চকচকে কাচের গুলির মতো চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তুরতুর করে আবার অন্য একটা ঝোপে ঢুকে যাচ্ছে।

বাজারে খরগোশের চামড়ার দাম নেই। কাজেই সেগুলোর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না ধর্মু।

একবার একটা শজারু সামনে এসে পড়েছিল। রায়পুরে নিয়ে গেলে শজারুর কাঁটার ভালো দাম পাওয়া যায়। তা ছাড়া এই জন্তুটার মাংসও খেতে খারাপ না। কিন্তু বন্দুক উঁচোবার আগেই কাঁটার ঝন ঝন শব্দ করে শজারুটা সামনের বড় একটা গর্তে ঢুকে গেল।

আজকের দিনটাই যা-তা। মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল ধর্মুর। তবু সে আশা ছাড়ল না; গভীর জঙ্গলের দিকে এগুতেই লাগল।

ধর্মু এই অরণ্যের যাবতীয় গাছ-পালা এবং লতা-টতা চেনে। তার চাইতেও বেশি করে চেনে প্রত্যেকটা জন্তু জানোয়ার আর তাদের চালচলন আচার-আচরণকে। হরিণ, বাঘ বা ভাল্লুকের গলার স্বর সে অবিকল নকল করতে পারে।

জঙ্গলে হানা দিয়ে ধর্মু যখন কোন জন্তু টন্তুর দেখা পায় না তখন দুটো হাত মুখের কাছে চোঙার মতো ধরে হরিণ বা বাঘের ডাক ডেকে যায়। আর সেই ডাকে জন্তুরা বেরিয়ে আসে।

আজও গভীর জঙ্গলের দিকে যেতে যেতে বার কয়েক বাঘের ডাক ডাকল ধর্মু, হরিণের ডাক ডাকল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। না হরিণ, না বাঘ, না ভাল্লুক—একটা জানোয়ারও বেরিয়ে এল না।

অথচ যেভাবেই হোক অন্তত একটা বাঘ বা হরিণ তাকে আজ মারতেই হবে। কেননা তার শরীরে এখনও ফুলকিয়ার শরীরের গাঢ় ছোঁয়া লেগে রয়েছে। ফুলকিয়ার ঠোঁট, গাল, মুখ, জোড়া পাহাড়ের মতো বুক—সব কিছু গলে গলে আশ্চর্য এক সুখ হয়ে তার সারা গায়ে এবং রক্তের ঢেউয়ে মিশে গেছে। ফুলকিয়ার মুখ যতবার তার মনে হচ্ছে ততবারই সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, ততবারই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে দিয়ে উঠছে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন যে গড়ানে উপত্যকার মতো একটা জায়গায় এসে পড়েছে, ধর্মুর খেয়াল নেই। ফুলকিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে আবছাভাবে তার মনে হচ্ছিল জন্তু-জানোয়াররা যদি তার সঙ্গে ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা করে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে ফুলকিয়াকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে কি করে?'

আচমকা খুব কাছ থেকে একটা শব্দ হল, সর-র-র-র—

চমকে ধর্মু দেখল পনের কুড়ি হাত তফাতে একটা ঝাঁকড়া অর্জুন গাছের মোটা গুঁড়ির গা ঘেঁষে একটা প্রকাণ্ড বাঘিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখ দুটো এদিকেই ফেরানো।

পনের কুড়ি হাত দূরত্ব এমন কিছুই না। বাঘিনীটা ইচ্ছা করলে চোখের পাতা পড়তে না পড়তে এক লাফে ধর্মুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তিন চার বছর এই রিজার্ভ ফরেস্টে ঢুকে জন্তু-জানোয়ার মারছে ধর্মু কিন্তু কখনও কোন বাঘ বা বাঘিনীর এত কাছে এসে পড়ে নি। তার বুকের ভেতর রক্ত যেন পলকে জমাট বেঁধে গেল। বন্দুক তুলে তাক করার কথাও সে মনে করতে পারল না। দৌড়ে যে নিরাপদ জায়গায় সরে যাবে, তাও তার খেয়াল রইল না। মনে হল পেরেক ঠুকে কেউ যেন পা দুটো মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

বাঘিনীটা সমানে শব্দ করে যাচ্ছিল, গ-র-র-র—তার দুই কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে।

সম্মোহিতের মতো বাঘিনীর দিকে তাকিয়েই রয়েছে ধর্মু। অস্পষ্টভাবে তার মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে বাঘিনীটা লাফিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে তার শরীর ক্রমশ অসাড় হয়ে যাচ্ছিল।

আশ্চর্য, বাঘিনীটা ঝাঁপিয়ে পড়ল না। তার গলার সেই গরগরানিটা আস্তে আস্তে গাঢ় হতে লাগল। সেই অবস্থাতেই সে ঘুরে দাঁড়াল; আর তখনই ধর্মু দেখতে পেল ওধারের ঝুপসি জঙ্গলের আড়াল থেকে বিরাট একটা বাঘ আস্তে আস্তে বেরিয়ে বাঘিনীটার কাছে চলে এল।

বাঘটা ধর্মুকে দেখতে পায়নি, তাকে কাছাকাছি পেয়ে বাঘিনীর সেই গরগরানি আরো বেড়ে গেল। থাবা দিয়ে বাঘটার গা আস্তে আস্তে আঁচড়াতে লাগল সে; তারপর মুখটা বাঘের মুখের কাছে এনে আদরের ভঙ্গিতে কামড়াতে লাগল।

এতক্ষণে বাঘটার গলা থেকেও গর-গরানি আওয়াজ বেরুতে শুরু করেছে। তার কষ বেয়েও লালা ঝরছে। সে-ও বাঘিনীটাকে আঁচড়াতে আর কামড়াতে লাগল।

একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ধর্মু। এতক্ষণে তার বিহ্বল ভয়ের ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। মনে মনে বাঘ আর বাঘিনীটাকে মেপে ফেলল সে। কম করে জানোয়ার দুটো তের চোদ্দ ফুট লম্বা হবে। তাদের শরীর চকচকে সোনালী লোমে ঢাকা; মাথা দুটোও প্রকাণ্ড।

তিন চার বছর এই জঙ্গলে হানা দিচ্ছে ধর্মু কিন্তু এতবড় বাঘ আগে আর কখনও মারতে পারে নি। বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই জানোয়ার দুটো রয়েছে। মাত্র দুটো কি তিনটে গুলি খরচ করলেই ফুলকিয়াকে তার বাপের ঘর থেকে নিয়ে আসার পয়সা উঠে আসবে। বন্দুক তুলে ধর্মু নিশানা ঠিক করতে যাবে, হঠাৎ বাঘটা তাকে দেখতে পেল। কয়েক পলক সে ধর্মুর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দ্রুত বাঘিনীটার দিকে ফিরল। ওদিকে বাঘিনীটা কোন কামুক যুবতীর মতো সামনের দুই থাবা দিয়ে বাঘটার গলা জড়িয়ে ধরেছে। বাঘটার গলা থেকে গাঢ় সুখের আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল, গর-র-র-র—

বাঘিনীটা ক্রমশ বাঘটাকে উত্তেজিত করে তুলছে। সে-ও দুই থাবায় তার বাঘিনীর গলা বেষ্টন করল।

ধর্মু আরেকবার বন্দুক তুলতে যাবে, সেই সময় বাঘ আর বাঘিনীর গা থেকে তার নাকে একটা বুনো মদকর গন্ধ এসে নাকে লাগল। এই গন্ধটা তার চেনা। বাঘিনী যখন বাঘকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার জন্য মেতে ওঠে তাদের দুজনেরই গা থেকে এই আশ্চর্য গন্ধ বেরোয়।

এদিকে পশ্চিম আকাশের গায়ে গা ঘেঁষে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে। দিনটা দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে শেষ বেলার চিকরি-কাটা নরম সোনালি রোদ এসে পড়েছে বনভূমিতে। সেই রোদ গায়ে মেখে বাঘিনী বাঘটাকে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে গলার ভেতর মুখ আর আরামের শব্দ করে করে তার আদর জানাচ্ছে। বাঘিনী যেন তার সঙ্গীকে নিয়ে নির্জন উপত্যকায় পৃথিবীর এক আদিম খেলায় মেতে উঠেছে।

ওদের, বিশেষ করে বাঘিনীকে দেখতে দেখতে আচমকা ফুলকিয়ার সুখটা মনে পড়ে গেল ধর্মুর। কিছুক্ষণ আগে ফুলকিয়াও তো তাকে নিয়ে এই রকম এক খেলায় মেতে উঠেছিল। বন্দুকটা তাক করতে নিয়েও নামিয়ে নিল ধর্মু।

মৃত্যু যে পনের কুড়ি হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে লক্ষ্য নেই বাঘ আর বাঘিনীর। ধর্মুকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নিজেদের মধ্যেই তারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ বাদে আবার বন্দুক তুলল ধর্মু। কিন্তু বাঘিনীটাকে দেখতে দেখতে আবার ফুলকিয়ার মুখ মনে পড়ে গেল তার। আস্তে আস্তে বন্দুক নামিয়ে নিল সে। তারপর যতবার বন্দুক তুলল ততবার ফুলকিয়ার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল আর ততবারই বন্দুক নামাতে হল। শেষ পর্যন্ত বাঘ আর বাঘিনীর দিকে তাক করে বন্দুকের ঘোড়াটা আর টেপাই হল না।

জীবনে এমন সুযোগ আর কখনও আসবে না। সে জন্য পরে হয়ত ধর্মুকে হাত কামড়াতে হবে। কি আর করা যাবে!

ফুলকিয়ার জন্য বাঘ আর বাঘিনীটাকে মারা দরকার কিন্তু ফুলকিয়ার জন্যই পৃথিবীর আদিম সুখে মত্ত জন্তু দুটোকে মারা সম্ভব না। বন্দুক নামিয়ে উপত্যকার ঢাল বেয়ে ফিরে চলল ধর্মু।

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

প্রায়োপবেশন

স্বামী অদেহানন্দ গিরি মহারাজ এই মরদেহটা সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়েছিলেন অনেক দিন আগেই, এটা ত্যাগ করবেন একথাও ঘোষণা করেছিলেন, সে জন্য যা যা করা দরকার তাও সব করেছেন। তাঁর অবর্তমানে উত্তরাধিকার নিয়ে পাছে মনোমালিন্য হয়—মামলা মোকদ্দমা, এমন কি খুনজখম হওয়াও আশ্চর্য নয়, তা তো নিজের চোখেই দেখলেন কতবার—তাই অধিকাংশ প্রবীণ শিষ্যের মত নিয়ে পরবর্তী মোহান্ত নির্বাচন করে তাঁকে সব বুঝিয়েও দিয়েছেন। এমন কি ব্যাঙ্কের খাতাপত্রে সই করার অধিকার দান, জলিলাদি হস্তান্তর সবই ঠিক—অতঃপর তিনি বাকী মাস দুই সময় কেদারনাথে গিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করবেন এ কথাও বলেছেন প্রিয় ও অন্তরঙ্গ শিষ্যদের (কারণ ঐখানেই তিনি তাঁর গুরু মহারাজ শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরির কৃপালাভ করেন)—কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেন যে মতি পরিবর্তন করে একাদশ দিন প্রায়োপবেশনে এই ঋষিকেশেই প্রাণত্যাগ করলেন সেটা আজও সকলের কাছে দুর্বোধ্য।

এ নিয়ে অবশ্য কল্পনা অনুমানের অন্ত ছিল না। আজও, তাঁর তিরোধানের এই দশ বছর পরেও, কিছু কিছু আলোচনা অনুমান যে না চলে এমন নয়—কিন্তু তার কোনটাই তো কেউ সত্য বলে স্থির নিশ্চয় করতে পারেন না। স্বর্গত গুরু মহারাজের অন্তরঙ্গ শিষ্য সেবকরাও না।

তবে ঐ যে মহিলা—বিদেশে শিক্ষিতা, চোস্ত ইংরেজী উচ্চারণে দক্ষা, অতি আধুনিকা ভদ্রমহিলা — যিনি বাঙ্গালী হয়েও বাংলা উচ্চারণ করেন অতিকষ্টে, বিদেশীর উচ্চারণের মতোই আড়ষ্ট ও বিকৃত শোনায়—বন্যা সচদেব গিরি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে এ প্রায়োপবেশনের, মৃত্যু ত্বরান্বিত করার সঙ্কল্পের কোন যোগসূত্র থাকতে পারে—তা কেউ কিন্তু কোন দিন কল্পনাও করতে পারেন নি, পারবেনও না। সে মহিলা নিজেও না।

অদেহানন্দ করেও গেছেন অনেক কাজ। অপূর্ণ কিছু রেখে যান নি, অতৃপ্তির কোন কারণ নেই। অখণ্ডানন্দ সাধনভজন নিয়েই থাকতেন, অধিকাংশ দিনই তাঁর কেটেছে তপস্যায়, হিমালয়ের দুর্গমতম স্থানে। মোট এগারো বারোটি শিষ্য সংখ্যা ছিল তাঁর। সকলেই সন্ন্যাস নিয়েছেন—তাও বহুকাল বাজিয়ে দেখে সন্ন্যাস দিয়েছেন তাদের, দীর্ঘকাল কঠিন ব্রহ্মচর্যে কঠোর সাধনা করার পর। কিন্তু অদেহানন্দর এই কৃপণতা ভাল লাগে নি। ব্রহ্ম সংস্পর্শের এই অত্যাশ্চর্য আনন্দ সংগোপনে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোধ করেন নি। গুরুর অনুমতি নিয়ে লোক-সমাজের মধ্যে এসেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ গৃহীকে দীক্ষা দিয়েছেন, সন্ন্যাস দিয়েছেন চার শতাধিক শিষ্যকে, শিষ্যা সন্ন্যাসিনীর সংখ্যাও কম নয়। তার জন্য একটি মঠও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মঠ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন সেও ছাব্বিশ সাতাশটি, ঠিক কোথায় কি আছে ইদানীং অত খেয়ালও থাকত না তাঁর—এসব পরিচালনার জন্য বহু লক্ষ টাকা লগ্নী করেছেন বিভিন্ন আমানতে সম্পত্তিতে। অর্থাৎ কাজ তাঁর সবই শেষ হয়েছিল, অন্তত তাঁর মতে। আর এ দেহটা বয়ে বেড়াবার কোন প্রয়োজন নেই এই কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল, তাই এদিককার পার্থিব সব দায়িত্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মের সঙ্গে লীন হবার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষায় প্রস্তুত হচ্ছিলেন—কেদারনাথে গিয়ে শ্রীগুরু পাদপদ্ম ও পরমেশ্বরের চিন্তা করবেন নির্জনে মাস দুই কাল, তার পর একটি শুভদিন দেখে অন্তরঙ্গ শিষ্যদের আহবান করে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো এই দেহটাকে ছেড়ে চলে যাবেন, পরম শান্তিতে, পরম তৃপ্তিতে—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

কিন্তু সব ওলট পালট হয়ে গেল বন্যা সচদেবের এই আকস্মিক আগমনে।

মন্ত্রে পড়ে গেল—বোধ করি শ্রীগুরু মহারাজই স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এই একটি কাজ এখনও বাকী আছে, শুদ্ধ দেহ মন নিয়ে মহাপরিনির্বাণে যাত্রা করার আগে—এই প্রায়শ্চিত্ত।

না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। কোন রোম্যান্সের প্রসঙ্গ তুলছি না।

বন্যা সচদেব দেখতে শুনতে ভাল হয়েও, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স তাঁর, বিধবা, দুটি প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জননী।

তিনি এসেছিলেন—লোকমুখে মহারাজের স্নেহভাগের সঙ্কল্প জানতে পেরে—প্রণাম জানাতে। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ—এবং প্রসঙ্গক্রমে কিছু ঐহিক জীবনের ব্যথা ও বেদনাও।

পাঁচ বছর বয়সের অনাথ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এক পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলা এসেছিলেন তখনও প্রায়তরুণ সন্ন্যাসী অদেহানন্দর কাছে। সঙ্গে মেয়েটির মায়ের এক চিঠি। এই মেয়েটি ও চিঠিটি ভদ্রমহিলার কাছে দিয়ে, ওঁর কাছে পৌঁছে দেবার ভিক্ষা জানিয়ে মেয়ের মা কদিন আগে নাকি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। আর কেউ নেই এদের—যে একে মানুষ করতে পারে। চিঠি পড়ে তখনকার মতো যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি সেরে কিছুক্ষণ নির্জনে কুঠিয়ার দ্বার বন্ধ করে বসে ছিলেন মহারাজ, তারপর বেরিয়ে এসে লোক দিয়ে এক গৃহী শিষ্যার কাছে পাঠিয়ে দিলেন মেয়েটিকে। সে শিষ্যা আরও বছর দুই পালন করে এক ক্রীশ্চান মিশনারী স্কুলে পাঠিয়ে দেন, সেখান থেকে কিছুদিন পড়াশুনো করার পর—সেই স্কুলের অধ্যক্ষার সঙ্গেই বিলেত চলে যায় মেয়েটি, সেখানেই অধ্যাপক সচদেবের সঙ্গে আলাপ হয়, দুজনের বিবাহও হয়। এতাবৎ সব খরচ—মানে স্কুলের ও বোর্ডিং-এর ব্যয় মহারাজই বহন করেছিলেন, অধ্যক্ষার অতি প্রিয়, কন্যাসম হয়ে পড়ায় তিনিই ইচ্ছা করে বিলেতে নিয়ে গিছলেন, সুতরাং আর আর্থিক সাহায্যের কোন প্রয়োজনও হয় নি। কোন সংবাদও রাখতেন না মহারাজ। ক্রমশ ভুলেই গিছলেন ওর কথা।

অকস্মাৎ যেন গুরু বা ইষ্টের প্রত্যক্ষ বিদ্রূপের মতোই—পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে শুদ্ধ চিত্তে বিদায় নেবেন এই অহঙ্কার চূর্ণ করতেই সেই মেয়ে এতকাল পরে এসে দেখা করল, পরিচয় দিয়ে কৃতজ্ঞতা, প্রণাম ও নিজের সমস্যা নিবেদন করে বিদায় নিল। মাত্র আধঘণ্টা ছিল মেয়েটি, তাতেই যেন এক বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেল, গুরু মহারাজের মানসিক শান্তি উত্তাল উদ্বেগ হয়ে উঠল অশান্তি ও অপরাধবোধের এক আকস্মিক তুফানে।

সমস্যা অবশ্য এমন কিছু নয়। সচদেবের অকালমৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তিনি টাকা কড়ি যা রেখে গিছলেন, ছেলেমেয়ের মানুষ করার পক্ষে যথেষ্টই। মানুষ করেছেনও ভদ্রমহিলা, সাধারণ অর্থে। বড় ছেলেটি ডাক্তারী পাস করে আমেরিকা গিছল, সেখানেই এক ফরাসী মেয়েকে বিয়ে করেছে, তবে তাতে সুখী নয়, মেয়েটি নাকি ভাগ্যান্বেষিণী পর্যায়ের, সে এক অভিনেতা তরুণের সঙ্গে প্রত্যক্ষেই ঢলাঢলি করে—তাতে ছেলেটার দুঃখের অন্ত নেই। মধ্যে মারামারিও হয়ে গেছে—তা নিয়ে পুলিশ কেস জরিমানা—সে সব সংবাদই মহিলা পেয়েছেন। ছোট ছেলেটি ভালভাবে এম-এ পাস করে সরকারী অধ্যাপকের চাকরি পেয়েছিল, তা ছেড়ে রাজনীতিতে নেমেছে, বর্তমানের পঙ্কিল রাজনীতি নিজেদের দলের ছেলেদেরই সংশয়বাদী বা বিদ্বেষী সন্দেহে খুন করে বেড়াচ্ছে—সে খবরও মার কানে পৌঁছে দেবার কোন অসুবিধা নেই। এই সব নানা কারণেই বড় অশান্তি যাচ্ছে তাঁর—গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করুন তাদের সুমতি হোক। ইত্যাদি—

এসব কোন কথাই অদেহানন্দর কানে বা মনে পৌঁছয়নি। তিনি যেন নিতান্ত দীর্ঘকালের অভ্যাসবশেই মৌখিক দু-চারটি সান্ত্বনা বাক্য বা আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলাকে।

মন তাঁর চলে গিয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের এক মৃত্যু মেঘাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নিশীথে, যেখানে প্রথম মৃত্যুর স্বাদ পান, যে মৃত্যুর পরও জীবিত থেকে তার সেই ভয়াবহ পরিচয় স্মরণ করা যায়। সে মৃত্যু তাঁর বুঝি আত্মারও।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের গঙ্গা-যমুনার সেই প্রলয়ঙ্কর বন্যার সব চেয়ে সাংঘাতিক একটি রাত্রি।

গঙ্গার জল বাড়ছে সে সংবাদ পেয়েছিলেন বৈ কি! অনেকে বলেছে। নিচে ঋষিকেশে নাকি সরকার ঢোলসহরৎ করে জানিয়েও দিয়েছেন, সতর্ক হতে বলেছেন গৃহীদের সাধুদেরও। সাবধান করার প্রয়োজনও ছিল, তখন বহু সাধুই গঙ্গার ধারে বাস করতেন, কেউ ঝোপরা বেঁধে কেউ বা পাহাড়ের কোন বিশেষ খাঁজে কোণে সামান্য গুহামতো স্থানে, কোন মতে একটু আচ্ছাদন পেলে তারই নিচে।

একেবারে জলের ধারে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউ কেউ সাবধান হয়েছিলেন, তাও সবাই নয়। একটু উঁচু জায়গায় যাঁরা থাকতেন তাঁরা কানই দেন নি। অথচ কালী-কম্বলি ছাত্র ভিক্ষা নিতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই জানিয়ে দিয়েছেন ওখানকার মুৎসীজি। এখানের এই পার্বত্য বন্যার আকস্মিক মৃত্যু রূপিণী মূর্তিধরার ইতিহাস বহুবার রচিত হয়েছে, বহুদিন ধরেই শুনছেন তাঁরা। সামান্য পাহাড়ি ঝরণা চন্দ্রভাগা * প্রতিদিনই পার হয়ে আসতেন বহু সন্ন্যাসী, বোধ হয় একশো হাতও হবে না চওড়ায়, হেঁটোভর জল থাকত—একবার তার মাঝামাঝি পৌঁছতেই খরস্রোতের মধ্যে এমন জল এসে পড়ল, শতাধিক সন্ন্যাসী তাতে ভেসে চলে গেলেন। সে তো এই মাত্র চার পাঁচ বছর আগের কথা।

এসবই জানতেন তাঁরা, শুনেছেন অনেকেরই সেদিনের ঘটনা মনে আছে তবু সাবধান হননি। ভেবেছিলেন গঙ্গার জল অনেক গভীরে, তা এত সহজে পূর্ণ হয়ে চারিদিক ভাসাবে না। অন্তত তেমন বাড়ছে দেখলে ওপারে চলে যাবার যথেষ্ট সময় পাবেন তাঁরা।

বিশেষ অদেহানন্দ থাকতেন লছমনঝুলা যাবার পথে বেশ একটু উঁচু জায়গায় একটা বড় পাথর বেরিয়ে আসা আচ্ছাদনের নিচে। তখনই তাঁর কিছু কিছু শিষ্য ভক্ত হয়েছে, কুঠিয়া ছেপে ঋষিকেশে আশ্রম তৈরী হচ্ছে তবু তিনি ইচ্ছে করেই—তপস্যা করার জন্য ওখানে বাস করছিলেন, তাঁর গুরু মহারাজ ভৈরো ঘাটিতে তখন আস্তানা গেড়ে ছিলেন কিছুদিন, তপস্যার কোন বাধা এলে কি কোন সমস্যা দেখা দিলে বিনা বিজ্ঞাপনে যাতে নিঃশব্দে সেখানে চলে যেতে পারেন এই গোপন কারণেই জনমানব বাস শূন্য স্থানে থাকা আরও।

অদেহানন্দ ভিক্ষা করতে যেতেন না। এক পাহাড়ি ভক্ত একটু দুধ বা একটু ঘোল দিয়ে যেত প্রত্যহ, তাই খেয়েই থাকতেন। কাজেই চেঁড়ার কথাটা শোনেননি। তবে গঙ্গার জল দ্রুত বাড়ছে সেটা নিজের চোখেই দেখে ছিলেন। ভেবেও ছিলেন পরের দিন সকালে অবস্থা বুঝে আর একটু উঁচুতে উঠে যাবেন। কিন্তু পাহাড়ে-নদীর জল হিসেব করে নামে না—এ কথাটা ভুলে যায় অনেকেই। নইলে এই সাম্প্রতিক কালেও এক দুর্ঘটনার ইতিহাস পড়ে শুনেও বদরীনাথের পথে বেলাকুচিতে বাস-এ বসে যেতে ভেসে যেতেন না অতগুলি যাত্রী। ভেবেছিলেন জল যতই বাড়ুক তাঁরা এত উঁচু আর ভারী বাস-এ বসে আছেন তাদের কী ভয়?

এই ভ্রান্তি হল অদেহানন্দেরও। তখনও তিনি বসে ধ্যান করছেন, জলের গম্ভীর বিরাট গর্জন সমীপবর্তী হচ্ছে জেনেও অতটা নিকটে এসেছে বোঝার অবস্থা ছিল না তাঁর। একেবারে যখন সে ঘূর্ণি জল সামান শুষ্ক তৃণ খড়ের মতোই ভাসিয়ে নিয়ে চলল তখনই বুঝতে পারলেন।

তখন আর সাবধান হওয়ার সময় ছিল না। নিতান্ত বহুদিনের রোগাভ্যাস করা শরীর বলেই তখন তখনই তলিয়ে গেলেন না—এবং অসম্ভব জোর সাঁতার দেবার বা প্রাণ আসারও চেষ্টা করলেন না—তাতে মিছিমিছি শক্তি ক্ষয় করা হত—কোন মতে প্রাণপণে শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখারই চেষ্টা করলেন শুধু। তাও বোধ করি অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হত না। বাল্যে ও কৈশোরে

---

* ঋষিকেশ ও লছমনঝুলার মধ্যে এখন পাকা পুল হয়েছে।

কটো : বিশ্বনাথ গোস্বামী

কঠোর ব্যায়াম করেছেন, প্রথম যৌবন থেকেই দীক্ষা নিয়ে পর্বতে কঠিন যোগ-সাধনা করে আসছেন—বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে রাখলেও কোন অসুবিধা হয় না তাঁর—এই জন্যই পারলেন। তাছাড়া তখনও তাঁর যৌবন যায়নি, ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স তাঁর, আঠারো-উনিশের মতো দেহের বাঁধান। সাধারণ কুড়িজন যুবকের শক্তি ধরেন তখনও।

কতক্ষণ ভেসে ছিলেন তা তিনি জানেন না। নিচে ঘন কৃষ্ণ ঘূর্ণমান জল উপরে মসীকৃষ্ণ আকাশ, কোথাও এক বিন্দু আলো চোখে পড়ে না, কোনটা জঙ্গল কোনটা জনপদ কিছুই বুঝতে পারেন না। জলের বেগ মন্দীভূত হওয়ার বা কোন নিরাপদ মৃত্তিকা কি প্রস্তরখন্ডে আশ্রয় পাবার কোন আশ্বাস পাচ্ছ না মনে। আসন্নিক শক্তিরও ক্ষয় আছে। তাঁর তো মানুষের শরীর—যতই না যোগাভ্যাসের শক্তি থাক হোক। ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছে এমন সময় চোখে পড়ল একটা ঘরের চালা ভেসে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কোনমতে গিয়ে সেটাকে ধরে—শেষ চেষ্টার মতোই—প্রাণপণে সেটার ওপরে উঠে এলিয়ে পড়লেন। তারপর আর কিছু মনে নেই। তখন কত রাত, আনুমানিক কতটা দূরে এসেছেন হরিদ্বার থেকে—এসব হিসাব করার মতো দৈহিক মানসিক শক্তি তো থাকা সম্ভবই না। ঐ চালায় তিনি ছাড়া অপর কোন প্রাণী ছিল কিনা—মানুষ বা হিংস্র পশু বা সরীসৃপ—তাও চোখ মেলে দেখেন নি। দেখতে পারেন নি।

চেতনা ফিরে পেলেন অনেক পরে। প্রথম যে অনুভূতিটা হল তাঁর—প্রচন্ড শীতের। ঠকঠক করে কাঁপছেন তিনি। প্রবল কাঁপুনি। আপনিই দাঁতে দাঁতে লাগছে ঠকঠক করে। একবার চোখ মেলে দেখবারও চেষ্টা করলেন—সেই যেন সর্ব-সৃষ্টি আবরিত করা অন্ধকার ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। কোথায় আছেন তাও বুঝলেন না, চেয়েও থাকতে পারলেন না। তারপর একটু একটু করে অনুভূতি ফিরে পেতে যেটা অনুভব করলেন—কার একটা উষ্ণ স্পর্শ। বড় আরাম-দায়ক সে স্পর্শ, সেই প্রণয়-মরণ হিম-শৈত্যের মধ্যে জল যেন সঞ্জীবনী-স্পর্শ।

আরও একটু পরে মনে হল কোন মানুষই জড়িয়েছে তাঁকে। জড়িয়ে ধরে আছে। তাঁর অবস্থা দেখে শীতবোধের কষ্ট দেখে কৃপা করে একটু উষ্ণতা দেবার চেষ্টা করছে। বস্ত্রাদির অভাবে নিজের দেহের উষ্ণতা সঞ্চারিত করার চেষ্টা করছে।

আরও পরে বুঝলেন পুরুষের স্পর্শ এ নয়। এত কোমল এত উষ্ণ পুরুষের দেহ হতে পারে না।

তখনই চমকে উঠে সে আলিঙ্গন মুক্ত হবার কথা একটা ক্ষীণ চেষ্টাও করলেন কিন্তু সে শক্তি ছিল না, কোন শক্তিই ছিল না। চোখই চাইতে পারছেন না—হাত পা নাড়াতো দূরের কথা।

শুধু শীত প্রচন্ড শীত। শীতেই মরে যাবেন।

কণ্ঠস্বরও বসে গেছে ফিসফিস করে প্রশ্ন করলেন এ আমি কোথায়?

উত্তর এল তেমনি ফিসফিস করেই ও আপনিও বাঙ্গালী? বাঁচা গেল। আমরা সেই চালার ওপরেই আছি এখনও। চালাটা একটা বড় পিপল গাছে আটকে গেছে বলেই বেঁচে গেছি। কিন্তু তার চারিদিকে জল। এটা আমারই ঘরের চাল্লা। বিপদ দেখে চালে উঠেছিলাম, চালাটা পুরো ভাসিয়ে নিয়েছে তাই রক্ষা নইলে ডুবতাম। জল আরও উপরে উঠেছে—অনেক উপরে। আমারও শীত করছে। দু-একটা লোককে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই ভেসেছি, তাদের তুলতে পারিনি। আপনি নিজে না উঠলে আপনাকেই কি টেনে তুলতে পারতাম? ভিজে কাপড়েই এতক্ষণ ছিলাম আপনার অবস্থা দেখে সে কাপড় সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। অন্য কিছু ভাববেন না। কোন সংকোচ করবেন না। এ সে অবস্থা নয়। এইটুকু তাপ না পেলে বাঁচবেন না। কোনমতেই—

সংকোচ করেনি অদ্বৈতানন্দ গিরি সন্ন্যাসী। করার অবস্থা ছিল না। কিছুই করেন নি। সেই অন্ধকারেই ঐ মানুষটি তাঁকে জড়িয়েছে। তাঁর কাঁপুনি যত প্রবল হয়েছে ততই সে আরও কঠিনভাবে জড়াবার চেষ্টা করেছে যেন নিজের সমস্তটুকু দেহের উত্তাপ দিয়ে তাঁর দেহের সজীবতা সক্রিয়তা—স্বাভাবিক অবস্থা। ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। তারপর তখন সত্যিই একটু উষ্ণতা ফিরে এসেছে ইন্দ্রিয়ের সচেতনতা—তা ভাল করে বোঝার আগেই

দুটি দেহ দেহের ধর্ম পালন করেছে। পালন যে করছে তাও তো তখন বোঝেন নি সম্ভবতঃ।

এরপর কি হয়েছে কেমন করে দুদিন পরে সরকারী নৌকা এসে উদ্ধার করেছে তাদের সেই জলবেষ্টিত চালা থেকে—সে সব তথ্য মনে ছিল না। প্রবল আত্মগ্লানি ও হতাশা ছাড়া আর কোন অনুভূতিই ছিল না। মেয়েটার দিকেও ফিরে তাকান নি। সেও দিনের আলো ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিত্যক্ত কাপড় জড়িয়ে মুখ নামিয়ে বসে ছিল।

তুষানলে প্রাণত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করবেন কিনা অথবা আর কি করা উচিত গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি হা-হা করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন। তুই এখনও ছেলেমানুষ আছিস বেটা। আমাদের পুরাণে যে সব বড় বড় ঋষিদের পদস্খলনের গল্প দেওয়া আছে সে কি সব সত্যি? আমাদের পথ দেখানোর জন্যেই রূপক কাহিনী ওসব। তোর সারা জীবনের তপস্যায় তীব্র বৈরাগ্য ঈশ্বর পিপাসা এ সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেল ঐ এক মুহূর্তের সামান্য একটু ভ্রান্তিতে? ভ্রান্তিও তো নয়—তোরা দুজনেই তো তখন আধা অজ্ঞান ছিলি কে জানে তখন ওটার হয়ত দরকারই ঘটেছিল। আমি ভাবছি সেই মায়ের কথাটা। তুই ঘেন্না করছিস বেটা সে তোর দেহটা ফিরিয়ে দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে জননীর মতো, সেটা ভাবছিস না। খবরও নিলি না একটু সে কোথায় থাকে কী তার পরিচয়। আমি ডেকে তাকে সান্ত্বনা দিতাম। ছি ছি সেও হয়ত মিথ্যা লজ্জায় কষ্ট পাচ্ছে। যা যা যা করছিলি তাই করগে যা। তোকে কোন পাপ স্পর্শ করেনি এতে।

গুরুদেবের দৃষ্টি যে কত দূর প্রসারী সেটা বুঝেছিলেন অদ্বৈতানন্দজী তারও পাঁচ বছর পরে। যখন একটি পাঞ্জাবী বন্ধ্যা মহিলা ঐ বন্যা মেয়েটিকে আর তার মায়ের চিঠি এনে ওর পায়ের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।

চিঠিতে লেখা ছিল—

শ্রীচরণেষু, আমি বাল্যবিধবা। আমার নিরক্ষা মায়ের এমন সংগতি ছিল না যে অবস্থাপন্ন ঘরে বিবাহ দেন। রোগগ্রস্ত সোজবর বর বিবাহের পরেই তিনি মারা যান। অগত্যা মায়ের কাছেই ফিরিয়া আসিতে হয়। বছর কতক ভিক্ষা দুঃখ করিয়া কাটে শেষে আমাকে রক্ষা করিতেই মা ঋষিকেশে থাকেন তীর্থস্থান—সাধন-ভজন করিয়া ছত্রের অন্নে বাকী জীবনটা কাটিয়া যাইবে এই আশায়। সে আশা মেটে নাই। ছত্রের ভিক্ষা সাধুদের জন্য। আমাদের জীবনধারণের উপায় মুষ্টি ভিক্ষা—অথবা বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ। তাই করিতেছিলাম—লোকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাই নাই। ধনী মোহান্তদের শক্তি ও প্রভাবের অন্ত নাই প্রাণরক্ষা করিতে দেহটা দিতে হইয়াছে। মা জীবিত থাকিতেই এ পথে নামিতে হয়। সে ব্যথা মাকে বড় বাজিয়াছিল। তবে বহুভোগ্যা হই নাই—এই যা সান্ত্বনা।

কিন্তু যেদিন আপনার সন্তান গর্ভে আসিল—দৈব প্রেরিত বলিয়াই আমার ধারণা—সেদিন হইতে মনের ভিতরটায় যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল বিশেষ আপনার চোখে যে গ্লানিভরা দৃষ্টি দেখি—পরে পরিচয় পাইয়া বুঝি তাহার অর্থ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আপনার সম্মান রক্ষা করিবই। এ সন্তানকে পাপ অন্নে বাঁচাইব না, মানুষ করিয়া তুলিব। এই গত পাঁচ বছর প্রাণপণে লড়িয়াছি দারিদ্র্যের সঙ্গে, পুরুষের সঙ্গে, বোধকরি আমার মতো মেয়েছেলের যাহা সাধ্য তাহার অনেক বেশী। কিন্তু আর পারিলাম না। লোকে বলে আত্মহত্যা মহাপাপ—সে কি গঙ্গার জলে ডুবিলেও? তবে গঙ্গার কী এত মহিমা? তাছাড়া ভগবান অন্তর্যামী অবস্থা বুঝিয়া তিনি মাফ করিবেন। আপনার তো এখন বহু শিষ্য হইয়াছে শুনিতে পাই—মেয়েটা যাতে ভাল শিক্ষা পাইয়া নিজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে কোন গৌরবজনক বৃত্তি ধরিয়া সৎপথে উপার্জন করিতে শেখে—কাহারেও দিয়া এইটুকু শুধু ব্যবস্থা করিয়া দিবেন — অভাগিনীর এই প্রার্থনা। মায়ের পাপে মেয়ের না শাস্তি হয়, দয়া করিয়া সেইটা দেখিবেন। ইতি—প্রণতা বকুলমালা।

সেদিন বকুলের জন্যে দুঃখ হলেও নিজের কতটা দায়িত্ব দুর্ভাগিনীর অকাল মৃত্যু এই আত্মহত্যার জন্যে—অত তলিয়ে ভাবেন নি, মেয়েটার চিন্তাই বড় হয়েছিল। সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে, তারও বেশী—আশাতীতভাবে, উচ্চ শিক্ষা, সৎ পাত্রে বিবাহ, দুটি উপযুক্ত ছেলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা— কোনদিকেই কোন অভাব থাকে নি তার। এসব খবরই পেয়েছেন মধ্যে মধ্যে, আর ওনিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধেন নি।

কিন্তু আজ বন্যার এই আকস্মিক আগমন—পরলোকের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যখন পা বাড়াতে যাবেন ঠিক সেই মুহূর্তে—ইষ্ট বা গুরুর নির্দেশ বলেই মনে হয়েছে।

উনি সমস্ত দায়িত্ব পালন করে সর্ব বন্ধন মুক্ত হয়ে শুদ্ধ দেহমন নিয়ে ইষ্টের মুখোমুখি দাঁড়াবেন—তিনি আর উনি এই না ভেবেছিলেন! হায় রে অহংকার!

এই যে একটা অকালমৃত্যুর বোঝা, একটা মানুষের—তাও নয়, ওর জীবনযাত্রীর আত্মহত্যার দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসে আছে—সে কথা ভুলেই গিছলেন। সেদিনের সে পদস্খলন, তাও ঠিক না, এক মুহূর্তের উত্তেজনার দায়িত্ব দুজনেরই সমান। বরং তারই কম, ওর বেশী। সে যা করেছে ওর প্রতি দয়া করে। ওঁর এই দেহটা এই প্রাণটা রক্ষা করার জন্যে। অতটা তাকে ঘৃণ্য অবজ্ঞেয়, নরকের দ্বার মনে করার কোন অধিকার ছিল না, যেমন অধিকার ছিল না নিজের কর্মের বোঝাটাও তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার। এর কোন জৈবিক ফল হতে পারে তাও ভাবা উচিত ছিল। উচিত ছিল খোঁজ নেওয়া। তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না, কারণ থাকত না। গুরুও সেইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অথচ সে ওঁর সম্মান বজায় রাখার জন্যে, ওঁর সন্তানকে কলঙ্কিত অর্থে পুষ্ট না করার জন্যে কী না করছে, কত কষ্ট—

না, এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বাকী আছে, জীবনের এক বিরাট ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। তার আগে ইষ্টপথে যাত্রার কোন অধিকার নেই তার।

বিশ্ব মুখোপাধ্যায়

যৌনরূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে

পুত্রকন্যার জন্মের কারণ ও অনুপাত নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহুবার বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়েস্টারমার্কের মত উদ্ধৃত করে অনেকে বলেছেন, পিতামাতার মধ্যে যদি পিতার বয়স মাতার অপেক্ষা পরিমাণে অধিক হয়, তাহলে পুত্রকন্যার মধ্যে পুত্রের সংখ্যা অধিক হবে এবং যদি মাতার বয়স পিতার সমান অথবা পিতার অপেক্ষা অধিক হয়, তাহলে কন্যার সংখ্যা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। আবার বহুজনখ্যাত হফকার-সেডলার ল' হিসাবে বলা হয়েছে পিতা-মাতা সমবয়স্ক হলে প্রতি শত-পুত্রের ক্ষেত্রে কন্যা হবে তিরানব্বই শয়েন্ট পাঁচ। অবশ্য এই হফকার-সেডলার ল'ও যে অখণ্ড অচল এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে একেবারেই ভ্রমাত্মক তা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই অনুমিত হয়। এতদ্ব্যতীত সেন্সাস রিপোর্ট থেকেও আমরা পুত্রকন্যার জন্মের এই অনুপাত যে কি পরিমাণ হাস্যকর তা সহজেই অবগত হতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে পুত্র ও কন্যার জন্মের কারণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত ব্যক্ত হলেও, জীবতত্ত্ববিদরা স্ত্রীপুরুষ জন্মাবার কারণ সম্বন্ধে বহু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আজও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। মোটামুটিভাবে যা আবিষ্কৃত হয়েছে তার মোদ্দা কথা হল, যৌন-ক্রোমসোম। প্রত্যেক মানুষের দেহকোষে নাকি একজোড়া করে যৌন-ক্রোমসোম আছে। স্ত্রীর দুটি একই প্রকারের এবং পুরুষের দুটির, একটি থেকে অপরটি স্বতন্ত্র। স্ত্রীর এই দুটি ক্রোমসোমের নাম যদি দেওয়া হয় 'অ' এবং পুরুষের স্বতন্ত্র দুটির নাম যদি দেওয়া হয় 'অ' ও 'আ', তাহলে মাতার অ-এর সঙ্গে পিতার অ মিলে হয় স্ত্রী-জাতীয় সন্তান; আর পিতার 'আ' ক্রোমসোমের সঙ্গে মাতার 'অ' ক্রোমসোম মিলে জন্মায় পুরুষ-জাতীয় সন্তান।

পুত্রকন্যা জন্মের এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি স্বীকার করে নিলেও সংসারী-গৃহস্থ, ধনী-নির্ধন পিতা-মাতা সকলেই কন্যা অপেক্ষা পুত্রের শুভাগমনেই যে অধিকতর আনন্দিত হন তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই পুত্রকন্যা ব্যতীত ক্লীব নপুংসক হিজড়ে বা খোজা নামধেয় মানুষও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে প্রকৃতির খেয়ালে। এই ব্যতিক্রম বা এতৎসংক্রান্ত রহস্য যেমন সাধারণ মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়, তেমনি কৈশোর বা যৌবনে লৈঙ্গিক রূপান্তরের ঘটনাও অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক পর্যায়ভুক্তই বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কিছু কিছু সত্য তথ্যের নিদর্শন উপস্থিত করার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা। এ থেকে জানা যাবে, কোথাও পুরুষ স্ত্রীরূপে আবার কোথাও নারী পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন বয়সে। ঘটনাগুলি ঘটেছে কোথাও প্রকৃতির স্বাভাবিক ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যে, বয়ঃসন্ধিক্ষণে, ব্যতিক্রম হিসাবে, আবার কোথাও বা চিকিৎসকের সামান্য সহযোগিতায়, অস্ত্রোপচারে। সেক্সের এই বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার পর তারা প্রায় সকলেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করেছে।

প্রকৃতির এই ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য বা পরিহাসকে অনেকে সহজভাবে নিলেও এবং এ-ব্যাপারে স্বস্তিবোধ করলেও, অনেকের কাছে ঘটনাগুলি স্বাভাবিক বোধ হয়নি, সেক্সের এই রূপান্তরে তারা অস্বস্তিবোধ করেছে। কিন্তু তাহলেও ঘটেছে এমন অসংখ্য ঘটনা। মেয়েনেকরা লাজুক প্রকৃতির বা মেয়েলী ভাবাপন্ন পুরুষ কিংবা পুরুষালী মন্দা হাবভাবের মেয়ে যেমন এদেশেও সংখ্যাতীতভাবে দেখা যায়, তেমনি ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এই ধরনের মানুষের সংখ্যা অসংখ্য। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে পুরুষ-সুলভ আচার-আচরণ হামেশাই দেখা যায়। চুল ছেঁটে ফেলা, পুরুষের মত প্যান্ট-সার্ট পরা, সিগারেট খাওয়া, ঘোড়ায় চড়া, পুশ-বাইক, মোটর সাইকেল ও মোটর চালানো, ছিপ ফেলা, নৌকা বাওয়া, শিকার করা প্রভৃতির অনেকগুলি ও-দেশের মত আমাদেরও আজ গা-সওয়া হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশের আপ-টু-ডেট মডার্ন সোসাইটির মেয়েদের যথেষ্টই উৎসাহ দেখা দিয়েছে আজ এই সব বিষয়ে।

কিন্তু পুরুষ সরাসরি একেবারে মহিলাতে পরিণত হল এবং নারী পুরুষে, এ ঘটনার নিদর্শন ইউরোপ ও আমেরিকায় যে পরিমাণে দেখা গিয়েছে, ভারতে সে পরিমাণ লৈঙ্গিক রূপান্তরের ঘটনা না ঘটলেও, একেবারে যে ঘটেনি, তা বলার উপায় নেই। কিছুকাল পূর্বে এই পশ্চিমবঙ্গেই এ ধরনের ঐক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে এবং স্থানীয় কলকাতা হাসপাতালের শল্যচিকিৎসকগণই লিঙ্গান্তর ঘটিয়েছেন সামান্য অস্ত্রোপচারের সাহায্যে—একটি কিশোরীকে পূর্ণ নারীত্বে ফিরিয়ে এনেছেন, অস্বাভাবিক পুংজননেন্দ্রিয়ের আংশিক বৃদ্ধির মূলোৎপাটন করে।

সম্প্রতিকালে আমাদের বাড়ির পাশে বাংলাদেশেও এমনি একটি বিস্ময়কর যৌন-বিবর্তনের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি এখানকার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৭শে নভেম্বর। সংবাদটি হুবহু এইরূপ—

"তরুণ ছাত্র। দেহে পুরুষের সব পরিচিতি। কিন্তু কি হল! পুরুষের লক্ষণগুলি ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে আরম্ভ করল। পুরুষালী চেহারা রূপ নিতে লাগলো মেয়েলী চেহারায়। তারপর, পুরুষ রইল না আর তরুণ ছাত্রটি। পরিণত হল তরুণী ছাত্রীতে। বিয়ে করল তার এক সহপাঠীকে।'

"এই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র আবদুস সামাদ এখন আর ছাত্র নয়, ছাত্রী। বর্তমানে তার নাম হাসনারা বেগম। বিয়ে করেছে তার বন্ধু ও দূর-সম্পর্কের খুড়ো আনসার আলীকে।"

আমেরিকার ক্যালিফোরনিয়ায় এই ধরনের কয়েকটি উপর্যুপরি বিবাহের ঘটনা ঘটায়, স্থানীয় কয়েকটি স্টেটস আইন করে বিবাহের পূর্বে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং ডাক্তার তাদের উভয়কে স্বাভাবিক জীবনযাপনের উপযোগী বলে সার্টিফিকেট দিলে, তবেই পুরোহিত চার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহের করণীয় বিষয়সমূহ নিষ্পন্ন করবেন বলে নির্দেশ দিয়েছে।

আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি লিঙ্গান্তর গ্রহণের ঘটনার মধ্যে মিঃ জেডকো কোউবকা-র ঘটনাটি ভারী রোমাঞ্চকর। এই কোউবকা ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলস-এ ৮০০ মিটার মেয়েদের দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড করেছিল, কিন্তু দু বছর পরে সেই কোউবকাকে বিদেশ যাবার সময় পাসপোর্ট অফিসের লোকেরা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। এবং তারা পরিবাস করতেই চায়নি যে, এই সেই দু বছর পূর্বের বব চুল-ছাঁটা, ফারের মেয়েলী কোট-পরা জেডকো কোউবকা। পাসপোর্ট অফিসের ক্লার্কদের সে নিজেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট-

সহ তার স্যুট কোর্ট ও মাথায় নাইট-ক্যাপ পরা ছবিটি রেখে, মেয়েছেলে থেকে পুরুষে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী ব্যক্ত করেছিল সহজ ভঙ্গিমায়।

কোউবকা যা বলেছিল তার মর্মার্থ হল : আমি স্বাভাবিকভাবেই জন্মে-ছিলুম এবং আস্তে আস্তে বড়ও হয়ে-ছিলুম একজন মহিলা রূপে। কিন্তু কি জানি কেন, সব সময়েই এই মেয়ে হয়ে জন্মানোকে মনে মনে আমি ঘৃণা করতুম। বিশেষ করে প্রথম আমি যখন ঋতুমতী হই, তখনই এই ঘৃণার ভাবটা আমার আরো বেড়ে যায়। কিন্তু সেই বছরেই এক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন দেখা দেয় আমার মধ্যে। ঈশ্বর যেন মন বুঝে সাড়া দিয়েছিলেন আমার ডাকে। কোউ-বকা আরও বলেছিল : কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে একটা অস্ত্রোপচার করতে হয়ে-ছিল ডাক্তারের নির্দেশ মত। সাধারণ অস্ত্রোপচার। জননেন্দ্রিয়ের পাশে মাংসের উপর সামান্য যে একটা স্ফীতি ছিল, তা উন্মুক্ত করার ফলেই সত্য উদ্ঘাটিত হয় এবং আমি পুরুষ রূপে চিহ্নিত হয়ে-ছিলুম। আমার বুকের উচ্চতা যা সামান্যই ছিল, সেই কুচযুগল অল্প দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক পুরুষের বুকের অবস্থায় ফিরে এসেছিল। পাসপোর্ট অফিসের রিপোর্টারদের কাছে খোলা-খুলিভাবেই সব বলেছিল কোউবকা। এখন অত্যন্ত ভদ্র ও মিতভাষী পুরুষ মিঃ কোউবকা।

আমেরিকা ছেড়ে ইংলণ্ডের একটি বিশেষ স্মরণীয় কাহিনী বলি। বিখ্যাত যুবতী এ্যাথলেট মেরীর নাম শুধু মিলমাউথের ঐ অঞ্চলে কেন, জাতীয় ক্রীড়ায় সটপুট চ্যাম্পিয়ন হিসাবে তার নাম সারা ইংলণ্ডে ছড়িয়ে তো পড়েই ছিল, তাছাড়া ১৯২৬ সালে জেভেলিন চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিল সে। কিন্তু ১৯২৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে একটি মেয়েদের প্রখ্যাত প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে হঠাৎই একদিন সে অনু-ভব করল তার সেকসের রূপান্তরের বিষয়। একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন শারীরিক চেতনা অস্থির করে তুললো তাকে। সে বেশ বুঝতে পারল, একটা কি যেন পরি-বর্তন আসছে এবং সে পরিবর্তন শুধু মানসিক নয় শারীরিকও। যে পুরুষের স্বপ্ন বহুদিন ধরে তার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারত মনে মনে সে ভাবত পুরুষরা কি সুখী, মেয়েরাই তাদের জন্যে শুধু কাঙ্গাল হয় (অনেক মেয়ে আবার উল্টোটাই ভাবে)। সেই মেরীই একদিন ঘটনাচক্রে পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে, মেরী এডিথ ওয়েস্টন নাম বদলে ফেলে মিঃ মার্ক ওয়েস্টন নাম নিয়ে তার চেয়েও বয়সে কিছু বড়ো এ্যালবার্টা ব্রে নামে এক বান্ধবীর পাণিগ্রহণ করে বসলো।

এ্যালবার্টা ব্রেকেই প্রথম প্রাণখুলে সব গোপন ব্যাপারটা বলেছিল ওয়েস্টন। প্রাণের বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধব বা বান্ধবীর কাছেই তো সব কিছু খুলে বলা যায়। তাই ওয়েস্টন এ্যালবার্টার কাছে তার বিশেষ স্থানের শারীরিক পরিবর্তনের অবস্থাটাও দেখাতে লজ্জাবোধ করেনি। এ্যালবার্টা সৎপরামর্শ দিয়ে তখুনি নিয়ে গিয়েছিল তাকে ডাক্তারের কাছে এবং ডাক্তারের নির্দেশ মত ঐ ১৯২৮ সালের এপ্রিল ও মে মাসে দুবার দুটি অস্ত্রো-পচার করার পরই সুস্থ একজন পুরুষের রূপ ধারণ করেছিল এডিথ ওয়েস্টান। এরপরই ডাক্তার তাকে পুরুষ বলে ঘোষণা করে এবং সে কোর্টে এফিডেফিড করে তার নাম মিঃ ক্লার্ক ওয়েস্টান গ্রহণ করে এবং বান্ধবী মিস এ্যালবার্টাকে বিবাহ করে স্লিমাউথেই থেকে যায়। সেখান-কার স্থানীয় অধিবাসীরা এই বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনায় প্রথম দিকে একটু বিচলিত হয় বটে, কিন্তু পরে সবারই এটা গা-সওয়া হয়ে যায়।

এখানের ছবিতে হাসিমুখে মিঃ ক্লার্ক ওয়েস্টন এবং মিসেস ওয়েস্টনকে (পূর্বের মিস এ্যালবার্টা ব্রে) হাত ধরা-ধরি করে যেতে দেখা যাচ্ছে। মিঃ ওয়ে-স্টনকে দেখে কে বলবে একদিন সে সুন্দরী তন্বী যুবতী ছিল!

নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরের ঘটনাই যদিও বেশী, কিন্তু তাহলেও, পুরুষ থেকে নারীতে প্রত্যাবর্তনের কাহিনীও কম না। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশেরই বেশ একটি প্রাচীন ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। বিখ্যাত দিনেমার চিত্রশিল্পী এ্যানাড্রিএস স্পারি ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে তিনি বিবাহও করেছিলেন সুন্দরী এক মহিলাকে, কিন্তু তাঁর কোন ছেলেপুলে হয়নি। বিবাহের কয়েক বছর পর থেকেই তিনি মেয়েদের মত সাজপোশাক করার দিকে আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়েন। চল্লিশ বছর বয়সের সময় সমস্ত ব্যাপারটা অকল্পিতভাবে একেবারে বদলে যায়—এ্যানাড্রিএস মহিলায় পরিণত হন। অবশ্য এর জন্যও কিছু ডাক্তারি কারিকুরি করতে হয় তাঁর শরীরের উপর ছুরি চালাতে হয় জননেন্দ্রিয়ে। সেই যুগেই তাঁর স্ত্রী বাধ্য হয়ে অন্য লোককে পুনরায় বিবাহ করেন। এ্যানাড্রিএস পূর্বের নাম পরি-বর্তন করে লিলি নাম গ্রহণ করেন, এবং এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আমেরিকায় এই ধরনের বহু ঘটনা প্রায়শই ঘটে চলেছে। বেশী দিনের কথা নয়, কেনসাস শহরের ১৪ বছরের সুন্দরী মেয়ে মার্গারেট ফাউলারের সঙ্গে গেলিনার ২১ বছরের ছেলে জর্জ হেস-এর বিবাহ হয়। বিবাহ হয়ে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই মার্গারেট বুঝতে পারে যে জর্জ পুরুষ নয়। সে এক বিশ্রী অনুভূতিতে জর্জরিত হয়ে, কয়েক দিন পরে একদিন কাঁদতে-কাঁদতে মার্গারেট বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে বাড়ি ফিরে আসে। অপরদিকে পুলিশের আদেশ অনুযায়ী জর্জকে এলিস নাম নিয়ে স্কার্ট পরতে বাধ্য করা হয়। দীর্ঘদিন থেকে পুরুষের সাজপোশাক এবং পুরুষোচিত ভাবভঙ্গি দেখে মার্গারেট বোঝবার সুযোগই পায়নি যে জর্জ হেস তারই মত ললনা কুলেরই একজন।

সিউইয়র্ক-এর হেলেন ইলিস যে একটি মেয়ে সে সম্বন্ধে কারুরই কোনদিন সন্দেহ হয়নি। কিন্তু বছর ষোল বয়সের সময় থেকে তার লিঙ্গান্তর ঘটে এবং সে পুরুষে পরি-বর্তিত হয়। কিন্তু ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত মহিলা হিসাবে, মহিলা সেজেই একটি দালালি ফার্মে বিশেষ তৎপর ও কর্মক্ষম পুরুষ কর্মচারীর মতই কাজ করে গিয়েছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক মহিলার সঙ্গে গভীর প্রেমে পড়ে একদিন সে ধরা পড়ে যায় যৌনবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে। মেয়েটি অত্যন্ত কাতরভাবে অনুনয়-বিনয় করে সে এই বোঝাতে চেষ্টা করে যে, আমরা সারা জীবন এইভাবেই কাটিয়ে দেব, এতে কেউই আমাদের সন্দেহ করার অবকাশ পাবে না। কিন্তু মেয়েটি সন্তান সম্ভবা হওয়ার জন্যেই হোক, অথবা বিবাহিত স্বামীর কাছ থেকে সন্তান পাবার আগ্রহেই হোক, এই কার-চুপি পছন্দ না করে তার সঙ্গ ত্যাগ করে এবং কথাটা আস্তে আস্তে ছড়াতে থাকে, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত হেলেন ইলিস-এর এই ধরনের কারসাজি পুলিশ ধরে ফেলে এবং হেলেনকে বিচারের জন্য কোর্টে যেতে হয়।

ফ্রান্সের বিখ্যাত শহর ও রাজধানী প্যারিসের ঠিক বাইরে এক বাঙালি জাদুকর ছিল গতশতকে বোশেরো নামে। সারা দেশের কাউন্ট-কাউন্টেস ও ধনী বিত্তবান ব্যক্তিদের বাড়িতে ও পার্টিতে ম্যাজিক দেখিয়ে প্রচুর রোজগার করত সে। টাকার সঙ্গে নানাবিধ উপহারে উপহারে স্তূপাকার হয়ে উঠত তার ঘর। আসলে পুরুষের মত সেজে থাকলেও বোশেরো ছিল মহিলা। এই মহিলাও নাকি ১৭ বছর পর্যন্ত নপুংসক থাকার পর স্বাভাবিক নারীতে রূপান্তরিত হয় চিকিৎসকের সহায়তায়। কিন্তু সেই গোড়া থেকেই সে যেমন পুরুষের বেশ ত্যাগ করেনি, তেমনি চুল ছাঁটা থেকে আচার-আচরণ সবই ছিল তার পুরুষের মতই। অবশ্য গোঁফ-দাড়ি কোনদিনই প্রকাশ পায়নি তার।

এই যৌন-বিবর্তন বা পুরুষের পুরুষোচিত পৌরুষের অভাবে মেয়েলী-পনা, অথবা মেয়েদের পুরুষালীভাব বা মর্দানী সারা পৃথিবী জুড়ে অতীত যুগ থেকেই হয়ে আসতে দেখা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে, মনোবিজ্ঞানীদের গবে-ষণায় এগুলি গ্ল্যান্ডের ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন হরমোনের স্বল্পতা ও আধিক্য, অথবা মূলতঃওভাম এবং প্রটোপ্লাজমের প্রচ্ছন্ন কারসাজি বলেই ধরা হয়ে থাকে।

চাঁদ ডুবে গেলে

আনন্দ বাগচী

উপন্যাস

সকালে এখানে খবরের কাগজ নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে কলকাতা থেকে কাগজ আসে, বাসী কাগজ। তাই জ্যোতির্ময় এই সকাল বেলায় রেডিওর বাংলা সংবাদ সহযোগে এক কিস্তী চা বানিয়ে নিয়ে বসেছিল। সেই কোন ছাত্রজীবনের অভ্যেস এখনো ছাড়তে পারল না, চায়ের সঙ্গে খবর না হলে সারা সকালটাই ম্যাজ-ম্যাজ করে।

জ্যোতির্ময়ের দাড়ি কামানো হয়ে গেছে একটু আগে। টেবিলের এক পাশে দাড়ি কামানোর গেলাসের মধ্যে সাবানের ফেনা মাখা সেফটিরেজার আর ব্রাশটা ডোবানো রয়েছে, পরে ধুয়ে ফেলবে। এখন স্বরচিত চায়ে চুমুক দিতে দিতে মসৃণ গালে হাত বুলিয়ে আরাম খাচ্ছিল আর আয়নার মধ্যে নিজের মুখোশ্রীর তারিফ করে মুচকি হাসছিল। পাশে খোলা ট্রানজিস্টর থেকে অক্লান্ত গল্পায় খবর ছড়াচ্ছিল।

পাকা দাড়ির জ্বালায় দাড়ি গোঁফ দু তরফই নির্মূল করে কামিয়ে ফেলতে হয় রোজ। ফলে মুখখানাকে বেশ মার্জিত আর ধারালো দেখায়। গোলগাল আলুভাতে মার্কা মুখ নয় জ্যোতির্ময়ের, রীতিমত ইন্টেলেকচুয়াল কাটিং। পোড়-খাওয়া, ঢালাই ব্রোঞ্জের মত। সে হাল্কা আমেজে ভাবছিল, গোঁফ ব্যাপারটাই মানুষের আদিম রিপু, বায়োলজিক্যাল রেভারের মত ওতে হয়তো অ্যানি-ম্যাল ইনস্টিংকট কাজ করে, হয়তো রোমান্টিক দেখায়, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্বুদ্ধিজীবীও মনে হয়।

শেষ চুমুকটা দিয়ে কাপডিশ মাটিতে নামিয়ে রাখতে রাখতে টেবিলে দাঁড়-করানো আয়নায় নিজের সঙ্গে আর এক দফা চোখাচোখি হয়ে গেল তার। যৌবনের খোলাবাজারে এই মুখের একটা ফেসভ্যালু ছিল একদিন। দস্তুরমত চাহিদা ছিল বলা যায়। কলেজ ইউনিভার্সিটির রেজিমে কোনো কোনো খুকুমণি ঝুঁকেছিল, দু-একজন কিঞ্চিদধিক ঝুঁকিও নিয়েছিল। কিন্তু জ্যোতি-র্ময় একটু-আধটু খেলে তাদের সকলেরই নাগালের বাইরে চলে এসেছে, শেষ পর্যন্ত কোথাও প্যাঁচ খায়নি।

সে অবশ্য এখন কিংবদন্তীর কাহিনীর মতই পৌরাণিক, যেন অন্য মানুষের গল্প, প্রায় অবি-শ্বাস্য। সত্যাসত্য যাচাই করার কোন উপায় নেই, আর সত্যি বলতে কি, তার কোন দরকারও নেই। তার জীবন নিয়ে কেউ এপিক উপন্যাস লিখতে যাচ্ছে না, কিংবা জীবনী, যে তার ফেলে আসা, ফুরনো অতীত আবার ঘাঁটতে হবে। তাছাড়া সে যুগ নেই, সে জীবন নেই, সে জ্যোতির্ময়ও নেই।

তবু একদিন নারীঘটিত প্রশ্ন উঠেছিল, কারো কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে বৈকি তাকে। ধরি মাছ না ছুঁই পানি—অন্ততঃ নারীক্ষেত্রে চলে না, প্রণয় হোক আর পরিণয় হোক এস্পার-ওস্পার চাই। মনে পড়ল, কাকে যেন কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেই নিশ্চয় একদিন সে জবাব দিয়েছিল, যাস্ট বিকজ আই কুডন্ট বেড উইথ দেম। ছারপোকার সঙ্গেও এক বিছানায় রাত কাটিয়েছি, বাট নেভার উইথ এ গার্ল।

ব্যাচেলার থাকার কঠিন যুক্তিই বটে!

উদ্যত তর্জনীর মত দৃপ্ত নাসিকা, চিবুকের ব্যক্তিত্বময় কাঠিন্য এবং ঠোঁটের উদাসীন হাসির মোচড় দেখতে দেখতে পুরনো কথা ভাবছিল জ্যোতির্ময়। ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, আসন্ন রেল ধর্মঘটের ঈষদুষ্ণ খবরও কখন তার কান পার হয়ে চলে গিয়েছিল, খেয়াল করেনি। হঠাৎ খুব কাছেই মোটরের একজোড়া হর্ণ শুনে সে চমকে উঠলো। শুধু মোটরের হর্ণ হলেও বা কথা ছিল, সেই সঙ্গে কয়েকটি মেয়েলি কণ্ঠের হৈ হৈ কলস্বর শোনা গেল এই বাড়ি, এই বাড়ি! না না, আমি বলছি এই বাড়ি!

টেবিলের ওপরে ঝুঁকে পড়ে জানালার পর্দা সরালো জ্যোতির্ময়। এই পাড়াটা নতুন এবং নিরি-বিলি। ইতস্ততঃ কয়েকটা বাড়ি সদ্য হয়েছে, বাকি প্লটগুলো এখনো শুধু পিলার-চিহ্নিত হয়েই পড়ে আছে। গাছপালা অঢেল, কাটা পড়েনি। সুতরাং মফঃস্বল শহরের এ রকম এক প্রান্তে একখানা অ্যামবাসাডার ভর্তি মহিলা অতিথির আগমন একটু আশ্চর্য ও আচমকা ঘটনা। এরা সব কাদের বাড়িতে এল জ্যোতির্ময় ঠিক ঠাহর করতে পারল না। তার বাড়ির ফটক থেকে সামান্য তফাতে সাদা রং-এর গাড়িখানা এসে থেমেছে, গাড়ির মাথায় একরাশ হোল্ডঅল সুটকেশ বাঁধা।

দূরদৃষ্টিটা অনেকদিন থেকেই জখম, তাই জ্যোতির্ময় বইপত্রের স্তূপের মধ্যে থেকে তাড়া-তাড়ি চশমাটা খুঁজতে লাগলো। আর ঠিক তখনই সম্পূর্ণ অপরিচিত গলায় কেউ তার নাম ধরে ডাকল। ঈষৎ ঢিলে হয়ে যাওয়া চশমাটা নাকের গোড়ায় ঠাসতে ঠাসতে অবাক জ্যোতির্ময় ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

'কাকে খুঁজছেন আপনারা?' ড্রাইভারের পাশে বসা তরুণটিকে লক্ষ্য করে জ্যোতির্ময় কথা বলল। কারণ ট্রলক ছাড়া গাড়িতে সেই একমাত্র পুরুষ।

'জ্যোতির্ময় দত্ত রায়। চেনেন?'

'চিনি।' ঠোঁটের কোণে হাসির মত কিছু ধরা পড়ল পলকের জন্য, 'কিন্তু আপনারা?'

জবাবে গাড়ির দরজা খুলে সেই যুবকটি, কল্যাণাক্ষ, নেমে এসেছিল। ফ্লোরসেন্স চোঙ্গা ইণ্ডি টাইট টাইয়ের মত জুলফি, ব্রীজেশ গোঁপ, গায়ে মাল্টিকালার নিউজপ্রিণ্ট। খালি গলা, অর্থাৎ টাই নেই, দক্ষিণ হস্তে নিষ্কুটক ঘড়ি, কাঁটার বদলে ডায়ালের ওপরে মীটারের মত ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড ফুটে ফুটে ওঠে, একেবারে বার-তাবিখ-মাস পর্যন্ত। যুবকটিকে একনজরে ঝরঝরে ছাপা লেখার মত আপাদমস্তক পড়ে নিয়েছিল জ্যোতির্ময়।

আমরা কলকাতা থেকে আসছি। ওঁর বিশেষ পরিচিত। ইন-ফ্যাক্ট বিপদে পড়েই ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—ওঁর বাড়িটা যদি একটু দেখিয়ে দিতেন।

'আমিই।' জ্যোতির্ময় ঘাড় নুইয়ে কথাটা বলল, বলে হাসল।

'মাই গুডনেস! আপনি জ্যোতির্ময়-দা? জ্যোতিদা আপনি! নমস্কার, নমস্কার!' যুবকটি অর্থাৎ কল্যাণাক্ষ কেবল নমস্কার করেই ক্ষান্ত হল না, এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করল।

এবারে চমকাবার পালা, অপ্রতিভ হবার পালা আর নিজের। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। একেবারে দাদা সম্বোধন! দূরে থেকে কাকা জ্যাঠা এমন কি দাদু পর্যন্ত ইদানীং প্রায়ই শুনতে হয়, কিন্তু দাদা! তাও অপরিচিত, অত্যাধুনিক এই যুবকের মুখে এবং হঠাৎ, প্রায় পূর্বপ্রস্তুতি হীন। এ যে পলিটিক্যাল ফ্ল্যাটারির মত শোনালো।

ফেরত নমস্কার জানাতে পারেনি জ্যোতির্ময়, কল্যাণাক্ষ তখনও হোলসটাইম নামবার মত তার হাতখানা ধরেই ছিল, করমর্দনের পর ফেরত দেয়নি।

'কিন্তু আমি তো ঠিক আপনাদের'—

'কল্যাণাক্ষ সেন, আমার নাম। আপনার ছোট ভাই, দাদা, আমাকে আপনি আজ্ঞে করলে লজ্জা পাই। একটা চিঠি আছে দাদা, আপনার নামে।' কল্যাণাক্ষ হিপপকেট থেকে একখানা সাদা খাম টেনে বের করলো ম্যাজে-শিয়ানের মত।

'চিঠি! জ্যোতির্ময় একটু অবাক হয়েই তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে খামটা নিল। মুখখোলা খামের ভেতর থেকে চিঠিখানা বের করে দেখলো কে এক হিতেন চৌধুরী তাকে লিখেছেন। নামটা চেনা ঠেকলেও কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে গেল মানুষটাকে চিনতে। তার একরা কালের এক প্রকাশক বন্ধু। অনেককাল [illegible] করছে কিছুই জানা নেই জ্যোতির্ময়ের। লিখেছে 'প্রিয় জ্যোতি জঙ্গল মহলের অনেক খবরই তো তুমি একদিন রাখতে, আমি তোমাকে ওই অঞ্চলের অথরিটি বলেই মনে করি। এই মডার্ণ বাবালক-নাবালিকার দল যাচ্ছে জঙ্গলে উইক এণ্ড কাটাতে। পত্রবাহক স্বয়ং আমার গালা-গালির সম্পর্কে কুটুম। ক্যানাডায় গিয়ে ন্যাজে অগ্নি সংযোগ করে এই ঘাল্ড দেশে ফিরেছে। তার অন্য পরিচয় তুমি সাক্ষাতেই পাবে। যাই হোক, হঠাৎ গিয়ে পড়লেও ওদের একটা আস্তানা তুমি ঠিক জুটিয়ে দিতে পারবে এই বিশ্বাস আমার আছে। যতদূর মনে পড়ছে ওখান-কার ফরেস্ট অফিসার তোমার বিশেষ পরিচিত। আসলে মেয়েরা সঙ্গে থাকছে বলেই কিছু যা চিন্তা। নতুন কোন লেখায় কি আর হাত দিয়েছ? অনেক-দিন কোন খবর নেই কেন? কী ব্যাপার ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? প্রীতি নিও তোমার ছিতেন চৌধুরী।

কল্যাণাক্ষ এতক্ষণ জ্যোতির্ময়ের মুখের দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। চিঠিটা পড়া হয়ে যেতেই বলল, 'আপনার অরণ্যের কান্না বইটা আমি পড়েছি, মারাত্মক বই! দাদা আপনি লিখেছেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না! ছবির খুব পাবলিসিটি আছে ওই যে লিখেছেন—সভ্যতার কুঠার পড়ছে অস্তিত্বের মূলে আদিবাসী বৃক্ষসমাজ ক্রমশ অদৃশ্য শিকড়ে পিছু হাঁটছে একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে আরণ্যক চেতনা, অন্ধকারের রাজত্ব এসে গ্রাস করে নিচ্ছে সব। চমৎকার। জবাব নেই। ওখানকার গোটা পাতাটাই আমি মুখস্থ বলে যেতে পারি। বিভূতিভূষণের আরণ্যক ছাড়া আর কোন বই ওর পাশে দাঁড়াতেই পারেনা।

ও অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কল্যাণাক্ষর মুখের দিকে। প্রায় দুই যুগ আগে লেখা তার প্রথম এবং শেষ বই অরণ্যের কান্না বাজার থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেছে বহুকাল আগেই। প্রায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই। প্রথম অগ্নি-সংস্করণের পরে আর ছাপাই হয়নি। অগ্নিসংস্করণ কথাটা সে নিজেই এক সময় ঠাট্টা করে বলত। সাম্প্রদায়িক সাঙ্গার আগুনে মুসলমান দপ্তরীর বাড়ি পুড়ে না বাঁধা ফর্মাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। শ খানেক কপি বোধ হয় বিক্রী হয়েছিল বাজারে। নতুন প্রকাশক এই মার খেয়ে আর উঠে দাঁড়ায়নি, লেখকও না। আসলে জ্যোতির্ময় কস্মিন-কালেও লেখক নয়, কি খেয়ালে এবং বন্ধুদের তাগিদে ওই একখানা অপকর্ম করে বসেছিল, ব্যস ওই পর্যন্তই।

ওই বইয়ের কথা যে কেউ মনে রেখেছে বিশ্বাস করাই শক্ত। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরোয় নি সমালোচনা হয়নি, বই পড়ে কেউ ভালমন্দ একটা চিঠিও লেখেনি। আসার কি কথা যে নিজেই ভুলে গিয়েছিল।

'ইনফ্যাক্ট আসার সেই জন্যেই আসা।' কল্যাণাক্ষ আবার কথাটা তুলল, 'বন্ধুদের ফূর্তি সফরে যোগ দিয়েছি স্রেফ স্পটটা একটু সরেজমিনে দেখে যাবার জন্যে। আউটডোর গেম এখানে কেমন জমবে আঁচ করে যেতে চাই। খুট রীডারের মত কল্যাণাক্ষ অন্তর্ভেদী চোখে তাকিয়ে ছিল কিন্তু জ্যোতির্ময়ের মুখ দেখে কিছুই আন্দাজ করা গেল না। এমন আবেগহীন আগ্রহ শূন্য মুখ দেখে হয়ত কল্যাণ কিঞ্চিৎ নিরাশই হল। খবরটা শুনে উল্লসিত বা খুশী হওয়া দূরের কথা জ্যোতির্ময়ের মুখ দেখে বরং মন হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে কল্যাণের প্রস্তাবের গুরুত্ব বা তাৎপর্য সে ধরতেই পারে নি।

হয়ত সন্দেহের বশে নয়ত নিছক ভদ্রতার খাতিরেই জ্যোতির্ময় শেষপর্যন্ত প্রশ্ন করল অরণ্যের কান্না আপনি পেলেন কোথায়?

কেন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। পরে হিতেনদার সঙ্গে বইটা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানতে পারি প্রকাশক হিতেন চৌধুরী তিনিই স্বয়ং। এবং আপনি কেবল তার পরিচিত লেখকই নন ছাত্রজীবনের বন্ধুও। উনি আপনার জন্যে একটা হোচিট সামলে নিয়ে যেন কল্যাণ বলল

আই মীন আপনার বইটার জন্যে খুব দুঃখ করছিলেন। বলছিলেন গত বিশ বছরের মধ্যে—

মাছি তাড়াবার মত হাত নাড়তে দেখে কল্যাণ থেমে গেল। বুঝল জ্যোতি-র্ময় দস্তরমত এনিহাউ এসব পছন্দ করছেন না। রিয়াল আর্টিস্টরা অনেক সময়েই দেখা গেছে গ্যাস ফ্যাস তেমন লাইক করেন না।

আপনাদের বিপদের কথা কি যেন বলছিলেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাপারটা এবারে বলি আপনাকে। কল্যাণ যেন ব্যাইণ্ড লেন থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। আমাদের একটা গাড়ির ফুয়েল সার্কুলেশন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। এই গাড়িটারও কিছু মাইনর ট্রাবল দেখা দিয়েছে। সারাই হতে অন্ততঃ ঘণ্টা-খানেকসময় লাগবে। এই সময়টুকুর জন্যে যদি আপনার আশ্রয় পাওয়া যেত তাহলে—পেছন ফিরে গাড়িতে বসা মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে যেন জ্যোতি-র্ময়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল। আপনাকে এভাবে ডিস্টার্ব করতে অবশ্য খুব খারাপ লাগছে।

আপনারা কতজন আছেন? শুকনো মুখে সে জিজ্ঞাসা করে মেয়েদের ব্যাপারটা তার খুব মনঃপূত নয়।

আপনি কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট রাখছেন না।

কল্যাণের কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল। হেসে উঠল তারপর ওঃ। ঠিক আছে ঠিক আছে তুমিই বলব এখন থেকে। কতজন তোমরা?

ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে আমরা সাতজন আছি।

ভেতরে আসতে বল সবাইকে তোমাদের যতক্ষণ খুশী থাক। তবে—

কি তবে? কল্যাণ যেন কিছুটা আঁচ করে নিয়েই বলল আপনি যদি দাদা বিরক্ত না হয়ে থাকেন দ্যাটস অল।

কি আশ্চর্য বিরক্ত কেন হব, ছিতেন তোমাদের পাঠিয়েছে। জ্যোতির্ময় একটু ইতস্ততঃ করে বলে আসলে দুটোর বেশী ঘর নেই এবাড়িতে— তোমাদের মেয়েদের খুব অসুবিধে হবে। তার ওপর রান্নার লোকও নেই—

দরাজ গলায় পাড়া কাঁপিয়ে হাসল কল্যাণ। এই জন্যে আপনি ভাবছেন বুঝি জ্যোতিদা। ওঃ আপনি সত্যিই এযুগের মানুষ নন। এই ইয়ং ব্যাচেলিয়ান বেরিয়েছে স্পোর্টস করতে এরা সুখ সুবিধে কিছু চায় না। মাথার ওপরে একটুখানি ছায়া আর স্নানফান ব্যাপারগুলোর জন্যে মিনিমাম আড়াল ব্যস। পথে বেরিয়ে বিশ্রাম আর বিছানা কে চায়? এক মুহূর্ত থেমে কল্যাণ গাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁক দিল এই গায়ত্রী মঞ্জু কণিকা ফণিকা তোমরা পত্রপাঠ চলে এস। আমরা নির্ভুল ঠিকানায় পৌঁছে গেছি।

গাড়ির মধ্যে মেয়েরা সেটা আগেই আঁচ করেছিল মনে-মনে তৈরী হয়েই বসে ছিল। এখন কল্যাণের মুখের কথা খসতে না খসতেই গাড়ির দুপাশের দরজা খুলে গুটিকেটে বেরিয়ে আসা প্রজাপতির মত রঙীন টেরিলিন-নাইলন ফুরফুর করে বেরিয়ে পড়ল তারপর সারসের মত লম্বা লম্বা সপ্রতিভ পা ফেলে সোজা সামনে এসে দাঁড়াল।

দিস ইজ গায়ত্রী জ্যোতিদাদা। একটি দীর্ঘাঙ্গী ভিমেল ছাঁদের মুখ তরুণীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে কল্যাণ বলল একটু আগে রান্নার লোকের কথা বলছিলেন না? একে দেখে রাখুন। লেফটেন্ট দ্রৌপদী বলতে পারেন। চাকরি থেকে ছাঁটাই হলে ও ঠিক করে রেখেছে গ্র্যাণ্ড একখানা হোটেল খুলবে আর তার নাম দেবে আপ রুচি খানা। আপ কথাটার ইংরেজী বাংলা দুরকম মানেই ধরতে হবে।

মেয়েটি ভীষণ ফর্সা এবং সুন্দরী। নামকরণের সঙ্গে সঙ্গেই গায়ত্রী দুহাত তুলে জ্যোতির্ময়কে একটা ছন্দবদ্ধ নমস্কার জানিয়েছিল। এবার কল্যাণের কথা শেষ হতেই একটা সুরেলা ধমক ছুড়লো তার দিকে খুব হয়েছে এবার থামুন তো। তারপর জ্যোতির্ময়ের দিকে লক্ষ্য ফিরিয়ে মৃদু নরম গলায় বলল সব বানাল। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না কিন্তু ও একনম্বরের মিথ্যেবাদী।

তা হতে পারে কল্যাণ সহাস্যে বলল কিন্তু তুমি কি সত্যিই রাঁধতে জান না?

বোকার মত কথা বলবেন না, রাঁধতে কোন মেয়ে না জানে।

এবং চুল বাঁধতে। দলের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে ফোড়ন কাটল।

কিন্তু গায়ত্রীর হাতে একটা আলাদা স্বাদ।

হাতে? কে যেন আলতো করে চিমটি কাটার মত অর্থপূর্ণ প্রশ্নটাকে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক হাসি উলুধ্বনির মত ফেটে পড়ল। কোন পূর্ব প্রসঙ্গ জানা না থাকায় জ্যোতির্ময় বোকার মত অস্বস্তি বোধ করল ভেতরে ভেতরে। গায়ত্রীর ফর্সা মুখে যেন অসাবধানে সিঁদুরের ছিটে লাগল। হাসির মধ্যেই আর একটা চোয়া মন্তব্য জ্যোতির্ময়ের কান এড়াল না ওই আবার গায়ত্রী জপ শুরু হল।

কল্যাণ এসব স্ত্রীআচার আচরণে ভ্রূক্ষেপ না করে গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিল এখানে দাঁড়িয়ে আর জট পাকাতে হবে না তোমরা ভেতরে যাও। তোমাদের মেয়েলী ব্যাপার স্যাপার সেরে নাও আমরা পনের মিনিটের মধ্যে আসছি। আসুন দাদা—

কোথাও যেতে হবে?

চলুন ডি এফ ও-র সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা চুকিয়ে রাখি—

কিন্তু এরা?

লেট দেম সী ফর দেমসেলভস। ওরা বুঝে নেবে সব নিজেরাই। জ্যোতির্ময়কে নিজের বাসী পাজামা আর ভাঁজ খাওয়া গেরুয়া পাঞ্জাবীর দিকে তাকাতে দেখে কল্যাণ হর্ষধ্বনি করে উঠল ওহ্ দ্যাট্স আছে। চলবে চলবে আসলে জ্যোতিদাদা সে বিদ্যাসাগরী আমল চলে গেছে এযুগ ড্রেস ইজ নো বার। আমাদের এই সব পাঁচফোড়ন সাড়ে বত্রিশ ভাজা মার্কা পোষাক দেখেও কি আপনার মনে হয়নি এগুলো নাকুঁচু ভ্রূচু সভ্যতার মুখের ওপর জুতো মারা? আসুন আমাদের ন্যামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার আবার গ্যারাজ থেকে বাকি বন্ধুদের আনতে যাবে।

জ্যোতির্ময় আর ইতস্ততঃ করল না গাড়ির পিছনের সীটে কল্যাণের পাশে গিয়ে বসল। ছেলেটিকে তার ভালই লাগল। কিঞ্চিৎ বচনবাজ হলেও ভেতরে মাল আছে। চকমকি ঘষলেই টের পাওয়া যায়।

ডি এফ ও-র বাংলোয় একদফা চা এমলেট খেয়ে প্রায় মিনিট চল্লিশ পরে রিকসা করে দুজনে ফিরে এল। তিন পাহাড়ী বন্ বাংলোয় বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ায় কল্যাণ থেকে থেকে কি একটা টপ্পার সুরে ভাঁজছিল দু-একটা শব্দ শুধু গজদন্তের মত ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে পড়ছিল। সে বেজায় খুশী। তিন পাহাড়ী অবশ্য জ্যোতির্ময়েরই সাজেশান ছিল। চা খেতে খেতে সেখানকার কিছু খাসবাত শুনে ইস্তক তার যেন আর তর সইছে না। জ্যোতির্ময় একটুক্ষণ এর টপ্পার সুরে কান খাড়া রেখে জিজ্ঞেস করল নিখুবাবু?

না দাদা আমি কারো ধার ধারি না। সুর থামিয়ে সহাস্যে কল্যাণ জবাব দিল, এ একেবারে নিজ-কলের সতোর প্রস্তুত টপ্পার সুরে কিছু নিষিদ্ধ কথা জুড়ে নিয়েছি, অশ্রাব্য দেখছেন না? আরে এই তো, বাড়ি এসে গেছি।'

কথাগুলো শ্রবণযোগ্য ছিল না ঠিকই, কারণ দু-একটি শব্দ ছাড়া জ্যোতির্ময়ের কর্ণগোচর হয়নি কিছুই। কিন্তু কান এড়িয়ে গেলেও জ্যোতির্ময়ের নাসিকা ফেল মারার পাত্র নয়। ফিকে হয়ে আসা গন্ধটার উৎস এবং জাতকুল সম্বন্ধে এতক্ষণ নিঃসন্দেহ হয়ে গেল সে। কল্যাণের মুখ থেকেই বিলিতী সুবাসটা আসছে। কেমন একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা লাগল।

ভেতরে ঢুকতেই গায়ত্রী নামের মেয়েটা একটা ট্রে নিয়ে ছুটে এল, তাতে দু কাপ ধূমায়িত চা। সদ্য তৈরী হয়েছে বোঝা যায়।

রানার্স কাপ!' গায়ত্রী ঠোঁট টিপে হাসল জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে, 'এই আপনাদের পনের মিনিট? নিন দাদা, চা নিন।'

জ্যোতির্ময় হাসি সমেত একটা ঢোক গিলে ফেলল। গম্ভীর মুখে নিজেকে আড়াল করে চায়ের কাপ বিনাবাক্যে তুলে নিতে নিতে ভাবল, এরা কি সবাই কথাশিল্পী নাকি! কথার এমন চমৎকার মারপ্যাচ দিতে খুব কম লোকই পারে। অন্ততঃ সে নিজে পারে না। মনে মনে সে বেরসিক নয়, কিন্তু মুখে তার লাগসই কথা কখনো আসে না, কেমন আটকে যায়। হয়ত এগুলো চর্চার ব্যাপার, হাত মকসোর মত মুখ মকসো

করারও প্রয়োজন আছে, নইলে মুখ ফস্কে হঠাৎ কিছু বেরোয় না।

কল্যাণ কুর্ণিশের ভঙ্গিতে চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে বলল, 'ওয়াণ্ডার-ফুল! কিন্তু ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বলে একটা কথা আছে, তোমার উই-মার্সদের চা কোথায়? তাদের দাও!'

তারা শীল্ড পেয়ে গেছে। গায়ত্রী কাঁটা চামচের মুদ্রা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল তারা খাবারের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত।

কল্যাণ হো হো করে হেসে উঠল, জ্যোতির্ময় চায়ের কাপে চিমুক খেতে খেতে সামলে নিল। পাশের বৈঠকখানা ঘর তখন গুলজার, তারস্বর তর্ক আর হাসির হররা শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সেদিকে দ্রুত পা চালাতে চালাতে চঞ্চল কল্যাণ বলল দাদা আপনি গায়ত্রীকে একটু দেখুন আমি ওদিকে চললাম।

জ্যোতির্ময় কিছু বলার আগেই সে অদৃশ্য হল।

গায়ত্রী স্মিতমুখে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনি এখানে চা-টা শেষ করে তারপর ওই মেছোহাটায় ঢুকবেন। এই ডাইনিং টেবলটায় বসুন, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

জ্যোতির্ময় ঘরে ঢুকেই তিনটি নতুন মুখ দেখতে পেল, অভিজাত সচ্ছল চেহারার তিন যুবক, যাদের সে আগে কখনো দেখেনি। ওদের তুমুল তর্ক টাল খেয়ে যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থামলো, ঝেঁপে নতুন করে বৃষ্টি আসার আগে একটানা বর্ষণ যেমন করে দম নেবার জন্যে থামে। কল্যাণ তার তিন বন্ধুর, অবগতির জন্যে বলল, 'ইনিই জ্যোতির্ময়দা।'

ঘরের সবাই আগেই মুখ তুলে তাকিয়েছিল এবার কল্যাণের বন্ধুরা হাত তুলে নমস্কার জানাল, প্রতিনমস্কারের পালায় জ্যোতির্ময় একা। আত্মপরিচয় অবশ্য কেউ দিল না, কল্যাণের তরফ থেকেও ওসব পরিচয় করিয়ে দেবার কোন গরজ দেখা গেল না।

সকলের চেয়ে দীর্ঘ চেহারার মজবুত গড়ন যুবকটি সৌজন্যের হাসি হেসে বলল, 'আমরা সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট।'

দ্বিতীয়জন হাড়ে মাংসে দশাসই চেহারা, দেখলেই মনে হয় মনুষ্যরূপী একটি টাইট হোল্ডঅল, ইস্পাত ধূসর চোখের মণিতে কেমন কঠিন ঠাণ্ডা চাউনি বলল, ক্রমশ আলাপ হবে।' তৃতীয়জন না লম্বা না বেঁটে, না রোগা না মোটা, কিন্তু দেখলে মনে হয় একটা মূর্তিমান কিম্ভূতা আত্মগোপন করে বসে আছে। এই তৃতীয়জন মুখে কিছু বলল না শুধু ঠোঁটের হাসি দিয়ে জ্যোতির্ময়কে অভ্যর্থনা জানালো এবং চোখের দৃষ্টি তার জন্যে ঘরময় এক চক্কর দিয়ে দূরের একটি আসন নির্বাচন করল।

জ্যোতির্ময় নিজেও অবশ্য মনে মনে এই জায়গাটাই পছন্দ করে রেখেছিল। এবার সেইদিকে এগিয়ে গেল। ওরাও ওদের থেমে থাকা বাকযুদ্ধে ফিরে গেল তাকে নিয়ে আর মাথা ঘামালো না।

বৈঠকখানা ঘরের নিরাপদ কোণের সেই অ্যালফ্রু ইজিচেয়ারটায় গা ঢেলে দিয়ে জ্যোতির্ময় ওদের মাতামাতি লক্ষ্য করতে লাগলো। তার মনে হল এই বাড়িঘর আসবাবপত্রের মালিকানা বুঝি রাতারাতি বদলে গিয়েছে। সে এখন এখানকার কেউ নয় নীরব দর্শক বড়জোর। এখন তার সত্যি কিছু করার নেই।

এ-ঘরে ছেলেদের তর্কযুদ্ধ প্রায় ফ্রিস্টাইল কুস্তির রূপ নিয়েছে। চেয়ার-টেবিল-মোড়া-টবপয় সব যেন হঠযোগের আসন কুশন ফুশন চটকে দলা-পাকানো। সিগারেটের টুকরো পোড়া-কাঠি পাইপের ছাই যত্রতত্র। এঁটো কাপডিশ অঙ্গভঙ্গি ভেঙ্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে ছুরিকাঁটা-চামচ মিনিয়েচার ক্ষেপণাস্ত্রের মত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

আলাদা করে জ্যোতির্ময় আর এখন কিছু দেখছিল না দেখতে পাচ্ছিল না। মনের ভেতর সে কেমন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। তার মন আর এখন চোখকে অনুসরণ করছিল না। আলো করে আসা চোখে সে শুধু দেখতে পাচ্ছিল কতকগুলো দিগ্বিজয়ী ঠ্যাং জবর দখলী কনুই রক্ষণশীল মুণ্ডু আর আহ্লাদী চিবুক তর্কপ্রিতর্ক হাসি মস্করার মধ্যে থেকে থেকে ভঙ্গী আর ভর বদলাচ্ছে; দু একটা মেয়েও থেকে থেকে বাঁয়া তবলার মত কেতরে পড়ে তাল দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদের কথাগুলো তার কানে আসছিল তবে মন পর্যন্ত পেঁছাচ্ছিল না।

ওদিকে সজ্জাশুদ্ধ বাথরুম যেন অবিশ্রান্ত জলসা ঘর এক মুহূর্ত জলের বিরাম নেই শুধু জলের শব্দ আর গান জলের শব্দ আর গান; কেউ যেন বকলস খুলে তার বিপজ্জনক গলাটাকে ছেড়ে দিয়েছে। ছাদের ওপরে অনেকক্ষণ থেকে নানা রকম রহস্যময় ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছে কেউ বা কারা উর্ধলোকে অ্যান্টিসোস্যাল নাচফাচ জুড়েছে কিনা ঈশ্বর জানেন। গোটা বাড়িটাই এখন থিয়েটারের স্টেজের মত প্রকাশ্য এবং প্রাণবন্ত। এখানে কার কি ভূমিকা বোঝা কঠিন, কে কোন গল্পের সুতোয় ঝুলে আছে ঠিক এক্ষুণি বলা যাচ্ছে না। ন-জন যেন মাত্র ন-জন নয় তিন নং সাতাশ হয়ে গেছে, কেউ কোথাও স্থির নেই।

জ্যোতির্ময় ভাবছিল এই জেনারেশনটাই এ-রকম কৃতজ্ঞতার ফিতজ্ঞতার ধারাই নেই কোন কেতাবী ভদ্রতার ধার ধারে না। এরা যেন এল দেখল আর জয় করে নিল যে-কোন অবস্থা নিজের করে নিতে এদের জুড়ি নেই। এই বাড়ি এই ফাঁকা জায়গা এরা যেন জিতে নিয়েছে, এবং পরের মুহূর্তে ভুলে গেছে, জ্যোতির্ময় এখন কোন ব্যাপার নয়। এই আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়নি তাদের কালে কৈশোরে যৌবনে এরকম ভাবাই যেত না। এ যুগটাই বুঝি, নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল নিঃশর্ত জয়ের।

ঘুরে ফিরে কেবলই নিজের জীবনের কথা মনে আসছিল এই অপরিচিত হুল্লোড়ের মধ্যে। এই বাড়িটা জ্যোতির্ময়ের কাছে অনেক কিছু। দুটি নির্মম মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করতে হয়েছে এখানে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত সেই নিরন্ত লড়াইয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছু পিছু হটতে হয়েছে তাকে। হেরে গেছে সে, নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় দুটি মানুষকে নিজে হাতে বিদায় দিতে হয়েছে শেষপর্যন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার হয়েছে কার, সে মীমাংসা এখনো বাকি। তার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে জ্যোতির্ময়। সেকথা এখন থাক, হচ্ছিল এই বাড়িটার কথা।

কচ্ছপের খোলের মতই এই বাড়িটা বুঝি তারই গায়ের মাপে মাপে তৈরী হয়েছিল। এটা তার সম্পত্তি নয়, এটা তার বর্ম। এই খাপের মধ্যে একবার এসে ঢুকতে পারলে সে নিশ্চিন্ত। এটা তার আশ্রয় নয় শুধু, আড়াল। মৃত্যুর অনেক আগেই এক একজন মানুষ একবারে চুপ করে যায়, জ্যোতির্ময় সেই জাতের। প্রায় বারো বছর সে এই নির্জন মফস্বল শহরের নির্জনতর পাড়ায় নির্জনতম বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে আছে। জীবিকান্নের তাগিদে বাইরে মুখ বাড়ায় অবশ্যই কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্য।

নিঃশব্দ হয়ে গেছে জ্যোতির্ময় কিন্তু থেমে যায় নি। ঘড়ির মত না থেমে চলেছে এই চলার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য নেই, তেমনি আলস্যও নেই। স্বনির্ভর স্বপাক,—নিজের হাতে পায়ে ভর করে চলেছে—হোলটাইম সেলফ হেলপ যাকে বলে। ঘুমভাঙ্গার পর প্রথম চা করা থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাবার আগে মশারি টাঙ্গানো পর্যন্ত সব নিজে হাতে। দাড়ি কামানো থেকে জুতো পালিশ। এভারিথিং ঘড়ি ধরে এবং রুটিন মাফিক।

কিছুকাল আগেও বন্ধুরা কখনো-সখনো এখানে চলে আসতো, ইদানীং কয়েকবছর সেসব থেমে গেছে, কারণ কোন ব্যাপারই একতরফা বেশি দিন চলতে পারে না। বন্ধুরা এসে ঠাট্টার সঙ্গে ক্ষোভ মিশিয়ে বলত, 'তুই যে একেবারে ঋষি বনে গেলি জ্যোতির্ময়।'

'গেলাম নাকি?' ও হেসে বলত, 'ঋষি আর বনতে পারলাম কই?'

'পারিস নি তো এরকম গুটিয়ে নিয়েছিস কেন নিজেকে?'

'ল্যাটাই হয়েছি।' জ্যোতির্ময় পাল্টা ঠাট্টা করেছে, 'একদিন না একদিন তোমাকে সুতো গুটোতেই হবে। চিরদিন কিছু তোমার হাতে ঘুড়ি উড়বে না।'

'ওরেঃ ফাদার! এযে বাণী, আহা মরি ধম্মকতা। আমাদের মত গেরস্থ মানুষ এসব বুঝবে না!'

'আমিও তো গৃহস্থ।'

'গৃহ থাকলেই গৃহস্থ হওয়া যায় না, জ্যোতি! সিং থাকলেই কি সিংহ হয়?'

'তোমাদের বিচারে গৃহস্থের আর কি কি কোয়ালিফিকেশন দরকার?' জ্যোতির্ময়ের গলা ঠাণ্ডা, তর্কের কোন ঝাঁঝ ছিল না প্রশ্নটার মধ্যে। বরং বন্ধু-বরের উত্তেজনা সে সকৌতুকে উপভোগ করছিল বলা যায়।

'বাদ দে। জেনে তোর লাভ হবে না কিছু। যেমন আছিস থাক, জীবনটাকে এইভাবে একা একা কাটা, আমরা তোকে বিরক্ত করতে আসছি না। শুধু যাবার আগে একটা কথা জেনে যাই, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এমন রুটিন মেনে তুই চলছিস কিসের জন্যে কার জন্যে?'

জ্যোতির্ময় সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। তার মুখে অদ্ভুত এক ধরনের হাসি খেলা করছিল।

একসময় ফিসফিস করে জ্যোতির্ময় বলেছিল, তোদেরমত গেরস্থ মানুষ হয়তো বুঝবে না, তবু বলছি। এখানে, এই ঘরে, একদিন এক ভদ্রলোককে রিসিভ করতে হবে, তার জন্যে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছি। তিনি কথার মানুষ, তাঁর সময়ের দাম আছে, ভেরী ভেরী পাংচুয়াল।

জ্যোতির্ময়ের বাল্যবন্ধু শিবনাথ অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখের জমাটা সজল হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। বার দুই ইতস্ততঃ করে শিবনাথ শেষে বলল, 'তুই কি মৃত্যুর কথা বলছিস?'

জ্যোতির্ময় কোনো উত্তর দেয় নি।

।। দুই ।।

কল্যাণ আর জ্যোতির্ময়কে নিয়ে সাদা গাড়িখানা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর মেয়েরা সবাই একসঙ্গে বাড়ির ভেতর ঢুকলো।

প্রথম বসবার ঘরে ঢুকেই ওরা কেউ কেউ হকচকিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল ঘরের কোণে বসে কেউ গুণগুণ করে গান গেয়ে চলেছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ভুল ভাঙলো, টেবিলের ওপরে একটা ট্রানজিস্টর প্রায় কানে কানে ভলামে খোলা রয়েছে এবং তা থেকে যে বিশেষ গানটির যে বিশেষ লাইনটি সেই মুহূর্তে শোনা যাচ্ছিল তা চমকাবার পক্ষে খুব অনুপযুক্ত নয়, 'এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে—'

শিবানী হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'বুড়োর গানগুলো মাইরী এক-এক সময় আমাদের মত ছুকরিদেরও পিলে চমকে দেয়। স্টার্ট বিজনেসটা গুরু আমাদের ভালই জানতেন।'

শিবানী টেবিলের কাছে গিয়ে রেডিওর ভলিউম বাড়িয়ে দিল। ওর কথা বলার মধ্যে রীতিমত একটা কমিক ভঙ্গী ছিল, কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ হেসে উঠল।

'তোর মুখের জন্যে একটা লাগাম সত্যিই দরকার হয়ে পড়েছে।' ওর স্কুল জীবনের বন্ধু গায়ত্রী কথাটা বলে মাথায় হাল্কা করে চাঁটি লাগালো, 'এদিকে দুজনে তো বলে রবীন্দ্রসঙ্গীত তুই ভীষণ ভালোবাসিস। কার কাছে নাকি এই বুড়ো বয়সে গান শিখছিসও।'

দলের মধ্যে এই দুজনেই বয়সে খুব বড়ো, কথায় মারপ্যাঁচ দুজনের মধ্যে লেগেই থাকে। যেমন দুজনের গলাগলি ভাব, তেমনি কথায় কথায় চুলোচুলি স্বভাব। গায়ত্রী ওর একটু আগের সেই মন্তব্যটা, সেই গায়ত্রী জপ করার কথা ভুলতে পারছিল না। গায়ত্রী কল্যাণকে মনে মনে পছন্দ করে, হয়ত ভালইবাসে তাতে ও মুখপুড়ীর এত গায়ের জ্বালা কেন? কল্যাণ যে ওর প্রতি পক্ষপাত দেখায় সেটা ওর সহ্য হয় না, অথচ নিজে অন্য জায়গায় কথা দিয়ে বসে আছে!

'কি শিবানী, ফ্যাকট?' আরাধনা কৌতুকের গলায় জিজ্ঞেস করে।

ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন করে সাবানের ফেনার উড়ন্ত বলগুলোকে ফুঁ দিয়ে ফাটায় ঠিক তেমনি করে শিবানী বলল, 'ফুঃ! ভালোবাসা-ফালো-বাসা শিবানী রায়ের অ্যাকাউন্টে নেই। আমার হচ্ছে নগদ নারায়ণ। যা সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ করা যায় না তাতে আমার ফালতু ইনটারেস্ট নেই। আসলে যেসব গানে লাগসই কথাবার্তা থাকে শুনি এই পর্যন্ত।'

অনুরাধা টেবিলে রাখা আয়নার মধ্যে বারদুই ভেংচি কেটে নিজেকে দেখে নিয়ে বলল এবার টয়লেট ফার্স্ট।'

'এমার্জেন্সী?' শিবানী ভুরু নাচাল।

'সিম্পল ওয়াটার।' বলেই অনুরাধা ঘরের অন্যদিকের দেওয়ালে এক পাল্লার দরজা লক্ষ্য করে ছুটলো। অনুমান নির্ভুল, লাগোয়া বাথরুমের দরজাই সেটা। চোখের পলকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্য আর একটি খোলা দরজা দিয়ে ডাইনিং স্পেস দেখা যাচ্ছিল। সেখানে খাবার টেবিল ঘিরে চারদিকে চারটে চেয়ার, পাশে বেসিন, আয়না বসানো। ডাইনিং স্পেস পার হলেই ভেতরের ঘরখানা, শোওয়ার ঘর।

শিকারের গন্ধ পাওয়া বেড়ালের মত শ্রীলা তার ছুরির ফলার মত নাকের ডগা বাড়িয়ে যেন দেওয়াল শুঁকে বেড়াচ্ছিল। গায়ত্রী ঘরের কোণের ইজি-চেয়ারখানায় শুয়ে দোল খাচ্ছিল। শ্রীলার দিকে চোখ পড়তেই হেসে ফেলল, 'কোনো সন্দেহজনক গন্ধ পাচ্ছ জুতগাহ নয় তো?'

'ছ মাসের মধ্যে কলি ফেরাতে হয়েছে।' দেওয়ালের থেকে চোখ না সরিয়েই শ্রীলা জবাব দিল, 'বছর আট দশ বয়স হয়েছে বাড়িটার। নাঃ ভদ্রলোকের টেস্ট আছে। ওহ্ ন্যাস্টি এই ব্যাপারটা আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না!' বলেই আঙুল বাড়িয়ে টেবিলের এককোণে রাখা দাড়ি কামানোর গেলাসটা দেখালো।

গায়ত্রী সারসের মত করে গলা উঁচিয়ে দেখে বলল, 'ও, তাই বলো ভদ্রলোক একটু আগে দাড়ি কামিয়েছেন বোধ হয়। তা তোমার এত ক্ষুব্ধ হবার কি আছে সুন্দরী? পুরুষরা চিরকাল দাড়ি কামিয়ে এসেছে, কামাচ্ছে এখনো কামাবে। তোমার হবু বরও নিশ্চয় যদি মাকুন্দা না হয়, দাড়ি কামায় দেখো গে যাও।'

'বর্বরের মত কথা বলিস না গায়ত্রী, মাকুন্দা হবে কোন দুঃখে সেটা শিবানী ঝাঁঝিয়ে ওঠে। শ্রীলা অপ্রস্তুত হয়, বলে, 'আহা, আমি তো দাড়ি কামানোয় কোন অবজেকশন দিয়েছি! আমি বলছিলাম পুরুষদের জাত কুঁড়েমির কথা। দাড়ি কামানোর পর কক্ষনো গেলাসটা পরিষ্কার করে না। হয় বউয়ের জন্যে নয় বোনেদের জন্যে জীইয়ে রেখে দেবে। আজ সকালবেলাতেই ওই বাথরুমে সাবানের গোলা দেখলে আমার ঘেন্না ঘেন্না করে গা গুলোয়।'

'যাকগে মরুগে। লোকটার খুব দোষ বোনও না। বোঝাই যাচ্ছে সময় পায় ধুয়ে ফেলার। তুমি বরং হাত বাড়িয়ে সদর দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও অচেনা ফাঁকা জায়গা, বলা যায় না দিনকাল পড়েছে'—গায়ত্রী ইজিচেয়ারে দোল খেতে খেতে বলল।

'সত্যিই এটা কারো খেয়াল হয়নি বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে আসতে অনুরাধা বলল।

'আমাদের স্নান-ফান সেরে নিতে হত। কল্যাণবাবু তো মিনিট পনের মধ্যেই ফিরে আসছেন বলে গেলেন। দরজার ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিয়ে শ্রীলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল।

'ছেলেদের পনের মিনিট সময়ের তোমার কোন ধারণা নেই, শ্রীলা দেবী ছেলেরা কোন দিন পনের মিনিটের মধ্যে ফেরে না।' শিবানী গায়ত্রীর দিকে একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করে বলল, 'অন্তত এক ঘন্টার আগে কারো টীকি দেখতে পাচ্ছ না জেনে রাখ।'

অনুরাধা বলল, 'আপনি ভাই স্নান সেরে আসতে পারেন, ফার্স্টক্লাস বাথরুম কমোড থেকে শাওয়ার ইস্তক আছে

এই মফস্বলে, একটা গ্রান্ড ঠাট্টার মত লাগে।'

শিবানী চোখ কপালে তোলার ভঙ্গী করে বলল 'তোমরা কি সেই ট্যাক্সের বাসী জলে কাকস্নান সারতে এতদূরে ছুটে এসেছ। কোথায় ফরেস্টে গিয়ে পাহাড়তলীর ঝর্ণার জলে স্নান করবে, তবে তো উইকএন্ড সার্থক হবে! আমি বাপু এখানে জলস্পর্শও করছি না—'

অনুরাধা অবশ্য এই মুহূর্তে স্নানের কথাও ভাবছিল না বাথরুমের কথাও ভাবছিল না, তার মনের মধ্যে তার চেয়েও জরুরী একটা ভাবনাই ফিরে ফিরে আসছিল। একটা প্রবলেম কিছুতেই সে সল্ভ করতে পারছিল না। এতক্ষণ বাথরুমে ঢুকেও নিজের স্মৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরে এসেছে কিন্তু কোন মীমাংসা হয়নি। এই মানুষটা তার চেনা, ভীষণ চেনা, কিন্তু কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। তাদের বাড়িতে মামলা মোকদ্দমার প্রয়োজনে কত রকমের মানুষই তো আনাগোনা করে, তাছাড়া বাবার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। হঠাৎ কেমন আশঙ্কা হল, এই ভদ্রলোক তেমন কেউ নন তো? তা হলেই সর্বনাশ, অনুরাধাকে যদি চিনতে পেরে গিয়ে থাকেন, তাহলে বাবার কানে ঠিকই উঠবে! ইস, এমন নাটকীয় ঘটনাও ঘটে! সমস্ত বিখ্যাত জায়গা ছেড়ে যখন এই নির্জন জঙ্গলরাজ্যে আসার কথা হয়েছিল তখন অনুরাধা মনে মনে এই ভেবে স্বস্তি পেয়েছিল যে আর যাই হোক চেনাজানা কারো সঙ্গে দেখা হবে না।

পথে আসতে আসতে বারদুই জ্যোতির্ময় দত্তরায়ের বিষয়ে কথা উঠেছিল গাড়ির মধ্যে। তখন অনুরাধা সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই ভদ্রলোকের বিষয়ে কোনই কৌতূহল বোধ করেনি। শুধু এইটুকু জেনেছে ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছাবার আগে স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাড়িতে সামান্য সময়ের জন্য হল্ট করবে। এই বয়স্ক ভদ্রলোক নাকি একা থাকেন। নাম থেকে এবং এই তথ্য থেকে ভদ্রলোকের সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা তখন গড়ে ওঠেনি স্বীকার বলতে কি তাঁকে নিয়ে সামান্যতম মাথা ঘামানারও প্রয়োজন বোধ করেনি অনুরাধা। অথচ কে জানতো এই ভদ্রলোকই তার সর্বক্ষণের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে!

এরকম মফস্বলে মধ্যবয়সের পর একা থাকতে পারে দুধরনের মানুষ—এক, তিনকাল খাওয়া তিনকুল খোয়ানো শাহানশাহ বুড়ো; দুই, সমাজ থেকে নানা কারণে গা ঢাকা দেওয়া মানুষ যারা নামে সঙ্গে একা থাকে বটে কিন্তু আসলে ঠিক উল্টো। পয়সা এবং মেয়েমানুষ যাদের হাতের খোলামকুচি। ক্যাটল রেইজিং কি গাছের গুঁড়ি কিংবা ব্রিফ্‌কেস ফার্ম আগলে হয়ত বসে আছে অথচ ভেতরে ভেতরে কি ধরনের বিপজ্জনক মানুষ বাইরে থেকে আঁচ করবার উপায় নেই।

এ ধরনের ক্যারেকটারের সঙ্গে শরদিন্দুদাদের মত কালচার্ড ইয়ংম্যানদের কোন যোগাযোগ থাকার কথা নয়, তবে অল্পস্বল্প ড্রিংক করা যাদের নেশার দাঁড়িয়ে গেছে তাদের জগৎটা বড় বিচিত্র। মদের নেশাই বোধহয় একমাত্র নেশা যা অনায়াসে সম্পূর্ণ অসমান দুটো মানুষকে এক কব্জায় এঁটে দিতে পারে। কল্যাণবাবু পথে আসতে আসতে ঠাট্টা করে একটা মজার কথা বলছিলেন, পৃথিবীতে নাকি শুধু দু ধরনের ব্লাড গ্রুপ আছে—অ্যালকোহলিক এবং নন-অ্যালকোহলিক। অ্যালকোহলিকরা সুতরাং এক জ্ঞাতিগোত্রের মধ্যে পড়ে।

ওদের গাড়ি যখন জ্যোতির্ময়বাবুর বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল আর কল্যাণবাবু গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মত গল্প জুড়েছিলেন তখনও অনুরাধা বুকের ভেতর ধাক্কা খায়নি, বরং তার ভালই লাগছিল মানুষটার চেহারা আর ভাবভঙ্গীর সঙ্গে তার মনের মধ্যে গড়ে ওঠা ছবির এক আঁচড় মিল নেই দেখে। কিন্তু তাল কেটে যেতে বিলম্ব হয়নি। কল্যাণবাবুর ডাকে ওরা যখন ভদ্রলোকের মুখোমুখি দাঁড়াল অনুরাধার বুকের ভেতরটা সেই মুহূর্তে হিম হয়ে গেল: সঙ্গীরা কলরব করছিল, হাসিতামাশা গাল্টেপাল্টেপি, কিন্তু অনুরাধা কাঠের পুতুলের মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মুখে একবিন্দু শব্দ ছিল না। ক্ষীণ ভরসা যেটুকু ছিল ভদ্রলোক বারদুই অদ্ভুত ধরনের হাসিছড়ানো ঠোঁটে তার দিকে তাকাতেই সেটুকু উপে গেল। কেবল মনে হল ভদ্রলোক যে তাকে চিনতে পেরেছেন সকলের অলক্ষ্যে সেটা জানান দিয়ে রাখলেন।

সম্পূর্ণ অচেনা কোন মানুষের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ির মধ্যে (সেই বাড়িটাও আবার যদি সম্পূর্ণ অজানা হয়) প্রথমে পা ফেলতে কিরকম অদ্ভুত একধরনের শিহরণ জাগে। সেই বাড়ির ভেতরের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা প্রতিটি আসবাব প্রতিটি সামান্যতম টুকিটাকি জিনিসে যেন সেই না-হাজির মানুষটার কণ্ঠ মুদ্রিত হয়ে আছে। যেন স্পর্শমাত্র চিৎকার করে উঠবে, যেন গ্রামোফোনের দমদেওয়া ডিস্কে রেকর্ড চাপানো রয়েছে। শুধু একটি পিনের বিন্দুমাত্র ছোঁয়ার অপেক্ষা, নির্ভুল কথায় বেজে উঠবে।

ঠিক বুদ্ধি দিয়ে এই অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না অথচ অনধিকার প্রবেশ মাত্রই হয়ত মানুষের মনের মধ্যে এই ধরনের অস্বস্তি জাগায়। মঞ্জুশ্রীর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল, যদিও সে একা নয় একসঙ্গে ছুটি মেয়ে এই অচেনা অজানা বাড়িটার মধ্যে তারা ঢুকেছে। এবং ভেতরে কিছু নির্জনতা ভারী হয়ে নেই, একটা ট্র্যানজিসটার সেই মুহূর্তে গান দিচ্ছিল, তার ভল্যুম বাড়িয়ে দিতে একটি ভারী পুরুষের গলা গমগম করতে থাকলো। গানের কথাগুলোও যেন আক্ষরিক অর্থে তাদের অভ্যর্থনা জানালো। নির্জনতা মুছে দিতে এইটুকুই সব নয়, সঙ্গিনীদের কলহাস্য এবং কথাকাটাকাটি হাওয়া বদলে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তবু মঞ্জুশ্রীর বুকের ভেতরটায় স্পন্দন দ্রুত হয়েছিল, নেশাচ্ছন্নের মত মাথাটা সামান্য ঝিমঝিম করছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটলো আর একটু পরে যখন বাইরের ঘর থেকে সে ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে ভেতরে শোবার ঘরের দাওয়ায় গিয়ে পা রেখেছে। সেই এক দৃশ্য, এমন এক যে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়। সিঙ্গল খাটের ওপর নির্ভাজ বিছানা টান টান করে বেডকভার দিয়ে ঢাকা। সেই গেরুয়া রঙের বেড কভার, সেই একইভাবে তার ওপরে দাবার ছক পাতা, গজ বড়ে সাজানো যেন এক্ষুণি কারাঃখেলা শুরু করবে। ইতস্ততঃ করে সেই বিছানার দিকে একপা বাড়িয়েছে অমনি তীক্ষ্ণ কলিংবেলের একটানা কামড়। মাথাটা ঘুরে গেল চোখের সামনে হঠাৎ ব্ল্যাকআউট হয়ে গেল যেন। মঞ্জুশ্রী মেঝের ওপর কাটা গাছের মত লুটান পড়ে যাচ্ছিল, অনুরাধা ছুটে এসে ধরে ফেলল।

ভারী শরীরটাকে অনেক কষ্টে টেনে নিয়ে গিয়ে বিছানার ওপর শুইয়ে দিতে দুয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান ফিরে এলেও তার ফ্যালফ্যালে চোখের দৃষ্টিতে তখনও কেমন একটা ঘোর, যেন চৈতন্য মেঘলা হয়ে আছে। একটু পরে হারানো কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়ে সে প্রথম প্রশ্ন করলো, 'কলিং বেল কে বাজালো?'

'কলিং বেল?' ভ্রূ কুঁচকে অনুরাধা এক মুহূর্ত তাকাল মঞ্জুশ্রীর মুখের দিকে, তারপর কি মনে হতে বলল 'ওহো আপনি সেন্সলেস হয়ে যাবার আগে ওই টাইমপীসটার অ্যালার্ম বাজতে শুনেছেন।'

মঞ্জুশ্রী বিছানার ওপর ধীরে ধীরে উঠে বসে অনুরাধার আঙুল বরাবর তাকিয়ে তাকের ওপর রাখা ঘড়িটা দেখতে পেল।

'কেমন বোধ করছেন এখন? ভালো? আচ্ছা কি হয়েছিল আপনার, হঠাৎ অমন—'

'মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখলাম। ও কিছু না, কখনো-সখনো আমার অমন হয়।'

'নিশ্চয়ই আপনার ব্লাডপ্রেশার আছে আই মীন্ বেড়েছে। একবার চেক-আপ

করিয়ে নেবেন কলকাতায় ফিরে। দেখুন তো, আজ এক্ষুনি একটা বিপদ হয়ে যেতো আমি ধরে না ফেললে। না না এসব নেগ্লেক্ট করা ভাল না, আগে থেকেই সাবধান হওয়া দরকার।'

মঞ্জুশ্রীর কানে তখন অনুরাধার একটা কথাও ঢুকছিল না, কেমন দৃষ্টিহীন চোখে সে ঘটে যাওয়া দৃশ্যটাই আবার দেখছিল।

ঘরের মধ্যে তখন কোন শব্দ ছিল না। শুধু গেরুয়া রঙের ঢাকা দেওয়া বিছানার ওপর দাবার ছকটা সাজানো। রাজামন্ত্রী গজ বড়ে নিয়ে পরস্পরের ওপর দুপক্ষই ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। মঞ্জুশ্রী যেই সেদিকে একপা এগিয়েছে অমনি কলিং বেল বেজে উঠলো। আচমকা বেল বাজার তীক্ষ্ণ আওয়াজে কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল সে, তবে তক্ষুণি মাথা ঘুরে অন্ধকার দেখেনি সেদিন।

কিন্তু সব শেষেরই একটা আরম্ভ আছে, সেই আরম্ভ থেকেই মঞ্জুশ্রীর কাহিনী শুরু করা যাক।

মঞ্জুশ্রীর দিন একেবারে সকাল থেকে মাপা। ছুটির দিনগুলো ছাড়া সপ্তাহের ছ'টা দিনই তাকে বেশ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হয় সওয়া নটার মধ্যে। বাড়ি থেকে ট্রাম ডিপো তিন চার মিনিটের পথ কিন্তু নটা পঁচিশের লেডিজ ট্রামটা ধরতে এবং তাতে বসতে হলে লাইনে গাড়ি দেবার আগেই ডিপোয় পৌঁছানো ভাল হয়। তাই খুব ভোরে উঠে যন্ত্রের মত সে কাজ করে যায়। এসংসারে লোক আছে অনেক কিন্তু কাজের লোক বেশী নেই। তার হাতের চা না হলে বাবার মুখে রোচতো না একদিন, মঞ্জু আজও সেকথা মনে রেখেছে। বিশেষ করে দিনের প্রথম চা বিছানায় শুয়ে খাবার চা যাকে বেড-টি বলে—সেই পয়লা কাপের ব্যাপারে বাবা ছিলেন ভীষণ খুঁতখুঁতে। মায়ের তৈরী চা পছন্দ হতনা বোনেরা দৈবাৎ কোন কারণে যদি কোন দিন চা বানিয়েছে বাবা প্রথম চুমুকেই বুঝতে পেরে যেতেন এবং সেই চুমুকই শেষ চুমুক হত। বাবার যদিও আজ আর কিছু বলার নেই সামান্য গোপন অভিমান ছাড়া পছন্দ-অপছন্দ সব ফুরিয়ে গেছে মুখ ফুটে তিনি কাউকেই কিছু বলেন না। আর বেড-টি ব্যাপারে মতন শোনাবে কারণ আজ দেড়বছর বাবা বেডরিডন্ হয়ে আছেন পক্ষাঘাতে; বিছানার ওপরেই তাঁর যাবতীয় কাজ। তবু মঞ্জু এখনো ঠিক সাতটায় বাবাকে বেড-টি খাওয়ায়, পাকা নার্সের মত এক তরফা প্রায় গল্প করতে করতে থার্মোমিটার পড়ে বেডপ্যান দেয়, ছোট ছেলের মত পরম যত্নে মুখ ধোয়ায় জামাকাপড় বদলায় বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় খুলে নিয়ে মেশিন ঘুছানা করে পৌঁছে ছিটেফোঁটা আদরের সকালের খাবার খাওয়ায় ভিভার গ্লাস মুখে ধরে। তখন মঞ্জুকে দেখলে মনে হবে ঠিক যেন একটি মা-পাখি, অসহায় অবোলা ছানাটির পরিচর্যা করছে। খুকু আর বিবি (ওদের দুজনের নামই বিবি হলে মানানসই হত) তখনও পাশ-বালিশ আঁকড়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। মা রান্নাঘরের ছোট্ট হাজতটুকুর মধ্যে আটক, নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, রোববার কি অন্য ছুটির দিন হলে মঞ্জু তাকে জামিনে খালাস দেয়; নিজে বঁটি পেতে বসে হাতাখুন্তির দখল নেয়। আঘাতে আঘাতে মায়ের শরীর ভেঙ্গে গেছে, হাইপ্রেশারের রোগী আগুনের আঁচ পোহানো ডাক্তারের বারণ। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ হয়ত আনা যায় কিন্তু বিধিনিষেধ খুব কমই মানা যায়।

আজও সকালে উঠে মঞ্জুশ্রী প্রতি-দিনের মত দম দেওয়া পুতুল হয়ে গিয়েছিল। বাইরে থেকে দেখে তার অন্যদিনের সঙ্গে কোন তফাৎ ধরতে পারার কথা নয়। কিন্তু শয্যাগত সেই বৃদ্ধ কেমন করে কিছু আন্দাজ করে নিয়েছিলেন সম্ভবত। শরীরের ওপরে তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই কিন্তু চোখ আর কান তাঁর সব অক্ষমতা পুষিয়ে দেবার জন্য যেন আরও তীক্ষ্ণ আর দূরগামী হয়ে। মঞ্জুর বাবা আজ একমুহূর্তের জন্যেই মেয়ের মুখ থেকে চোখ সরান নি। মঞ্জুশ্রী ভেতরে ভেতরে ভীষণ ডিস্টার্বড ছিল নইলে সেও বুঝতে পারতো বাবা অন্য-দিনের মত তাকাচ্ছেন না। আসলে মঞ্জু তখন ভাবছিল এই ক্ষীণ পরমায়ুটির সুতো সে এখনও পর্যন্ত বাঁধা আছে। এ সুতোও যে কোন সময়ে ছিঁড়বে, আর তখনই এ সংসারে মঞ্জু প্রকৃত একা হয়ে যাবে। কাল রাতেই সে প্রথম বুঝতে পেরেছে মানুষ হিসেবে এ বাড়িতে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। যদিও তার টাকার প্রয়োজন এ সংসারের ফুরোতে পারে না ফুরোবে না বরং যত দিন যাবে ততই আরও লম্বা হাত বাড়িয়ে তার সমস্ত উপার্জন সংসার ছিনিয়ে নেবে।

সব কাজ শেষ করে চলে যাবার সময় মঞ্জু হঠাৎ লক্ষ করল বাবার চোখের কোল দুটিতে দুফোঁটা জল। সস্নেহে জল মুছিয়ে দিয়ে বাবার গালে আদর করে একটা চুমো খেয়ে মঞ্জু বেরিয়ে গেল।

আজ এতদিন পরে হঠাৎ কেন এত ক্লান্তি বোধ হচ্ছে মঞ্জুশ্রী বুঝতে পারল না। জল ভর্তি ছোট চৌবাচ্চাটার সামনে জলের মগ হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বাথরুমটা খুবই ছোট, ইচ্ছে মত হাত পা ছড়িয়ে স্নান করা যায় না। মেঝে শ্যাওলায় পেছল, দেওয়ালগুলো থেকে ডাম্পের গন্ধ নাকে আসে, দিনের বেলাতেও একটা পঁচিশ ওয়াটের বাল্‌ব আলো মিটমিট করে জ্বলে। হ্যাঙ্গারে ঝুলোনো শুকনো জামাকাপড় সাবধানে বাঁচিয়ে জল ঢালতে হয়। ভেতরে পায়খানার ক্ষয়ে যাওয়া বন্ধ দরজার ফাঁকে ফাঁকে আরশোলা মুখিয়ে থাকে, শুড় নাচিয়ে নাচিয়ে মোতাত করে। এরা মানুষের অবক্ষয় অবনতি অবসাদ যেন উপভোগ করে। উত্তর কলকাতার এই সব মান্ধাতার আমলের বাড়িগুলো আলোহাওয়াশূন্য কফিনের মত ধীরে ধীরে মাটির তলায় বসে যাচ্ছে।

নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না মঞ্জু, তার সম্পূর্ণ খোলা শরীরটা, সুডৌল শুভ্র উরু থেকে স্তন পর্যন্ত কেমন জলছবির মত নিচু চৌবাচ্চার মধ্যে ভেসে রয়েছে। জীবন্ত অথচ অর্থহীন, কামনা বাসনাহীন, শ্বেত-পাথরে তৈরি একটা ভাঙ্গা স্ট্যাচুর মত নির্মুণ্ডু দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখতে না পেলে শরীরের কোন ভাষা বোঝা যায় না, কবন্ধ কেবল মূক আর বধির নয়, তবন্ধ অন্ধও, থ্রি ডাইমেনশন মুছে দিলে যা হয় এক অর্থে।

মঞ্জু ভাবল, এই সংসারেও কি আমি নিজের মুখ দেখতে পেয়েছি কোনো দিন? ভেবে কেমন ড্যাম্পের মত শীত অনুভব করল সারা শরীরে। কফিনের মধ্যে শুয়ে একমাত্র মৃতরাই যা অনুভব করতে পারে। শরীর ভাল ছিল না, অফিসে খাটুনী বেড়েছে, কদিন পর পর ওভারটাইম করছে, অফিস থেকে বেরিয়েও কাজ অন্য কাজ ছিল। শরীরে ক্লান্তির বোঝা নিয়ে ফিরছিল, ফেরার পথে বিবিকে দেখতে পেল সেই স্টুডিওর ছোকরাটার সঙ্গে হাসি-তামাশা করতে করতে ফটোর দোকানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। ইলেক-ট্রিক শক খাওয়ার মত সমস্ত শরীরটা ঝনঝন করে উঠেছিল মঞ্জুর, মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল সোজা গিয়ে ঠাস করে দুটো চড় কষিয়ে দেয় বিবির গালে, তারপর হিড়হিড় করে কান ধরে টেনে নিয়ে যায় বাড়িতে। অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করেছে মঞ্জু, পথে কোনো সিন ক্রিয়েট করেনি। মাতালের মত টলতে টলতে বাড়ি ফিরেছে। সত্যি, এবাড়ির ছেলে-মেয়েগুলোর হল কি। এই কদিন আগেও যাদের কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, বায়না আবদার মিটিয়েছে, কারো বারো গাল টিপলে এখনো দুধ বেরতে পারে তারাই যা খুশি করে বেড়াচ্ছে দিদিকে কেউ পরোয়া করতে চায় না। গত বছর মেজবোন পাঁতু যে কেলেঙ্কারীটা করল তার তাল সামলাতে নার্সিংহোমের বিল বিয়ের খরচ সব মেটাতে মঞ্জুকে অফিসের পরেও একটা টিউশানী যোগাড় করতে হয়েছে। এততেও এদের শিক্ষা হল না, খুকু কি করছে কে জানে তবে বিবিও পাঁতুর পথেই চলেছে। যে কোনদিন দুঃসংবাদ ছুটিয়ে বসবে। ছোটভাইটা [illegible]

হাড়িকাঠে মাথা দিয়েছে, আগুনে নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে, প্রায়ই রাতে ও বাড়িতে থাকে না মঞ্জু টের পায়। পুলিশ দু দুবার ওর সন্ধানে বাড়ি বেড় করেছিল। যাবে, কোনদিন খতম হয়ে যাবে! অথচ কিছুই করার নেই, ওই উদ্ধত ছেলেটা এখন সব শাসনের বাইরে। অথচ ও জানে না ওর মুখ চেয়েই অনেক আশা নিয়ে মঞ্জু এতদিন বসেছিল। নিজের ভাই বলে মঞ্জু স্পেশাল করে ভাবছে না, অমন জুয়েল ছেলেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশের পরেই কেরানীর জোয়ালে জুড়তে চায়নি। বাড়ির সকলের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে মঞ্জুই ওকে মেডিকেলে ভর্তি করে দিয়েছিল, ডাক্তারী পড়ানোর গুরুভার মুখ বুজে বহন করে চলেছিল, কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। মঞ্জু ভেবেছিল ও পাশ করে বেরোলে এ সংসারের দুঃখ ঘুচে যাবে। তারপর তার ছুটি, তারপর অনেক দেরিতে হলেও বেটার লেট দ্যান নেভার কথাটা ভেবে দেখবে। নিজের যা কিছু চাওয়া ছিল, পাওনা ছিল, নিজেই দুহাতে ফিরিয়ে দিয়েছে একদিন। না দিয়ে উপায় ছিল না। তার এম. এ পড়া হয়নি, গায়ে পড়ে দুচারটে ভাল সম্বন্ধ এসেছে প্রথম দিকে, মঞ্জু হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। দিয়ে, ভাগ্যক্রমে জুটে যাওয়া ব্যাঙ্কের চাকরিটা আঁকড়ে ধরেছে। যদি না ধরতো, আজ সাত বছর যদি সেই চাকরি ধরে না থাকতো, যদি স্বার্থপরের মত নিজের সুখের কথা, অন্যজীবনের কথা চিন্তা করতো তাহলে কি দশা হতো এই সংসারের? সম্পূর্ণ বিনা দোষে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে পড়ে বাবার যখন চাকরি গেল তখনও মঞ্জুর দাদা মনোতোষের এঞ্জিনীয়ারিং-এ ফাইনাল ইয়ার চলছে। মনোতোষ আর মঞ্জু পিঠোপিঠী ভাইবোন। ডিসিশন নিতে সময় লাগে নি মঞ্জুর, এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েও পড়া ছেড়ে দিল। চাকরি নিল। কিন্তু সেই দাদাও চরম স্বার্থপরের মত এ সংসারের বুকে লাথি মেরে চলে গেল। পাশ করে চাকরি পেতে না পেতেই নিজে পছন্দ করে এক ইতর স্বভাবের মেয়েকে বিয়ে করে বসল এবং যা হয়ে থাকে, বছর ছয় যেতে না যেতেই আলাদা হয়ে গেল। অবশ্য বেসিক্যালি দাদাটা মানুষ খারাপ ছিল না, কিছুদিন পর্যন্ত নিয়মিত মনি-অর্ডারের কুপন মারফৎ একটা যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছিল কিন্তু কোন একটা ঘটনা উপলক্ষে মঞ্জুর বাবা সেই অসম্মানের টাকা আর নিতে রাজি হননি। বাবার তখন স্ট্রোক হয়েছে, বিছানায় পড়ে আছেন। মঞ্জু তাই এ বিষয় নিজের কোন মতামত চাপাতে যায়নি।

এই শীতের সকালে সাঁতসেঁতে বাথরুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে খালি গায়ে কেমন শিরশিরানী বোধ করতেই শরীরে একটা ঝাঁকি দিয়ে এলোমেলো চিন্তা ঝেড়ে ফেলল, তারপর জলে মগটা ডোবালো। কিন্তু দুতিন মগের বেশী বোধহয় মাথায় জল চাপাতে পারে নি, বাইরে প্যাসেজে খুকুর গলা পেল। ব্রাশ করতে করতে চেঁচিয়ে কিছু বলছিল, জল ঢালা থামাতেই কথাগুলো স্পষ্ট কানে এল। মাকে উদ্দেশ করে বলা হলেও কথাগুলো মঞ্জুকে সরাসরি শোনানোই যে উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না। পড়াশোনায় মাথা নেই খুকুর, আগ্রহও নেই, ছেড়েছুড়ে বাড়িতেই এতদিন বসেছিল, মঞ্জুই দুচারজনকে ধরাধরি করে কর্পোরেশন ইস্কুলে একটা মাস্টারি যোগাড় করে দিয়েছে, গতমাস থেকে খুকু সেই চাকরি করছে।

'মা, রাজেশ্বরীকে বল বাথরুম জপতপ করার জায়গা না, পৃথিবীতে আরো অনেক মানুষকে কাজকর্ম করে খেতে হয়।'

পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য ঘটনাই ঘটে নিশ্চয়, নইলে খুকুর মুখে এরকম কথা, মঞ্জুর নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না! যাক ভালই হল, ষোল আনার ওপরে আঠার আনা হল। কাল অনেক রাত অবধি বিবির ব্যাপার নিয়ে অশান্তি হয়েছে। মা পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে ওদের দলে চলে গেছে, অন্যায়কে সমর্থন করে যাচ্ছে, প্রশ্রয় দিচ্ছে, ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি সে। শুধু মা যখন বলল, 'ওর ওপরে তোর এত হিংসে কেন? ইচ্ছে করলে তুইও তো কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করতে পারিস!' তখন মঞ্জুর মত শক্ত মেয়েও আর নিজেকে সামলাতে পারেনি, কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

কাল রাতে খাওয়া হয়নি মনে পড়লো। আজ সকালে বাবার জন্যে বেড-টি তৈরী করার সময় প্রতিদিনের মত নিজেও এক কাপ চা করে খেয়েছিল। শরীরটা সেই কারণেই হয়ত এমন অবসন্ন ক্লান্ত লাগছিল। মঞ্জুর মাথায় আর জল ঢালা হল না, কোনরকমে গায়ে শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খুকুকে একটা কথাও বলল না।

শীতটা এবার বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে কলকাতায়।

প্রতি বছরই বড়দিনের সময়টাই কলকাতায় প্রকৃত শীতের মরশুম, এবছর সেই সঙ্গে পরপর দুদিন সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় এবং উত্তুরে বাতাসের দাপট থাকায় শীতের পরমায়ু বেড়েছে। রাতের দিকে পুরো শীতবস্ত্রেও যেন কলকাতার মানুষের কলজে গরম হচ্ছে না।

বিশ্বজিতের কাছে অবশ্য এটাকে ছেলেমানুষী ঠাণ্ডার বেশী মনে হয় না। ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে সে জীবিকার সূত্রে দিন কাটায় সেখানে বরফ পড়ে। ঘরে ঘরে ফায়ার প্লেস, হটওয়াটার ব্যাগ দরকার হয়। দরকার হয় কড়া ড্রিঙ্কস-এর।

পার্ক স্ট্রীটের দিক থেকে চৌরঙ্গীর দিকে হেঁটে আসছিল বিশ্বজিৎ। আজ একত্রিশে, রাত বারোটার পর থেকে নতুন বছর পড়বে, সমস্ত কলকাতার সাহেবপাড়া নববর্ষকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে। হোটেল রেস্তোরাঁ গীর্জা মার্কেট প্লেস রঙীন আলোয় আর কাগজের মালায় সাজানো হয়েছে। উৎসবের রোশনাই ঘরে ঘরে, মানুষের চোখেমুখে সাজপোশাকে পর্যন্ত।

একা একা হাঁটতে তার বেশ ভালো লাগছিল। ময়দানের দিকে কুয়াশা ঘন হয়ে জমেছে। এই কলকাতা কেন যেন তাকে টানে, এখানে তার নিজের বলতে প্রায় কেউ নেই তবু। তাই বছরে কয়েকবার সে ছুটি পেলেই কলকাতায় ছুটে আসে। কলকাতায় তার নিজের একটা ফ্ল্যাট আছে পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে। সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে চলে যায়। এবারেও কটা দিন একনাগাড়ে আড্ডা হয়েছে। ছুটিও ফুরিয়ে এল। ২রা তার ফ্লাই করবার কথা, রিজার্ভেশন হয়ে আছে। মনটা তাই ভেতরে ভেতরে একটু ভারী হয়েছে। এই কলকাতায় তার নিজের কেউ নেই কিন্তু থাকতে পারতো। এই কলকাতা তাকে সবচেয়ে মধুর বিষন্নতায় জড়িয়েছে। এখানেই জীবনে প্রথম প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এক অর্থে পরাজিত হয়েছে বলা যায়। একটি মেয়েকে সে পছন্দ করেছিল, বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল কিন্তু মেয়েটি তাকে নামঞ্জুর করে দিয়েছিল—ব্যাপারটা এই কবছরেও ভুলতে পারলো না। প্রেমের প্রত্যাখ্যান আর বিবাহের আরজি ফেরতের মধ্যে তফাৎ আছে অনেকখানি। কোনো বাঙালী মেয়ের কাছ থেকে বুঝি কোনো সুদর্শন যোগ্য পুরুষ আশাই করে না। আত্মমর্যাদায় ঘা দেয়। এই সূক্ষ্ম অথচ গভীর আঘাতটি কখন এক দুরারোগ্য আকর্ষণে রূপান্তরিত হয়ে গেছে বিশ্বজিৎ নিজেই জানে না। তার ঘন ঘন কলকাতায় আসার পেছনে হয়ত অবচেতন এই কারণটিও কাজ করে যাচ্ছে। কলকাতায় এলে বিশ্বজিৎ একবার অ-তত দূর থেকে মেয়েটিকে দেখে যায় আর মনে মনে অনেককাল আগে পড়া একটা কবিতার লাইন আওড়াতে থাকে : তাহার অধিক মিঠে কনো তোমার কোমল হাতের চাপড়ি!

কিন্তু চাপড়ি যে মেরেছিল সে এসবের বিন্দুবিসর্গও জানে না।

এইসব ভাবতে ভাবতে বিশ্বজিৎ সদর স্ট্রীটের কাছে এসে পড়েছিল, মিউজিয়মের নির্জন ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিল অন্যমনস্কর মত। কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কিছুই মনের মধ্যে নেই এমন ভাসমান অবস্থায় হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে কে যেন তার পায়ের ওপর এসে পড়ল। চোখের পলকে

ক্ষিপ্র পায়ে সরে দাঁড়িয়ে তাকে সে ধরে ফেলেই বুঝল ব্যাপারটা। এ অঞ্চলের রাতের ব্যাপার-স্যাপার তার না জানা নয়। স্ত্রীলোকটি তখন জড়িত স্বরে কি যেন বলল, বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বিশ্বজিৎ তাকে ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'কী ম্যাডাম, এ লাইনে কতদিন হল? এখনো লোক চিনতে ভুল হয়!'

'ছাড়ুন। আমাকে যেতে দিন'—প্রায় দুর্বোধ্য গলায় স্ত্রীলোকটি আবার বলল।

'এত সহজে কি তোমাকে ছাড়া যায় সুন্দরী!' বিশ্বজিৎ কঠিন গলায় হেসে উঠল 'এসে যখন পড়েইছ—কারো হাতে অন্ততঃ সম্প্রদান করে দিয়ে যাই নববর্ষে যাতে আমাকে অন্ততঃ মনে পড়ে!'

একটা করুণ আর্তনাদের মত শব্দ করে মেয়েটির অসাড় দেহ হঠাৎ তার হাতের ফাঁক দিয়ে ফুটপাথের ওপর পড়ে গেল।

এই শীতের রাতে একটি মাত্র সুতীর শাড়ি ব্লাউজপরা শরীরটার দিকে তাকিয়ে বিশ্বজিৎ চমকে উঠল। ছিছি একে সে একমুহূর্ত আগেও প্রস্টিটিউট ভেবেছিল। ভেবেছিল নেশায় জড়ানো গলায় কথা বলছে। প্রসাধন হীন, শুকনো, চোখের কোলে কালি পড়া চেহারা দেখে বুঝলো কত-খানি বিপন্ন একটি মেয়ে এইভাবে ছুটে যাচ্ছিল। অনাহারে এবং ঠাণ্ডায় অবসন্ন শরীর হঠাৎ কোলাপ্স করেছে। হাতে একটা হাতব্যাগ কিংবা রুমাল পর্যন্ত নেই লক্ষ্য করে ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হল।

*

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে মঞ্জুশ্রী যখন পার্ক স্ট্রীটের একটা বিরাট বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তখন সকাল দশটা বাজে কাঁটায় কাঁটায়। পাশেই কোন গীর্জার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজার শব্দ শুনে বাঁহাতের কব্জির দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার ঘড়ি নেই, কাল রাতে আরও অনেক কিছুর সঙ্গে সেটাও খোয়া গেছে। একটা নিশ্বাস ফেলে কলিং বেল টিপতে গিয়েই চোখে পড়ল ছোট্ট নেমপ্লেটটির পাশে আউট কথাটা বেরিয়ে আছে। শব্দটা ছোট, কিন্তু বেশ জোরে ধাক্কা দিল। কাল সারারাত ঘুমে জাগায় যে মানুষটার কথা ভেবেছে গোটা সকাল কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে মানুষ-টার সঙ্গে ফের দিনের আলোয় কতক্ষণ দেখা হবে ভেবে ছটফট করেছে, সে সকাল দশটা পর্যন্তও তার জন্যে অপেক্ষা করবে না বেরিয়ে যাবে, এ মঞ্জু কল্পনা করেনি। আঘাতটা সেই কারণেই। অবশ্য ভদ্রলোক তাঁদের বাড়ির প্রায় কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবার সময় নিজের নাম লেখা কার্ড আর একটা চাবি দিয়ে বলেছিলেন, ঋণ পরিশোধের জন্যে আপনার যখন এত ব্যাকুলতা, ঠিক আছে কাল যদি পারেন আসবেন, আমার নিজের হাতে তৈরী কফি স্যান্ডুইচ খেয়ে একটু গল্পস্বল্প করে যাবেন।

মঞ্জু হাতের চাবিটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

ওঃ এটা কি জন্যে ভাবছেন? আপনি যখন আসবেন আমি বেঁচে থাকি যদি ফ্ল্যাটে না থাকি আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারবেন। দরজা খোলার দ্বিতীয় কোন লোক নেই আসলে। কথাটা বলে সলজ্জ কৈফিয়তের হাসি হেসেছিল।

মঞ্জু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সে চায়নি ভদ্রলোক এতটা পাড়ার ভেতরে চলে আসে। দিনকাল ভাল নয় পাড়াটা ইদা-নীং কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। ট্যাকসি থেকে নেমে বড় রাস্তা থেকেই চলে আসতে চেয়েছিল কিন্তু ভদ্রলোক যেন গায়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে এতটা পথ এলেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে, নমস্কার।

দেখা হচ্ছে তো? ভদ্রলোক ফিরে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন।

হ্যাঁ না কোন স্পষ্ট জবাবে না গিয়ে মঞ্জু উত্তর দিল, দেখা যাক। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে দিল। আর সত্যি বলতে কি তখনও মঞ্জু নিশ্চিত ছিল না সে নিজে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ভেবেছিল ভদ্রলোকের কিনে দেওয়া গায়ের শালখানা চাবি আর একটুকরো চিঠি সহ বেয়ারা শিউনন্দনকে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। কাল ছুটির দিন, কাল হবে না, পরশু পাঠাবে। কিন্তু বাড়ি ফিরেই কার্ডের নাম ঠিকানায় চোখ বুলোতে গিয়েই সব গোলমাল হয়ে গেল। ইসস, একটু আগেও যদি ভদ্রলোকের নামটা সে জানতে পারতো। ভদ্রলোক ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না গত একটা ঘণ্টা তিনি যার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে কাটালেন, অকৃপণ হাতে অর্থ ব্যয় করলেন সেই মেয়েটির কাছ থেকে আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে একটি ছোট্ট চিঠি পেয়ে-ছিলেন। এই মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় সেদিন সামান্যতম মোলায়েম করেও চিঠিটা লেখেনি, বলতে গেলে আঘাত দেবার জন্যেই যেন চিঠিটা লেখা। সে-দিনের ভ্রম আজ আর সংশোধন করবার হয়ত আর উপায় নেই, তবু মুখোমুখি কথা বলার একটা সুযোগ অন্ততঃ এসেছে। অত ক্লান্তিতেও সারারাত বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করল মঞ্জু, ছেঁড়াখোঁড়া তন্দ্রার অতিরিক্ত কিছু চোখে এল না।

চাবি খুলে ভেতরে ঢুকলো মঞ্জু, তারপর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রায় কোনো মানুষের না দেখা বাড়ির মধ্যে প্রথম পা ফেললে বুকের ভেতরটায় অদ্ভুত এক ধরনের সেন্সেশন হয়। মঞ্জুশ্রী কয়েক-মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। হাঁটুর কাছটায় যেন আগের মত জোর নেই, অল্প অল্প কাঁপছে। কালকের জের এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি, তবে মনটা অনেক হাল্কা। মানসিক চাপে পড়ে যে সব মেয়েরা অনায়াসে আত্মহত্যা করে মঞ্জুশ্রী সেই টাইপের নয়। অথচ কাল সকালে উত্তেজনার মাথায় ভাত না খেয়েই অফিসে বেরিয়ে পড়ার পর থেকে তার মগজে আত্মহত্যার চিন্তাই ভূতের মত পেয়ে বসেছিল। নিজের প্রতি এমন তীব্র অনুভূতি, এমন ঘৃণা এর আগে সে কখনও অনুভব করেনি। নিজের জন্য এক ধরনের আতঙ্ক এবং মমতা বোধ করছিল ব্যাপারটা ভেবে যে কাল সে মৃত্যুর ফাঁদের মধ্যে পা ফেলতে ফেলতে বেঁচে গেছে। ভগবান মানুষের জীবনের গল্প লেখেন কিনা কারো জানা নেই কিন্তু ছোট ছোট ঘটনা অনেক সঙ্কট মুহূর্তে এমন ভাবে সাজানো থাকে যে তাকে কাকতালীয় বলা যায় না অথচ এক একটা অঘটন এক একটা ভয়ঙ্কর পরিণতি কত সহজে তারা পাল্টে দেয়। কাল ব্যাঙ্কের ইয়ারলি ক্লোজিং ছিল। কাজের চাপের মধ্যে নিজের জন্যে ভাববার বিশেষ সময় ছিল না কিন্তু তারই মধ্যে অন্ততঃ দু দুবার সে নিজেকে ফেয়ারওয়েল দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু দুবারই অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে রক্ষা পেয়ে গেল। বিশ্বজিৎ অফিস ছুটি তক মুলতুবী রেখেছিল মঞ্জু, ভেবে রেখেছিল এবার সাদামাটা অথচ অব্যর্থ উপায়টাই সে নেবে, স্পেশ্ট একটা ডবলডেকার কি মিনিবাসের তলায় বাঁড়ি গ্রো করে দেবে। আত্মহত্যার পক্ষে স্ট্রিট অ্যাকসিডেন্টই ভাল, কেউ স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। কিন্তু মঞ্জুশ্রীর জীবনের নাটকার বোধহয় আগে থেকেই মুচকি হেসেছিলেন।

ঠিক বেরোবার মুখেই কয়েকজন বিশিষ্ট সহকর্মী এসে পাকড়াও করে নিয়ে গেল পি জিতে, তাদেরই সঙ্গে কাজ করতো একটি মেয়েকে দেখতে। মেয়েটি সম্প্রতি অন্য ব্রাঞ্চে বদলী হয়ে-ছিল। আজই একটা ট্যাকসির তলায় চাপা পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

স্ট্রীট অ্যাকসিডেন্ট! মঞ্জুশ্রী চমকে উঠল। কে একজন বলল, এতে চমকাবার কিছু নেই, অ্যান অ্যাটেম্পট অব সুই-সাইড, আজকাল আকচার ঘটছে।

কোন অজুহাতেই এড়ান গেল না। ওর নিজের শরীরই তখন টলছে। দল-বেঁধে ট্যাকসি করে যাওয়া হল, ফেরার পথে মঞ্জু একা। মেয়েটির মা বাবা আর স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে একটা রাতই হয়ে গিয়েছিল। শর্টকাট করে চৌরঙ্গীর দিকে বেরোতে নিজেই কান্নায় মোড়া ময়দানের ধারে দুটি জলজ্যান্ত শয়তানের খপ্পরে পড়ে গেল।

তারপরের অবস্থা ভাল মনে নেই, কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে অতি ঝাপসা চেতনা নিয়ে কি ভাবে হেঁটে এসেছে ঈশ্বর জানেন। হাতে এক কপর্দক নেই, গায়ের

আলটি পর্যন্ত দুর্ভোগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। রাস্তার ধারে বার দুই বমি করেছিল মনে আছে, শুধু পিত্তিজল উঠেছে গলা দিয়ে। তারপর বিশ্বজিৎ লাহিড়ীর সঙ্গে ন্যাটকীয় ভাবে দেখা না হলে কি হত বলা যায় না। বিশ্বজিৎ মৃতকল্প মঞ্জুকে প্রায় বয়ে নিয়ে গিয়ে ব্র্যান্ডি গিলিয়ে চাঙ্গা করেছে, তারপর জোর করে খাবার খাইয়েছে, একটা শাল কিনে দিয়েছে। মঞ্জু কিছুতেই নিতে চায় নি, বিশ্বজিৎ বলেছে, ঠিক আছে এখনকার মত নিন, পরে ফেরত দেবেন।

মঞ্জু তখন প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছে। লোকটির চোখ মুখ কথা এবং আচরণ থেকে বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে লোকটি নিছক উদারতা এবং কর্তব্য থেকে এসব করছে না। সামান্য সময়ের দেখা, সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও লোকটি তার প্রেমে পড়ে গেছে। প্রেম ব্যাপারটা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতে হয়নি মঞ্জুর, জীবনে নাটকে গল্পকে এড়িয়েই সে চলেছে এ-যাবত। কাল রাতেও সেই মুহূর্তে মনে মনে হেসে ভেবেছিল, প্রেমও একজাতের স্যাটি অ্যাকসিডেন্ট, আজকাল আকছার ঘটছে।

বসবার ঘর পার হয়ে পায়ে পায়ে ভেতরের ঘরে মঞ্জুশ্রী হাজির হয়েছিল। হয়ত তার অবচেতন মন এই ফ্ল্যাটে অন্য কোন স্ত্রীলোকের বসবাসের চিহ্ন খুঁজছিল। ঘরে পরবার শাড়ি-অন্তর্বাস ছাতাজুতো হাতব্যাগ কিংবা প্রসাধনী, কোনো কিছু না, কোন চিহ্নই তার চোখে পড়ে নি, আর না পড়ায় সে যে কি দুঃসহ হতাশ হয়েছে তা বলা যায় না। এমন সময় খাটের ওপর সেই নাবাধ ছেলে সোদকে এক পা এগোলো কলিং বেল, দরজা খুলতেই হসপিটাল মেসেজ ভায়া লোকাল থানা। বিশ্বজিৎ লাহিড়ী গতকাল রাতে কোন একটি বিশেষ অঞ্চল থেকে গুরুতর আহত হয়ে আর জি কর হাসপাতালে পৌঁছায় এবং পরে মারা যায়। মারডার খুন। এবং খুন হয়েছে প্রায় মঞ্জুদের গলির মোড়ে, অথচ সে কিছুই জানতে পারেনি।

হঠাৎ মাথাটা ঘুরে অন্ধকার দেখেছিল সে, একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তার বুক ফাঁড়ে বেরিয়ে আসার আগেই মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। সে পতন ঠেকাবার জন্যে সেদিন তার পাশে কেউ ছিল না।

•

ডিসট্যান্ট সিগন্যালের ওপারে প্রায় দিকচক্রবালে এঞ্জিনের প্রথম ইসারা দেখা দিতেই যেমন সমস্ত প্ল্যাটফর্ম গমগমে এসে যায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা প্যাসেঞ্জার আর হাইহোলা ব্যাগেজপত্র আর পাগড়ি খুলে হাওয়া খাওয়া কুলি যেমন একমুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে, জ্যোতির্ময় মন হৈচৈখানা ঘর হঠাৎ তেমনি নিজের পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

ইজিচেয়ারের মধ্যে, সিনেমা হলে ঘুমিয়ে পড়া মানুষের মত, জ্যোতির্ময় ঘুমের চটকা ভেঙ্গে তাকাল।

দাদা, গেট রেডি, এবার আমাদের যেতে হবে। কল্যাণাক্ষ ঝুঁকে পড়ে জ্যোতির্ময়কে বলল, দুয়ারে প্রস্তুত রথ বেলা একপ্রহর।

আমাকেও যেতে হবে?

নিশ্চয়। আপনার জন্যেই তো আসা।

এক্ষুনি?

এক্ষুনি। আপনার তো চারির, এক মোচড়ের ওয়াস্তা। ইউ আর ভেরী ফাস্ট, এই বয়সেও। আমি দেখেই চিনেছি।

হোল্ড অল মার্কা চেহারা সেই ছেলেটা এবার সাগ্রহে এগিয়ে এল, হিসেব-নিয়মের জীবনে মাঝে মধ্যে বে-হিসেব-বেনিয়ম ভাল, জ্যোতির্ময়দা। গাড়ির মতই দেহ-মনের সার্ভিসিং দরকার। কোথায় এক মহাপুরুষ সত্যের বাণী পড়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন উইল যা। এই ওল্টানোর জন্যেই কেউ ফাসের কোপন শাসন করে, কেউ ফেলস করেন্ট চন্দ, আর আমরা ফেলগানুবি করলে ফাইন এন্ড রেসিয়ে পড়ি।

জ্যোতির্ময় তাকাল। ওর বরফের মত কঠিন চোখের সঙ্গে চোখাচুখি হল।

।। তিন ।।

শহরের সীমানা ছাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভোজবাজীর মত পথের দুপাশের দৃশ্য বদলে গেল। ছোট বড় পাথর ছড়ানো প্রান্তরের মধ্যে থেকে থেকে উঁচু টিলা, কলকাতার মানুষের চোখে পাহাড় কোনটা ঘাসে ছাওয়া, কোনটা মৃত্তিকাহীন, কদাচিৎ কখনো এক-আধটা মরা নদী, খোলসছাড়া সাপের মত নির্জীব পড়ে আছে। তার ভিতরিতরে জলে রাখাল ছেলের দল ক্ষুদে মাছের সন্ধানে ঘুরছে। পিচ রাস্তাটা উঁচু-নিচু চিলড্রেন্স পার্কের সরাসরির মত ঢেউ খেলে এগিয়ে গেছে, মাঝে মধ্যে ছোট-ছোট জঙ্গল এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি দুটোকে কালো রাস্তার বুকের ওপর দুটো ক্ষিপ্র ছুঁচের মত দেখাচ্ছিল, যেন ফোঁড় তোলার মত ডুবছে উঠছে, ভেসে উঠছে, হারিয়ে যাচ্ছে। পিছনে ধোঁয়ার রেখা সুতোর মত রেখে যাচ্ছে।

পথ নির্জন, জনমনুষ্যহীন। অনেক দূরে দূরে এক-আধটা আদিবাসী গ্রাম, সাঁওতালদের রঙীন মাটির ঘরবাড়ি। উলঙ্গ শিশু, দাওয়ার নিচে লড়াকু মুরগী আর শিকারী কুকুর। পিচ রাস্তার ওপর ধান কিংবা অন্য শস্য শুকোতে দিয়েছে, আচমকা তাকালে আলপনার মত মনে হয়। পথে কদাচিৎ একটা দুটো গরুর গাড়ি চোখে পড়ে, হেলেদুলে এগোচ্ছে। কিংবা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাক, ডবলডেকারের মত উঁচু ত্রিপলঢাকা মূর্তি নিয়ে গুরু-মন্থর গতিতে চলেছে। অনেক হর্ণ দিয়ে সাধ্যসাধনা করে তবে সাইড পাওয়া যায়। তবে সুখের বিষয় এ পর্যন্ত দুবার মাত্র ট্রাকের কনভয় সামনে পড়ছিল এবং আর মাইল পাঁচ-ছয় এগোতে পারলেই তাদের পথ ঘুরে যাবে, তখন বেবাক ফাঁকা।

এ-গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে বসেছিল কল্যাণ নিজে, তার হাত খুব স্পীড। গাড়ি চলছিল ঝড়ের গতিতে। পিছনের গাড়িখানা মাঝেমাঝেই ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না, বে-কায়দায় পিছিয়ে পড়ছিল। এগাড়ির মেয়েরা ওদের দুয়ো দিচ্ছিল, ও-গাড়ির আরোহীরা ড্রাইভারকে উৎসাহ দিচ্ছিল, উত্তেজনা যোগাচ্ছিল। ঠিক দৌড়ের মাঠের মত, শুধু তফাৎ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সবাই যেন সমান অংশীদার, সবার রক্তেই অদম্য আবেগ সংক্রামিত।

কল্যাণের পাশে বসে জ্যোতির্ময়, বহুকাল পরে কেমন এক আরামদায়ক উত্তাপ নিজের ভেতরে যেন আঁচ করতে শুরু করেছিল। ভাল করে ভেবে দেখলে সেটা ঠিক প্রত্যক্ষ উত্তেজনা নয়, এই মোটর রেসের সঙ্গে জয়-পরাজয়ে জড়িত নয়। শীতের পরে অন্যমনস্ক মানুষের গায়ে প্রথম বসন্তের হাওয়া লাগলে যেমন স্নায়ু শিরশির করে ওঠে, অনেকটা সেই রকমের। জ্যোতির্ময়ের হারানো যৌবন, কত যুগ আগের ভুলে যাওয়া অনুভব যা বিস্মৃতির কফিনে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তার যেন ঘুম ভাঙ্গছিল, সেই জমাট অবস্থা ঘাম দিয়ে তরল হচ্ছিল।

জ্যোতির্ময় চিরদিন কিছু এমন ছিল না। এদের চেয়েও অনেক কম বয়সে অনেক অনেক গুণ বেশী ঝুঁকি নিয়েছিল সে। নিজের মৃত্যুর এত কাছে চলে গিয়েছিল সেদিন যে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যেত। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে বুঝি এক আঙ্গুল ফারাকও ছিল না। সেই বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ সালের দিনগুলোয় কতই বা বয়স তখন, উনিশ ফুরিয়ে কুড়িতে পা দিয়েছে। বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু ফল বেরোয় নি তখনো, হঠাৎ কি খেয়ালের বশে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে বসেছিল জ্যোতির্ময়, চেহারায় প্রমাণ সাইজের জোয়ান দেখালেও কৈশোরের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনার ঘোর তখনও কাটে নি। তার মনে হয়েছিল দেশকে স্বাধীন করতে হলে হাতে-কলমে যুদ্ধ শেখা দরকার, এবং সে শিক্ষানবিশীর ব্যাপারটা ইংরেজের খরচায় সেরে নেওয়াই ভাল। গুরুমারা বিদ্যে যেমন গুরুর কাছেই শিখে নিতে হয়। ইলেভেন্থ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন তখন জাপানী এয়ার ফোর্সের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ অবস্থায়। সেই সময় জ্যোতির্ময় গিয়ে পৌঁছেছিল মালয়ে। মালয়ের জঙ্গলেই তার হয়েছিল প্রকৃত যুদ্ধের

বিশেষ বিশেষ সময়ের পোষাক-বিনী

হালকা হালকা রঙ···আর আকর্ষণীয় চেক, আজ পুরুষের পোষাকে এনেছে এক নতুন ধারা। শার্ট আর জ্যাকেট···মনের মত ঢঙে তৈরী ···ফ্ল্যাপ বিহীন অল্প ফ্লেয়ার ওয়ালা সেঁটে থাকা ট্রাউজার।

আর মেয়েদের পোষাকের কথা··· আজ ওঁদের পছন্দ এমন কাপড়, যা পরলে নারীর সকল সৌন্দর্য্য উপচে পড়বে···অবশ্য আপনি যদি পারেন···নিশ্চয়ই তাই পরবেন!

দেখুন দিকি—চওড়া লেপ্‌লওয়ালা পলিয়েস্টার কটনের এই পুরুষালী স্যুট···সঙ্গে চেক শার্ট আর উওভেন সিল্ক টাই!
আর পলিয়েস্টারের তৈরী এই হল্টার গাউনে···মরাল গ্রীবা···বিকশিত··· তাজা কুসুম-তনু···উদ্বেলিত!

বিনী
সংমিশ্রিত কাপড়

Interpub/BB/1/76 Ben

হাতেখড়ি। মর্টার, মেশিনগান আর মাইনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে সেই ভয়ংকর আদিম জঙ্গলে, সেই বীভৎস বর্ষায়, প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় যে দিনগুলো কাটিয়েছে তার স্মৃতি কখনো মুছে যায় না। শত্রু সেখানে কেবল মানুষ নয়, প্রতিকূল প্রকৃতি এবং কীটপতংগের হাত থেকেও বাঁচবার জন্যে লড়াই করতে হত। কোন কোন রাতে জঙ্গলে এমন মশার কামড় খেতে হতো যে পরদিন সকালে নিজেকে চেনা শক্ত হতো। মুখখানা ফুলে সাঁওগাঁছির ওল হয়ে যেত। এছাড়া রক্তশোষা জোঁকের কামড়, ম্যালেরিয়া, এবং এক ধরনের রহস্যময় জ্বর, যা হলে মৃত্যুর জন্যে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হত না। কিন্তু তবু জ্যোতির্ময় হলফ করে বলবে এই মালয়ের জঙ্গলই তাকে কয়েক মাসে পূর্ণবয়স্ক মানুষ করে দিয়েছে।

হঠাৎ মেয়েলি গলার তীক্ষ্ণ উলুর কোরাস শুনে চমক ভাঙলো জ্যোতির্ময়ের। পেছনের সাদা গাড়িটা এইমাত্র তাদের কালোগাড়িকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেল। সামনে গাড়িটা উল্লাসে যেন ফেটে পড়েছিল, এগাড়ির রমণীদের মুখে চুন মাখানো হাঁড়ি, তারা কল্যাণকে দেখছে। তাদের ধারণা কল্যাণই বিয়ে করে ও-পক্ষকে জিতিয়ে দিল। দেখেই বোঝা ও গাড়িতে যে গায়ত্রী আছে!

জ্যোতির্ময় বেশ আমোদ পাচ্ছিল। চারটে টগবগে ঘোড়ার মতই ওদের চার বন্ধুকে মনে হচ্ছিল। এত কথা, এত হাসি এত ছেলেমানুষী এখনো ওদের মজ্জাগত ভাবা যায় না। মেয়েগুলোও যেন ব্যালে নাচের জুটির মত সমান্তরাল, শরীরের সমস্ত ছন্দকে কব্জায় এনে ফেলেছে। অথচ কলকাতায় নিশ্চয় ওরা এমন ছিল না, সেখানে ওদের আর এক জীবন, আর এক চেহারা। বোতলের সোডার মত ছিপি খোলার আগে এবং পরে। দুই চেহারা।

এখন এদের ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে জ্যোতির্ময়ের কোন মাথাব্যথা নেই, বরং ভাল লাগছে অথচ ঘন্টাখানেক আগেও বাড়িতে বসে কেবলই অস্বস্তি বোধ করেছে। কে এরা কেন এরা কি জন্যে এরা — এই প্রশ্নই মনের মধ্যে কেবল ঘুরপাক খেয়েছে। যদিও এদের যুগলে ঘুরতে দেখেনি তবু এতগুলো তরুণ-তরুণী যেভাবে একসংগে এসেছে এবং যেভাবে উইকএণ্ড কাটাতে যাচ্ছে তাতে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল যে এরা জোড়ায় জোড়ায় স্বামী-স্ত্রী এবং উভয় তরফের বন্ধু। মধুচন্দ্রিকা অথবা মধুচন্দ্র-বার্ষিকী পালন করতে দূরে নির্জনে যেতে চায়।

কিন্তু এদের সাজসজ্জা ঘা দিয়েছে। রীতিমত কুমারী মেয়ের মত এরা ঘুরছে ফিরছে দৌড়চ্ছে মোটা খুব একটা আশা করেনি জ্যোতির্ময়, কিন্তু শাঁখা সিঁদুর লোহা, যে কোনো একটা চিহ্ন ওদের শরীরে খোঁজা কিছু অন্যায় হয়নি। কিন্তু কোথাও বিবাহের ট্রেস নেই, একমাত্র এই সুখী সুখী ভাব আর কর্তৃত্ব করার প্রবণতাটুকু ছাড়া। জ্যোতির্ময় ওদেরই পক্ষ সমর্থনে যুক্তি খাড়া করেছে। বক্তব্য এই, আজকাল মেয়েরা শাঁখা পরা ছেড়ে দিয়েছে, ছেলেদের হস্তগত হবার পর থেকে হাতের লোহা-ত্যাগ করেছে। প্রতিদিন অফিস দৌড়তে হয় যাদের তারা যতদূর ভারমুক্ত হতে পারে ততই ভাল। সিঁদুরও ইদানীং মা-লক্ষ্মীরা সিঁথির আনাচে কানাচে এমন কামুফ্লেজ পরেন্টে সূক্ষ্ম বিন্দুবৎ ছুঁইয়ে রাখে যে সে সিঁদুর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে কমিশন বসানোর প্রয়োজন হতে পারে। আর রেজিস্ট্রী ম্যারেজ ত আজকাল মোটেই সিঁদুরপন্থী নয়।

এখন মনে মনে হাসল জ্যোতির্ময়। ভাগ্যিস কল্যাণকে জিগ্যেস করে বসেনি যে, তাহলে ওই ঠোঁটকাটা মুখর ছেলেটা কি জবাব দিত সে এখন লিখে দিতে পারে। সে বলত, 'ওহ্ দাদা এইটিন সেঞ্চুরী, এটা বঙ্কিমী আমল নয়! এখন ওসব তাবিজ কবচ তিলকে কারো বিশ্বাস নেই। সতীত্ব এখন কারো দেহে নয় মনে, নিজের ইচ্ছে মত নিজেকে ব্যবহার করতে পারাই সতীত্ব, এছাড়া অন্য কোনো সংজ্ঞা নেই। আসলে দাদা, সুন্দরের কোন জাত নেই, শ্রেণী নেই। ইংরেজদের দেখুন ওরা মানুষকে অনেক পরিচয়ে ভাগ করেছে—ম্যান, হিউম্যান, সুপারম্যান, জেন্টলম্যান, স্পোর্টসম্যান, স্টেটসম্যান ইত্তক, কিন্তু ওম্যান দেখুন একটাই।'

ছেলেটা একটু বচনবাগীশ আছে। জ্যোতির্ময় হাসল নিজের মনে।

'জ্যোতিদা গল্পটায় যদি কিছুটা কারেকট লাইফ পাম্প করা যায়, কেমন হয়?' স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে বাঁক নিতে নিতে কল্যাণ আচমকা প্রশ্নটা করল। সামনের সীটে কল্যাণ আর শিবানীর মাঝখানে বসে ছিল জ্যোতির্ময়। পিছনে আরও তিনজন মেয়ে। কল্যাণই তাকে পাশে বসিয়েছিল, আগে থেকে বসে থাকা একটি মেয়েকে উৎখাত করে পিছনে পাঠিয়ে দিয়ে। এমন কি শিবানীকেও জানলার দিকে সরিয়ে দিয়েছিল। তখন ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু লেগেছিল কিন্তু এখন কল্যাণের চিন্তামগ্ন প্রোফাইল খুঁটিয়ে দেখে জ্যোতির্ময় বুঝল কল্যাণের মনের মধ্যে আগাগোড়াই ছবির ব্যাপারটা রয়েছে। এই রেস, এই হুল্লোড়, তার অন্তরের ব্যাপার নয়, ওপর ওপর যোগ দিয়েছে মাত্র। ছবির ব্যাপারে সে আলোচনা করতে চায়।

'তুমি কি আমার উপন্যাসটার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, তখন থেকে আপনার গল্পটাই ভাবছি। এনি অবজেকশন?'

'কিছু বদলাতে চাও?'

কল্যাণ জিভ কাটলো, 'স্যার অনধিকার প্রবেশ, ব্যাট নো চেঞ্জ। নতুন ধরনের একটা লাইফ ইনট্রোডিউস করতে চাই, টু মেক এ বিট কমার্শিয়াল।'

'কি রকম জীবন তুমি এর মধ্যে যোগ করতে চাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তবে একটা কথা তোমাকে বলি, আমার গল্পের ব্যাপারে আমার কোন মোহ নেই, ও আমি ভুলে গেছি। তুমি ছবি করতে গিয়ে মার খাবে এটাই আমার খারাপ লাগছে। অনেক টাকাই তো ঢালতে হয় ছবি তুলতে, শুনেছি।'

'ওয়াণ্ডারফুল!'

জ্যোতির্ময় মন্তব্যটা ধরতে না পেরে আবার কল্যাণের মুখের দিকে তাকাল। হুইলে হাত রেখে সে সটান পথের দিকে দু চোখ ছড়িয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ তাকালে মনে হচ্ছিল গাড়িটা এখন এক সবুজ টানেলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দুপাশে মেটাল রোডের প্রায় কিনার ছুঁয়ে বড় বড় গাছ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আম, জাম তেঁতুল, শিরীষ আর বাদাম গাছই বেশী। ছাতার মত নিবিড় গাছগুলো যেন দুপাশ থেকে এসে পরস্পরের সংগে মিশেছে। এই বর্ডার লাইনের দু পাশেই ঘনজঙ্গল, প্রধানত শালের সদ্যফোটা ফুলের মঞ্জরীতে সাদা হয়ে আছে। এছাড়াও অন্য বন্যকুসুম ফুটেছে। সমস্ত পথটা এক রহস্যময় গন্ধে ভারী হয়ে আছে। গাড়ির ভেতর বসেও ফুলের গন্ধ নাকে আসছিল। জ্যোতির্ময় বুঝলো তার কথা কল্যাণের কানে যায় নি। পিছনে মেয়েদের কলকাকলী থামে নি পথের দৃশ্যে তারাও মুগ্ধ। সামনের গাড়িটা বেশ কয়েক গজ এগিয়ে আছে কিন্তু এই উজ্জ্বল রোদের সকালে ভেতরটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে গাড়িটা যখন পথের ঢাল বেয়ে নামছে কিংবা খাড়া চড়াই বেয়ে উঠছে তখন ভেতরের প্রতিটি মানুষের হালচাল নড়াচড়া নজরে পড়ছে। দুটো গাড়ির মধ্যে এখন আর হারজিতের পাল্লা চলছিল না, কল্যাণই সেটা থামিয়ে দিয়েছে তবু ও গাড়ির মেয়ে দুটি মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছে। ও গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল গোলালো চেহারার তরুণটি সে একটা ওয়াটার বটল খুলে এক চুমুক খেয়ে পিছনে বসা সবচেয়ে দীর্ঘাঙ্গী বন্ধুটির হাতে চালান করে দিল। ছেলেটির নাম বোহয় রুদ্রপ্রসাদ বা রুদ্রমোহন রুদ্রনাথ—এইরকম কিছু একটা হবে। বৈঠকখানায় সবাই ওকে রুদ্র বলে ডাকছিল। মুখে বেশ উঁচু চাকরির তেল পালিশ ইংরেজী উচ্চারণে খাঁটি বিলিতী ক্লীজ। পাশে বসা হলুদ

শাড়ি কালো ব্যাউজ নিশ্চয় গায়ত্রী, সে কিছুক্ষণ ওয়াটার বটল নিয়ে কাড়াকাড়ি করল। জ্যোতির্ময়ের বুঝতে অসুবিধে হল না সে বাধা দিতে চাইছিল, কিন্তু পারল না জলের বোতল রুদ্রর মুখ ঘুরে চলে গেল একেবারে ডানদিকের জানলা ঘেঁষে বসা ছেলেটির হাতে। সে এতক্ষণ তার সঙ্গিনীর গলা জড়িয়ে ধরে বসে-ছিল। জ্যোতির্ময় চোখ সরিয়ে নিল। ওরা নিছক জলপান করছে মনে হল না তার।

কল্যাণ এতক্ষণ পরে কথা বলল 'আর খাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই, এ ছবি সুপার হিট করে বেরিয়ে যাবে দেখে নেবেন!'

জ্যোতির্ময় অবাক হল, তার কথা-গুলো কল্যাণের কান এড়িয়ে যায়নি তাহলে। হয়ত এতক্ষণ মনে মনে খতিয়ে দেখছিল।

তুমি কি আমার.....

'টাকা আমার নয়, ফাইন্যান্স করবে আমার বন্ধু শরদিন্দু।' কল্যাণ ঘাড় ফিরিয়ে জ্যোতির্ময়ের চোখে চোখ রেখে হাসল, 'টাকার জন্যে দরকার হলে অন্য সোর্সও আমি ট্যাপ করতে পারতাম কিন্তু দরকার হবে না। আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে দেখিয়ে দেব কত কম খরচে কত ভাল ছবি করা যায়। ওহ দাদা শরদিন্দুকে আপনি বোধহয় প্লোকেট করতে পারছেন না, ওই যে সামনের সীটে বসে আছে। চলুন জঙ্গলে গিয়ে ত সকলের সঙ্গেই আলাপ হবে। ভেরী গুড সোল। আমার বন্ধুরা সবাই ভাল, বাইরের আঙ্গিক দিয়ে যেন বিচার করবেন না!'

'আর আপনি সোল এক্সেপ্ট!' সামনের সীট থেকে উৎখত হওয়া সেই মেয়েটা বোধহয় ফুসকুড়ি কাটল, সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি। কল্যাণ তার মাথার ওপরের আয়নাটার অ্যাঙ্গেল ঠিক করে নিতে নিতে বলল 'শিবানীর বাণীটা ইদানীং বেশী হয়ে যাচ্ছে, সবসময় বড়দের কথার মধ্যে কথা! ডেঁপোমী না করে জানলা দিয়ে প্রকৃতি ফকৃতি দ্যাখো।'

'আহা মাস্টার মশায় রে!' শিবানী দমবার পাত্রী নয়।

জ্যোতির্ময় ওদের কথা কাটাকাটি আমলের মধ্যে না এনে বলল, 'কিন্তু কল্যাণ আমাকে তোমরা ধরেবেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না। আর তোমার ছবির জায়গা পছন্দ আমি আর কি সাহায্য করতে পারবো, বলো?'

কল্যাণ স্টিয়ারিং-এ মনোনিবেশ করে গম্ভীর হয়ে গেল। জ্যোতির্ময় বুঝলো বারবার একই প্রশ্ন তুলে পেড়াপেড়ি করার ক্ষুণ্ণ হয়েছে কল্যাণ। আর সত্যিই তো, পথে বেরিয়ে এতটা চলে এসে এখন আর ওসব কথা তুলে লাভ কি। ফিরে যাওয়া তো আর যাবে না। জ্যোতির্ময় তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল।

'আসলে কি জান,' কথাটা আরম্ভেই থামিয়ে জ্যোতির্ময় মেয়েদের মনোযোগ খানিকটা আঁচ করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হল। না, ওরা নিজেদের মধ্যেই মশগুল হয়ে আছে। ওদের কথার খৈ ফুটছে, থেকে থেকে হাসির ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে কিন্তু সবই অনাপ্রসঙ্গে।

'বলুন?'

'আসলে আমি একদম ম্যাচ করছি না। এ শিঙ ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢোকা। কোথাও কোথাও হয়ত লাইফ বিগিনস্ অ্যাট ফরটি কিন্তু আমার সে আরম্ভের বয়সও নেই।'

কথাটা বলেই জ্যোতির্ময় হঠাৎ সজাগ হয়ে গেল। এতক্ষণ সে তাকিয়ে দেখেনি, ওপরদিকে চোখ তুলতেই একে-বারে ডানপাশের জানলায় বসা মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। আয়না কখন যে ওদের দুজনের যোগসূত্র টেনে দিয়েছে সে কি জানে! মেয়েটা এতক্ষণ তাহলে তাকেই দেখছিল। জামরঙের শাড়ির আঁচল খানিকটা সরে গিয়ে হলুদ জামার সুডৌল অংশ সুন্দর কপালের ওপরে ছড়িয়ে পড়া অশান্ত চুলগুলো চিবুক আর গালের রেখা ধারালো ভ্রু একটা ক্যানেল পাথরের ফলা কিছুক্ষণের জন্য জ্যোতির্ময়ের নজরবন্দী হয়ে থাকলো। চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। জানালার বাইরের দৃশ্যে সে যেন আগুন খুঁজে পেয়েছে।

'আমি তা মনে করি না। চল্লিশ পঞ্চাশ ঘাটের মধ্যে কোন ফারাক নেই। জীবন যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে শুরু হতে পারে তার আরম্ভ একটা নয় একবার নয়। জীবন

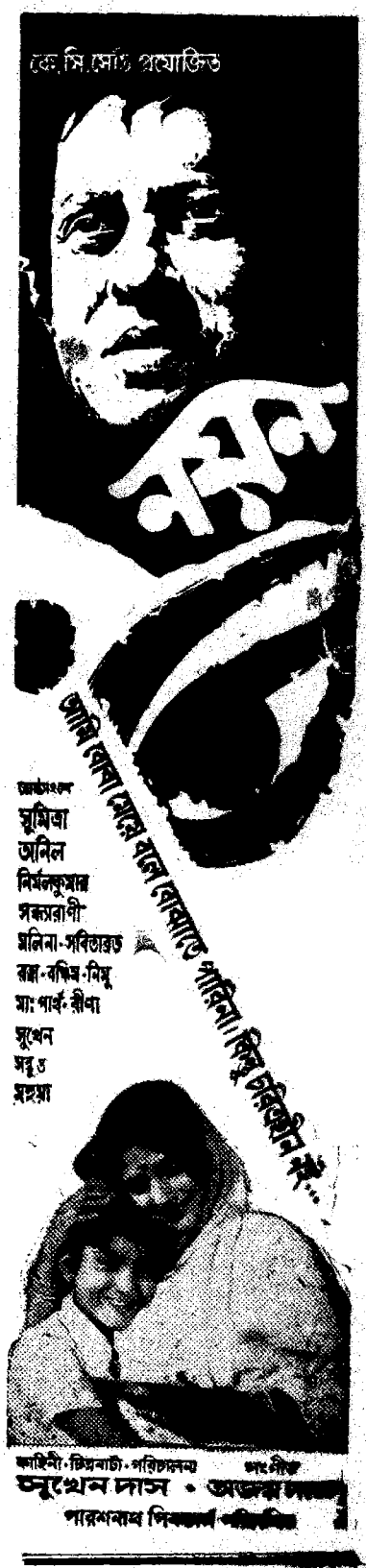

বারবার শুরু হয় কতরকমে কতভাবে।' কল্যাণ একটু থেমে আর একটি বাক্য সংযোজন করল, 'অ্যান্ড মোর ওভার আমরা কেউই বাচ্চা নই। আমাদের শিশুর সঙ্গে তাল রাখতে আপনাকে হয়ত আরো বড় করার চেষ্টা দেখতে হবে। ভাগ্যার তো কোশ্চেনই নেই।'

জ্যোতির্ময় কোন কথা বলল না। শুধু ড্রাইভারের আয়নার ভেতর দিয়ে ক্যামেরার দ্রুত চোখের মত এক লহমা গাড়ির কোনে বসা সেই মেয়েটার মুখ দেখে নিল। কি যেন আছে মেয়েটার মুখে। বিষন্নতা? তা হবে। সুন্দর যখন বিষন্ন হয় তখন তা ভাঙা বোতলের মত অসাবধান মুহূর্তে বিঁধে যায়।

*

তিন পাহাড়ীর ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছানোর মাইল খানেক আগে থেকেই গাড়ি দুটোর গতি কম গিয়েছিল। দুটো গাড়িই এখন প্রায় গায়ে গায়ে পাথরে বাঁধানো সরু পথটা ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে উঠছে। দুপাশে গভীর খাদ, খাদের ওপাশে দুদিকেই গভীর জঙ্গল, জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ঘন নীল আকাশ কাঁচের মত ঝকঝক করছে। এমন একটা অভাবনীয় বিশাল দৃশ্যের জন্যে কেউ যেন প্রস্তুত ছিল না।

দুটো গাড়ির ভেতরেই এখন গল্প থেমে গিয়েছে। সকলেরই মুগ্ধ চোখ বাইরের দিকে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। মেয়েদের মুখ দিয়ে শুধু মাঝে মাঝে বিস্ময়সূচক শিহরণ বেরোচ্ছে। কী অপূর্ব। কী সুন্দর! হাউ বিউটিফুল! ওঃ ওদিকের হরাইজন দেখুন আর হিলরেঞ্জ, সো গ্রেট! কী হাওয়া কী হাওয়া! আর এই হাওয়ায় রোদটা কি মনোরম। চুপ! চুপ! শুনতে পাচ্ছেন? পাচ্ছেন না? জলের শব্দ নিশ্চয় খাদের মধ্যে কোথাও ঝর্ণা বইছে। পৃথিবীতে এত কাছে এত্তো কাছে এমন স্বর্গের মত সুন্দর জায়গা আছে ভাবাই যায় না।

রুদ্র বলল—অথচ ট্যুরিস্ট গাইড এর নামগন্ধও নেই। ভূগোলের বইয়ে হাওয়া বদলের জায়গা হিসেবেও এক-বিন্দু উল্লেখ নেই। বাঙালী বাবুদের বাৎসরিক দৌড়ের রাস্তায় তিনপাহাড়ী পড়ে না।'

'লেক! লেক! আমি একটা লেক দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও। পাহাড়ের ওপরে এত উঁচুতে—কি আশ্চর্য!'

'আমাদের ঢাকুরিয়া লেকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'ঢাকুরিয়া না চাকুরিয়া! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। ও লেক তো কলকাতার চাকরি করে। অনেক মানুষ কোদাল দিয়ে কেটে ওকে বানিয়েছে। খেলনা হ্রদ। আর এটা হচ্ছে ন্যাচারাল রিজার্ভার এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া বিরাট। বর্ষার আর ঝর্ণার জলে এই প্রকাণ্ড বাঁধটা টৈটম্বুর হয়ে ওঠে। এখন অবশ্য এই শীতে যাবার মুখে জল কিছুটা কম।

চেহারার তুলনায় শরদিন্দুর গলার স্বরটা কিঞ্চিৎ সরু। সে হঠাৎ গেয়ে উঠল, 'আমায় দে মা পাগল করে।'

কল্যাণ তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল 'সাড়ে এগারটা।'

জ্যোতির্ময় বলল 'তাহলে বেশ তাড়াতাড়িই পৌঁছানো গেল, প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ দেড় ঘণ্টায় খুব ভাল রান করেছে। এবার বাঁদিকে বাঁক নিলেই সরু ব্রীজ, সেটা পেরোলেই বাংলোর কম্পাউন্ড।'

একটু সুযোগ মিলে যেতেই কল্যাণ সামনের গাড়িখানাকে টপকে এগিয়ে গেল। এবার অবশ্য ওদের গাইড করবার জন্যেই সে নিজের গাড়িখানাকে সামনে নিয়ে এল। এবং তারপর মিনিটখানেকের মধ্যেই একেবারে বাংলোর হাতায় গিয়ে দাঁড়ালো।

অনেকটা খোলা জমি সামনে রেখে সুন্দর একতলা বাংলো বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশে দু রঙা বোগেনভিলার লতা ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়ে ফুলেফুলে আলো করে রেখেছে। গাড়ি দুখানা উপর্যুপরি কয়েকটা হর্ন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সবাই তখন তাড়াতাড়ি বাইরে বেরোতে ব্যস্ত। কয়েকটি মূল্যবান ফলের গাছ ছাড়া যা চোখে পড়বার মত তা হচ্ছে কম্পাউন্ড জুড়ে নানা জাতের ফুলের গাছ। কিছু মরশুমী ফুলের বেড তৈরী করা হয়েছে বিভিন্ন জ্যামিতিক নকসায়। মেয়েরা একসঙ্গে হুয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। এক জায়গায় অনেকগুলো বড় বড় আর মাঝারি পাথর যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে, সদ্য-গজানো মোষের শিঙের মত। কোনটা গাছের মত সটান খাড়া কোনটা ইজিচেয়ারের পিঠের মত হেলানো, মাঝখানে নিচু চাটালো ধরনের একখানা বড় পাথরকে সেন্টার টেবিলের মত ঘিরে যেন নানা সাইজের একগাদা চেয়ার এলোমেলো কোণ করে সাজানো। অল্প খানিকটা জায়গার মধ্যে এই আয়োজন বিস্ময়কর। নিছক একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার বলে যেন মনেই হয় না, ভাবতে ইচ্ছে হয় না কোন সুদূর অতীতে ভূবিস্ফোরণের ফলে এই শিলারাশির আবির্ভাব। কোন স্থপতির পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য এদের পিছনে আদৌ ছিল না। ছিল না যদি, তবে এদের এমনভাবে রাখা হল কেন এমন মসৃণ পালিশ এদের গায়ে কে দিল, এই কালো মারবেল পাথরের মত সাদা আর হলুদ শিরারেখাবহুল পাথর কোনো সৌন্দর্যবোধ থেকে জন্ম নেয়নি ভাবতে ভাল লাগে না। পাথরগুলোকে ঘিরে গুটিকুড়ি পঁচিশ খর্জু শালগাছ ব্যূহ রচনা করে এর বিউটি বাড়িয়ে দিয়েছে। গাছগুলোর বয়স আট দশ বছরের বেশী নয় তবে না গুঁড়িগুলো প্রমাণ সাইজের বাঁশের গোড়ার চেয়ে বেশী মোটা নয় দীর্ঘ ছাঁদ দেখে অ্যাথলেটের সুঠাম উরুর কথাই মনে হয়।

শ্রীলাই জায়গাটার প্রথম আবিষ্কর্ত্রী দেখা মাত্র ছুটে গেল তারপর হাততালি দিয়ে সকলকে ডাকলো 'ওহ্ একেবারে টপ বিউটি, এখনে বসে বিকেলের চা খেতে যা ভালো লাগবে!'

'বনের খাঁচা!' কণিকা বলল, 'এমন গাছের ঝিলিমিলি দিয়ে ঘেরা ওপেন এয়ার রেস্তোরাঁ কোথায় পাবে কলকাতার মানুষ!'

'ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম। কণিকা আমাদের কবি মহিলা কবি! তা এখানে বসলে ওর ফিনকি দিয়ে পদ্যফদ্য বেরিয়ে আসতে পারে।' একজন খোঁচা মারল 'আমরা মোটা মানুষ, শিলপটিলপ বিয়োতে পারি না।' আমাদের জন্যে প্রেমই ভাল, ব্রেকফাস্ট আর টিফিন হলেই চলবে এ শিবানী গলা শুনেই কণিকা অনুমান করে নিল। সত্যি তার এতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ ঠিক হয়নি, কবিতা লেখার দুর্বলতা সে যতটা পারে ঢেকেঢুকে রাখতেই চেষ্টা করে। কেউ কবি বলে ঠাট্টা করলে বড় লজ্জা করে। গায়ত্রী শিবানীকে পরে ঠোকর দিল, ওগো শ্রীমতী ভিভে গঞ্জা! এটা লেডিজ সীট নয় যে জেন্টলম্যানরা তিরিং করে উঠেই জায়গা ছেড়ে দেবে! তোমার টিফিন ব্রেকফাস্ট দেখেশুনি কষে কষে খেতে। বাবাজীবনদের একবার দেখতে দাও তারপর বুঝবে। বোতলের ডাঙ আর তাসের গোলামরা এখানে মৌরসীপাট্টা জমাবে!'

শিবানী চটলো না গায়ত্রীর কথায়, বলল, সত্যি এরা পারেও বাবা। কিভাবে সারা রাস্তা গিলতে গিলতে এসেছে। পিছনের গাড়ি থেকে সবই লক্ষ্য করছিলাম। বলে কেমন ট্যারা চোখে গায়ত্রীর দিকে তাকাল।

পিছনের গাড়ির জন্যে আমার ভয় হচ্ছিল। গায়ত্রী ভুরু কুঁচকে শিবানীর কৃত্রিম ট্যারাচোখ না পছন্দ করে বলল যেভাবে রেস চলছিল।

ভয়টা আন্দাজ করা শক্ত নয়। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শিবানী।

শিবানীর একটু আগের কথায় শ্রীলা কেমন গিরগিটির মত লালচে হয়ে উঠেছিল তার মনে হয়েছিল শিবানীর লক্ষ্যটা তাকে তার ভাস্করকে জড়িয়ে। সত্যি ভাস্কর আনপ্রেডিক্টেবল কখন কি করে বসবে চোখ মুখ দেখে আন্দাজ করা যায় না। সকলের সামনে যা তা ভাবে গায়ে হাত দেয়। ছি ছি সবাই কি ভাবলো।

খানিকটা সামলে নিয়ে শ্রীলা বলল, কিন্তু কল্যাণবাবু খুব স্টেডি। স্টিয়ারিং হাতে নিলে—

শুধু স্টিয়ারিং কেন, কোন কিছু হাতে নিলেই ও স্টেডি হয়ে যায়—অসভ্যের মত হাসল শিবানী।

জি টি রোডে আমার রিয়্যালি ভয় করছিল। গায়ত্রী বলল, ড্রাইভারকে সাইড্‌ডিং-এ দিয়ে নওজওয়ানরা যেভাবে হুইল ধরেছিলেন—

আর যেভাবে ফুয়েল টানছিলেন, কোন ট্রাকফ্রাকের সঙ্গে লড়িয়ে দিলেই হল—

মেয়েদের এই গেঁজানীতে বাধা পড়ল। বাংলোর পিছনে দিক থেকে জরুরী তলব আসতেই ওরা তখনকার মত শুনানী মুলতুবী রেখে সেদিকে ছুটলো। ইতিমধ্যে সেখানে কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। কেয়ার-টেকার বাংলোর ঘরগুলো খুলে দিয়েছে। গাড়ির মাথা থেকে যাবতীয় মালপত্র নামানো হয়ে গেছে, এবার সেগুলো গুছিয়ে রাখার কাজে ভাস্কর আর রুদ্রমোহন তৎপর হয়েছে। কোন হোল্ডঅল, কোন সুটকেশ কোন ঘরে যাবে নির্দেশ দিচ্ছে, ড্রাইভার সুন্দর-লাল আর চৌকিদার সেগুলো যথা-স্থানে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাটিতে গুটি ছয়েক মুরগী পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে আর থেকে থেকে ক'ক ক'ক শব্দে মানুষের এই অশালীন আচরণের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। শহর থেকে বেরিয়ে আসার মুখে বাজার থেকে এগুলো কিনে গাড়িতে তুলেছিল শরদিন্দু।

এই যে ম্যাডাম আপনারা গায়ে ফুঁ দিয়ে না বেড়িয়ে একটু হুইল-হেঁসেল ধরুন। শরদিন্দু গাড়ি থেকে রাইফেল দুটো নামাতে নামাতে বলল, পুরুষ বেচারীদের দিয়ে কি আর এসব কম্মো হয়।

রুদ্রমোহন বলল, মঞ্জুশ্রী, আপনি অনুরাধা আর শিবানীকে নিয়ে চটপট ঘরগুলো গুছিয়ে ফেলুন, সুন্দরলাল আপনাদের সাহায্য করবে। আর গায়ত্রী কণিকা তোমরা ভাই কিচেনের ইনচার্জ, বাংলোর কুক অবশ্য আছে কিন্তু ওভার অল দায়িত্ব তোমাদের। বেলা হয়ে গেছে, ঝটপট যাহোক কিছু দুপুরের জন্যে রসুই পাকিয়ে ফেল, মাংসফাংস রাতের জন্যে রাখা থাক।

আমি বলছিলাম, দুপুরে রিয়্যাল বনভোজন হয়ে যাক, কল্যাণ বলল, খিচুড়ি আর বেগুণ ভাজা, খাঁটি গব্য ঘৃত সহযোগে খুব ওতরাবে। সময়ও বেশী লাগবে না।

রুদ্রমোহন গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, প্রস্তাবটা মন্দ নয় কি বলো?

গায়ত্রী ঠোঁট টিপে হেসে বলল, প্রপোজাল অ্যাকসেপটেড। পাকালে খিচুড়ি পাকানোই সব সময়ে বুদ্ধি-মানের কাজ।

এবং সেটা জগা খিচুড়ি হলে জবাব নেই। গাড়ির বুট খুলে কাঁচা বাজার কিচেনে নিয়ে গিয়ে তোল। তোমরা কেউ কি স্নান সেরে এসেছ জ্যোতিদার বাড়ি থেকে?

অনেক দিন পরে সাঁতার কেটে হাতের সুখ করা যাবে। ভাস্কর লাফিয়ে উঠল, অমন নাকের ডগায় লেক থাকতে—

বাথরুমেও চব্বিশ ঘণ্টা কলের জল আছে। রুদ্রমোহন জানালো, ঝর্ণা-রই জল, পাহাড়ের ওপর থেকে আসছে।

দেখা গেল গায়ত্রী, অনুরাধা আর কণিকা স্নান সেরে এসেছে। ডুব জলকে মঞ্জুর কেমন ভয় করে, খাস কলকাতার মেয়ে সাঁতার জানেনা সেটা তেমন ব্যাপার নয়, আসলে বাথরুমের ওপরে একটা স্নায়বিক দুর্বলতা আছে। খোলামেলা জায়গায় গা ভিজোতে বড় লজ্জা। নেচে উঠল শিবানী আর শ্রীলা। শ্রীলা বেদিং কস্টিউম নিয়ে এসেছে সগর্বে জানালো।

ভাস্কর বলল, ঠিক হ্যায়, চ্যালেঞ্জ রইল। তুমি গোলদীঘির সুইমিং ক্লাবে ডুবে ডুবে কত কত জল খেয়েছ একবার তার পরীক্ষা নেব। আমি শালা অরিজিন্যালি নর্থ ক্যাল-কাটার আইরীটোলার ছেলে, হাফ প্যান্টুল থেকে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো সেরে আসছি।

জ্যোতির্ময় কাছে পিঠে নেই দেখে কল্যাণ বলল, আমিও তা হলে ধরি মাছ না ছুঁই পাণি করব।

শিবানী ভ্রূকুঁচকে সন্দিগ্ধ কটাক্ষে তাকালো, সেটা আবার কি বস্তু।

জলের কিনারে আমার বিলিতী ছিপ ফেলে বসব।

অ, মাছ ধরবেন। শ্রীলা আর শিবানী ঠোঁট উল্টে বলল, এসব পাহাড়ী জায়-গায় আবার মাছ থাকে নাকি?

সঙ্গে থাকবে বাইনোকুলার আর পোর্টেবল মুভী ক্যামেরা।

ওমা কি অসভ্য লোক। শ্রীলা যেন ভবিষ্যৎ দৃশ্যটা দেখে শিউরে ওঠে।

শিবানী তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে, মেয়ে-দের চান করা দেখতে আপনার লজ্জা করে না?

ওরে শালা, বিলেত ফেরত ব্যাক-মেলার। ভাস্কর সকৌতুক টীপ্পনী কাটলো।

বন্ধুর কথা কানে নিল না কল্যাণ, সে শিবানীর জবাবে অত্যন্ত নিরীহ মুখ করে বলল, আমি তো তোমাদের চান করা দেখবো না, বস্ত্র হরণের চান্সও নেব না।

মিথ্যেবাদী কোথাকার! এই মাত্তর তো বললেন—

বলেছি নাকি? কল্যাণ শব্দ করে হেসে উঠে বলল, ডুবে ডুবে তোমরা কে ক ঢোঁক জল খাও, আর কে কত-খানি জল ঘোলা কর আমি শুধু তাই দেখবো। আচ্ছা ওই কথাই রইল, চলি—

কল্যাণ সত্যি সত্যি রওনা দিল। শিবানী আর শ্রীলা পিছু ডেকে কল্যা-ণকে ফেরাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কল্যাণ ফিরলো না। তার মাথায় তখন ছবি ঘুরছে, জ্যোতির্ময়কে তার খুব দরকার। এই জায়গাটা তার খুব পছন্দ হয়েছে, শুধু পছন্দ নয়, যাকে বলে মুগ্ধ তাই—।

*

ল অব দা জাঙ্গল অর্থাৎ জংলী কানুন রুদ্রমোহন সামন্ত মনে মনে পছন্দ করে। এক তেল কোম্পানীতে সে চুটিয়ে চাকরি করে, দু দুটো টেলিফোন পাশে নিয়ে বসে। একটা বিরাট ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করে। ছোট ভাইকে বিয়ে দিয়েছে সে সঙ্গে থাকে। নিজে রুদ্র-মোহন স্থির করেছে কোন মেয়েকেই বিয়ে করবে না, তার সংস্পর্শে যত মেয়ে এসেছে সকলকেই সে ওয়েলকাম করেছে, হোটেলের ঘরের মত দস্তুর মাফিক অ্যাকোমোডেশন দিয়েছে কিন্তু তারপরে নির্দিষ্ট দিনে ফেয়ার ওয়েল। আসলে বিয়ের মত মধ্যযুগীয় দাস-প্রথায় সে বিশ্বাস করে না। পুরুষ জাতটা তার মতে মোট বইবার জন্য জন্মায় নি। আসলে কোন স্থায়ী কিছুতে সে বিশ্বাসী নয়। মেয়েরা তার কাছে নেপথ্য ব্যাঙ্কের মত জার্নির পার্টনার। পথচলার স্টেশন থেকে স্টেশন সঙ্গী। সহজে খোল সহজে পড় আবার পুরনো খবরের কাগজের মত সেই রং-চঙ্গে মলাটের বইখানা নিজের ছেড়ে যাওয়া আসনের ওপর ফেলে চলে যাও। যে মাছভাজা খেতে চায় সে মাছকে বরাব-রের জন্য বঁড়শিতে গেঁথে রাখে না।

অথচ রুদ্রমোহনকে দেখলে কখনই নিষ্ঠুর বলে মনে হয়না। কখনোই না। বরং কল্যাণকে কিঞ্চিৎ ঠান্ডা, শর-দিন্দুকে অনেক বেশী রুয়েল মনে হয়। শরদিন্দুরা বিরাট ধনী, ও ফুর্তির জন্যে জলের মত অর্থ ব্যয় করে কিন্তু সবই যেন তাস সাফল করার মত, তাস বাঁটার মত নির্লিপ্ত হাতে নিজের জন্যে স্পেশাল কিছু ওর নেই। আর ভাস্কর আজ ক-বছর ধরে বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে, ও বিয়ে করে স্বামী হতে চায়, পুত্রকন্যার জনক হতে চায় সব অ্যাডভেঞ্চার থেকে বিদায় নিতে চায়। কিন্তু ওর অবস্থা সত্যিই করুণ, চোখ ঝলসানো শাড়ির দোকানে ঢুকে মেয়েরা যেমন কিছুতেই মনস্থির করতে পারেনা, ওর সেই দশা চলছিল। এত-দিনে বোধহয় সেটল করতে যাচ্ছে, রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিশ পর্যন্ত পড়ে গেছে। কিন্তু এরকম নোটিশ আগেও বার দুই পড়েছে, তাই এখনো ফাইন্যাল কিছু বলা যায় না।

বাংলোর পিছন দিকে বিরাট মুচকুন্দ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রুদ্রমোহন চার-পাশে চেয়ে দেখছিল। এই জায়গাটায় দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ও দেখতে পেল সকলের চোখ এড়িয়ে ভাস্কর আর শ্রীলা লেকের দিকে গুটি-গুটি এগোচ্ছিল, কিন্তু শিবানীর চোখ এড়ানো শক্ত। সে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে নিঃশব্দ চিতার মত ওদের ধরে ফেলল।

চেষ্টা কোরে যান

দেখুন, সাধারণ কাজও অসাধারণ ভালো
করা যায় কি না। এই ভাবেই সকলে
দেশ গঠনের কাজে অংশ নিতে পারেন।

ইন্দিরা গান্ধী

আসুন সবাই মিলে নতুন কোরে

এই দেশটাকে গড়ে তুলি

davp-16/37

মনে মনে হাসল রুদ্রমোহন। বাংলোর ভেতর থেকে মঞ্জুশ্রীর গলা শোনা যাচ্ছিল। সে ঘরগুলোর তদারকি করছে। জ্যোতির্ময় পাহাড়ে উঠেছেন, দূর থেকে তাঁকে প্রায় পুতুলের মত মনে হচ্ছে। শরদিন্দু বোধ হয় কিচেনের সামনে মাংসের সাইজ ঠিক করছে।

নিন একটু ভাজা মাছ উল্টে খান। গায়ত্রী কখন এক প্লেট মাছ ভাজা নিয়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রুদ্র বিন্দুমাত্র টের পায়নি।

জবাব নেই! একটু দূরের কবরির ঝোপ নড়ে উঠলো, হাতে ক্যামেরা গলায় বাইনোকুলার ঝুলিয়ে কল্যাণ গালপাট্টা হাসি হেসে এসে দাঁড়াল। ভূত দেখার মত গায়ত্রী চমকে উঠল।

রুদ্রমোহন বিদ্রূপভরা গলায় বলল, 'সত্যিই জবাব নেই। তোর এই আড়িপাতা মেয়েলী বিজনেসটা আমি বুঝতে পারি না!'

কল্যাণ হাহা করে হেসে বলল, 'কোনো কোনো ব্যাপারে আমি আনাড়ি হতে পারি কিন্তু কারো সঙ্গেই আমার আড়ি নেই।' বলেই বাঁকা চোখে গায়ত্রীর দিকে তাকাল, 'ইটস টু মাচ, গায়ত্রী, তুমি সকলকে চাখিয়ে বেড়াচ্ছ নাকি?'

গায়ত্রীর ফ্যাকাশে মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল কেমন আড়ষ্টগলায় বলল, 'খাবেন, আনবো?'

কল্যাণ গায়ত্রীর কথার জবাব না দিয়ে রুদ্রর প্লেট থেকে খপ করে একখানা মাছভাজা তুলে নিয়ে স্বগতোক্তি করল, মৎস্য ধরিব খাইব সুখে! তারপর এক-মুহূর্ত থমকে গিয়ে বলল, 'আশ্চর্য! মাছ এল কোত্থেকে?'

গায়ত্রী বলল, 'কেয়ারটেকারবাবু। যাই আপনার জন্যে নিয়ে আসি।' ও যেন পালাতে পারলে বাঁচে। পিছন ফিরে ছুট দিল।

কল্যাণ বলল, 'দরকার হবে না। আমরা এক গেলাসের বন্ধু, এক ডিশেই ম্যানেজ করে নেব।'

দুজন একা হতে রুদ্র বলল, 'ঝোপের মধ্যে কি করছিলি?'

'ঝোপ বুঝে কোপ মারছিলাম।' ক্যামেরার প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, গোটা চৌহদ্দি এতক্ষণ চোষে বেড়িয়েছি। গাছে উঠেছি, খাদে নেমেছি, টিলায় চড়েছি—গোটা টপগ্রাফী এখন আমার নখদর্পণে। জায়গাটা ইটসেলফ একটা ক্যারেকটার, সাসপেন্সে ভরা। গল্পটা নেশার মত ধরে যাবে, রুদ্র।'

বইটা আমি—আমরা কেউই কিন্তু পড়িনি।' রুদ্র সিরিয়াস হয়ে উঠল, 'একটা ছবিতোলা খেলা-খেলা নয়। তুই ভীষণ হুজুগে—হটকারী আছিস।'

কল্যাণ রহস্যময় হাসল, 'এক গাট্টি খেলেই দেখা যাক না, খেলতে খেলতে ছবি হয় কিনা। বইয়ের গল্পটা আজ রাতে শোনাবো, তবে আমার মগজে আসল চিত্রনাট্য কুমোর পোকার মত বাসা বানাচ্ছে। ইনফ্যাক্ট, গল্প তৈরি হচ্ছে, তুমি আমি আমরা সবাই মাকড়সার মত একটাই গল্পের সুতো নিয়ে খেলছি। এই উইক এন্ড আমরা শুধু গল্প-গল্প খেলবো। সকলের অলক্ষ্যে আমার ছবির সিনারিও তৈরি হতে থাকবে, এক গল্পের দর্পণে আর এক গল্প দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখবে। তোমরা খেলতে থাক, আমি আছি, তোমাদের খুব কাছেই আছি।' কল্যাণ মাছের টুকরো চিবোতে চিবোতে তার বাইনোকুলার চোখে রাখলো, অটোফোকাস অ্যাডজাস্ট করতে করতে ঘরে দাঁড়াল।

'ম্যাড!' রুদ্রমোহন মন্তব্য করে হাতের ডিশে মনোনিবেশ করল।

*

বাংলোর জানলায় দাঁড়িয়ে অনুরাধা লামনের খাড়াই পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে ছিল কিন্তু আসলে কিছুই দেখছিল না, তার মনের মধ্যে একটা চাপা অস্বস্তি কেবলই পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল এখানে এসে সে ভাল করেনি এই ড্যামাডোলের মধ্যে সে কিছুতেই নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল এখানে তাকে সে একা পাবে না, অন্ততঃ একলার করে পাবে না। অরণ্যে শুধু রোদনই সার হবে বুঝি। উইক এন্ডের সব কাল্পনিক আনন্দ, কানে কানে নির্জনতা, মুখোমুখি বসে থাকার অবকাশ সব মাঠেই মারা গেল। বাড়িতে মিথ্যে গল্প ফেঁদে বেরিয়ে আসা কে জানে হয়ত কোন কাজেই লাগলো না।

আসলে এই মেয়েগুলোকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না, এদের সঙ্গে মানিয়ে দুটো দিন কাটান তার পক্ষে কষ্টকর হবে। মেয়েরা ছেলেদের চোখ ধাঁধিয়ে মুগ্ধ ঘুরিয়ে দিতে পারে ঠারে-ঠমকে, চোখে ধুলো দেওয়াও খুব কঠিন কর্ম নয়। কিন্তু মেয়েদের কাছে মেয়েদের ফাঁকি চলে না, কোন মেকি মেক-আপ অচল ছলাকলা অবান্তর। সবাই যেন সবার কাছে দিনের আলোয় উলঙ্গ। অনুরাধার ভাল লাগছিল না, শরদিন্দুর ওপর তার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ছি ছি, কেউ তাকে এ রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেনি কখনোও। শরদিন্দু যখন তাকে কোন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তুলে আনবার প্ল্যান এঁটেছিল তখন একবারও ঘুণাক্ষরে আভাষ দেয়নি যে গাড়ি একটা নয় দুটো এবং গাড়িতে তারা ছাড়াও আরও অনেকে যাচ্ছে। এবং তাদের কেউই তার পূর্ব পরিচিত নয়। গাড়িতে উঠেই থ হয়ে গিয়েছিল। এত হৈ হুল্লোড় হাসি রং তামাসা কেমন অতিনাটকীয় মনে হয়েছিল, সবটা তখনও ধরতে পারেনি। সাবানের ফেনার তলায় ক্ষুর যেমন নিঃশব্দে তার কাজ চালিয়ে যায়, এই উচ্ছল হাসি আর অফুরন্ত ছেলেমানুষীর তলায় ধারালো ঈর্ষা আর অসহিষ্ণুতা পরস্পরকে ছেদন করার জন্যে তেমনি সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বুঝতে খুব একটা বিলম্ব হয় না সবাই এখানে সবাইকার প্রতিদ্বন্দ্বী।

তবু শরীরের প্রথম ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি বুঝি জন্মান্তরেও মোছে না। সেই প্রথম মানুষটির কাছে মেয়েরা ফিরে ফিরে আত্মদান করতে পারে। এ এক দুর্বোধ্য মানসিক দাসত্ব, রক্তের মধ্যে এর অনিবার্যতা লুকোনো থাকে বুঝি। তাই বিবাহিত প্রণয়ীর আমন্ত্রণও উপেক্ষা করতে পারেনি ছুটে এসেছে অনুরাধা।

হঠাৎ পাহাড়ের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল সে। জ্যোতির্ময়বাবু খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠছেন। চমক সে জন্যে নয়, লোকটাকে এত চেনা লাগার কারণ এতক্ষণে মনে পড়ল, সেই জন্যে!

—চার—

বেতের আধশোয়া চেয়ারে আকণ্ঠ ডুবে আয়েস করে বসে ছিল ওরা।

টাঁকশাল থেকে সদ্য-ছাড়া-পাওয়া চাঁদ উঠে পড়েছে বনের মাথায়, ওদের চারপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো শালগাছের ফাঁক দিয়ে ছায়া-জ্যোৎস্নার জাফরি এসে পড়ে জায়গাটাকে কেমন ধাঁধায় পরিণত করেছে। এই বন বাংলোর লনটাকে আর এখন লন মনে হচ্ছে না, একটা মায়াবী ফাঁদ মনে হচ্ছে যেন।

বাংলোর কেয়ারটেকার আর বন্দুকবরদার কাম বাবুর্চি দুজন সাহেবদের লাস্য মজলিশে গেলাসের আনুষঙ্গিক সরবরাহ করে অনেকক্ষণ ভেতর মহলে রান্নাঘরে চলে গিয়েছে। সেখানে আজ রাতের জন্যে রাজসিক আহার্যের আয়োজনে তারা রীতিমত ব্যস্ত। ঘরে ঘরে বিছানা বানানো শেষ হয়েছে, সম্ভবতঃ থালা রচনাও সমাপ্ত। সরাব সহবৎ শেষে সাহেব বাবুদের এখন ক্ষুধার উদ্রেক এবং মার্জনা হলেই হয়।

কদিন বনবাদাড় ঠেঙিয়েছে, রুদ্রকে ঘাড়ে এক নাগাড়ে পাহাড় জঙ্গল জরীপ করে বেড়িয়েছে, কখনও বুকে হেঁটে, কখনও গাছে উঠে, কখনও মাইলের পর মাইল কুইকমার্চ করে। ফলে খাবার টেবিলে প্রত্যেকেই এক একটি হিপোপটেমাসের মত আচরণ করেছে এবং বিছানায় পড়া মাত্র মোষের মত ঘুমিয়েছে। কিন্তু আজ সারাদিনই ঘরে বসা, প্রায় নিশ্চল মূর্তিতে সকাল দুপুর বিকেল কেটেছে তাই বাবুর্চি আর কেয়ারটেকার উভয় পক্ষই দুশ্চিন্তিত। সাহেবদের আহার নিদ্রা আর মেজাজের কোন হদিশ পর্যন্ত পাচ্ছে না।

গোল হয়ে বসেছিল ওরা ক জন, সবাই শ্রোতার মতই নিশ্চুপ, একজন মাত্র কথা বলছিল, তাও স্বগতোক্তির মতন, যেন ঠিক কাউকে লক্ষ্য করে বলছে না। বিশেষ করে মহিলা দুজন, যারা আজ

দুপুরেই প্রথম এখানে এসে পৌঁছেছে, একেবারেই বস্তার নিশানার বাইরে।

'আদিম মানুষে একদিন অরণ্য প্রাণীর মতই দীর্ঘনাসা ছিল, না, বাইরে নয়, ভেতরে ভেতরে অর্থাৎ ঘ্রাণ শক্তিতে। যাকে আমরা সিকসথ সেন্স বলি, তার সঙ্গে এই নাসিকা নামক মাফটিপারপাস যন্ত্রটি মূলে যুক্ত ছিল। তাই এখনও বিপদের গন্ধ, রহস্যের গন্ধ ইত্যাদি কথা চালু আছে। চোখ কানকেই আমরা সবচেয়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের পাত্র করে তুলেছি ইদানীং কিন্তু তারা অনেক সময় অন্ধ এবং ভ্রান্ত আচরণ করে আমাদের সঙ্গে, শত্রুপক্ষের ধূর্ততার কাছে অনেক সময়ই সহজে প্রতারিত হয়। রিসিভার হিসেবে তারা খুব পাওয়ারফুল নয়, সুপার সেন্সিটিভ না। তাদের রেডিয়াস সামান্যই। চোখের সামনে আড়াল থাকলেই মানুষ অন্ধ, রেঞ্জের বাইরে গেলেই মানুষ কালা, অনেক রং-এর মিশ্রণ ঘটলেই আমরা কালার ব্লাইন্ড, অনেক শব্দের মিকশ্চার ঘটলে সাউন্ড-পাজলড। কিন্তু শিকারী প্রাণীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিপদজ্ঞ যন্ত্র হিসেবে উচ্চ স্তরের। এর মধ্যে স্কেল আছে, কম্পাস আছে, অ্যানালিস্টের টেস্ট টিউব আছে আছে আরও অনেক কিছু। সুতরাং সবচেয়ে অ্যাডভান্সড অর্গান হচ্ছে এই নাক! বক্তা সাময়িক বিরতি নিয়ে নিজের নাকে হাত দিল।

জুলজির অধ্যাপক শঙ্করদাসের নীরস বক্তৃতায় স্থায়ী ছেদ আনার জন্যে বিপুল মিত্র ফোঁড়ন কাটল, এক্স, আপনি আমাদের ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছেন?'

শ্রোতাদের নির্জন মনোযোগ আলগা হয়ে গেল। জনা দুই আবছা গলায় হেসে উঠল। হাত পা ছড়িয়ে কেউ চেয়ারের মধ্যে নড়েচড়ে বসল, গ্লাস ওঠানো-নামানোর এবং লম্বা চুমুকের শব্দ হল। একটু তফাতে শাড়ি আর সালোয়ারের খসখস শোনা গেল। মিসেস মিত্র কোলের ওপর উলের গোলা নিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় কিছু বুনছিল, তার থেমে যাওয়া হাত দুটো আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো, লম্বা কাঁটা দুটো পরস্পর কর্কশ শব্দে কাটাকাটি করে চলল, অন্য মহিলাটি তার বব্ড চুলের রাশ সামনে এনে আঙুলে খেলা করছিল।

কে একজন বলে উঠল, 'আপনাকেও কিন্তু শিকারী প্রাণী বলা যায়।'

আর একজন কেউ প্রশ্ন করল, 'সেই থেকে কেবল বিপদের কথা আসছে কেন?'

'এমনি আসছে, এসে যাচ্ছে। শঙ্করদাস কথাটা বলেই আলোছায়ার ঝোরাঝাটা একটা মূর্তির দিকে তাকালো, সুচিত্রিত ভুরুর নীচে, পাতলা অধরোষ্ঠের ওপর একজোড়া চোখ নীল আগুনের আভা নিয়ে জ্বলছে। যেন সে ক্লান্ত, যেন তার কথা ফুরিয়ে গেছে, শঙ্করদাস তেমনিভাবে চুপ করে থাকল।

শঙ্করদাস ভট্ট বয়সে উপস্থিত সকলের চেয়ে বড়, দু পাশের জুলপি একেবারে সাদা, এখন এই মুহূর্তে অবশ্য বুঝতে পারা যাচ্ছে না। অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়েছে, কলেজ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আর যুক্ত নেই তবু অধ্যাপক পরিচিতিটুকু নামের সঙ্গে খেতাবের মত যুক্ত হয়েই আছে। ব্যাচেলার মানুষ, অগাধ পৈতৃক সম্পত্তির মালিক, সেই সঙ্গে ক্যামেরারও। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় শিকারটিকার করে। সেই সূত্রেই এদের সঙ্গে পরিচয়। জন্তু জানোয়ারের জীবন্ত ছবি তোলার নেশা তার অনেক দিনের তাদের অতি নিভৃত জীবনে তথ্য খুঁজে বেড়ায় একা একা। এমনিতে খুব চাপা স্বভাবের, কম কথা বলে, একমাত্র ডায়েরীতে নিজের কাছে ছাড়া কোথাও মুখ খুলেছে কখনো এমন শোনা যায়নি।

আকণ্ঠ পূর্ণ হাতের গ্লাসে একটা রঙীন চুমুক দিয়ে তরল গ্লাসটুকে নিজের চেয়ারের হাতলে সযত্নে বসিয়ে রাখল। সকলের মাঝখানে বেতের টেবিলের ওপর দাবার ছকের মত একটা বহুমুখী ট্রে বসান আছে। তার ওপরে দীর্ঘ বেন্টে গোল চাপটা এবং ত্রিকোণাকৃতি বোতলের সমারোহ। যেন দাবার ছকের মধ্যে যুদ্ধমান দুই পক্ষের বিগগানসরা বোঝাপড়ার জন্যে মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। নানা রং নানা ব্র্যান্ড নানা লেবেল।

প্রফেসর শিবরাম চক্রবর্তীর ভাষায় উল্টো দিকের চেয়ারের মধ্যে বিলকুল নিমজ্জিত সতীন দত্ত লঘু গলায় কথা বলল একেই বলে নাক নিয়ে নাকাল হওয়া।

আপনিও নাক গলাতে এলেন মশাই তাহলে? বিপুল মিত্র যেন ফাইটার মাছের মতই সকলকে ঠুকরে দিতে প্রস্তুত।

ঘ্রাণের দ্বারা অর্ধ ভোজন সারতে আমি অন্তত রাজী না। কুর্ণিশের ভংগিতে সামনে ঝুঁকে পড়ে সতীন নিজের গ্লেটটি বাড়িয়ে ধরল, কয়েকটা শিককাবাব একেবারে কাবার হবার আগে অধমের পাত্রেও ছড়ুন দু-একটা।

হেসে উঠল কেউ কেউ। গণেশ গাঙ্গুলী কয়েকটা রোল তার প্লেটে দিতে দিতে বলল, সতীন থাকার এই দুঃখ।

এই কথার পিঠোপিটি মেয়েলি হাসির টুকরো ছিটকে এল। ব্যান্ড মাস্টার মনজেশ চৌধুরী পাম্পিং মেশিনের মত নিভুল হাতে আর একদফা পাঞ্চ করতে বসেছিল।

সালোয়ার কামিজ এই সময় তারিফ-ভরা গলায় বলে উঠল, ওয়ান্ডারফুল এই জ্যোৎস্না যাই বলুন না কেন আপনারা। মহিলার গলাটা কেন রিচ, কাকজ্যোৎস্নায় চুপ করে বসে থাকলে বুকের ভেতরটা খুঁড়ে যায়।

শেষ কথাটুকু শুনে সকলে জ্যোৎস্নার দিকে তাকাল। সত্যি রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অসহ্য জংলী জ্যোৎস্নায় দূরের বন আর কাছের জঙ্গল যেন একেবারে চুর হয়ে আছে। প্রত্যেকটি বৃক্ষকে মাতাল বলে মনে হয়। ফুলের কেয়ারী ঘাসের লন, হেজের বেড়া সব যেন ঝিম ঝিম করছে।

একটা ছোট পাহাড়ের ওপরে এই বন বাংলো। তিনদিকেই পঁচিশ ত্রিশ ফুট নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্ধকার খাদ। পাগলা ঝোরা যাবার পথ এটি। এখন জল নেই বদলে জঙ্গল ঘন হয়ে জমেছে। অন্যদিকে চেয়ারের খাড়া পিঠের মত একটা ন্যাড়া পাহাড় সোজা উঠে গেছে। খাদ আর পাহাড়ের পাহারায় দুর্গের মত নিরাপদ এই কমপাউন্ড শুদ্ধু বাংলোটা। একমাত্র বাংলোর মুখোমুখী খদের ওপর দিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ব্রীজ গিয়ে পড়েছে ওপারের রাস্তায় যে রাস্তাটা পাকদণ্ডি খেলোয়াড়ের হাতের তলোয়ারের মতই সটান ছুটে গিয়ে ফরেস্টর বুকের ভেতর ঢুকে গেছে। লাল ল্যাটেরাইট সয়েলের রাস্তা কাঁচা রক্তে ভেজা তরবারীর মতই মনে হয় দূর থেকে। কিন্তু এ দৃশ্য দিনের বেলার, রাতের এখন পথটা অরণ্যের ফুটনোটের মত জ্যোৎস্নায় রহস্যময় হয়ে জ্বলছে।

একটি সম্ভবত অতিকায় নিশাচর পাখি বিকট গলায় বিদকুটে ডাক দিয়ে উঠল দূরে কোথেকে। গোটা দুই নাইটজার ধূসর পাখায় সভয়ে উড়ে গেল গাছের পাতার মধ্যে কয়েকটা আধ পাকা খসা পাতা অনেক উঁচু থেকে বিলম্বিত শব্দ তরঙ্গ তুলে মাটির ওপরে এসে পড়ল।

কি রকম একটা অসাচ্ছন্দ্য জাগল সকলের মনের মধ্যে। অদৃশ্য ফুলের গন্ধের মত আবহাওয়াটা অশরীরী অথচ জীবন্ত হয়ে উঠল। কথা থেমে গেল সবাইকার। রাত আরও একটু গাঢ় হয়েছে। প্রৌঢ় অরণ্যের কিনারে এই গম্ভীর নিস্তব্ধ রাতে যেন চপলতা কেবল মানুষের ঠোঁট থেকেই মিলিয়ে যায় না মন থেকেও উপে যায়। পুরোন স্মৃতি এসে মনকে অবরোধ করে বসে। মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে অত্যন্ত আসন্ন একটি ভবিষ্যতের সরীসৃপ চলে বেড়াতে থাকে।

আজ কদিন ধরেই ওরা শিকারের সন্ধানে সারাদিন এই অরণ্যের মধ্যে ঘুরে

বেরিয়েছে। কিন্তু এই গভীর জঙ্গলের পকেট কারা যেন আগে থেকেই সাফ করে রেখে গেছে. কানা কড়িটিও আর পড়ে নেই। শেষ পর্যন্ত একটা বুনো শুয়োর মেরে পিণ্ডি রক্ষা করেছে। ওদের শিকারী জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। অথচ কত উড়ো খবরের কাহিনীই না তাদের এখানে টেনে এনেছিল। টেনে এনেছে আজ দুপুরে সস্ত্রীক বিপুল মিত্রকেও। মিসেস মিত্রের অতিথি হয়ে এসেছে তার বান্ধবী টাইগ্রেস শুটিং ক্লাবের লাইফ মেম্বার ও একদা কালের ওয়েস্ট বেঙ্গল চাম্পিয়ান মিস সুচেতা ভরদ্বাজ। এসে সবাই কিঞ্চিৎ হতাশ রোমাঞ্চে ঠাসা রংচং-এ মলাটের গল্পের বইয়ের মত শেষ পর্যন্ত অবাস্তব বনপর্ব সেরে এরা কাল পাততাড়ি গুটোচ্ছে এখান থেকে।

জঙ্গলে মেয়েদের আসতে দেখে শংকর দাস কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বিপুল মিত্র আলাপ করিয়ে দিতে তার স্ত্রী অরুন্ধতী জোড়হাতে নমস্কার করে অদ্ভুত হাসল. এ বনে বাঘ নেই কেন এখন বুঝতে পারছি।

শংকরদাস প্রতি নমস্কার করতে ভুলে গিয়ে সুচেতার মুখের দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতীকে পাল্টা প্রশ্ন করল, কেন নেই?

পালিয়েছে বলে।

বাঘ পালিয়েছে?

হ্যাঁ, আপনার মত গম্ভীর মানুষকে দেখলে বাঘ তো বাঘ, তার চোদ্দপুরুষ বন ছেড়ে পালাবে।

স্ত্রীর রসিকতায় বিপুল মিত্র সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হাসল। খিলখিল করে হেসে সুচেতা তার বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করল, উনি বুঝি খুব গম্ভীর অরুণ?

অরুন্ধতী কিছু জবাব দেবার আগেই মনুজেশ বলল, ভেরী ভেরী সরি মিসেস মিত্র। আপনারা এলেন অথচ দুটো খরগোশ মেরেও শিভ্যালরি দেখাতে পারলাম না। ধিক এই পুরুষ জীবনে।

পুরনো পল্টনের আজ রাতে যেন ক্যাম্প ফায়ার। গ্লাসে গ্লাসে তরল আগুন জ্বলছে, সেই সঙ্গে সমান্তরালভাবে জ্যোৎস্না এবং আগুন হয়ত আরও কোথাও কোথাও আছে জ্বলছে দেখা যাচ্ছেনা। হয়ত কারো চোখে কারো বুকে। শংকরদাস দুপুরের কথাগুলো ফিরে ফিরে ভাবছিল। পেছনে একটা বড় পাথরের চাঁই তার গায়ে হেলান দিয়ে স্টেনলেস ব্যারেলগুলো জ্যোৎস্নায় ঝকমক করছে। সিঙ্গল ব্যারেল ডাবল ব্যারেল, নেশা জমাট বাঁধছে। বাংলোর বারান্দায় বাবুর্চি অঁর কেয়ারটেকার ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। অধৈর্য হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে ওদের ছায়ামূর্তি সামান্য নড়া-

আরো অনেক মহিলার মত
ইনিও বলেন,
"ভিনকোলা-১২ আমার
জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল!"

কল্পনা কত ক্লান্ত
থাকতেন সারাদিন।
কাজের নামেই
বিরক্তি আসত।

কল্পনা প্রতিদিন ২ বার
করে ভিনকোলা-১২ খেতে
শুরু করলেন। শীঘ্রই
বুঝতে পারলেন তাঁর জীবনে
এক পরিবর্ত্তন আসছে।

আজ ওঁর মধ্যে কত
উৎসাহ। সারাদিন
হাসিমুখে কত কাজ করেন।

কতনা শক্তি, কতনা উৎসাহ!
খুশীতে কল্পনা বলেন,
"ভিনকোলা-১২
আমার জীবনে
এক পরিবর্ত্তন এনে দিল।"

ভিনকোলা-১২
ভিটামিন বি-১২ যুক্ত আয়রন টনিক

Standard

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যালস্ লিঃ
কলিকাতা ৭০০ ০১৬
ভারতে পেনিসিলিন ও
অন্যান্য আধুনিক ঔষধাদির
অগ্রণী প্রস্তুতকর্তা। স্থাপিত ১৯৩৪ সাল।

Shilpi SPL 4A/75 bun

চড়া করছে, বিড়ির আগুন দেখে বোঝা যায়। পা ছড়িয়ে বসে আছে শংকর দাস তার শুদ্ধের ডগায় একটা সরীসৃপ যেন মাথা দিয়ে টোকা দিল। ফণা তোলার আগে যেমন খেলে। অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া শিলপার কখন এগিয়ে এসেছে, শংকরদাস টের পেল। তৃতীয় রাউন্ডের গ্লাসে গ্লাসে বাজিয়ে বিপুল-সতীন-মনুজেশ-অভয় সবে ঠোঁট ভিজিয়েছে অমনি আচমকা কেমন এক ঝলক হাওয়া এল। হাতে গ্লাস নিয়েই মনুজেশ তুখোড় শিকারীর মত খাড়া হয়ে বসে বাতাস শুঁকতে লাগল। শংকরদাস সম্ভবত পাশে রাখা ট্রানজিসটার অন করে নব ঘুরিয়ে দিয়েছিল সিক মোচড়। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত নাটকীয় ক্যাপসনের মত সেই আরণ্যক নির্জনতা ফুঁড়ে বেরল গানের একটি কলি : ওগো বাতাসে কি কথা ভেসে চলে আসে...

উত্তেজিত চাপা গলায় মনুজেশ যেন ধমক দিল, বন্ধ করুন রেডিও।

সত্যিই জবাব নেই.....

ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল সবাই চমকে তাকাল। শংকরদাস তৎক্ষণাৎ সুইচ অফ করে বললেন, কি হল?

কেন আপনারা কেউ গন্ধ পাচ্ছেন না?

শংকরদাস ম্লান হেসে বলল বাঘের গন্ধ।

একথার কোন জবাব দিল না মনুজেশ। কথাটা হয়ত আদৌ প্রশ্ন নয় শংকরদাসের স্বীকৃতি মাত্র। মনুজেশ পিছনে হাত বাড়িয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় নিজের দোনলাটা টেনে নিল। ইতিমধ্যেই কারো কারো নেশা এসেছিল অল্পসল্প। কিন্তু এক মুহূর্তেই সবাই যেন বিপদের আশঙ্কায় সজাগ হয়ে বাতাসে নাক ঘষল। চোখের পলকে সবাই যেন অ্যামেচার থেকে প্রফেশন্যাল।

প্রফেসার।

উঁ?

বাঘটা খুব কাছেই এসে পড়েছে কিন্তু আমি স্পষ্ট গন্ধ পাচ্ছি এখন ...

শংকরদাস সামান্য জড়িত স্বরে প্রশ্ন করল কোথায়? আমাদের ভেতর।

সবাই পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বাঘের গন্ধ সকলেরই চেনা কিন্তু বাতাসে এখন ফুলের গন্ধ আর অ্যালকোহল ছাড়া আর কিছু নেই। নেশা মানুষকে অনেক প্রখর অপ্রকৃতিস্থ চেতনা যুগিয়ে থাকে সময় সময়। মনুজেশের বোধ হয় নেশা খুব জমেছে নইলে বাঘের গন্ধ কি আর কেউ পেত না? তাছাড়া ফরেস্টের পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ পশু-পাখিরা নিশ্চয়ই সংকেত পাঠাত বাঘ বেরলে! তদুপরি বাঘের নিজস্ব হাঁক ডাক শুনতে পাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এপর্যন্ত কোন সন্দেহজনক শব্দ তাদের কানে আসেনি।

সকলেরই চোখ চলে গেল বিনা-বাক্যব্যয়ে সামনের ব্রীজটার দিকে জ্যোৎস্নায় সেটা ফটফট করছে। বাঘকে যদি এক্ষুণ্ডই কারও ঘাড় মটকাবার জন্যে এখানে আসতে হয়, তাকে তবে ওই পথেই আসতে হবে। মনুজেশ বন্দুক প্রায় কাঁধে তুলে নিয়েছে সেফটি ক্যাচ খুলে একেবারে পনের আনা রেডি হয়ে আছে। মনুজেশের নার্ভ বরাবরই শক্ত, মাটিতে দাঁড়িয়ে বারদুই সে মুখোমুখী বাঘ মেরেছে, বুনো হাতিও। কিন্তু আজ কেবলমাত্র গন্ধই তাকে এত বিচলিত করার কারণ বোধহয় নেশা, আর নেশার সঙ্গে মিশেছে শংকরদাসের নাসিকা-সংক্রান্ত আলোচনা।

বিপুলই প্রথম ঘোষণা করল, সে বাঘের কোন গন্ধ পাচ্ছে না। মনুজেশ ছাড়া সবাই একে একে একই স্বীকারোক্তি করল। মনুজেশ স্বভাবতই উত্তেজিত। শংকরদাস কোন মন্তব্য করেনি। তার পাশে বসে বিপুল মিত্র লাইটার জ্বালতেই মনুজের চোখে পড়ল শংকর দাসের মুখখানা কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছে। এই জঙ্গলের কিংবদন্তী, অলৌকিক এক বাঘিনীর কাহিনী শংকর দাসও শুনেছে, তবে বিশ্বাস করেছে কিনা বলা শক্ত। মুখে কিছু না বললেও বিপদের কোন পূর্বাভাষ সে নিশ্চয়ই পেয়েছে, বাঘের গন্ধ না পাক, কোনো আসন্ন বিপদের গন্ধ নিশ্চয় তাকে ভেতরে ভেতরে নাড়া দিয়ে গেছে।

দুঃখের বিষয়—শংকর দাস ভাবছিল —এরা সবাই আর পাঁচজন লোকের মতই এক অর্থে সাধারণ। এরা ভাল শিকারী হতে পারে, ভাল আড্ডাধারী বন্ধু, কিন্তু যাকে বলে ইমাজিনেশন তার কোটা এদের শূন্য। গান ব্যারেলের মতই এরা ফাঁপা, একমুখী এবং ভয়ঙ্কর রকমের প্র্যাকটিক্যাল, চোখে দেখার জগতের বাইরে এরা কিছুই জানে না, বোঝে না, বিশ্বাস করে না। ট্রিগারের মতই করায়ত্ত এদের আত্মবিশ্বাস, কিন্তু সমস্ত মনটাই নিশানায় নেশাগ্রস্ত, যাকে বলে ফ্লাই ব্লাইন্ড। একটি অনড়, মরা মাছি বরাবর চোখ রেখে যেন বসে আছে। ঠিক বুলেটের মতই ওরা নীরেট। কোন মায়াবী জঙ্গলের পবিত্রতা যদি কেউ নষ্ট করে থাকে তাহলে কড়ায় গণ্ডায় তা শোধ করার সময় একদিন আসেই। একথা এরা ঠিক বুঝবে না সামান্য বাঘিনীও কখনো শিকারীর জ্বলন্ত মানুষ খেকো হয়ে ওঠে। শংকরদাস তার লুমিনাস ঘড়ির ডায়ালে চোখে দেখতে পেল রাত দশটা কুড়ি বেজেছে। জঙ্গলের হিসেবে মধ্যরাত।

'এবার বৈঠক শেষ করা যাক, রাত হয়েছে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম!' সতীন যেন মুখিয়েই ছিল, 'এবার ওদের খেতে দিতে বলি?'

'কিন্তু বাঘটা?' মনুজেশ ব্রীজের ওপর থেকে চোখ সরায় না।

'অপেক্ষা করে থাকুক!' কে যেন লঘু গলায় বলল।

'ও হচ্ছে মনের বাঘ।' গলাটা সতীন দত্তরও হতে পারে। মনুজেশের কাছে সমস্তই কেমন ঝাপসা, আকর্ষণ-হীন মনে হচ্ছে।

'পেপার টাইগারের মত?' বিপুল বলল।

'বোতলের বাঘ বলুন।' কয়েকজন হেসে উঠল সতীনের কথায়।

সব বিষয় নিয়ে ভাঁড়ামি ভাল লাগে না, মশায়!' মনুজেশ রুদ্ধ চোখে ফিরে তাকাল।

'চলুন, খাবার ডাক এসেছে।' অভয় চাটুজ্জে বলল।

সবাই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে হাত মুখ মুছে খাবার টেবিলে গিয়ে বসল। হ্যাজাক বাতির উজ্জ্বল রঙীন আলোয় ডাইনীং হল ভরে গিয়েছিল। সকলের মগজেই নেশা চেপে এসেছিল। কেউই প্রায় কথা বলছিল না। অত্যন্ত মনোযোগসহকারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সমাধা করার মত মুখোভঙ্গী করে সবাই ঝুঁকে পড়ে খাচ্ছিল। এমন সময় খাবার টেবিলের সামনের জানলায় বাইরে আম গাছের নীচু ডাল থেকে খুব কর্কশ গলায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠেই উড়ে গেল। সবাই চমকে তাকাল। যেন চটকা ভেঙে গেল। মনুজেশ অবশ্য এখন আর বাঘের গন্ধ পাচ্ছিল না।

শংকরদাস সশরীরে বসে থাকলেও সেখানে সে উপস্থিত ছিল না। কেবলই

টুকরো টুকরো দৃশ্য, কথা আর মুখ মনে পড়ছিল। জীবনের অনেক ভুলতে না পারা কাহিনী। অনেক মুখ—ঘৃণায়, অভিশাপে, ধিক্কারে, কান্নায় বিকৃত অনেক মুখ। অনেক ঘটনা, যার আজ আর এক তিলও সংস্কার সাধন কি সংশোধন সম্ভব নয়। যেন একটি গোপন অ্যালবাম. বারবারা, বৈজয়ন্তী, পদ্মা রুকিণী সুচেতা লতিকা। কেউ বেঁচে আছে কেউ নেই। আজ স্মৃতি-চারণের দিন।

খাবার টেবিলে মনুজেশের পাশে নয় যেন, কো-পাইলটের ঠিক পেছনে নিজের জায়গায় যেন বসেছে শঙ্করদাস। টেবিলের ওপরে প্রয়োজনীয় সব কাগজ-পত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছে, ক্রমানুসারে রাখছে। উইণ্ড ফোরকাস্ট, ওয়েদার অ্যানালিসিস, হাউগোজ ইট কার্ভ, লগ আর লোরান চার্ট। পেন্সিল, ডিভাই-ডার কম্পিউটার্স সব একটি নির্ভুল রেখায় গুছিয়ে রাখছে শঙ্করদাস। অপারেটিং ইনস্ট্রুমেণ্টের মত।

—হাইড্রলিক প্রেশার?
—ওয়ান থাউজ্যাণ্ড পাউণ্ডস।
—কারবিউরেটর হিট?
—কোল্ড।
—জেনারেটর্স?
—অফ।

উড়তে যাবার আগের মুহূর্তের এই দীর্ঘ পাঁচালী শুনতে বেশ মজাই লাগে। মানুষের সাবধানতার অন্ত নেই। তবু সামান্যতম ছিদ্রপথের ছোঁ মেরে নেমে আসে সেই বাজপাখি, যা ঘটবার ঘটে যায়। সব ফোরকাস্ট, হাওয়াই ঠিকুজীকুণ্ঠী, ওয়েদার অ্যানালিসিস—সামটাইমস সোজ এগেইনস্ট ইটসেলফ। সব অঙ্ক, সব হিসেব, সব অভিজ্ঞতা কম্বিনেশন অব ড্যাম লাই হয়ে দাঁড়ায় —মিসক্যালকুলেশন, মিসক্যারেজ অ্যাণ্ড মিসফায়ার! মানুষের তখন কিছু করার থাকে না।

এয়ার হোস্টেস লতিকা চট্টোরাজের মুখটা মনে পড়ল। প্লেন ক্র্যাশিং-এর পর তাকে আর চেনা যায় নি। আগুনে-লাগা তুলোর বাণ্ডিলের মত নেভ্যানোর পরেও তার গা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। পরাশরের স্ত্রীর কথা মনে পড়ল, কোন ময়না তদন্তই আর সেই মৃত্যুর প্রকৃত ইতিহাস বলতে পারবে না।

শঙ্করদাস রূপবান, তার জীবন এত শান্ত ছিল না কোন দিনই। রেসের ঘোড়ার মত সে কেবলই ছুটেছে, এক জীবিকা থেকে আর এক জীবিকায়। আজকের অনেকেই এ খবর রাখে না। একদা স্টেজে নেমেছে, অ্যামেচার হিসেবে নাম করেছিল। সক্রীনেও একবার অ্যাপিয়ার করেছিল। পদ্মা, ভ্যানিশিং ট্যাবলেট। নাঃ, শঙ্করদাস আর অতীত ভাববে না, স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়েও আজ কেবলই দু হাত ভরে পাঁক উঠছে।

বৈজয়ন্তী বলত, 'তোমার চোখের দিকে তাকানো যায় না, চুম্বকের মত কেবলি টানতে থাকে তোমার চোখ।'

ও হেসে বলেছিল, 'আমার চোখে আর চুম্বকে তাহলে কোন ফারাক নেই বলছ?'

'বাঃ রে, তা কেন? নিশ্চয়ই তফাৎ আছে।'

'কি তফাৎ বলতে পারো?'

'চুম্বকের কোন ভাষা নেই, তোমার চোখের আছে অদ্ভুত ভাষা।'

তফাৎ অবশ্য আরও ছিল কিন্তু, বৈজয়ন্তী তুমি সেদিন জানতে না আমি জানতাম।

*

ঘুমের মধ্যেই বাঘের গর্জন শুনতে পেয়েছিল মনুজেশ; সম্ভবত স্বপ্নই দেখছিল কিন্তু তবু ঘুম ভেঙে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। কটা বেজেছে দেখার জন্যে বালিশের তলা থেকে হাত-ঘড়িটা টেনে নিয়ে টর্চ জ্বালতেই পাশের খাট থেকে অভয় চাপা গলায় শুধলো, ব্রাদার শুনলে?

মনুজেশ অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'কী?'

'বাঘের ডাক।'

'হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম স্বপ্নে।'

'না ভাই, ঠিকই শুনেছ। বেশ কিছুক্ষণ থেকে আমি জেগে শুয়ে আছি, হলফ করে বলতে পারি খাঁটি বাঘের ডাক। এখন বুঝতে পারছি, গন্ধটা তখন তুমি যথার্থই পেয়েছিলে।'

'কত দূরে মনে হল তোমার?'

সঙ্গে সঙ্গে বাংলো কাঁপিয়ে আর একবার গর্জন শোনা গেল। অতি কাছে, একেবারে বাড়ির মধ্যে বলে মনে হল। এক লাফে মনুজেশ আর অভয় খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। দুটো পাঁচ সেলের টর্চের আলোয় ঘর দিন অবতার হয়ে উঠলো। লোডেড রিভলভার হাতে নিয়ে অভয় খাট দুটোর নিচে উঁকি মারল। কিছু নেই কোথাও।

ইতিমধ্যে চাপা কোলাহল শুরু হয়ে গেছে। অন্য ঘরগুলো থেকে বাকি সবাই বন্দুক বাগিয়ে লণ্ঠন উস্কে নিয়ে ডাইনীং হলে বেরিয়ে এসেছে। মনুজেশ আর অভয়ও বেরিয়ে এল। ঠিক হল মেয়েরা ঘরে থাকবে, পুরুষরা দলবদ্ধভাবে বাইরে বেরুবে বাঘের সন্ধানে।

এমন সময় অরুন্ধতী মিত্র প্রথম কথাটা তুললো, 'শঙ্করবাবুকে দেখছি না, এত গোলমালেও ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙে নি নাকি!'

বাংলোর কোণের ঘরখানায় শঙ্কর-দাস একা শোয়। সতীন দত্ত ছুটে গেল তাকে ডাকতে। এদিকে কিভাবে বাঘের সন্ধানে বেরোনো হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল। এমন সময় সতীন

আসছে

চিত্রশিল্পী । মণীশ দাশগুপ্ত

সম্পাদনা । নানা বসু

ফিরে এসে বলল, ভারী আশ্চর্য, অনেক ডেকেও সাড়া পেলাম না।'

'কেন, দরজা বন্ধ নাকি?' অভয় জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম।' মনুজেশ কাঁপা গলায় বলল, 'ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে! দরজা খুলে শোয়াই ত ওঁর অভ্যেস। আর ভেরী এ্যালার্ট, খুবই সজাগ ঘুম। স্টেজ! চলুন তো দেখি কি ব্যাপার!

এই সময় কেয়ারটেকার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল। শংকরদাসের ঘরের পিছনের দরজা নাকি খোলা আছে। সেই পথে সে নাকি কাউকে বেরিয়ে যেতেও দেখেছে কিছু আগে। প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়েছিল, তখন দৃশ্যটা তার চোখে পড়ে। চাঁদ ডুবে যাওয়ায়, আলো ছিল না, স্পষ্ট কিছুই দেখতে পায় নি। তাছাড়া সাহেব-মেমদের ব্যাপার, তার মত মানুষ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় নি, গিয়ে আবার শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু দরজাটা এখনো খোলা দেখে সন্দেহ হয়েছে।

'কি ব্যাপার, একা একাই উনি বাঘের সন্ধানে বেরোলেন নাকি?' বিপুল স্বগতোক্তি করল।

সবাই সতর্ক হয়ে হ্যাজাক বাতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে বাংলো ঘুরে শংকরদাসের ঘরের পিছনে গিয়ে জড়ো হল। ঘরের অ্যাটাচড বাথরুমের মেথর যাওয়ার দরজাটা হাট খোলা। বাঘের কিছু বিশ্বাস নেই, ঘরের কোণে হয়ত ওঁৎ পেতে লুকিয়ে বসে আছে। খুব সাবধানে টর্চের আলো ফেলে বন্দুক বাগিয়ে সকলের আগে মনুজেশ ভেতরে ঢুকল। তার পেছন পেছন খানিকটা দূরত্ব রেখে বাকি সবাই।

নিজের খাটে বিছানার ওপরে চিৎপাত হয়ে শংকরদাস পড়ে আছে। বিছানা বালিশ বিধ্বস্ত। উস্কোখুস্কো চুল কপাল ঢেকে চোখের ওপর নেমে এসেছে, চোখ দুটো পুরো খোলা, দৃষ্টি কেমন উদভ্রান্ত।

হঠাৎ মনুজেশ একটা বিকট চিৎকার দিল। সবাই ছুটে কাছে গিয়ে দেখল শংকরদাসের কণ্ঠনালী ছিন্ন, ফিনকি দিয়ে তখনও রক্ত বেরোচ্ছে। মনুজেশ ঝুঁকে পড়ে কেবল বলতে লাগলো, কি করে আপনার এমন অবস্থা হল শংকরবাবু, কি করে এমন হল?'

চোখের ভুল হতে পারে নাও হতে পারে, মনুজেশের মনে হল শংকরদাসের ঠোঁট দুটো বার দুই তির-তির করে কাঁপলো তারপর স্থির হয়ে গেল মাথাটা একপাশে সামান্য হেলে পড়ল। অর্থাৎ শেষ।

এমন সময় অভয় স্বগতোক্তির মত চেঁচিয়ে উঠল 'একি! আরে এটা কি ব্যাপার?'

সবাই অভয়ের দিকে ফিরে তাকালো। অভয় তখন অনেক কষ্টে শংকরদাসের ডান হাতের বন্ধ মুঠো একটু ফাঁক করে চার-পাঁচটা লম্বা চুল বের করে এনেছে। ওগুলো যে মেয়েদের মাথার তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাট!

ডু ইউ হিয়ার মি কাট! কল্যাণাক্ষ তাজা গলায় ফের কথাটা বলেই পাথরের চাতালটার ওপর থেকে নিজের চুমুক না দেওয়া হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিল। সবাই এতক্ষণ পরে একটু নড়ে-চড়ে বসল। ঝিমধরা চাঁদের আলোয় এই মিনিয়েচার শালের জঙ্গলের মধ্যে এতক্ষণ সবাই যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল। ঠিক এই পরিবেশে এই জায়গায় তারা যেন অতীতের আর একটা রাতের অন্য এক অপার্থিব ঘটনার সামিল হয়ে গিয়েছিল। কারো হাতের গ্লাস আধখালি কারো শুধু তলানী পড়ে আছে। রুদ্রমোহনের একটা হাত ময়াল সাপের মত গায়ত্রীর কোমর জড়িয়ে যেন ঘুমোচ্ছিল। শ্রীলা আর ভাস্কর গাছের ছায়ার মধ্যে তলিয়ে বসেছিল তাদের অবয়ব সংস্থান কারো নজরে আসছিল না তবে তারাও পাথরের মূর্তির মত নীরেট হয়ে বসেছিল এতক্ষণ বাদে যেন খোয়ারী ভাঙ্গল। জ্যোতির্ময় তার পাঞ্জাবির কাপড়ে চশমা পরিষ্কার করতে করতে শব্দ করে গলা সাফ করলেন। অনেক দূর থেকে একটা ফেউয়ের ডাক শোনা গেল এই সময়। ক্ষণিকা ভীত গলায় প্রশ্ন করল প্রশ্নটা কাকে ঠিক বোঝা গেল না 'বাঘ বেরিয়েছে নাকি?'

'কেন বাঘের গন্ধটন্ধ?' রুদ্রমোহন খুক খুক করে হাসল 'কল্যাণ গপ্পোটা যা জমিয়েছিল ওয়ান্ডারফুল!'

'অরণ্যের ব্যাক গ্রাউন্ড এইটেই মোদ্দা গল্প আমাদের জ্যোতিদাদার লেখা।' কল্যাণ গোটা দুই বড় চুমুকে গলা-বুক ভিজিয়ে নিয়ে বলল—কিন্তু আমি ভেবেছি এই গল্পের কভারে আমি আর একটা গল্প চোলাই করে দেব। গল্পের ওই ট্র্যাজিক এন্ডে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দৈববাণীর মত কাট, এই শব্দটা লাউড স্পীকারে ভেসে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই টেনশন ভেঙ্গে ঘুরে দাঁড়াবে আলো জ্বলে উঠবে ওরা গল্পের বাইরের মানুষের মত স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে, হাসবে নিজেদের মধ্যে খোশগল্প, কথাবার্তা শুরু করবে। তখন দর্শকদের চোখে পড়বে ক্যামেরা, চোখে পড়বে নানা যন্ত্রপাতি তার কেবল চোখে পড়বে মাইক্রোফোন সাউন্ড ট্রাক। ক্যামেরার চোখ টেনে নিয়ে যাবে মেঝের ওপর কিভাবে খড়ির দাগ কেটে আগে থেকে মাপজোক করা আছে অর্থাৎ ছবি তোলার ছবি, স্টুডিওর নেপথ্যালোক কলাকুশলীর কারসাজি, যা সিনেমায় গোপন থাকে তাই তখন দর্শকাদের সামনে আসবে। দর্শকরা দেখতে পাবে এই সামান্য কজন অভিনেতা অভিনেত্রীর পিছনে আরও কতজন মানুষ বিভিন্ন পোজিশনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছিল। দর্শকরা দেখতে পাবে এই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাদের চোখে ধুলো দেওয়া পোষাক এবার খুলে ফেলছে মেক-আপ মুছছে। যেন চোখে ধুলো দেওয়া গল্পের কেপগাম পরচুলা আর পেন্ট ঘষে ঘষে তুলছে, নকল গল্প থেকে, সাজানো সংলাপ থেকে, বাঁধা বরাদ্দ হাসি-কান্না ভয় বিস্ময় থেকে বেরিয়ে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত খাঁটি গল্পে ফিরে দাঁড়াচ্ছে। তারা জানতে পারবে শংকরদাস ওরফে জ্যোতির্ময় বিপুল মিত্র ওরফে ভাস্কর কিংবা সুহৃতা ভরদ্বাজ ওরফে মঞ্জুশ্রী মুখার্জির গোপন লকারে কিছু সঞ্চিত স্মৃতি আছে আছে ব্যবহারে ব্যবহারে ক্ষয়ে আসা অন্তরঙ্গ গল্প। কল্যাণ লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরানোর জন্যে থামলো।

মঞ্জুশ্রী জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল—'তার মানে আমাকে শেষ পর্যন্ত সিনেমায় নামাতে চান? কক্ষনো না আমি সিনেমায় নামবো না।'

কল্যাণ তার কাঠবেড়ালীর ল্যাজের মত ঝোলা গোঁপে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—আচ্ছা তুমি সিনেমায় নামবে একথা কে বলেছে। সবাই কি সিনেমায় কেবল নামেই কখনো ওঠে না? তুমি উঠবে।

জ্যোতির্ময় কথাটার কৌতুক বোধ করে মঞ্জুশ্রীর দিকে তাকাল। মঞ্জু তখনও অবুঝ মেয়ের মত মাথা নেড়ে চলেছে। ওর মনে পড়ছিল গীতশ্রীর কথা। গীতশ্রী ওর মেজবোন ফিল্মে নামার স্বপ্ন দেখতো। ফেসক্যাটিংটা ভালই ছিল, ফটায় এক-একজনের মুখ অসাধারণ ভাল ভাস সেই রকম। তার ওপর কোন এক-জন বিখ্যাত চিত্র তারকার মুখের আদল হাসবার ভঙ্গির মিল থাকায় ছোটবেলা থেকেই তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল সে ফিল্মের হিরোইন হবে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই এক লোফার তাকে নিয়ে চম্পট দিয়েছিল তবে বম্বে অবধি যায়নি দীঘার কাছে কোথায়। এক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল। ফিল্মে তাই মঞ্জুর একটা অ্যালার্জি আছে। মঞ্জু আবার বলল—'না।'

কল্যাণ কৌতুকের গলায় বলল—'সিনেমায় তুমি নামবে একথা কে তোমার মাথায় ঢোকাল?'

কয়েক চুমুকে ড্রাই জিন পেটে গিয়েই শিবানীর নেশা চেপে এসেছিল, মঞ্জুশ্রীর হয়ে সেই জবাব দিল 'কেন চাঁদ এই মাত্র তুমিই তো বললে।

কল্যাণ শিবানীর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল 'আমি সিনেমায় নামবে একথা কখনো বলিনি।

আজকের আধুনিকা জানেন...

জীবন মানে–লড়াই। জীবন মানে–বেগ। জীবন মানে–আবেগ। অজস্র সহস্র পথে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। কখনও বেগে উধাও। কখনও আবেগে থরো থরো। সে কারণেই তাঁর ত্বকের পক্ষে আরও জরুরী সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন। বোরোলীন ছয় ঋতু বারো মাস সারা দেহ— ত্বকের অতন্দ্র প্রহরী, আজকের আধুনিকার নিত্য সহচরী। শীতে রুক্ষ ওষ্ক খসখসে ত্বক বোরোলীন-এর স্নেহস্পর্শে আবার সুস্থ স্বাভাবিক এবং সতেজ। মোলায়েম বোরোলীন নেমে যায় রোমকূপের গভীরে। নতুন করে গড়ে তোলে ত্বকের কোষ। কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, কিংবা হাজা-মজা ক্ষতে বোরোলীন নিরাময়ী, জীবাণু নাশক, সংক্রমণ প্রতিরোধক। নিয়মিত বোরোলীন ব্যবহারে ত্বক নিরাপদ।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড • বোরোলীন হাউস, ১ গিরীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০০৩

খুব কথা বোঝাতে শিখেছ রাজা। ভেবেছ মাতাল হয়ে গেছি বলে আমার জ্ঞানের ঠিক নেই?'

মঞ্জুশ্রী খুব অবাক হয়ে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে ছিল বলল—'বাঃ।'

কল্যাণ উত্তর দিল 'সিনেমায় সবাই নামে না কেউ কেউ ওঠেও। তুমি উঠবে।'

রুদ্রমোহন তার হাতের বেষ্টন আরও মন করে নিয়ে জঙ্গল কাঁপানো হাসি হাসল 'হাঃ হাঃ হাঃ।

পাঁচ

আকাশের বিরাট ক্যানভাসের ওপর যেন নানা রঙের আগুনের তুলি কেউ চাবুকের মত অন্ধ ও এলোপাথাড়ি ব্যবহার করে গেছে। সংগম আবদ্ধ দেহ-রেখার মত দিগন্তে দুটি শায়িত পাহাড় ইতস্তত বৃক্ষমুণ্ড মাতাল মাস্তুল ছুঁয়ে পালের মত পত পত শব্দে উড়ছে ছেঁড়া-খোঁড়া ডালপাতার চন্দ্রাতপ। সমস্ত শরীর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চাইছে অনুরাধার। এমন আত্ম-ছলনের মত অপরাহ্ণ সে আর কখনো দেখেনি। তার স্মৃতির মধ্যে শুধু কিশোরী বয়সের এক চিলেকোঠা অবৈধ সুখে আর উত্তেজনায় কাঁপছে। অন্ধকার পোরানো সিঁড়ির তল থেকে হিক্কার মত ঠেলে উঠে আসবে চীৎকার। স্খলিত শাড়ি আর ছিল খোলা অন্তর্বাসের মধ্যে তার আচ্ছন্ন চেতনা কাছে কোথাও মানুষের কণ্ঠস্বর আর শুকনো পাতার শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু তার অসাড় শরীর নিরুপায় তার আচ্ছন্নচেতনা শুধু অনুভব করল বুকে হাঁটা ডোরা কাটার মত শক্ত চোয়াল আর সজাগ মাংসপেশী তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আড়াল থেকে আরও আড়ালে ঝোপের মধ্যে।

আর একজনের বুকের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধারালো ব্লেডের মত যন্ত্রণায় চিরে যাচ্ছে তখন: মাত্র উনিশ বছর বয়সে যার দেহ বিক্রী হয়ে গিয়েছিল কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে। লৌহ ব্যবসায়ী সূর্যনাথ তাঁর ক্যেপকুলেশনে ভুল করেনি তাঁর টেপ এবং ষড়াশি নির্ভুল ছিল, তিনি লোহা বেচেন লোহা কেনেন লোহাকে সোনা বানাবার কৌশল যাঁর করায়ত্ত উনিশ বছরের ম্যাডোলেসেন্ট মন নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। বালক এবং স্ত্রীলোক দুই-ই তাঁর কাছে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কোনো খোকামি তাঁর ধাতে সয় না। ছেলেকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন হাতে-কলমে সে কাজটি তিনি পাকাই করেছেন। কার-খানায় ঢালাই পেটাই করেছেন, ফরেনে পাঠিয়েছেন ফিরিয়ে এনে তৈরি গদীতে বসিয়েছেন তবু যদি সে ছেলে সংসারকে যাবজ্জীবন সাজা মনে করে চারটি সন্তানের জনক হয়েও নিজেকে উদ্বাস্তু লেজকুড়-বাকড়হীন মনে করে তবে তাঁর কিছু দায় নেই। বিরাট সংসার এবং ছড়ানো বাণিজ্যকে তিনি দেওয়াল ঘড়ির মত চোখের সামনে দম দিয়ে চালাচ্ছেন সকলেই পেন্ডুলামের মত নির্ভুল মাত্রায় বাঁধা ছাড় নেই।

আজ ষোল বছর পরে শরবিন্দু এই প্রথম রক্তের মধ্যে তার কিশোর বয়সকে অনুভব করল সেই চিলেকোঠা ফ্রক ছেড়ে শখ করে শাড়ি পরা সেই প্রথম প্রেম নিঃশ্বাসে চঞ্চল দীপ শিখার মত সেইরূপ তার মগজের কোষে কোষে জ্বলে উঠল! তাড়া করা অন্ধকারে কত নারী শরীর সে ছিঁড়ে ছেনে দেখেছে সব এক, সব বোবা কেউ তাকে কোনো উত্তেজনা ফিরিয়ে দিতে পারেনি। ফ্রিজের মাংসের মত সেই শীতলতা কেবলই এক স্থবির স্থূলে ন্যাক্কারজনক ব্যাঙের মত স্ত্রীলোকের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে প্রতিদিনের বিছানায় যার সঙ্গে তার ফিরে ফিরে দেখা হয়। যাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার শক্তি তার নেই কোন দিন হবে না।

*

ওরা চাপা গলায় কলরব করতে করতে এগিয়ে আসছিল চারটে চঞ্চল ছটফটে কিশোরী শালিখের মত। ধারালো চোখে ঠোঁটে যেন চারপাশ খতিয়ে দেখছিল।

—'মনে হচ্ছে ভুল দেখেছিস।' গায়ত্রী মন্তব্য করে।

—'বাঃ এই দিনের আলোয়? বাথ-রুমের জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম এই গাছের কাছ পর্যন্ত পা টিপেটিপে এল'—কণিকা।

—'একা?'

—একাই এসেছিল তবে নির্ঘাত দোকার সন্ধানে।

—অভিসারে বল। খিলখিল করে হেসে উঠল শ্রীলা 'তিনিও নিশ্চয়ই ধারে কাছে পৃথ্বিরাজের মত ওয়েট করছিলেন?'

—কে তিনি, প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কে? একবার যদি হাতে-নাতে ধরতে পারি না! শিবানী বলে।

—কিন্তু দুই জলজ্যান্ত মরেল ভ্যানিশ হয়ে গেল এটা যেন মাইরী কি রকম লাগছে!'

—হিরোটি কে? ভাস্কো ডা গামা? শিবানী শ্রীলার দিকে এক চোখ বুজে কটাক্ষ করে। ভাস্করকে ও এই নাম দিয়েছে। শ্রীলা চটে গেল বলল—'বাজে বোকো না! কল্যাণ সেন কেন নয়। শো কজ!'

'কেন, লেডী কিলার রুদ্রমোহন কি দোষ করল যে তার নাম মনে আসছে না?' কণিকা একঢিলে দুই পাখি নিশানা করল। আসলে দুপুরে গড়ানো বিকেলে মেয়েরা যখন বাংলোর মধ্যে ডালপালা পিলোর গদিতে গড়াগড়ি দিয়ে আলস্য ভাঙ্গছিল আর গল্পতালী করছিল, ছেলেরা বাইরে গাছতলায় পয়সা রেখে তাস পিটাচ্ছিল সেই সময় হঠাৎ গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ হতেই গায়ত্রীরা ছুটে বাইরে বেরিয়ে দেখে গাছতলা ফাঁকা। তাসের প্যাকেট জোড়া আর খালি বোতল সাক্ষী রেখে সবাই বেমালুম উধাও হয়েছে। আচমকা কাউকে কিছু না বলে ওরা দল বেঁধে কোথায় গেল এই প্রশ্ন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে এমন সময় কণিকা বাথ-রুম থেকে বার্তাবিহের মত ছুটে এল। নিশ্চিত হবার জন্যে ওরা পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখতে পেল মঞ্জুশ্রী ঘুমিয়ে আছে কিন্তু পাশের খাট থেকে অনু-রাধার বড়ি পাচার। তাই এখন ওরা কেউ সত্যিই নিশ্চিন্ত নয় গাড়িতে সবাই চলে গেছে না দু-একজন ইতিউতি গা ঢাকা দিয়ে রয়ে গেছে! পুরুষ জাতটাকে বিশ্বাস নেই।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে খাদের প্রায় কিনারে এসে পড়েছিল। শিবানী তার জামার পকেট থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট বের করে বলল, নাও কে কে হাতানো জিনিষ টানতে চাও হাত বাড়াও।' ওরা তিনজনই হাত বাড়াল, গায়ত্রীর তো রীতিমত স্মোক করা হ্যাবিট, অফিসের ড্রয়ারে ও প্যাকেট রাখে। কণিকা রাত জেগে পদ্য লেখার সময় শব্দ টব্দ জুট পাকিয়ে গেলে মাঝে মধ্যে সিগারেট টেনে থাকে, শ্রীলা কখনো খায়নি আর শিবানী কন্টিনেন্টাল টুরে গিয়ে ওটা এবং আরও অনেক কিছু রপ্ত করে এসেছে। শিবানী রায়ের জীবনটা গড়ানে নুড়ির মত, যদিও তাতে প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী একদম শ্যাওলা ধরেনি তা নয়। বি-এ পাশ করার পরই এক ভারত বিখ্যাত যাদুকরের দলে ঢুকে বিদেশ সফরে চলে যায় শিবানী তারপর ফিরে এসে এয়ার হোস্টেসের চাকরি পায় কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একটা দুর্ঘটনায় ফেঁসে যায়। সে সব তাল সামলে কিছুদিন ইস্কুলে দিদিমনি সাজার পর ব্যাঙ্কে ঢোকে, সেখানেই মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে আলাপ। শিবানীর অফিস পাড়ায় নাম-ডাক আছে, শখের থিয়েটারে অভিনয় করে কিছু উপরি রোজগারও করে।

সকলকে বিলি করে সবে ঠোঁটে সিগারেট চেপে দেশলাই বের করেছে এমন সময় নাকে গন্ধটা এল। ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল একটা শাল-গাছের গোড়ায় মাঝারি সাইজের একটা পাথর খন্ডের ওপর থেকে সরু নীলচে ধোঁয়া উঠছে, পাশে একটা পাইট বোতল ছিপি খোলা অকস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ব্যোম শঙ্কর। বেলবটস্ পরা শিবানী লাফিয়ে উঠেই সেদিকে দৌড়লো, অকুস্থলে এমনি করেই ক্লু পড়ে থাকে।

পাথরের চাইটার ওপর নামিয়ে রেখে যাওয়া সিগারেট অল্প অল্প হাওয়া লেগে তখনও জ্বলছিল, জ্বলছিল না বলে ধোঁয়াচ্ছিল বলাই ভাল। প্রায় ইঞ্চি দেড়েক ছাই জমেছিল সেই আধলা সিগারেট টুকরোটার মুখে। পাশে দেশলাই আর চারমিনারের প্যাকেট। শিবানী চারপাশে শিকারী বেড়ালের মত ঘাড় মটকে তাকালো, কিন্তু ধারে কাছে মানুষের চিহ্নও নেই, লুকিয়ে থাকার তেমন জায়গাও নেই। ঝোপ জঙ্গল বরং তারা পেছনে ফেলে এসেছে। একমাত্র খাদের দিকে, যদি কোন পথ থাকে নিচে ঝর্ণার বেডে নামবার তবে।

গায়ত্রী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, শার্লক হোমস থাকলে সিগারেটের ভুক্তাবশেষ দেখে বোধহয় এই মন্তব্যই করতেন, ফরমন ব্র্যান্ড, পাঁচ পুরুষের কাউকেই আইডেন্টিফাই করতে পারছো না। সে এখানে বসেছিল সে জানতো না তার নায়িকা এখানে আসবে বা এক্ষুণি এসে পড়বে। চমকে গিয়ে সে ধূমপান দুইই ফেলে দিয়ে উঠে যায় কিন্তু আর ফিরে আসে নি অর্থাৎ তাদের বোঝা-পড়া কোন মীমাংসায় পৌঁছায় নি। তবে এইটুকু বলা যায়, যে এখানে ছিল সে মিনিট তিনেকের আগে উঠে গেছে।

লেডী শার্লক হোমস! শিবানী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার অনুমান খুবই লাগসই তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু একটি পয়েন্টে অধমার অন্যরকম সাজেশান আছে। ধরুন যে অপেক্ষা করছিল বা নিছক নিরিবিলিতে কাল কর্তন করছিল সে আদৌ দুনম্বর মাল নয়, আই মীন হিরো নয়, নিতান্তই থার্ড পার্সন, সিগারেটার নাম্বার, রাইট্যাল কেস। আচমকা দূর থেকে যুগলকে দেখতে পেয়ে ফলো করেছে।

'তা হলে?'

'ফলো অন।'

শিবানী সকলকে নিয়ে খাদের কিনারে এগিয়ে গেল। তিরিশ চল্লিশ ফুট নিচে খাদটা বালি আর পাথরের চওড়া বিছানা পেতেছে। ঝোপ জঙ্গল নেই, শুধু পাথর আর পাথর, অজস্র পাথর। তার মধ্য দিয়ে এই শীত শেষের পাহাড়ী ঝর্ণা খোলস ছাড়া সাপের মত নিস্তেজ, কোন রকমে বুকে হেঁটে বয়ে চলেছে বর্ষার ফুঁসিয়ে ওঠা ফণা নেই নেই মারাত্মক দাঁত বসানো ছোবল। কিন্তু নামবার রাস্তার খোঁজে উঁচু পাড় ধরে আরও খানিকটা হাঁটতে হল ওদের। মাটি আর পাথর কেটে, গাছ উপড়ে বৃষ্টির জল নেমে যাওয়ার নুড়ি পথ মিললো একটু তফাতে। সেই সঙ্গে সকলেরই চোখে পড়ল ঝর্ণার জলে পা রেখে জ্যোতির্ময়বাবু বসে রয়েছেন একটা উঁচু পাথরের ওপর।

ওদের বুকের ভেতর আচমকা হাওয়া-হকের কষার মত জোরে একটা ঝাঁকি লাগল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের, তাতে ওদের আজ বিকালের দুর্ধর্ষ মুক্ত বিন্দু-মাত্র যখম হল না। থমকানি কেটে যেতেই শিবানী গলাটা খাদে নামিয়ে এনে গেয়ে উঠল 'কা করু রাম মুঝে বুড়ো মিল গিয়া।'

শ্রীলা হাতে তুড়ি বাজাতে বাজাতে গানের লাইনটাকে ইলাস্টিক রবারের মত রিপিট দিয়ে লম্বা করল। কণিকা নিঃশব্দে কোমরে মারাত্মক মোচড় দিয়ে দুপাক নেচে নিয়ে বলল চলো ললনাগণ ওই ব্রহ্মচারী বড়দাকে একটু আঁচিয়ে আসি।'

গায়ত্রী ধমকের সুরে বলল 'ওখানে খাপ খুলতে যেও না কবি, প্রাণে মারা যাবে। ওসব তাতানো-আঁচানো ওখানে চলবে না, উনি কঠোর আদর্শী কাছে গেলেই সেটা মালুম পাবে!'

কণিকা বলল, হুঁ! আগেই কাছে যাওয়া হয়েছিল নাকি স্যার আপনার?'

'ন্যাকামো রাখো! কারো কাছে যেতে আমার বয়েই গেছে, অন্যেরাই আমার কাছে আসে বুঝলে ম্যাডাম!'

'এই মরেছে!' শ্রীলা হঠাৎ যেন কাতরোক্তি করে উঠল 'আমাদের এখনো যে সিগারেটগুলো ধরানোই হয়নি।'

* * *

অনুরাধা চোখ বন্ধ করে ঘুমের অছিলায় পড়েছিল। পাশের খাটে মঞ্জুশ্রীদি একই রকমভাবে শুয়ে আছে, হয়তো সেও ঘুমোয় নি, জেগে জেগে চোখের পর্দায় ফিলিম দেখছে। মফস্বলে চ্যারিটি শোর জন্যে মরে ভূত হয়ে যাওয়া ছবির অফ্ প্রিন্ট! মঞ্জুদির কাস্টডিতে অনেক সুপার-হিট ছবি আছে।

সুতরাং ছবি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়া ইস্তক অনুরাধাকে অপেক্ষা করতেই হবে, সিকিটাক চোখ খুলে থেকে থেকে হাত ঘড়ির ফাতনার দিকে চোরা নজরে রাখতেই হলে নইলে মঞ্জুদিও যদি উঠে বসে এবং সঙ্গ নেয় তখন অনুরাধা তাকে কি বলে নিরস্ত করবে? মঞ্জুদির জন্যেই তার এখানে আসা সম্ভব হয়েছে এবং সত্যি বলতে কি মঞ্জুদিও তার জন্যেই এখানে এসেছে। তার বাবা মঞ্জুদির ওপরে খুব বিশ্বাস রাখেন. মঞ্জুদির কথায় চোখ বুঁজে অনুরাধাকে ছেড়ে দিয়েছিল। মঞ্জুদি তার দিদি নয়, ঠিক বন্ধুও নয় অথচ প্রকারান্তরে বোধহয় দুটোই। কবছর আগে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী তাদের বাড়িতে সে এসেছিল। এসে অবাকই হয়েছিল ছাত্রীর বয়স তার সমান সমান দেখে। আসলে অনুরাধা দীর্ঘকাল দিল্লীতে তার কাকার কাছে ছিল ওখানেই পড়াশোনা করেছে এবং বাংলা বেটুকু জানতো, ভুলেছে। তারপর দিদির বিয়ে হয়ে যাবার কয়েক মাসের মধ্যেই মা মারা গেল। বাবাও মফস্বল বাংলার ভেসে বেড়ান জীবন ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। তিনি তখন একা মানুষ সরকারী চাকুরিতে বড় প্রমোশন হলেও সংসারে তাঁর অবস্থা তখন নিচু ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া ছাত্রের মতন। অনুরাধা এসে বাবার পাশে দাঁড়াল, সে তখন আর সেই সদ্য কিশোরীটি নেই যে দুরুদুরু বুকে চোখের জল মুছতে মুছতে দিল্লীতে গিয়েছিল। সে এখন সমর্থ যুবতী, তার বুকের ভাঙ্গা বাসার মেরামতী হয়ে গেছে দরজা জানলায় মজবুত ছিটকিনি বসেছে। ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শিখতে চাইল, বাংলা শুধু শেখা নয় বাংলা জানা। মঞ্জুশ্রী এল, মঞ্জুশ্রী আর ফিরে গেল না, বন্ধু হয়ে থেকে গেল অনুরাধার কাছে। সেই থেকে অনুরাধার সম্বোধন মঞ্জুদি হলেও মঞ্জু তার নিত্য-সঙ্গীর মত নিকটবর্তী।

এমন সময় রেলগাড়ির গার্ডের দূরাগত বাঁশির মত ফুরর—ফুরর শব্দ শুনেই অনুরাধা তড়াক করে বিছানার ওপরে উঠে বসল, মঞ্জুদি ঘুমে কাবার। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিভে একটা কামড় খেল। পাশের ঘরে তখন শিবানী সম্প্রদায়ের গুল গল্প আর গুলতানী চলেছে।

* * *

তন্দ্রার মধ্যেই মঞ্জু একগাদা পায়ের শব্দ আর ফিসফাস গলা শুনতে পেয়েছিল কিন্তু তার চেতনায় ভেসে উঠতে সামান্য সময় লাগলো। জেগে উঠেই প্রথমে সে অনুরাধার শূন্য খাটখানা দেখতে পেল। হয়ত বাথরুমে গেছে মনে করে নির্বিকার পাশ ফিরে আবার নিদ্রা-কর্ষণের চেষ্টা করতে যাবে এমন সময় খটকা লাগল। চারপাশ কেমন নিঝুম হয়ে আছে যেন। পাশের ঘরের হাট ভেঙ্গে গেছে বুঝি। ক্যাম্পাসের মধ্যেই বাংলো থেকে একটু তফাতে ছেলেরা তাসে মজে বুঁদ হয়ে মাঝে মাঝে জুয়ার জিগীর ছাড়ছিল, সেই হৈহল্লাও যেন শোনা যাচ্ছে না। সবাই কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! সত্যি যা কাণ্ড করে এক একখানা! মঞ্জু উঠে অ্যাটাচড বাথে উঁকি মারতে গিয়ে দেখল সেটা হাটখোলা, অনুরাধা নেই। কোথায় গেল অনুরাধা। পাশের ঘরেও কেউ নেই; বাইরে উঁকি মেরে দেখল, গাছতলার আসরও সমান ফাঁকা। দু প্যাকেট তাস আর একটি বিশেষজ্ঞ জিনিসের খালি বোতল যেন ওদের ফেলে যাওয়া নির্জনতা পাহারা দিচ্ছে। বাপার কি সব গেল কোথায় তাকে একা ফেলে! কিচেন আর বাংলোর মধ্যিখানে গারাজ, সেখানে সাদা গাড়িটা নেই। মঞ্জু হিসেব

ঘরে দেখল ছ থেকে মেয়েকেটে সাতজন সাদা গাড়িটার সওয়ার হয় উধাও হয়ে থাকলেও বাকিরা নিশ্চয়ই ধারে কাছে কোথাও আছে। সে ঘুমোচ্ছিল বলে তাকে ডাকতে এসেও ফিরে গেছে। একটু আগে তন্দ্রার মধ্যে পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ তাহলে ঠিকই পেয়েছিল কোন স্বপ্ন ফপ্ন না! যাক যেখানে খুশী ওরা, মঞ্জুর চিন্তার কিছু নেই। অনুরাধাকে নিয়ে ছাড়া তার আর কোন ভাবনাই নেই। মেয়েটা অন্য সবাইকার মত পোড়-খাওয়া নয়, কোথায় যেন ছেলেমানুষ রয়ে গেছে কিছু হলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। খুব চাপা স্বভাব কিছু খুলে বলে না. তাই আরও মুস্কিল হয়েছে। মঞ্জু বুঝতে পেরেছে ওর এখানে একটা হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার চলছে কিন্তু সেটা যে ঠিক কার সঙ্গে ধরতে পারে নি। প্রথম দিন এখানে এসে হঠাৎ কেমন ভয় পেয়েছিল সর্বক্ষণ কেমন আতঙ্কে আতঙ্কে ছিল, অন্যমনস্ক কথা বললে চমকে ওঠে, নিজে কথা বলতে শুরু করে হঠাৎ ফ্যাকাশে মুখে থেমে যায়। অনেক পেড়াপীড়ি করে জানা গেল, ভয় তার নাকি জ্যোতির্ময়-বাবুকে, ভদ্রলোক তার ভীষণ চেনা কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না! অনু-রাধার বাবা অরিন্দম মিত্র বাইরে কঠোর এবং কঠিন, তপ্ত মেজাজের মানুষ— কি করে ঠাণ্ডা কলমে আইন মাপেন কি করে জটিলগতি করেন বলা শক্ত— তার মানসিক অবস্থা ঠিক লণ্ঠনের চিমনীর মত, ঠুনকো হয়ে আছে ভেতরে ভেতরে একটুখানি জল এসে লাগলেই ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পার। অনুরাধার ভয় সেইখানে।

তবে জ্যোতির্ময়কে দেখে ভয় পাওয়াটা হাস্যকর, এই ভীষন চেনাচেনা লাগার একটা কাকতালীয় কারণ ছিল, অনুরাধা হঠাৎই সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। জ্যোতির্ময়বাবু অনুরাধার জামাইবাবুর হুবহু নকল হতে পারতেন যদি তাঁর একটি স্টাইলিশ গোঁফ ভারী জুলফি আর বাবরি চুল থাকত আর যদি তাঁর উচ্চতা ইঞ্চি দুই কম হত আর চোখদুটো চশমামুক্ত হত। আর বলা বাহুল্য বয়সটা কম হত। অনুরাধার

এই জামাইবাবু আমেরিকায় সেটল্ করেছেন, তার দিদিও আমেরিকায় তবে দুজনে এখন আলাদা থাকে কয়েক বছর হল তাদের ছাড়াছাড়ি আইনসিদ্ধ হয়ে গেছে।

মঞ্জুশ্রী এইসব ফালতু চিন্তা ছেড়ে অনুরাধার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

* * *

জ্যোতির্ময় আজও সকলের অলক্ষ্যে এখানে চলে এসেছিল। এই নির্জন পাহাড়ী নদীটার বুকের ভেতর একটা একলা পাথর আছে বেশ বড়সড় আকারের ইচ্ছে করলে জন-দুই সেখানে স্বচ্ছন্দে চেপে বসতে পারে। পাথরটার চারপাশ দিয়ে ক্ষুরের মত পাতলা ধারালো জলের স্রোত ছোট বড় নুড়ীর গায়ে জলতরঙ্গ তুলে ছুটে যাচ্ছে। মেয়েদের কুলকুল হাসির মত, গায়ে পড়া উপরি উচ্ছ্বাসের মত। ছোটবড় নুড়ীগুলো তার মধ্যে ডুবে থাকছে, গড়াচ্ছে ক্ষয় হচ্ছে এবং অন্তিমে মাজা যাচ্ছে কিন্তু দলছুট এই বড় পাথরটা স্থির অনড় নির্বিকার, সেন মজা দেখছে। তার গায়ে না-স্রোত না-শ্যাওলা। তার আদলে রূপান্তর নেই। জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে নদীমাধ্যস্থ এই পাথরটার কি কোন মিল আছে? এটা কি তার জীবনের রহস্যময় প্রতীক কোনো? কে জানে! শুধু একটা ব্যাপার স্পষ্ট, চুম্বক পাথরের মত এটা তাকে সবসময় টানছে টেনে আনছে।

জ্যোতির্ময়ের পা টলছিল, মাথাটা গ্যাসভর্তি বেলুনের মত চোখ ঝাপসা। আজ ছবির কলস্ট্রাক্ট সই হল, আজ ওরা তাকে ছাড়েনি কোন অজুহাত শোনে নি।

আজ আপনি আমাদের গুরু, কল্যাণ নাটকীয়ভাবে হাতজোড় করে বলেছে 'আর মদ্যপান ব্যাপারটাই গুরু-মুখী বিদ্যা। আজ আমরা আপনার প্রসাদ চাই।'

শুচিবায়ুগ্রস্ত না হলেও মদ ব্যাপারটার প্রতি একটা বরাবরের অনীহা জ্যোতির্ময়ের, সে শক্ত করে মাথা নেড়ে বলেছে 'না। আমাকে অন্য অনুরোধ কর।'

শরদিন্দু একাধিক বোতল খুলে সিঙ্কনি তৈরিতে ব্যস্ত, প্রসাদ ব্যাপারটা স্পেশাল হওয়াই দরকার। সেই মেয়েটির দিকে চোখ চলে গিয়েছিল জ্যোতির্ময়ের সে কেমন এক অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিল। চোখের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক তবু কেমন মনে হল সে চোখে একটা নিঃশব্দ ইসারা খেলে গেল। সে কি নীরব ভর্ৎসনার, অথবা করুণ মিনতির নিষেধের?

প্রথম গ্লাসটি তার দিকে বাড়িয়ে ধরে শরদিন্দু বলল, 'আপনি যে আমাদের ঘেন্না করেন না তার প্রমাণ।'

একথার পরে কোন কথা নেই, অগত্যা প্রমাণই সই। এদের জন্যে মনে মনে মমতা অনুভব করেছে সে. এরা এযুগের মানসিক বাস্তুহারা অপ্রকৃতিস্থ কখনো কখনো, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা পথ খোয়ানো চরিত্র। নিজের নিজের গল্পের আগুনের আঁচে পুড়ছে। কখনো জুয়ার জমে পাথর, শারীরিক কারণে উন্মাদ কখনো পরস্পরকে গালিগালাজ হাতা-হাতি পর্যন্ত গড়িয়েছে। ভক্তেরা পরক্ষণে আবার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে, জুতো খোয়ানো একপাটি জুতোর মত ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে। এই রকম বেহেড মাতলামো করতে করতে একেবারে বেহাঁস আউট হয়ে গেলে সেই সব জ্যোতির্ময়কেই সামলাতে হয়েছে। তার মনে হয়েছে এরা নগ্ন নষ্ট নিশানাহীন নিরুপায়। কিন্তু কেউ পাপী নয়, ন্যায়-অন্যায় দিয়ে পরলোক মাপে এদের জরীপ করা চলে না। কল্যাণ সেন সেদিন বলেছিল, তার অরণ্যের কান্না দিয়ে সে আর একটা অরণ্যে রোদন কভার করতে চায়। সে অরণ্য সেলুলয়েডের অরণ্য, কতকগুলো আমেচার, একসট্রা দুঃখ গ্ল্যামার আর সাকসেসের পথ খুঁজতে মাথা খুঁড়ে মরছে। এই ফিলমের জঙ্গলেও নরখাদক আছে, ফেউ আছে, বুকে হাঁটা সরীসৃপ আছে কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ নেই। কিংবা ধরা যাক জনঅরণ্য, জীবনের অরণ্য—যেখানে মানুষের শেষ পরিণতি রোদন। কল্যাণ ঠিকই বলেছিল কিন্তু এসব ছবিতে কি করে ফোটাবে, এতবড় একটা ব্যাপার কি করে এই নির্দিষ্ট ছোট গল্পের মোড়কে ধরে দেবে, চিত্র-নাট্যে জমাবে জ্যোতির্ময়ের মাথায় ঢোকেনি। আর এ ব্যাপারে সে মাথা ঘামাতেও রাজী নয় শুধু এই কুশীলব-দের জীবনের যে সব আত্মঘাতী গল্পের টুকরোর মুখোমুখী তাকে হতে হয়েছে এই দুদিনে, শ্রোতা এবং সহচর বনতে হয়েছে তার একটা ভাববেগ আছে। ধাক্কা আছে, যা সামলানো শক্ত।

কয়েকবার পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে জ্যোতির্ময় আজ পাথরটার ওপর চড়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল। পায়ের তলা দিয়ে ধারালো জলের ক্ষৌরকর্ম চলেছে, সেই দিকে তাকিয়ে চমকে চমকে উঠেছে। এই পাথর আর জলের খেলা, চিরকালের খেলা, তার জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন মিল। শাঁকোর তলা দিয়ে যে জল গড়িয়ে যায় আর পাথরের গা ছুঁয়ে, দুই-এ অনেক তফাৎ। মনে পড়ল কাল বিকেলের দিকে সেই চারটে চন্নমনে মেয়ে এসেছিল এখানে! ওরা নিশ্চয় দূর থেকে জ্যোতির্ময়কে দেখতে পেয়েই নেমে এসেছিল। জ্যোতির্ময় প্রথমটায় চিনতে পারে নি, ওই পোষাক ওইরূপ চট করে চেনা যায় না, অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। জ্যোতির্ময় তাই ছিল। মেয়েদের রূপ এত তাড়াতাড়ি পাল্টায়, খোলস ছাড়ে অবাক কাণ্ড। কিন্তু সেই বিবাদ সুন্দরীকে ওদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না, একটা সামান্য ছোট্ট ঘটনার পর থেকে সে যেন জ্যোতির্ময়ের কাছ থেকে সরে সরে থাকছে, চোখের সামনে আসছে না। কিন্তু সেই গায়ে পড়া মেয়েগুলোর উদ্ভট আধুনিক পোষাক আর অবিশ্রান্ত খুকী সিরিয়াসের ব্যবহার যে-কোনো পুরুষের বুকে রক্ত উস্কে দিতে পারে। জ্যোতির্ময় করুণাভরা

এখন পাবেন

হাই পাওয়ার সার্ফ

ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে যা নজরে পড়ে !

নতুন হাই পাওয়ার সার্ফের আছে সত্যিকারের ধোওয়ার অনেক বেশী ক্ষমতা, অন্য যে-কোনো ধোওয়ার-পাউডারের চেয়েও বেশী। আর এজন্যেই এর বেশী ক্ষমতার কেনা থাকে বেশীক্ষণ, ধোয় বেশী ক্ষণীরে গিয়ে... আপনার পরিবারের সবার জামাকাপড় হয়ে ওঠে সবচেয়ে সাদা।

নতুন হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা...দেখায় সবচেয়ে সাদা !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন। কেবলমাত্র কার্টনে আর ছোট প্যাকেটে বিক্রী করা হয়। কখনও খুলে খুচরো বিক্রী করা হয় না লিমটাস-SU.191.140 BG

রমতার হাসল। তার মন তখন সব ডিঙিয়ে অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। কলেজের সহপাঠী হিতেন ইউনিভার্সিটিতে এসে তাকে ধরে ফেলল, মধ্যে কয়েক বছর ব্যাক আউট, পুরোপুরি যুদ্ধে খেয়ে নিয়েছে। হিতেন আর জ্যোতির্ময়ের মাঝখানে তখন একটি নিটোল কবিতার মত রমণী এসে দাঁড়িয়েছে, মেয়েটির নাম কৃষ্ণকলি, যদিও সে কৃষ্ণও নয় কালিও নয়—এক নিশ্বাসে ফোটা একটি শ্বেত গোলাপ। তারপর ঘনঘনিয়ে বৃষ্টির মত গল্প গল্প আর গল্প। কৃষ্ণকলির অনুরোধেই জ্যোতির্ময় তার অরণ্য জীবনের অভিজ্ঞতা লিখতে শুরু করে, সে লেখে আর ইউনিভার্সিটিতে এনে পড়ে শোনায়। শ্রোতা মাত্র দুজন, হিতেন আর কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলির দিকে তাকিয়ে হিতেন তন্ময় হয়ে গল্প শোনে, কৃষ্ণকলির বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানা নির্ভীক এবং অন্যমনস্ক। হিতেন তখন কোন এক ইংরেজী খবরের কাগজের অফিসে কাজ করত আর রাত-জাগা লাল চোখ নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে আসতো।

ওঃ সে সব কতকালের কথা, যেন অন্য জীবনের আর এক জন্মের গল্প! জ্যোতির্ময়ের মনে হল এবার ফেরা দরকার অন্ধকার হয়ে আসছে।

* * *

কল্যাণ তার বাইনোকুলার দিয়ে জ্যোতির্ময় গুহরায়কে দেখছিল। তার ছোটবেলায়, অনেক ছোটবেলায় এই মানুষটার ফটো দেখেছে, কথা শুনেছে, অনেক সম্ভাবনা ছিল মানুষটার মধ্যে কিন্তু কিছুই সম্ভব হল না। ভাষাটা অবশ্য তার দিদির, কিছুদিন আগে ব্রেকফাস্টের টেবিলে একটা ক্যাজুয়াল মন্তব্য। জামাইবাবু পোঁচটাকে চামচে বাগাতে বাগাতে থেমে গিয়ে চোখের ঝিলিক তুলে দিদির দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর পোচের ওপর নতুন করে নুনমরিচ ছড়াতে ছড়াতে মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'জানতাম।'

কল্যাণ সেদিন কি যেন দেখতে পেয়ে চমকে গিয়েছিল। আজকেও চমকে গেল। তার ভিউফাইণ্ডারের ফ্রেমের মধ্যে একটি অবিশ্বাস্য ফিগার ঢুকে পড়ল। জ্যোতির্ময় সামান্য টলছিল কিন্তু কল্যাণ বুঝতে পারছিল ভেতরে ভেতরে অবস্থা খারাপ, হুইলের সুতো মুখে করে যতই পিছু হটুক, যতই পালাক, লিকারের বড়শি তার রক্তের গভীরে বিঁধে গেছে। শরদিন্দু আর রুদ্রমোহন কাজটা ভাল করেনি। অন্যায় করেছে। কল্যাণ তার লেন্স অ্যাডজাস্ট করে তাকিয়ে আছে। ক্লোজ আপ-এ মুখোমুখি দুটো মুখ, ফ্রিজফ্রেমে দাঁড়িয়ে আছে, স্থির। শব্দহীন সংলাপ মুখের রেখায় এক-আধ আচড় ছবি রেখে যাচ্ছে। একটি মুখ ভাঙছে, কান্নার আগে যেমনভাবে টুকরো টুকরো হয়, জল-রংয়ের ছবি হবার আগে যেমনভাবে গলতে থাকে। কল্যাণ চমকে গেল। গল্প এমন অপ্রত্যাশিত মোড় নেবে ভাবতে পারে নি।

* * *

চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল না। কাল পূর্ণিমা গেছে, চাঁদ উঠতে আজ কিছু দেরী। দিনের ঘুম ভেঙ্গে ধনভূমি যেন অন্ধকারে জেগে উঠে হাই তুলছিল। ও তাড়াতাড়ি পা ফেলবার চেষ্টা করে কেবলই হোঁচট খাচ্ছিল, পড়তে পড়তে সামলে নিচ্ছিল। মাথার মধ্যে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক, সব কি রকম ঘোলাটে করে দিচ্ছে। যেন ঢেউএর পর ঢেউ ভেঙ্গে টলতে টলতে তুলোর বস্তার মত হাল্কা শরীরটা এগোচ্ছিল।

এখুনি এই মুহূর্তে ওর মঞ্জুর কাছে পৌঁছানো দরকার, কথাটা বলতেই হবে। কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওর বুকের মধ্যে কি রকম একটা ব্যথা থেকে থেকে ফ্যাশ দিচ্ছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে যেমন রেডিও সেটের বুকের মধ্যে তরঙ্গ ঝলসে যায়, শব্দের বারুদ বিস্ফোরণে ছড়িয়ে যায়, সেইরকম।

ওই নিঃসঙ্গ মেয়েটার মুখ একটা তীক্ষ্ণ বেদনায় কিরকম কুঁচকে গিয়েছিল, ও কিভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল, ছুটে পালাল, ভাবতে গিয়ে কেমন একটা দমবন্ধ কষ্ট বোধ হচ্ছিল। মঞ্জুর মনের অবস্থা যে পর্যায়ে পৌঁছেচে, কিছু একটা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। বাংলোয় এখন কেউ নেই। সেখানে একা মঞ্জু, ওর মনে হল, এক্ষুণি এই মুহূর্তে মঞ্জুর কাছে পৌঁছানো দরকার, কথাটা বলতেই হবে। এই তীব্র অভিমানী মেয়েটার, স্পর্শকাতর নিঃসঙ্গ মেয়েটার ভুল ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। সব পরিষ্কার হয়ে যাক স্বচ্ছ হয়ে যাক তার ঘোলাটে মগজে এই মুহূর্তে এই চিন্তাটাই পাক খাচ্ছে।

সামনের লালবনীতে ওরা সবাই জটলা করছিল। চাঁদের আলোর অপেক্ষা করছিল। ওদের কলরব, গানের টুকরো হাসি পাল্টা হাসিতে ভরে গিয়েছিল ধনভূমি। বাংলোর বারান্দায় উঠে একবার থেমে দাঁড়িয়ে সেই দিকে তাকালো। রক্তাভ জোনাকির মত সিগারেটের আগুন গুলো যেন নিভছিল জ্বলছিল। দূর থেকেই মঞ্জুকে বাংলোয় ঢুকতে দেখেছিল ও। এবার ডাইনিং হলে এসে দাঁড়াতেই কার যেন কান্নার ফোঁপানি কানে এল। মঞ্জুদের ঘরের দরজা মঞ্জু ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। তাছাড়া সরাসরি ওর দরজায় নক করে ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না। চৌকিদার আর তার বউ ওই ঘরের সামনেই খাবার টেবিল সাজাচ্ছিল। ওকে দেখেই চৌকিদার একটা সসম্ভ্রম সেলাম ঠুকলো, বউটা নাকের ডগাতক ঘোমটা টেনে দিল। ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ তখন আসছে। ও ধীরে ধীরে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে আগে দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে একটু দম নিল। এই দুটো ঘরের অ্যাটাচড বাথরুম কমন, দুটো ঘর থেকেই সাওয়া যায়। ভাবল বাথরুমে ঢুকে ওর বাথরুমের দরজায় নক করাই ভাল কেউ কিছু জানতে পারবে না।

দরজা খুলে বাথরুমে ঢুকে প্রথমে খেয়াল করেনি কয়েকপা এগোতেই একটি আর্ত চিৎকারে ওর নেশা যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোথায় মঞ্জু? দেখলো একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নগ্ন নারী মূর্তি ঘরের দাঁড়িয়ে লজ্জা নিবারণে দিশেহারা হয়ে বাথরুমের আলোটা নিভিয়ে দিল। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল ও বুঝতে পারার আগেই ওপাশের ঘর থেকে কেউ ছুটে এল, তার হাতে একটা খোলা ট্রানজিস্টারে নাটক হচ্ছে। কিন্তু তার থেকেও নাটকীয় একটা ঘুসি তার মুখের ওপর এসে পড়ে চশমাটাকে চুরমার করে দিল।

টাল সামলাতে না পেরে অন্ধকারের মধ্যেই একটা জলভরা বালতির ওপর পড়ে যেতে যেতে ওর মনে হল মঞ্জুর কাছে আর কোন দিনই পৌঁছাতে পারবে না।

শেষ।

রাজনারায়ণ—রবীন্দ্রনাথ : গুরু ও শিষ্য কেন?

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

শিক্ষকের নাম রাজনারায়ণ বসু, ছাত্র—মহর্ষি কনিষ্ঠ পুত্র বালক-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবরণ যেমন মধুর ও অন্তরঙ্গ, তেমনই চমকপ্রদ ও পরম আকর্ষণীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তরুণ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক এবং অভিভাবক, আর পরিণত রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ বন্ধু ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে রাজনারায়ণ বসুর কথা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।'

শারদীয় পুজোর ঠিক প্রাক্কালে, বর্তমান বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে, এই 'চির-বালক' মহামনীষীর আবির্ভাবের সার্ধ-শততমবর্ষ-পূর্তি। ১ আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে তাঁর নাম অশেষ সমাদরের সঙ্গে রক্ষা করা জাতীয় কর্তব্য, এতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাসনাও একই সঙ্গে চরিতার্থ হবে।

*

রাজনারায়ণ ও রবীন্দ্রনাথকে প্রথম একত্রে দেখা যায় ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, কবির বারো বৎসর বয়সে—তাঁর উপনয়ন অনুষ্ঠানে।

তিনটি বালক—মহর্ষির কনিষ্ঠ দুই পুত্র সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এবং দৌহিত্র সত্যপ্রসাদ—এঁদের একত্রে উপনয়ন অনুষ্ঠান হলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ পুরোহিতের কাজ করছেন, মহর্ষি নিজে আচার্যের আসনে উপবিষ্ট। অনুষ্ঠানে গণ্যমান্য বহু মানুষের সমাগম। ঠাকুর-বাড়ির দালানে বিশেষ অতিথিবর্গের মধ্যে দেখা গেল রাজনারায়ণ বসুকে। চেয়ারে উপবিষ্ট। প্রভাত-রবির প্রসন্ন মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তিনি কী চিন্তা করছিলেন? হয়তো ভাবছিলেন—প্রতিভার মধ্যাগগনে উদয় হতে এই নবীন ব্রহ্মচারীর কালবিলম্ব হবে না।

উপনয়ন যখন হয় তখন রবীন্দ্রনাথ বেঙ্গল একাডেমির ছাত্র। উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চললেন হিমালয় ভ্রমণে, কয়েক মাস পর মহর্ষির পার্শ্বচর কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে কবি ফিরে এলেন কলকাতায়।

হিমাচল বক্রোটা থেকে রাজনারায়ণকে দেবেন্দ্রনাথ এই সময় পত্রে লেখেন, 'রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্র-স্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি।'

হিমালয় থেকে ফিরে এসে স্কুলের ধরাবাঁধা পড়াশুনায় কবির আর মন বসলো না। বেঙ্গল একাডেমিতে বেশি দিন যেতে না যেতে ভরতি হলেন সেন্ট-জেবিয়ার্সে, সেটা তখন ১৮৭৪ সাল। সেখানেও কোনো ফল হলো না। দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করে শেষে কনিষ্ঠ ভ্রাতাটির আশা-ভরসা একেবারে ত্যাগ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেন্টজেবিয়ার্সে ছিলেন দুই বৎসর। এই সময়-পর্বে দেবেন্দ্রনাথ হিমাচল থেকে রাজনারায়ণকে যে-সকল চিঠিপত্র দেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, শুধু বাড়ির গুরুজনেরাই নয়, স্বয়ং রাজনারায়ণও রবীন্দ্রনাথের লেখা-পড়ার বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বাবধান করতেন এবং নিজে তাঁকে ইংরেজি বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে রাজনারায়ণ ছিলেন একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং কৃতী শিক্ষক।

রাজনারায়ণ রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবিদের একটি তালিকাও করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সেই বয়সেই ওই সব লেখকদের রচনা নিজে নিজে পাঠ করে বোঝবার চেষ্টা করতে হয়েছিল।

রাজনারায়ণের ধারণা ছিল—বালক বয়স থেকে নিজে নিজে উচ্চমানের গ্রন্থ পাঠের অভ্যেস ঘটলে ভাষা এবং সাহিত্য উভয়ই দ্রুত আয়ত্তে আসে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকতা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ একটি পত্রে রাজনারায়ণকে লেখেন, "রবীন্দ্রের তত্ত্বাবধারণ মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকো, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি।"

রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বেই রবীন্দ্রনাথ জীবনে প্রথম প্রকাশ্য সভায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। ১৮৭৫ সালে হিন্দুমেলার নবম অধিবেশন হলো কলকাতার পার্সী বাগানে। এবারের অধিবেশনে সভাপতি রাজনারায়ণ; রবীন্দ্রনাথ তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে বৃহৎ জনমণ্ডলীর সমক্ষে আবৃত্তি করলেন নিজের লেখা কবিতা হিন্দুমেলায় উপহার।

অতঃপর বিশ্বজ্জনসমাগম-সভা। কবির উক্তি, 'বৎসরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিকগণকে একত্র করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের বাড়িতে বিশ্বজ্জনসমাগম নামক এক সভা স্থাপিত হইয়াছিল।' এই সভায় ১২৮২ বঙ্গাব্দে (১৮৭৫)

---

১. রাজনারায়ণ বসুর জন্ম-তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৬ সাল।

রাজনারায়ণ বসু

আমাদের জীবন রচনার সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি চিরদিনের মত জড়িত হইয়া আছে।' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির খেদ নামক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। গুণেন্দ্রনাথের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি রাজনারায়ণ বসু।

রবীন্দ্রনাথের শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কাজেও রাজনারায়ণকে নানা সময়েই বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে দেখা গিয়েছে। কবি নিজেই বলেছেন, 'তিনি আমার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।' শুধু কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার প্রতিও রাজনারায়ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল বরাবর। বিলাত থেকে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের রচনা য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র ভারতীতে ধারাবাহিক মুদ্রিত হয় ১২৮৬—৮৭ বঙ্গাব্দে (১৮৭৯-৮০)। পত্রিকার সম্পাদকরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বিলাতপ্রবাসী কনিষ্ঠের মতের প্রতিবাদ করে পত্রধারার পাদটীকায় দীর্ঘ মন্তব্য সংযোজন করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রধারাকে 'কাঁচাবয়সের' রচনা বলে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের এই রচনাসমূহের প্রতি রাজনারায়ণের কিন্তু ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। 'রাজনারায়ণবাবু তাহা পরম আগ্রহে পড়িতেন, প্রত্যেকটি বাক্যে সমালোচনা করিয়া দেওঘর হইতে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ পত্র পাইবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতাম।' —রবীন্দ্রনাথ এ-কথা একদিন জানিয়েছিলেন।

ভারতী পত্রে রবীন্দ্রনাথের বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ১২৮৮-৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮১-৮২) ধারাবাহিক ছাপা হয়। ১২৮৯ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো তাঁর বসন্ত রায় শীর্ষক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ এবং বৌ-ঠাকুরাণীর হাট সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রে রাজনারায়ণ যে-অভিমত প্রকাশ করেন তা উদ্ধৃত করি :—

'বসন্ত রায় অতি উত্তম লেখা হইয়াছে। বসন্ত রায় বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি তাহা এই প্রস্তাবে সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পুরাতন কবির কবিতা অবিশুদ্ধ প্রেমের ভাব দ্বারা কলুষিত। বর্তমান সময়ের কবিতা এ-বিষয়ে অনেক ভালো বলিতে হইবে।.....বৌ-ঠাকুরাণীর হাটের প্রত্যেক পংক্তিতে কবিত্বভাব না থাকুক কিন্তু ঘটনায় বিলক্ষণ কবিত্ব আছে। তাহা মনের নানা ভাবকে গভীররূপে আন্দোলিত করে।" দেওঘর থেকে লিখিত এই পত্রের তারিখ ৭ ভাদ্র ৫৩ ব্রহ্মাব্দ (১৮৮২ সাল)।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই-একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাই। এ-বিষয়ে কবি অতিরিক্ত আর-কিছু বলেন নি। আমরা অনুমান করতে পারি রবীন্দ্রনাথের হাতে বালক পত্রিকার অন্তত প্রথম সংখ্যাটি ছিল। সেই সংখ্যাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মুখ-চেনা শীর্ষক একটি প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল প্রবন্ধকারেরই আঁকা মনস্বী রাজনারায়ণের একখানি অনুপম প্রতিকৃতি। ঠাকুরবাড়ির বালক

রাজনারায়ণ বসু

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অঙ্কিত এই দুর্লভ ছবিটি ঠাকুরবাড়ির বালক পত্রিকার একানব্বই বৎসর পূর্বে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। অতি দুষ্প্রাপ্য ও জীর্ণ উক্ত পত্রিকার ধূসর পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি এখানে প্রথম মুদ্রিত হলো। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে এই ছবিটির মাইক্রোফিল্ম করে দিয়েছেন বিশ্বভারতী রবীন্দ্র সদন।

রবীন্দ্রনাথ

'অদ্য প্রাতে [১৪ মার্চ ১৮৮৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহার দীর্ঘ কেশ ও দেবতার ন্যায় চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য জ্ঞান হইল। —নিজস্ব ডায়েরিতে রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্য

পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নাম মুদ্রিত থাকলেও, পত্রিকার সকল বিষয়ে দেখাশোনা ও পরিচালনার মুখ্য দায়িত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের উপরেই। মনে হয় বালক পত্রিকা বিষয়ে কিছু উপদেশ ও পরামর্শ সংগ্রহের জন্যই কবি দেওঘরে গিয়েছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের বাইরের ছবি এঁকেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন তাঁর অন্তস্তলের চিত্র। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের তুলিতে আঁকা রাজনারায়ণের ছবি—

'ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোট তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মত হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অসুস্থতা, না সংসারের দুঃখ কষ্ট, না মেধয়া না বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে

সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন।'

রাজনারায়ণের দৌহিত্রী (কন্যার দুহিতা) কুমুদিনী দেবীকে একটি পত্রে (১৯০৭) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তোমাদিগকে আমরা নিতান্তই আত্মীয় বলিয়া জানি। তোমার মাতামহের সঙ্গে আমাদের যে নিকট-সম্বন্ধ ছিল তাহা তোমরা ঠিক জানো না—কেন না শেষ বয়সে দেওঘরে যাপন করিয়া আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটিত না। কিন্তু আমাদের জীবনরচনার সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি চিরদিনের মত জড়িত হইয়া আছে।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণের একটি সাক্ষাৎকারের সংবাদ পাওয়া যায় রাজনারায়ণেরই একখানি দুষ্প্রাপ্য ডায়রির পাতা থেকে।

১ চৈত্র ১২৯৩. ১৪ মার্চ ১৮৮৭ : 'অদ্য প্রাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহার দীর্ঘ কেশ ও দেবতার ন্যায় চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য জ্ঞান হইল। তিনি আমার নিকট তাঁহার নিজের রচিত দুই-একটি গান গাইলেন। তাহাতে একেবারে মোহিত হইলাম।'

ছাটিকা-ঝঞ্ঝার দিনে বা অধিক উদ্দীপনা-উন্মাদনার মুহূর্তে 'চিরবালক' রাজনারায়ণের কণ্ঠেও সংগীতের জোয়ার বইতো—সে-সংগীত প্রায়শই হত রবীন্দ্রসংগীত, কণ্ঠে তাঁর সুরের বাঁধন থাকুক আর না-ই থাকুক। বৃদ্ধ-শিক্ষকের মুখে কখনো কবি শুনেছেন তাঁরই সদ্য-রচিত গান—শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা; আবার কখনো বা দেশের উন্নতিসাধনে একান্ত আত্মমগ্ন রাজনারায়ণের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনেছেন—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

সেই ১৯২০ সালের মতো আমরা এখনো খাঁটি নিম তেল দিয়ে অল্প অল্প ভাগে মার্গো সোপ তৈরী করছি

আমরা তাদের মতো বিরাট সাবান প্রস্তুতকারক নই—যারা মেশিনে একদিক দিয়ে কাঁচা মাল ঢেলে যায় আর অপরদিক দিয়ে তৈরি সাবান বের করে নিয়ে আসে। মার্গো সোপ সেভাবে করা যায় না।

মার্গো সোপ খাঁটি নিমবীজের তেলের সঙ্গে অন্য তেল মিশিয়ে তৈরী হয়। এতে কোন সিনথেটিক ডিটারজেন্ট নেই। ডিটারজেন্ট মেশানোর ফলে ফেনা অনেক বেশি হয় ঠিকই কিন্তু গায়ের চামড়া শুকনো ও রুক্ষ হয়ে যায়।

মার্গোর জন্য যে নিমতেলের দরকার তা যোগাড় করাও কঠিন। আর তার দামও বেশি। সঠিক মানের নিমবীজের তেল ছাড়া সস্তা নিমফলের তেল আমাদের কাজে আসে না। কারণ নিমতেলে ছত্রাক বা ফাঙ্গাসনাশক ও জীবাণুনাশক ক্ষমতা অনেক বেশি। নিমের এত গুণ যে নিমগাছকে এখনও 'গ্রামের ডাক্তার' বলা হয়।

নিমতেলের এই সব গুণ বজায় রেখে সাবান করাই আমাদের লক্ষ্য। নিমবীজের তেলকে প্রথমে আমাদের নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতিতে পরিশোধন করা হয়। তারপর সেই তেল মিশিয়ে প্রায় দশদিন ধ'রে জ্বাল দিয়ে ছোট ছোট ভাগে সাবান তৈরী করা হয়। কাজটি যেমন জটিল তেমন তার জন্য মেহনত ও সময়—দুইই লাগে বেশি। মার্গোর দামও তাই কিছু বেশি—ভালো জিনিষের দাম বেশিই হয়।

অন্য পদ্ধতিতেও আমরা সাবান করতে পারি। কিন্তু নিমতেল বাদ দিয়ে বা তার ভেষজগুণ নষ্ট করে মার্গো সোপ করার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। সাবানের উঁচুমান বজায় রাখবার জন্য তাই আমরা সেই সনাতনী পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। ফলে মার্গো সোপ আজও সকলের কাছে সমান চাহিদা রেখে চলেছে।—যেমন ছিল ১৯২০ সালে। মার্গো একমাত্র সাবান যার মধ্যে নিমতেলের স্বাভাবিক ভেষজগুণ পুরোপুরি রয়েছে।

ভেবে দেখুন, কেন আপনি মার্গো কিনছেন। প্রসাধনে ও স্বাস্থ্যরক্ষায় সমান উপকারী—চামড়া নরম ও মসৃণ রাখার জন্য এতো ভালো সাবান আর কি আছে?

IDL/MG/38

মার্গো সোপ
সব বয়সে সব ঋতুতে
আপনার সঙ্গী

ক্যালকাটা কেমিক্যালএর তৈরী

মিষ্টি জ্বালা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

রমেন আমার বন্ধু। এই জীবনে বন্ধু অনেক পেয়েছি, কিন্তু রমেনের মতন কাউকে নয়। যেন আমার জন্য প্রাণ দিতে সে প্রস্তুত। এতটা সহানুভূতি এতটা মমতা আমার প্রতি।

বেকার। ইদানিং আমার জামা-কাপড়ের যা জীর্ণ দশা হয়েছিল—রমেন সহ্য করতে পারেনি। সেদিন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের একটা দোকানে ঢুকে এক প্রস্ত নতুন স্যুট প্যান্ট কিনে দিয়ে তবে সে ঠান্ডা হয়। পুজোর আগে ঘুষ্টিটাস্টি ভেজার দরুন কদিন খুব আশিতে ভুগেছিলাম। রমেন আমাকে টেনে নিয়ে যায় তার পরিচিত এক ডাক্তারের চেম্বারে। আমার গলা বুক পরীক্ষা করে ডাক্তার এক হাত লম্বা প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়। ডাক্তারের ওষুধ থেকে বেরিয়ে রমেন আবার আমার টানতে টানতে একটা ওষুধের দোকানে নিয়ে গেছে। কুড়ি টাকার ওষুধ কিনে দেয়।

আপত্তি করিনি। আগে আগে করতাম। রমেন ক্ষুব্ধ হত, রেগে যেত, এমন কি আমার সঙ্গে কথাটথা বন্ধ করে দিত। বুঝতাম বন্ধু আঘাত পায়। আমার উপকার করে, আমার দৈন্যদশায় আমাকে সাহায্য করে সে তৃপ্তি পায়। এই তৃপ্তির স্রোতে বাধা পড়তে দেওয়া উচিত নয়। বুঝতে পারার পর আমি আর আপত্তি করতাম না। তার সবরকম সাহায্য ও উপকার মাথা পেতে নিতাম। এখনও নিচ্ছি। তা ছাড়া আপত্তি সঙ্কোচ লজ্জা—এসব আমাকে মানায়ও না। বছরের পর বছর বেকার থেকে দরিদ্র থেকে কারো কোনো রকম সাহায্য না নিয়ে মাথা উঁচু করে চলব—সেই মনের বল আমার কোথায়। এমন সময় আসে যখন, রাস্তায় বেরিয়ে এক কাপ চা খেতে বা একটা সিগারেট খেতে হলেও আমাকে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে হয়। অধিকাংশ সময় ট্রাম বাসের পয়সা সঙ্গে থাকে না। অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। এই অবস্থায় কথায় কথায় অন্যের দেখাটা আমি পাচ্ছি কোথায়। কে আর পকেটে পয়সা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে আদর করে চা খাওয়াবে, চা খাওয়াবার পর হাতে সিগারেট তুলে দেবে বা বরানগর থেকে ধর্মতলা আসব কি বালিগঞ্জ থেকে বরানগর ফিরব, বাসের পয়সা দিয়ে আমাকে সাহায্য করবে?

একমাত্র রমেন। একজনই আছে পৃথিবীতে যার কাছে চাওয়ার আগে আমি সাহায্য পাই, এবং আমিও চোখ বুজে যখন তখন এই একটি লোকের কাছে হাত পাততে পারি। এখানে আমার কোনোরকম লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা থাকে না।

বাঁধার হোটেলে দু'বেলা ভাত খাই। বছরে একটা প্যান্ট ও একটা জামা জোটে। দু' বছর অন্তর এক জোড়া চটি। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। কেবল এই সম্বল করে আজকের দিনে কোনো

ছেলে, ছাব্বিশ সাতাশ যার বয়েস হল চলতে পারে? আমার বয়সী রমেন এটা বোঝে বলে সারাক্ষণ আমার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে আছে। কারণ সে চাকরি করে।

এবং এ-ও সত্য, ঐ যে তৃপ্তির কথা বললাম, দরকার হলে আমার জামাটা প্যান্টটা সে কিনে দিচ্ছে, ডাক্তারের ভিজিট ওষুধের দাম চালিয়ে যাচ্ছে, চা সিগারেটের খরচ জোগাচ্ছে, ডাইং-ক্লিনিং-এর বিল মেটাচ্ছে কি ব্লেডের অভাবে দুদিন আমার শেভ করা হচ্ছে না দেখতে পেলে একসঙ্গে দু' তিনটে ব্লেড কিনে দিচ্ছে—এসবের পিছনে তার মানসিক তৃপ্তি যেমন আছে, একটা অহংকারও যে কাজ করছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, লক্ষ্য করেছি, আমার বা রমেনের পরিচিত কোনো মানুষ ধারেকাছে থাকলে আমার ওপর তার সহানুভূতি দয়াদাক্ষিণ্য বা করুণা—যা-ই আখ্যা দেওয়া যাক, মাত্রাটা যেন বেড়ে যায়। যেমন একদিন তার অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমাকে দেখেই সে রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কি রে, চা খাবি, বোস বোস, পাখার নিচে বোস, মুখটা শুকিয়ে গেছে এই নে সিগারেট, তারপর? বাসের পয়সা ছিল তো, না কি হেঁটেই শ্যামবাজার টু ডালহৌসী মেরে দিলি। রমেনের কথা শুনে তার অফিসের লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে আমাকে দেখছিল। আমি চা খাচ্ছিলাম, রমেনের দেওয়া দামী সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেটও ধরিয়েছিলাম মনে আছে। দেখে খুশি হয়ে রমেন তার অফিসের লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে তখনি আবার আমাকে বলছিল, তারপর? টাকাকড়ির দরকার আছে আজ?

হয়তো দরকার ছিল, ধার করার উদ্দেশ্য নিয়েই অফিসে তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কিন্তু যেমন চেঁচামেচি করছিল সে ও সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, হঠাৎ কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওদিকে চোখেমুখে উৎকট কৌতূহল নিয়ে রমেনের সহকর্মীরা আমাকে দেখছে তখন। এই অবস্থায় আমি চুপ করে আছি দেখে রমেন ভীষণ চটে যায়। দ্যাখ, আমি তোর ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড—চেঁচিয়ে অফিস-শুদ্ধ লোককে শুনিয়ে সে আবার বলল, আমার কাছে ধার চাইতে যদি লজ্জা করে তবে তোর মরে যাওয়াই উচিত। তোর চাকরি বাকরি নেই, এই অবস্থায় আমার কাছে এসেও এমন মুখ বুজে থাকা মানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া.....

ঠিক আছে। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল আমার। রমেনের বক্তৃতা বন্ধ করতে তাড়াতাড়ি টাকাটা টেবিল থেকে তুলে পকেটে পুরলাম। রমেন তখন ঠাণ্ডা হয়।

আর একদিন। মনে আছে চৈত্র মাস। শাস্ত্রে বলে মধুমাস। কলকাতার রাস্তায় অবশ্য মধুটা বোঝা যায় না। বুঝেছিলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে। রমেনের কথায় তার সঙ্গে সেখানে বেড়াতে যাই। আমি কি জানতাম রমেন আর একজনকেও নেমন্তন্ন করেছিল। তাঁর নাম মীনাক্ষী। আমার মতন রমেন ব্যাচেলার। আমি বেকার। কোনো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সাহস ও সামর্থ্য আমার ছিল না। তা বলে রমেন চুপ করে ছিল না। কেনই বা থাকবে। তার একাধিক গার্ল-ফ্রেন্ড জুটেছিল। এখনও জুটছে। কিন্তু এক সঙ্গে মীনাক্ষীকে ও আমাকে সেই চৈত্রের দুপুরে বোটানিকস-এর জঙ্গলে ডেকে নিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি। পরে কারণটা বুঝেছি। রমেন মুহুর্মুহু তার গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট ও সুদৃশ্য লাইটারটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। টিফিন ক্যারিয়ার ভরতি করা প্রচুর খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সে। মীনাক্ষীও অনেক সন্দেশ টন্দেশ নিয়ে যায়। মীনাক্ষী না, যেন এই জন্যই জিনিসটা আমার চোখে অদ্ভুত ঠেকছিল, রমেন নিজের হাতে কাগজের প্লেটে আমার খাবার বেড়ে দিচ্ছিল। এবং লক্ষ্য করছিলাম, ওদের দুজনের জন্য যত না রাখছিল তার চেয়ে ঢের বেশি সে আমাকে দিয়ে দিচ্ছিল। কেমন ফাঁপড়ে পড়লাম। হাত তুলে যত বলছি, আর নয়, অত খেতে পারব না, আমি রাক্ষস নই রমেন—রমেন আমার কথা কানে তুলছিল না। হেসে বলছিল, খা খা, মীনাক্ষী ভীম নাগের কড়াপাক এনেছে। কতকাল ভীম নাগের সন্দেশ খাস না বল তো? আমি দু বছরের মধ্যেও একটা সন্দেশ খেতে পারলাম না, অথচ আমি চাকরি করি—আজ মীনাক্ষীর দৌলতে—কি বলো মিনু?

চোখ আড় করে দেখছিলাম আমার দিকে একবার তাকিয়েই রমেনের বাগ্দত্তা তৎক্ষণাৎ মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। দৃশ্যটা দেখে মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। মুখের সন্দেশ তেতো ঠেকল। অর্থাৎ মেয়েটির চোখে এমন কিছু ছিল—আমার যেন মনে হল সেই মুহূর্তে সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু তার উপায় ছিল না। মুখ কালো করা ঘাড় গুঁজে

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
নতুন বই
চিত্র বিচিত্র
একাল-সেকালের বিচিত্র কথা
ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ
দাম ঃ সাত টাকা
বেঙ্গল পাবলিশার্স
প্রাঃ লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজে ষ্ট্রীট কলিকাতা -- ১২

পাতের সন্দেশ খুঁটে আর লুকিয়ে নিজের জীর্ণ ময়লা জামা প্যান্ট ও পায়ের নোংরা জুতোটা দেখি। রমেনের গায়ের দামী ঝকমকে পোশাকের বুঝি সেদিন তুলনা ছিল না। সোনালী সিল্কের শাড়ি ও কচি কলাপাতার রঙের ব্লাউজে মীনাক্ষীকে বসন্তের রাণীর মতন দেখাচ্ছিল। সেখানে আমার ঐ দীনদরিদ্র বেশ। দেখে রমেনের বান্ধবী আমাকে অনুকম্পা করত না তো কে করত!

এই, অমন ঘাড় গুঁজে আছিস কেন। খাচ্ছিস না? রমেন চেঁচিয়ে উঠেছিল। যেন সে আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরে গলা চড়িয়ে গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করল : দ্যাখ নবেন্দু, আমি তোর ফ্রেন্ড—বেস্ট ফ্রেন্ড—তোর গোমড়া চেহারা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। তোর মুখ কালো দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তুই ভাল করে জানিস তোকে চীয়ার আপ করতে আমার চেষ্টার ত্রুটি নেই। আর পাঁচটা বেকারের মতন সারাক্ষণ নৈরাশ্যে ভুগবি, এ আমি কখনো হতে দিতে চাই না, যে জন্য মীনাক্ষীর সঙ্গে বেড়াতে এসে তোকেও আজ এখানে ডেকে আনলাম।

মীনাক্ষী তখন আবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল কিনা, চোখ তুলে সেদিকে তাকাতে সাহস পাইনি। রমেনের কথা মতন আর একটু সন্দেশ ভেঙে তাড়াতাড়ি মুখে পুরেছিলাম। তা না হলে, জানতাম সে কিছুতেই চুপ করত না।

কালকের আর একটা ঘটনা। কালই আমি রূপাকে প্রথম দেখি। তিন মাস আগের মীনাক্ষীর জায়গায় এখন রূপা। আগেই বলেছি, ঋতুতে ঋতুতে ফুল ফোটার মতন নতুন নতুন বান্ধবী আসছে রমেনের জীবনে। আসুক। কিন্তু আমাকে ওদের সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া কেন। মীনাক্ষীর সঙ্গে আমাকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গেল। আর কাল রবিবার ছুটির দিন তার রূপার সঙ্গে রমেন আমাকে ধরে নিয়ে গেল লাইটহাউসে ইংরেজী বই দেখাতে। ছবি দেখার সময় অন্ধকারে জিনিসটা তত বুঝতে পারিনি। শো ভাঙ্গবার পর হল থেকে বেরিয়ে তিন-জন একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি, তখন। দোকানের নীলাভ ঝকমকে আলোয় লক্ষ্য করলাম রমেনের নতুন বান্ধবী আমাকে দেখে মীনাক্ষী যেমন করত নাক কুঁচকে ঘাড়টা মোটেই ঘুরিয়ে নিচ্ছে না। বরং বেশ মনোযোগ দিয়ে একবারের জায়গায় দু তিনবার করে আমাকে দেখছে। ওর এভাবে তাকানটা রমেনের চোখে পড়বে জানা কথা। তাই বুঝি রমেন মিটিমিটি হাসছিল। তারপর আর সে চুপ থাকতে পারল না।

এটা তোর সেই জামাটা, আমি যেটা কিনে দিয়েছিলাম। তাই না নবেন্দু?

হুঁ। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর করলাম।

যা দশা করেছিস না জামার! রমেন আবার বলল, তা জামার দোষ কি। মাসের পর মাস একটা সার্ট একটা প্যান্ট গায়ে থাকলে এই অবস্থা দাঁড়াবে জানা কথা। ঠিক আছে, কালই আবার একটা সার্ট একটা প্যান্ট তোকে কিনে দেব।

তা দিও। ঠোঁট থেকে চায়ের কাপটা সরিয়ে রূপা বলল, তা হলেও এই আধা-ময়লা ছেঁড়া পোশাকে তোমার বন্ধুকে একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না। মুখটা ভারি মিষ্টি তো।

চমকে উঠলাম। বুকের মধ্যে টিপ করে উঠল। ঘাড় তুলে দেখি চা খাওয়া ভুলে গিয়ে লম্বা পালকের বড় বড় চোখ মেলে রমেনের বান্ধবী সেই একভাবে কেবল আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু অবাক লাগল, রমেন যেন জিনিসটা মোটেই গ্রাহ্য করছে না। আমরা দুটি পুরুষ টেবিলের এধারে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে। রূপা বসেছে আমাদের মুখোমুখি হয়ে। রমেনকে ফেলে রূপা সারাক্ষণ আমাকে দেখবে, এ কেমন কথা। আমার ভয় ভয় করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে, আমার ভয়টাকে প্রায় ঝড়ের মতন উড়িয়ে দিতে রমেন হো হো করে হাসল।

রূপা তোকে ঠাট্টা করছে নবেন্দু। ময়লা ছেঁড়া পোশাকেও তোকে নায়ক নায়ক দেখাচ্ছে।

রূপা কথা বলল না। আমি নীরব থেকে ঘাড় গুঁজে চা খাই।

তা বলে রমেন চুপ থাকল না। আমার দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, মুখ-টাও তো একেবারে জঙ্গল করে রেখে-ছিস। সেই যে তিনটে ব্লেড কিনে দিয়ে-ছিলাম—শেষ হয়ে গেছে বুঝি?

হুঁ, ঘাড় গুঁজে উত্তর করি।

আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না। রূপার রূপালী গলার স্বর আমার কানে এল। রমেনকে ও বোঝাচ্ছিল, পুরুষের গাল চিবুক সাধারণ ডিমের মতন পালিশ চকচকে হয়ে আছে দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে নবেন্দুকে সুন্দর লাগছে।

হো হো। রূপার কথা শুনে রমেন ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠল। চোখটা কাত করে আমি রমেনের মুখটা দেখলাম। এত জোর হাসছিল সে! আমার বুক কাঁপতে লাগল।

বেকার মানুষ পেয়ে নবেন্দুকে এভাবে ঠাট্টা করা তোমার উচিত নয় রূপা। রূপার দিকে চোখ রেখে রমেন বলল, আমি আজই ওকে এক ডজন ব্লেড কিনে দেব।

রূপা চুপ! আমি চুপ। রূপার চোখ দেখে ওর চোখের ভাষা আমি এত বেশি বুঝতে পারছিলাম! রমেনের কাছে এই জিনিস দুর্বোধ্য ছিল। তৎক্ষণে আমাদের চা খাওয়া শেষ। রমেন বিল মিটিয়ে দিল। তারপর তিনজন রাস্তায় নামলাম।

এবার কোনদিকে? রমেন বলল।

গড়ের মাঠে—তারপর গঙ্গার ধারে। রূপা প্রস্তাব করল।

আমি না। সংকুচিত হয়ে রূপাকে বললাম, এবার আমি কাটব রূপা।

না, না, সে কি! তুমি না থাকলে আমাদের বেড়ানটা মাটি হবে।

বলে শক্ত করে রূপা আমার হাত চেপে ধরল। আমার কোনো আপত্তি ও মানবে না। চৌরঙ্গীর হাজারটা লাল, নীল, বেগুনি আলোর ছটা ওর চোখে মুখে এসে ছিটকে পড়ছিল। পরিষ্কার দেখছিলাম রূপার মুখের রং মুহূর্মুহু বদলে যাচ্ছে। অথচ মুখের মতন রমেন তখনও হো হো করে হাসছে। রূপার রং-করা ঝকঝকে কটা নখ আমার হাতের চামড়ায় বসে যাচ্ছে দেখে যেন সে ভীষণ মজা পেল।—শক্ত মেয়ের পাল্লায় পড়েছিস আজ তুই নবেন্দু। চোখ নাচিয়ে রমেন বলছিল, হিপ্পিদের মতন তোর লম্বা চুল দাড়ি ও ময়লা পোশাক দেখে রূপার খুব পছন্দ হয়েছে। হিপ্পিগণ্য করতে ইচ্ছে হয়েছে ওর। কিছুতেই তোকে ছাড়বে না।

হুঁ, কিছুতেই ছাড়বে না। মনে মনে বললাম, তারপর করুণ করে রূপার চোখের দিকে তাকালাম। বললাম, আজ নয়, রূপা, আর একদিন, আজ আমার তাড়া আছে।

জোর করে ওর মুঠোর বাঁধন থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। রমেনের বোকা হাসিটা তখনও কানে বাজছিল। এও কষ্ট লাগছিল বেচারার জন্য। সে জানে না বেকার বাউণ্ডুলে একটি পুরুষের হাতে কখন একটি মেয়ে নখের আঁচড় বসায়, আর তার জ্বলুনি কী মিষ্টি।

সম্পাদক

দেবলদেব বর্মা

চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু চন্দ্রকান্তে নেই। একথা তার অতি বড় শত্রুও একবাক্যে মাথা হেঁট করে স্বীকার করবে। আর শত্রু-মিত্রর রটনা নয়। চন্দ্রকান্ত যে একজন নিষ্কলঙ্ক, দক্ষ বিশ্বাসভাজন কর্মী—আজ পঁচিশ বছর ধরে অফিসের গোপন রিপোর্টে তা লেখা হয়ে আসছে।

চন্দ্রকান্ত,—অর্থাৎ চন্দ্রকান্ত দত্ত। হরিশপুরের কনস্ট্রাকশন ডিভিসনের বড়বাবু। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল। পরনে ধুতি আর লংক্লথের পাঞ্জাবী। সাধারণ বঙ্গসন্তানের মত নরম ভবা চেহারা। অমায়িক, সদালাপী। শুধু কথার শুরুতে একটা 'ইয়ে' বলার মাত্রাদোষ আছে।

বছর পনের আগে হাসান সাহেব এখানে ইঞ্জিনীয়র ছিলেন। ছ-ফুট লম্বা, জবরদস্ত চেহারা। রোদপোড়া, তামাটে গায়ের রঙ। কটা চুল। উঁচু উঁচু শাদা দাঁত। সমস্ত দিন অসুরের মত খাটতেন। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে সাইটে ঘোরা। শুধু সন্ধ্যের পর সাহেবকে আর পাওয়া যেত না। একটা পাত্র নিয়ে নিরিবিলি বসে থাকতেন। তখন মেমসাহেব ছাড়া আর কারো ঘরে ঢোকার হুকুম ছিল না।

সে বছর কনফিডেনসিয়াল রিপোর্ট লেখার সময় হাসান সাহেব ঠাট্টা করে বললেন,—'ওয়েল চন্দ্রকান্তবাবু, আই ডু নট নো ইফ মাই ওয়াইফ ইজ ফেথফুল টু মি। বাট আই ক্যান অ্যাফার্ম দ্যাট ইউ আর ফেথফুল টু ইয়োর ওয়ার্ক'। ফের ভাঙা বাংলায় তার বক্তব্য তর্জমা করবার চেষ্টা করলেন,—হামি জানি না, হামার বিবি সতী আছেন কিনা। লেকিন আপনি মহাসতী বেহুলা আছেন।' কথা শেষ করেই সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর চন্দ্রকান্তর চোখের সামনেই অ্যানুয়াল কনফিডেনসিয়্যাল রিপোর্টের কাগজটার উপর খস খস করে লিখে দিলেন,—'হিজ ইনটিগ্রিটি ইজ লাইক পিওর গোল্ড,—বিয়ণ্ড ডাউটস।' অর্থাৎ তার সততা বিশুদ্ধ সোনার মত,—সকল সন্দেহের অতীত।

সেই চন্দ্রকান্ত,—অর্থাৎ চন্দ্রকান্ত দত্ত। জীবনে মাইনের টাকা ছাড়া কোনদিন একটি তামার পয়সা স্পর্শ করে নি। চাকরির প্রথম জীবনে তার এক বন্ধু ভবতোষ বলেছিল,—তুই শালা চন্দ্রকান্ত নয়, ঠাকুর। চোখ বুজে একবার বল দিকি,—টাকা মাটি, মাটি টাকা।

কনস্ট্রাকশন ডিভিসন। অর্থাৎ ঠিকাদারের অফিস। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত শুধু কন্ট্রাকটরের আনা-গোনা। টেণ্ডার, কোটেশন, অরনেস্ট মানি। তারপর ওয়ার্ক অর্ডার। মাঝে মাঝে ইনজিনিয়র, ওভারসিয়রবাবুরা একবার বোঁ করে সাইটে ঘুরে আসেন। কখনও সরকারী গুদাম থেকে বস্তা বস্তা সিমেন্ট আসে। লোহালক্কর সামনের ঘেরা জায়গাটায় ডাঁই করা থাকে। যথাসময়ে সাইটে চলে যায়। ঠিকাদারদের বিল পাশ করার আগে চন্দ্রকান্তকে একবার চোখ বুলিয়ে বাম কোণে ছোট্ট একটুকু সই করে দিতে হয়। তারপর আফসের সীল মারা বিল সাহেবের ঘরে চলে যায়। সমস্ত দিন কেবল হাজার হাজার টাকার ফিরিস্তি। মাঝে মাঝে চন্দ্রকান্তর মনে হয়, তার টেবিলের তলা দিয়ে টাকাগুলো কনে বউয়ের মত গুটি গুটি করে সলজ্জ পায়ে হেঁটে চলেছে। ইচ্ছে করলে খপ করে হাত বাড়িয়ে সে এক খাবলা তুলে নিতে পারে। কিন্তু ছিঃ! কনে বউয়ের

গায়ে হাত? অমন কু-ইচ্ছা চন্দ্রকান্তর কোন দিন হয় নি।

* * *

তবে ইদানীং চন্দ্রকান্তর হৃদয়-পীড়া শুরু হয়েছে। এত দিনে যা হয় নি, অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তাই। তা বলে হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাক নয়। যন্ত্রণার কারণ তার নতুন পড়শী বিষ্ণুচরণ। মাস তিন-চার হল বিষ্ণুচরণ তার পাশের বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়েছে। লোকটার গায়ের রঙ অমাবস্যার মত কালো, তালগাছের মত ঢ্যাঙা, প্রায় উটের মত গলা বাড়িয়ে হাঁটে। বিষ্ণুচরণ রেলের গুডস ক্লার্ক। সাদা বাংলায় যাকে মালবাবু বলে।

কী একটা ছুটির দিন দুপুরে বিষ্ণুচরণ সপরিবারে তার নতুন ভাড়া নেওয়া বাড়িতে এসে উঠল। অবশ্য সকাল থেকেই তার মালপত্র আসছিল। এক ট্রাক বোঝাই জিনিস,—দুটো পালঙ্ক, তিনটি প্রমাণ সাইজের স্টীলের আলমারি। তার একটার পাল্লায় চৌকো আয়নার মত কাঁচ বসানো। গোটা চারেক সিলিং ফ্যান, —একটা নতুন টেবিল ফ্যানও। মেয়েদের সাজগোজ করবার ড্রেসিং টেবিল। একটা ডিভান, সোফা সেট, ডাইনিং টেবিল,—এমন কী একটা ফ্রিজও রয়েছে। চন্দ্রকান্ত বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় করে তাকিয়েছিল। মালবাবুর যে অত মাল হয়, সে বোধহয় কল্পনাও করতে পারে নি।

চন্দ্রকান্তর বউয়ের নাম সৌদামিনী। দিব্যি মেয়ে। টানা চোখ, ফর্সা রঙ। বয়স হয়েছে বলে শরীরটা একটু ভারী, আলগা মনে হয় যৌবনে একটু যেন ভাটার টান। নইলে সৌদামিনী যে এককালে রীতিমত সুন্দরী ছিল, তা ওর মুখের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়।

সকালবেলায় একটু বেলা করে আর এক কাপ চা খায় চন্দ্রকান্ত। ডিসের উপর পেয়ালাটা রেখে আঁচল দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নিয়ে এল সৌদামিনী। স্বামীর হাতে দিয়ে ঈষৎ শ্লেষের সুরে বলল,—কি গো, মালপত্র দেখেই যে হাঁ করে রইলে! আগে মালের বাবুটিকে চাক্ষুষ দেখ।

মালের বাবু,—অর্থাৎ মালবাবু বিষ্ণুচরণ চক্কোত্তি। সন্ধ্যেবেলাতেই সে পড়শীর সঙ্গে পরিচয় করতে এল। সঙ্গে বউ কৃষ্ণভামিনী। গোলগাল, পুরন্ত চেহারা। মুখে পান, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। গলায় বেশ ভারী বিছে হার। কানে পাশা, হাতে চুড়ি, বালা। তা লোকটির ব্যবহার ভালো। মিষ্টভাষী, শিষ্টাচার জানে। চন্দ্রকান্তকে সে দাদা বলে ডাকল। সৌদামিনীকে বৌদি। এক গাল হেসে মাথা নুইয়ে বলল,—'আপনাদের আশ্রয়ে এলাম দাদা। ছোট ভাইকে একটু নজরে রাখবেন?

নজর তার নয়, সৌদামিনীর। আর তাই নিয়ে চন্দ্রকান্তর প্রাণান্ত অবস্থা। সকাল-সন্ধ্যে দু-বেলা খবর পাচ্ছে চন্দ্রকান্ত। বিষ্ণুচরণ চক্কোত্তির বাড়ির সংবাদ। ঠিক বাড়ির খবর না বলে হাঁড়ির খবর বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে। সবই স্ত্রীর মারফৎ,—মানে যাকে বলে ঘোড়ার মুখের খাঁটি খবর। আর ধন্যি চোখ দুটো সৌদামিনীর। বিষ্ণুচরণের বাড়িতে কে এল, কে গেল সে জানালার পর্দার ফাঁকে সর্বদা লক্ষ্য করছে। কবে কৃষ্ণভামিনী স্যাকরা ডেকে নতুন গয়না গড়তে দিল, রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে চন্দ্রকান্ত তা জানতে পারল। প্রতি দিন সকালে বিষ্ণুচরণের বাড়িতে দই আর নরম পাকের সন্দেস আসে। খাওয়ার শেষে সন্দেশ না হলে কৃষ্ণভামিনীর নাকি ঢেকুর ওঠে না। রাত্তিরে বিষ্ণুচরণের জন্য ভাত নয়, ...ভালো ঘিয়ের লুচি আর একটু মাংসের ঝোল পেলেই সে খুশি। তার সঙ্গে বেগুন কিম্বা পটল ভাজা। সব শেষে রাবড়ি অথবা কাঁচা গোল্লা। ছেলেরা রোজ বিকেলে আপেল আর আঙুর খায়। বিষ্ণুচরণের বড় ছেলের তিনটে টিচার,—একজন ইংরেজী, একজন অঙ্ক, একজন ইতিহাস-ভূগোল পড়ায়। মেয়ের জন্য মাসে একশ টাকা দিয়ে ভালো গানের মাস্টার রেখেছে বিষ্ণুচরণ। শুধু কী তাই? এই তো গত মাসে প্রায় হাজারখানেক টাকা খরচ করে এক সাধু বাবার কাছে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দীক্ষা নিয়ে ফিরল।

চন্দ্রকান্ত খুব বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করল। সৌদামিনী আজকাল কেবল ঠেস দিয়ে কথা বলে। চন্দ্রকান্তর মত মানুষের সংসারে থাকা মিছে, তার নিশ্চয় সাধু-সন্ন্যাসী হওয়া উচিত ছিল। অনর্থক শুধু বিয়ে-থা করে সমস্ত জীবন দুঃখে-কষ্টে কাটাবার কোন মানে হয় না। আর সেই সঙ্গে সৌদামিনী এবং তার ছেলে-মেয়েদেরও দুর্গতির একশেষ।

মাঝে মাঝে অবশ্য বিষ্ণুচরণের উদ্দেশ্যেও সে সুমধুর বাক্যবাণ ছাড়ে। তবে তার আসল প্রতিপক্ষ কোন পুরুষ নয়। সে এক নারী, —মালবাবুর বউ কৃষ্ণভামিনী। আড়ালে বউটাকে অবশ্য ওই নামে ডাকে না সৌদামিনী। বলে, মালিনী। মালবাবুর বউয়ের আবার অন্য কী নাম হবে? মালিনীই তো হওয়া উচিত।

ভাদ্র মাসের প্রথমেই সৌদামিনী হঠাৎ একদিন তাকে আলটিমেটাম দিল। তার পাঁচশ টাকা চাই,—অবিলম্বে তিন দিনের মধ্যে। নইলে সে কুরুক্ষেত্তর করবে। মনের দুঃখে ঘেন্নায় আত্মঘাতীও হতে পারে।

চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে চন্দ্রকান্ত বলল,—ইয়ে পাঁচশ টাকা? তুমি পাগল হলে নাকি?'

—'এখনও হই নি।' সৌদামিনী ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল। বলল,—'টাকা না পেলে কিন্তু সত্যি হব।'

তবু চন্দ্রকান্ত অনুনয় করল,—মানে পাঁচশ টাকা। এখনই কী দরকার হল?'

সৌদামিনী মুখখানা শক্ত করে বলল,—'আর এক মাস বাদেই পুজো। মেয়ে-জামাইকে তত্ত্ব-তালাস করতে হবে, সে খেয়াল আছে?'

চন্দ্রকান্ত স্রেফ ঢোক গিলল। পুজোর নামে সে যেন একটা জুজু দেখছে। অত টাকা কোথায় পাবে? প্রভিডেন্ট ফণ্ড থেকে দুবার ধার নিয়েছে। আর লোন পাওয়া যায় না। পঞ্চান্ন বছর বয়সে তার পাঁচশ টাকা মাইনে হয়েছে ঠিক। কিন্তু জিনিসপত্রের দামও তেমনি। সব অগ্নিমূল্য। মাইনের টাকা কটায় নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মাসের শেষে চন্দ্রকান্ত তো প্রায় পাঁচ-দশ টাকা ধার করে। কিন্তু পাঁচশ টাকার জন্য সে কার কাছে হাত পাতবে?

সৌদামিনী ঝংকার দিয়ে বলল,—শুনতেই পাঁচশ। নইলে ওই কটা টাকার কী মুরোদ? জামাইয়ের জন্য একটা শান্তিপুরী ধুতি কিনতে গেলে পঞ্চাশ টাকা বেরিয়ে যায়, সে খবর রাখ?'

তবু চন্দ্রকান্ত একবার মিনমিনে সুরে গাইল,—'অত টাকা কোথায় পাই?'

—'তা আমি কেমন করে জানব? টাকার খবর তুমি পুরুষ মানুষ বলতে পার।' তারপর বুড়ো-বয়সে যেন রঙ্গ করে বাঁ চোখটা টিপল সৌদামিনী। কী যেন ইঙ্গিত করে বলল,—'না জানলে বরং সন্ধ্যেবেলায় মালবাবুর কাছ থেকে শিখে এস।'

গত ফাল্গুনে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে চন্দ্রকান্ত। বলতে গেলে পুজোর তত্ত্ব এই প্রথমবার। সুতরাং পাঁচশ টাকা তার চাই। এতদিন যা করে নি, চন্দ্রকান্তকে বোধহয় আজ তাই করতে হবে। নইলে পাঁচশ টাকা সে কোথায় পাবে? ভালো করে ভেবে নিয়ে মনঃস্থির করল চন্দ্রকান্ত। সে নিরুপায়। টাকা না পেলে সৌদামিনী তাকে আস্ত রাখবে নাকি? এতদিন তার নিজের কোনো শখ-সাধ, আমোদ-আহ্লাদের জন্য স্বামীর কাছে আবদার করে নি। বছরে চারখানা শাড়ি আর দু-বেলা শাক-ভাত তাই নিয়েই একটা জলজ্যান্ত সুন্দরী মেয়ে আজ বিশ-পঁচিশ বছর হাসিমুখে রয়েছে। এখন মেয়ে-জামাইকে পুজোর তত্ত্ব না পাঠাতে পারলে সৌদামিনী কী তাকে ছেড়ে কথা কইবে?

হাতে তিনখানা বিল চেপে রেখে প্রায় মৌনীবাবা সেজে বসে রইল চন্দ্রকান্ত। সাধারণত তার টেবিলে কিছুই পড়ে থাকে না। বিনা তদ্বিরেই সব টুক-টুক করে এগিয়ে চলে। ঠিকাদারবাবুরা অবশ্য মাঝে মাঝে আসে। সামনের

যে স্বাদ সকলের মুখে মুখে

উইলস ভার্জিনিয়া এত জনপ্রিয় কেন? কারণ বাছাইকরা ভার্জিনিয়া তামাকের এই স্বাদই সকলের পছন্দ। চমৎকার ফিলটার সিগারেট, যা খেয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তি।

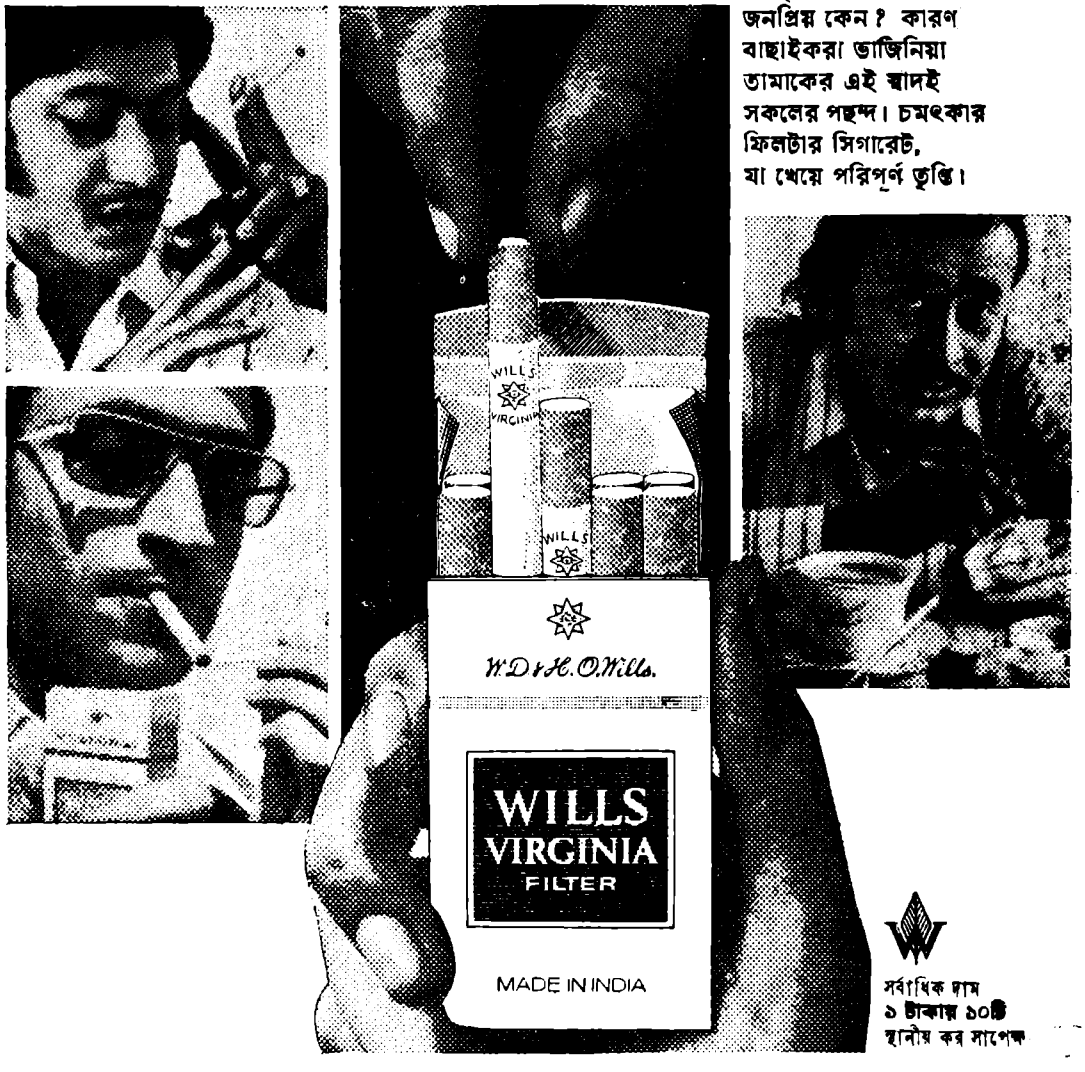

সর্বাধিক দাম
১ টাকায় ১০টি
স্থানীয় কর সাপেক্ষ

উইলস ভার্জিনিয়া

ভার্জিনিয়ার স্বাদ উইলস নামের মর্যাদা রাখে

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

চেয়ারে বসে। গল্পগুজব, কুশল প্রশ্ন করে। চন্দ্রকান্ত বিড়ি সিগারেট খায় না। নইলে হয়তো প্যাকেটটা তার দিকে এগিয়ে ধরে একটা নিতে বলে।

বিলটা পাশ হয় নি শুনে প্রথমেই ছুটে এল জগন্নাথ কর্মকার। পুরুকে ঠিকাদার। কম পুঁজির কারবার। টাকা আটকে গেলে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খায় আর ছটফট করে।

—কী ব্যাপার চন্দ্রকান্তবাবু? বিলটা পাশ হয় নি কেন? সে ব্যস্ত-ভাবে শুধোল।

সাকুল্যে দু-হাজার সাতশ চার টাকার বিল। নেহাৎ পুঁটি মাছের প্রাণ। বিলের উপর একবার চোখ বুলিয়ে চন্দ্রকান্ত জবাব দিল,—ইয়ে মানে, আচ্ছা যান। পাশ করে সায়েবের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পরের লোকটাও তেমনি। হারাধন বিশ্বাস। কালো রঙ। চিমসে চেহারা। তার চার হাজার তিনশ তেষট্টি টাকার বিল,—বাকুড়ার ওদিকে একটা রোডে লোকটা পাথরগুঁড়ি সাপ্লাই করেছিল। চন্দ্রকান্ত বার দুই ঢোক গিলল বটে। কিন্তু লোকটার খা চেহারা আর চির-কালের অভ্যাস,—তার মুখ দিয়ে এত-টুকু আওয়াজ বেরোল না। বিলটা পাশ করে সে প্রায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত হাত গুটিয়ে বসে রইল।

বেলা একটা নাগাদ ভূষণ সামন্ত এসে হাজির। পরনে মিহি ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। চকচকে পাম্প-সু। হাতে একটা ছড়ি রেখে ভূষণ। ফার্স্ট ক্লাস ঠিকাদার। রইস আদমী। বলতে গেলে মা লক্ষ্মীর দুলাল। ঠিকাদারির দৌলতে হরিশ-পুরে গাড়ি-বাড়ি-টেলিফোন - অফিস সব করেছে।

ভূষণ সামন্ত মৃদু গলায় শুধোল, —বিলটা পাশ হয় নি চন্দ্রকান্তদা? কোথাও ভুলচুক আছে নাকি?'

—'ইয়ে, তোমার বিল?' চন্দ্রকান্ত ন্যাকা সাজল। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তারপর চোখের উপর চশমার কাঁচটা রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে বিলটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

ভূষণ তেমনি মৃদুস্বরে বলল,—'টাকার একটু দরকার ছিল বুঝলেন? যদি আজই পাশ করে সায়েবের সইয়ের জন্য দিতেন।'

চন্দ্রকান্ত বিল দেখছিল। আহা। বিল নয়, দীঘি নয়। মজা-হাজা খাল নদী নয়। সাগর, সাগর। সাতাশী হাজার টাকা। তা ভূষণ সামন্তর দোষ কী? এতগুলো টাকার জন্য মানুষ একটু চঞ্চল, ছটফট করতে পারে বৈকি।

চেয়ারে বসে ভূষণ ফের অনুনয় করল,—খুব উবগার হত চন্দ্রকান্তদা। যদি বিলটা আজ সায়েবের ঘরে সইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিতেন।'

—'ইয়ে, মানে এতগুলো টাকার বিল। একটু দেখে-শুনে ছাড়তে হবে তো।' চন্দ্রকান্ত যেন লাট্টুর গায়ে সুতোর প্যাঁচ জড়াতে লাগল।'

ভূষণ সামন্ত ঝানু ঠিকাদার। তার কেমন খটকা লাগল। চন্দ্রকান্তদার কথার সুরে যেন কিসের গন্ধ! কিন্তু তাই কী সম্ভব? দশ-বারো বছর ধরে সে এই মানুষটাকে দেখছে। কোনো-দিন এতটুকু বেচাল দেখে নি।

তবু জল মেপে দেখতে হয়। ব্যবসার তাই নিয়ম। আর এই ভুবন কী বিচিত্র। সংসারে সবই সঙ্ঘ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির-কেও তো একটিবার মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল।

একটু গলা নামিয়ে শুধোল ভূষণ, —কোনো অসুবিধে ছিল নাকি?

—'না ইয়ে মানে তেমন কিছু নয়।'

—'আরে বলুন না চন্দ্রকান্তদা। আমি তো ধরুন আপনার ছোটো ভাই।'

সুযোগ বুঝে মুখ খুলল চন্দ্র-কান্ত। খুব চাপা গলায় বলল,—'শ পাঁচেক টাকার বড় দরকার ছিল হে।'

—'আরে ছি, ছি!' ভূষণ যেন নিজেকেই ধিক্কার দিল। এই সামান্য কথাটা আপনি এতক্ষণ গলার মধ্যে চেপে রেখেছিলেন? দাঁড়ান, আমি বাড়ি থেকে এখুনি এনে দিচ্ছি।'

মুহূর্তে চন্দ্রকান্তর মুখখানা রক্ত-শূন্য প্রায় ছাইবর্ণ দেখায়। বলল,—'সর্বনাশ! এইখানে বসে কী তাই হতে পারে? দেখছ না, রতন সাহা, ভজহরি মণ্ডল, রাখহরি মাহাতো মুখ তুলে বার বার এদিকে তাকাচ্ছে।'

ভূষণ সামন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলল,—'আহা! ওরা বুঝি সব সাধু-পুরুষ? আপনি মিথ্যে বড় চিন্তা করেন চন্দ্রকান্তদা। আলোর সামনে সবাই দেবতা, আবার অন্ধকারে গেলে ভূত সেজে তারাই ঘাড় মটকায়।'

কিন্তু চন্দ্রকান্ত নারাজ। 'তা হয় না বাপু, অসম্ভব।' ভূষণকে সে বোঝাতে চাইল।

—'তাহলে? সন্ধেবেলায় বাড়িতে যাব?'

—'পাগল নাকি?' চন্দ্রকান্ত যেন আরো ভয় পেল। খুব চাপা গলায় বলল,—'আমার পাশের বাড়িতে একজন মালবাবু থাকে। লোকটা সাংঘাতিক। তুমি এসেছ জানতে পারলেই বাস। কাল সকালেই খবরটা সর্বত্র চাউর করে দেবে।'

—'তাহলে কী করব বলুন?' ভূষণ সামন্ত যেন একটু বিরক্ত হয়ে শুধোল।

—'অন্য কোথাও। মানে কোনো নির্জন জায়গায়।' চন্দ্রকান্ত নিজেই প্রস্তাব করল।

ভূষণ সামন্ত এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল,—'নদীর পুলটার নীচে একবার আসতে পারবেন? ওখানে একটা রেস্তোরাঁ আছে। দিনের বেলায় চা জলখাবার। আর রাত্তির হলেই স্রেফ বার। তখন মদ আর মেয়ে-মানুষের কারবার চলে।

'ইয়ে মানে রাত্তির বেলায় তুমি ওখানে যাও নাকি? চন্দ্রকান্ত ভ্রূ কোঁচকাল।

—'তা যেতে হয় বৈকি। ভূষণ মুচকি হাসল। বলল,—'আমাদের শতেক দেবতার পুজো। কে কোন ফুলে সন্তুষ্ট হবেন তার ঠিক আছে? তবে আপনার কোনো ভয় নেই। এখন দুপুরবেলায় নির্জন ঘর,—শুধু ভন ভন করে মাছি উড়ছে।'

বেলা আড়াইটে নাগাদ নদীর পুলের নীচে এলো চন্দ্রকান্ত। রিকশ-টাকে হাত পঞ্চাশ আগেই ছেড়ে দিল। আকাশ ফটফটে নীল। বর্ষা এবার বিদায় নিচ্ছে। নদীর ওপারে কী একটা গ্রামের পাশ দিয়ে এক খণ্ড তুলোর মত শাদা মেঘ ভাসতে ভাসতে এদিকেই আসছে।

ভূষণ তার জন্য অপেক্ষা করছিল। এক গাল হেসে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বলল,—'ঠিক টাইমে এসেছেন চন্দ্রকান্তদা। যাকে বলে পাংচুয়াল।'

রেস্তোরাঁ ফাঁকা। একটাও লোক নেই। শুধু কাউন্টারে বসে একজন কর্মচারী কী যেন হিসেব লিখছে।

ছোট্ট একটা কেবিনে ঢুকে ভূষণ অর্ডার দিল,—দু প্লেট চিকেনকারী, রুটি আর চা।'

চন্দ্রকান্ত বলল,—'ইয়ে আমি চিকেন খাব না ভাই। আমার জন্য শুধু টোস্ট।'

পকেট থেকে লম্বা গোছের একটা খাম বের করল ভূষণ। ডিমভরা পোনা মাছের মত পেটটা মোটা। তবে মুখটা বন্ধ। বলল,—'নিন, রেখে দিন চন্দ্র-কান্তদা। মিছিমিছি রোদ্দুরে এত দূরে এলেন।'

খামটা দেখেই চন্দ্রকান্তর যেন ঘাম হতে শুরু করল। বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ড নামক বস্তুটি হঠাৎ মেল ট্রেনের মত চলতে শুরু করেছে। তার ব্লাড-প্রেশার তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল নাকি?'

একটা ঢোক গিলে চন্দ্রকান্ত বলল, —'ইয়ে মানে এখন থাক না তোমার কাছে। যাবার সময় বরং নিলেই হবে।'

ভূষণ ব্যঙ্গ করে হাসল। বলল,—'আপনি বড্ড নার্ভাস।'

হঠাৎ চন্দ্রকান্তর মনে হল নদীর পুলের কাছে সে যেন একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। পরনে সাদা হাফ সার্ট আর ধুতি, লোকটা যেন তার দিকেই তাকাচ্ছিল। ছদ্মবেশে গোয়েন্দা পুলিশ নয় তো? গোপনে খবর পেয়ে তার গতিবিধির উপর সতর্ক নজর রাখছে।

চা আর টোস্ট খেয়ে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল,—'তুমি একটু বস ভূষণ। আমি চট করে বাইরে থেকে আসছি।'

ভূষণ সামন্ত চিকেন কারী নিয়ে ব্যস্ত। মুখ না তুলে বলল,—'বাথরুমে যাবেন তো? চলে যান, ওই পেয়ারা গাছটার পিছনেই রয়েছে।'

কিন্তু বাথরুমে নয়। হাঁটতে হাঁটতে চন্দ্রকান্ত নদীর পুলের সামনে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য! সাদা হাফ সার্ট পরা সেই লোকটা গেল কোথায়? চন্দ্রকান্ত আকাশ-পাতাল, সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছু চিন্তা করতে লাগল।

হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে সে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। বিষ্ণুচরণ, —তার প্রতিবেশী মালবাবু সামনে দাঁড়িয়ে। উঃ, কী কপাল। আজ কার মুখ দেখে সে উঠেছিল?

বিষ্ণুচরণ বলল,—'এই মাত্তর আপনার কথা হচ্ছিল দাদা।'

—'ইয়ে আমার কথা? ভয়ে চন্দ্রকান্তর মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু।

বিষ্ণুচরণ একগাল হেসে বলল,—'সত্যি দাদা। কী সুনাম আপনার। একটু আগে ওভারসিয়র চিত্তবাবুর সংগে দেখা। নাম শুনে খালি প্রশংসা আর প্রশংসা। বলল,—মশায়, চন্দ্রকান্ত-বাবু হল আসল হীরে। লাখে অমন একটা মেলে।

তারপর বিষ্ণুচরণ এক কাণ্ড করল। হঠাৎ তার পা দুটো স্পর্শ করে বলল, —"একটু পায়ের ধুলো নিলাম দাদা। কিছু মনে করবেন না।'

* * *

পায়ের ধুলো নয়। মালবাবু যেন তার সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়ে চলে গেল। চন্দ্রকান্তর এখন সাধ্য নেই পুলের নিচে ওই রেস্তোঁরায় ফের ঢোকে। পাশেই দোকানে তেলেভাজা হচ্ছে। গন্ধে জিভে জল আসে। দোকানী বলল,—'দুটো গরম চপ দেব বাবু?'

হঠাৎ চন্দ্রকান্ত দ্রুত হাঁটতে শুরু করল, মনে হল কী যেন সম্পদ বাঁচাতে সে পালিয়ে যাচ্ছে। পুলের নিচে রেস্তোঁরায় ভূষণ তার জন্য বসে। ঠিকাদার ভূষণ সামন্ত। পরনে মিহি ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। দুই হাতের আঙুলে পাঁচ-ছটা জ্বল-জ্বলে পাথর বসানো আংটি। গাড়ি-বাড়ি-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি।

অথচ চন্দ্রকান্ত নিঃস্ব, বিত্তহীন। তবু সে পালাচ্ছে, তেলেভাজা তার হজম হবে না। আর ভূষণ? ঠিকাদার ভূষণ সামন্ত?

শেয়ালের মত বসে বসে মুরগীর পুরুষ্ট ঠ্যাংটাকে সে আয়েস করে চিবোচ্ছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পাটনা থেকে ফিরে এসে অরুণের হাতস বেড়ে গেল। সকালের ফ্লাইটে গিয়ে সন্ধ্যের ফ্লাইটে দমদমে ফিরেছে। দু ধারেই অফিসের গাড়ি ছিল। প্লেন থেকে নেমে সারাদিন অফিসের কাজ সেরেছে। শহর থেকে আবার এয়ার-পোর্ট। ঘণ্টাখানেকের ভেতর দমদম। আবার কলকাতা।

রিজিওন্যাল ম্যানেজার অরুণকে মোহনবাড়ি পাঠাতে চাইলেন। বললেন, মোহনবাড়ি এয়ার স্ট্রিপে কাজ হচ্ছে। তাই তোমাকে হয়তো কুম্ভীগ্রামে নামতে হতে পারে। মিলিটারি ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড। সেখান থেকে বেরিয়ে দেখবে একটা স্টেশন ওয়াগন ওয়েট করছে। সোজা তোমাকে গার্ডেনে নিয়ে যাবে। মাত্র বিশ মাইলের রাস্তা।

গার্ডেন মানে চায়ের বাগান। অ্যাকাউন্টিং ফার্ম। পাটনায় ট্রান্সপোর্ট হাউসের হিসেব, তিনসুকিয়ায় চা-বাগানের, ভুবনেশ্বরে তামাক কোম্পানির। এরকম ঘুরে ঘুরে হিসেব করে দিয়ে আসতে হয়।

আর এম ইদানীং অরুণকেই পাঠাতে চান। অরুণ ছাড়াও আরও সি এ আছে অফিসে। কিন্তু ছেলে ছোকরারা যেভাবে কাজটাকে নেয়—তার চেয়ে অনেক গোছালো অরুণ। অল্প বয়সীরা বাইরে গিয়েই কখন ফিরি কখন ফিরি ভাব। বউকে ফেলে এখনকার ছেলেগুলো দুদিনের বেশি বাইরে থাকতে চায় না। ফিরে একদিন ছুটি নেয়। যাবার আগে আরও একদিন। ওভারটাইম, টি এ-র লোভ দিয়েও কিছু করা যায়নি।

কিন্তু অরুণের ব্যাপার আলাদা। অরুণকুমার রায়—বয়স পঁয়তাল্লিশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ হনস্। বিয়ে করেন নি। অরুণের পার্সোনাল ফাইলে রিজিওন্যাল ম্যানেজার বায়োডাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। জন্ম ঃ ১৯৩১। ম্যাট্রিকুলেশন ঃ ১৯৪৮। বি-এ কিছু দেরিতে। ১৯৫৮।

এ সম্পর্কে লাঞ্চের টেবিলে বসে অরুণ নিজেই তাকে বলেছে। ম্যাট্রিকের পর বি-এ পাশ করতে সার আরও দশ বছর লেগে গেল। লাগার কথা ছিল না। বাবার প্রথম সন্তান আমি। আদরে মানুষ হয়েছি। বাবা ভালো চাকরি করতেন। অফিস থেকে ফিরে গরম-কালের সন্ধ্যায় টান করতেন। তার পর পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরে পাখা চালিয়ে টান টান হয়ে বিছানায় শুতেন। চাঁনে বাড়ি থেকে ড্রাইভার গরম গরম খাবারের প্যাকেট আনতো। আমরা দু ভাই এক বোন ফেলে ছড়িয়ে খেতুম।

রিজিওন্যাল ম্যানেজার এই সুদর্শন, অকৃতদার, প্রবীণ যুবকের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসেন। বাইরে কাজে পাঠালে অরুণ কাজ নিংড়ে নতুন কাজ

বের করে। তার জন্যে নতুন ফিল হয়। ফার্মের লাভ হয়। বাইরে বেরিয়ে অরুণের টি-এ কিংবা আউট অ্যালাউন্সও খুব একটা বেশি হয় না। কথাবার্তায় ধীরস্থির। পার্টি খুশী হয়। নতুন কাজ আসে।

আর এম বলেছেন, অরুণ তুমি কবিতা লিখতে এক সময়? তাই না?

অনেক আগে স্যার। আজ কাল আর লিখি না।

তুমি কথা বলো খুব সুন্দর।

যা বলছিলাম স্যার—বাবা তখন বেঁচে। মা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন মার্কেটে। নিজে লেস কিনে এনে ব্যাউজের হাতায় বসাতেন। আমার মায়ের মাথায় যে কত চুল ছিল স্যার।

এখন আর তত নেই। যত্ন নেন না একদম। আমাকে নিয়েই তাঁর যত বাড়াবাড়ি।

ভায়েদের মধ্যে তুমিই বোধ হয় সবচেয়ে সুন্দর।

না স্যার। আমার ছোট ভাইয়ের মনটা খুব সুন্দর। ভুলু আমায় ভীষণ ভালবাসে। এইতো বছর খানেক হল বিয়ে দিয়েছি। বউমাকে নিয়ে চিত্তরঞ্জনে আছে। আমি যাবো বলে আলাদা একখানা ঘর সাজিয়ে রেখেছে কোয়ার্টারে। সরকারী কোয়ার্টার। চব্বিশ ঘণ্টা জল।

অরুণ ভাইয়ের কথা থেকে বোনের কথায় চলে এল। সুপু—সুপ্রিয়া টি ভি-তে কাজ করে। এর বর অমিতও টি ভি-তে আছে। সাউণ্ড ইনজিনিয়ার। দুজনে মাস পয়লায় মাইনে পেলেই আমাকে খাবার নেমন্তন্ন করে। কখনো ওদের বাড়িতে। নয়তো রেস্তোরাঁয়। আমি কি খেতে ভালবাসি তাও জানে। জানেন তো স্যার—আমার আলু, চিনি, চর্বি, ঘি—সবরকমের রেসট্রিকসন।

এখন তো সাবধানেই থাকা উচিত তোমার। দু দু'বার হয়ে গেল।

সেই বি-এ পাশ করলাম। বাবা দেখে যেতে পারেন নি। তিনি বেঁচে থাকতে এই আমি কি ভীষণ দুর্দান্ত ছিলাম।

তুমি? দুর্দান্ত?

হ্যাঁ স্যার। বিশ্বাস হবে না আপনার। এখন আমি নরম হয়ে গেছি। বয়স হল। তারপর দু দুটো স্ট্রোক গেল। কতদিন বাঁচবো জানি না।

রিজিওন্যাল ম্যানেজার কথা ঘুরিয়ে দিল। খুব দুর্দান্ত ছিলে?

ভীষণ।

রিজিওন্যাল ম্যানেজার একসটেনসনে আছেন। কাজ জানেন ভালো—ভাই। একটি মোটে মেয়ে। বিয়ে দিয়ে খালাশ। নিজে বিপত্নীক। দুপুরে ডালহৌসি পাড়ায় লাঞ্চ সারেন। রাতে কোনদিন খান। কোনদিন খান না। সতেরো বছরের ছোট এই সুন্দর ধীরোবাক ছেলেটিকে তার ভালো লাগে। ওর কথায়, চোখের চাউনিতে বিকেলের ছায়া দেখতে পান। জল খেলে দু ঠোঁটের কষ থেকে কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। বোঝাই যায়—একটা বয়সে অরুণ কিছু ড্রিংক করেছে। এখন নিশ্চয় ডাক্তারের মানা। ঠোঁটের কোণে সাড় নেই অরুণের।

বাবা বসে আছেন বৈঠকখানায়। আমি দেওয়াল থেকে দাড়িটা খুলে নিয়ে বেচতে চলে গেলাম। বাবা হা হা করে উঠলেন। আমি কান দিই নি।

পর পর কয়েক বছর বি-এ পরীক্ষা দিয়ে শুধু ফেল করেছি। বাবা বলতেন, অরুণ পাশ করলে গঙ্গাস্নান করবো। সে চান্স পান নি বাবা।

বাবা চলে যেতে অনার্স গ্রাজুয়েট হলাম। বাবার বৈঠকখানায় তখন নিজে বসি। মা বাবার গ্র্যাচুইটি, পেনসনের টাকায় বাড়ি তুলছেন।

ওটা তোমাদের নিজেদের বাড়ি নয়? আমি জানতাম—

না স্যার। ও বাড়ি বাবা লিজ নিয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছরের। বাবা চলে যেতে মা ভাড়া বসালেন। আমাদের চলে যাচ্ছিল। বাবার টাকা যাতে নষ্ট না হয়—তাই মায়ের চেষ্টায় নতুন বাড়ি উঠলো। ভাড়া বসলো। বছর পনেরো ভাড়াও পেলাম আমরা। তারপর রাস্তা বড় করতে বাড়ি ভাঙ্গা পড়লো। মা কমপেনসেসনের টাকা পেয়ে ফিকসডেএ ফেলে দিলেন।

তাহলে তো ভালো সুদ পাচ্ছো। লিজের বাড়িরও সারেলেটের টাকা পাও। চাকরি না করলেও চলে তোমার অরুণ।

তা হয়তো চলে স্যার। কিন্তু কিছু না করে বাড়ি বসে থাকি কি করে। মা বলেন, ভবিষ্যৎ তো আছে। তাই না স্যার?

বিয়ে করোনি। থা করোনি। তোমার আর ঝামেলা কি?

বিয়ে তো করতেও পারি স্যার।

ইচ্ছে হয়?

এতোদিন হয়নি। ভাবিনি। বন্ধুবান্ধবরা বিয়ে করলো। তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হল চোখের সামনে। কারও ছেলে কলেজে ঢুকেছে। যুবক হয়ে উঠেছে। মা বাবার অসুখ করলে ডাক্তার ডাকে। আমারও মনে হয়—এমন যদি কোন ছেলেমেয়ে থাকতো আমার—

অরুণ। তুমি কখনো প্রেমে পড়োনি?

মনে পড়ে না। হয়তো অনেক দিন আগে। কিছু ঘটেনি তখন।

তুমি সেদিন ঘটাওনি কেন অরুণ?

ভেবেছিলাম জীবন তো অনেক বড়। দেখা যাবে এক সময়। স্যার আপনার সুপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এর পরে ভালো লাগবে না।

আমি ঠাণ্ডা সুপ ভালোবাসি। অরুণ তুমি ডিব্রুগড় ঘুরে এসো। আমাদের অফিসেই উঠবে। সামনে খোলা লন আছে। বিকেলে ইচ্ছে করলে বেতের চেয়ার পেতে চা খেতে পারো। সন্ধ্যে হলে বসে বসে তারা দেখতে পারো। জ্যোৎস্না রাতে কামাক্ষ্যা পাহাড় শহরের একদিক থেকে জেগে ওঠে। আমি অনেকবার গেছি। তোমার ভালো লাগবে।

স্যার আমার আজকাল কলকাতার বাইরে যেতে ভালো লাগে না। এখানেই আমার ডাক্তার। ওষুধ। আর বলতে পারলো না অরুণকুমার রায়। সে বলতে চাইছিল—এখানেই আমার মা থাকেন। চিত্তরঞ্জন থেকে এখানেই আমার ছোট ভাই ভুলু এসে ওঠে। বউমা আসেন। আসে সুপ্রিয়া। টি ভি স্টেশন-ফেরৎ অমিতাভও আসে। আমি বড় শোবার ঘরে আমার খাটে আসন করে বসি। ওরা সবাই মোড়ায় বসে। চা হয়। হাসি হয়। বেশ কাটে। কলকাতার বাইরে এখন আর আমার ভালো লাগে না। নতুন শহরে ভরসা পাই না। সেখানে আমাকে কেউ চেনে না।

ডিব্রুগড়েও বড় বড় ডাক্তার আছেন। আমাদের অফিসের নাম সবাই জানেন। ডাকলেই আসবেন। তুমি এইবারটি ঘুরে এসো। তুমি দেখলে কাজ ভালো হয়। এর পর আর বাইরে পাঠানো হবে না তোমাকে।

অরুণদের বাড়ি তার ছোটবেলার বন্ধু মহীতোষ যায় মাঝে মাঝে। ওরা এক সঙ্গে স্কুলে পড়তো। মহীতোষের ভুঁড়ি আছে। বউ আছে। এক মেয়ে ও এক ছেলে আছে। মেয়ে পার্ট গান দেবে। ভারতনাট্যম্ শিখছে ছ'বছর বয়স থেকে। মহীতোষ রাত আটটা নাগাদ অফিস থেকে ফিরে চান করে, খায়, তারপর বউ নিয়ে গাড়ি করে এক একদিন অরুণের বাড়ি যায়। তখন সেখানে ভুলু, সুপ্রিয়া, ভুলুর বউ, অমিতাভ, মাসীমা থাকেন। ১৯৪০, ৪৫, ৫৩, ৬১ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়কার কথা—কথায় কথায় উঠে আসে। হাসাহাসি হয়। হাসে বেশি অরুণ। মহীতোষের মনে হয় অরুণ বুঝি এখনকার আয়টুকু উপরি পাওনা হিসেবে পেয়ে হাসিতে বিশ্রামে, আলস্যে একটু একটু করে খরচ করছে। সবসময় ভয়—এই বুঝি ফুরিয়ে যায়।

মহীতোষকে পেলে অরুণ ভয়ঙ্কর খুশি হয়। কখনো আবার বিরক্তও হয়। বলে, তুই বাড়ি যা কিংবা অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে বলে, তুমি এখন বাড়ি যাও। আমি আর হাসতে পারছি না। আমার পেটে ব্যথা ধরে গেল।

মহীতোষ পারেও বটে। ১৯৪৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের একটি হাস্যকর ঘটনা মুহূর্তে জীবন্ত করে তুলে ধরে। কথা বেচে খাওয়াই তার ব্যবসা। অনেক কিছু মনে রাখে। রাতে রং দিয়ে বইটই লেখে। লোকে এখন তাকে লেখক বলতে শুরু করেছে। কেউ কেউ তাকে অবশ্য আড়ালে অন্য কিছু বলে। মহীতোষ এসব টের পেয়েও গায়ে মাখে না।

একদিন নিজের বউকে মাসীমার সামনে বসিয়ে বলল, আমি আবার বিয়ে করব অরুণ।

অরুণ সব জিনিস সিরিয়াসলি নেয়। খবরদার। ও কাজটি কোরো না।

সবচেয়ে শক্তিশালী কাপড় ধোয়ার পাউডার

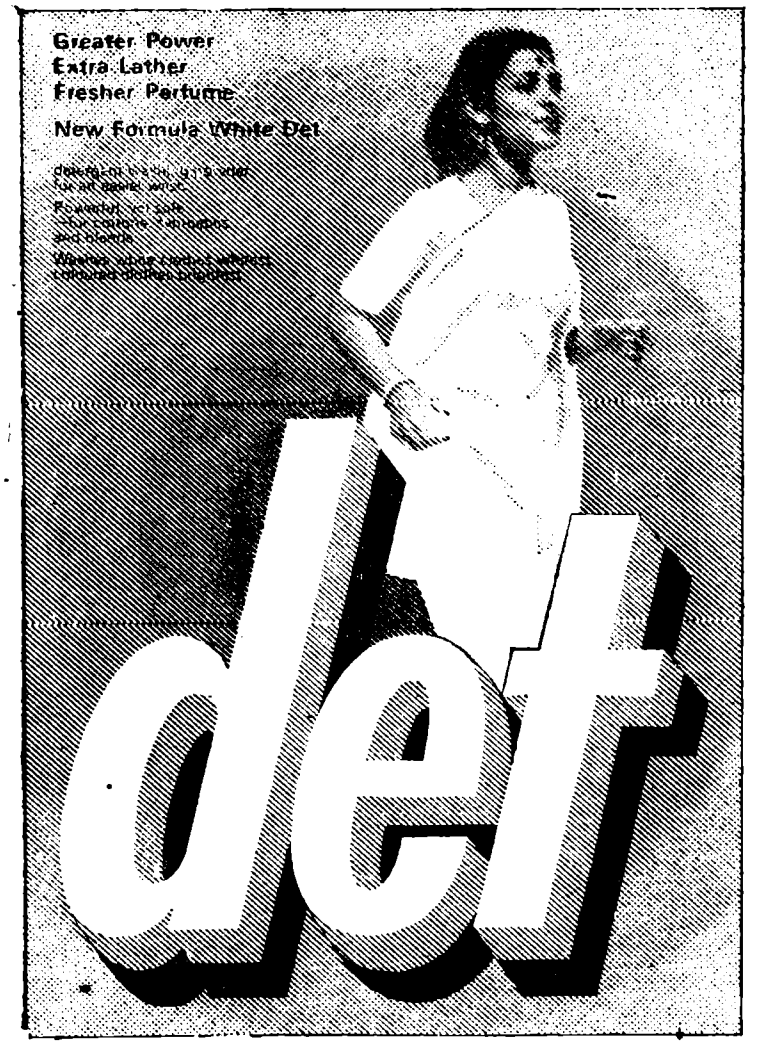

নতুন ফরমুলা ডেট বেশী শক্তিশালী অতিরিক্ত ফেনা সতেজ সুগন্ধ

ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা

Shilpi dm 11b/76 ben

প্রায় অবশুরের ভঙ্গিতে বলল, এমন ভালো বউ থাকতে তোমার যেন মতিচ্ছন্ন না হয়। মহীতোষকে তার বউ চেনে। সে জানে তার স্বামী এই পৃথিবীটাকে একটা ক্লাবের চোখে দেখে। মহীতোষ সেখানে জার্সি গায়ে প্রাকটিস করছে সব সময়। কাল টুর্ণামেন্ট। তাই মহীতোষের বউ এসব কথায় শুধু হাসে।

অরুণ হাফপ্যান্ট-বেলার বন্ধু। মহীতোষের সঙ্গে কলেজেও পড়েছে। তখনকার বৈশিষ্ট্যহীন এই দুই লাস্ট-বেঞ্চারের দিকে কো-এডুকেশন ক্লাসের কেউ ফিরেও চাইতো না।

একদিন অরুণ আর মহীতোষ সিঁড়ি দিয়ে নামছে। ল্যান্ডিংয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। শোনা গিয়েছিল, তার বাবা মিলিটারির কর্ণেল।

অরুণ এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, আপনি আমাদের ভেতর শুধু একজনের দিকে তাকান কেন?

কোথায়? আমি তো তাকাইনি।

তাকাবেন না কেন? তাকাবেন। তবে দুজনের দিকেই তাকাবেন।

মেয়েটি ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আমরা দু ভাই তো। শুধু একজনের দিকে যদি তাকান তো ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয়ে যায়।

মেয়েটি হো হো করে হেসে উঠেছিল।

এসব কথা একদিন অরুণদের দোতলার বড় শোবার ঘরের জমায়েতে মহীতোষ হুবহু মনে করিয়ে দেওয়ায় সবাই হেসে উঠেছিল। হাসলেও অরুণকে ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল।

স্কুল জীবন, কলেজ, বেকার অবস্থায় কলকাতা চষে ফেলার পর সেই মহীতোষ প্রভৃতিরা এতদিনে ক্রমে ক্রমে পিতৃব্য, পিতা, জ্যেষ্ঠতাত, মেশোমশায়, পিসেমশায় ইত্যাদি হয়ে গেছে। এদের ইনসিওরের বয়স সতের আঠারো। ব্লাডে কারও কারও ক্লোরোস্টাল পাওয়া যাচ্ছে।

মহীতোষ এ-সবই তুচ্ছ করে একদিন গরম কালের রাত সাড়ে দশটায় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে অরুণের সঙ্গে আড্ডা দিতে এল। যাবার আগে অরুণের মুখে হাসি দেখবার জন্যে মহীতোষ তার মেয়েকে বলল, তুই নাচ। আমি তোর সঙ্গে নাচবো।

অরুণের সে কি হাসি। মা একবার দেখে যাও। মহী তার মেয়ের সঙ্গে নাচছে। হাসতে হাসতে অরুণ নিজের উরুতে নিজেই থাপ্পড় মারছিল।

মাসীমা শুয়ে পড়েছিলেন। উঠে এসে বললেন—ওভাবে নেচো না বাবা। কোমরে কোঁথায় আচমকা চোট পেয়ে যাবে।

অরুণ জানে মহীতোষ আসলে একজন এক নম্বরের চোট খাওয়া মানুষ। ওর একটা রোগ আছে। কলিক। তার নাম, মহীতোষের ভাষায় বন্ধুত্ব বা ভালবাসা বা মেশামিশি। অরুণ জানে এই জিনিসটি হোভি ডোজে করতে গিয়েই ও সর্বস্ব গণ্ডগোল করে ফেলে। তখন ওর বুকে প্লুরিসি হয়ে যায়। আবার কিছুকাল পরেই এই রোগ দেখা দেয় মহীতোষের। এভাবে মহী অনেক জায়গা ও মানুষ পালটেছে। যেমন—বীরেন চাঁপাডাঙ্গা, সোমনাথ বারাসত অমল...

অরুণের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছিল। অনেকদিন পরে কিছুদিন ধরেই মহী ফিরে ফিরে আসছে। তার সঙ্গে মহীতোষের ভালবাসাবাসি হচ্ছে। ঘট করে একটা গণ্ডগোল শুরু হলেই মহীতোষ কলকাতার এদিকটা এবং তাকে ফেলে দিয়ে চলে যাবে। আর আসবে না। অরুণ পিতা-পুত্রীর ভারতনাট্যম দেখতে দেখতেই বুকের ভেতরে একটা ভয়ের গুড় গুড় শুনতে পাচ্ছিল। ভয় তার বুকে মেঘের মতই আগাম ডাকে।

মহীতোষ এক একদিন মাসীমাকে গম্ভীর মুখে বলে কিছু ভালো লাগে না মাসীমা।

অরুণ প্রবোধ দেয়। খাটে বসে সিগারেট খেতে খেতে। দুজনকেই মাসিমা তার সামনে সিগারেট খাওয়ার পারমিশন দিয়ে রেখেছেন। ডাক্তার অবশ্য অরুণকে বলেছেন দিনে পাঁচটার বেশি নয়। অরুণ কখনো মানে। কখনো মানে না।

মহীতোষকে অরুণ বলে—এ তোমার দুঃখ বিলাস। এত সুন্দর দুই ছেলে-মেয়ে লক্ষ্মী বউ পাকা চাকরি ধানের জমি নিজের বাড়ি নিজের গাড়ি সুনাম। আর কী চাও জীবনে? আদর করে শেষ ধমকে ওঠে। হ্যাংলা! লোভী! সেই তুলনায়—

মহীতোষ এমন বৈঠকী কথাকে সিরিয়াস মোড় নিতে দিতে রাজি নয়। অরুণ যদি এখন তার নিজের কথায় চলে যায়—তাহলে তো হাওয়া দিয়ে পাথর কুচি ঝরে পড়তে থাকবে। অরুণ তো বলতে পারে আমার কি নেই মহী? আমার তো সব আছে। তবু কিছু নেই।

মহীতোষ জানে মাসিমা তিল তিল করে অরুণের চারদিকে যে জিনিসের পাহারা বসিয়েছেন—তার নাম নিরাপত্তা। বাংলায় যাকে বলে সিকিউরিটি। এই নিজের বাড়ির একতলায় লন্ড্রী দর্জি ডাক্তারখানা। বিছানার পাশে টেলিফোন। ব্যাংকের সুদ। বাড়িতে গ্যাসের লাইন। হালকা চাকরির মাঝারি মাইনে। অরুণ অন্ত প্রাণ ছোট ভাই বোন ভগ্নীপতি। সর্বোপরি তিনি নিজে বড়ছেলের মাথার ওপর ছাতা ধরে আছেন। মাঝে মাঝে ই সি জি হয়। প্রেশার চেকের কামাই নেই কোন। অরুণ রীতিমত ফর্সা। আজও সম্ভবত চন্দনের গুঁড়ো মাখে গায়ে। ও যে [illegible]

সোজাসুজি কোন কলিশন করেনি। কলিশনে যায়নি।

মহীতোষ দুঃখী দুঃখী মুখভঙ্গী করে বলে—আরেকবার বিয়ে করব।

সেইটেই বাকি আছে!

না মাসিমা। বউ বেশ চাকরি করবে। মাস গেলে কড়কড়ে একশো টাকার কখানা নোট এনে হাতে দেবে।

মাসিমা খুব সিরিয়াস হয়ে বলেন—অমন ভালো বউ পেয়েছো—কোথায় মাথায় করে রাখবে তা নয়।

মহীতোষ জানে অরুণের মা-বাবা জীবন শুরু করেছিলেন খুবই সুন্দর। ছোট শহরে নদীর ধারে ছিমছাম বাড়ি। ভাল চাকরি। বড়ছেলে অরুণকুমার রায় ক্লাস ফাইভে পড়ে। তার সহপাঠী মহীতোষ।

যুদ্ধ এসেছিল ওদের ক্লাশ সিকসে। ব্ল্যাক আউট। সোলজার বোঝাই দশ চাকার লরি। অরুণ ক্লাশ নাইনেই নদীর ঘাটের নির্জন রাস্তায় জেলখানার ঘাটে বিকেলে চশমা চোখে হাঁটতে লাগলো। রাস্তার দুধারে কয়েদীদের বসানো ঝাউ-গাছ। সর্বক্ষণ বাতাস পেয়ে সন সন বেজে যাচ্ছে। খেলে ফেরার পথে অরুণকে দেখতে পেয়ে মহীতোষ বলেছিল তুই নাকি কবিতা লিখিস আজকাল। দেখাবি একটা?

লিখি নারে! এসে যায়।

শোনাবি?

এমন কিছু না।

জিন্নার মৃত্যুর কদিন পরে মহীতোষ একদিন একটা গল্প পেয়ে গেল কলেজের ওয়ালপেপারে। লেখক—অরুণকুমার রায়।

তার তিনদিনের দিন পার্কের বেঞ্চে অরুণকে পাকড়াও করলো মহীতোষ। কাকে নিয়ে লিখেছিস? রোল সেভেনটিন?

বুঝলি কি করে?

ডেসক্রিপসন থেকে। কথা হয়েছে তোর সঙ্গে?

না আলাপ হবে কি করে? কোন চান্স নেই। ওর এক সাবজেকট। আমার আরেক—

চল তবে আলাপ করে আসি।

দরকার নেই। এই ভালো।

কীরকম তুই অরুণ? এর কোন মানে বুঝিনে আমি।

তুই বুঝবিনে মহী। আমরা দু রকম লোক।

সেদিন মহীতোষের অভিমান হয়েছিল। অরুণ থেকে তার ভিন্ন হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। ভিন্ন হলেও তা স্বীকার করার ইচ্ছে তো ছিলই না মহীতোষের।

বন্ধুদের মধ্যে অরুণ প্রথম হাওয়াই চপ্পল পায়ে দেয়। ফরসা পা। তাতে নতুন ধরনের স্লিপার। সম্ভবত কলকাতায় অরুণের পায়ে ও জিনিসটি প্রথম দেখা যায়। বেশ স্টাইলিশ ফুল

অরুণ থেমে থেমে কথা বলতো। আসুন না একদিন আমাদের বাড়ি। বিকেলের দিকে আসবেন। দরজায় বেল টিপলেই দোতলা থেকে নেমে আসবো।

কী গলার স্বর অরুণের। গম্ভীর। গাঢ়। মধুর। একদম অন্যরকম।

শীতকালের দুপুরে মহীতোষের অফিসের বাইরে ফুটপাথে বেণ্ড পেতে ঘুগনি বিক্রি হয়। অরুণ আসে এক একদিন। মহীতোষ তাকে নিয়ে বেণ্ডে বসে গরম শালপাতায় ঘুগনি খায়। এই সামান্য জিনিস অরুণ এত সুন্দর করে তারিয়ে তারিয়ে খেতে জানে—যেন কোন এক্সাই ব্যাংকোয়েটে বসেছে দুজনে। সেখানে মহীতোষ তার নতুন গল্পের শেষটা পড়ে শোনায়। পাণ্ডুলিপি থেকে।

অরুণ চুপ করে শুনে আস্তে আস্তে তারিফ করে। বোঝা গেল না মহী। তোকে বোঝা গেল না। দারুণ হয়েছে।

ওর বলবার ভঙ্গীতে তাকানোর কায়দায় সাধারণ গল্পটা দুর্ষর্ষ হয়ে ওঠে। যেন বা গল্পগুচ্ছের মাস্টারমশাই গল্পটা লিখে মহীতোষ এইমাত্র অরুণকে শুনিয়েছে। অরুণই তার প্রায় সব লেখার প্রথম শ্রোতা।

লিখতে শুরু করে অরুণ প্রথম। মাসিক দৈনিক সাপ্তাহিকে অরুণকে দেখা যেতে লাগলো। ছাপার অক্ষরে। একবার এক বিখ্যাত মাসিক কবিতা ছেপে পয়সা দিল না। সে মাসের কাগজখানা ফ্রি দিল।

অরুণের একটা গল্পের নাম হল পূব। অরুণ বলল—শেষটা ও স্বপ্নে পেয়েছিল। প্রায়ই ও বলতো ভালো লিখতে হলে কি কি করতে হয়। সাউথ কলকাতার প্রায় রেস্তোরাঁই ওদের দুজনকে চিনতো। বালক বয়সের সঙ্গে একটা রফা হয়ে যেত অরুণের। কীভাবে চা দিতে হবে—সঙ্গে কোন বিস্কুট—প্লেটে একটুও পড়বে না—আবার চিনি ও দুধের মাত্রা কোন মাপে লিকারের সঙ্গে মিশে যাবে—তার একটা ছোট বক্তৃতা অরুণ ওদের দিয়ে দিত। ইয়ার্কির মাত্রা বেড়ে গেলেই রেস্তোরাঁ পালাবার সময় এসে যেত। এক একটা ঘুপচিমত লিকলিকে রেস্তোরাঁর টেবিল চেয়ারে কত কবিতা কত গল্পের লাইন মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। উনিশ তেইশ ঐসব বয়সের কনইয়ের দাগ ওসব টেবিলে খুঁজলে এখনো পাওয়া যাবে।

মহী এক সময় বছরে তিন চারবার প্রেমে পড়তো। তাতে সবসময়েই যে কোন মেয়ের ভূমিকা থাকতো তা নয়। বরং প্রেমের পাত্রী সে মেয়ে অনেক সময় মহীর এই বিবাট কাণ্ডের কোন খবরই জানতো না। প্রতিটি প্রেমের খুঁটিনাটি সে অরুণকে শোনাতো। শুনে অরুণ বলতো এতো বিশাল ব্যাপার। কী করছিস কি! লেগে যা। এসপার নয় ওসপার। একটা কিছু করে ফেলতেই হবে।

মহীতোষ অনেক পরে গল্প লিখতে আসে। তার লেখার কথা নয়। কলকাতায় এসে স্কুলের শেষ ধাপে সে ফাঁকা ট্রাম লাইনে চাকা চালানো। তারপর গুণ্ডা হিসাবেই মহীতোষের কিছুটা নাম হয়। কলেজের শেষের দিকে একটা প্রেমে গাঁট্টা খেয়ে টাইফয়েডে শুয়ে থেকে সে একখানি গল্প লিখে ফেলল।

শ্রোতা অরুণ। ভোরবেলা। দেশপ্রিয় পার্কের শিশিরভেজা ঘাসে বসে পড়ে শুনিয়েছিল মহীতোষ। এরপর অন্তত তিরিশটি গল্প বারোটি উপন্যাসের প্রথম তিন চ্যাপ্টার অরুণ শুনেছে। গত প্রায় পঁচিশ বছরে। শুধু মহীতোষের নয়। অনেকেরই শুনেছে অরুণ। ঢাউস ঢাউস গল্প। পেল্লাই পেল্লাই উপন্যাস। কোনদিন না বলেনি। নিজেও শুনিয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু শোনার তুলনায় তা নগণ্য।

মহীতোষ তেমন খেতে পারতো না। খেলে বমি হয়ে যেত। কষ্ট পেত। সেই অবস্থায় অরুণ মহীতোষকে দোতলায় ওর বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়েছে।

একবার বিদেশীদের জাহাজ এল গঙ্গার ঘাটে। সবাইয়ের জন্যে পাটাতন পেতে দিল। মহীতোষকে নিয়ে অরুণ ভেতরে গিয়েছিল। জাহাজটার বয়স সত্তর বছর। আগে যেভাবে চালান হোত তার ছবি আঁকা দেওয়ালে। বেলচা হাতে যারা কয়লা দিত বয়লারে—তাদের একখানা ছবি দেখিয়ে ক্যাপটেন বলেছিল—স্টোকার।

জাহাজ থেকে বেরিয়েই অরুণ অন্তত তিন বছর নিজেকে আর মহীকে স্টোকার বলে ডাকতো। ওরা দুজন এই কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে চেঁচিয়ে উঠতো—স্টোকার! স্টোকার!! অদৃশ্য বয়লার অদৃশ্য কয়লা দিয়ে যাচ্ছে।

মহীর জীবন পালটে যাচ্ছিল। বিয়ে করল। অরুণ বলল—বউ কেমন লাগে?

বুঝি না ঠিক। অন্য একজন লোক আর কি!

একই খাটে শুতে হয়। জীবনের মাঝখান থেকে। অসুবিধে হয় না?

একটু আধটু হয়। পরে বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে।

পরে অনেক জিনিসই মহীতোষের ঠিক হয়ে যেতে লাগলো। যেমন দুটির শিশুর বাবা হওয়া বউয়ের হাতের রান্না নিয়মিত খাওয়া। ইনসিওরেন্স। উপন্যাস লেখা।

অরুণ পালটালো না। যা ছিল তাই থেকে গেল। শুধু বয়সটাকে আটকাতে পারলো না। ফলে রেস্তোরাঁ কমে গেল। দেখা সাক্ষাতও কমে গেল। অরুণের বৈঠকখানায় নতুন নতুন ছেলেরা গল্প লিখে এনে শোনাতে লাগলো। অরুণের কবিতা শুরুতে ছেপে লিটিল ম্যাগাজিনগুলো বাজারে বেরোতে থাকলো। ছোট-ভাই ভুলুর বিয়েতে তিনশো ফিফ্‌টি অর্ডার ছিল। ম্যারাপ বাঁধা হোল ফুটপাথে। অরুণ ভাসুর হল।

দ্বিতীয় স্ট্রোকের পর অরুণ হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে মাসিমা আর কোন রেস্ট্রিকশন শুনলেন না। বললেন, তোর খেতে ইচ্ছে হলে বাড়ি বসেই খা।

একা খেতে ভালবাসতো না বলে জিনিসপত্র নিয়ে মহীর বাড়ি চলে গেছে। খবর পেলে মহী নিজেও আনিয়ে রাখতো।

একদিন বলল, ভাবছি বিয়ে করব।

মেয়ে পেয়েছিস?

একটা খবর এসেছে। ডাকঘরে কাজ করে। চাকরিতে সিনিয়র।

তাহলে তোর দেখাশুনো ভালই পারবে।

ভয় লাগে। যদি অ্যাডজাস্ট না হয়।

ওসব নিয়ে অরুণ যারা ভাবে—তারা অ্যাডজাস্ট করতেই জানে না। আমি তো বেলার ব্যাপারে কোন দিন কোন কিছুই ভাবিনি। ফলে অসুবিধেও হয়নি।

বেলা ওদের গ্লাসের পাশে মাছভাজার প্লেটটা এনে সাজিয়ে দিল।

আমার মনে হয় অরুণ—তার আগে মাসিমার আঁচল থেকে তোর বেরিয়ে আসা দরকার।

অরুণ চুপ করে থেকেছে।

আমিও আমার মাকে ভালবাসি। সবাই বাসে। আমার তো মা নেই। তবু বলি যার যার নিজের গ্রোথের জন্যে নিজের তৈরি আকাশের নিচে একা এসে দাঁড়াতে হয়। ভিজতে হয়।

হয়তো ঠিক। হয়তো ঠিক নয়। জানিস মহী—আমাদের অফিসের রিজিওন্যাল ম্যানেজার লোকটা আমাকে ভীষণ ভালবাসে। এখন বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তাতে হয়তো লোকটা একা একাই ডালহৌসি পাড়ায় হেঁটে হেঁটে ভিজছে। আমি অফিসে থাকলে নিশ্চয় বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়তো না। আমার টেবিলে এসে বসতো। কত লোকের ওপর যে মায়া পড়ে গেল পৃথিবীতে এসে। শুধু ওঁর কথায় আমি ডিব্রুগড় যাচ্ছি।

কবে ফিরবি?

সাত-আট দিনের ভেতর। আর আমি বাইরে যাবো না। বাইরে আর আমার ভালো লাগে না।

এক রবিবার অরুণদের বাড়ি গিয়ে শুনলো, অরুণ ফেরেনি। শীগ্গির ফিরবে। সুপ্রিয়াদের পেল মহীতোষ। ওরা নুন শোয়ে সিনেমায় যাবে সবাই। তাই তৈরি হচ্ছে।

মহীতোষ ফিরে এল। একটা গল্প আধখানা লেখা হয়ে গেছে। অরুণ থাকলে শুনিয়ে বুঝতে পারতো—ছিঁড়ে ফেলে দেবে? না, লিখে শেষ করে ফেলবে।

ডিব্রুগড়ে কলেজ পাড়ার কাছেই অফিস বাড়ি। তার সামনের রাস্তা দিয়েই এয়ারপোর্টে যেতে হয়। বাড়িটার সামনে

ঠাসা ঘাসের মাঠ। দোতলা ছিমছাম বাড়ি। ফারনিশড্। দু-তিন দিনে অটো-রিকসায় শহরটা চষে ফেলল। বিরাট ব্রিজ। একটা নদী। থমথমে ঘুমন্ত পাহাড়। মেঘলা আকাশ। অরুণ তার শোবার ঘরে বসে মাকে চিঠি লিখলো।

আজ আকাশটা মেঘে ভারি। মনও। ভেবেছিলাম কলকাতার একটা চিঠি পাবো। কাল সারা রাত্তির ঘুম হয়নি দুশ্চিন্তায়।

অফিসের কাজ প্রায় শেষ। এখন অপেক্ষা করে আছি ফেরবার প্লেন ভাড়াটার জন্যে। এলেই উড়বো।

এবারে কিছুই দেখা হল না। না শিলং, না কামাক্ষ্যা। দু-একদিন হাতে অবসরও ছিল। তবু মন চাইলো না। অনেক কিছুই যেমন পাওয়া হল না জীবনে তেমনি দেখাও বাকি রয়ে গেল অনেক কিছু।

আমি যে জানলাটার পাশে বসে চিঠি লিখছি তার সামনে মস্ত একখণ্ড জমি। অদ্ভুত সুন্দর ডালপাতা ফুল ভরা গাছ আছে একটা। তবু তেমন ফুলগাছ নেই। শুধু বাগানের বেড়ার গায়ে বিস্তর জবা ফুটে আছে। এত বেশী জবা ফুল ফোটে এখানে—ফুটেই থাকে, কেউ তুলে নিয়ে যায় না পুজোর জন্য। একটু দূরে টিলাটার ওপর দোতলা একটা হলুদ-বাড়ি একলা দাঁড়িয়ে। কারা যে থাকে ওখানে। রাতে দেখেছি আলো জ্বলে।

শহরের রাস্তায় এ পর্যন্ত দুজন ভিখারীর দেখা পেলাম। শহরটা মস্ত আর ছড়ানো। দূরে দূরে বাস যায়। অটো-রিকসা। শহরের রাস্তায় মেয়েদের প্রতাপ খুব বেশি। এখানকার অফিস কাছারিগুলো চোখে না দেখলে ভাবা যায় না এত সুন্দর। মস্ত একটা নদী শহরের গা ঘেঁষে। ছিমছাম বাড়ি ঘরের পাশে ছিমছাম রাস্তা।

এখানকার কটন কলেজটা দেখবার মত। বিদেশের ইস্কুল কলেজের দেখা ছবির মতোন। ছেলেদের পোশাক-আশাক ভয়ংকর আধুনিক। চায়ের দোকানে শুধু আদা দেওয়া চা পাওয়া যায়।

সব হোটেল কেমন জানি না। তবে একটা মাড়োয়ারি ভোজনালয় বড় চমৎকার। তিন টাকা দিয়ে যত ইচ্ছে ভাত, তরকারি, ডাল, আচার, পাঁপড় আর দই লওয়া যায়। সব নিরামিষ। কিন্তু রান্না চমৎকার। এই প্রথম কোন হোটেলে জোর করে খাবার দিতে দেখলাম। না চাইলেও খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে।

সনৎ বলে যে ছেলেটি আমাদের অফিসের ম্যানেজার সে এত সুন্দর আর স্মার্ট যে তার সঙ্গে রাস্তায় বেরোতে ইচ্ছে করে না। বয়স বড়জোর বাইশ তেইশ। দেখতে একেবারে রাজেশ খান্না। সনতের বাবা বেল কোম্পানির একটি কিউটিভ। ওদের বাড়ি রাতে একদিন নেমন্তন্ন ছিল। মা, বাবা আর ভাই তিনজনই বড় ভালো।

সিনেমা হলগুলো বাজে। কালিকা মার্কা।

সুপ্রিয়ার জন্যে এখানকার মেয়েদের পোশাক কিনবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পছন্দ হবে কিনা ভেবে কিনলাম না। গরদের ঝালর দেওয়া সায়ার ওপর সিল্কের মেখলা। মেখলা হয়তো হাত পাঁচেকের মত হয়। গায়ের ওপর শাড়ির আঁচলের মত পেঁচিয়ে থাকে। খুব সুন্দর আর শালীনতার পোশাক। বরং শাড়িতে যতটুকু বে-আব্রুপনা আছে—মেখলায় তা নেই।

অমিতাভর জন্যে আসাম হ্যান্ড-লুমের সিল্কের একটা কাপড় পছন্দ করে রেখেছি। আমার ফেরার ভাড়াটা এলে নিশ্চিন্ত হয়ে কিনবো। কেননা সতেরো টাকা করে মিটার কাপড়টার।

তুমি যা টাকা দিয়েছিলে তার মধ্যে গোটা চল্লিশ টাকার মত খরচ হয়েছে—পুরোটাই প্রায় রয়ে গেছে। শিলং না গেলে কিছু কিনবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু তোমার বা সুপ্রিয়ার জন্যে কি কিনবো বুঝে উঠতে পারছি না। কিছু কিনে শেষে না বোকা হয়ে যাই।

তুমি, সুপু, অমিতাভ, ভুলু, বউমা সবাই দল বেঁধে এলে খুব ঘোরা যেত। এত কিছু দেখবার আছে এখানে বা আশে-পাশে। থাকবার জায়গাটা ঠিক থাকলে রেঁধে খেলে বোধ হয় খুব বেশি টাকা লাগবে না। আমার ফিরতে হয়তো শনিবার হবে—জানি না।

মালিগাঁও থেকে ফিরবার পথে নির্জন রাস্তায় একটা উঁচু টিলার গা ঘেঁষে সূর্য যখন দাঁড়িয়ে—সুন্দরকে দেখলাম। ধুলোর ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে একটা মস্তো ঘোড়া, শুনো পা চারটে আছড়াচ্ছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, জলভর্তি। হয়তো ঘোড়াটা মরছে, হয়তো বা দিচ্ছে গড়াগড়ি, ঠিক জানি না, অটো রিকসাটা দাঁড় করিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম দৃশ্যটা। আশ্চর্য! সূর্যটা ডুবে গেল নিমেষে। এমন অকল্পনীয় সুন্দর দৃশ্য আগে দেখেছি বলে মনে হল না। চোখে জল এল আমার।

এ শহরে এত যে জবা ফুল ফোটে, কার পুজোয় লাগে তারা?

অরুণ

দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটালো অরুণ। মাড়োয়ারি হোটেলের ছোট ছেলেটি এত যত্ন করে খাওয়ায়। এখানকার দইয়ের স্বাদই আলাদা। ঘুমের ভেতরে ওর বুকের দেওয়ালে ঘোড়াটা দু-চার পা আঁচড়াতেই অরুণ জেগে গেল। অন্ধকার বিকেল। পাশের বাড়িতে সকালেই আলো

আসছে বড়দিনে

ধীরেশকুমার চক্রবর্তী প্রযোজিত

স্বদেশ সরকার পরিচালিত

সৌমিত্র আরতি বিকাশ হারাধন তরুণ/অনু শম্ভু/এবং সুব্রতা ও দিলীপ রায়

অভিনীত

নন্দিতা

মূল কাহিনী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সংগীত সুশীল ব্যানার্জী

• চিত্রনাট্য ও গীত পুলক ব্যানার্জী •

ডি.কে.ফিল্মস এন্টারপ্রাইজ পরিবেশিত

চিত্রশিল্পী । কৃষ্ণ চক্রবর্তী

সম্পাদনা । অমিয় মুখার্জী

ভেতরে। ডাক দেখলো। না। কোন চিঠিপত্র আসে নি। মাকে লেখা চিঠিখানা রাস্তার মোড়ে একটা পাহাড়ি গাছে লটকানো লাল ডাকবাকসে ডালা তুলে ফেলে দিয়ে এল।

এসে আর ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে হল না অরুণের। লনের ঠাসা ঘাসে শুয়ে পড়ল। এখন পৃথিবী তার পিঠের নিচে পিছলে গিয়ে অনবরত ঘুরছে। অথচ সে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে না। ভূগোল বইয়ের কথা তাহলে মিথ্যে? আকাশে একটাও তারা নেই।

কতক্ষণ এভাবে শুয়ে ছিল তা মনে নেই অরুণের। একটা অসম্ভব ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমিয়ে পড়বার আগে ভেবেছিল—উঠে গিয়ে শোবার ঘরের তাক থেকে ছোট বোতল একটা চেলে নিয়ে খাবে। খাওয়া হয়নি। ঘুমিয়ে পড়েছিল। শহরের গায়ের পাহাড়টা দিব্যি মেঘের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আজ সকালেও ওদের আলাদা করা যাচ্ছিল।

আর ভাবতে পারলো না অরুণ। কলকাতা কতদূর। কতদূর? টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। আশে পাশে কেউ নেই। অফিসবাড়ির ছোকরা চাকরটা নিশ্চয় এখনো ফেরে নি বাজার থেকে। ফিরেই 'বিবিধ ভারতী' ধরবে।

অসময়ে আলোজ্বলা পাশের বাড়িটা বিরাট হয়ে দুলে উঠলো চোখের সামনে।

অরুণ বুঝতে পেরেছে। সে এসেছে। এসে গেছে। কলকাতা কন্দুর? কন্দুর?

প্রথমে দুটো চোয়াল পাথর হয়ে গেল। তারপর কেউ খুব জোরে তাকে ঠেলে ধরে তারই বুকের আগাগোড়া পর্যন্ত শুধু পাথর। শুধু পাথর। আঃ!

সামনের দরজা খুলে অরুণ ছিটকে ঘরের ভেতরে ঢুকলো। সেখানে কেউ থাকলে নির্ঘাৎ তাকে ফাঁকা সন্ধ্যার ডাকাত বলে ধরে নিতে পারতো। কিন্তু কেউ ছিল না।

সে যখন আসে এমন আচমকাই আসে।

অরুণ ফাঁকা চেয়ারটায় বসেই ডান হাতখানা এগিয়ে দিল পাশের টেবিলে। কালো জিনিসটা যদি ধরা যায়। সামান্য একটা টেলিফোন। অথচ হাত পৌঁছচ্ছে না।

মা-আ-মা। ডা ক তা র বা বু—

ডানবুকের দুখানা পাঁজর বেঁকে গিয়ে জল ঢোকার রাস্তা সহজ করে দিল। অরুণ সে জল আটকাতে পারলো না। অচেনা অজানা বাড়িটার বসবার ঘরখানা তার চোখের ঠিক নিচে দাড়ি কমার মত ঘনিয়ে এল।

একজন মহিলা দোতলা থেকে শব্দ পেয়ে নিচে নেমে এলেন। এসে অবাক হলেন। ভয়ও পেলেন। একজন ভদ্রলোক মত অচেনা লোক তাদের বসবার ঘরের টেলিফোনে বসবার চেয়ারখানায় শক্ত, সিধে হয়ে বসে আছেন। চোখে চশমা। কোলের ওপর রিসিভারটা।

মাসিমা টেলিফোন পেলেন ভোর পাঁচটায়। অরুণের কলকাতা অফিসের রিজিওনাল ম্যানেজার জানালেন। মহী ফোন পেল ছটায়। গিয়ে দেখলেন, লোক রওনা হয়ে গেছে। অরুণকে ডিব্রুগড়েই দাহ করা হবে।

কারণ, ট্রেনে আনলে অনেক ঝামেলা। বডি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্লেনেও ঝকমারি অনেক। অতএব।

সব শুনে বেলা বলল, ওদের অফিসের এটা গুরুতর অন্যায়; যেভাবেই হোক বডি এনে দেওয়া উচিত ছিল। বিদেশে। একা। কেউ চেনে না। একটা অজানা শ্মশানে—

মহীতোষ কোন কথাই বলতে পারলো না ও বাড়ি গিয়ে দেখলো, মাসিমা বলছেন—আমার অরুণ কাউকে তুমি বই তুই বলতো না। পাছে তার মনে লাগে—

মহীতোষ বুঝলো, মাসীমার কাঁদা দরকার। তার নিজেরও দরকার। বাড়িতে বেলা আবার সেই কথা বলল, ওদের অফিসের উচিৎ ছিল—

মহীতোষ ভাবলো, বেলা যেন কোন ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের পর মৃতদেহ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের গাফিলতি নিয়ে আইনের, মানবতার কূটকচালি ঘাঁটছে।

সন্ধেবেলা ডিব্রুগড় থেকে টেলিফোন এল। কাজ শেষ।

একতলায় যে ঘরটায় একদা অরুণের বাবা বসতেন—এক সময় অরুণও বসেছে তাদের নিয়ে—সে-ঘর সুপর্ণা আর অমিতাভ খুলে পরিষ্কার করাচ্ছে। আগের মতই সাত-আটখানা চেয়ার, জলের জাগ, দু তিনটে গ্লাস টেবিলে। জানলাগুলো খোলা। অরুণ আর মহীতোষের বন্ধুরা খবর পেয়ে অফিসের পর একে একে এসে বসছে। আগের মতই। কেউ কেউ সস্ত্রীক।

পাড়ার ইলেকট্রিক দোকানের ছেলেটা ভাড়ার পাখা টানিয়ে দিয়ে সুইচ টিপলো। হাওয়া পাচ্ছেন সবাই?

কেউ হ্যাঁ বলল। কেউ মাথা নাড়লো।

মা বলেছেন, ছাপ্পান্ন ইঞ্চি দিতে। আটচল্লিশই দিলাম।

ঠিক আছে। ছেলেটি টেবিল মুছে

ঘণ্টাখানেকের ভেতর ঘরে অরুণের বিষয়ে আলোচনার গুঞ্জন উঠলো। মহীতোষ, তপন, রণজয়, শ্যামাপদ, হেমন্ত, হেমন্তর বউ, নবীন—সবাই তার সঙ্গে অরুণের এক-একটা প্রসঙ্গ—এক-একটা দিন বা দুপুর—কিংবা বিকেল তুলে ধরছিল। আর সেই সঙ্গে ৬১, ৬৭, ৫৮, ৫৩,৭১ ইত্যাদি সাল উঠে আসছিল। তার ভেতরে মহীতোষ পাকা স্মৃতিচোর হিসেবে কখনো ৪৩, ৪৫ আবার কখনো এই ইদানীংকার ৭৩, ৭৪ গুঁজে দিচ্ছিল। কাউকে বুঝতে না দিয়ে। নিজে না হেসে—বা কেঁদে। এই স্মৃতিচারণের একটি চেয়ার খালি রয়ে গিয়েছিল। সেটায় অরুণ বসতো। এখন কারো মনেই নেই—যে ওখানে আদপেই অরুণ বসে নেই। প্রায় সবারই জীবনের অনেকটাই রয়ে গেছে। তবু যে কত কথা, উঠে আসছিল। তা থেকে মহীতোষ সাবধানে একটু একটু করে নানা খবর কুড়িয়ে নিচ্ছিল।

তারপর এক সময় মহীতোষ মেজালিন ফ্যারোর ঘরটায় উঠে গিয়ে আজকের রাতের খবরের কাগজে পাঠাবে বলে অবিচিউয়ারি লিখতে বসলো। নিচের ঘর থেকে আলোচনার টুকরো টুকরো এ-ঘরেও আসছে।

মহীতোষ লিখলো —অকৃতদার, সুপুরুষ...তাঁর দরগা রোডের একতলার ঘরে গত পঁচিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের নানা লেখাই পড়া হয়েছে।

ভুলু এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একখানা চিঠি। দাদা লিখেছে। কাল সকালে লেখা। প্লেনে এসেছে বোধ হয়। সন্ধ্যার ডাকে দিয়ে গেছে মহীদা দেখবেন?

চিঠিখানা খুলে নিয়ে বসলো মহীতোষ। অনেক কাজ বাকি। অরুণ হপ্তা দুই আগে বলেছিল, ফোনে, তোর তো অনেক পাবলিশার জানা। আমার একটা ফর্মা সাতেকের নভেল আছে। ম্যাগাজিনে ছেপে পড়ে আছে আজ দু বছর। সেটা যদি ছাপে তারা—

সেটা খুঁজে বের করতে হবে অরুণের টেবিল থেকে। কিংবা তোষকের নিচু থেকে।

চিঠির এক জায়গায় চোখ আটকে গেল মহীতোষের। এ শহরে এত যে জবা ফুল ফোটে, কার পুজোয় লাগে তারা?

মহীতোষ ওদিকটায় ঘুরেছে। জবা নয়। এক রকমের পাহাড়ি ফুল। লাল টকটকে। অজস্র ফুটে থাকে। জবার আরও গাঢ়। বরং কিছু কালচে। অরুণের চোখের মাইনাস পাওয়ার বেড়েছিল। দূর থেকে দেখা। তাই ঠিক আন্দাজ পায় নি। ও তো জীবনে কোন কলিশনে

[..... না জানি কতেক মধু গ্রাম নামে আছে গো .....

অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি পশ্চিমবাংলার পনরোটি গ্রামের (মফঃস্বল শহর বা রেল ষ্টেশন নয়) নাম করতে বলা হয়, তবে কতজন শিক্ষিত শহুরে বাঙ্গালী যে সঠিক উত্তর দিতে পারবেন, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। মফঃস্বলের সংবাদদাতারা তাঁদের যেসব রিপোর্ট খবর কাগজগুলিতে পাঠান তা আসে জেলা-সদর বা মহকুমা-শহরের নামাঙ্কিত হয়ে। সেসব নাম অনেকেই জানেন। কিন্তু, ছোট হক বড় হক, সেগুলি শহর, গ্রাম নয়। মাঝে মাঝে কোন গ্রাম যখন দৈনিকের পাতায় বিখ্যাত হয়ে ওঠে—যেমন চাসনালা বা নকশালবাড়ি —তখন শহুরে বাঙ্গালীর কানে সে-নামগুলি লেগে থাকে বড়জোর সামান্য কিছুদিন। গ্রাম-গ্রামান্তরে সরেজমিন ঘুরে আসা তো দূরের কথা, কেতাবীভাবে তাদের নাম মনে রাখার এই অক্ষমতা বা উদাসীনতা, আমরা, শহুরে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা, গ্রাম-বাংলাকে কত কম জানি তার একটা নির্ভরযোগ্য নিরিখ। স্বীকার করি মফঃস্বলে ঘোরাঘুরি করাটা সকলের হয়ত প্রয়োজন হয় না। তবু, শহরের ঘরে বসেই পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সাড়ে-ছেচল্লিশ হাজার মৌজার (তার মধ্যে কমবেশি একচল্লিশ হাজার গ্রাম অধ্যুষিত) নাম নিয়ে যদি নাড়াচাড়া করা যায়, তাহলে, অন্যান্য নানাবিধ অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার ছাড়াও, অসংখ্য গ্রাম-নামের বিপুল মাধুর্যে—হলফ করে বলতে পারি—আপনি বিস্ময়-বিমূঢ় হবেন এবং বৈষ্ণব পদাবলীর একটি বিখ্যাত পংক্তিকে অনুসরণ করে শ্যাম-এর জায়গায় গ্রাম কথাটি বসিয়ে এ-প্রবন্ধের শিরোনাম রচনায় যে বিশেষ ভুল করিনি, সাগ্রহে স্বীকার করবেন সেকথাও।

গ্রাম-নামের বেলায় যে-অনীহা দেখি, আমাদের বহু নদনদীর কাব্যধর্মী নামের বেলাও কিন্তু ততটা উদাসীনতা চোখে পড়ে না। অজয়, ইছামতী, কর্ণফুলী (অধুনা বাংলাদেশে), কপোতাক্ষ (বর্তমানে বাংলাদেশে), কালিন্দী কুন্তী কুমারী চন্দনা চূর্ণী শ্বারকা শ্বারকেশ্বর পুনর্ভবা ভাগীরথী ময়ূরাক্ষী মহানন্দা যমুনা শিলাবতী সরস্বতী সুবর্ণরেখা—অসংখ্য উজ্জ্বল নামের মধ্যে কয়েকটি—শহুরে বাঙ্গালীরও জানা। তবু তাঁরা গ্রামের সুন্দর সুন্দর নামগুলিকে উপেক্ষা করেন কেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে হয়ত বলা যায়—কাব্যিক নামের নদনদীর মোট সংখ্যা আঙুলে গোণা যায় বলে তাদের মনে রাখা সহজ। কিন্তু সাড়ে-ছেচল্লিশ হাজার মৌজা বা গ্রাম-নামের বিরাট তালিকা থেকে ঝাড়াইবাছাই করে শ্রুতি-সুখকর নামগুলি পৃথক করাই এক রাজসূয় যজ্ঞবিশেষ। তারপরে, নির্বাচিত গ্রাম-নামগুলির কতকাংশও মনে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। কেন না যে-ভূভাগের সীমিতসংখ্যক নদনদীর মধ্যেই উল্লেখ্য নাম এতগুলি, সেখানকার অগণিত গ্রাম নামের মধ্যে কাব্যধর্মী নাম যে অজস্র পাওয়া যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আমাদের গ্রামগুলি চিরকাল অবহেলিত হলেও, অবহেলা দিয়ে বহুক্ষেত্রে তাদের নামের গরিমা খর্ব করা যায় নি। যে-দেশে নদীর নাম হয় কর্ণফুলী, কপোতাক্ষ কালিন্দী ময়ূরাক্ষী বা সুবর্ণরেখা সেখানে অকালমেঘ আশাকুণ্ঠী উছল-পুকুরী কল্লোলী চন্দনপিঁড়ি দুধঝর্ণা নিশিরাগ পরজ পাথরপ্রতিমা বিরহিণী ময়ূরনাচনা শেফালিকাচন্দন সাহানা প্রভৃতি গ্রাম-নামের দেখা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে এসব এবং আরও অনেক কাব্যিক গ্রাম-নামের উল্লেখের সমন্বয় তাদের অব্যবহিত পরে, বন্ধনীর মধ্যে, সংশ্লিষ্ট থানা ও জেলার নাম পরপর দেওয়া আছে যাতে তাদের সঠিক অবস্থিতি কোথায় তা সহজেই বোঝা যায়।

পশ্চিমবাংলার সাড়ে-ছেচল্লিশ হাজার মৌজা-নামের এক বিস্তৃত সমীক্ষা থেকে দেখছি — দেবদেবীসংক্রান্ত গ্রাম-নামের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। আশ্চর্য শোনালেও কথাটা সত্যি যে, এ-রাজ্যে গোপালপুর নামের গ্রাম আছে মোট ১৪১টি (এক নামের বহু গ্রামের তালিকায় এটিরই সর্বোচ্চ রেকর্ড), গোবিন্দপুর ১১৯টি, রঘুনাথপুর ৯৩টি, রামচন্দ্রপুর ৮২টি, জগন্নাথপুর ৭২টি, গোপীনাথপুর ৬৮টি এবং দুর্গাপুর ৬২টি। এ-তালিকা দীর্ঘতর করে লাভ নেই। কেননা, এই শ্রেণীর প্রায় সব নামই পুর, নগর, গঞ্জ প্রভৃতি অন্ত্যাংশ দিয়ে গঠিত এবং হাজার হাজার সেসব নামের মধ্যে ভক্তিরস যথেষ্ট থাকলেও কাব্যরসের গন্ধ পাওয়া যায় না। অতএব এ-প্রবন্ধে আলোচ্য কাব্যিক নামগুলির জন্য আমাদের অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় শ্রেণীগুলিতেই খোঁজ করতে হবে।

প্রথমেই যে-গ্রুপটির কথা মনে আসে তা হল প্রকৃতিসংক্রান্ত। শতেক যুগের কবিরা মিলে গ্রাম-বাংলার ঋতু ও নিসর্গশোভার এত অসংখ্য গীতিকা রচনা করেছেন যে, তার প্রভাব গ্রাম-নামকে স্পর্শ করবে না এমন হতেই পারে না। এই দলের কয়েকটি বাছাই-করা নাম—অকালমেঘ (ডায়মণ্ডহারবার: ২৪-পরগণা), চিকনমাটি (মাল : জলপাইগুড়ি), চৈতালী (বাঁকুড়া : বাঁকুড়া), ধানডালি (শ্যামপুর : হাওড়া), ধান্যশ্রী (নন্দীগ্রাম : মেদিনীপুর), নবঘনপুর (ফরিদপুর : বর্ধমান), পাতাঝরিয়া (শালবন : মেদিনীপুর), পূরবী (স্বরূপনগর : ২৪ পরগণা), বসুধা (কাঁকসা: বর্ধমান), বসুমতী (লালগোলা : মুর্শিদাবাদ), বহুরূপা (নারায়ণগড় : মেদিনীপুর), মেঘডম্বুর (কেশিয়ারী :

ফটো : স্নেহাংশু দে

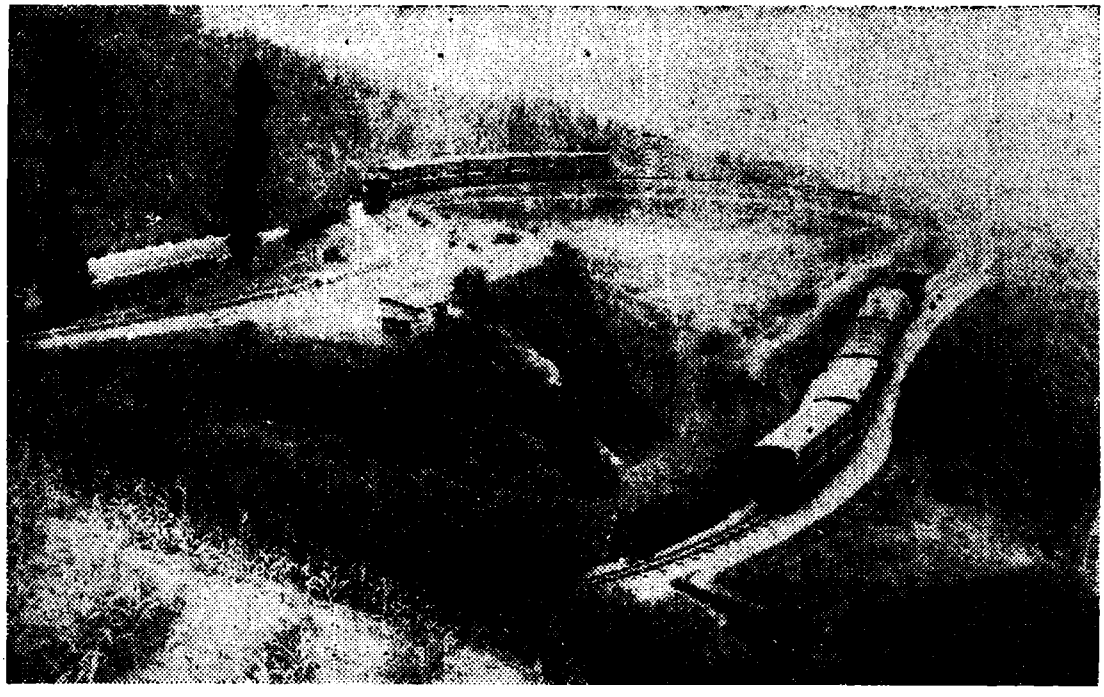

পাড়া : নদীয়া/মালদা : মালদা/সাতুরিয়া : পুরুলিয়া) ও সাতসাগরিয়া (ইন্দপুর : বাঁকুড়া)। পশ্চিমবঙ্গের দূরে দূরে এসব আশ্চর্য নাম যে শুকনো পাতার মত ছড়িয়ে রয়েছে, সেকথা কজন পাঠকপাঠিকাই বা জানতেন? কিন্তু এসব শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়—কতদিন আগে, কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে এসব নামের, তা এক অতি চিত্তাকর্ষক গবেষণার বিষয়। কাজটা আমি হাতে নিয়েছি বটে, তবে তার পরিসর দেখে মনে হয় আমার জীবদ্দশায় এই হৃদয়-গ্রাহী প্রসঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা ছাড়া আর খুব বেশী করে যেতে পারব না। তারপরে থাকবেন মহাকাল ও আগামীদিনের দেশপ্রেমী গবেষকরা। খ্যাতি বা পুরস্কার কামনার উর্ধ্বে থেকে এই মহৎ অথচ দুরূহ কাজটি তাঁরা সুসম্পন্ন করবেন, এমনই আশা করব।

সে যাই হোক, গাছ-ফুল-লতা-পাতাসংক্রান্ত গ্রাম-নামগুলি নিসর্গ শোভার খুব কাছাকাছি বলে এবার সে-প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। সুন্দর নামের এখানেও ছড়াছড়ি। যেমন—ইক্ষু পত্রিকা (ভগবানপুর : মেদিনীপুর), কদমদেউলি (ইন্দপুর : বাঁকুড়া), কমলহীর (শালতোড়া : বাঁকুড়া), কুঞ্জবন (২টি) (বাঁকুড়া : বাঁকুড়া ও তারকেশ্বর : হুগলী), কেতকী (শাঁকরাইল : মেদিনীপুর), চম্পকলতা (শান্তিপুর : নদীয়া), চাঁপাডালি (কাঁকসা : বর্ধমান) চন্দ্রপুর (সাগরদীঘি : মুর্শিদাবাদ), তপোবন (২টি) (ওন্দা : বাঁকুড়া ও নয়াগ্রাম : মেদিনীপুর), দুধকলমি (চণ্ডীতলা : হুগলী), দোলবাগিচা (তালডাংরা : বাঁকুড়া), ফুলকলমি (চাপড়া : নদীয়া) ফুলমালঞ্চ (বাসন্তী : ২৪-পরগণা), মহুয়া (২টি) (রায়গঞ্জ এবং গোয়াল-পোখর : পশ্চিম দিনাজপুর), মালা (বোলপুর : বীরভূম), লবঙ্গ (বাদুরিয়া : ২৪-পরগণা), শালপত্র (সবং : মেদিনীপুর), শিউলি (৩টি) (আউস-গ্রাম : বর্ধমান। সিমলাপাল : বাঁকুড়া/গড়বেতা : মেদিনীপুর), শেফালিকা-চন্দন (তপন : পশ্চিম দিনাজপুর) এবং শ্বেতপলাশ (রঘুনাথপুর : পুরু-লিয়া)। একটি লক্ষণীয় জিনিস হয়ত ইতিপূর্বেই পাঠকের চোখে পড়ে থাকবে —এসব শ্রুতিসুখকর নাম কোন বিশেষ একটি-দুটি জেলার একচেটিয়া নয়; তাদের কিছু-না-কিছু অংশ প্রায় সব জেলার ভাগেই পড়েছে। বিশেষত বন্ধ্যা কাঁকুড়ে মাটির এলাকা বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় কুঞ্জবন, কমলহীর, তপোবন, শ্বেতপলাশ প্রভৃতি গ্রাম-নাম রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

ছোটবড় নদী, ঝরণা বা জলাশয়ের তীরে তীরেই গ্রাম-বাংলার অধিকাংশ জনপদ গড়ে উঠেছে। সেগুলি এসব পল্লীর প্রাণস্বরূপ। সেজন্য তাদেরও প্রভাব যে গ্রাম-নামের উপর পড়বে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বরং জলাভাব যেখানে যত বেশী, সেখানেই এই শ্রেণীর নাম বেশী দেখা যায়। যথা—উজানী (ইটাহার : পশ্চিম দিনাজপুর), উথলদহ (পিংলা : মেদিনীপুর) কল্লোলী (কাশীপুর : পুরুলিয়া), কালিঝরণা (বাঘমুণ্ডি : পুরুলিয়া), গঙ্গাযমুনা (নারায়ণগড় : মেদিনীপুর) জলবিন্দু (সবং : মেদিনীপুর), ঝরণা-ডাঙ্গা (গড়বেতা : মেদিনীপুর), দীঘিরপাড় বকুলতলা (মথুরাপুর : ২৪-পরগণা), দুধঝরণা (রাণীবাঁধ : বাঁকুড়া) ও ময়ূরঝরণা (বিনপুর : মেদিনীপুর)। এসব নামের মধ্যে 'দীঘিরপাড় বকুলতলা' নামটি আমার বিশেষ প্রিয়। কেননা, জল এবং ছায়ার প্রয়োজনে, কোন বিস্তীর্ণ জলাশয়ের তীরে প্রাচীন এক বকুলগাছের নীচে ও আশপাশে যে গ্রামটির একদা পত্তন হয়েছিল, এ-নামের ভিতর দিয়ে তাকে যেন প্রত্যক্ষ করা যায়।

এত সহজে, তৈরী-ডাঙ্গায় গ্রামের পত্তন হয়নি সব সময়। জঙ্গল কাটতে হয়েছে, পুকুর খুঁড়তে হয়েছে, তাড়াতে হয়েছে হিংস্র বনপ্রাণী। এত পরিশ্রমে পাওয়া বসতজমিটুকুতে তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ঘর-গৃহস্থালী। নিদারুণ কষ্টে অর্জিত বলে সেসব গ্রামের প্রতি বাঙালী এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছে চিরকাল। আর চারিদিকের অভাব ও শঙ্কার কালো ছায়ার মাঝখানে এই নিরাপদ আশ্রয়টুকুকে সে নানা প্রিয় নামে ভূষিত করেছে মনের সাধ মিটিয়ে। যেমন—আঁধারনয়ন (গড়বেতা : মেদিনীপুর), আঁধারমানিক (২টি) (মথুরাপুর : ২৪-পরগণা ও বংশীহারী : পশ্চিম দিনাজপুর) আনন্দপাথার (হবিবপুর : মালদা), আলোকবাড়ি (দিনহাটা :

কোচবিহার), উজ্জলমানিক (সাগরদীঘি : মুর্শিদাবাদ) কল্যাণশ্রী (বলাগড় : হুগলী), দীপমালিতা (বাগনান : হাওড়া), প্রাণেরছড়া (দিনহাটা : কোচবিহার) মধুর কোল (ডোমকল : মুর্শিদাবাদ), মনটানি (তুফানগঞ্জ : কোচবিহার), মানিকদীপা (২টি) (গড়বেতা ও দাসপুর : মেদিনীপুর), মৌভাণ্ডার (গোপীবল্লভপুর : মেদিনীপুর), রসপুঞ্জ (বিষ্ণুপুর : ২৪-পরগণা), লাবনি (বিনপুর : মেদিনীপুর), সন্ধ্যাজল (রামপুরহাট : বীরভূম) প্রভৃতি।

নিজের গ্রামের টানের মতই ঘর-গৃহস্থালীর প্রবল আকর্ষণও বাঙালী অনুভব করেছে আবহমানকাল। তাই নানাবিধ গৃহোপকরণের নামও অভিক্ষিপ্ত হয়েছে গ্রাম-নামের তালিকায়। যথা—আলিনা (কুমারগ্রাম : পশ্চিম দিনাজপুর), খেলনা (সবং : মেদিনীপুর), চন্দন (রায়গঞ্জ : পশ্চিম দিনাজপুর), চন্দনপিঁড়ি (নামখানা : ২৪-পরগণা), ঢামরদানী (ভরতপুর : মুর্শিদাবাদ), বরণডালা (মন্তেশ্বর : বর্ধমান), শঙ্খ (বড়বাজার : পুরুলিয়া) শালিখই (মোহনপুর : মেদিনীপুর) ও সোনার চালুনি (শীতলকুচি : কোচবিহার)।

সুবিদিত এক সংস্কৃত শ্লোকে গৃহ ও গৃহিণীকে অভিন্ন বলা হয়েছে। অতএব গৃহিণীর অলংকার যে গৃহোপকরণের শীর্ষস্থানীয় সেকথা বলাই বাহুল্য। সেজন্য বঙ্গনারীর ব্যবহৃত বিবিধ আভরণেরও দেখা মেলে আমাদের গ্রাম-নামগুলিতে। দৃষ্টান্ত—আলতাগ্রাম (ধূপগুড়ি : জলপাইগুড়ি), অলংকার (সাগরদীঘি : মুর্শিদাবাদ), কঙ্কনদীঘি (মথুরাপুর : ২৪-পরগণা), কানসোনা (৩টি) (উলুবেড়িয়া ও উদয়নারায়ণপুর : হাওড়া/বনগাঁ : ২৪-পরগণা), ঝুমকা (সিমলাপাল : বাঁকুড়া), মাকড়ি (গোপীবল্লভপুর : মেদিনীপুর), রূপাহার (রায়গঞ্জ : পশ্চিম দিনাজপুর), শঙ্খহার (বিনপুর : মেদিনীপুর), সিঁদুরগৌর (শঁকরাইল : মেদিনীপুর), সিঁদুরটোপা (সাঁইথিয়া : বীরভূম) প্রভৃতি।

এসব অলংকার ব্যবহার করতেন যে মহিলা সমাজ, গ্রাম-নামে তাঁদেরও বিভিন্ন রূপ বিধৃত। যেমন—আগুনকুমারী (বিনপুর : বাঁকুড়া), কুমারী (৫টি) (মেদিনীপুর জেলায় ৪টি ও পুরুলিয়ায় ১টি), কৃষ্ণকুমারী (বিনপুর : মেদিনীপুর), নবীনা (তারকেশ্বর : হুগলী), নারী (বর্ধমান : বর্ধমান), পইরীকুমারী (কার্শিয়াং : দার্জিলিং), বউঠাকুরাণী (সন্দেশখালি : ২৪-পরগণা), বনকুমারী (গড়বেতা : মেদিনীপুর), বনশ্রীগৌরী (নন্দীগ্রাম : মেদিনীপুর), হীরাপরী (নারায়ণগড় : মেদিনীপুর), হেমকুমারী (৩টি—সব

নারীর রূপ একদিকে যেমন স্নেহ-বাৎসল্য-প্রেম-প্রীতিতে স্নিগ্ধ, অন্যদিকে তেমনি ঈর্ষা-অসূয়া-নির্দয়তায় কঠিন। বিশ্বনারীর প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গনারীর কোমল-কঠোর ভাবমূর্তিগুলিরও প্রকাশ ঘটেছে কিছু কিছু সুললিত গ্রাম-নামে। যথা—আশাকুঠী (বিনপুর : মেদিনীপুর), কঙ্কাবতী (৩টি) (মেদিনীপুর ও চন্দ্রকোণা : মেদিনীপুর এবং কোতুলপুর : বাঁকুড়া), কাঞ্চনা (২টি) হবিবপুর : মালদা ও ময়ূরেশ্বর : বীরভূম), কুন্ডলা (ময়ূরেশ্বর : বীরভূম), চঞ্চলী (মুরারই : বীরভূম), তিয়াসী (সাঁতুরিয়া : পুরুলিয়া), নিদয়া (বাঁকুড়া : বাঁকুড়া), বিদেশিনী (সাঁইথিয়া : বীরভূম), মধুরা (নলহাটি : বীরভূম), মনোহরা (বংশীহারী : পশ্চিম দিনাজপুর) এবং সুন্দরিকা (ডায়মণ্ডহারবার : ২৪-পরগণা)। এই শ্রেণীতেই আর কিছু নাম পাওয়া যায় যেখানে স্ত্রীলিঙ্গবাচক নামের পুংলিঙ্গবাচক। প্রতিশব্দ গ্রাম-নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বহুদূরবর্তী স্থানে। যেমন—কিশোরীনগর (পাথরপ্রতিমা : ২৪-পরগণা) আর কিশোরনগর (২টি) (দাসপুর ও কাঁথি : মেদিনীপুর) কিংবা ফুলেশ্বরী (কোচবিহার : কোচবিহার) এবং ফুলেশ্বর (উলুবেড়িয়া : হাওড়া) অথবা বিরহিণী (বালুরঘাট : পশ্চিম দিনাজপুর) ও বিরহী (হরিণঘাটা : নদীয়া)। এত দূরে দূরে এই যুগ্ম নামগুলির কি করে সৃষ্টি হল সে এক রহস্য।

দেবদেবীর নামসংবলিত গ্রাম-নামে যে কাব্যধর্মিতা অনুপস্থিত সেকথা এ-প্রবন্ধের প্রথম দিকে বলেছি। কিন্তু দেবলোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু নামের কাব্যিক গড়ন স্পষ্ট। দৃষ্টান্ত—অমরাবতী (নামখানা : ২৪-পরগণা), আরতি (অন্ডাল : বর্ধমান), ইন্দ্রানী (খড়গ্রাম : মুর্শিদাবাদ), কালোসোনা (কুকের ঘরোয়া প্রতিশব্দ) (শঁকরাইল : (মেদিনীপুর), পাথরপ্রতিমা (পাথরপ্রতিমা : ২৪-পরগণা) এবং মন্দারমণি (রামনগর : মেদিনীপুর)।

দেবগণের সুরলোক ও সঙ্গীতের সুরলোকে তফাত আছে। কিন্তু সে ব্যবধান অতিক্রম করে আমাদের গ্রাম-নাম সৃষ্টিকর্তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত কিছু সুন্দর নাম আমাদের উপহার দিয়েছেন। যেমন—আড়ালবাঁশি (বাঁকুড়া : বাঁকুড়া), একতারা (মগরাহাট : ২৪-পরগণা), নিশিরাগ (মেমারি : বর্ধমান), পরজ (গলসি : বর্ধমান), বাঁশি (৩টি) (ইন্দপুর, জয়পুর ও বাঁকুড়া : বাঁকুড়া), বাহার (২টি) (গাজোল এবং হরিশ্চন্দ্রপুর : মালদা), মুরলী (২টি) (ময়ূরেশ্বর : বীরভূম। বারাসত : ২৪-পরগণা), সাহানা (চন্ডীতলা : হুগলী) প্রভৃতি।

গৃহপালিত বা পল্লীপালিত পশু-পাখির প্রতি বাঙালীর প্রাণের টান

পশ্চিমবাংলার গ্রাম-নামের ভিতর যতটা সংক্রামিত হয়েছে এমনটি আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। পরবর্তী সুমধুর নামগুলিই তার প্রমাণ। যথা—কোকিলা (গোয়ালপোখর : পশ্চিম দিনাজপুর), কবুতরখোপী (গোয়ালপোখর : পশ্চিম দিনাজপুর), কোয়েলা (সিউড়ি : বীরভূম), গজঘন্টা (মগরা : হুগলী), গাংচিয়া (নারায়ণগড় : মেদিনীপুর), চক চাতক (বালুরঘাট : পশ্চিম দিনাজপুর), চন্দনা (কেশিয়ারী : মেদিনীপুর), চড়ুইমারন (২টি) (ফাঁসিদেওয়া : দার্জিলিং ও ইটাহার : পশ্চিম দিনাজপুর) ঝিল্লী (খড়গ্রাম : মুর্শিদাবাদ), পায়রাউড়া (গড়বেতা : মেদিনীপুর), পায়রাচালি (৫টি) মেদিনীপুরে ৩টি, পুরুলিয়ায় ও ২৪-পরগণায় ১টি করে), পায়রাবাঁশি (গড়বেতা : মেদিনীপুর), ভোমরা (রায়গঞ্জ : পশ্চিম দিনাজপুর) ময়না (ময়না : মেদিনীপুর) ময়নাপাড়া (নারায়ণগড় : মেদিনীপুর। রবীন্দ্রনাথের দেখা কালো হরিণ চোখের কালো মেয়েটি এখানকার কিনা কে জানে!), ময়ূরনাচনা (ইন্দপুর : বাঁকুড়া) এবং সুবর্ণমৃগী (ভগবানপুর : মুর্শিদাবাদ)।

ধ্বন্যাত্মক ও ধ্বনিসাম্যের প্রয়োগে সৃষ্ট কিছু অনুরণিত গ্রাম-নামের উল্লেখ করে এ প্রবন্ধ শেষ করব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শব্দের কোন স্পষ্ট অর্থ নেই। কিন্তু তাদের উচ্চারণগত মাধুর্য অবশ্যই স্বীকার্য। যথা—কলকলি (লোনাগোলা : মুর্শিদাবাদ), গড়গড়া (দুবরাজপুর : বীরভূম), চিকাচিকা (বাঁকুড়া : বাঁকুড়া), চুচুরমুচুর (খড়িবাড়ি : দার্জিলিং), ঝলঝলি (তুফানগঞ্জ : কোচবিহার), ঝিলিমিলি (রাণীবাঁধ : বাঁকুড়া), ঝুনঝুনি (মেদিনীপুর : মেদিনীপুর), ঝুমঝুমি (২টি) (দাসপুর : মেদিনীপুর ও শ্যামপুর : হাওড়া), ঝরঝুরি (বিনপুর : মেদিনীপুর), টিংলিং (মিরিক : দার্জিলিং) ধপধপি (বারুইপুর : ২৪-পরগণা), সাহারা-বাহারা (হরিশ্চন্দ্রপুর : মালদা) প্রভৃতি।

নানান দৃষ্টিকোণ থেকে সুমধুর নামের এই গ্রামগুলির অবস্থিতি নির্দেশ করতে গিয়ে বন্ধনীর মধ্যে বারবার সংশ্লিষ্ট থানা ও জেলার উল্লেখ হয়ত অনেকের ক্লান্তিকর মনে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমার মতে, এ তথ্যগুলি মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়। কেননা, তাদের ভিত্তিতে শ্রুতিসুখকর গ্রাম-নাম পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণে স্ফূর্তিলাভ করেছে তার একটা চিত্তাকর্ষক সমীক্ষা সম্ভব। সেজন্য অবশ্য পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন। সে যাই হোক, সুখপাঠ্যতার এই বাধা অতিক্রম করে যেসব পাঠক-পাঠিকা শেষ অবধি আসতে পেরেছেন, আশা করি তাঁরা আমার সঙ্গে সোৎসাহে গলা মিলিয়ে বলবেন—না জানি কতেক মধু

তিন সারি লক্ষ্মীর পা

চাণক্য সেন

উপন্যাস

— এক —

বিদেশী মেয়েরা ভারতবর্ষে আসে সাধারণত, হয় বেড়াতে, নয় এ্যাডভেঞ্চার-এর লোভে, যদিও তাতে মানুষের দুনিয়ার পশ্চিমী প্রাধান্যের অহংকার থেকে যায় প্রচ্ছন্ন। ক্ষুদে ক্ষুদে মাতা-হারিও যে কদাপি কখনও পদার্পণ করে না এমন নয়।

বাঙ্গালী মেয়েরা বিদেশে যায় প্রধানত দুই সড়ক অতিক্রম করে। একটি সড়কের নাম বিয়ে। অন্যটির নাম উচ্চশিক্ষা। প্রায়ই দেখা যায় কোনও এক যাদুতে দু' সড়ক মিলে গেছে। বিয়েটাই কি কম উচ্চশিক্ষা? উচ্চশিক্ষার পরিণতি কি বিবাহ হতে পারে না?

যে তিনটি মেয়ের এ-কাহিনীতে নায়িকা-ভূমিকা, তাদের দু'জনে আমেরিকা-প্রবাসী (কালক্রমে নিবাসী) হল বিবাহ সড়কে উধাও হয়ে। তৃতীয়াকে টানল উচ্চশিক্ষা। প্রথম দু'টি বঙ্গকন্যা কলকাতার মেয়ে, তৃতীয়টি রাজধানী দিল্লির। তিনকন্যার মিল নেই, শুধু যে ব্যাপক ও গভীর মিল তৈরী করে রাখে, রেখেছে, রাখবে তাদের বাঙ্গালীত্ব। তারা একে অন্যের থেকে ভীষণ আলাদা, কেউ কাউকে ভাল করে জানেও না, তবু তারা অনেকখানি এক। তারা তিনজনেই অদৃষ্ট মানে (স্বামী হল অদৃষ্টের শেষ ল্যাম্পপোস্ট), দেবদেবী রামকৃষ্ণ সাঁইবাবা জ্যোতিষে তিনজনেরই ভক্তি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ, তিনজনেই সুন্দর হাসতে ও কাঁদতে পারে, রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসে, বাঙ্গালী নিয়মে ফ্লার্ট করতে পারে। এবং তিনজনেই বাধ্য না হলে ইংরিজী বলতে চায় না, বাংলা বলতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

তবু তারা ভীষণ আলাদা, যার পরিচয় পাবেন তাদের এই খণ্ডিত কাহিনীতে।

রাধা ভট্টাচার্য, আঠার বছর তিন মাস, কাঞ্চন-কান্তি, পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি, ৩৪-২৭-৩৬ ঝাঁক ঝাঁক কোঁকড়া চুলে সারা পিঠ তরঙ্গিত, বড় বড় চোখে অনুচ্চারিত ভীরু ভীরু স্বপ্নের শেষ নেই, নিজের নিরাবরণ দেহ দেখে নিজেই ভয়ে সংকুচিত সংশয়ে কম্পিত, আনন্দে অস্থির।

রাধা ভট্টাচার্যকে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে সাত সাগর পার করে নিউইয়র্কে নিয়ে এল একদিন যে দুঃসাহসী বঙ্গযুবক, তার নাম অমিয়কান্তি মজুমদার।

মণিমুকুল মুখোপাধ্যায়, ছাব্বিশ, নাতি-উজ্জ্বল-শ্যাম, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, ৩৮-৩৬-৩৮, কোমর ছাড়িয়ে নেমে এসেছে কালো অজগর-কেশ, চশমার আড়ালে দীপ্তমান চোখে সুগভীর রহস্য, ভরা ভরা গালে হঠাৎ সিঠে দু'টি টোল, চিবুকে সমুচ্চারিত সপ্রতিভতা।

মণিমুকুল মুখোপাধ্যায়কে হুট করে বৌ বানাল তপোময় ঘোষাল। বিবাহিত জীবনের প্রথম বছর কলকাতা কাটিয়ে, দ্বিতীয় বছরের মাঝখানে মণিমুকুল ঘোষাল একাই আকাশ পেরিয়ে উপস্থিত হল নিউইয়র্কে।

মিস অনুপ্রিয়া দত্ত, এম এস-সি (দিল্লি), বাইশ, ঝলকানো কৃষ্ণবর্ণ, পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি, ৩৬-২৯-৩৫, হাল্কা চুল অযত্নে লালচে, ছোট ছোট দু'টি চোখে অফুরন্ত বিদ্যুৎ, পূর্ণ চাঁদের মত গোল মুখখানা হাসির ঝরণা, খাঁদা নাক মোটা ঠোঁট, পুরু চিবুক, সারা দেহে, সমস্ত মনে ঋজু সরলতা।

(মিস অনুপ্রিয়া দত্ত, এম এস-সি (দিল্লি) নিজেই একদিন পালাম থেকে উড়াল দিয়ে সোজা পৌঁছল জন-এফ-কেনেডি বিমানবন্দরে।

— দুই —

এবার আসুন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই সেই দু'টি বঙ্গসন্তানের সঙ্গে, যাদের হাতে সিঁদুর না পড়লে আমাদের দুটি কন্যার আমেরিকা যাওয়া হত না, লেখাও হত না এ-কাহিনী।

অমিয়কান্তি মজুমদার ধনী ঘরের সন্তান, শৈশবে পিতৃহীন, কৈশোরে মাতৃহীন যৌবনে স্বাধীন। পঞ্চম দশক-এর শেষ বছর থেকে মার্কিন-মুলুকে প্রবাসী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের কৃতি ছাত্র। কেমিস্ট্রিতে পি-এইচ-ডি করে রাটপার্স য়ুনিভার্সিটিতে রিসার্চ স্কলার হয়ে আসার সাত বছর পরে কম্পিউটার বিজ্ঞানে দ্বিতীয় পি-এইচ-ডি ডিগ্রী নিয়ে অমিয়কান্তি সগৌরবে আপন মর্যাদায় উচ্চ বেতনে মার্কিন শিক্ষা-বাণিজ্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এবং সঙ্গীতপ্রিয়, নিজেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শী। এবং অভিনয়-পাগল, সামাজিক আনন্দ উৎসবে অসম্ভব উৎসাহী। আমেরিকার সারা পূর্বাঞ্চলে বাঙ্গালীদের কোনও উৎসব আনন্দ হতে পারে না অমিয়কান্তি মজুমদারকে, এবং তার রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে, বাদ দিয়ে। ১৯৬৫ সাল থেকে, কয়েক বছরের প্রচেষ্টার ফলে, অমিয়কান্তির নির্দেশনায় এবং অভিনয়-নায়কত্বে, নিউইয়র্কে প্রতি বছর একখানা বাংলা নাটক অভিনীত হয়ে আসছে; নিন্দুকেরা যাই বলুক, নাটক নিশ্চয় ভাল, কেননা

ডলার দিয়ে টিকিট কিনে দুশো-আড়াইশ' নরনারী তা চাক্ষুস করে থাকে। অমিয়কান্তি মজুমদার সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভূত পুরুষ, যার প্রমাণ মিন্টইয়র্ক অঞ্চলের ভারতীয় ইমিগ্রান্টদের নিয়ে তার নেতৃত্বে একটি এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা।

চাকরীতে সুনাম, সমাজে জনপ্রিয়তা জীবনের গরম আস্বাদ : এর মধ্যে অমিয়কান্তির একচল্লিশটা বছর কি করে কখন কেটে গেল সে নিজেই জানে না। কলকাতাতেই দেহের রং ফর্সা ছিল, দীর্ঘ মার্কিন প্রবাসে এখন পাকা কলার মত। মাথায় টাক পড়েছে, কিন্তু পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি শরীরে মেদের বাহুল্য নেই। মুখে সতেজ, দৃষ্টিতে প্রতিভা, কৌতুক ও নিষ্ঠুরতার মিশ্রণ, পদক্ষেপে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস। অমিয়কান্তি মজুমদার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সতেজ পুরুষ; বিবাহান্তরেও, টাক না থাকলে, তাকে দর্শন দেখাত।

বিয়ালিশে হঠাৎ অমিয়কান্তি মনস্থির করল একটি টাটকা তরতাজা বাঙালী লতা কলকাতা থেকে আমদানী করে তার শোবার ঘরে স্থাপন করতে হবে।

তপোময় ঘোষাল সাধারণ মধ্যবিত্ত বাপের ছয় সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র। বেলেঘাটায় একটি জরাজীর্ণ দ্বিতল বাড়ীর একতলার এক-তৃতীয়াংশে তার জন্ম থেকে যৌবনের প্রথম কয়েকটা বছর অতিক্রান্ত। পিতা আলিপুর স্মলকজেজ আদালতের দরিদ্র উকিল। তাঁর রংচটা জালি দেওয়া কালো গাউন তপোময়দের সামাজিক ঠিকানার দলিল। দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েও তপোময় ছোটবেলা থেকে মোটাসোটা নাদুস নুদুস গম্ভীর প্রেমাদী নির্জনতাপ্রিয় একাকী ও আত্মস্থ। উত্তেজনার উত্তাপ থেকে দূরে থাকাই তার স্বভাব। খেলাধূলা নয়, আড্ডা নয়, সিনেমা নয়, বই আর লাইব্রেরী আর নিদ্রা আর ফ্রেঞ্চ বসে বসে নিস্তব্ধ ভাবনা; এই ছল কলকাতার তপোময় ঘোষাল। শিবপুর থেকে সিভিল ইনজিনীয়ারিং পাশ করে একদিন তার সি-এম-পি-ওতে হাজারি গোছের চাকরী হয়ে গেল, ফলে আর কিছু না হোক, ছোটভাই মনোময় এম মেডিকেল কলেজে পড়ার রসদ জোটল। কাউকে কিছু না জানিয়ে তপোময় কলকাতার মার্কিন কনসুলেটে ইমিগ্রেশনের জন্যে দরখাস্ত করেছিল; একদিন কনসুলেট থেকে ডাক এল। তিন মাস পরে তপোময় ঘোষাল নিউইয়র্কে পৌঁছল, তিন সপ্তাহের মধ্যে কাজ পেল যে মাসিক মাইনেয় তা তার বাবা সারা বছরে কোনও দিন রোজগার করতে পারেনি।

কলকাতায় একা ও একাকী ছিল, নিউইয়র্কেও তপোময় তাই রয়ে গেল। তিন বছরে তার মাইনে হল বছরে তেইশ হাজার ডলার; ম্যানহাটানের পশ্চিম অংশে তিন কামরার আবাসকে সে বই-এ ছবিতে রেকর্ডে ইলেকট্রনিকে আসবাবে ভরে ফেলল। বন্ধুবান্ধব বিশেষ নেই। প্রয়োজনও বোধ করে না তপোময় কিন্তু এমন কোনও নাটক, কনসার্ট, অপেরা, ব্যালে নেই যা তার দেখা হয়নি, মার্কিন, ভারতীয় অথবা অন্য দেশের। এক দিগন্তহীন আনন্দ ও মাধুর্যের সন্ধান পেয়ে তপোময় ঘোষাল স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে কাটিয়ে দিল বছরের পর বছর। তার আনন্দ, সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও মাধুর্য-আস্বাদকে অহরহ পীড়া দিত বেলেঘাটার সেই জীর্ণ দোতলা বাড়ীর একতলার আলোহীন, বাতাসহীন, আরশোলা-ইঁদুর অধ্যুষিত এক-তৃতীয়াংশ যেখানে তার জীবনের পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত, এবং যেখানে বাস করছে তার বাবা, মা, চার বোন, ভাই। তপোময় চাকরির প্রথম চার বছরে পরিবারের সামাজিক ঠিকানা বদলে দিল। তার পাঠান টাকায় বহুদিনের দরিদ্র এক বাঙালী উকিলের দোতলা বাড়ী উঠল লেক-গার্ডেনস-এ। চার-চারটি সুধারণ বাঙালী মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। একটা গোটা পরিবার দারিদ্র্যের কারাগার থেকে মুক্তি পেল। উকিল মহাশয় সস্ত্রীক কেদার বদ্রীনাথ পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারলেন। মনোময় এম বি বি এস পাশ করে এম এস পাশের জন্যে তৈরী হবার সময় এক ডাকসাইটে ডাক্তারের দুধে-আলতা মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পর্যন্ত পড়তে পারল।

লেক-গার্ডেনস-এ বাড়ী নির্মাণ ও তিন কন্যার বিবাহ সুসম্পন্ন করার পর থেকে উকিল মহাশয় নিয়মমাফিক মাসে দুবার তপোময় ঘোষালকে বিবাহ করতে আদেশ-আবেদন-অনুনয় করে যেতে লাগলেন, মনের গহনে, কপালের রেখায়, কাচাপাকা গোঁফের আড়ালে প্রচ্ছন্ন শংকা, সন্দেহ ভয় ও সংশয় নিয়ে স্ত্রী তাঁর সুপুত্র নিশ্চয় এতদিনে কোন মেম-মেয়েকে পত্নী বানিয়ে পুরোপুরি মার্কিন হয়ে গেছে।

অমিয়কান্তির জীবনে কয়েকটি আমেরিকান মেয়ে প্রবেশ করেছিল এবং জীবন থেকে তাদের প্রস্থানও হয়েছিল। এদের মধ্যে একটির প্রবেশ অবস্থিতিতে পরিণত হতে পারত, সত্যজিৎ রায় বাধা না দিলে। অনিটা রোজার্স অমিয়কান্তির সঙ্গে কম্পিউটার বিজ্ঞান পড়ত; সুন্দরী ছিল; সেকসী ছিল; পিয়ানো বাজাত; ছবি আঁকতে; শীতকালে বরফ-ঢাকা পাহাড়ে স্কী করত; প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে মূর্তি বানাত। এক কথায় অনিটা রোজার্স লোভনীয় মেয়ে ছিল, অমিয়কান্তির তাকে দেখে জীবনতৃষ্ণা বেড়ে গিয়েছিল; তারা দুজনে দুজনকে ভালবেসেছিল, তাদের মনে মিলন দেহের মিলনে জমজমাট হয়ে উঠেছিল। এমন সময় নিউইয়র্ক শহরে প্রদর্শিত হল সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি'। পঞ্চাশ মাইল ড্রাইভ করে অনিটা রোজার্সকে নিয়ে অমিয়কান্তি দেখল 'পথের পাঁচালি'। ছায়াছবি শেষ হবার এক ঘন্টার মধ্যে তাদের এনগেজমেন্ট ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় স্পেগাস্টি আর চিলি-সস নাড়তে নাড়তে অনীটা রোজার্স প্রশ্ন করল, তোমার দেশে কি এতো দারিদ্র্য, এতো দুঃখ এখনও মানুষকে ভোগ করতে হয়?

অমিয়কান্তি উত্তর দিল, 'হয়।'

অনীটা রোজার্স ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছল। সত্যজিৎ রায় তাকে অনেক কাঁদিয়েছেন। এখনও তার কান্না শেষ হয়নি।

অনীটা রোজার্স বলল, 'তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।'

অমিয়কান্তি আকাশ থেকে পড়তে পড়তে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তো ওদের মতো গরীব নই! তাছাড়া আমরা থাকবো শহরে, অভিজাত পাড়ায়। দারিদ্র্য তো কেবল বস্তিতে আর গ্রামে!'

অনীটা রোজার্স বলল, 'অনেক মানুষ যেখানে এমন গরীব সেখানে কিছু মানুষের উপচে-পড়া স্বাচ্ছন্দ্য ভীষণ কুৎসিৎ, অসভ্য অশ্লীল।'

অমিয়কান্তি, রক্ত থেকে উঠে আসা ক্রোধের উত্তাপ হজম করে বলল : 'আমি দেশে ফিরবো এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। দেশে কেউ নেই আমার—বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই। আমি হয়তো এদেশেই জীবন কাটিয়ে দেব।'

অনীটা রোজার্স বলল, 'আমার জন্য তোমাকে দেশত্যাগী হতে হয় তা আমি চাইনে।'

অমিয়কান্তি-অনীটা রোজার্স পর্ব সমাপ্ত হল।

তপোময় ঘোষালের কোনও বান্ধবী ছিল না।

একটি নরমগরম সুন্দরী স্প্যানীশ মেয়ের সঙ্গে মাসে দুদিন যতক্ষণ ইচ্ছে, যা-করে ইচ্ছে সময় কাটাবার 'বন্দোবস্ত' ছিল। প্রতি মাসে নির্দিষ্ট ডলারের বিনিময়ে তপোময় এটুকু রিলাকসেশন এবং সেকস কিনে নেওয়া ছাড়া স্প্যানীশ মেয়ের আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। ক্রুডিয়া গোমেজকে তপোময় এক জন্মদিন ছাড়া কোনও বাড়তি উপহার পর্যন্ত দিত না। ক্রুডিয়া গোমেজ বিশেষ পছন্দ করত তপোময় ঘোষালকে। সে কথা বলত কম, মদ্যপান করত সামান্য, তার দাবীতে দস্যুতা নেই, বরং আছে কোন অজানা দেশের অচেনা জল মাটি আকাশ বাতাসের কোমল আধাতুর অবিজ্ঞাপিত স্বপ্নার্ত তৃষ্ণা—নারীদেহের সৌন্দর্যের জন্যে, রহস্যের জন্যে, ঐশ্বর্যের জন্যে। নিরাবরণ ক্রুডিয়াকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তপোময় শুধু বিস্মিত আনন্দে দেখত, তার স্তন দুটিকে স্পর্শ করে আদর করে ভ্রাণ করে তপোময় সমাধিস্থ হয়ে যেতো, তার সমতল পেট, সুগঠিত

নিতম্ব, আলাবাস্টার জঙ্ঘা, তপোময়কে সম্মোহিত করে রাখত।

মাসে শুধু দুরাত্রি, বেশি নয়, কম নয়। বিশেষ কথা বলত না তপোময়। নিজের সম্বন্ধে বলত না কিছুই।

—তিন—

কলকাতায় নিউ আলিপুরে বাস করত সীমা চক্রবর্তি, অমিয়কান্তি মজুমদারের মাসতুতো বোন। সীমা একদিন অমিয়কান্তির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল। অন্যান্য কথার পরে চিঠিতে পড়ল, বয়স বেড়ে যাচ্ছে, যদিও টের পাই নে একটুও। এবার ভাবছি বিয়ে করবো। বাংলাদেশের টাটকা সবুজ মেয়ে, নতুন লাউএর মতো, নতুন শশার মতো, তরতর বেড়ে যাওয়া কুমরো লতার মত। তবে, সুন্দরী হওয়া চাই, এবং সঙ্গীতে কিছুটা দক্ষতা, না রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়—ওখানে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে সহ্য হবে না—একেবারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে। যদি কেউ জানা থাকে তো দেখেশুনে রাখিস। পছন্দ হলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বিবাহ। মেয়েকে আমি আধঘণ্টা প্রশ্ন করব। মেয়ে, অথবা তার অভিভাবক, আমাকে আধঘণ্টা প্রশ্ন করতে পারবে।'

তপোময় ঘোষাল পিতার অথবা মায়ের কাছ থেকে নিয়মিত বিবাহ-প্রস্তাবে সাড়া না দিলেও, মনোময়ের একখানা চিঠি পেয়ে বিবাহিত হতে রাজী হয়ে গেল। মনোময় লিখেছিল, জনৈক ডাকসাঁইটে মেয়ের যে তনয়ার সঙ্গে তার প্রেম, অবিলম্বে তাকে বিবাহ না করলে কলঙ্ক ও বিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনা। অথচ যে দাদার উদার স্নেহে এ প্রকার স্নাতকোত্তর দয়িত সম্ভাবনার সে দ্বারস্থ, তার বিয়ে না হবার আগে মনোময় কিছুতেই বিবাহ করে উঠতে পারবে না। অতএব তপোময় তার স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতি ও ঔদার্যে বিবাহ করতে রাজী হয়ে তাকে যুগপৎ রক্ষা ও মুক্ত করুক।

তপোময় ভাইকে লিখল, অনেক চেষ্টা করে জুন মাসে দু সপ্তাহের ছুটি পেয়েছি। যদি একটি পাত্রী বেছে রাখতে পার বিয়ে করে নিয়ে আসতে রাজী আছি। আমি লিকলিকে স্ত্রীলোক পছন্দ করি না, ঐশ্বর্যপূর্ণ নারীদেহ দেখতে আমার ভালো লাগে। একটির বেশি মেয়ে দেখব না। এসেনসিয়েল কোয়ালিফিকেশন, লাবণ্যময় মুখশ্রী মাঝারি বুদ্ধি, বি-এ পাশ, ডাল-মাছের ঝোল-সুক্তো রান্নায় পরীক্ষিত হাত। সতেরই জুন এয়ার-ইণ্ডিয়ায় কলকাতা পৌঁছব।'

—চার—

১৯৭০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ডাকপিয়ন একখানা চিঠি নিউদিল্লীর বি—তিনশ ছত্রিশ লক্ষ্মীবাই নগরের দরজার নীচ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

চিঠিখানা প্রথমে তুললেন পরিবারের গৃহিণী। বাড়ীতে তখন তিনি একা। কর্তা আপিসে। মেয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। চিঠির চেহারা দেখেই মা বুঝলেন, এ সেই পত্র যার জন্যে পরিবারের তিনজন আজ তিন মাস ধরে প্রতীক্ষা করে আছে। হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন, অনুমান ঠিক, দীর্ঘ লিপাফার উপরের বাম কোণে লিখিত আছে : কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটি ইন দ' সিটি অব নিউইয়র্ক, টিচারস কলেজ। ঠিকানার জায়গায় সুন্দর হরফে টাইপ করা : মিস অনুপ্রিয়া ডাট এম, এস-সি। এই সেই চিঠি, কোনও ভুল নেই। চিঠিখানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মা। খুলতে সাহস হল না। এ চিঠির মধ্যে রয়েছে তাঁর একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ। যদি চিঠি আশার বাণী বহন করে নিয়ে এসে থাকে, মেয়ে তাঁর চলে যাবে বহুদূরে, বহুদিনের জন্যে, কবে ফিরবে, কি-ভাবে কি-মন নিয়ে, কি পরিবর্তনের পোশাক পরে ফিরবে কে জানে? ভাবতে মার বুক হুহু করে উঠল, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। যদি চিঠিতে নিরাশা থেকে থাকে, মেয়ে ভীষণ দুঃখ পাবে, তার অনেক স্বপ্ন, অনেক উচ্চাশা ধূলিসাৎ হবে। এ-ভাবনাও মার মনকে বিষণ্ণ করে রাখল। চিঠিখানা নিয়ে কি করবেন কয়েক মিনিট তিনি ভেবে পেলেন না। তারপর যত্ন করে চিঠিখানাকে মেয়ের ঘরে পড়ার টেবিলের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে দিলেন। দুপুরে তাঁর চোখে ঘুম এল না। একটা বাংলা নভেল পড়ার চেষ্টা করলেন, মন বসল না। অবশেষে তিনি একরাশি সেলাই নিয়ে বসলেন। মেয়েকে যদি বিদেশে যেতেই হয় কয়েকটা পেটিকোট তো লাগবেই। দশ গজ লংক্লথ কর্তাকে দিয়ে তিনি আনিয়ে রেখেছিলেন। পেটিকোট সেলাই করতে করতে বার বার মনে হল চিঠিটার কথা, ওটায় কি থাকলে তাঁর পক্ষে খুশী অথবা দুঃখিত হওয়া উচিত হবে কিছুতেই ভেবে পেলেন না।

সাড়ে পাঁচটায় কর্তা আপিস থেকে বাড়ী এলেন। স্কুটারের শব্দ শুনেই গৃহিণী দরজা খুলে দাঁড়ালেন; কর্তা স্কুটারটাকে বারান্দায় তুলে, প্লাস্টিকের কভার দিয়ে ওটাকে ঢেকে রেখে, দরজার কাছাকাছি হতেই গৃহিণী ঘোষণা করলেন, "চিঠি এসে গেছে।'

কোন চিঠি, কার চিঠি কোনও কিছু ভাবতে হল না কর্তার। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ছুড়লেন, কি লিখেছে?'

গৃহিণী বোকা-বোকা মুখ করে বললেন, খুলি নি আমি।'

কর্তা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হুকুম হানলেন, কৈ চিঠি? নিয়ে এসো তো দেখি!"

গৃহিণী মেয়ের ঘর থেকে চিঠিখানা সযত্নে সশ্রদ্ধায় তুলে এনে কর্তার হাতে তুলে দিলেন।

ভাগ্য যখন কৃপণ হয়ে আসে !

মহামায়া পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন

ভাগ্যলিপি

অভিনয়/অঞ্জনা·ভৌমিক
বিকাশ রায়·নিরঞ্জন দে
অসিতবরন·শিবানী বসু
জলি বন্দোপাধ্যায়
আনন্দ মুখোপাধ্যায়
ঝুমকি রায়·
ও বিশ্বজিৎ

পরিচালনা কাহিনী চিত্রনাট্য নিরঞ্জন দে

সুর-তরুন রঞ্জিত

পরিবেশনা
আলো ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

সুস্বাগতম

গীত : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

কণ্ঠ : হেমন্ত, তরুণ, শ্যামল, বনশ্রী ও সন্ধ্যা।

যোগাযোগ : ৯ডি, মহামেডান বেরিয়াল গ্রাউন্ড লেন, কলকাতা—২৩

কর্তা ইউ-এস-এ'র ডাকটিকেটবাহী এয়ারমেল এনভেলপখানা হাতে করে, মার মতোই, এক মিনিট স্থির দৃষ্টি রাখলেন ঠিকানার ওপর। মিস অনুপ্রিয়া দাট এম, এস-সি।' ঠিকানাটার ওপর একবার আঙুল বুলিয়ে স্ত্রীকে বললেন, আই-বি-এম ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে লেখা। বুঝেছ? মনে হয় যেন প্রিন্ট করা।' তারপর ভয়ার্ত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, খুলবো?

গৃহিণী বললেন, আমার তো সাহস হয় নি, বাপু। যদি না লিখে থাকে, অনু একেবারে ভেঙ্গে পড়বে।'

কর্তা শুকনো হাসি দিয়ে বুকের দ্রুত স্পন্দন চেপে বললেন, তুমি মা হয়েও অনুকে চেন না। অনু ভাঙ্গবার পাত্রী নয়। তা ছাড়া, না যদি এসেই থাকে, আমাদের কাছ থেকেই শোনা ভালো।' এবার তিনি চিঠি খোলবার উদ্যোগ করলেন। অনুর টেবিলে একটা পেপার-কাটার আছে, নিয়ে এসো।' সেটা খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা পুরান ব্লেড দাও আমাকে।' ব্লেড দিয়ে সন্তর্পণে কর্তা চিঠির মুখ খোলবার আগে একবার ভালো করে দেখে নিলেন লেপাফার মধ্যে ঠিক কতোখানি স্থান জুড়ে আছে পত্রখানা। মুখ খোলবার পর অতি সাবধানে তিনি চিঠিখানাকে বার করলেন। খুলতে গিয়ে হাত কাঁপল। এক মিনিট পরেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, পেয়ে গেছে! অনু পেয়ে গেছে। এ্যাডমিশন পেয়েছে। ফেলোশিপও পেয়েছে।'

দুজনে এবার একসঙ্গে কেঁদে ফেললেন।

সন্ধ্যা পেরিয়ে বাড়ী ফিরল অনুপ্রিয়া। দরজা খোলা। বাবা মা দুজনেই দেখতে পেল ড্রইংরুমে চুপ করে বসে আছে। তাকিয়ে দেখল দুজনকে।

বলল, বুঝেছি। আমার চিঠি এসে গেছে।'

বাবা বললেন, দুটোই হয়ে গেছে তোমার!'

মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, তুই বুঝলি কি করে?'

অনুপ্রিয়া বলল, তোমাদের মুখের আর চোখের অবস্থা দেখে।'

বাবা বললেন, আমি জানতাম তোমার হবেই, দিল্লী য়ুনিভারসিটির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তো একটুখানি কথা নয়!'

অনুপ্রিয়া বলল, না, বাবা। অনেক, অনেকখানি কথা।'

বাবা বললেন, চিঠিটা পড়ে দেখ, প্রাঞ্জলেই বুঝতে পারবে।' উঠে গিয়ে অনুপ্রিয়ার ঘর থেকে চিঠিখানি এনে মেয়ের হাতে দিলেন। অনুপ্রিয়া খুলতে লাগবে, বলে উঠলেন, খুলতে হবে না। আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার মুখ থেকেই শুনে নাও ঃ আই হ্যাভ প্লাচ হ্যাপিনেস দ্যু ইনফর্ম ইউ দ্যাট...

চিঠির সবটুকু ভাষা নির্ভুল আবৃত্তি করে বাবা বললেন, 'ভেবে দ্যাখ অনু, তোকে ভর্তি করেছে পি-এইচ-ডি প্রোগ্রামে, বছরে চার হাজার ডলার ফেলোশিপ দিয়েছে (কত টাকা জানিস? সরকারী রেট ধরলেও ত্রিশ হাজার টাকার ওপর, মানে আমার মাইনের, বলতে গেলে, তিনগুন, তার ওপর পড়বার মাইনে মাপ, ডরমিটরীতে থাকতে টাকা দিতে হবে না, তাও মাপ, ভেবে দ্যাখ, কী সম্মান দিয়েছে তোকে, এবার তোর জীবনের রাজপথ তৈরী, আমি যা কেবল স্বপ্নেই দেখেছি, তাও বেশিদিন দেখতে পারি নি, স্বপ্নও আমাদের ছিল ভীরু, সীমাবদ্ধ, তাই এবার তোকে দিয়ে পূর্ণ হল, অনু, ভেবে দ্যাখ...'

অনুপ্রিয়া যে মেয়েটির নাম, তার চোখের জলে এতক্ষণে গাল জলে ভেসে গেছে।

—পাঁচ—

১৯৬৮ সালের নভেম্বরে অমিয়কান্তি মজুমদার কলকাতা এল এক মাসের ছুটি নিয়ে। উঠল পার্ক হোটেলে। কলকাতা পৌঁছবার তৃতীয় দিনে সীমার স্বামীকে তার আপিসে ফোন করে আগমন বার্তা প্রসারিত করল। ঐ দিনই সন্ধেবেলা হাজির হল নিউ আলিপুরে সীমাদের ফ্ল্যাটে। দেখল, শহর কলকাতার মতোই, ক্ষয়ে গ'লে মজে গেলেও,, সীমা এখনও আকর্ষণীয়, চোখ ফিরে ফিরে যেতে চায় ওর দিকে। বাঙ্গালী মেয়ের, অমিয়কান্তি মনে মনে বলল, একটা বিশেষ সেকস-এ্যাপীল আছে, তাই ভারতবর্ষে বাঙ্গালী মেয়েদের প্রতি অবাঙ্গালী পুরুষদের সহজ-আকর্ষণ। বাঙ্গালী মেয়েরাও অমিয়কান্তি লক্ষ্য করল, দেহচর্চায় ও প্রসাধনে, বদলাতে শুরু করেছে। সীমাকে এই সে প্রথম দেখল নাভির নিচে সাড়ি পরতে, যদিও সীমার পেট এখন আর পাতলা নেই। সীমার ব্লাউজও আগের চেয়ে অনেক ছোট। বাঙ্গালী মেয়ের অনাবৃত পিঠ-ও-পেট দেখতে মন্দ লাগে না, স্বীকার করল অমিয়কান্তি। সীমা রাগ করল তার হোটেলে ওঠার জন্যে। সাফাই হিসেবে অমিয়কান্তি বলল, স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে বিদেশে থেকে, রাতদুপুরে মাতলামি করলে তোদের ভালো লাগবে না।'

সীমার স্বামী বলল সীমা আপনার জন্যে অনেক মেয়ের খোঁজ করেছে। পছন্দ করতে পারে নি একটিকেও। কেউ নাকি ওর দাদার যোগ্য নয়।

অমিয়কান্তি ভগ্নীপতির দিকে চোখ রেখে বলল, ভায়া যোগ্য মেয়ে কে চায়? যোগ্য কিনা তাই বলো। সীমা কি করে জানবে সে প্রশ্নের জবাব।

সীমা বলল, যোগ্য না হলে দোষ হয় না, স্যার। আমি চারটি মেয়ে তোমাকে দেখাব।

একসঙ্গে? অমিয়কান্তির প্রশ্ন।

না, স্যার। তোমাকে বিউটি প্যারেড দেখাবার সাধ্য নেই আমার। চারটি বিবাহ-যোগ্য মেয়ে, কলকাতার চার পাড়ায়, চারদিনে দেখতে হবে।

কেন? চারদিনে কেন? একদিনে চারটে এ্যাপয়েন্টমেন্ট অনায়াসে রাখা যেতে পারে। তাছাড়া একদিনেই চারজনকে দেখলে কমপেয়ার করাটা সহজ হবে। আমি আবার কোনও মেয়ের মুখ বারো ঘন্টার বেশি মনে রাখতে পারিনে।

সীমা বলল অসম্ভব। একদিনে একটির বেশি মেয়ে দেখলে তোমাকে সুস্থ পেট নিয়ে ফিরে যেতে হবে না।

অমিয়কান্তি বলল, মেয়ে দেখা আর ছেলে দেখা এক সঙ্গেই হবে তো? না কি ওরা আবার আলাদা করে ছেলে দেখতে আসবে?

সীমা জবাব দিল, ছেলে দেখার রীতি এখনও দানা বাঁধেনি বাঙ্গালী সমাজে, যদিও বাঁধা উচিত। তবে কি জানো, তুমি বড় বেশি দীর্ঘকাল একা একা আমেরিকায় বাস করছ, তোমার সম্বন্ধে খোঁজ খবর মেয়ের বাপ-কাকারা করবে বৈ-কি?

অমিয়কান্তি বলল, 'বলে দিস, পাত্র বলবান, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র। খোঁজ নিতে গেলে ডিটেকটিভ এজেন্সীর শরণাপন্ন হতে হবে। তাতে খরচ অনেক, বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। অতএব আমি যা বলবো কন্যাপক্ষের প্রশ্নের উত্তরে, তাকেই মুনিবাক্য বলে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

সীমার স্বামী বলল, 'মেয়েদের বাবারা যতোটা নিরুপায় আপনি ভাবছেন ততোটা কিন্তু নয়। আজকাল অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের কেউ-না-কেউ আমেরিকায় বসে রয়েছে। নিজেদের ছেলে-মেয়ে না হলেও, তাদের বন্ধু, অথবা বন্ধু বা জ্ঞাতির ছেলেমেয়ে। সীমা যে চারটি মেয়ের কথা বলছে তার মধ্যে দুটির বাবা ইতিমধ্যেই আপনার সম্বন্ধে অনেক খবর নিউইয়র্ক থেকে সংগ্রহ করেছে। ডিটেকটিভ এজেন্সী নিয়োগ করতে হয়নি, ডলারেরও প্রয়োজন হয়নি।'

অমিয়কান্তি সীমাকে বলল, 'তাহলে তোর চারের লিস্ট থেকে দুটি তো বাদ পড়ল। এঁরা নিশ্চয় আমাকে মেয়ে দেখতে ডাকবেন না।'

সীমা ঘোষণা করল, 'ডাকবে না মানে? রোজ খোঁজ করছে, কবে তুমি আসবে?'

খাওয়া-দাওয়ার পর তিনজনে জমাট হয়ে বসল কনে-নির্বাচন প্রচেষ্টায়। সীমা গদরেজ আলমারি খুলে একখানা বড় এনভেলপ নিয়ে এলো। 'এই হচ্ছে অমিয়কান্তি মজুমদারের বিবাহ ফাইল,' বলল

সীমা, 'এর মধ্যে দশটি মেয়ের ফটো আছে, আরও অনেক কিছু আছে।'

'তবে যে তুই বললি চারটি?' অমিয়কান্তির প্রশ্ন।

'দশটির মধ্যে চারটি আমার পছন্দ। তুমি চাইলে দশটিকেই দেখতে পারো।'

অমিয়কান্তি বলল, 'দশজনকেই লিখে দেওয়া যাক, ইন্টারভিউর জন্যে এ বাড়ীতে আসতে।'

'একজনও আসবে না,' বলল সীমা।

তার স্বামী একমত নয়; 'আলবৎ আসবে। একশ টাকা বাজী। দশজনের মধ্যে অন্তত একজন আসবে।'

অমিয়কান্তি পরিসংখ্যানের ছাত্র; বলে উঠল, 'তার মানে টেন পার্সেন্ট বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মেয়ে, তোমার মতে, ট্রুলি লিবারেটেড!'

সীমা দশটি মেয়ের ফটো বার করল। অমিয়কান্তি খুঁটিয়ে দেখল প্রত্যেকখানা ছবি। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে দেখল যে-চারখানা ছবি সীমা বাছাই করেছিল। এদের দুজন বি-এ পাশ, একজন এম-এ, চতুর্থজন সায়ান্স কলেজে রিসার্চ করছে বায়োকেমিস্ট্রিতে। তৃতীয়জন বাংলায় এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হয়েছিল; কাগজে তার ছবি বেরিয়েছিল। 'কোম্পানীর কলকাতায় মেয়েদের অবস্থা' নামে তার একটি প্রবন্ধও ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। চতুর্থ মেয়েটির ছবিও কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, অনেক গুণের মধ্যে সে নাচতেও পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় দুজনেই সঙ্গীত-সরস্বতী। তৃতীয় ও চতুর্থেরও গান জানা আছে। চারটি মেয়েই সুশ্রী। তিনজন ছিপছিপে, একজন মাংসল। দুজনের চোখে চশমা। চারখানা ছবিই স্টুডিওতে তোলা।

অমিয়কান্তি প্রশ্ন করল, 'এদের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস?'

সীমা রক্তিম হল। তার স্বামী বলল, 'ওটা বাসরঘরে আপনাকে আবিষ্কার করতে হবে। আপনার পকেটে একটা টেপ রেখে দেব।'

মেয়ে না দেখে অমিয়কান্তি পেপার পড়তে লেগে গেল। আর লেগে গেল কলকাতার সিনেমা, থিয়েটার ও যাত্রা দেখতে। আজ মুক্ত-অঙ্গন, কাল রঙ্গনা। একদিন রবীন্দ্রসদন, অন্যদিন কাশী বিশ্বনাথমঞ্চ। যাত্রা দেখে অমিয়কান্তির কী উৎসাহ! নিউইয়র্কে একবার যাত্রা করতেই হবে! বই-এর দোকানে ঘুরে ঘুরে একগাদা নাটক কিনে ফেলল। প্যাক করে সেগুলোকে পাঠিয়ে দিল নিউইয়র্ক। তিন রাত্রি সীমাদের নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেল। কিন্তু মেয়ে দেখার কোনও উৎসাহ দেখাল না।

অবশেষে কলকাতা আসার দ্বাদশ দিবসে, সীমার চাপে, অমিয়কান্তি একটি মেয়ে দেখতে হাজির হল যোধপুর পার্কে একটা বড়সর বাড়ীর ঢালাও বৈঠকখানায়। এই সেই মেয়ে যে কোম্পানীর আমলে কলকাতার মেয়েদের নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিল। মেয়ের বাবা ব্যারিস্টার, দাদা ব্যবসায়ী, ছোট ভাই সবেমাত্র এনজিনীয়র হয়ে বেরিয়েছে। মেয়েটিকে দেখতে বেশ। মানে, পনের গজ দূর থেকে দেখতে অমিয়কান্তির চোখে বেশ ভালই লাগল।

কথাবার্তা আলাপ যেসব পথ ধরে সাধারণত চলে যোধপুর পার্কের ঢালাও ড্রয়িংরুমে তার ব্যতিক্রম হল না। ব্যারিস্টার ও ব্যবসায়ী একসঙ্গে গভর্নমেন্টের খিস্তি করল, ঘোষণা করল, এ-দেশের কিসসু হবে না; ব্যারিস্টার ঘোষণাটা করল ইংরিজীতে, ব্যবসায়ী বাংলায়। দুজনেই, দেখা গেল, 'ইয়ংগ'-দের ওপর বেজায় চটা; 'দেশের ভবিষ্যৎ যাদের হাতে তারাই ধ্বংস ও নৈরাজ্যের পথে নেমেছে।' ক্ষেদ করলেন ব্যারিস্টার, ব্যবসায়ীর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে। দুজনেরই আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণা : অমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, অবশ্যি হিপি আর সেকস আর ড্রাগস আর নিগ্রোগুলোকে বাদ দিলে। এসব আলোচনায়, বলা বাহুল্য, অংশ গ্রহণ করল না যাকে দেখতে অমিয়কান্তির সদল উপস্থিতি, যার নাম সরমা। সে তার পরিপাটি সাজ নিয়ে, গহনা নিয়ে, দেহনিসৃত শানল সুরভি নিয়ে, কোম্পানীর আমলে কলকাতার মেয়েদের সম্বন্ধে জ্ঞান গবেষণা নিয়ে, চুপ করে বসে রইল। অমিয়কান্তি অবশ্য লক্ষ্য করল সরমার বড় বড় কালো চোখ কয়েকবার দেখে নিয়েছে পুরো অমিয়কান্তি মজুমদারকে, বিশেষ করে কানের পাশে সাদা চুলগুলিকে।

সীমা মৃদু পর্দায় প্রদর্শনীর নায়িকার সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ অমিয়কান্তিকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন ছুড়ল, 'দাদা, এঁকে তোমাকে জিজ্ঞাস্য কিছু আছে কি?'

অমিয়কান্তির টনক নড়ল। বুঝল, প্রদর্শনীর নায়িকাকে প্রশ্ন করতে হবে। কোনও প্রশ্নই মাথায় খেলল না। অতএব প্রশ্ন করল, 'আমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন কি?'

উত্তরে প্রদর্শনীর নায়িকা লাজুক বোকা-বোকা হাসল। মার মানে, আপনার বয়স ঠিক কতো জানতে পারি কি?

অমিয়কান্তির মাথায় একার একের পর এক প্রশ্ন হঠাৎ খেলে যেতে লাগল। মেঘময় আকাশে একের পর এক বিদ্যুৎ খেলবার মতো।

'কোম্পানীর আমলে কলকাতায় যে স্ত্রীলোক বাস করতো, জানলেন কি করে?'

উত্তর : লাজুক অপ্রতিভ হাসি; নড়ে-চড়ে বসা।

'বিয়ে করেই আমেরিকা চলে যেতে এবং সারা জীবন আমেরিকায় বাস করতে আপনার ভালো লাগবে?'

উত্তর : খুশিখুশি হাসি। সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন।

'নিজের ইচ্ছেয় ভালো লাগবে, না বাবা-দাদা-মা-মাসিপিসির ইচ্ছেয়?'

সুন্দরী
তোমার
মনের মত
রেসিয়ার

Re-zina
BRASSIERS

রেজিনা ইণ্টারন্যাশনাল (ইণ্ডিয়া)
৬৬এ, বিডন স্ট্রীট, কলি-৭০০০০৬

ফাটা মালতী সিংহ

উত্তর : শাড়ির আঁচল দ্বারা মুখ ঢাকা। হেসে কিছুটা গড়িয়ে পড়া।

'আমার বয়স কতো মনে হয় আপনার?

উত্তর : দৃষ্টিতে ভয় ও সন্দেহের দ্রুত ছায়া-গতি; চোখে-মুখে অসহায় ভাব, যার পরিষ্কার মানে, আমি কি করে জানবো? এরা তো আমাকে বলেছে বাত্রিশ।

'পঞ্চাশের বেশি মনে হয় কি?'

উত্তর : সভয় দৃষ্টিপাত। দ্রুত মস্তিষ্ক সঞ্চালন দ্বারা ঘোষণা : মনে হয় না।

'আপনার বয়স শুনেছি তেইশ। দেখে কিন্তু আপনাকে পঁচিশ-ছাব্বিশ মনে হয়। তেইশটাই কি ঠিক?

উত্তর : আরক্ত মুখ। বিব্রত দৃষ্টি। চিন্তা। 'আমার বয়স এখন চব্বিশ।'

'আমার নাম অমিয়কান্তি মজুমদার। আপনার?'

'সরমা সান্যাল।'

'কম্পিউটার কাকে বলে জানেন?'

'কথাটা শুনেছি। মানে ঠিক জানি না।'

'গান ভালোবাসেন?'

'খুব।'

'গান করেন?'

'চেষ্টা করি।'

'শিখছেন?'

'আট বছর ধরে শিখছি।'

'গুরু কে?'

'এ টি কানন।'

অমিয়কান্তি এবার বলল, 'শুনে খুব সুখী হলাম। আমি একদা পঙ্কজ মল্লিকের ছাত্র ছিলাম।'

সরমা সান্যাল কৌতূহল চোখে তাকাল সোজাসুজি অমিয়কান্তির দিকে।

অমিয়কান্তি বলল, 'আমি অনেক প্রশ্ন করেছি, মাপ করবেন। এবার আপনার এক আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। স্বচ্ছন্দে যে কোনও প্রশ্ন করতে

সরমা সান্যাল প্রশ্ন করল একটিই : 'আপনার কোনও মেমসাহেব বান্ধবী আছে না কি?'

ব্যারিস্টার ও ব্যবসায়ীর প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম।

অমিয়কান্তি জোরে হেসে উঠল, 'বর্তমানে নেই। মানে, কয়েক বছর নেই। তার আগে ছিল।'

ব্যারিস্টার ও ব্যবসায়ীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে যোধপুর পার্ক থেকে অমিয়কান্তিরা নিউ আলিপুরে চলে এল। সীমা জানতে চাইল দাদার অভিমত। অমিয়কান্তি বলল, সরমা সান্যালকে খুব ভালো লাগল।'

'অন্য তিনজনকে না দেখে কথা দেওয়াটা কিন্তু ঠিক হবে না, দাদা।'

অমিয়কান্তি বলল, 'আর কাউকে দেখার দরকার নেই।'

সীমা খুশি না হয়েও খুব-খুশি দেখিয়ে বলল, 'তাহলে এক দৃষ্টিতেই নায়ক নির্বাচিত?'

অমিয়কান্তি গম্ভীর স্বরে বলল, 'অপর্ণা সান্যালকে খুব ভালো লাগল। কিন্তু বিয়ে একে করছি না আমি।

সীমা ও তার স্বামী আকাশ থেকে পড়ল।

অমিয়কান্তি বলল—'তোকে মেয়ে বেছে রাখতে বলে ভুল ও অন্যায় করেছি। ক্ষমা চাইছি সেজন্যে।

তিন দিন পরে আমি দিল্লী যাচ্ছি সেখান থেকে পুণা। এ যাত্রা বৌ আর জুটল না।'

হোস্টেলে ফেরার আগে সীমাকে বলল—অমিয়কান্তি, সরমা সান্যালদের আমিই জানিয়ে দেব।

তোকে আর এ নিয়ে বিব্রত হতে হবে না।

হোটেলে পৌঁছে সরমা সান্যালকে পাঁচ ছত্র পত্র লিখল অমিয়কান্তি : 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড় আনন্দ হল। শুধু সুন্দরী ও সঙ্গীতজ্ঞা নন আপনি। আপনার সপ্রতিভতাও আকর্ষণীয়। আপনার ও আমার বিবাহ হতে পারে না। তের বছরের বড় স্বামী পেয়ে আপনি সুখী হবেন না। আচ্ছা এতো গুণ আপনার একটু সাহসী হতে পারেন না? আমি না হয় আপনার 'মেসেজ' পেয়ে গেলাম; অন্য কেউ যদি না পায়? ইতি অমিয়কান্তি।

।। ছয় ।।

পরের দিন কলেজ স্ট্রীটে প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে ফুটপাতে অমিয়কান্তি কয়েকখানা পুরাতন নাটক খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল মাঝবয়সী এক টেকো-মাথা ভদ্রলোক তার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ।

অমিয়কান্তিও তার দিকে তাকাতে লোকটি সাহস সঞ্চয় করে সংশয়ের সঙ্গে বলে উঠল অ-মিয়-কা-ন্তি ম-জু ম দা র না।'

বিস্মিত অমিয়কান্তিকে বিব্রত করে লোকটি বলে চলল 'ঠিক চিনেছি। তুমি আমাকে চিনতে পারো নি। না দোষ তোমার নয়, দোষ কালের এবং এই টাকের। আমি অধর, অধর ভট্টাচার্য। মনে পড়ছে?

অমিয়কান্তি চেঁচিয়ে উঠল 'অধর! অধর ভট্চাজ! তুমি! তুই! কি আশ্চর্য!

অধর ভট্টাচার্য বিজ্ঞ হাসির সঙ্গে বলল—'আশ্চর্য বৈকি? জীবনটাই আশ্চর্য! তুমি কবে এ শহরে উদয় হলে। তুমি তো এখন আমেরিকান সিটিজেন।'

অমিয়কান্তি প্রতিবাদ করল 'মোটেই না! আমি জাতীয় নাগরিক ভারত সরকারের প্রদত্ত পাসপোর্ট আছে আমার। আর যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাস ঐ তুমিটিকে ছুঁড়ে ফেলে দে। কস্মিনকালেও তুই আমাকে তুমি বলিস নি আজও বলা চলবে না।

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল কফি হাউসের দিকে।

দু কাপ কফি আর গরম সিঙ্গারার অর্ডার দিয়ে অমিয়কান্তি বলল—'বারো বছর পর!'

অধর বলল—'তুই যেবার আমেরিকা থেকে প্রথম ছুটিতে এলি একদিন পূর্ণ সিনেমায় দেখা হয়েছিল।'

অমিয়কান্তি বলল—'তখনও তোর মাথায় টাক পড়েনি। টাক অদ্ভুতভাবে মানুষের মুখের চেহারা বদলে দেয়।'

অধর বলল—'টাক কি ভায়া সহজে পড়ে! অনেক কিছু ঘটে গেল এই বারো বছরে।'

হেড লাইনগুলি শুনিয়ে দে, পরে বিস্তৃত খবর শোনা যাবে।

'বাবা-মা মরলেন। চারটে সন্তান হল। চাকরী গেল। এক বছর বেকার হয়ে বসে থাকতে হল। টাক পড়ল।'

তুই চারটি সন্তানের বাবা। গুড হেভেসন?'

পঞ্চমটি আসছে। আর তুই!

'আমি? আমি শালা বিয়ে করেই উঠতে পারলাম না!'

বলিস কি? বিয়ে করিস নি। পনের বছর আমেরিকায় আছিস বিয়ে করিস নি?'

'যে প্রয়োজনে এ দেশে বিয়ে করতে হয় সে প্রয়োজন মেটাতে বিদেশে বিবাহের দরকার হয় না।

তাই বিয়ে করাটা দুরূহ হয়ে ওঠে।'

'বুঝলাম। এতো টাকা দিয়ে করিস কি?'

'খাই দাই বগল বাজাই। তোর কথা বল। চাকরী গেল কেন?'

শ্যাইকে খোগ দিয়েছিলাম।'

'এখনও ওসব করছিস?'

তার মানে? এখন তো বেশি করা দরকার।

অমিয়কান্তি বলল—রাজনীতি নিয়ে তর্ক নয় নয় নয়। আমি মাত্র দুদিন আছি কলকাতায়।'

'কোথায় আছিস?'

পার্ক হোটেলে।

'ওরে বাব্বা! তোর মা একটা মাসতুতো বোন ছিল!

এখনও আছে। আর তো তিনকুলে কেউ নেই।'

'বেড়াতে এসেছিস?'

বেড়াতে এবং ইচ্ছে ছিল বিয়ে করতে। সীমাকে লিখেছিলাম দু-একটি মেয়ে বাছাই করে রাখতে।

চার চারটি বাছাই করেছিল। তার একটিকে ভাল দেখে এলাম।'

'তাই নাকি! কেমন দেখলি!'

খুব তরতাজা মেয়ে।

'পছন্দ হল?'

মেয়ে তো ভালোই। কিন্তু তার অন্যের সঙ্গে প্রেম আছে।

তাই নাকি? তুমি বুঝলে কি করে?

বুদ্ধিমতী মেয়ে নিজেই আমায় ইংগিতে বুঝিয়ে দিল।

যাক গে। এখনও তো তিনটি মেয়ে হাতে আছে তোমার।

'আর আমি মেয়ে দেখছি না।'

সে কি হে! কেন?

'আমার ধারণা শতকরা অন্তত পঞ্চাশটি বাঙ্গালী মেয়ে যৌবনে পা দিয়ে কাউকে না কাউকে ভালোবেসে ফেলছে। ছেলেদের বেলা শতাংশ হয়তো বেশি হবে। অথচ বিবাহের সময় প্রেমিক-প্রেমিকাদের সাহস হচ্ছে না বাপ-মা অভিভাবকদের অমান্য করে নিজেদের পছন্দমত স্বামী-স্ত্রী বেছে নেবার। আমি চাইনে এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসতে যার মন অন্যত্র আকৃষ্ট।

বাকী তিনটির একটিরও ভালোবাসার পাত্র না—থাকতে পারে।

অসম্ভব নয় আবার সম্ভবও। আমি রিস্ক নিতে চাই নে।

আমেরিকায়ই তো কাউকে বিয়ে করলে পারিস। দেশে তো তোর কেউ নেই।

বিয়ে ব্যাপারটা পরীক্ষা নয় যে খাটলেই ভালো করা যায়, চাকরী নয় যে যোগ্যতা থাকলে মিলেও যেতে পারে। এটা একটা দৈব দুর্ঘটনা। কোন গ্রহের সংযোগ কোন গ্রহ যাত্রা খাবে কেউ বলতে পারে না।

ঘড়ি দেখে অধর ভট্টাচার্য বলল—তুই কি করছিস আজ সন্ধ্যেবেলা?

অমিয়কান্তি বলল—কিছুই না। ভাবছি একটা ট্যাকসিতে বসে বললো স্ফূর্তির ঘরে নিয়ে চল।

তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তার চেয়ে চল না আমার বাড়ী। আমার বৌকে তো দেখিসই নি তুই। একেবারে ডালভাত খেয়ে আসবি।

তোর বৌ তো পোয়াতি! আমার সামনে বারই হবে না!

খুব হবে। তিন মাসও হয়নি এখনও।

তোরা ছাড়া আর কে আছে তোর সঙ্গে?

কেউ নয়। শুধু আমার ছোট বোন রাধা।

সেই রাধা যাকে পাঁচ-ছয় বছরের দেখেছিলাম?

দেখেছিলি নাকি? এখন আঠারো পেরিয়ে গেছে। এবছর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ করবে ভালোই, বুদ্ধি আছে। গান জানে বেশ।

তুই কি রাধার জন্যে পাত্র খুঁজছিস নাকি? দূধের খুকি তো!

তা ভালো ছেলে পেলে বিয়ে দিয়ে দি। দিতে তো হবে আমাকেই! আবার আমারও একটি মেয়ে আছে। যিনি আসছেন তিনি যদি কন্যা হন তাহলে তো আর একটি ছোরা!

অমিয়কান্তি বলল—আমি হুট করে হাজির হলে তোর বৌ-এর অসুবিধে হবে না?

অধর ভট্টাচার্য বলল—এ কি তোর আমেরিকা পেয়েছিস! এ হলো বঙ্গদেশ। এখানে গৃহস্থের দ্বার অতিথির জন্যে সর্বদা খোলা। সবাই তোকে দেখে দারুণ একসাইটেড হবে। জলজ্যান্ত একটি আমেরিকান বাঙ্গালী—যাদুঘরেও দেখতে পাওয়া যায় না চিড়িয়াখানায়ও না।

অধর ভট্টাচার্যের বাসা মানিকতলা বাজারের কাছেই গোঁসাইবাগান লেনটে।

ট্যাকসি বিদায় দিয়ে ফ্লাট বাড়ীর তিনতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে অমিয়-

বিদেশের ফেষ্টিভ্যালে দেখাবার মত ছবি।
—আনন্দবাজার

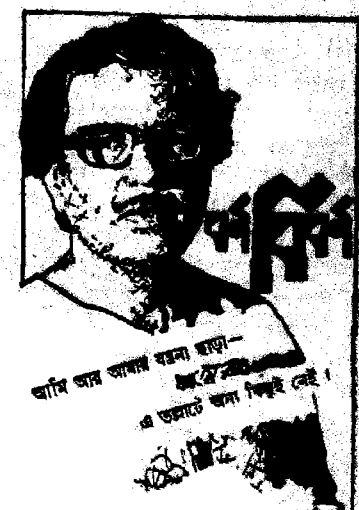

কাহিনী
সন্তোষকুমার ঘোষ
নাট্য সম্পাদনা ও পরিচালনা
বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী
সঙ্গীত
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
চিত্রশিল্পী
পিন্টু দাসগুপ্ত
প্রযোজনা
ফিল্ম ও পাথ
অভিনয়
ধীরেশ মুখোপাধ্যায়
মমতা চট্টোপাধ্যায়
ইন্দ্রিতা রায়

কান্তি মিষ্টি মসলা মেয়েলি কণ্ঠে দেশ রাগের কসরৎ শুনতে পেল। বেল টিপতে দরজা খুলল যে মহিলা তিনি নিশ্চয় অধরের স্ত্রী। ঠিক তাই: অধর পরিচয় করিয়ে দিতে মহিলা একমুখ বিব্রত হাসি দিয়ে অমিয়কান্তিকে অভ্যর্থনা করল। বলল—আপনার কথা অনেকবার শুনেছি আজ চোখে দেখার সৌভাগ্য হল। বসবার ঘরে ঢুকতেই চারটি ছেলে-মেয়ে আট চোখ অমিয়কান্তিকে অবাক হয়ে দেখে চলল। ডাকলেও তারা কাছে এগুলো না, দূর থেকে ভয় সন্দেহ কৌতূহল সংমিশ্রিত মুখে রইল দাঁড়িয়ে। অবশেষে অধরের বড় মেয়েটি অমিয়কান্তির কাছে এগিয়ে এল। তার সঙ্গে আলাপ জমে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছেলেও গা-ঘেষে এসে দাঁড়াল। শুধু বড় ছেলে, যার বয়স তেরো, পাশের ঘরে চলে গেল।

অমিয়কান্তিকে বসিয়ে অধর ভট্টাচার্য বাথরুমের ঘরে ঢুকল। তার স্ত্রী রান্নাঘরে। মিনিট দশেক পরে ট্রেতে চা নিয়ে ঢুকল: কী আশ্চর্য! অমিয়কান্তির চোখ অপলক তাকিয়ে রইল তার মুখে, এমন নরম নির্মল পবিত্র দৃষ্টি দেখে নি সে কোনও দিন কোথাও, এমন কমনীয় সৌন্দর্য সে দেখেনি কোনও মুখে কোনও কুমারীর চুল মনে হয়নি এমন গভীর মমতার ঢেউ-এর ওপর ঢেউ; কোনও দখানি কুমারী হাত কথা বলেনি কোনও-দিন এমন নিবিড় নিশ্চিত আশ্বাসে। কোনও নারীদেহ কোনওদিন এমন তরঙ্গিত মনে হয়নি অমিয়কান্তির।

সোফার টেবিলে চা রেখে প্রণাম করতে নত হল সেই সুরভি কন্যা, অমিয় তার হাতখানি ধরে তাকে তুলল। নরম গরম পরম প্রশান্তি পেল নবযৌবন ত্বকের স্পর্শে।

তোমার নাম রাধা না? অমিয়কান্তির মনে হল রাধা নামটি বেশ উচ্চারণে জিভে একটা সুন্দর ধারা লাগে আমি তোমাকে চিনি তুমি আমাকে চেন না।

রাধা ছোট ছোট দুটি বিস্ময়কর চোখে বুঝিয়ে দিল কথাগুলির অর্থ তার কাছে সাফ নয়।

বারো বছর আগে আমি একদিন এসেছিলাম অধরের খোঁজে। তখন তোমরা কৈলাস বসু স্ট্রীটে থাকতে। তুমি দরজা খুলে বলেছিলে অধর বাড়ী নেই।

রাধা মনে করতে পারল না সেই অনৈতিহাসিক ঘটনাটিকে।

তোমার মনে নেই। তুমি তো সুন্দর আধুনিকাল গান শিখছ। কার কাছে শিখছ?

রাধা বলল—কাছেই একটা স্কুল আছে।

এবার কলেজে পড়বে?

ইচ্ছে আছে।

কি সে অনার্স নেবে?

রাধা লাজুক হাসল। অমিয়কান্তির মনে পড়ল না এমন মধুক্ষরা হাসি এর আগে সে দেখেছে।

আগে রেজাল্ট কি হয় দেখা যাক বলল রাধা।

তবু নিশ্চয় কিছু একটা ভেবে রেখেছ!

রাধা বলল ম্যাথামেটিকস।

অমিয়কান্তি ইমপ্রেসড হল। অংকে মাথা ও ইনটারেস্ট থাকা মানে রাধার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ মন পরিষ্কার। সবকিছু নিয়ে অতিশয় মনে লেগে গেল রাধাকে অমিয়কান্তির।

দু ঘন্টা কাটাল অমিয়কান্তি অধর ভট্টাচার্যের বাড়ীতে—খেল, গল্প করল, হাসল, হাসাল, এবং অনেকবার, কয়েক হাজার বার, রাধাকে দেখল।

বিদায় নেবার সময় অধরকে বলল, 'রাত তো বেশি হয়নি, চল না আমাকে একটু এগিয়ে দিবি।' রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাকসি ধরল দুজনে। অমিয় বলল, 'তোর সঙ্গে একটু কথা আছে। আমার হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি তোকে। ভালো কফি খাওয়াবো। মাল খাস?'

অধর বলল, 'পেলে এক-আধটু খাই বৈ কি!'

'চল, তোকে লিকিউর খাওয়াবো।'

'ফিরতে রাত হয়ে যাবে না?'

'একদিন না হয় রাতই হল! আছিস তো আমার সঙ্গে।'

রাস্তায় অধরের সঙ্গে অমিয়কান্তি কথা বলে গেল, মন তার অন্য সুরে গিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হল। পার্ক হোটেলে পৌঁছে রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে লিফট চেপে দুজনে তৃতীয় তলায় উঠে অমিয়কান্তির ঘরে ঢুকল। রুম সার্ভিসকে ফোনে বলল অমিয়-কান্তি দু পিয়ালা কফির জন্যে। লিকিউর একটু পরে।

ভণিতা না করে সরাসরি কথাটা পারল অধরের কাছে অমিয়কান্তি মজুমদার।

'তোকে তো বলেছি আমার বৌ-খোঁজার কথা।'

অধর বলল, 'আমার মনে হয় তোর আরও দু-একটি মেয়ে দেখে নেওয়া উচিত।'

অমিয় বলল, 'আমার বয়স এখন বিয়াল্লিশ। আমি বছরে বত্রিশ হাজার ডলার মাইনে পাই। ইমিগ্রান্ট ভিসা আছে। বাকী কর্মজীবন আমার আমেরিকাতেই কাটবে। এমন কি, আমেরিকান সিটিজেনও সম্ভবত হয়ে যাবো।'

অধর বলল, 'তাতে কি? বাঙ্গালী মেয়েরা তোর মতো বর পেলে বর্তে যাবে।'

অমিয় বলে চলল, 'আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো—কোনও রকম গোলমাল নেই। আমি রোজ ব্যায়াম করি। আমি অসচ্চরিত্র নই। অনেকদিন আগে একটি আমেরিকান মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম। সে ব্যাপারটা ভেঙ্গে যাবার পর আর কারুর সঙ্গে প্রেম হয়নি আমার। বলছি না, তারপর থেকে আমি ব্রহ্মচর্য করে আসছি। বলছি, তার পরে আমার আর কোন ইমোশনাল ইনভলমেন্ট হয়নি।'

অধর প্রশ্ন করল, 'এতোদিন বিয়ে না-করে আছিস কেন?'

অমিয় উত্তর দিল, 'সেই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হতে পারত। সম্পর্কটা ভেঙ্গে যাবার পর অন্য কোনও আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানোর ইচ্ছে মরে গেল। মানে, নিজের উদ্যোগে, ভালোবাসাবাসি করে, বিয়ের ব্যবস্থা করার ইচ্ছে বা উৎসাহ আর হল না। আর তুই তো জানিস, বিয়ে দিয়ে দেবার মত লোক কেউ নেই আমার!'

'তোর কিন্তু বয়স হয়নি,' সান্ত্বনা দিল অধর। "বিয়েটা করেই নে এবার।'

অমিয়কান্তি বলল, 'চুল পাকছে—দেখতেই পাচ্ছিস, টাকও পড়েছে—তবে এমন বেশি নয়। আমাদের পরিবারে নিশ্চয় তাড়াতাড়ি চুল পাকার ধাত। বয়সটা আমার কোনও প্রবলেম নয়। প্রবলেম হল আমি একা এবং অসহায়। আমার বাপ-মা নেই, ভাইবোন নেই, কাকাজ্যাঠামাসিপিসি নেই। যারাও আছে, সম্পর্ক রাখিনি আমি, কেবল সীমার সঙ্গে ছাড়া। মেয়ের বাপ ভাইদের মনে হতে পারে আমি নিশ্চিন্ত নৌকা নই মেয়েকে তুলে দেবার।'

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অধর বলল, 'আমার চোখে তো তুই বিরাট জাহাজ।'

অমিয়কান্তি বেয়ারাকে শেরী আনবার হুকুম দিয়েছিল। কফির পেয়ালা খালি করে সে অধরের চোখে চোখ রেখে বন্দুক ছুড়ল: 'রাধার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে?'

অধরের হাত থেকে কফির পেয়ালা কার্পেটে পড়ে যেতে গিয়েও পড়ল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অধর অমিয়-কান্তির দিকে। দু মিনিট কারুর মুখে কথা নেই।

অধর যখন কথা বলল, বলল নিজেকেই: 'চব্বিশ বছরের তফাৎ! বড্ড বেশি তফাৎ হয়ে যায়।'

অমিয়কান্তি অন্তিম উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইল।

অধর নিজেকেই বলতে লাগল, 'অনেক, অনেকগুলো প্লাস-পয়েন্ট আছে। মাইনাস পয়েন্ট মাত্র একটাই।'

অমিয়কান্তি অপেক্ষা করল।

অধর এবার তার প্রশ্নের জবাব দিল, 'আমার নিজের আপত্তি নেই। গীতা,

ক্যাডবেরীস্ 5 স্টার

ক্রীমে ভরপুর মিল্ক চকলেটে
মোড়া মজাদার ক্যারামেল আর সুস্বাদু
নুগাটিনের পুরের ওপর পুর !

স্বাদে অতুলনীয়-কেউ ছাড়তে চায় না

আমার স্ত্রী, সম্ভবত আমারই মতো ভাববে। রাধুকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

অমিয়কান্তি বলল, 'আমি পর্শু দিল্লী যাচ্ছি। ভেবেছিলাম দিল্লী থেকে পুণা চলে যাবো—ছুটির বাকি দিন-গুলি বোম্বেতে কাটিয়ে ফিরে যাবো সিঙ্গাপুরকে। আমি তোকে তিন-চার দিন মাত্র সময় দিতে পারবো। আজ মঙ্গল-বার। শুক্রবার তুই আমাকে একটা তার পারামি দিল্লীতে আমার হোটেলে। মা বলতে পিছুপা হোল সে। হ্যাঁ বা না জানালেই হবে। ঠিক আছে?'

অধর বলল, 'আছে।'

'যদি তোর সিদ্ধান্ত নেগেটিভ হয় তাহলে তো কোনও সমস্যা নেই। যদি পজিটিভ হয়, বিয়ে হবে আজ থেকে দশ দিনের মধ্যে। আমার আর মাত্র চোদ্দ দিন ছুটি আছে।'

'যাড়াম যাবে না?'

'যাড়াতে চাইলে।'

'এতো অল্প সময়ে ব্যবস্থা করে ওঠা শক্ত হবে।'

'জানি, কিন্তু উপায় নেই। বিশেষ কিছু করতে হবে না তোকে। রাধাকে পার্সোনালি যা কিনতে চাস তার চেয়ে বেশি কিছুই দিতে হবে না। দরকার হলে আমি তোকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবো। এ ব্যাপারটা তুই আর আমি ছাড়া আর কারুর জানবার প্রয়োজন নেই।'

শেষটা পার করে দুজনের মনই একটু চাঙ্গা হল। অমিয় ট্যাকসি করে অধরকে বাড়ী পৌঁছে দিল। অধর নেমে যাবার সময় অমিয়কান্তি বলল, তোকে, তোদের দুজনকে একটা বিষয়েই মনস্থির করতে হবে। আমার ঘাড়ে লোকের ছাতে রাধাকে দিতে পারবি কিনা। 'না' বলতে দ্বিধা করিস না। বাঁসও আমি হ্যাঁ শুনে-বার আশায় থাকবো আগামী চারদিন। আর একটা কথা। রাধার পূর্ণ মত না নিয়ে হ্যাঁ বলিস না কিন্তু। ওকে তোরা বোঝাতে পারিস, জোর করিস না একটুও।'

অধর বলল, 'তুই লোকটা কিন্তু খুব খারাপ নোস।'

চতুর্থ দিনে অশোকা হোটেলে অমিয়কান্তি মজুমদার টেলিগ্রাম পেল : আমাদের সংগে জানাচ্ছি, আমাদের জবাব পজিটিভ। রাধা ভেবে-চিন্তে পুরো পুরি সম্মতি দিয়েছে। এবার তোমার নির্দেশের অপেক্ষায়। অধর।'

দশদিন পরে অমিয়কান্তি মজুমদার বিয়ে করল রাধা ভট্টাচার্যকে। বিয়ের চতুর্থ দিনে রাধা মজুমদার এয়ার-ইণ্ডিয়া জাম্বোতে স্বামীর পাশে বসে নিউইয়র্ক যাত্রা করল।

।। সাত ।।

১৯৭০ সালের জুন মাসে তপোময় ঘোষাল কলকাতা এল বিয়ে করবার বিশেষভিত উদ্দেশ্যে। দমদম বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা করতে হাজির ছোটভাই মনোময়, এবং তার বান্ধবী, সুলেখা, যার সংগে তার বিবাহ সম্ভাসন্ন। লেক গার্ডেনস-এ নিজেদের বাড়ীতে পৌঁছে মা ও বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে তপো-ময় লক্ষ্য করল, দুজনেই বৃদ্ধ হয়েছেন এবং দুর্বল। তপোময়ের টাকাতেই বাড়ী-টার দোতলা উঠে গেছে; দোতলায় তপো-ময়ের জন্যে বড়ো একখানা ঘরও সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। অন্য বেডরুমটা মনোময়ের। নিচে একটা ঘর খালি করা হয়েছে। বিয়ের পর মনোময় ও সুলেখা এ ঘরটাতে চেম্বার খুলবে। আনুষংগিক কিছু রদবদলের কাজ চলছে বাড়িটাতে।

দুপুরে বিশ্রামের পর মা ও মনো-ময় বিবাহ প্রসংগ তুলল, বাবা উপস্থিত রইলেন। তপোময় শুনল, তার জন্যে অনেক মেয়ে দেখা হয়েছে, অন্তত দশটি। বেছে বেছে মা ও মনোময় দুটিতে এসে পৌঁছেছে। বাবাও এ মেয়ে-দুটিকে দেখেছেন; তিনজনেরই খুব পছন্দ। এখন তপোময়কে বাছতে হবে দুয়ের মধ্যে একটিকে। ইচ্ছে করলে সে অবশ্যি বাকী আটজনকেও দেখতে পারে।

তপোময় দশটি বিবাহযোগ্যা, বিবাহ-ইচ্ছুক বাংগালী মেয়ের ফটো দেখল। প্রথম দৃষ্টিতে সবাইকে একই রকম মনে হল; এমন কিছু সুন্দরী সমাগম নয়, তোমরা যাই বলো! শ্রী আছে, হ্যাঁ, তাকিয়ে দেখলে মিষ্টিও লাগে, সব মিয়ে রায় দাঁড়ায়, মন্দ নয়। সব বাংগালী মেয়ের চোখই কি একরকম? সব বাংগালী মেয়েরাই কি আজকাল স্বল্প-স্তনী হয়ে গেছে? একটি মাত্র মেয়েকে পূর্ণ-স্তনী বলা যেতে পারে। দশটি মেয়ের একটিকে মাত্র দীর্ঘাংগী মনে হল। ছুটির চোখে চশমা।

মা ও মনোময়ের প্রশ্নের জবাবে তপোময় বলল, 'শেষ বাছাইটাও তোমরাই করে দাও। আমি একটির বেশি মেয়ে দেখতে পারবো না।

দেখা গেল মা ও মনোময় দুদিকে ছেলে রয়েছে। মা ছেলে রয়েছেন যার দিকে তার নাম মণিমুকুল। এ সেই পূর্ণ স্তনী কন্যা। একটু মোটার দিকে। এম-এ পড়ছে, আসছে বছর ফাইনাল। ইকনমিকস। গোড়া ব্রাহ্মণ পরিবার, এ পরিবারের মেয়ে উটকো হতে পারে না। বাপ-মার শাসন আছে। আজকাল কিছুই বলা যায় না কোথায় কি জটিলতা বসে আছে। বাবার অবস্থা ভাল। সল্ট লেকে নতুন বাড়ী করেছেন। বাবা কি করেন? কর্পোরেশনের ইনর্জিনিয়ার, মেডিকেল কন-ট্রাকশন বিভাগের ডেপুটি চীফ। না বলতেদুর জানা গেছে, সব লোক, অসদু-পায়ে অর্থ উপার্জন করেন নি। দুই ছেলে দুই মেয়ে। ছেলেরা কাজ করছে হায়দরাবাদ ও পুণায়, দুজনেই ইনর্জি-নীয়র। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মণিমুকুলই কেবল এখন বাবা-মার সংগে সল্ট লেকের বাড়ীতে বাস করছে।

মনোময় বলল—মার খুব পছন্দ মণিমুকুলকে।'

মা কারণ দেখিয়ে বললেন—'শান্ত শান্ত দেখতে। কম কথা বলে। মুখখানাও সৌম্য প্রকৃতির।'

পরের দিন তপোময় জানাল মার পছন্দ মেয়েটিকেই সে দেখতে যাবে।

সল্ট লেকে মণিমুকুলের বাবাকে খবর পাঠান হল। তপোময়ের কলকাতা পৌঁছনর তৃতীয় দিন মনোময়কে সংগে নিয়ে ট্যাকসি চেপে সে সল্ট লেকে উপস্থিত হল মণিমুকুলকে দেখতে।

মা যা বলেছিলেন তাই। শান্ত শান্ত দেখতে। মুখখানা সদ্য চন্দনের আড়ালে চোখ দুটি রাঙ্গায়। মেয়েটি বিষন্ন, খুশির ঝিলিক নেই মুখে।

জন্মমাত্রের চাপ উঠল প্রশ্ন করবে।

মনোময় ইতিমধ্যেই মণিমুকুলের সংগে কথাবার্তা বলে আবহাওয়াটাকে খানিকটা হালকা করে এনেছিল।

তপোময় প্রশ্ন করল 'আপনার এম-এ পরীক্ষা কবে?'

মণিমুকুল বলল—'দশ মাস পরে। অবশ্য যদি পরীক্ষা হয়।'

'যাদবপুরেও ঐ অবস্থা?'

মণিমুকুল বলল—'যাদবপুরে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা বন্ধ হয়নি।'

'আপনার তো একনমিকস?'

হ্যাঁ।

'এম-এর পরেও পড়বার ইচ্ছে আছে?'

'সুযোগ সুবিধে হলে আছে।'

আপনি নিশ্চয় তাহলে পরীক্ষার আগে বিদেশ যেতে রাজী হবেন না।

মণিমুকুলের বাবা জবাব দিলেন রাজী না হবার কি আছে? এম-এ পাশটা মেয়েদের পক্ষে এমন কিছু বড়ো কথা নয় বিশেষ করে যে মেয়ের আমেরিকায় বিয়ে হচ্ছে।'

তপোময় মণিমুকুলকে বলল—প্রস্তাবের জবাব দিলেন না তো?

মণিমুকুল নখ দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল—'পরীক্ষাটা দিতে পারলে ভালো হত; তবে—'

তপোময় বলল—'এতোটা এগিয়ে এসে পরীক্ষা না দিতে পারলে আপনার দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।'

মণিমুকুল কপালের ঘাম মুছল।

এক একজন উঠে গিয়ে এয়ার-কনডিশন যন্ত্রের পাখার তেজ বাড়িয়ে দিল।

তপোময় বলল—'আমার আর তিনটি প্রশ্ন আছে।'

মণিমুকুল তৈরি হল।

'আপনি না-গলিয়ে ভাত রাঁধতে পারেন?'

মণিমুকুল বলল—'চারবার চেষ্টা করেছি। দুবার পেরেছি। দুবার ভাত গলে গেছে।

নিঃসঙ্গতা কেমন লাগে আপনার?

খারাপ লাগে না।

'এবার আমার তৃতীয় ও শেষ প্রশ্ন' তপোময় বলল—আপনি হয়তো জানেন মা ও মনোময় দশটি মেয়ের ফটো জীবনী ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাছাই করতে করতে শেষ পর্যন্ত দুটিতে এসে ঠেকে গিয়েছিল। সে দুটির মধ্যে আমি একটিকেই দেখতে রাজী হয়েছি। সুতরাং বুঝতে পারছেন নিজেকে অনেকখানি তৈরি করেই আমি আজ এসেছি। বিয়ে ব্যাপারটা সহজ ব্যাপার নয়। আমার ফাইনাল ডিসিশনে আসবার আগে আপনাকে তৃতীয় প্রশ্নটি করতে হচ্ছে। অনুগ্রহ করে ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।

'আমার প্রশ্ন হলঃ আপনি আমার সম্বন্ধে যা জেনেছেন তাই কি আপনার পক্ষে মনস্থির করার জন্যে যথেষ্ট? আরও কি কিছু জানতে চান? এবং আমার সঙ্গে বিবাহে আপনার সম্মতি আছে তো?

কর্পোরেশনের সড়ক নির্মাণ বিভাগের ডেপুটি চীফ চেঁচিয়ে উঠলেনঃ 'এ আবার কি রকম প্রশ্ন তোমার বাবাজি! সম্মতি আছে মানে? একশবার হাজারবার লক্ষবার আছে। ওর সম্মতি ছাড়াই আমরা এতোদূর এগিয়েছি ভেবেছ নাকি? হে-হে-হে-হে। আমরা আমেরিকায় বাস করি না বটে কিন্তু তাই বলে সেকেলে অসভ্য নই। মেয়ে এম-এ পড়ছে। তার সম্মতি ছাড়া তাকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা যায় নাকি? হে-হে-হে-হে।'

মণিমুকুল বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল বাবার মুখে।

তপোময় বলল—আপনার কাছ থেকে প্রশ্নের জবাব শুনতে চাই।

মণিমুকুল বলল—'সম্মতি? একশবার হাজারবার...।' তার বাক্য শেষ হল না। সকলের হাসির মধ্যে ডুবে গেল তার কথাগুলো।

দশ দিন পরে তপোময় ঘোষাল আর মণিমুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ে হয়ে গেল।

॥ আট ॥

বিয়ের রাত্রিতে রাধাকে একা পেয়ে অমিয়কান্তি প্রথমবার পুরোপুরি দেখল তার টাটকা ছাঁদা কচি লাউ কচি শশা নতুন বৌকে। দেখে খুশি হল। প্রীত হল।

দেখতে পেল না কি বিরাট ভয় আর অনিশ্চয়তা জমাট পাথর হয়ে আছে আঠারোয় -পা-দেওয়া একটি বাঙ্গালী মেয়ের চোখে মনে বুকে। না দেখতে পেরেও প্রশ্ন করল অমিয়কান্তি, তোমার ভয় করছে রাধা?

রাধা যখন ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ ভয় করছে, অমিয়কান্তি বুঝল উদার কণ্ঠের আশ্বাস শুনে নিজেই বিস্মিত হল, ভয় নেই। আমি এমন কিছু করবো না যাতে তুমি ভয় পাও, ব্যথা পাও। শাড়িটা ছেড়ে শুয়ে পড়ো।

রাধাকে জড়োসড়োভাবে বসে থাকতে দেখে অমিয়কান্তি প্রশ্ন করল, আমার সামনে শাড়ি ছাড়তে লজ্জা করছে! আচ্ছা আমি বাইরে যাচ্ছি।

এবার রাধা একটু হাসল। বলল—'শাড়ি ছাড়বো না।'

সে কি! এই বিয়ের শাড়ি পরে শোবে কি করে, ঘুমুবে কি করে?

রাধা বলল—শাড়ি ছাড়তে নেই। একটু পরে শাড়ি ছেড়ে পরবই বা কি?

অমিয়কান্তি বলল—কেন? পেটিকোট ব্লাউজ কি যথেষ্ট নয় শোবার জন্যে?

রাধা সজোরে মাথা নেড়ে জানাল মোটেই যথেষ্ট নয়।

অমিয়কান্তি বলল, তোমার চেয়ে বয়সে আমি অনেক বড়ো।

রাধা বলল—জানি।

অমিয়কান্তি বলল—আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি হয়নি তো?

রাধা বলল—আপত্তি হলে দাদা-বৌদি কি আমাকে জোর করে বিয়ে দিত?

অমিয়কান্তি বলল—তুমি দেখবে ঐ একটাই যা আমার দোষ। আর কোনও দোষ নেই। আমি নিউইয়র্কে খুব ব্যস্ত থাকি। আপিসের অনেক কাজ। তাছাড়া গান নাটক এসব অনেক কাজ আছে। তুমি প্রচুর সময় ও স্বাধীনতা পাবে। যতো ইচ্ছে পড়তে পারবে। কেউ কোনও ভালো কাজে তোমাকে বাধা দেবে না। গাড়ী চালাতে ঘোড়া-চড়া শিখতে পিয়ানো বাজাতে ব্যালে নাচ শিখতে পি এইচ ডি পর্যন্ত পড়তেঃ কিছুতেই বাধা থাকবে না তোমার যদি না নিজের দিক থেকে বাধা আসে।

রাধা বলল—আমেরিকার কথা বলুন।

অমিয়কান্তি চমকে উঠলঃ তুমি আমাকে আপনি বলবে নাকি?

রাধা ভীষণ বিব্রত হয়ে বলল—না-না। প্রথম-প্রথম...

অমিয়কান্তি বলল—আশা করি দু-একদিন পরে আর বলবে না। আচ্ছা তুমি শুয়ে পড়ো। আমি তোমাকে আমেরিকার গল্প বলবো।

রাধা শুয়ে পড়ল অমিয়কান্তি থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে। দূরত্বটা তাকিয়ে

সুটিং চলছে

বক্সী পিকচার্সের প্রথম নিবেদন

সুশীল রায়ের ছোট গল্প থেকে

লবাস

চিত্রনাট্য | গোবিন্দ দে

পরিচালনা | সুশীল মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত | অধীর বাগচী

ভূমিকায়

সমিত মহুয়া দিলীপ সত্য স্মরাজ ও সন্তু

প্রযোজনা । বক্সি অজিন্দর

অসম্ভব আত্মসচেতন। নিজেও শুয়ে পড়ল। দুঘণ্টা যে কেটে গেল প্রথম রাত্রির মতো। অমিয়কান্তি রাধাকে নিউইয়র্কের জীবনযাত্রার গল্প বলল। রাধার মনে হল এক অদ্ভুত আজগুবি অসভ্য দেশের গল্প শুনছে। অমিয়কান্তির মুখে নিউইয়র্ক অঞ্চলের বাঙ্গালীদের গল্প শুনে রাধার অবাকের অন্ত রইল না। ধারণা হল ওখানকার প্রত্যেকটা মেয়েলোক ভীষণ শিক্ষিত সর্বদা খই ফুটিয়ে ইংরিজী বলে; শাড়িও পরে আবার প্যান্টও পরে বিকিনিও পরে আবার ওয়ান-পিস সুইস সুটও পরে রাত্রিতে নাইটি পরে শোয় বিউটিশিয়ানদের দিয়ে মাসে একবার কেশচর্চা করিয়ে নেয় স্বামীদের ডায়লিং বলে স্বামীরা তাদের বক্স হনি। গল্প শুনে রাধার ভয় হল অনেক, মাঝে মাঝে হাসিও পেল সাহস করে কয়েকটা প্রশ্নও করে ফেলল অমিয়কান্তিকে, লোকটিকে ভালোই মনে হল নিশ্চয় খুব ভদ্র, কিছুই করছেন না-ঐ-যে কি-সব করে এই রাত্রে বেশ দূরেই শুয়ে আছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বঞ্চিতও মনে হলঃ কি যেন সব হবার কথাছিল কিছুই না হবার জন্য হতাশ-হতাশ লাগল। আমাকে বোধহয় খুব একটা ভালো লাগেনি ভদ্রলোকের নিজের মধ্যে নিজের কথা শুনতে পেল রাধা খোলা মতো বিয়ে করেছেন বস। ইচ্ছে হল সরে যেতে অমিয়কান্তির দিকে অন্তত একটু কিন্তু সাহস হল না লজ্জা এসে বাধা দিল। অনেক কিছু ভীষণ ভয়ের দারুন সুন্দর হবার কথা এখনই অদ্ভুত কিছুই হচ্ছে না উনি শুধু আজেবাজে লোকদের গল্প করছেন বালবন্ধুদের কি বলবো তার চেয়ে ঘুমিয়ে পড়া ভালো। হঠাৎ রাধা বুঝতে পারল অমিয়কান্তির গল্প বলা থেমে গেছে সে পড়েছে ঘুমিয়ে।

তৃতীয় রাত্রিতে হোটেল ঘরে অমিয়কান্তি যখন রাধাকে বুকে চেপে ধরল খুলে ফেলল শেষটুকু আবরণ প্রশংসা ও মুগ্ধতার দৃষ্টি আছড়ে পড়ল রাধার সমস্ত শরীরে, রাধা পেট থেকে বেরিয়ে আসা ভয়ের গলা টিপে ধরল দাঁতে দাঁত কেটে অমিয়কান্তিকে গ্রহণ করল নিজের অভ্যন্তরে একটিবার শব্দ পর্যন্ত করল না।

অমিয়কান্তি রাধাকে বাহুতে বেঁধেই ঘুমিয়ে পড়ল। ভালো লাগল রাধার খুব ভাল লাগল নিশ্চিন্ত সংরক্ষিত মনে হল নিজেকে, শুধু ইচ্ছে নামক একটুকরো আগুন রহস্যময়ভাবে রক্তের কোথায় যেন তিকতিক জ্বলতে থাকলো, শরীর চাইল পুনরায় পিষ্ট হতে স্তন দুটি হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে উঠল ওষ্ঠাধর উঠল বার বার কেঁপে।

ঘুমিয়ে পড়ার মানে উচ্চারিত অমিয়কান্তির কথাগুলি কানে বাজতে লাগলঃ তুমি খুব সুন্দর! খুব মিষ্টি! এখন দুদিন তোমার বিশ্রাম। এরপর নিউইয়র্ক।

।। নয় ।।

তপোময়-মণিমুকুলের বাসর ভাঙ্গতে রাত দুটো হয়ে গেল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল মণিমুকুলের, ক্লান্ত আর নিঃশেষিত। বন্ধু আত্মীয় ইত্যাদিরা সবাই বিদায় নিলে সে নিজেই দরজা বন্ধ করল। ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। তপোময়েরও ক্লান্ত লাগছিল, কিন্তু ক্লান্তিকে ছাপিয়ে উঠেছিল তার কৌতূহল ও কৌতুকবোধ। বাসর ঘরের বন্ধুদের সঙ্গে খুব বেশি কথা সে বলেনি, কিন্তু সব ব্যাপারটা তার কাছে বেশ মজার লেগেছে। একই মধ্যে সে নিজেকে বলেছে, এ পর্ব শেষ হলে আসবে সবচেয়ে মজার পর্ব, দুটি প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষ-নারীর এক শয্যায় রাত্রিবাস—সম্ভোগের আইনী সার্টিফিকেট নিয়ে। আমি এই মেয়েটিকে আক্রমণ করলেও তাকে কেউ ধর্ষণ বলবে না। ইনি আমাকে আক্রমণ করলেও তাকে প্রেমকর্ষণ বলতে হবে। কে কাকে আগে আক্রমণ করবে? বরফ ভাঙ্গবার দায়িত্ব কার? পুরুষ বলে তাকেই কি এ দায়িত্ব পালন করতে হবে? যদি না করি? তিন চার দিনের মধ্যে আমাকে নিউইয়র্ক ফেরৎ যেতে হবে। ইনি যাচ্ছেন না। যদি এঁর সঙ্গে আমার সঙ্গম না হয় বিয়ে আমাদের কমপ্লিটেড হবে না। বাংলায় তাকে কি বলে? তা হলে কি আমাকে বলবে অকৃতদার? দারার সঙ্গে করেনি যে তাকে অকৃতদার বলা উচিত নয়?

তপোময় ও মণিমুকুলঃ দুজনে একা হয়ে হঠাৎ বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। এখুনি যা হতে যেতে বাধ্য সেটা ক্রমে উলঙ্গ দৈত্যের মতো দাঁড়াল দুজনের মাঝখানে। দৈত্যের কামার্ত উত্তেজিত অঙ্গ দুজনকেই নিষ্ঠুরভাবে বিদ্ধ করল। তপোময় দৈত্যের হাতের ধাক্কায় সরে এল মণিমুকুলের নিকটতম সামনে। মণিমুকুলের দেহের রক্ত গরম হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে, মুখ থেকে সবটুকু রক্ত চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে, হাত থেকেও—পা থেকেও—তারপর, মনে হল—শরীর থেকেও। তপোময় মণিমুকুলের অবশপ্রায় দেহকে তুলে নিয়ে শয্যায় শুইয়ে দিল। পাঞ্জাবী গেঞ্জি ধুতি খুলে সে শিল্পিং-সুট পরল। মণিমুকুল তখন তার বড় বড় চোখে তপোময়কে দেখছে। সে চোখের দৃষ্টিতে আলোর অভাব দেখতে পেল তপোময়। বিছানায় উঠে এসে মণিমুকুলের পাশে সে শুয়ে পড়ল, একটু একটু করে বিবসনা করল নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে। মণিমুকুল বাধা দিল না। একটা অবশ্যম্ভাবী-মানবীয় দানবীয়যজ্ঞে প্রণয় আহুতি দিয়ে মণিমুকুল কর্তব্য সম্পাদন করল।

ঘুমিয়ে পড়ল মণিমুকুল। ব্লাউজের বোতামগুলি পর্যন্ত না লাগিয়ে। তপোময় দেখল তার সতেজ সুপুষ্ট স্তন দুটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে উঠছে, নামছে। এ স্তনসম্ভার তার নির্ধারিত সময়ের জন্যে সুরক্ষিত স্প্যানিশ বাল্কবীর বুকে থাকে কোনও অংশে হীন নয়। তাকিয়ে তাকিয়ে হাসি পেল তপোময়ের। মা বলছিলেন, গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে মণিমুকুল, পিতামাতার কড়া শাসনের মধ্যে বড়ো হয়েছে। শান্ত স্বভাব, মুখখানায় সৌম্যভাব। অথচ তপোময় জানে—মণিমুকুলের জীবনে সেই প্রথম পুরুষ নয়। আজ যা এক্ষুনি ঘটল তা আরও ঘটেছে মণিমুকুলের জীবনে।

তাতে কোনও আপত্তি নেই তপোময় ঘোষালের। সে নিজে অবিবাহিত অবস্থায় সঙ্গমে বঞ্চিত থাকে নি। মণিমুকুলকে থাকতে হবে এমন দাবী সে করতে পারে নি। তবে তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটু বিধাতার পরিহাস আছে। কোনও মেয়ের সঙ্গে হৃদয়াবেগে জড়িয়ে পড়তে চায়নি তপোময় ঘোষাল। মনে হয়েছে—এ এমন একটা অনাবাদী ভূমি যেখানে তার দ্বারা কোনও চাষই হতে পারে না। সম্ভোগের সুরক্ষিত ব্যবস্থার জন্য তাই তাকে প্রতি মাসে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। মণিমুকুল নিশ্চয় সম্ভোগ করেছে ভালোবেসে। কার সঙ্গে—কবে—কখন? তপোময় বিশেষ একটা কৌতূহল বোধ করল না।

বিয়ের রাত্রির পরেও এক সপ্তাহ তপোময় ও মণিমুকুল একসঙ্গে একঘরে শুয়েছে। প্রথম রজনীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে প্রতি রাত্রে। মণিমুকুল নেয়নি, দেয়ওনি। সঙ্গম নিয়ে কোনও কথা হয়নি দুজনের মধ্যে।

তপোময় বিয়ের আগেই ঠিক করেছিল—মণিমুকুল এম-এ পরীক্ষা দিয়ে নিউইয়র্ক যাবে। বিয়ের পর প্রথম সপ্তাহে তার সেই সিদ্ধান্তই আরও পাকা হয়েছে। দুপক্ষের বাবা-মা কারুর মত ছিল না। বিশেষ অমত ছিল মণিমুকুলের বাবার ও মার। তপোময় কান দেয়নি। একোনমিকসে এম-এ পাশ করলে ওদেশে অনেক সুযোগ-সুবিধে মিলবে। ওটা না-করে যাওয়া ঠিক হবে না। বিশেষ করে মণিমুকুলের যখন এত আগ্রহ—অটল অভিমত তপোময়ের।

নিউইয়র্ক রওয়ানা হবার আগের রাত্রিতে তপোময় মণিমুকুলকে বলল,—তোমাকে যে আমাদের বাড়ীতেই থাকতে হবে এমন কোনও কথা নেই। প্রথম দু-এক মাস থেকো, বাবা-মা খুশি হবেন।

তারপর যেখানে থাকলে তোমার পড়াশোনার সুবিধে হবে সেখানে থেকো, এ ব্যাপারে তোমার নিজের বিবেচনামতো কাজ কোরো। টাকা পয়সার অসুবিধে হবে না, তোমার একাউন্টে প্রতি মাসে দুশ ডলার পাঠাবো, আরও দরকার হলে লিখতে সংকোচ কোরো না। আর যদি কখনও কোনও কারণে মনে করো পড়া ছেড়ে নিউইয়র্ক চলে যাওয়াই ভালো, যদি তাই তোমার ইচ্ছে করে—আমাকে লিখলেই আমি ব্যবস্থা করে দেব। একটু সময় লাগে ইমিগ্রেশনের সব ঝামেলা মেটাতে, তাহলেও দু-তিন মাসের মধ্যে রওয়ানা হতে পারবে।

তপোময় যতোবার পড়াশোনার নাম করল, মণিমঞ্জুলের মনে হল স্বামীর জিভে একটা অচেনা আধা-লুকান জ্বালা রয়েছে।

তবু সে প্রশ্ন করল, তুমি কি সত্যি চাও আমি তোমার কাছে চলে আসি?

প্রশ্নের জবাব দিতে দু মিনিট সময় নিল তপোময়। জবাবে বলল,—হ্যাঁ—তুমি যদি সত্যি চলে আসতে চাও আমার কাছে।

।। দশ ।।

গ্রীষ্মকালটা যে কী করে কখন কেটে গেল অনুপ্রিয়া টেরই পেল না। দিল্লীর গরম এবার অসহ্য লাগল না, গরমে পোড়া দিল্লিকেও স্নেহে নরম মনে হল। জুনের পর, জুলাই-এর দশম দিবসে আকাশ কালো করে বর্ষা নামল, সারা জুলাই দিল্লীর নীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের পাহাড় ভেসে বেড়াল। অনুপ্রিয়ার মনের সংগে পঁচিশ বছর এই বর্ষামেঘের মিতালি, এবার ইচ্ছে হল বর্ষামেঘকে জড়িয়ে ধরতে, মনে হল আকাশ এসে মিলেছে মনের দিগন্তে, আমি হঠাৎ অনেক, অনেক, অনেক প্রসারিত হয়ে গেছি। বন্ধুরা প্রতি সপ্তাহে নিমন্ত্রণ করছে বাড়ীতে, বন্ধুর মায়েরা আশীর্বাদ করছেন, 'জয়ী হয়ে ফিরে এসো, মা।' কলেজের প্রফেসররা পর্যন্ত বাড়ীতে ডেকে আদর আপ্যায়ন করছেন। এরই মধ্যে মা বললেন, একবার কলকাতা গিয়ে কাকাদের আর মামা-মামিদের সংগে দেখা করে আয়—আবার কবে দেখা হবে কে জানে? রাজধানী একসপ্রেসে চড়ে অনুপ্রিয়া দু সপ্তাহ ঘুরে এল কলকাতা ঃ বর্ষার কলকাতা তার কখনই পছন্দ নয়, এবার কিন্তু অপূর্ব লাগল। বাড়ীতে বাবা মার সংগে গল্পের আর শেষ নেই। মা বেছে-বেছে শাড়ি কিনছে তো কিনছেই, কিছুতেই তাঁকে থামান যাচ্ছে না। সিল্কের শাড়ি তোর তো একেবারে নেই, আর ওদেশে তো তাঁতের শাড়ি পরতে পারবি নে। অন্তত দশ-বারোখানা সিল্কের শাড়ি তো চাই। কিনছি তো তোর নিজের টাকা দিয়েই," এর পরে আর কি বলতে পারে অনুপ্রিয়া। বাবার সংগে গল্প প্রধানত ভবিষ্যৎ নিয়ে, অনুপ্রিয়ার বুকে যে স্বপ্ন, আশা এখনও ভীরু, এখনও উচ্চারণে লাজুক, বাবার মুখে তাদের উত্তাল প্রবাহ। 'সাইকিয়াট্রিস্ট এদেশে ক'টা আছে বল? মেয়ে দু-চারজনের বেশি নিশ্চয় নেই। তুমি বসবে দিল্লীতে নিজের চেম্বারে, অবশ্যি সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে বড় বড় হাসপাতালগুলির সংগে। অল-ইণ্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউট নির্ঘাৎ তোমাকে প্রফেসরশিপ অফার করবে। কলম্বিয়া হচ্ছে আইভি-লীগ য়ুনিভার্সিটি—গোটা আমেরিকায় মাত্র পাঁচটা আছে এই জাতের অভিজাত য়ুনিভারসিটি। কলম্বিয়া থেকে পি-এইচ-ডি নিয়ে এলে তোমাকে ধরতে-ছুঁতে পারবে না আর কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট। দেশ যতো শিল্পপ্রধান হবে, আরগানাজাইশন যতো বাড়বে, ততো আমাদের জীবনে টেনশন বেড়ে যাবে, ততো বেশি লোকেদের মানসিক ব্যাধি দেখা দেবে। দশ বছরের মধ্যে তুমি একটি নার্সিং হোম খুলে বসতে পারবে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের জন্যে।'

'তোমার অন্য আইডিয়াটাও চমৎকার অনু', বাবা বললেন একদিন। 'যতো ভাবছি ততো আমি একসাইটেড হয়ে যাচ্ছি। নিউট্রিশন! এর চেয়ে বড় সমস্যা আমাদের দেশে নেই। তুমি যদি সংগে সংগে নিউট্রিশনে পারদর্শী হয়ে আসতে পার, তাহলে, আমাদের আনন্দ ও গৌরবের কথা ছেড়ে দাও, ওতো হবেই, দেশের অনেক মঙ্গল করতে পারবে। আমাদের দেশে ফুড হ্যাবিট নিয়ে অনেক স্টাডি হওয়া দরকার, ভারতের মাটিতে উৎপন্ন শাক-সব্জী ডাল গমের মধ্যেই কি ক'রে প্রয়োজনীয় নিউট্রিশন পাওয়া যেতে পারে জনসাধারণকে তা শোনাতে হবে। এসব কাজ করতে সারা জীবন কেটে যাবে তোমার। সার্থক সুন্দর জীবন কাটবে। নিউট্রিশনটাও যদি শিখে আসতে পারো—'

মা বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, সারা জীবন মেয়েটা কেবল পড়ুক আর খাটুক, ওর জীবনে আর কিছুর দরকার নেই! বিয়েও করতে হবে না, সন্তানের মাও হতে হবে না!'

বাবা অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'আহা, আমি কি তাই বলছি? সব হবে! তোমার রাজপুত্রের মতো জামাই হবে। ঘরভরা নাতি-নাতনি হবে। আমার মেয়ের ডবল ডকটরেট হবে। সাইকিয়াট্রিস্টে এবং নিউট্রিশনে।'

অনুপ্রিয়া বাবা-মা'র কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ওর হাসির বন্যায় বাবা মাও ভেসে যান।

এমনি করে, এরই মধ্যে, পাসপোর্ট তৈরী হল, আমেরিকান কনসুলেট জেনারেল থেকে ভিসা পাওয়া গেল, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে জোগাড় হল দুশো ডলার নিউইয়র্কে প্রাথমিক খরচের জন্যে, বাবা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে বাবার খরচ ধার করলেন, এয়ার ইণ্ডিয়া থেকে কেনা হল টিকেট, রিজার্ভ ব্যাংক থেকে পেতে হল পি-ফর্ম, এবং আগস্ট মাসের তেইশ তারিখে অনুপ্রিয়ার রিজারভেশন হয়ে গেল।

যাবার দু' দিন আগে বাবা বললেন, 'দু একটা কথা তোমাকে বলা দরকার, অনু, অথচ সাহস ক'রে বলতে পারছি না।'

অনুপ্রিয়া বাবার কোল ঘেঁষে বসল, বলল, 'তোমার মনে যে-সব কথা আসছে, সব বলো আমায়, বাবা। সব শোনা আমার প্রয়োজন।'

বাবা বললেন, 'অনেক গুহ্যতর বিষয় আছে যা আমরা ছেলেমেয়েদের সংগে খোলাখুলি আলোচনা করি না। ভুল করি। আমিও এ ভুল বহুদিন করে এসেছি। আজ হঠাৎ সংশোধন করা সম্ভব নয়, মা।'

অনুপ্রিয়া জিদ করল, 'তবু, বাবা, যা বলতে চাও বলো।'

বাবা বললেন, এখন একটা দেশে যাচ্ছ বিশেষ করে এমন একটা শহরে, যেখানে জীবনযাত্রার আদৎ আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওদেশে থেকে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, ওদেশের লোকেদের সংগে মিশে, তোমার মূল্যবোধ বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক। যা আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ অনেক কিছু ওদেশে অতি সহজে প্রাপ্য, জীবনের অতি স্বাভাবিক উপাদান।

অনুপ্রিয়া বলল, 'ঠিক বলছ, বাবা।'

বাবা ধীরে ধীরে চিন্তা করে করে বললেন, 'সব কিছু এবার তোমাকে নিজের বুদ্ধি মতো করতে হবে—গাইড করবার কেউ থাকবে না ওখানে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, তোমার নিজের মনোপ্রাণ তোমাকে যে পথে চালাবে সে পথে চলবার সাহস যেন তোমার থাকে। যা করবে সৎসাহস নিয়ে করবে, যদি মনে করো ঠিক করছ, কে কি বলে তার পরোয়া করবে না।

শুধু দেখো, পা পিছলে পড়ে গেলেও আবার যেন উঠে দাঁড়াতে পারো।'

অনুপ্রিয়া ভারী গলায় বলল, 'বাবা, এমন কিছু আমি করবো না যাতে তোমাদের মাথা হেট হতে পারে।'

বাবা বললেন, 'তা জানি। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে আমাদের মাথা হেট হবে, যা অপছন্দ হবে ভেবে তুমি তোমার মতে যা করা উচিত তা থেকে বিরত রইলে, অথচ তুমি তা করলে, এবং আমাদের বুঝিয়ে বললে, মাথাও নত হবে না আমাদের, অপছন্দও হবে না তোমার কাজ।

অনুপ্রিয়া বলল, 'বুঝেছি তোমার কথা। আমি যদি কোনও সাহেব ছেলের প্রেমে পড়ি ও তাকে বিয়ে করতে চাই, তোমাদের অমত না-ও হতে পারে, মাথা নিচু যে-হবেই তারও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু বাবা, সাহেব ছেলে বিয়ে করার ইচ্ছে আদৌ নেই আমার।

বাবা বললেন, 'সাহেব ছেলের সঙ্গে বিবাহ মনে রেখেই ও-কথাগুলি বলি নি আমি।'

অনুপ্রিয়া হঠাৎ সোজা হয়ে বসল।

'যদি অপরাধ না নাও, বাবা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? প্রশ্নটা শুনতে তোমার ভালো লাগবে না।'

'অনায়াসে।'

'যদি শুনতে পাও আমি কোনও ছেলের সঙ্গে বিয়ে-না-করে সহবাস করছি, তুমি খুব দুঃখ পাবে?'

বাবা সহজে প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'তোর মাকে এ প্রশ্ন করেছিস?'

'করেছি, বাবা।'

'কি উত্তর দিয়েছে তোর মা?'

মা বলেছে, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে।'

পুনরায় নীরব হলেন বাবা। অবশেষে অনুপ্রিয়া মাথায় হাত রাখলেন।

বললেন, 'দুঃখ পাবো নিশ্চয়। কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মাথা হেট হবে না।

তোর কোনও কাজেই আমাদের মাথা নুয়ে পড়বে না, অনু এটুকু মনে রাখিস।'

এগার

অমিয়কান্তির সঙ্গে রাধা পৌঁছল নিউইয়র্কের জন. এফ. কেনেডি বিমানবন্দরে ১৯৬৮ সালের এক নভেম্বর অপরাহ্ণে হেলথ, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস পেরিয়ে প্যাসেঞ্জারদের লবীতে পৌঁছতে হেমন্তের স্বল্পায়ু দিন গেল ফুরিয়ে। অমিয়কান্তি মজুমদার যে নিউইয়র্ক অঞ্চলে কতো জনপ্রিয় তার প্রথম, এবং নিশ্চিত, প্রমাণ পেল রাধা বিমানবন্দরেই। অন্তত চল্লিশজন বাঙালী এসেছে অভ্যর্থনা করতে অমিয়কান্তি ও রাধাকে। তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মেয়েদের চেয়ে বেশি নয়। রাধা এতগুলি নিউইয়র্কের বাঙালী, বিশেষ করে বাঙালিনী, একসঙ্গে দেখে যুগপৎ ঘাবড়ে ও রেগে গেল। কুকুরের মতো মেয়েদের আঘ্রাণ শক্তিটা প্রখর, রাধা টের পেল, কাস্টমস লাউঞ্জের ওপরতলায় সমবেত ওরা সবাই টিপ্পনী করছে অমিয়কান্তির সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ নিয়ে। কল্পিত মন্তব্যগুলি তার কানে পর্যন্ত এসে গেল : ও মা! অমিয়দা যে একটা-খুকিকে বিয়ে করে এনেছে!' 'সুন্দর দেখতে মেয়েটা, না রে?' নিশ্চয় গরীব ঘরের মেয়ে, বিয়ে দেবার সময় অত বাছবিচার করতে পারে নি' সুন্দর-সুন্দর যে বলছিস, ওটা বয়সের কারসাজি। ষোলো সতের বছর বয়সে সব মেয়েই সুন্দর থাকে। আমরাও ছিলাম!' 'কি সব্বোনাশ, এই মেয়েকে অমিয় সামলাবে কতোদিন?

কাস্টমস্ লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে অমিয়কান্তি মহা খুশিতে তার বন্ধু বান্ধবীদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করতে লেগে গেল। পুরুষদের সবাইকে জড়িয়ে ধরল, মেয়েদের মধ্যেও অনেককে। রাধা ভ্রূ কুঁচকে লক্ষ্য করল এখানকার বাঙালী মেয়েরা পুরুষদের সামনাসামনি জড়িয়ে ধরতে পিছ-পা হয় না। 'কি বেহায়া! মা-গো!' মেয়েরা ঘিরে ধরল রাধাকে, চল্লিশ পঞ্চাশটা চোখ একসঙ্গে ওকে খুঁটিয়ে দেখল, রাধার মনে হল, এরা আমায় উলঙ্গ করে নেবে না কি? একসঙ্গে একপাল নারীকণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি! তুমি চটি পরে চলে এসেছো নিউইয়র্কে নভেম্বর শেষে! এই অমিয়! এই অমিয়দা, বৌ-কে জুতা-মোজা পরিয়ে আনতে পারো নি! আজকে স্টম্পারেচার কতো জানো? আঠাশ। মানে, বিলো ফ্রিজিং পয়েন্ট।' একটি মেয়ে ব্যাগ থেকে একজোড়া প্যান্টি-হোস বার করল। রাধাকে বলল, 'বাথরুমে গিয়ে এটা পরে এসো ভাই। নইলে শীতে জমে যাবে।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যোগ দিল, প্যান্টি-হোস পরার অভ্যেস তো নেই তোমার। চলো, আমি দেখিয়ে দেব।

রাধা বুঝল খালি পায়ে চটি পরে নিউইয়র্ক চলে আসাটা বোকামি হয়েছে। রাগ হল অমিয়কান্তির ওপর। তার বলে দেওয়া উচিত ছিল না? রাগ হল সমবেত সকলের ওপর; তার বোকামিকে এরা গেয়োমি ভেবে দারুন মজা পাচ্ছে। যে মেয়েটি প্যান্টি-হোস পরে নিতে বলল, তাকে দুখণ্ড করল রাধা : ওটা আপনার ব্যাগেই রেখে দিন। আমার গায়ে ঠাণ্ডা লাগে না। অন্যের ব্যবহৃত জামাকাপড় আমি পরি না।

কয়েক মিনিটে সবাই জেনে গেল অমিয়কান্তির ছুকরি বৌটা ভীষণ অহংকারী দারুণ টগবগে। ম্যানারস জানে না। ভয়ানক জেদী।

রাধা দেখল, শুনল শুকল স্পর্শ করল আস্বাদ করল নিউ ইয়র্কের বাঙালীদের। যাতে তার অসুবিধা না হয় এজন্যে অমিয়কান্তি এক সপ্তাহের জন্যে তার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে বাসের ব্যবস্থা করেছিল। ডাউন টাউনে এখানেই উঠল দুজনে এয়ারপোর্ট থেকে। রাত্রিতে রাধা অমিয়কান্তিকে বলল, 'আমাদের নিজেদের ফ্ল্যাট নেই?'

'বাঃ! আছে বই কি! এরচেয়ে বড় ফ্ল্যাট নিয়েছি আমি।'

'কাল আমরা যেতে পারি না সেখানে?'

'পবিত্র ও সুধাকে বলেছি একহপ্তা থাকবো ওদের সঙ্গে। তুমি একটু অভ্যস্ত হয়ে নাও।'

'অভ্যস্ত হবার কিছু নেই। আমার ভালো লাগছে না এখানে। কাল আমরা নিজেদের বাসায় যেতে পারি না?'

'পারি, কিন্তু ভালো দেখায় না।'

রাধা ভীষণ রেগে গেল। পরের দিন অমিয়কান্তি সুধা বোসকে সঙ্গে নিয়ে রাধার জামাকাপড় কেনার ব্যবস্থা করেছিল। রাধা বেরুতে রাজী হল না। বলল শরীর ঠিক নেই; মাথা ঘুরছে। অমিয়কান্তি বলল, ও কিছু নয় জেট-ল্যাগ। একদিন বিশ্রাম করো ঠিক হয়ে যাবে।'

দুপুরবেলা সুধা বসুকে নিয়ে অমিয়কান্তি বেরিয়ে গেল। রাধা শুয়ে রইল ঘরে একা। ঘন্টা চারেক পরে পাহাড়প্রমাণ বোঝা নিয়ে দুজনে ফিরে এলো। প্রায় সবকিছুই রাধার জন্যে। নাইলনের শাড়ি, দুটো তোয়ালে নাইটি ব্লাউজ, প্যান্টি-হোস মায় একটা ওভারকোট পর্যন্ত। একটা কার্ডিগানও। এমন সুন্দর সুন্দর পোষাক রাধা জীবনেও দেখে নি। প্রত্যেকটাই তার পছন্দ, তবু তার রাগ বেড়েই চলল।

অমিয়কান্তিকে একা পেয়ে বলল, 'মেয়েদের জামাকাপড় মেয়েরা নিজেরাই কেনে। অন্যের কেনা তাদের পছন্দ হয় না।'

অমিয়কান্তি বলল, 'সুধাও তাই বলছিল। কিন্তু উপায় কি? তুমি শুয়ে রইলে! কাল সবাই মিলে তোমাকে পার্টি দিচ্ছে। ল্যাংটো হয়ে তো আর যেতে পারবে না।'

রাধা মনে মনে বলল, পারলে বেশ হত।

বারো

চতুর্থ দিনে রাধা অমিয়কান্তিকে বলল 'এখানে ইংরিজী-বলা শেখা যায় না?'

'যায় নিশ্চয়' অমিয়কান্তি অনিশ্চিত।

'আমি ইংরিজী-বলার ক্লাসে ভর্তি হতে চাই।'

'বেশ তো!'

'আজই।'

'আজই!'

'অন্তত কাল কিম্বা পরশু।'

অমিয়কান্তি মস্করা করে বলল, 'আর কি চাও আজকালপরশুর মধ্যে?'

'কলেজে ভর্তি হতে চাই।'

অমিয়কান্তি আপিস থেকে ফিরলে রাধা প্রশ্ন করল 'আমার ইংরিজী-বলা শেখার ব্যবস্থা করেছ?'

অমিয় অবাক হয়ে বলল, 'দাঁড়াও আজই তো বললে! কদিন যাক।'

রাধা ঘোষণা করল, 'আমি ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তিন মাসের কোর্স। পুরো ত্রিশ ডলার লাগবে।'

'তুমি ব্যবস্থা করেছ মানে?' অমিয়কান্তির আকাশ হইতে পতন। 'তুমি কি করে—?'

'খুব সহজ কাজ!' রাধার স্বরে কোন উত্তেজনা নেই।' হলদে কাগজের টেলিফোন বইতে পনেরটা স্কুলের নাম আছে যেখানে ইংরিজী কনভারসেসন শেখায়। আমি ফোন করলাম, আর হয়ে গেল। কাল ডাকে কাগজপত্র সব আসবে। পরশু আমি ভর্তি হতে চাই।'

'স্কুলটা কোথায়? এ পাড়ায় হলে আমাদের বাসা থেকে দূরে হয়ে যাবে।'

'সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে' ছাঁকা করে উঠল রাধা 'স্কুলটা ওয়াই - ডবলু-সি-এর লেকিংটন এ্যাভিনিও আর উনষাট ষ্ট্রীট। আমাদের বাসা থেকে বিশেষ দূর নয়।'

অমিয়কান্তির বিস্ময়ের শেষ নেই ঃ 'তুমি জানলে কি করে? সুধাকে জিজ্ঞেস করেছিলে বুঝি?'

'না। এটাও খুব সহজ। শহরের একটা ম্যাপ দেখলেই বোঝা যায়। সুধা বা তোমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয় না।'

। তেরো ।

তিন মাসের মধ্যে রাধা ভর্তি হয়ে গেল 'নিউ স্কুলে' চার বছরের আন্ডার-গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে। অমিয়কান্তির বা অন্য কারুর কোনরকম সাহায্য না নিয়ে। সপ্তাহে দুদিন ক্লাস করতে যেতে হয় রাধাকে, সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসতে রাত দশটা। অমিয়কান্তি একটু আপত্তি করেছিল রাধা কান দিল না।

নিউইয়র্ক শহরে রোজ মার্গিং হচ্ছে। একা একা অত রাত্রিতে বাড়ী ফিরতে ভয় করবে না তোমার?'

রাধা বলেছিল, 'লক্ষ লক্ষ লোক দুপুর রাত তক রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তোমাদের শহরে। ভয় কিসের?'

মার্গিং—

আমার কিসসু হবে না তুমি দেখো।

'এতগুলি কোর্স একসঙ্গে নিচ্ছ, পেরে উঠবে তো? আর একদিন অমিয়কান্তির প্রশ্ন রাধাকে অনেক রাত পর্যন্ত পড়তে দেখে।

'চার বছরের শেষ করতে হবে তো? রাধার অসহিষ্ণু জবাব।

'তাড়া কিসের তোমার? পাঁচ বছর লাগলে ক্ষতি কিসের?'

'দশ, পনের, বিশ বছর নিলেই বা ক্ষতি কি আমার?'

এতো পরিশ্রম সইবে তোমার?

'এখানে আবার পরিশ্রম কি? ঠাণ্ডা দেশ! কিছুতেই শ্রান্ত লাগে না।'

কিন্তু আর একটা কিছু লাগে, বড় বেশি করে লাগে যার নাম বোধহয় ক্লান্তি, যাকে তোমরা ইংরিজীতে বলো বোরডম, সেই কিছু-ভাল-না-লাগার রোগটা, যা আমার কলকাতাতেও একটু ছিল, এখানে এসে বেড়েছে, তুমি তার খোঁজও রাখো না। তুমি বেশ আছে। তোমার অনেক কাজ, সপ্তাহ, আসবে উৎসবে। তুমি মানুষটা ভাল, একশ হাজার বার ভালো ঃ কোনও মিছুতা নেই তোমার মনে, তোমার মন পরিষ্কার এবং উদার, কিছুটা আদর্শবাদও তোমার আছে। কিন্তু তুমি অন্ধ, তুমি উদাসীন, তুমি নিজেকে নিয়ে কী দারুণ পরিতৃপ্ত! অথচ তুমি জানো না তোমার অন্ধত্ব, তোমার ঔদাসীন্য, তোমার আত্মতৃপ্তি। তোমার কাছ থেকে আমি অনেক পাচ্ছি—কিছুরই অভাব নেই আমার, আমার জন্যে টাকা খরচে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই তোমার। আমার কাজে বাধাও তুমি দাও না, তুমি আমাকে স্বাধীন হতে শেখাচ্ছ, বুঝতে পারছি। তুমি কিন্তু বুঝতে পারছ না কি আমার নেই, কোথায় আমি একেবারে ফাঁকা, আমার বইপত্র, ক্লাস, দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার টেলিফোন ধরা, রান্না, ঘরকন্না, বেড়ান, সিনেমা দেখা, লোকজনের বাড়ী যাওয়া, তাদের বাড়ী যাওয়া এবং তাদের পালটা ডেকে খাওয়ানো, রাত্রিতে তোমার দেহের প্রয়োজন মেটান ঃ এত সব নিয়েও কোথায় আমি একান্ত একা, একেবারে ফাঁকা, তুমি তা জান না, জানবার আগ্রহও তোমার নেই, এমন-যে হতে পারে তাই তুমি পারো না ভাবতে।

বছর খানেক পরে অমিয়কান্তি আরও বড় চাকরি পেল লং আইল্যাণ্ডে, নিউইয়র্ক শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। কিনে ফেলল একটা আস্ত সমস্ত ছবির মতো সুন্দর বাড়ী চল্লিশ হাজার ডলারে। রাধা 'নিউ স্কুল' ছাড়ল না। সন্ধ্যাবেলা থেকে রাত নটা পর্যন্ত ক্লাসের দিনগুলি ঘুমুবার ব্যবস্থা করে নিল দুটি বন্ধুর সঙ্গে, তারা দুজনেই হস্টেলে বাস করা ছাত্রী।

বছর ঘুরবার আগে অমিয়কান্তি একদিন দপ্তর থেকে বাড়ী ফিরল নির্ধারিত সময়ের একটু আগে। বাড়ীর কাছাকাছি একটা সড়কে বা দেখল তাতে তার মাথা ঘুরে গিয়ে প্রায় অ্যাকসিডেন্টের যোগাড়! দেখল বিরাট একটা ট্রাক চালিয়ে হাইওয়ে দিকে ধাবিত হচ্ছে, আর কেউ নয়, রাধা!

রাধা বাড়ী ফিরে অমিয়কান্তিকে দেখে অবাক হল, বিব্রতও।

'তোমার তো এ সময় ফেরবার কথা ছিল না!' রাধা অমিয়কে প্রায় চ্যালেঞ্জ করে বসল।

'আমাকে কাল ভোরে দু দিনের জন্যে ওয়াশিংটন যেতে হবে,' বলল অমিয়, 'তুমি যাবে সঙ্গে?'

'ওরে বাব্বা! আমার মরবার সময় নেই!'

'এত বড় বাড়ীতে একা থাকতে ভয় করবে না তোমার?'

বিশেষ সংবাদ

'পাশের বাড়ীর জুডিথ একা থাকে কি করে অত বড় বাড়ীতে?'

'ওদের কথা আলাদা। ওরা মেম-সাহেব।'

রাধা চোয়াল শক্ত করে বলল, 'মোটেই আলাদা নয়। ওরা যা পারে আমরাও তাই পারি।'

অমিয়কান্তি বলল, 'আজ তো রাস্তায় এ্যাকসিডেন্ট হতে যাচ্ছিল!'

রাধা ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'সে কি! সাবধানে গাড়ী চালাও না কেন!'

অমিয়কান্তি বলল, আরো একটা লোকের একটা বৌ আছে। লোকটা জানে তার বৌ গাড়ী চালাবার গ-ও জানে না। বাড়ীতে গাড়ীও একখানাই, লোকটা ড্রাইভ করে আপিস যায়। সে যদি হঠাৎ দেখতে পায় তার বৌ বিরাট এক বাইক হাঁকিয়ে হাইওয়েতে চলছে তার পক্ষে এ্যাকসিডেন্ট করাটা কি অন্যায়?'

রাধার মুখখানা লজ্জায় ও অপ্রস্তুতে লাল হয়ে গেছে।

সে বলল, 'ভেবেছিলাম তোমায় সারপ্রাইজ দেব। আজই।'

'এসব করা হল কবে, কখন, কি করে?'

'এক মাস সপ্তাহে দু দিন লেসন নিয়েছি। আজ আমার ড্রাইভিং লাই-সেন্স হয়ে গেছে।

একটা বাইক ভাড়া করে হাইওয়েতে একটু ড্রাইভ করে এলাম।'

অমিয়কান্তি খুশিই হল। বলল, 'সাবধানে চালিও। স্পীড দিও না প্রথম প্রথম।'

অমিয়কান্তির ইচ্ছে ছিল তার নিজের গাড়ীটা আরও বছর খানেক চালিয়ে বেচে দিয়ে নতুন গাড়ী কিনবে। ছ মাস পরে সে নতুন গাড়ি কিনে বসল। ফোর্ড ইম্পালা।

মাস্ট্যাংটা কি বেচে দেবে নাকি?' রাধা প্রশ্ন করল।

'ভাবছি, ওটাও থাক। তুমি ব্যবহার করো। গাড়ীটা এখনও চমৎকার রয়েছে।'

রাধার ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল, এমন সব ইচ্ছেই হয়ে থাকে আমার! তুমি সেদিন আমার লাইসেন্স হয়ে যাবার খবরে খুশি হলে, সেদিনও আমার ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল, এমন সব আজগুবি বাজে ইচ্ছে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে মনের মধ্যে, পেটের মধ্যে, বুকের মধ্যে আমার। সেদিন তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরলেও পারতে, ক্ষতি হত না তোমার, আজ আমি জড়িয়ে ধরলেও পারতাম তোমাকে, ক্ষতি হত না তোমার। তুমি এগোলে না সেদিন আমার পা দুটো পাথর হল আজ একখানি।

রাধা বলল, 'থ্যাংকিউ!'

।। চোদ্দ ।।

দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি একদিন রাত্রে অমিয়কান্তি বলল, 'আমার তো পঁয়তাল্লিশের আর বাকী নেই বিশেষ!'

রাধা বলল, 'দেড় বছর এখনও বাকী আছে।'

অমিয় বলল, 'আমাদের সন্তান হতে যদি আরও দেরী হয় তাহলে তাদের মানুষ করবো কি করে?'

রাধা বলল, 'ঠিকই তো!'

অমিয়কান্তি বলল, 'কিন্তু তোমার পড়াশোনায় বাধা পড়ে যাবে যে!'

রাধা বলল, 'তা কেন পড়বে?'

'বাচ্চা মানুষ করে তুমি চার বছরে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স শেষ করতে পারবে না।'

রাধা বলল, 'কটা বাচ্চা চাই তোমার?'

অমিয়কান্তি প্রশ্ন করল, 'তুমি কটি সন্তানের মা হতে চাও?'

রাধা বলল, 'প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করা ঠিক নয়।'

অমিয় বলল, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হলে তো হয়। তুমি কি বলো?'

রাধা বলল, 'মন্দ কি?'

রাধা হঠাৎ উঠে বাথরুম গেল। সে প্রতি দিন নিয়ম করে পিল খাচ্ছিল। দেখল দশ দিনের পিল রয়েছে নির্দিষ্ট স্থানে। পিলগুলোকে টয়লেটে ফেলে ফ্লাশ টেনে বিছানায় ফিরে এল।

পুরো গর্ভ নিয়েও ক্লাস করে গেল রাধা। বিয়ের তৃতীয় বছরে তার একটি মেয়ে হল। ছ মাসের ছুটি নিল রাধা নিউ স্কুল থেকে। তৃতীয় মাস থেকে প্যারামবুলেটরে বাচ্চাকে শুইয়ে দিয়ে বসিয়ে তাই সংগে নিয়ে সে স্কুলে যাওয়া শুরু করল।

অমিয়কান্তি বলল, 'বেবী-সিটর ডাকলেই তো পারো।'

রাধা জবাব দিল, 'দরকার মতো ডাকা তো হয়েই থাকে।'

'এমনি করে বাচ্চা সংগে নিয়ে স্কুলে যাওয়া কি ঠিক?'

'ঠিক নয় কেন? একটু শব্দও করে না। দিব্যি ঘুমোয়।"

'তবু! লোকে কি ভাবে?'

রাধা তেতে উঠল, 'আমেরিকান মেয়েরা তো হরদম বাচ্চা সংগে নিয়ে স্কুলে আসছে।'

ওদের কথা আলাদা বলতে গিয়ে বলল না অমিয়কান্তি।

শুধু বলল, 'নিউইয়র্কের বাংগালীরা কি বলে জানো? বলে, বিয়ের পর দিন থেকে আমি তোমাকে কেবল পুস করছি। বলে, নিউইয়র্ক আসবার তিন দিনের দিন আমি তোমাকে টেনে নিয়ে গেছি ইংরিজি কনভারসেশন ক্লাসে, তিন মাসের মধ্যে তোমাকে ঠেলে দিয়েছি নিউ স্কুলে, এক বছরের মধ্যে, জোর করে তোমাকে ড্রাইভিং শিখিয়েছি। হায় ভগবান! এরা যদি তোমাকে একটুও চিনতো!'

রাধা বলল, 'এদের দোষ দিয়ে লাভ কি? তুমিই কি চেন আমাকে একটুও?'

অমিয়কান্তি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, অন্তত তোমার জেদটাকে চিনি।'

রাধা বলে উঠল, 'একটা বিরাট ব্যাপার আছে যেখানে আমার জেদ একেবারে অচল, তা জানো তুমি?'

অমিয়কান্তি হতবুদ্ধি হয়ে বলল 'শুনলেও বিশ্বাস করবো না।'

রাধা বলল 'তাহলে আর শুনে কি হবে?'

।। পনের ।।

চার বছর পূর্ণ হবার আগেই রাধা বি-এ ডিগ্রী পেয়ে গেল। তখন সে দ্বিতীয়বার গর্ভবতী। প্রসবের দেরী নেই। মাত্র মাস দু-এক।

অমিয়কান্তির চাকরী আরও উন্নতি উঠেছে তার মাইনে এখন বছরে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার। লং আইল্যান্ডের প্রথম বাড়ীটা বিক্রী করে দিয়েছে অমিয়কান্তি কিনেছে অভিজাত পাড়া স্কারডেলে আরও বড় বাড়ী। রাধার পুরানো মাস্ট্যাং গাড়ীটাও এখন আর নেই; অমিয়কান্তি ওকে একটা ঝকঝকে নীলটুকটুক ফকস-ওয়াগন 'বাগ' কিনে দিয়েছে। অমিয়-কান্তির মাথায় টাক পড়তে লেগেছে, বেশ একটু ভুড়ি দেখা দিয়েছে কোমরে, গলার গালে বয়সের প্রথম ভাঁজ পড়েছে। প্রায়ই আজকাল টুরে যেতে হয় অমিয়কান্তিকে আমেরিকার বিভিন্ন বড় শহরে, বছরে দু-তিনবার আমেরিকার বাইরেও। তবু অমিয়কান্তি গানের সুযোগ পেলেই আর সময় করে উঠতে পারলেই আসরে নিউ ইয়র্কের পংকজ মল্লিক হয়ে বসে যদিও তার গুরু-স্থানকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন কটি ছেলে আবির্ভূত হয়েছে নিউ ইয়র্কে, এক মহিলা তো রীতিমত তার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছেন, সে নাকি রবীন্দ্রসংগীতের র-ও জানে না। দু বছরে একবার নিয়মিত ভারতে আসছে অমিয়কান্তি সপরিবার। অধর ভট্টাচার্যের ফ্ল্যাট ভরে গেছে আমেরিকান গ্যাজেটে সুভেনিরে; অধর ভট্টাচার্যের স্ত্রী এখন হামেশাই নাইলন শাড়ি পরেন, ছেলে-মেয়েরা আমেরিকা থেকে আনা হংকং বা সাউথ কোরিয়া বা তাইওয়ানে তৈরী নাইলন প্যান্ট শার্ট পরিধান করে। তাতে অবশ্যি অধর ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক মতবাদ দুর্বল হয়নি চিরদিন যেমন ছিল এখনও সে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে মানব জাতির এক নম্বর দুষমন মনে করে থাকে।

রান্নায় আনুন নিত্য নতুন স্বাদের মজা

ব্যবহার করুন **লাশেফ**

অলস্পাইস কুকঅল পাউডার

- যে কোনও মশলা এমন কি বনস্পতি, পেঁয়াজ, আদা ইত্যাদি ছাড়াই সুস্বাদু রান্না করা যায়।
- এতে সমস্ত রকম মশলা মেশানো অবস্থায় থাকে।
- পয়সা, সময় ও ঝঞ্ঝাট বাঁচায়।

লাশেফ — আজকের দিনে কর্মব্যস্ত মহিলা ও গৃহিণীদের পক্ষে অপরিহার্য

SUNRISE BRAND PURE POWDER SPICES
SUNRISE SPICES PVT LTD 46 PATHURIAGHAT ST CAL 700006

সানরাইজ স্পাইসেস প্রাঃ লিঃ

৪৬, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

naa.SS-7683 B

রাধারও পরিবর্তন হয়েছে, প্রায় একুশ বছর বয়স হতে চলেছে রাধার, রূপযৌবনের সম্ভার তার পূর্ণ। রাধা এখন প্রতি মাসে বিউটিশিয়ান দিয়ে হেয়ার-ড্ করিয়ে নেয়। এমন সব প্রসাধন ব্যবহার করে যা হঠাৎ-দৃষ্টিতে আদৌ ধরা পড়ে না; রাধা ন্যাচারেল-কলার প্রসাধনের সমর্থক, শুধু মাঝে মধ্যে ঠোঁটে সে লাল লিপস্টিক লাগায়, লাল ঠোঁটে নিজেকে দেখতে ভালো লাগে রাধার। রাধাকে এখন বেশ সফিস্টিকেটেড দেখায়, খুশি-বিষাদের স্বাদু-ককটেল রাধার মুখখানা ছেয়ে থাকে, রাধাকে পুরুষেরা অনেক বেশী আকর্ষণীয় মনে করে। বাঙালীদের চেয়ে সাহেবরা আরও বেশি। শুধু অমিয়কান্তির দু-একসময় মনে হয় সেই অনেককাল আগের আর এক যুগের সবেমাত্র আঠারোয় পা-দেওয়া প্রভাতের সবেমাত্র ফুলটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে; সন্দেহ হয় সে কখনও কোনও কালেও ছিল কিনা।

।। ষোল ।।

রাধার ডায়েরীর কয়েকটি পাতা :

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ : হাইওয়েতে গাড়ী চালাতে দারুণ মজা। আজ ষাট মাইল স্পীড দিয়েছিলাম। রাস্তায় সুপুরে বেশি গাড়ী ছিল না। আরও স্পীড দেবার ইচ্ছে হল। অনেক ইচ্ছেকে স্নেভাবে চেপে মারি, এ ইচ্ছেটাকেও তেমনি চেপে মারলাম। কিন্তু আশি মাইল স্পীড দেবো একদিন। আর একটু রুশ করে নি ড্রাইভিংটাকে।

সুজিত ছেলেটা একেবারে বোকা। ছেলেগুলি সত্যিই কি বোকাই না হতে পারে। পুরুষজাতটাই বোকা। তা নইলে পৃথিবীর অবস্থা এরকম হোতো?

১২ই নভেম্বর ১৯৬৯ : আমার বিয়ের একবছর পূর্ণ হল। এমনি করে পাঁচ দশ কুড়ি পঁচিশ ত্রিশ বছর পূর্ণ হবে। মাগো!

২৪শে এপ্রিল ১৯৭০ : আমার সব আছে, তাই না? কি নেই আমার? সব আছে। শুধু যদি শ্রীযুত অমিয়কান্তি মজুমদার আমাকে একটু খোলা চোখে দেখতেন! সেই চোখ যা রোজ দেখছি টেলিভিশনে যা বই-এর পাতা ভেদ করে তাকিয়ে থাকে যাকে বলে ভালোবাসার চোখ। উনি আমাকে প্রচুর স্নেহ করেন। আমার সুখ-সুবিধের দিকে নজর রাখেন। কোনও কাজে আমাকে বাধা দেন না। আমাকে নিয়ে সপ্তাহে দুবার খেলাও করেন।

অমিয়কান্তি মজুমদার আমাকে একটু ভালবাসলে কি ক্ষতি হবে আপনার?

২৮শে জুলাই ১৯৭০ : মা হতে বেশ ভালোই লাগবে কি বলো? অমিয়-

রাধাকে পুরুষেরা অনেক বেশী আকর্ষণীয় মনে করে.....

বলবে, আমাকে বলবে না। অমিয়বাবুর মা নেই আমারও মা নেই। এখন, কয়েক মাস পরে আমিই মা হবো—আমার সন্তানের মা অমিয়বাবুর মা আমার মা। মা হয়ে কি আর কিচ্ছু হওয়া যায়? মা হলেই শুধু চলবে না কিন্তু আমার! ডাক্তারী হয়ে থাকতেই হবে। নিউ ইয়র্কের এইসব হামড়ি-দামড়ি মেয়েগুলোকে দেখিয়ে দিতে হবে রাধা কে, কি তাকে দিয়ে সম্ভব।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ : অমিয়বাবু, একটু ছেলেমানুষি করতে পারেন না আমার সঙ্গে? ভুলে যান কেন আমার বয়স উনিশ! হলেনই না হয় আপনি উনত্রিশ! পারেন না কি একটু ছেলে-মানুষি করতে?

১২ই জুন ১৯৭১ : জীবনে অন্তত একবারটি দেখতে চাই একজন, কেউ এক-জন কোন সুন্দর সরল সহজ সরল অশান্ত একজন আমার প্রেমে পড়েছে আমার চোখে তাকিয়ে আছে, আছে তাকিয়েই সারা সকাল ভিড় করেছে তার চোখে, সমুদ্রের ঢেউ উঠছে তার চোখে, আর আমি কাঁপছি, কাঁপছি, বার বার কেঁপে উঠছি।

১৪ই আগষ্ট, ১৯৭১ : অমিয়কান্তি মজুমদার কেন শুধু অমিয় হন না? হতে কি পারেন না আপনি একদিনের জন্যেও.

১৮ই মে, ১৯৭২ : আমি বি-এ পাশ করলাম। তোরা হাঁ করে তাকিয়ে দ্যাখ, আমি মেয়ে পেটে নিয়ে, মেয়ে কোলে নিয়ে ঠিক সময়ে বি-এ পাশ করে নিলাম।

অমিয়কান্তিবাবু খুশি হয়েছেন অবাকও। আমি সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা নই! যদি হতাম, এই বি-এ ডিগ্রীটা, আর ঐ শেলফ্-ভর্তি বইগুলো এক-জনের মাথায় চাঁপাতাম।

১৬ই জুন, ১৯৭৩ : হতে পারত। হতে দিলাম না। আবার গলা টিপে মারলাম ইচ্ছেকে। এবার বুঝি মরেই গেল। হে ভগবান, ওকে আর বাঁচিও না।

হুবার্ট রবিনসন। সুন্দর নামটা। তোমাকে আমার মনে থাকবে। তুমি যে চোখে তাকিয়েছ আমার চোখে, যে চোখের লোভ আমার রক্তে, আমার হৃদয়ে।

তোমাকে অনুমতি দিলেই তুমি আসতে। বাড়ীতে আমি একা। অমিয়-কান্তি মজুমদার গেছেন প্যারিসে। তিন-দিনের জন্যে।

লোভ হয়েছিল, স্বীকার করছি। ওটা কি লোভ? জীবনের তৃষ্ণা কি লোভ? তুমি ফোন করেছিলে, হুবার্ট রবিনসন। তোমার সঙ্গে আমার দুবছরের বন্ধুত্ব। 'পিনউ স্কুলে।' কেউ জানে না, তুমি আর আমি ছাড়া। জানবার প্রয়োজন নেই কারুর।

তোমার মুখে শুনেছি, হুবার্ট রবিনসন সেই অমৃতে কথাগুলি, যা অমিয়কান্তি মজুমদার কখনও মুখ ফুটে বলতে পারেন নি। হয়তো বলতে চেয়ে-ছেন, হয়তো বয়স তাঁর মুখ চেপে ধরেছে যেমন বয়স মুখ চেপে ধরেছে আমার মনে অনেকবার। বলতে যা চেয়েছি বলে উঠতে পারি নি।

তোমাকে আসতে দিলে আমাকে সব উজার করে দিতে হত। দিতে পারলে আমি মুক্তি পেতাম। আমি সমুদ্রের মতো উত্তাল ও অসীম হতাম।

কিন্তু আর একটা মানুষ যেতো একেবারে নিঃস্ব হয়ে। তার কোনও দোষ নেই। ভালোবাসতে না-পারায় কোনও দোষ নেই। যেমন দোষ নেই ভালোবাসতে পারায়। সে মানুষটা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। শুধু দেয় নি আকাশ আর সমুদ্র আর সেই একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া, আবার পরিপূর্ণ ভরে ওঠা : যার নাম প্রেম।

তোমাকে আসতে দিলাম না, হুবার্ট রবিনসন। তার মানে এই নয়, তুমি হারলে। তোমার জয় হল। জয় হল অমিয়কান্তি মজুমদারেরও। হেরে গেলাম

মেয়ে। হে ঈশ্বর, তাকে হেরে থাকতে দাও।

।। ১৭ ।।

তপোময় ঘোষাল নিউইয়র্ক ফিরে যাবার আগে মণিমুকুল প্রশ্ন করেছিল, তুমি আমাকে চিঠি লিখবে তো?'

তপোময় জবাব দিয়েছিল, 'চিঠিপত্র লেখার একেবারে অভ্যেস নেই আমার। বাবা-মাকে বছরে দু-তিনখানা চিঠি কোনও মতে লিখি।'

'তার মানে কি এই যে তুমি প্রয়োজন না হলে চিঠি লিখবে না?' মণিমুকুলের স্বর ভয়ার্ত।

তপোময় বলেছিল, 'লিখব। না লিখলে লোকে নানা-কথা বলবে তোমাকে। তাই না?'

তাই!

'মাসে দুখানার বেশি পেরে উঠবো না। তুমিও লিখো।'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিঠিপত্র চলল, কিন্তু সেতু বাঁধতে সক্ষম হল না।

তপোময় সংক্ষিপ্ত চিঠির সঙ্গে নিউইয়র্ক টাইমস, নিউইয়র্কার, নিউ-ইয়র্ক রিভিয়ু অব বুকস, নিউ রিপাবলিক ইত্যাদি পত্রপত্রিকা থেকে কাটিং পাঠাল অনেক, তার বেশির ভাগই মণিমুকুলের পড়ার সময় হল না।

মণিমুকুল তার চিঠিতে নিয়মিত সবাকার খবর সরবরাহ ক'রে গেল। বাবা-মা (দু পক্ষের) ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কে কেমন আছে তপোময় প্রতি সপ্তাহে জানতে পারল। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মারফৎ মণিমুকুলের নামে প্রতিমাসে দশ ডলারের বিনিময়ে প্রাপ্য টাকা আসায় একবারও ব্যতিক্রম হল না।

জাহাজ-ডাকে একদিন মণিমুকুলের নামে এক বাকস বই-ও এসে হাজির হল। নতুন বই, চকচকে ধপধপে বই। আঠারখানা বই-এর মধ্যে বারখানা একোনমিকস-এর। বাকী ছখানা চলতি বাজারের সেরা বই। মণিমুকুল বই-গুলিকে নেড়েচেড়ে দেখল, পাতা ওল্টালে দু-চারবার, দু-একখানাকে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করে পড়ল ঘুমিয়ে।

।।১৮।।

দশ মাস পরে মণিমুকুলের পরীক্ষা হ'য়ে গেল।

তারও তিন মাস পরে তপোময় চিঠি পেল মণিমুকুলের ঃ "আমি এখন নিউ ইয়র্কে আসতে পারি কি?"

ইমিগ্রেসন, পাসপোর্ট ইত্যাদির ঝামেলা মণিমুকুলের বাবা আগেই মিটিয়ে রেখে-ছিলেন: জুলাই মাসে, বিবাহের তের মাস পর, মেয়েকে তিনি দিল্লী থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার জাম্বো-প্লেনে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

জন এফ. কেনেডি বিমানবন্দরে তপোময় একাই উপস্থিত স্ত্রীকে রিসীভ করতে।

দুজনেরই সন্দেহ ছিল একে অন্যকে দেখলেই চিনতে পারবে কিনা তেরো মাস বাদে। তপোময় অনেক চেষ্টা ক'রেও মণিমুকুলের মুখখানাকে চোখের সামনে দাঁড় করাতে পারে নি; গোটা চেহারার একটা মোটামুটি কাঠামো মাত্র একত্রিত করতে পেরেছে। অগত্যা কেনেডি যাবার আগে এ্যালবাম খুলে মণিমুকুলের মুখখানা কয়েক মিনিট দেখে নিয়েছে তপোময়! মণিমুকুলের অবশ্য তপোময়ের মুখখানা অস্পষ্ট মনে আছে, তার ভয় ছিল, হয়তো তপোময় বদলেছে, হয়তো দাড়ি-গোঁফ ফেলেছে কামিয়ে, হ'য়ে গেছে আরও, একেবারে, অপরিচিত। বাস্তব-ক্ষেত্রে কিন্তু দুজনই দুজনকে অনায়াসে চিনল। ওপরে অপেক্ষমাণ তপোময় কাষ্টমস লাউঞ্জে মণিমুকুলকে দেখেই চিনতে পারল, যদিও মণিমুকুল এই তের মাসে, মনে হল, একটু ক্ষীণা হয়েছে একটু ফর্সা-ফর্সা দেখাচ্ছে ওকে, অবশ্যি সেটা আমেরিকান নিয়ন আলোর কল্যাণেও হ'তে পারে। মণিমুকুল নার্ভাস হ'য়ে এদিক-ওদিক-ওপরদিক তাকাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে খুঁজে পেল তপোময়কে. না, সে বদলায় নি: তেমনি আছে, দাড়ি-গোঁফ নিয়ে, চশমা নিয়ে, নাদুসনুদুস শরীর নিয়ে।

কাষ্টমস লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসতেই তপোময় মণিমুকুলের হাত থেকে দ্বিতীয় ব্যাগটা নিয়ে নিল। মুখে বলল, "হ্যাই, রাস্তায় কষ্ট হয় নি তো?"

মণিমুকুল বলল, "খুব একটা না। বড় লম্বা জার্ণি।"

মণিমুকুলকে দাঁড় করিয়ে তপোময় পার্কিং লট থেকে গাড়ী নিয়ে এল। গাড়ী কুইন্স পর্যন্ত পৌঁছবার আগে আর কোনও কথাবার্তা হল না।

তপোময় হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে উঠল, "কেমন দেখছ নিউ ইয়র্ক?"

মণিমুকুল জবাব দিল, "আমি ভাবছি, নিউ ইয়র্ক কেমন দেখছে আমাকে।"

কুইন্স-এ তপোময়ের বাসস্থানে পৌঁছতে আধঘণ্টার বেশি লাগল না। পঁচিশ-তলা বিরাট এ্যাপার্টমেন্ট হাউস; এলিভেটার চেপে তেরোতলায় উঠল দুজনে মালপত্র সমেত, তপোময় এ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলল, মণিমুকুল ভেতরে ঢুকে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ব'লে উঠল, "ওর বাব্বা, এ দেখছি দারুণ!"

তপোময় বলল, "তুমি নিশ্চয় ভীষণ ক্লান্ত, এই হচ্ছে বাথরুম, মুখ-হাত ধুয়ে নাও, আমি চা করছি। চা খেয়ে ইচ্ছে হ'লে স্নান কোরো। স্নানের সময় দেখো মেঝেতে যেন জল না পড়ে, শাওয়ার-কার্টেনটা একটু ভালো ক'রে টেনে নিও।"

মণিমুকুল হাতমুখ ধুয়ে বাথরুম সেরে রান্নাঘরে ঢুকে দেখল তপোময় চা

সুটিং শেষ

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
বিমল কর'র

পরিচয়

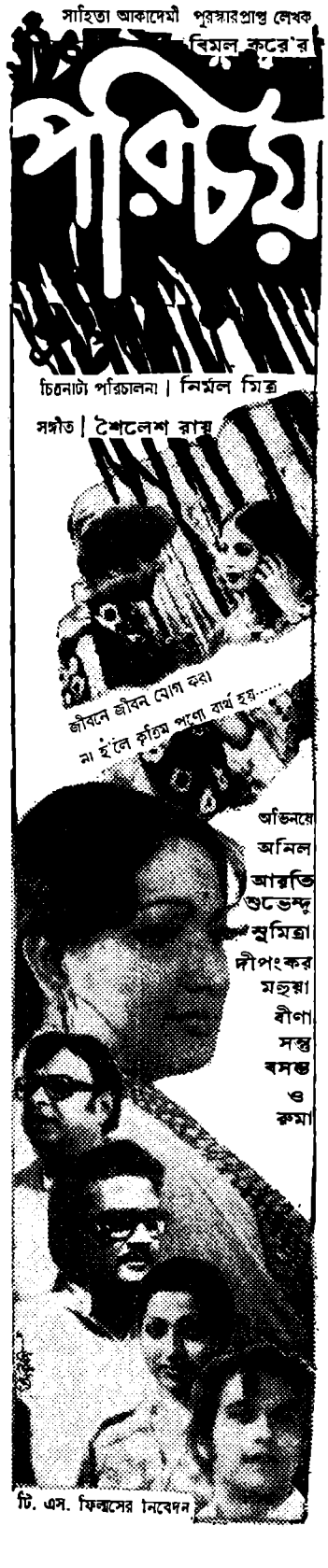

চিত্রনাট্য পরিচালনা | নির্মল মিত্র
সঙ্গীত | শৈলেশ রায়

জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্য ব্যর্থ হয়.....

অভিনয়ে
অনিল
আরতি
শুভেন্দু
সুমিত্রা
দীপংকর
মহুয়া
বীণা
সন্তু
বসন্ত
ও
রুমা

টি. এস. ফিল্মসের নিবেদন

তৈরী ক'রে ফেলেছে, রান্নাঘরটাকেই দেখে নিল পুরো চোখে,, ফিরে এল লিভিং রুমে, দুজনে একসঙ্গে কথা-না-ব'লে চা খেল, তপোময় চায়ের সরঞ্জামগুলি রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে ফেলল, মণিমুকুলের মনে হল, আমারই তো এসব করা উচিত, মুখে একবার ঐ ধরনের কিছু বললও, শুনতে পেল তপোময় বলছে, আজ থাক, আজ তুমি খুব ক্লান্ত, চায়ের কাপ-প্লেট ধুয়ে-মুছে তুলে রেখে বসবার ঘরে ফিরে এসে তপোময় বলল, "আমাকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটু বেরুতে হবে। তুমি স্নানটান সেরে, বরং একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি এসে খাওয়ার ব্যবস্থা করবো। আমরা না হয় বাইরে কোথাও খেয়ে নেব আজকে।"

বেরিয়ে গেল তপোময় ঘোষাল। ভদ্র, উদার, ব্যবহারে ত্রুটিহীন : নিজেকে বলল মণিমুকুল। মিনিট কয়েক ব'সে রইল। তাকিয়ে দেখল লিভিং রুমটাকে। তিন-থ্রীড সোফাসেট, বাদামি রং-এর মোটা নরম গদি। পুরো ঘরটা জুড়ে, দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত, বাদামি রং-এর নরম কার্পেট। কাচের সেন্টার টেবল। ডানপাশে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে বড় একটা ' ফিশার মিউজিক সিস্টেম"। তার সঙ্গেই প্রায় বিরাট একটা টেলিভিশন সেট। দেয়ালে দুখানা ছবি, তার একখানা একটি নগ্ন মেয়ের স্কেচ। জানালায় ঘনসবুজ রং-এর পুরু পর্দা। মাথাটা ঘুরে উঠল মণিমুকুলের। উঠে, বাক্স থেকে শাড়ি-ইত্যাদি বার ক'রে বাথরুমে ঢুকল। আগে বাথরুমের ব্যাপারস্যাপার বুঝে নিল, যাতে স্নানের সময় মেঝেতে জল না পড়ে। দেখতে পেল সোপকেসে নতুন সাবান : আইভরি। একটা নতুন টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ পর্যন্ত। নতুন তোয়ালে। কোনও ত্রুটি নেই তপোময়ের, অতিশয় ভদ্র, উদার, দয়ালু। স্নান সেরে প্রথম সমস্যা হল, শাড়ি মেলবো কোথায়? সমস্যার সমাধান হল না। লিভিং রুমে ফিরে এসে সোফায় ব'সে মনে হল সারা শরীর নিস্তেজ, অবশ হ'য়ে আসছে। উঠে ঢুকল শোবার ঘরে—চটাং ক'রে চাবুক খেল, যখন বুঝল তপোময় তার জন্য আলাদা বেডরুম সাজিয়ে রেখেছে। বড়সড় বেডের পাশে ড্রেসিং টেবল; দেয়ালের সঙ্গে চেস্ট অব ড্রয়ার্স। বেড ও ড্রেসিং টেবলের মাঝখানে একটা টেবল-ল্যাম্প। একবার ইচ্ছে হল অন্য বেডরুমটা দেখে আসবার। ইচ্ছে টিকল না। মণিমুকুল ড্রেসিং টেবলের সামনে ব'সে চুল আঁচড়ালো, মৃদু প্রসাধন করল। সিঁথির সিঁদুরের ওপর দৃষ্টি আটকে রইল কয়েক মিনিট। আয়নার সামনে ব'সে ব'সেই আবার শরীর অবশ হ'য়ে এলো। এবার বিছানায় শুয়ে পড়ল মণিমুকুল। কয়েকমিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে তুলে নিল মণিমুকুলকে, তুলে নিয়ে

অবশেষে ঘুম যখন ভাঙ্গল, স্থান-কালের জ্ঞান ফিরে আসতে একটু সময় লাগল। যেটা কিছুতেই বুঝতে পারল না তা হচ্ছে সময়। এখন কি রাত্রি, না সকাল, না দুপুর, না বিকেল? আজ কি বার কোন তারিখ? উঠতে গিয়ে দেখল, মাথাটা ভারীই রয়ে গেছে, লিভিংরুমে এসে দেখতে পেল তপোময় 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পড়ছে। মণিমুকুলকে দেখে বলল, "উঠেছ? দাঁড়াও, তোমাকে চা দিচ্ছি।"

মণিমুকুল বলল, "আমি করছি চা।"

তপোময় বলল, আজ থাক। জেট-ল্যাগটা বড় বিশ্রী বড় বিশ্রী ব্যাপার। অনেককে বেশ কাবু ক'রে দেয়।"

"এখন কি সকাল?"

তপোময় ঘড়ি দেখে বলল, "এখন শনিবার, সকাল এগারোটা সাঁইত্রিশ মিনিট।"

"কি সর্বনাশ!" মণিমুকুল চেঁচিয়ে উঠল, "আমি বারো ঘণ্টা একসঙ্গে ঘুমিয়েছি!

তপোময় বলল, "প্রায় আঠার ঘণ্টা।"

বিস্ময়ে হতবাক মণিমুকুল হাই চেপে বলল, "বোধহয় আরও আঠার ঘণ্টা শুলেই ঘুমুতে পারি।

চা-বিস্কুট পরিবেশন করে তপোময় বলল, কি খাবে দুপুরে?

মণিমুকুল বলল, আমি এখন ভাতটা ভালোই রাঁধতে পারি।"

দুপুরে আমি সাধারণত একটা-দুটো স্যান্ডউইচ খেয়ে নি।

"আমিও তাই খাবো।"

"ফ্রিজে সব আছে।"

"কখন খাবে তুমি?"

তপোময় বলল, "আমার লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে। তিনটেয় ফিরব। তুমি খেয়ে নিও।

মণিমুকুল তাকিয়ে রইল তপোময়ের মুখে।

তপোময় বলল, "আজ বিকেল পর্যন্ত তোমার জেট-ল্যাগ কেটে যাবে। তখন আমাদের কথাবার্তা হবে।"

।।১৯।।

"বিয়েতে রাজী হ'লে কেন?" প্রশ্ন করল তপোময়।

"উপায় ছিল না। বাবা-মা কোনও আপত্তি শুনলেন না।"

"তাঁরা জানতেন না?"

"না। তাঁরা ভাবতেও পারতেন না তাদের মেয়ে এমনকিছু করে বসবে।

"বলবার সাহস হয় নি তোমার।"

"না। হয়তো হোতো, যদি সুজয়কে রাজী করাতে পারতাম।"

"পারলে না?"

"দায়িত্বহীন ভাবে এমনি কেউ প্রেম করে?"

সুজয়কে খুব দোষ দি না আমি। ওর ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। ছটি ভাইবোন। সুজয় সবাকার বড়। বাপ ষ্ট্রোক হয়ে ইনভ্যালিড। ওর পক্ষে আমাকে বিবাহ করা সম্ভব ছিল না।"

"তোমার সঙ্গে শোওয়া যদিও সম্ভব ছিল! তপোময়ের কণ্ঠস্বরে এই প্রথম উষ্মা।

মণিমুকুল মাথা-নিচু করে চুপ করে রইল এক মিনিট। তার-পর তপোময়ের চোখে চোখ রেখে বলল! "তুমি বুঝতে পেরেছিলে?"

তপোময় বলল, না, বুঝতে দেবার চেষ্টা তুমি বিশেষ করো নি।"

মণিমুকুলকে নীরব দেখে, তপোময় প্রশ্ন করল, "তুমি বিয়ের আগে কারুর সঙ্গে প্রেম করেছো, কি কারুর সঙ্গে শুয়েছ, আমার কাছে সেটা খুব বড়কথা নয়। প্রেমে আমি পড়িনি। শুধু এজন্যে যে প্রেমে পড়তে আমার ভালো লাগে না। শোওয়ার মতো মেয়েমানুষ আমারও ছিল। তোমাকে নিয়ে আমার প্রশ্ন তিনটি : বিয়ে করবার সময় কেন ভাবলে না যে আর একটা লোকের জীবনে মস্ত সমস্যার সৃষ্টি করছ তুমি, যা-করার কোনও অধিকার নেই তোমার। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, এখনও তুমি সুজয়কে ভালোবাসো কিনা। তৃতীয় প্রশ্ন, তোমার মতে আমাদের সম্পর্কটা কি-স্তরের হবে? তুমি নিশ্চয় এসব নিয়ে, আমার মত, অনেক ভেবেছ। অতএব আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না। তাড়া নেই, তুমি কিছু সময় অবশ্য নিতে পারো। তোমার জবাব পাবার পরে আমি বুঝতে পারবো আমাদের সম্পর্কটা, যদি আদৌ থাকে, কি ধরনের হবে। তার মানে, তুমি এ গৃহের গৃহিণী হবার চেষ্টা কোরো না।

।।কুড়ি।।

মণিমুকুল তপোময়ের প্রশ্নের উত্তর দিল, দিতে চেষ্টা করল, পরের দিন সকালে চায়ের সময়।

তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব নেই। শুধু বলতে হয়, আমি দোষী, অপরাধ আমারই। বাবা-মাকে বলতে পারতাম সুজয় যদি রাজী হত। সুজয় রাজী হল না, বাবা মাকে বলার মতো কিছু রইল না আমার। পরীক্ষার আগে বিয়ে করব না, এখন বিয়ে ফিয়ে থাক না এসব কোনও যুক্তিই নয়। এ ধরনের আপত্তি ও'দের কানে ঢুকল না। দাপুটে বাবা-মার অভিজ্ঞতা তোমার আছে কিনা জানি না, টেরর বলে যে কথাটা আছে, তার বাস্তব বিন্যাস যে কি ভীষণ হতে পারে আমি জানি। বাবা আমাকে ছোটবেলা থেকে টেরিলাইজ করে রেখেছে, মাও এ [illegible]

বিষয়ে বাবার সঙ্গে একমত। ওঁদের ডিনাই করার জন্যেই সম্ভবত আমি সুজয়ের প্রেমে পড়েছিলাম, আমাদের সেকুলার সম্পর্কটাও হয়তো গড়ে উঠত না বাবা-মার ও-ধরনের শাসন না থাকলে। আমি সাফাই গাইছি না। সুজয়কে আমি সত্যি ভালোবেসেছিলাম। ওর সঙ্গে বিছানায় শুতে আমার ভালো লেগেছিল। এ কাজের ইনিসিয়েটিভ নিয়েছিলাম আমিই।

জীবনে এই প্রথম আমি একজনের সঙ্গে কথা বলার সময় একটাও মিথ্যে বলছি না। মিথ্যে বলে, লুকিয়ে, গোপন করে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। তোমার কানে ভালো শোনাবে না অনেক কথা যা আমি বলছি। তোমাকে খুশি করবার জন্যে আমি বলছি না। বলছি তোমাকে একটা বাস্তব পরিস্থিতি জানতে ও বুঝতে দেবার জন্যে। বলছি, নিজেকে হালকা ও একটু নির্মল করবার জন্যে।

বিয়ের আগে তোমাকে আমার কোনও রক্তমাংসের জীবন্ত পুরুষ বলে মনে হয় নি। তুমি ছিলে একটা অ্যাবস্ট্রাকশন : একজন পাত্র। আমেরিকায় অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বঙ্গদেশ থেকে একটি স্ত্রী-সংগ্রহের উদ্দেশ্য তুমি কলকাতা এসেছ, এই ছিল আমার কাছে তোমার ইমেজ। তুমি দুটি মেয়ের ছবি দেখে, তাদের ওপর রিপোর্ট শুনে, আমাকে দেখতে এলে, তোমার ওপর রাগ না হবার কারণ ছিল না, তুমি সেই রেডিও এ্যানাউনসার মেয়েটিকে দেখতে গেলে আমার এই বিপদ হত না। অতএব তোমার একটা বিরাট সর্বনাশ করতে যাচ্ছি ভেবে বিয়ের আগে আমার খারাপ লাগে নি, বরং ভালোই লেগেছিল। আমার নিজের সর্বনাশের কাছে তোমার সর্বনাশটা তুচ্ছ মনে হয়েছিল। আরও মনে হয়েছিল, যে শাস্তি তুমি পেতে চলেছ তার জন্যে দায়ী আমি নই, দায়ী একটা দাপুটে শ্বাসরোধী সমাজ-ব্যবস্থা যা ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা করে না, যুবক-যুবতীদের সাবেকি জীবনের যাতাকলে পিষে মারবার জন্যে যা সর্বদা উন্মুখ, বদ্ধপরিকর।

প্রথম ধাক্কা খেলুম বিয়ের পর, তোমার প্রথম পরিচয় পেয়ে। দেখলাম, তুমি শুধু একটা স্টেরিওটাইপ নও, তুমি একটি ভদ্র, মার্জিত পুরুষ, তোমার মধ্যে একটা শালীন আধুনিকতা আছে, যাকে তার আগে আমি কখনও দেখিনি। তুমি যদি আমার মানসের স্টেরিওটাইপ হতে, আদায় করে নিতে আমার কাছ থেকে তোমার সবটুকু পাওনা, কানই দিতে না আমার পরীক্ষা নামক কলকাতায় থেকে যাওয়ার অজুহাতে, বাবা যে দাপটে আমাকে ঘরে রাখতে চেয়েছিলেন, করে রাখতে পারেন নি সুশাসিত শৃঙ্খলিত কন্যা, তুমিও সেই দাপটে আমাকে করে রাখতে চাইবে, এবং [illegible] স্ত্রী। যদি তাই করতে আগের সমস্যাটারও সমাধান হয়ে যেতো। আমার মৃত্যুর জন্যে তোমাকে দায়ী করে পঞ্চাশ বছর তোমার স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকতাম।

কিন্তু তুমি অপ্রত্যাশিত অন্য পথ নিলে, আমাকে বিপন্ন করে, আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে নিজের কথার পেছনে দাঁড়াতে বাধ্য করে। দেখতে এসে তুমি যে তীক্ষ্ণ ধারাল প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তরে সরাসরি মিথ্যে বলা আমি কোনও মতে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। তখন তোমার ভূমিকা ছিল অন্যরূপ, তাই মিথ্যে বলতেও কাঁধতো না আমার। বিয়ের পরে তোমাকে ষোল আনা ঠকাবার শক্তি আর আমার রইল না। ইচ্ছে করলে আমি তোমার কাছে ভার্জিন কন্যা হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে পারতাম, করতে আমার না হল ইচ্ছে, না সাহস। তোমাকে দেখেশুনে তোমার চোখ মুখ শরীরের প্রতি তাকিয়ে আমার প্রত্যয় হল, তুমি আন্তরিক হলেও সেন্টিমেণ্টাল নও, স্পেডকে স্পেড হিসেবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তোমার আছে। আমি বুঝলাম যে তুমি জেনেছ, বুঝেছ আমার অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম ছিল, আমি তার শয্যাসঙ্গিনীও ছিলাম, এবং বিয়ের পরেও আমি তার প্রতি আসক্ত। তুমি যে এই দারুণ দুর্ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত হলে না, আমার সঙ্গে ভদ্র-শীতল ব্যবহার করে গেলে মাত্র, তাতে আমার বিস্ময়ের ও শ্রদ্ধার ভাব বেড়ে গেল। বিস্ময়ের সীমা রইল না তুমি যখন একরকম জিদ করেই আমাকে কলকাতায় রেখে এলে। তুমি বললে না কিছুই, কিন্তু আমার বুঝতে বাকী রইল না, তুমি চাইছ আমি আমার প্রাক-বিবাহিক ঘটনাটার চূড়ান্ত ফয়সালা না করে যেন তোমার কাছে না হাজির হই। এবং এ-ও তুমি আমাকে, কোনও কথা না বলেই, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে এলে যে ফয়সালার জন্যে আমাকে তুমি এক বছর পর্যন্ত সময় দিতে রাজী আছ।

তুমি চলে আসার পর সুজয়কে আমি বহুবার বলেছি, যদি-সে আমাকে গ্রহণ করতে তৈরী থাকে, আমার বিয়ে আমি ভেঙে দেব। সুজয় নিজেকে তৈরী করতে পারে নি। আমি জানি, সে চেয়েছিল, চেষ্টা করেছিল, সব মানুষ তো জেতে না জীবনযুদ্ধে, বেশির ভাগই হারে। সুজয় আর আমি দুজনেই হেরে গেছি। একবার মনে হয়েছিল বুঝি সুজয় পারল, বুঝি সে উৎরে গেল, কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত পাঁচটি ভাই বোন, ইনভ্যালিড বাবা ও রুগ্না মা এবং সনাতন সমাজেরই জয় হল, একটা ছেলে আর একটা মেয়ের পারস্পরিক আনুগত্যের কতোটুকু শক্তি এই পৃথিবীতে! তোমাকে বলা প্রয়োজন, এই বারো মাসে সুজয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক আগের মতোই ছিল, মানে, সুযোগ পেলেই আমরা একত্র হয়েছি। তাতে অবশ্যি [illegible] আমরা এক হতে পারি নি বরং আমার চোখের সামনে সুজয় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছিল, শেষ পর্যন্ত নিয়মিত রোজ মদ না খেলে ওর চলতো না। একদিকে সুজয়, অন্যদিকে আমার পরীক্ষা, তোমার কাছে এতটুকু মান বাঁচাতে হলেও পরীক্ষা আমাকে দিতেই হবে, এবং পাশ করতে হবে, এটুকু জ্ঞানও আমার ছিল। পরীক্ষা আমি দিয়েছি, পাশও করে যাবো, রেজাল্ট খুব একটা নিকৃষ্ট হবে না বলেই বিশ্বাস।

এবার তোমার তৃতীয় প্রশ্নে আসছি। সুজয় শেষ দিকে প্রায় রোজই বলতে শুরু করল, তোমার স্বামীর কাছে চলে যাও, আমাকে অন্তত বেঁচে থাকতে দাও। আমিও বুঝলাম, শেষ চেষ্টায় হেরে গিয়ে সুজয় ভেঙে পড়েছে, আত্মবিশ্বাসের কিছু অবশিষ্ট নেই, ওর কাছ থেকে আর কোনও আশা নেই আমার। তখন নিজের জীবনটাকে বাস্তব দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে মনে হল, যদি আমার কেউ কোথাও থাকে, যার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, সে হল তুমি। বাবা আমাকে কত বেশি ভালোবাসেন যে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে এক মুহূর্ত লাগবে না তাঁর যদি তিনি জানেন কি আমি করেছি, কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। যার কোনও ব্যক্তিত্ব নেই বাবাকে বাদ দিয়ে, তিনিও বাবারই সঙ্গে অন্তত এ সংকটে। আমার দাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক এমন নয় যে তাদের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে। বৌদিদের কাছ থেকে সহানুভূতির কোনও আশা নেই। অতএব তোমার কাছে চলে আসা ছাড়া আর কোনও পথ পেলাম না।

তোমার কাছে চলে এলাম এজন্যে নয় যে তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী। আমার জীবনে বিয়েটা যে এক বিরাট প্রহসন তা কি জানতে বাকী আছে? তোমার ওপরে নিজেকে চাপাতে আমার লজ্জা ও অসম্মান হচ্ছে, কিন্তু লজ্জা ও অসম্মানের চেয়েও জীবন বড়, তাছাড়া আমি সে-জাতের মেয়ে নই যারা আত্মহত্যা করে বসে। আমি তোমার কাছে এসেছি এটুকু বিশ্বাস, ভরসা ও প্রার্থনা নিয়ে যে তুমি আমাকে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার পথ দেখিয়ে দেবে।

।। একুশ ।।

তিন দিন তিন রাত্রি চাউল চাপা টেনশনে। দুজন দু ঘরে। দুজন দুজনকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলল।

চতুর্থ দিন তপোময় ঘোষণা করল তার সিদ্ধান্ত : তুমি আপাততঃ এখানেই থাকবে। আগামী সপ্তাহে তুমি কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হচ্ছ নিউইয়র্ক য়ুনিভারসিটিতে ছ মাসের কোর্স। পাশ করলে সাত আট হাজার ডলারের চাকরী তোমার হয়ে যাবে। পাশ না করা পর্যন্ত তুমি থাকবে এখানেই। আমি তোমার মাইনে দিয়ে

দেব। তুমি হাতখরচাও পাবে। তোমার চাকরী হলে পরে তোমাকে হিসেব দেব কত টাকা খরচ করেছি তোমার জন্যে। ইচ্ছে হলে তুমি তা শোধ করতে পারবে। যতোদিন আমার সঙ্গে এই ফ্ল্যাটে থাকবে, ততোদিন তোমার পরিচয়, তুমি আমার স্ত্রী। এ পরিচয় সমাপ্ত হবে যেদিন তুমি চলে যাবে এখান থেকে। সাংসারিক কাজকর্মে আজ থেকে তুমি সাহায্য করতে পারবে।

থেমে, দম নিয়ে, তপোময় যোগ দিল, সপ্তাহে দুবার আমার সেক্স প্রয়োজন। ওটা তোমাকে সাপ্লাই করতে হবে।

মণিমুকুলের মুখে চোখ রেখে জানতে চাইলে তপোময়, এ সর্তগুলিতে রাজী আছ?

মণিমুকুল বলল, তুমি সত্যি দয়ালু।

।। বাইশ ।।

পরের সপ্তাহে তপোময়ের নির্দেশ মত মণিমুকুল জর্জ ওয়াশিংটন স্কোয়ারে নিউ ইয়র্ক য়ুনিভারসিটিতে ছ মাসের কম্পিউটার ট্রেনিং প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে গেল।

সকাল সাতটায় তপোময় বিছানায় শুয়েই চা পেল। নিউ ইয়র্কে আসার পর এটা ওর এক নতুন অভিজ্ঞতা। উঠে বসবার আগেই মণিমুকুল চায়ের সরঞ্জাম বেডসাইড টেবিলে রেখেছে। তপোময় খুশি হয়ে বলল, গুড মর্ণিং এ্যান্ড থ্যাংক ইউ। মণিমুকুল জানতে চাইল, তুমি কি খেয়ে বেরুবে? তপোময় বলল, ব্রেকফাষ্ট।

মণিমুকুলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, সিরিয়েল, টোষ্ট ডিমভাজা। এই আমার রোজকার ব্রেকফাষ্ট। ও হ্যাঁ, ওরেঞ্জ জুস। মণিমুকুল চলে যাবার মুখে, তুমি বেরুচ্ছ কখন? মণিমুকুল বলল, এগারটায়। তপোময় অনুনয়ের কণ্ঠস্বরে বলল, ভালো করে খেয়ে যেয়ো।

বাড়ী ফিরতে তপোময়ের সন্ধ্যা সাতটা। ফিরে এসে স্নান সেরেই দেখল চা তৈরী। দুজন একসঙ্গে বসে চা খেল। তপোময়ের প্রশ্নের জবাব মণিমুকুল তার নতুন স্কুলের কথা বলল কিছু কিছু। চা-পান শেষ হলে প্রশ্ন করল, কখন ডিনার খাও তুমি?

তপোময় বলল, আটটা?

মণিমুকুল, কি খাবে?

তপোময় বলল, ডিনারের মেনু তোমাকে তৈরী করতে হবে। আমি ভাত খেতে, সরবরকম বাঙ্গালী রান্না খেতে ভালোবাসি। পুড়িয়ে না ফেললে আমার মুখ বেজার দেখবে না।

মণিমুকুল রাঁধল ডাল, মাংসের ঝোল, বেগুন ভাজা। দুজনে একসঙ্গে বসে খেল। তপোময় খাওয়া শেষ হলে লিভিং রুমে সোফায় শুয়ে পড়ল মিউজিক সিস্টেমে সঙ্গীত চালিয়ে। মণিমুকুল তপোময়ের ব্যবহার রেখে নিজের ঘরে চলে গেল পড়া তৈরী করতে।

বুধবার ও শনিবার মণিমুকুল শুল তপোময়ের সঙ্গে। সারা রাত নয়, কিছু পরে মণিমুকুল ফিরে গেল নিজের ঘরে।

তপোময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব কম। তবু মাঝে মধ্যে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল বাঙ্গালী পরিবার থেকে। বেশির ভাগ নিমন্ত্রণই গ্রহণ করল তপোময়।

দুজনে কোনওদিন একসঙ্গে সিনেমা গেল না, অথবা অপেরায় নাটকে, নাচে, সঙ্গীত-পরিবেশনায়।

ছ মাসের কোর্স মণিমুকুল ছ মাসেই শেষ করল। গ্রেড পেল বেশ উঁচু।

তপোময় শুনে বলল, কনগ্রাচুলেশন। তোমার সত্যি মাথা আছে। এবার নিউ-ইয়র্ক টাইমস-এ বিজ্ঞাপন দেখে যাও, আর ফোন করো। চাকরী হয়ে যাবে ঝট করে।

হয়েও গেল। ফিলাডেলফিয়া শহরে মণিমুকুল প্রোগ্রামারের চাকরী পেয়ে গেল। শুরুতে বছরে ন হাজার ডলার।

জামাকাপড় জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে মাত্র কয়েক ঘন্টা লাগল। তপোময় সকালেই বেরুবার আগে গুড-বাই জানিয়ে গেছে। মণিমুকুল সুটকেশে ও ব্যাগ হাতে করে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নির্গত হবে এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে তপোময় ঢুকল।

মণিমুকুলের বিস্মিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে বলল, তোমাকে ষ্টেশনে পেঁছে দিতে এলাম।

সুটকেসটা তুলে নিল তপোময়। এলিভেটরে নিচে নামল। রাস্তায় এসে ট্যাকসি ডাকল। আধ ঘন্টায় পেঁছে গেল পেন ষ্টেশনে।

ট্রেন ছাড়বার মিনিট দশেক বাকি। মণিমুকুলের টিকেট কিনে দিল তপোময়। প্রশ্ন করল, টাকা এনাফ আছে তো তোমার সঙ্গে? আবার প্রশ্ন করল, ওয়াই-ডবলু-সি-এতে ফোন করে চেক করেছ তো যে তুমি উঠবে ওখেনে? যে ট্র্যাক থেকে ট্রেন ছাড়বে তার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল মণিমুকুলকে তপোময়।

মণিমুকুল বলল, তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই আমার। শুধু বলছি, আমাকে ক্ষমা কোরো।

তপোময় বলল, সাবধানে থেকো ঃ টেক কেয়ার অব ইয়রসেলভ।

একখানা লিফাপা দিল তপোময় মণিমুকুলের হাতে।

।। তেইশ ।।

ট্রেন ছাড়বার মিনিট কুড়ি পর মণিমুকুল লিফাপা খুলে একখানা কাগজ বার করল। তাতে তপোময়ের লেখা কয়েকটি লাইন ঃ

তোমার ওপর সম্ভবত সবশুদ্ধ আমার পাঁচ হাজার ডলার খরচ হয়েছে। ছ মাস যদি তুমি কোনও পরিবারে চাকরী করতে, কম করে পনেরশ ডলার তোমার রোজগার হত। সুতরাং তোমার কাছে আমার সাড়ে তিন হাজার ডলার পাওনা।

এ টাকা না পেলেও আমার চলবে, মনে হবে না যে পাই নি। শোধ না করলে তোমার যদি আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, ফিরিয়ে দিও সুযোগ বুঝে মত, তাড়া নেই একেবারেই।

তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজ শেষ। দেখা যদি বা হয়, আমরা আর পরিচিত নই পরস্পরের কাছে। এখন থেকে তোমার জীবনের দায়িত্ব তোমারই।

আমাদের দুজনের স্বার্থেই ডিভোর্স প্রয়োজন হবে। সময় মতো আমার এটর্নী তোমাকে লিখবে। তারও দেরী আছে। ততদিনে তুমি সেটেলড হয়ে যাবে ফিলাডেলফিয়ায়।

বিধাতা মানুষের জীবন নিয়ে অনেক রসিকতা করেন। অনেক খেলা খেলেন তাঁর হাতের পুতুলদের নিয়ে। পুতুলগুলি যদি বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাদেরও কর্তব্য বিধাতার সঙ্গে সমান তালে খেলে যাওয়া। সমান রসিকতা বোধ নিয়ে। বিধাতা হারুন মানুষের কাছে দু-একবার।

।। চব্বিশ ।।

বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি লাগল নিউইয়র্ক শহর অনুপ্রিয়ার কাছে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস। তার কল্পনার পশ্চিমী শহরের সঙ্গে নিউইয়র্কের বিশেষ মিল দেখতে পেল না। রাস্তায় নোংরা জমে থাকে, লোকেরা চলতে চলতে থুতু ফেলে, রোজ মাগিং, মার্ডার আর রেপ, রাস্তায়, সাবওয়েতে ভিখিরি! উঁচু উঁচু এ্যাপার্টমেন্ট বাড়ীগুলোয় লক্ষ লক্ষ পরিবারের বাস, কেউ এরা কাউকে চেনে না, এই বিরাট অসম্ভব কর্মব্যস্ত শহরটাতেই কেউ চেনে না কাউকে, কারুর জন্য কারুর সময় নেই। পথে দোকানে, বাজারে লোকেদের ব্যবহার ভদ্র নয়, বরং রূঢ়, দিনের বেলাও অনেক রাস্তায় একা চলতে ভয় করে। আর সব সময় কি নিঃসঙ্গ একা লাগে, মনে হয় এই বিরাট জনসমুদ্রে আমার কেউ নেই, কারুর কেউ নই আমি। তার চেয়ে অনেক অনেক ভালো আমার দিল্লী-কলকাতা, যেখানে অনায়াসে যে কোনও সময়ে বন্ধু-আত্মীয়ের বাড়ী চলে যাওয়া যায়, যেখানে মানুষের হৃদয় এখনও উত্তপ্ত, মানুষ মানুষকে আর কিছু না হোক সময় ও বাক্য দিতে পারে।

এর মধ্যে একমাত্র ভালো য়ুনিভার-সিটি, এতো ভালো যে অনুপ্রিয়া কল্পনাও করতে পারে নি। শুধু বই-পত্র-জার্নাল অফুরন্ত নয়, শেখাবার পদ্ধতি সুন্দর ও নতুন, শিক্ষকরা কৃতী এবং খেলাতে উৎসুক, ছাত্রা সীরিয়স।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাইকলজিতে এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া সত্ত্বেও অনুপ্রিয়া কলম্বিয়ায় প্রথম মুহূর্তেই বুঝল, সাইকলজি পড়া তার বিশেষ কিছুই হয়নি, সাইকোথেরাপি পড়তে হলে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত খেটে দুরত্বকে আগে দূর করতে হবে। অতএব প্রথম কয়েকটা মাস অনুপ্রিয়ার কাটল ক্লাসে, লাইব্রেরীতে আর ল্যাবে; এছাড়া আর কিছু করার না রইল সময় না শক্তি না ইচ্ছে। সাত মাস ধারাবাহিক পরিশ্রমের পর অনুপ্রিয়ার আত্মবিশ্বাস বাড়ল। আমি এবার এদের সঙ্গে সমান স্তরে কথা-বার্তা বলতে পারছি; সেমিনারে আমার প্রশ্ন শুনে কেউ আর হতাশ হচ্ছে না, বরং অনেকেই উৎসাহিত হচ্ছে, ল্যাবে আমার এক্সপেরিমেন্ট এবার এদের সঙ্গে সমান পর্যায়ে চলছে। খানিকটা হালকা লাগল অনুপ্রিয়ার, আবিষ্কার করল, হাতে মাঝে মাঝে সময় এসে যাচ্ছে, আরও আবিষ্কার করল নিউইয়র্ক শহরে সে একেবারে একা।

ডর্মে দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ, বন্ধুত্ব নেই কারুর সঙ্গে। আমস্টারডাম এ্যাভেনিউর ওপর টিচার্স কলেজের হস্টেলে অনুপ্রিয়ার বাসস্থান, এখানে মাত্র আর দুটি ভারতীয় মেয়ে, দুজনেই অবাঙালী। তাতে অসুবিধা হত না অনুপ্রিয়ার, সে দিল্লীতে মানুষ, এবং তার হিন্দী পাকাপোক্ত, কিন্তু এদের সময় নেই তার জন্যে, একজন আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে মহাব্যস্ত, অন্যজন তার চেয়েও ব্যস্ত তার পাঞ্জাবী বয়-ফ্রেন্ড নিয়ে। আমেরিকান মেয়েদের প্রধান কর্ম পুরুষ, তারপরে পাঠ, তৃতীয় আহার, চতুর্থ নিদ্রা। নতুন নিয়মে ছেলেরা মেয়েদের ডর্মে রাত বারোটা অবধি কাটাতে পারে, মেয়েগুলির পাত্তা পাওয়া যায় না সন্ধ্যে থেকে মাঝরাত্তির। একা-একা কি যেতে ইচ্ছে করে সিনেমা থিয়েটার কনসার্টে? অমিয়কান্তি মজুমদারের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেও যেতে ইচ্ছে করে না একা একা। এ অবস্থায় বাবা-মার চিঠি পড়তে চোখে জল এসে যায় না? বুকটা মচড়ে ব্যথা করে ওঠে না? মাকে চিঠি লিখতে বসলে চোখের জল টপ করে চিঠির কাগজের ওপর পড়ে না?

।। পাঁচিশ ।।

পড়াশোনার চাপ যতো বেশিই থাক, হৃদয় হোক না নিঃসঙ্গতার ভারে রুদ্ধশ্বাস, মা-বাবাকে অনুপ্রিয়া প্রতি সপ্তাহে একখানা চিঠি লিখবেই। বেশির ভাগ চিঠিই বাবা মা এক সঙ্গে লেখা; কোনও কোনও চিঠি মা-কে অথবা বাবা-কে। বাবা-মা দুজনেই অনুপ্রিয়ার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তথাপি অন্তরঙ্গতারও অন্তস্তলে এক-একটা নিবিড় সুরের মূর্ছনা থাকে, তার কোনওটার যোগসূত্র মনে হয়, বাবার সঙ্গে, কোনওটা মার। আবার এমন অনেক নিবিড়তম সুরের মূর্ছনাও ভেসে আসে অন্তিম অন্তস্তলের গভীরতর আলো-অন্ধকার থেকে, যার সঙ্গে কারুর যোগসূত্র নেই, ঈশ্বরের পর্যন্ত না।

৭ই মার্চ, ১৯৭১ : মাগো, আমি কেবল পড়ছি আর নোট লিখছি আর ল্যাবে কাজ করছি আর সেমিনার-ক্লাস-ওয়ার্কশপ করছি; এর বাইরে যা করছি তাকে একশব্দে ডিসমিস করে দেওয়া চলে; কিছুই না। অথচ আমার শরীর বেশ ভালো আছে। সবচেয়ে সাংঘাতিক সংবাদ হল যে আমার তিন পাউন্ড ওজন বেড়েছে। আটত্রিশ সাইজের ব্রা না হলে আর চলছে না আমার।

হস্টেলের মেয়েগুলি হয় বেহায়া-বেলাজ, নয় অহংকারী, নয় বোকা। এদেশে আজ-কাল ছেলেদের অবাধ আসা-যাওয়া মেয়েদের হস্টেলে। সুতরাং প্রায় কোনও মেয়ের ঘরই কোনও রাত্রিতে পুরুষবিহীন নয়। যাদের শুধু ঘর নয়, জীবনটাও, পুরুষবিহীন তাদের মধ্যে তোমাদের এই কন্যা অন্যতমা। অতএব, জননী, চিন্তার কোনও কারণ নেই।

আমি এখনও পড়াশোনায় প্রায় সবার থেকে পিছিয়ে আছি। তবে, বলে রাখছি, আর বেশি দিন থাকবো না। এই সময়, আগামী বছর, আমি সবার আগে পৌঁছে যাবো। এ বিষয়ে আমার মাষ্টারমশাই-দের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার বিন্দুমাত্র নেই।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৭১ : বাবা, ফ্রয়েডের 'ক্রাইসিস ইন আওয়ার সিভিলাইজেশন' পড়লাম। তিনি কি পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন ও বিনাশ দিব্যজ্ঞানে দেখতে পেয়েছিলেন? এদেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের শতকরা পঞ্চাশজন সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন। মানে, কম-বেশি এরা সবাই পাগল। না-কি খানিকটা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও স্নায়বিক বৈকল্য বর্তমান জীবনধারার অনিবার্য সহচর? ভারতের অবস্থাও কি একদিন এমনি হবে?

মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মাথাও পুরোপুরি ঠিক নেই। দিল্লীতে এরকম মনে হত না কখনও। চিন্তা করে বুঝতে পেরেছি কারণটা কি। আমাদের দেশে আমরা নিজেকে নিয়ে ভাবি খুব কম; আমার কাছে আমি খুব একটা মুখ্য সমস্যা নই। আমি লুকিয়ে থাকি, বিলীন হই, অনেকের মধ্যে। এখানে ব্যক্তিই প্রধান। আমার কাছে আমিই সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমাকে নিয়ে আমি কি করবো, এই হল সব সময়ের সবাকার প্রশ্ন। মানুষ যে তার নিজের কতো বড় দুষমণ হতে পারে এখানে না-এলে বুঝতাম না।

তুমি খুব চিন্তিত হোয়ো না, বাবা। আমি মাত্র একটুখানি পাগল হয়েছি। কাল রকফেলার সেন্টারে বেড়াতে গিয়ে সদ্যফোটা গোলাপের প্রবাহ দেখে কী যে

পরবর্তী আকর্ষণ

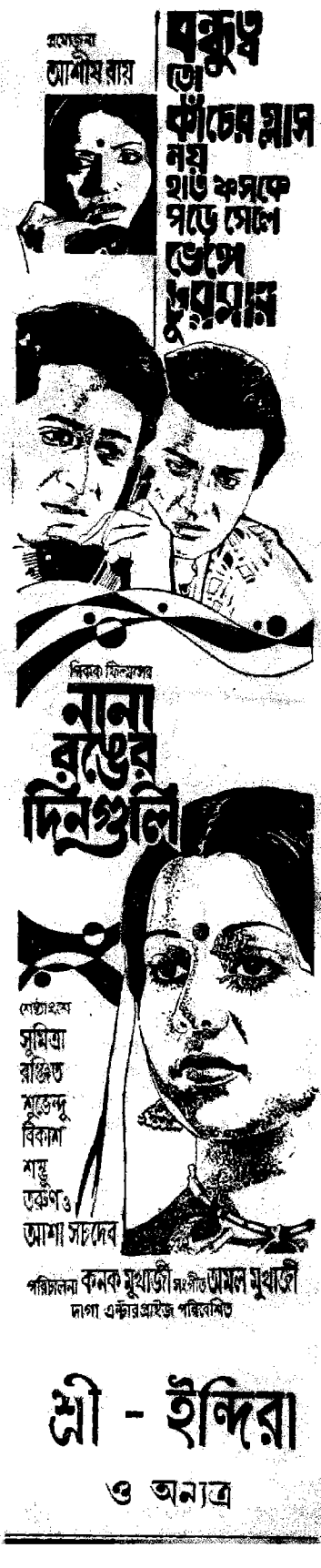

শ্রী - ইন্দিরা

ও অন্যত্র

আনন্দ হল, যদি দেখতে। তার মানে আমি এখনও প্রায় ঠিক আছি। বিশ্বাস করো, বাবা, একটুখানি পাগল না হয়ে বেঁচে থাকাটা বড্ড নিরামিশ লাগতে পারে।'

৩০শে মে, ১৯৭২ : মা, তোমাকে যা বলেছিলাম তাই হল। টার্ম পেপারে আমি এ ক্লাস পেয়েছি। আমার গ্রুপের আর কেউ পায় নি। আমার প্রফেসরের গোঁফ প্রায় খুলে পড়েছিল! ক্যাথারীন বলে যে দেমাকী সুন্দরী মেয়েটার কথা আগে লিখেছি, হিংসেয় তার মুখ সবুজ! আর আমার আনন্দ যদি দেখতে! দুঃখ এই যে কারুকে জড়িয়ে ধরতে পারলাম না।

এ সপ্তাহে আমার জীবনে একটা দারুণ ঘটনা ঘটে গেল। একটি আমেরিকান ভদ্রলোক, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স আমাদের ল্যাবে আসেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্টে 'সাবজেক্ট' হয়ে কাজ করতে। এঁরা দুজনেই আমাকে বললেন, আমি দেখতে সুন্দর। ইউ আর ভেরী প্রিটি। জীবনে এই প্রথম শুনলাম এমন মিষ্টি, সুধাকর শব্দ। ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, তুমি অন্তত দুটি মানুষকে সৌন্দর্য চেনবার ক্ষমতা দিয়েছ।'

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ : মা, একটা ঘোষণা আছে। আমি একটি বন্ধু পেয়েছি। চমকে উঠো না; মেয়ে বন্ধু। বাঙালী মেয়ে। এডুকেশনাল টেলিভিশনে কাজ করে। খুব জীবন্ত, সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো। আলাপ হল অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বাঙালী ফাংশনে। এখানে অমিয়কান্তি মজুমদার বলে একজন আছেন। ভালো রবীন্দ্রসংগীত করেন। ভদ্রলোকের বৌ ওঁর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট। দেখতে সুন্দর, কিন্তু, সবাই বলে ভীষণ দেমাকী। হবেই বা না কেন? অমিয়কান্তি মজুমদার নাকি ওর কথায় ওঠেন, বসেন, নাচেন। ওকে একটা আলাদা বাড়ি কিনে দিয়েছেন। প্রত্যেক মাসে নাকি এক সেট নতুন গহনা প্রেজেন্ট দেন। থাকগে, অমিয়কান্তি মজুমদারের গান শুনতে গিয়েছিলাম, আলাপ হয়ে গেল সুরভি বসুরায়ের সঙ্গে। আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাব। সুরভির স্বামীর সঙ্গেও আলাপ হল। কলম্বিয়া থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে পি এইচ ডি করে একটা বড় কোম্পানীতে কাজ করছে। একটু লাজুক প্রথম প্রথম, কিন্তু খুব আন্তরিক। ওরা খেতে ডাকল, আমি নাচতে নাচতে হাজির হলাম। কতদিন পরে যে বাঙালী ঘরোয়া রান্না খেলাম তা মনেও করতে পারছি না। সুরভি মন্দ রাঁধে না, কিন্তু আমার মুখে অমৃত লাগল। ওদের ওখানে আরও তিনটি যুবকের সঙ্গে আলাপ হল : একটি যুগল মন্দ নয়, অন্য দুটি বাজে। আর একটি ছেলেও ছিল যে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলল না, কিন্তু লক্ষ্য করলাম একশ হাজারবার আমাকে দেখেছে! ছেলেটার নাম সোমরাজ। চাপ দাড়ি আছে আর মাথায় চুল খুব কম। মুখে চোখে পৃথিবীর সবটুকু নৈরাজ্য।

আমার ভাগ্য খুলে গেছে মা। সুরভি প্রায়ই খেতে ডাকবে। ওজন প্রতি মাসে এক পাউন্ড বাড়বে। সেই আমেরিকান দম্পতি নিশ্চয় খাঁটি কথা বলেছিল : সোমরাজও আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। আজকাল পথে চলতে মনে হয় অনেকেই আমাকে দেখছে।

৮ই জুলাই, ১৯৭৩ : বাবা আমি সেপ্টেম্বর থেকে সন্ধ্যেবেলা নিউট্রিশন নিয়ে পড়া শুরু করব। আমার প্রফেসর মত দিয়েছেন। আমি একটা কোর্স নিয়ে শুরু করছি, তার বেশি পেরে উঠবো না। তোমাকে কথা দিচ্ছি বাবা, নিউট্রিশনে অন্তত মাস্টারস না নিয়ে আমি দেশে ফিরছি না।

আরও একটা খবর আছে যা তোমাকে খুশি করবে। আমার এক মহিলা অধ্যাপককে আমি কেস-ওয়ার্কে সাহায্য করছি। সপ্তাহে দুদিন তাঁর সঙ্গে পাঁচ ঘন্টা কাজ করছি। পেসেন্টদের মন খুলে কথা বলাতে পারলে তাদের রোগ ধরা সম্ভব হয়। কথা বলানর অনেক বিজ্ঞানসম্মত প্রথা আছে। এ প্রথাগুলো আমি এবার শিখতে পারবো, এছাড়া ঘন্টায় পাঁচ ডলার রোজগারও হবে।

নিজেকে নিয়ে কোনও বড় সমস্যায় এখনও পড়ি নি বাবা। নিঃসঙ্গতাটা সমস্যা ছিল কেটে গেছে। সুরভিরা এখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাসে অন্তত

পিটার প্যান চায়

ব্রা করবে সুন্দর
আর হবে অনেক কাজের

স্নোফ্লেক

আপনার পক্ষে অনেক সুবিধের—
এই এর বিশেষত্ব !

স্নোফ্লেক-নিপুণভাবে নিখুঁত ক'রে তৈরী করা হয়েছে আপনার তনুশ্রীকে সুঠাম করার সাথে সাথে তাকে ধরে রাখতে।

কাপের নীচে ভেতরের ন্যাপ্তের দরুণ ব্রা সুন্দর খাপ খায়। বিশেষভাবে তৈরী সুপারফাইন সুতীর লাইনিং এমন মিহি মোলায়েম যে গায়ে কিছু আছে বলেই মনে হয় না। তাছাড়া কাপকেও ধরে রাখে নিজের জায়গায়।

কাঁধের স্ট্র্যাপ সত্যিই বিশেষ ধরণের— অন্য কোন ব্রা-তে এরকমটি নেই।

টানটান নরম নাইলনের তৈরী এগুলো ভারী আরামের—কাঁধে দাগ কাটে না। আর হাতের নীচে ইল্যাস্টিক স্ফীতির চিহ্নমাত্র হতে দেয় না।

সুন্দর নাইলন লেসের স্নোফ্লেক সাদা, কালো, গোলাপী আর নীল রঙে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে মানানসই ব্রীফ।

Peter Pan নারীর সেরা আভরণ

প্রস্তুতকর্তা :
ডন অ্যাপেরেলস লিমিটেড
ফাওসন রোড, লোয়ার পারেল,
বোম্বাই ৪০০ ০১৩

রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিনামূল্যে

অপূর্ব নতুন পিটার প্যান পুস্তিকা

ব্রা — এ সম্বন্ধে আপনি খুব কমই জানেন 18-S

আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

স্পষ্ট বড় হরফে আপনার নাম ও ঠিকানা লিখে এই কুপনটি পূরণ করুন ও ডাক খরচ বাবদ ৫০ পয়সার ডাক টিকিটের সঙ্গে এই ঠিকানায় পাঠান। ডন অ্যাপেরেলস লিঃ, ফাওসন রোড, লোয়ার পারেল, বম্বাই ৪০০ ০১৩

নাম: _____

ঠিকানা: _____

CHAITRA-PP-108 BEN

একটা উইক-এন্ড ওদের সঙ্গে কাটে। নিঃসঙ্গতার সমস্যা নেই, সঙ্গতার সমস্যা এখনও দেখা দেয়নি। তবে কোনওদিনই দেখা দেবে না তাই-বা বলি কি করে? না বাবা, সোমরাজের প্রেমে পড়ি নি এখনও। তবে ছেলেটা আমাকে টানছে। একটু-একটু, হেডলাইন খবর নয় এখনও। তবু বলে রাখলাম। তুমি নিশ্চয় শ্রদ্ধা ছারাচ্ছ তোমার মেয়ের সম্বন্ধে ঃ সে কাউকে একটুও আকর্ষণ করতে না পারায়। তাই বলে রাখলাম, যতোটা অকেজো ভাবছ তুমি আমাকে ততোটা হয়তো আমি নই।'

২০ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ ঃ 'মা সুরভিদের সঙ্গে ক্রিসমাসের সপ্তাহে আমি বস্টন যাচ্ছি। সোমরাজও যাচ্ছে। ওর হাবভাব কিছুদিন হল সুবিধের দেখছি না। মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে বস্টনে। যদি ঘটে, নতুন বছরে জানতে পারবে।

আমার রোজগার বেশ বাড়ছে। বাবাকে বোলো জমিটা কিনে ফেলতে। জানুয়ারীতে আমি পুরো টাকাটা পাঠাতে পারবো। দু বছরের মধ্যে আমাদের নিজেদের বাড়ী হবে দিল্লিতে। ভাবতেও লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। তোমার তো ছেলে-না-হবার জন্যে দুঃখের শেষ নেই! দেখে নিও তোমাদের মেয়ে একাই দশটা ছেলের কাজ করে দেবে।'

১লা জুন ১৯৭৪ ঃ বাবা-মা, আজ আমি একটা বড় কাজ করে বসেছি, তোমাদের জানাচ্ছি। ঠিকানা দেখে বুঝবে আমি হস্টেল ছেড়ে দিয়েছি। আমি উঠে এসেছি একটা দু-ঘরের অ্যাপার্টমেন্টে। আজ থেকে এখানে আমি আর সোমরাজ একত্র বাস করব।

আমরা বিয়ে করছি না, বাবা ও মা। বর্তমানে আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি। কিন্তু দুজন দুজনকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই কিনা এ নিয়ে আমাদের মনে সন্দেহ রয়েছে। এ সন্দেহ দূর না হলে বিয়ে করা নিছক বোকামি হবে। তাছাড়া বিয়েই যদি করি তোমাদের ও সোমরাজের বাপ-মার উপস্থিতিতেই করব।

সোমরাজের কথা তোমাদের অনেক লিখেছি। ওকে তোমরা এখন মোটামুটি চেন। সোমরাজ শুধু সৎ ও উদার নয়, অতিশয় বুদ্ধিমান ও মেধাবী। কিন্তু ওর একটা বিরাট প্রব্লেম রয়েছে; নিজেকে কারুর কাছে খুলে ধরতে পারে না সোমরাজ। ওর একটা গভীরতম সত্তা আছে যেখানে ও একা, সেখানে ও কাউকে ঢুকতে দিতে চায় না, অথবা পারে না। তার মানে নিজেকে অন্য এক-জনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া সোমরাজের পক্ষে সহজ নয়।

যতোদিন ওর এই অক্ষমতা বা অনিচ্ছা থাকবে ততোদিন আমি ওকে বিয়ে করতে পারব না। আমি চাই আমাকে ভাগ করে নিতে আমার স্বামীর সঙ্গে; যে পুরুষ আমাকে তার অন্তরতম সত্তায় প্রবেশাধিকার দেবে না তাকে আমি স্বামীর আসনে বসাতে পারবো না।

তবু সোমরাজকে আমি সত্যি ভালোবাসি; খুব দারুণ ভীষণ ভয়ানক ভালোবাসি। ওর নিঃসঙ্গতা স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরতা আমাকে ততোখানিই আকর্ষণ করে, যতোখানি করে ওর তীক্ষ্ণ মেধা ক্ষুরধার বুদ্ধি উদার মন ওর সৌন্দর্য-প্রিয়তা। সোমরাজের কাছে গান ছবি আর বিজ্ঞান সমান সুন্দর।

সবচেয়ে বড় কথা ঃ সোমরাজ আমাকে ভালোবাসে। আমার জীবনে এই প্রথম পুরুষের ভালোবাসা; সে পুরুষ যে-কেউ নয়, সে সোমরাজ সেন। আমার জীবনে সোমরাজ প্রথম পুরুষ যে আমাকে বলেছে, আমি সুন্দর আমি নাকি অপূর্ব সুন্দর। সোমরাজ যতো-দিন আন্তরিক সততার সঙ্গে আমাকে সুন্দর দেখবে বলবে, তুমি সুন্দর ততো-দিন আমি ওকে ভালোবাসবো।

হস্টেলে থেকে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। চারদিকে ছেলেমেয়েরা জীবন উপভোগ করছে দেখে দেখে আমার সেহমনেও এমনসব ক্ষুধা জেগে উঠছিল যাদের কথা মনে আনতেও তিন বছর আগে আমি মূর্ছা যেতাম। খাওয়া-দাওয়ার খুব অসুবিধা হচ্ছিল ঃ হস্টেলের খাদ্য আমার মুখে কোনওদিন পুরো ওঠে নি। বাইরে খেতে খরচ হচ্ছিল অনেক।

সোমরাজও প্রায় পাগল হতে যাচ্ছিল। ওর নিঃসঙ্গতা যে কি গভীর কি জটিল তা তোমাদের বোঝাতে পারবো না এই চিঠিতে। প্রায়ই ওর খাওয়া হোতো না। টাকাপয়সা হারিয়ে যেতো ওর দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছিল।

বস্টনে সোমরাজ ও আমি দুজন দুজনকে পুরোপুরি ভালোবেসে ফেললাম। এপ্রিল মাসে সোমরাজকে আমিই বললাম এসো আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি।

সোমরাজ প্রথমে ভাবতে পারল না আমি সিরিয়াসলি বলছি ওকথা। যখন ওর সন্দেহ কাটল, সোমরাজ বলল তুমি বাঁচালে আমাকে। আমি কিছুতেই এ প্রস্তাব করতে পারতাম না তোমার কাছে।

আমি বললাম তোমার সঙ্গে একত্র বাস করতে রাজী আছি। কিন্তু তোমাকে এখনই বিয়ে করতে রাজী নই। সোমরাজ বলল, আমার অবস্থা এতোই খারাপ যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পর্যন্ত রাজী আছি।

বাবা-মা আমি এখন বড়ো হয়েছি; জীবন যে কতো গুরুগম্ভীর কি ভীষণ আনন্দের বুঝতে শিখেছি। আমি জানি বেঁচে থাকা অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। আমি এ-ও জানি জীবনে অনেক কিছু আছে যা প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব, সেখানে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ আমি যা করছি তার পূর্ণ দায়িত্ব আমার। যা করছি তা আমাকে আমার কাছে অনেক বড়ো করে দিয়েছে তাই তোমাদের কাছে অকপটে গর্ব ও বিনয়ের সঙ্গে সব বলতে পারছি। তোমরা আমার বাবা-মা-ই শুধু নও আমার অন্তরতম বন্ধু। তোমাদের কাছ থেকে লুকোতে হবে এমন কাজ আমি জীবনে করবো না। এখানে আসবার আগে তোমাদের কথা দিয়েছিলাম। আমি এমন কিছু করছি না যার জন্যে তোমাদের সামনে উঁচু মাথায় পারবো না দাঁড়াতে, সোজা তাকাতে পারবো না তোমাদের চোখে, তোমাদের বুকে মাথা রেখে পারবো না আদর খেতে।

।। সমাপ্ত ।।

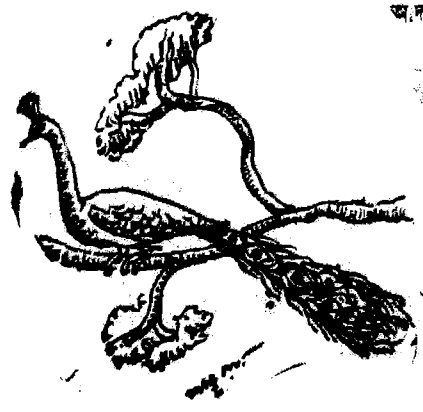

আকাশের নীচে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

নদীর চড়ায় জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে কি যেন একটা অদ্ভুত জীব উবু হয়ে মাটি খামচে পড়ে আছে। দৃশ্যটা প্রথম চোখে পড়ল শিবুর। শিবু, তারক আর জগা এই তিনজনে মিলে ছোট্ট একটা নৌকায় মাছ মারতে বেরিয়েছিল। সপ্তাহে দুবার একবার করে বেরুতেই হয়। আজও জোগাড় যন্ত্র করে যখন ওরা রওনা হল তখন ছিল রাত। এখন উষুম উষুম আলো ফুটতে শুরু করেছে। পুব দিকে আকাশ লাল আর কয়েক দণ্ড পেরুলে সূর্যের মুখ দেখা যাবে। ডিমের কুসুমের মতো আলোর এই আমেজটা কেটে যেতে এখনো বেশ কিছুক্ষণ বাকি।

দিন কয়েক ধরে আকাশ পরিষ্কার যাচ্ছে, ঝড় বাদলার সম্ভাবনা নেই। নদীতে এই ছোট নৌকো নিয়েই অনেক দূর অবধি এগিয়ে যাওয়া যায়। ওরা ঠিক করেছিল, নতুন চরের কাছাকাছি এগিয়ে দিনভর মাছ মারবে। বিকেলের আলো পড়তে পড়তে আবার ফিরে আসবে গাঁয়ের দিকে।

কিন্তু চরের কাছাকাছি এগিয়ে শিবু হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল বস্তুটাকে। প্রথমে মনে হয়েছিল গাছের একটা গুঁড়ি। ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এসে চড়ায় আটকে পড়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন ভ্রম ভাঙ্গল তখন আপাদমস্তক ঝনঝনিয়ে উঠল ওর, টান টান হয়ে উঠল সর্বদেহ। চেঁচিয়ে উঠল শিবু, আই বাপ, ওটা কি গো?

—কোনটা, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বাকি দুজন।

আঙুল তুলে বস্তুটার দিকে দেখাল শিবু, ঐ যে গো পড়ে আছে!

—তাই তো বটে! তারক আর জগা হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকল। একটা মেয়ে মানুষের মতো মনে হচ্ছে হাঁ মেয়ে মানুষই যে সন্দেহ নেই। লেবু পাতা রং একটা শাড়ি পরনে কাদায় আর খোলায় লটপটি খেয়ে আছে। মাথা ভর্তি চুল, চুলের ঢল বিছিয়ে আছে বালির ওপর। মুখ দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। গালের এক পাশ কাদায় লেপটে আছে। দু বাহু সামনের দিকে ছড়ান। মুঠোয় কাদায় খামচে ধরা, যেন বাঁচবার জন্য শেষ চেষ্টার ভঙ্গিটা এখনো খুব স্পষ্টভাবে ধরা যাচ্ছে।

এসব ক্ষেত্রে যা করা উচিত তাই করল ওরা। নৌকাটাকে টেনে এনে চড়ায় ঠেকাল। গেরাফি ফেলল। চড়ায় লগি ঠেকিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে নামল ডাঙ্গায়। তারপর হাই হাই করে ছুটে একেবারে মৃত দেহটার কাছাকাছি।

—নাহ! বেঁচে নেই। শিবু ঝুঁকে পড়ে বলল। বোধ হয় নৌকাফোঁকা ডুবি হয়েছে কোথাও।

এত বড় বিশাল এই নদী। এই চড়ায় দাঁড়িয়ে ওপারের ভাঙ্গা চোখে পড়ে না। চড়া ছাড়িয়ে আরো মাইল কয়েক এগোলে সাগরের মুখ দেখা যেত। ঢেউ আর জলের টান দেখেই বোঝা যেত, সাগর শুরু হচ্ছে। এই ছোট নৌকোয় ভরসা করে অত দূরে এগোন উচিত নয়। বড় নৌকোয় অনেকবার ওরা সাগর ঘুরে এসেছে। এমনও হতে পারে ঐ সাগরের মুখোমুখিই কোথাও হয়তো নৌকাডুবি হয়েছে, আর এই বেচারী জলডুবি হয়ে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে আটকে পড়েছে।

জগা বিড়বিড় করে বলল, নৌকা-ডুবি হলে খবরটা কিন্তু চাপা থাকত না। ঠিক আমরা পেয়ে যেতাম।

তারক এমনিতেই একটু ভীতু স্বভাবের মানুষ, কম কথা বলে। এ জাতীয় একটা দৃশ্য দেখার পর ওর চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। নৌকা ডুবিই ঘটুক আর যাই ঘটুক মাছ মারতে এসে এ কোন ঝামেলায় পড়লাম বলো দেখি! ভীষণ খারাপ লাগছিল ওর দৃশ্যটার দিকে তাকাতে, তবু অপলক ও তাকিয়ে রইল।

—এমনও হতে পারে, জগা মেয়েটিকে লাফিয়ে উলটো পিঠে গিয়ে দাঁড়াল, কেউ ওকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। এত বড় এই নদীতে ভাসিয়ে দিলে লাশ। কারো খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। নেহাতই মেয়েটার

কপাল ভালো, আমাদের চোখে পড়ে গেছে।

তারক শুধোল, খুন করবে কেন? এমনও তো হতে পারে অসুখে মারা গেছে, পোড়াবার কাঠ জোগাড় করতে না পেরে ওকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে ওর সঙ্গীরা।

—অসম্ভব না। শিবু তারকের দিকে তাকাল, অনেক সময় সাপে কাটা মড়া জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

—সাপে কামড়ালে চামড়ার রঙ অন্য রকম দেখাত। সারা গা নীল হয়ে থাকত। জগা মেয়েটার মুখের কাছে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল। সাপে কামড়ালে রঙটা অত টাটকা থাকত না।

মুখটা অবশ্য পুরোপুরি ভাল করে দেখার উপায় ছিল না। ঘাড়ের কাছে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে মেয়েটাকে বেশ ফর্সা বলে অনুমান হয়। অটুট স্বাস্থ্যবতী, বয়স এমন কিছু একটা বেশিও নয়, বড়জোর কুড়ি কিংবা বাইশ।

—হ্যাঁ, ও রকমই একটা বয়স হতে পারে ওর। জগা বলল, শাড়িটা একটু লক্ষ্য কর, গরীবের মেয়ে হলে পরনে ওর ওরকম শাড়ি থাকত না। আমার মনে হয় অবস্থা-টবস্থা বেশ ভাল ছিল। নেহাতই ভাগ্যদোষে আজ এই অবস্থা।

—অবস্থা ভাল থাকলে দাহ না করে জলে ভাসিয়ে দিল কেন? সাপেও তো কামড়ায় নি বলছিস?

—নির্ঘাৎ নৌকাডুবি হয়েছে কোথাও। আমি যা বলছি, তাই হয়েছে।

জগা আবার প্রতিবাদ করল, এমনও তো হতে পারে নৌকায় ডাকাত পড়েছিল। মেয়েটা হয়তো সম্মান বাঁচাতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

—এই নদীতে কেউ জেনে-শুনে জলে ঝাঁপাবে না, কেননা জলে ঝাঁপালেই মৃত্যু।

ডাকাতরাও জলে ফেলে দিতে পারে।

অসম্ভব, হতেই পারে না।

—কেন হতে পারে না কেন? সমান উঁচুতে গলা তুলে জিজ্ঞেস করল জগা।

শিবু বোঝাবার চেষ্টা করল হতে পারে না তার কারণ ওর কানে একটা সোনার দুল রয়েছে। গলার কাছে চিক চিক করছে কি ওটা ভালো করে তাকিয়ে দেখ।

ঝুঁকে পড়ল তারক আর জগা।

তারক বলল, হার রে হার। গলায় একটা হার রয়েছে।

—তাই বলছিলাম, ডাকাতের চোখেই যদি পড়বে ও, তাহলে ওগুলো এখনো ওর সঙ্গে থাকত না।

মড়াটা নদী থেকে লাফিয়ে টকাস করে খানিকটা উপরে উঠে পড়ল। এখন গোটা নদীর জলে টকটকে মেজেন্টার রঙ। জলে ভেজা বাতাস এখনো বেশ ভার ভার। চড়ার মাঝখানে বেশ খানিকটা ঝোপ জঙ্গল দানা বেঁধে উঠেছে। বছর খানেক আগেও এখানে কোন ঝোর জঙ্গল ছিল না। গোটাটাই ছিল পলিমাটির চড়া। সেবার এ চড়ায় দুটো চিতি সাপ মেরেছিল শিবুরা। এবার এই ঝোপের মধ্যে যে আরো সাপ-দেখা যেতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। আলতু-ফালতু সাপ মেরে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, গো-সাপ হলে বরং তার চামড়া-টামড়া কাজে লাগতে পারত।

শিবু ঝোপটার দিকে তাকাল। ওর মাথায় এখন মেয়েটাকে দাহ করার কথা ঘুরছিল কিনা কে জানে।

জগা বলল, কি করবি রে শিবু? মড়াটাকে এখানে ফেলে রাখলে চিলে শকুনে এসে উৎপাত করবে।

—কি করতে চাস বল?

তারক বলল, এখান থেকে এবার সরে পড়াই ভালো। জানাজানি হলে পুলিশের ঝামেলায় জড়াতে হবে।

জগা সায় দিল, আমারও সেই কথা! বরং ওকে টেনে-হিঁচড়ে আবার জলে ভাসিয়ে দেই চল।

শিবু কিছুটা অন্য রকম ভঙ্গি করল, না, অসম্ভব! জলে ভাসিয়ে দিলেও ওর গতি হবে না। আমাদের উচিত ওর একটা সত্যিকার গতি করে দেওয়া।

—কি গতি করতে চাস বল? জলে ভাসিয়ে দিলেই ওর গতি হয়ে যেত জলে ভাসিয়ে দিলে পচে-গলে জলের সঙ্গে ও মিশে যেত।

আর তার আগেই ওকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে যাবে মাছে কিংবা কুমীরে কিংবা কামটে। সেটা কি ভালো হবে?

—খারাপই বা কি হবে! মানুষ মরে গেলে দাহই কর কিংবা কবরই দাও কিংবা চিল-শকুনেই খাক, কি এসে যায়!

—কিছুই আসে যায় না। কিন্তু বিবেক বলে তো আমাদের একটা পদার্থ আছে। আমাদের চোখে যখন ও পড়েছে, আমাদের উচিত হবে ওকে দাহ করে যাওয়া।

—দাহ করা মানে তো চিতা সাজান, আগুন দেওয়া, খোঁজাখুঁচি করা, সে তো গোটা একটা দিনের ব্যাপার। মাছ মারবি না?

—মনে করে নেব আজ একটা মাছও পাই নি আমরা। খালি নৌকো নিয়ে ফিরে যাবো।

—নৌকার ভাড়া, জালের ভাড়া ওগুলো কে জোগাবে?

শিবু এবার ধূর্ত চোখে হাসল, হাসিটা ভীষণ অর্থবহ। যেন বোঝাতে চাইল, যাকে দাহ করব সেই জোগাবে।

—তুই কি বলতে চাস শিবু ঠিক বুঝতে পারছি না?

জগাও ধূর্ত চোখে হাসল, শিবু বলতে চাইছে ওর গা থেকে গয়নাগুলো আগে খুলে নেওয়া হবে। তাই না?

—শুধু গয়না কেন, ঐ শাড়িটাও।

—তোরা অমানুষ। তারকের মাথার ভেতর ঝাঝা করে উঠল।

—মানুষই বলো আর অমানুষই বলো, ওগুলো অমনভাবে নষ্ট করা উচিত হবে না আমাদের। তেমন হয় শাড়ি গয়না গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে আপত্তি কি!

তারক আর কথা বাড়াল না। লোভ বড় সাংঘাতিক। গরীব দুঃখীদের নাম করে ওগুলো যে নিজেরাই আত্মসাৎ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

—কেন গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া যায় না বলছিস?

—না, যায় না। কেন না, যাকে দিবি সেই তোকে সন্দেহ করবে। সোনার গয়না বিলোবার মতো অবস্থা নয় আমাদের।

শিবু এবার শব্দ করে হাসল, সোনা বিলোতে যাব কেন! সোনাগুলো বিক্রি করে টাকা করে নেব। সেই টাকাই আমরা বিলিয়ে দেব। দশজনের উপকার হবে।

জগা সমর্থন করল শিবুকে। তুই মন্দ বলিস নি শিবু। আয়, ওর গা থেকে তাহলে গয়নাগুলো খুলে নেওয়া যাক।

শিবু হা হা করে উঠল, এখন নয়, আগে চিতা সাজান যাক। আবার জঙ্গলের দিকে তাকাল শিবু।

তারক বলল চিতায় আগুন দিলে লক-লক করে আগুন উঠে অনেক দূর অবধি জানাজানি হয়ে যেতে পারে কিন্তু সেটা কি ভাল হবে।...

কথাটা ভেবে দেখার মতো। থমকে দাঁড়াল জগা। শিবু বলল, আগে একটা বিড়ি ছাড়, ব্যাপারটা ভেবে নিই।

—অত ভাবাভাবির কিছু নেই। জগা ওর গলা থেকে হারটা খুলে নেবার জন্য ঝুঁকে বসে পড়ল দেহটার কাছে। গলার কাছে হাতটা চালিয়ে দিল। উহ্, কি ঠান্ডা রে! কনকন করা শীতল একটা প্রবাহ ওর দেহের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গেল।

শিবু আর তারক জমে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। রুদ্ধশ্বাস।

গলা থেকে হারটা তুলে আনতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। হারটা তুলে এনে হাতের চেটোয় দুলিয়ে একটু ওজন বোঝার চেষ্টা করল, দু তিন ভরি হবে।

—দেখি। হাত এগিয়ে দিল শিবু।

হারটা হাওয়ায় দুলিয়ে শিবুর দিকে ছুঁড়ে দিল জগা।

তারক বলল, আমার কিন্তু একদম ভাল লাগছে না। শত হোক আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে বাস করি। এভাবে ঘাটা আঁঘাটার মড়া ছোঁওয়া কি ভাল হচ্ছে!

—তিন ভরি সোনার কত দাম হতে পারে জানিস? জগা দুটো আঙুল

ফুলে ডিফটীর চিহ্নের মতো দেখাল, দু হাজার। একসঙ্গে দু হাজার তোর চোদ্দ পুরুষ কোনদিন দেখে নিরে তারক।

—দু হাজার! শিবুর ইচ্ছে হচ্ছিল হামটাকে একটু চুমু খায়। কিন্তু সামনেই এই মৃতদেহটা পড়ে আছে। ফলে তেমন কিছু করল না ও, বলল, কানের দুল দুটোও খুলে ফেল জগা। ও দুটো নিশ্চয়ই আরো এক ভরি হয়ে যাবে।

জগা ওর কানের পাশে হাত আনল, রিংটা এমনভাবে সেঁটে আছে কানে যে খুলতে গেলে কানের পাতা ছিঁড়ে যেতে পারে। শিবুর দিকে তাকাল, বরফের টুকরোর মতো ঠাণ্ডা রে। এই শিবু তুই খোল এটা।

শিবু বলল, মাথা খারাপ, তুই খোল না। একবার যখন হাত লাগিয়েছিস, তখন বাকি কাজটুকু করে ফেল না বাবা। কেন ঝামেলা করছিস।

—তার মানে যত সব নচ্ছার কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চাইছিস, তাই না। ঠিক আছে, পাপ কাজটা আমিই করি।

আবার ওর কানে হাত লাগাল জগা। কানের লতিটা বরফের মতই ঠাণ্ডা আর শক্ত।

শিবু বলল, পাপের কথা যদি বলিস, আমাদের তিনজনেরই পাপের হাত থেকে রেহাই নেই। খুনের কাজে যে সাহায্য করে সেও খুনী। তারও সাজা কম হয় না।

তারক বলল,তাই বলছিলাম, এসব কাজ না করাই ভালো। ছেড়ে দে না।

জগা খিঁ খিঁ করে হাসল, এখন দেখছি তারককে আমরা সঙ্গে না আনলেই পারতাম। ও বেচারী সারা জীবন ধরে পুণ্য করছে, ওকে পাপের মধ্যে না জড়ানোই ভালো ছিল।

শিবু বলল, গয়না খুলে নেওয়ার মধ্যে কি পাপ আছে, আমার মাথায় ঢুকছে না। বরং আমরা ও দেহটাকে সৎকার করে যাবো, সেটা অনেক বেশি পুণ্যের কাজ। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ যদি কিছু থাকে তা হলো শব সৎকার করা।

ততক্ষণে একটা দুল হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলে জগা দুলটা শিবুর দিকে ছুঁড়ে দিল। অন্য দুলটা খুলতে হলে দেহটাকে উলটে ফেলতে হবে। জগা দুপাশে পা ছড়িয়ে মেয়েটাকে মাঝখানে রেখে দাঁড়াল, কি করি বলতো, উলটে ফেলতে হবে যে!

শিবু বলল, ডান হাতটা তুলে চাপ দে না। বলতে বলতে দুলদাকে পরীক্ষা করতে শুরু করল শিবু।

সূর্যের খুব সুন্দর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চরের ওপর। সেই আলোয় একবার দুলটাকে নেড়ে চেড়ে দেখল শিবু। সোনার রং যেন টল টল করে গলে পড়ছে।

ওকে সৎকার করবি কিভাবে সে কথা কিন্তু একদম ভাবছিস না তোরা। গলায় কিছুটা বিরক্তি আর অভিযোগ ছড়িয়ে রাখল তারক।

ততক্ষণে মেয়েটার একটা হাত হ্যাঁচকা দিয়ে টেনে তুলছে জগা। কি ভারী রে! মরে গেলে সত্যি সত্যি শালা ওজন বাড়ে।

দুর্গা প্রতিমার মতো দেহটা ওর নিরেট, কাঠ কাঠ, বিন্দুমাত্র ভাঁজ হল না। টানাটানিতে অনেকখানি উঁচু হয়ে উঠেছিল, আবার ধপাস করে বালির ওপর আছড়ে পড়ল। চিৎ হয়ে পড়ল মেয়েটা। মুখটা তেমনি বাঁকা হয়েই মাটি আঁকড়ে রইল আবার।

—আই বাপ! এ কানটা যে ফাঁকা। এ কানে ওর কিছুই নেই।

—পড়ে গেল নাতো! ঝুঁকে এসে শিবু বালির ওপর খুঁজতে শুরু করল। স্যাঁতসেঁতে ভিজে বালির ওপর আলো পড়েছে, আলোর তাপ একটু একটু করে যেন বালিকে তাতিয়ে তুলতে শুরু করেছে।

—নাহ, হাওয়া হয়ে গেছে। বডিটাকে একটু টেনে টুনে এপাশ ওপাশ করা হল। সত্যি সত্যি আর পাওয়া গেল না দুলটাকে।

যেন এর চেয়ে আপশোষের আর কিছুই থাকতে পারে না। শিবু নিজের কপালে একটা চাপড় মেরে অদৃষ্টকে গালাগাল দিল।

—হয়তো জলে ভেসে বেড়াবার সময় খুলে পড়ে গেছে।

—আমাদেরই কপাল খারাপ, হাতের মুঠোয় পেয়েও জিনিসটাকে আমরা হারালাম।

তারক বলল, হার আর ঐ দুলটা পড়ে গেলেও ভালো হত। মাছ মারার বদলে এখানে এভাবে আমাদের মড়া ঘাটতে হত না।

জগা এতক্ষণ পর একবারের জন্য একটু কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তুই মাছ মারতে চাস, মার না। আমরা তো আর বারণ করি নি তোকে। সোনাগুলো নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল আমরা সেগুলো বাঁচালাম। বরং আমরা সমাজেরই একটা উপকার করলাম।

—কি রকম?

—দু আড়াই হাজার টাকার মতো সোনা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল, আমরা সেগুলো নষ্ট হতে না দিয়ে দশজনেরই কিছুটা উপকার করলাম। আমরা যদি টাকাগুলো দান করে বিলিয়েও দেই কয়েকজন লোক তা খেয়ে বাঁচবে।

তারকের মনে হল জগার মধ্যে অশুভ একটা কিছু যেন ভর করেছে। জগার চোখ মুখ বড় নোংরা লাগছিল ওর। হাতের মুঠোয় সোনাগুলো যখন এসে গেছে, তখন কোনক্রমেই ওগুলো দান করে দেওয়ার পাত্র নয় ওরা। কিন্তু এখন এ নিয়ে কথা বাড়াতে গেলে হাতাহাতি হয়ে যেতে পারে। ফলে নিজের উত্তেজনা নিজের ভিতরই রাখার চেষ্টা করল তারক।

শিবু বলল ব্যাজার ব্যাজার না করে চল এবার বাকি কাজটুকু সেরে ফেলে আমরা কেটে পড়ি।

—বাকি কাজ মানে! জগা মড়ার কাছ থেকে দু পা পিছিয়ে এল, চিতায় চড়ানো কি সোজা কাজ নাকি! এখন শুরু করলে শেষ করতে রাত্রি হয়ে যাবে।

হলে হবে। তারক বলল, তবু আমাদের এটুকু কাজ করে যাওয়াই উচিত।

শিবু আবার চড়ার জঙ্গলের দিকে তাকাল। জঙ্গল বলতে কচি ঝোপঝাড়ই বেশি। এখনো তেমন শক্ত বড় গাছ তৈরি হয়ে ওঠে নি এ চড়ায়। চিতা সাজাতে গেলে শক্ত শুকনো কাঠের দরকার। জঙ্গলের যা ভেজা চেহারা, আগুনই ধরবে না। শিবু বলল, চিতায় পোড়ান সম্ভব নয়, অন্য কি করা যায় ভাব।

—কেন, পোড়ান সম্ভব নয় কেন!

—এ জঙ্গল পোড়াবার মতো কাঠ থাকলে তো পোড়াব। তাকিয়ে দেখ না।

তারকের মনেও এই সন্দেহটা ছিল। এত বড় একটা দেহকে পোড়াতে গেলে যে পরিমাণ কাঠ দরকার তা এখানে চোখে পড়ছে না। তা ছাড়া জলে টুসটুসে ভেজা ওরকম কাঠে আগুন ধরানোও যাবে না।

জগা বলল, আমি একটা বুদ্ধি দিতে পারি। চল ওকে মাটি চাপা দেই।

হা হা করে উঠল তারক, দেখছিস না হিন্দুর মেয়ে। সিঁথিতে এখনো জ্বল জ্বল করছে সিঁদুরের দাগ।

—হলই বা। চিল শকুন ছাড়া কে ওকে ছুঁতে বল। তবু তো একটা গতি হবে।

—তাই বলে কবর দেব আমরা। হিন্দু হয়ে কবর দেওয়ার কথা চিন্তা করব বলছিস! —এখানে হিন্দু মুসলমানের কি কথা। কবর দিয়ে গেলে মেয়েটার একটা সত্যিকার গতি হত তাই বলছিলাম। পোড়াতে গেলে দেখিস আধপোড়া হয়ে পড়ে থাকবে।

শিবু অনেকক্ষণ পর কথা বলল, কবর না দিয়ে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি। করবি?

—কি?

—আগে ওর মুখে কিছুটা আগুন ছোঁয়াই আয়। তারপর ওকে টেনে জলে ভাসিয়ে দিলেও চলবে।

কথাটা খুব খারাপ বলে নি শিবু। তারক রাজি হয়ে গেল। জগার কোন কিছুতেই আপত্তি নেই। ব্যাপারটা ঝামেলাও কম। বলল, ঠিক আছে আমিও রাজি। যা তারক মুখাগ্নি কর।

সূর্যটা বেশ অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে। গনগনে তেজ রোদের। গায়ের চামড়ায় জ্বলুনি ভাবটা শুরু হয়েছে একটু একটু করে। তবু ভালো,

হু হু করে বাতাস বইছিল, বাতাসের জন্যই তাতা বালির ওপর এভাবে ঘরে বেড়ান সম্ভব হচ্ছে।

তারক বলল, আয় তবে মুখাগ্নিরই আয়োজন করি। কিছু শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করি। বলতে বলতে তারক চড়ার ওপর দিকে লাফিয়ে উঠে এল। কোমর উঁচু জঙ্গল ছড়িয়ে আছে অনেক খানি জায়গা জুড়ে। নতুন জাগা জঙ্গল, শুকনো দু'চার টুকরো পাতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ার কথা নয়। এপাশ ওপাশ কিছুক্ষণ খুঁজল তারক, একটা যদি বা জ্বালাবার মতো কাঠের চেহারা দেখা যায়।

কুড়িয়ে কাচিয়ে দু'চার টুকরো প্যাকাটির মতো ডাল সংগ্রহ করে ও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

—ও কি তোরা দাঁড়িয়ে আছিস?

তারক দেখল, ওরা দুজন আর হাত নিয়েই ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে কি যেন সব পরামর্শ করছে। ওদের হাবভাব একদম ভাল লাগল না ওর। বিরক্তিতে ও চেঁচিয়ে উঠল, আমি কিন্তু ওসব জলে ফেলে দেব।

—আই বাপ! অত মেজাজ দেখাচ্ছিস কেন? বল, কি করতে হবে বল? এগিয়ে এল শিবু।

—কি করতে হবে জানিস না যেন! তোরাই তো বললি মুখাগ্নি করবি।

শিবু পকেট থেকে দেশলাই বার করল, নে ধরা।

হু হু করে বাতাস বইছে। বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে কাঠে আগুন ধরাবার জন্য বসে পড়ল তারক। কিন্তু—

পর পর কয়েকটা কাঠি নষ্ট করে ও উঠে দাঁড়াল। অসম্ভব। এ ভেজা কাঠে কখনো আগুন ধরবে না।

জগা এগিয়ে এসে আগুন ধরাবার চেষ্টা করল, আরো দু' চারটে কাঠি খরচ করে উঠে দাঁড়াল। পুরো দেশলাইটাই কিন্তু খরচ হয়ে যাবে, আগুন ধরবে না।

শিবু বলল, দে, দেশলাই দে। দেশলাই কাঠি জ্বালিয়েই ওর মুখে ছোঁয়াই। তাতেই হয়ে যাবে।

আবার ওরা তিনজনে দেহটার কাছে এগিয়ে এল। শিবুর হাতে দেশলাই, শিবু বাতাস আড়াল করে দু হাতের খাঁচায় আগুন ধরাল। তারপর সন্তর্পণে ওর হাতের খাঁচাটা এগিয়ে এনে মেয়েটার মুখের কাছে ধরল। বরফের মতো শীতল এক টুকরো ঠোঁট। ঠোঁটের উপর জ্বলন্ত কাঠিটা ছোঁয়াতেই তা নিভে গেল।

—নে, এবার তুই আগুন দে। দেশলাইটা ও এগিয়ে দিল তারকের দিকে।

তারকের সারা গা শিরশির করে এবার ঝাঁকি খেয়ে উঠল, হে ভগবান, আমাদের দোষ নিও না গো। আমরা ওকে সৎকার করার ত্রুটি করিনি। দেশলাই জ্বালিয়ে পরপর দুটো কাঠি ও মুখে ছোঁয়াল মেয়েটার। তারপর উঠে দাঁড়াল তারক।

—নে, তুই নে। জগার দিকে এগিয়ে দিল দেশলাইটা।

জগা দেশলাই হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল, কাঠি কমতে কমতে আর মাত্র দু-চারটে আছে। এ কটা কাঠি নষ্ট করা উচিত নয় ওদের। বলল, তোরা দিয়েছিস, তাতেই হবে। চল এবার ওকে টেনেটুনে জলে নামিয়ে দেই।

শিবু বলল, আমাদের একটু হরিধ্বনি দেওয়া উচিত, বল হরি—

তারক আর জগা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, হরি বোল।

তারপর আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার! দেহটাকে টানতে টানতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার মতো উত্তেজনার মধ্যে ওরা কোমর জলে এসে নেমে পড়ল। এক ধাক্কায় যতটা পারল জলের মধ্যে দেহটাকে ওরা ভাসিয়ে দিল। তারপর—

বল হরি—

হরিবোল।

এসব ক্ষেত্রে গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসার নিয়ম আছে। ওরা ঝুপঝুপ করে দু-তিনটে ডুব দিয়ে উঠে এল ডাঙ্গায়।

তারপর সব শূন্য হয়ে গেল। আজ আর মাছ মারার প্রশ্নই আসে না। গায়ের জল গায়েই শুকিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। এবার ফিরতে পারলে বাঁচা যায়।

নৌকায় উঠে এল ওরা। ছড়ানো নদীর ওপর সূর্যের আলো ধুধু করে জ্বলছে। সূর্য এখন মাঝ আকাশে। বাতাসের টানে নদীর ওপর ঢেউয়ের চেহারা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। এ ঢেউয়ে নৌকো বাইতে হলে খুব সাবধানে দাঁড় ধরে থাকতে হবে। নৌকো টাল খেয়ে খেয়ে দুলবে। একটু বেসামাল হলেই রক্ষে নেই।

নৌকোতেই ওরা নীরবে উঠে এল। জগা দাঁড় ধরল। তারক বসল তামাক সাজতে, শিবু চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

আর অনেকক্ষণ পর শিবু বলল, হ্যাঁ রে জগা, হাজার দুয়েক টাকা নিশ্চয়ই আমরা পেয়ে যাবো এ দিয়ে, তাই না। তোর সোনার দর জানা আছে তো?

জগার কবজীতে বেশ জোর লাগছিল দাঁড় ধরে থাকতে। ভাগ্যিস জলের টানটা ওদের সহায় আছে তাই সুবিধে। হেসে বলল, এক-একজনের ভাগে ছ-সাত শ' করে পড়বে যে সন্দেহ নেই।

তারক একগাল ধোঁয়া টানল হুঁকো থেকে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সন্দেহের চোখে তাকাল জগার দিকে। তবে যে বললি দান করে দিবি ওসব।

—দান! জগা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

শিবু পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে শুরু করল, আমাদের ভাগ করে নিয়ে যদি বেশি থাকে নির্ঘাৎ দান করে দেব। আমাদের পাওনা টাকা আমরা বুঝে নেব আগে।

—পাওনা টাকা কি রকম?

—বারে! আমরা যে ওর একটা গতি করে দিলাম তার মজুরি নেব না।

তারকের হাত থেকে হুঁকোটা খসে পড়তে যাচ্ছিল, সামলে নিয়ে ও শিবুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

শিবু বলল, দে, হুঁকোটা দে। আমরা কোন খারাপ ব্যবহার করি নি ওর সঙ্গে। ভগবান যদি থাকেন, সব দেখেছেন।

—আমরা ইচ্ছে করলে ওর শাড়িটাও খুলে নিতে পারতাম অথচ নেইনি।

তারক ধীরে ধীরে হুঁকোটা এগিয়ে দিল ওদের দিকে।

নৌকোটা জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে পারের দিকে। ধু ধু চোখ ধাঁধানো রোদ। কপালের ওপর হাতের চেটো বিছিয়ে রোদ আড়াল করে একবার বহু দূর তাকিয়ে নিল জগা। শিবু সাত শ টাকা খরচের একটা হিসেব কষে নিচ্ছিল মনে মনে। তারকের আফিমখোরের মতো চোখ। চোয়াল খানিকটা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। তারক ভাবছিল অন্য কথা। তারক ভাবছিল, ভাগের টাকা বলেই টাকাটা ওর নেওয়া উচিত। কিন্তু এমন যদি হয়, সোনার গয়না দুটো আসল সোনা না হয়ে অন্য কিছু হয়। যদি এর থেকে এক পয়সাও না আসে।

ঝট করে ও উত্তেজনায় ঝাঁকি খেয়ে উঠল, দে, হুঁকোটা দে।

শিবুর হাত থেকে হুঁকোটা ও ছিনিয়ে নিয়ে এক রকম প্রায় কাঁপতেই শুরু করল, হায়রে কপাল তেমন কিছু হলে ধর্মও যাবে অধর্মও যাবে।

—কি হল! অমন করছিস কেন তারক? প্রশ্ন করল শিবু।

তারকের ভয় করছিল 'নকল' কথাটা উচ্চারণ করতে। ছ-সাত শ' টাকা তো আর সত্যি সত্যি কম কথা নয়। হোক না তা পাপের টাকা, কি এসে যায়। হুঁকোয় লম্বা করে একটা টান দিয়ে ও ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলার চেষ্টা করল, না, কিছু না।

জগা সামনের দিকে চোখ রেখে বলে উঠল, আমরা অনেক পুণ্যি করেছিলাম রে, নইলে কখনো এমন হবে কে জানত।

নৌকোটা টলতে টলতে এগোতে লাগল।

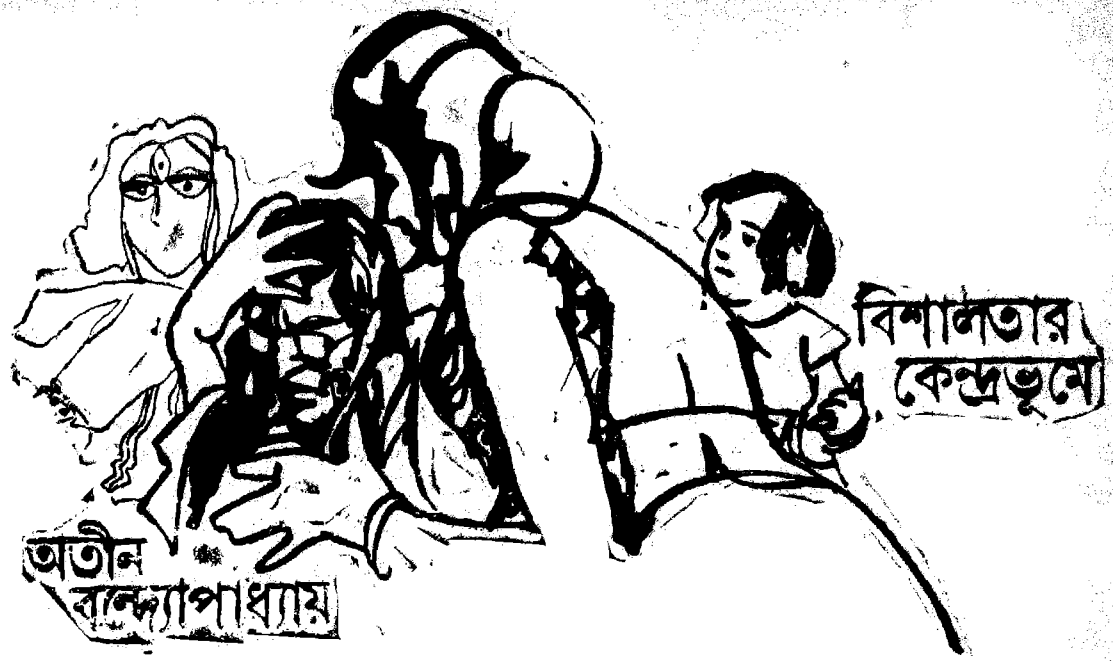

লোকটা পাগল হয়ে যেতে পারত। রক্ষা ছোট মেয়েটার খুব অসুখ—রোগের নামটা বিলক্ষণ মনে থাকে। এবং যখনই বড় রকমের কোনো গাছের শেকড় মাথার ভেতর প্রোথিত হতে চায়, লোকটা নাম জপের মতো অসুখের নামটা জপ করতে শুরু করে দেয়। কিয়ৎক্ষণ ভাল থাকে। সংসারের ভাল-মন্দ, মাসের মাইনে, শেষ দিকের হাত-টান, স্ত্রীর একজোড়া শাড়ি, বড় মেয়েটার জন্য মোটামুটি দামের ফ্রক কেনার বাড়তি পয়সার কথা চিন্তা করতে পারে। তখন মনেই হয়না, পৃথিবীটা বিশাল, পৃথিবীটা সৌরজগতের গ্রহ, চার হাজার পাঁচশ মিলিয়ান পুরানো এবং মানুষ নিজের জন্য সীমাহীন বিস্তৃতি এবং সময়ের পরিমাপসম্পন্ন বিশ্ব তৈরী করতে প্রয়াসী। মনে করতে পারে না, গ্রহদের শুরু প্রায় পাঁচ হাজার মিলিয়ন বছর আগে বায়বীয় নীহারিকা এবং সূর্যের চারিদিককার ধূলিকণা হতে—নক্ষত্রকে ঘিরে থাকা একটা নীহারিকা থেকেই জন্ম সব গ্রহ-সমূহের। কিম্ভূতকিমাকার সব জটিল মহাকাশ-তত্ত্ব মাথার ভেতর আর থাকে না। কোনো ক্লাউন মগজে দাঁড়িয়ে অনবরত শূন্যতায় আর তখন লাল নীল বল ছুঁড়েও দেয় না।

যখন মাথাটা এ-ভাবে ফাঁকা থাকে সে দেখতে পায় বেশ নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে একটা লোক। খাটো কাপড়, ছেঁড়া সার্ট গায়ে অনবরত ঘুরে ঘুরে বাজিয়েই যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে সব দোকান-পাট, এক কোণে নারকেলের সুতলির অস্থায়ী বেড়া। ভেতরে পেতলের থালায় রেজকি পয়সা, আর সামনে বসা মূর্তিমান শনিঠাকুর। ধূপ ধুনো, ফুল তুলসীপাতা, আতপচাল। যত ঢাক বাজছে, তত সরগরম হয়ে যাচ্ছে পথচারীরা। দু দশটা পয়সা দিয়ে নতজানু কেউ, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক অলৌকিক মহত্ব আরোপ করে নিজেদের দুঃখ মোচনের মোক্ষম দাওয়াই পেয়ে গেছে। যতক্ষণ মাথাটা ফাঁকা থাকে বেশ একটা মানুষের মিছিল, সৌধমালা, আম আনারসের গন্ধ ঠিক ঠিক টের পায়। তখন তারও হাঁটু কাঁপে। দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে। সময় ভাল না। কেবল অসময় নিয়ত হাতে বেড়ি পরিয়ে দিচ্ছে। পরিত্রাণ নেই ভেবে সে দশটা পয়সা থালায় ফেলে দিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তখন তার মনে থাকে না নভো-প্রাণীবিজ্ঞান নামীয় বিষয় অবশ্যই অত্যন্ত ভূমিকাসম্পন্ন এবং কৌতূহলোদ্দীপক। পৃথিবীর জীবনকে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তুলনা করতে সক্ষম এটা। মনে করতে পারেনা আসলে মানুষ কি! অনেকটা যেন অপরিত্রাণ-যোগ্য একটা আচ্ছাদনে আবদ্ধ। সে শনিঠাকুরকে বলল, ঠাকুর বিনিকে ভাল করে দাও। তুমিতো সব পার ঠাকুর। তোমার কি চাই বল! শোলমাছ পুড়িয়ে খেতে বলছ। মাছের দাম যা আককারা। তা তুমি যখন বলছ, খাব। আর কি ঠাকুর? ভাল করে ভক্তি করে পুজো করতে বলছ! মনটা খুব অপরিষ্কার? মন্দবাতিক আছে। ওটা থাকা বুঝি ভাল না!

কি কিরি ঠাকুর! সকালে উঠেই দেড়শ রকমের খবর মাথার ভেতর কেউ গুঁজে দিয়ে যায়। বিনির কি বয়স বল! সবে সাতে পা দিয়েছে। এ-বয়সেই মেয়েটার হাতটা শুকিয়ে গেল! তুমি সারিয়ে দাও ঠাকুর। সারিয়ে দাও। বিনি যখন বলে, বাবা আমার হাতটা আর ভাল হবে না, তখন বিনির মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমার নাকি এমনই হওয়া উচিত ঠাকুর। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে মানুষের এমনই সাজা হয়। আচ্ছা আমিতো চেষ্টা করি, কতবার ভাবি তুমি সত্যি আছ। শোলমাছ পুড়িয়ে খেলে শনির দশা কেটে যায়। এটা নাকি আমার শনির দশা চলছে। শেষ হয়ে গেলেই বিনি ভাল হয়ে যাবেতো ঠাকুর?

—পৃথিবীর বয়েস বিশ্বের বর্তমান বয়সের মাত্র আর্ধেক। তোমার বয়স কত ঠাকুর?

—পণ্ডু তোর স্বভাব দোষে গেলি! তোর কিছু আর হবার নয়। মহাকাশ-তত্ত্বের শেকড়-বাকড় বড় বেশি ঘেঁটে গেছে।

পণ্ডু বলল, কি করি ঠাকুর, দেড়শ রকমের খবর, হাজার রকমের বই আমার হাতের নাগালের কাছে। যত পড়ি তত ভাবি ঠাকুর তোমার কি হবে গো!

—এই পয়সা নিয়ে যা। অধার্মিক ইতর। মাথা ঠিক নেই। সন্দ থাকলে হয় না।

ঢাক বাজছিল। বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে চারপাশটা। ঘন্টা নাড়ার শব্দ, শংখ বাজাচ্ছে কেউ, ষণ্ডামতো লোকটা বিড়ি ফুঁকছে। ওরই ঠাকুর। এজমালি নয়। এজমালি হলে এতটা হত না। ওর দেশে পিতাঠাকুরদের এজমালি ঠাকুর ছিল। রাধাগোবিন্দ, শালগ্রামশীলা। মাস কাবারে পুজো। ঠাকুরের বোঝা এলেই পিতাঠাকুর খুব দুঃখী মানুষ বনে যেতেন। কোথা দিয়ে কি হয়, না খাওয়ালেও চলবে না। ঠাকুর বলে

কথা!... কিন্তু আমার আজকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে.....এই রে মাথার ভেতর বিদ্যুতের মতো তেড়ে আসছে—দেখুন বার্নার্ড সাহেব আমাকে আর দোনো-মনো করে দেবেন না, বক্তব্যের মূল বিষয় যাই থাক—আমার বিনির তাতে কিছু আসবে যাবে না।.....আমরা এই প্রায় অর্থহীন ও তুচ্ছ সময়কালেই উপনীত হয়েছি বিশালতার কেন্দ্রভূমে—আমরা শুধু দাঁড়িয়ে নয় আমাদের পার্থিব উপলব্ধিসম্পন্ন বিশ্বে, বরং আমরা আমাদের প্রচেষ্টার এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যখন আমরা বিশ্ব এবং মানব এ দুয়ের সম্পর্ক অনুভব করতে সক্ষম।

পণ্ডু প্রায় চিৎকার করেই উঠত। না ঠিক হবে না। সবাই বুঝতে পারবে মরচে-পড়া পেরেকে অলক্ষ্যে মগজে ছোট হাতুড়ী ঠুকছে। সে বলতে চেয়েছিল, বকর বকর থামান। আমাকে একনিষ্ঠ হতে দিন। ঠাকুর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বিনির তাতে অমঙ্গল হবে।

আসলে লোকটার নাম পঞ্চানন মোহান্ত। ষ্ট্যারি এণ্ড সনসের ডেসপাচ সেকসানে চারশ ছত্রিশ টাকা সাতষট্টি পয়সার কেরানী। খুব বিশ্বস্ত কর্মী। অফিস ক্লাবের দেখাশোনার ভারটাও তার ওপর। পত্রপত্রিকা, যেদিনকার যে বই সবই তার মনমতো কেনা হয়। কিছু-দিন থেকে দু-তিনটে পৃথিবীর খবর তাকে খুবই ভাবাচ্ছে। যদিও এটা সে বোঝে—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর দিয়ে কি হবে, তবু ভাবনাটা যায় না। কারণ সংসারে মালবিকা এমন অশান্তি করছে যে, বার বার ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠছে। শোক তাপ জরার জন্য তেনার কাছে হাত পেতে ভিক্ষে নিতেই হয়। এই যেমন বড় মেয়েটার বেলায় একটা কঠিন অসুখ। বেশ ছিল। একদিন সামান্য ঠাণ্ডা লেগে জ্বর, জ্বর আর ছাড়ে না। ডাক্তার বাবুতো স্টেথিসকোপ গলায় ঝুলিয়ে বসেই থাকলেন। সকালে উঠে একদিন দেখা গেল, কেমন হাত মুখ ফোলা, হাসপাতালে গেলে স্পেসালিস্ট মানুষটি ধমকে উঠেছিল, সে তস্করের মতো বলেছিল, ছ সাত মাস হল স্যার সাড়ে আটানব্বই তাপ অনেক শেকড়-বাকড়, পান মানত, কালীবাড়ি করে কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি বলবনা স্যার, বলে সে তার স্ত্রী মালবিকার দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, ভোগ কপালের খণ্ডাবে কে। আমরা সামান্য মানুষ, ওর কৃপার কথা ঠিক বুঝি না। স্পেসস্যালিস্ট মানুষটি বলেছিল, হাস-পাতালে রেখে যান, বড়ই কঠিন অসুখ —কি হবে বলতে পারব না। পরদিন সে গিয়ে দেখেছিল, ফুলে ঢোল হয়ে গেছে নিনি। পেচ্ছাপ বন্ধ। রোগের নাম নেফ্রাইটিস।

তারপর মাসাধিককাল টানাপোড়েন। কিডনি যখম। মালবিকার দৌড়াদৌড়ি বেড়ে গেছে। এমন নতুন নতুন রোগের নাম তখন কেবল বাড়ছেই। মালবিকা বলেছিল, বাড়বে না কেন, মানুষের পাখা গজিয়েছে। ওষুধ পথ্যির সঙ্গে সঙ্গে জোড়া পাঁঠা মানত এবং এ-ভাবেই যখন নিনি আরোগ্য লাভ করে সত্যি বাড়ি ফিরে এল, তখন থেকেই মালবিকা পঞ্চাননকে ভীষণ শাসনে রেখেছে। বছর দুয়েক পঞ্চাননও বেশ দিব্যি ভক্ত মানুষের মতো ছিল। দেব-দ্বিজে ভক্তি, মানত দেওয়া, এমন কি আঙুলে তিন তিনটি প্রবাল, গোমেদ এবং চন্দ্রকান্তমণি পরে কতটা ধার্মিক মানুষ সে মালবিকাকে প্রমাণ দিতে চেয়েছিল। হলে কি হবে, ইদানিং বার্নার্ড সাহেবের একটি বক্তৃতা তাকে আবার অধার্মিক করে তুলছে। একদিন সে বলেও ফেলেছিল, আর বুজরুকি সহ্য হয় না।

মালবিকা খেতে দিয়েছে। এমন সময়ে কে আবার মানুষটাকে ঠকাল! খুব উদ্‌বিগ্ন চোখে-মুখে বলল, কি হয়েছে! খামোকা মাথা গরম করছ।

—কি আবার হবে! আচ্ছা তুমি এত ভাত দেও কেন আমাকে বলত!

—একটা খাবে না! দিন দিন মেজাজ এত তিরিক্ষি হচ্ছে কেন?

—হবে না বলছ! রাস্তা দিয়ে আর হাঁটা যায়! আবার এক নতুন উপদ্রব শহরে দেখা দিয়েছে।

শহরে কিছু দিন খুন-জখম লেগেই ছিল। আপাতত শান্তি এসেছে। মালবিকা তখন মানুষটা বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারল না। বাস-ট্রাম কখন যে কোথায় বন্ধ হয়ে যাবে। এমন একটা উপদ্রব থেকে শহরটা কিছু-কাল হল রক্ষা পেয়েছে। ছিনতাই আর হচ্ছেই না। মানুষের কল্যাণের জন্য যা যা দরকার সবই হয়ে যাচ্ছে। তখন আবার কি নতুন উপদ্রব যা মানুষটাকে বিচলিত করছে পেট ভরে দুটো খেতে পর্যন্ত দিচ্ছে না!

—কিসের উপদ্রব বলবে তো!

—উপদ্রব না। চোখের ওপর দেখলে সহ্য হয়!

—কার যে গেল! মালবিকা হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। বলল—তুমি আবার ভিড়ের বাসে ঝুলে আস না তো। দেরি হয় হোক ভিড়ের বাসে কখনও ঝুলবে না।

—ঝুলব নাতো আকাশে উড়ব! আমার কি পাখা আছে! খুবই তিক্ত কথাবার্তা। খেতে বসে মেজাজ বিগড়ে গেলে খারাপ। মানুষটার এমনিতেই অম্বলের ধাত আছে। খাওয়া-দাওয়ার খুব নিয়ম মেনে চলার স্বভাব। রাতে রুটি খায় না সেজন্য। মালবিকা খুব হিসেব করে চলে! সবার জন্য রাতে রুটি কেবল ওর জন্য যে করেই হোক রাতে ভাত করে থাকে মালবিকা। তাও আজ খাচ্ছে না।

—বুক জ্বালা করছে। মালবিকা শুধাল।

—কেন বুক জ্বালা করবে?

—না বলছিলাম—খুব বিনীত গলায় কথাবার্তা বলছিল মালবিকা। মানুষটা চটে যাক কিছুতেই সে চাইছে না।—উপদ্রব বলছ...! মালবিকা জানে খেতে বসে চটে গেলেই বুকের অম্বল চাড়া দিয়ে উঠবে।

—একটা যায় একটা আসে। রাস্তায় তখন শনিবারের দিনটা কেবল শনিপুজো। এতদিন যে ওরা কোথায় ছিলো!

মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল মালবিকার। বড় মেয়েকে বলল—পাখাটা ছেড়ে দে!

—হল। মঞ্জু জ্বলু জ্বলু চোখে তাকাল!

—তুমি আবার ঠাকুর নিয়ে ঠাট্টা করছ!

এসব কথাবার্তা মাস দুই আগের। তারপর ছোট মেয়েটার কি হয়ে যায়! ডান হাতটায় ব্যথা। তারপর অসাড় হতে থাকে শুকিয়ে যেতে থাকে। হাস-পাতাল ডাক্তার করে মালবিকা আর পারছে না। শনিপুজো করেছে বাড়িতে। এবং পণ্ডু যে থানের সামনে একদা বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়েছিল সেখানে দশটা পয়সা দিতে বলেছে। আজ সেই পয়সা দেবার দিন।

লোকটা ঢাক বাজাচ্ছেই। কেবল বাজাচ্ছে। যারা যাচ্ছে কোথাও কিছু নেই সহসা ঢাকের শব্দে চকিতে দেখছে শনিঠাকুর বসে আছেন সামনে। এবং পাশে দাঁড়িয়ে একজন ষণ্ডামার্কা লোক বিড়ি ফুঁকছে। হাত জোড় হয়ে যায়। প্রণামী দশ পয়সা সিকি আধুলি। একটা লোক টাকাও দিয়ে ফেলল। যাবার তাড়া আছে তো লোকটার! এবং ওরা কি জানে এ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর ভাণ্ডারে এক লক্ষ পারমাণবিক বোমা তৈরি হয়ে যাবে। ভারতবর্ষে মানুষের সংখ্যা হবে একশত কোটি। মানুষের পায়ের নিচে মাছের ডিমের কতো ছানা-পোনা ভাসবে। সে বলল—ঠাকুর উপকার করো। মানুষকে নির্বীজ করে দাও না হলে নিনি-বিনিরা রাস্তায় একটু হাত-পা মেলে বেড়াতে পর্যন্ত পারবে না। কত চিন্তা ঠাকুর বল।

পণ্ডু অর্থাৎ পঞ্চানন দেখছে মাথার ওপরে আকাশটা তেমনি নীল। দুটো পাখিও সে ঊর্ধ্বাকাশে দেখতে পেল। এবং ঠেলাঠেলি মানুষের। ট্রেন ধরার জন্য ছুটির শেষে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে থানের সামনে পড়ে গেলেই চমকে উঠছে। দৌড়াতে পারছে না। কেউ কেউ তার মতো যারা ধনদ সম্বল করে কেবল বাঁচে দাঁড়াচ্ছে না। সে বলল বুজরুকি ছাড়ো। পয়সা দাও। নাইলে বাড়ি ফিরে বৌ পাবে না।

আর তখনই মনে পড়ে যায় ষণ্ডা মতো লোকটার কথা। সে যেমন টাইপের চাবি টিপে পয়সা কামাবার ধান্দায় থাকে লোকটারও বোধ হয় তাই। একটা নতুন টাইপ মেসিন কিনে রাস্তায় বসে পড়েছে। হা ঠাকুর, আবার যেন অধার্মিক হয়ে যাচ্ছি! মালবিকা টের পেলে আস্ত রাখবে না। আচ্ছা ঠাকুর ষণ্ডামতো লোকটা কি জানে দশ হাজার মিলিয়ন বছর আগে একটা অসংকোচিত অবস্থা থেকে বিশ্বের সৃষ্টি। লোকটা কি জানে ছায়াপথই হলো আমাদের নিজস্ব অবস্থান। এতে রয়েছে প্রায় এক লক্ষ মিলিয়ান তারকা যার মধ্যে সূর্য তারকা পাঁচ হাজার মিলিয়ন বছরের পুরানো একটা মাঝারি গোছের তারকা। ও কি জানে আমাদের এই নিজস্ব তারকাগুচ্ছ বিশ্বের একটা অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। চোখের সামনে থানের যে কোনো আধুলি কি দশপয়সা হাত বাড়িয়ে চোখের ওপর ধরে রাখলে মোটেই ভুল হবে না যদি আমরা বলি তিনশত পঞ্চাশ মিলিয়ান আলোক বছর দূরের কয়েক হাজার লক্ষাধিক জগৎ যা সেকেন্ডে পাঁচ হাজার মাইল গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে, যা পুরোপুরিই দশটা পয়সার আড়ালে পড়ে যাচ্ছে।

সে সহসা চিৎকার করে উঠল, ঠাকুর আমার মাথা ঠিক রাখো। মাথার ভেতর কেবল পেরেক পুঁতে দিচ্ছে কে! আমি এসব কি দেখতে পাচ্ছি?

ঢাকের বাদ্যি থেমে গেল। থানের সামনে লোকটা কেমন উবু হয়ে বসে পড়েছে। ভিরমি খেয়েছে হয়তো। কেউ বলল—শুইয়ে দাও। স্ট্রোক। ঠিক পটল তুলবে। ট্যাকসি। ট্যাকসি। উর্ধ্বশ্বাসে কেউ ট্যাকসির পাশে ছুটে গেল। বলছিল, মশাই ওখানে একটা লোক সংজ্ঞা হারাচ্ছে। এবং যখন পশু হাসপাতালের করিডোরে হাজির সে বলল—এখানে কেন। থানে ছিলাম। এখানেই তিনি আমার জন্য জীবন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন।

—কোথায় থাকেন?

সঙ্গে সঙ্গে বিনির কথা মনে পড়ে গেল। ঐ যে বিনি সংসারের রজ্জু। নিজেই যা তৈরি করেছে, পাকিয়েছে শক্ত হাতে, তাই আবার তাকে স্বাভাবিক করে তুলল। বলল, থাকি পাতিপুকুর।

—থানে কি করতে গেছিলেন?

—মানত ছিল!

—কিসের মানত।

—দশটা পয়সার স্যার।

—এবারে বাড়ি যান।

—বুকে কোনো অসুখ নেই ত।

—ধরা পড়ছে না।

—তা হলে বলছেন ভাল আছি। মাথাটা কেমন ঘুরে গেছিল।

সাবধানে থাকবেন। বেশি চিন্তা-ভাবনা করবেন না। খাবেন-দাবেন ফুর্তি করবেন। ছুড়ি মেরে হাই তুলবেন, যখন ইচ্ছে হবে লাফাতে তখন লাফাবেন। মনের ভেতর কিছু গোঁথে রাখবেন না।

সে বলল আচ্ছা।

—বাড়ি ঠিকমতো যেতে পারবেন তো!

এসব গণ্ডগোলে ফেলে দেয়া কেন আবার! সে বলল—দৈহিক এবং বুদ্ধিগতভাবে আমরা বিশালতার কেন্দ্রভূমে দাঁড়িয়ে।

ডাক্তারবাবু বললেন—লোকটার শুধু বুকেরই অসুখ নয়। মাথায়ও দেখছি অসুখ আছে। ওকে আপনারা বরং কেউ বাড়িতে রেখে আসার ব্যবস্থা করুন।

পঞ্চানন কেমন ক্ষেপে গিয়ে বলল—স্যার আপনি একজন বিজ্ঞানের হাতিয়ার আপনার মুখে অমন কথা শোভা পায় না। একটা লোকের শনির দশা চলছে, আপনি তা নিয়ে মসকরা করছেন।

ডাক্তারবাবুর প্রভূত কাজ। মজার মজার রুগিও দেখেছেন অনেক। কিন্তু এই ধেড়ে লোকটার মতো মজার কথা কখনও যেন শোনেননি। তিনি আপাত কাজটাজের কথা ভুলে বললেন—আপনার শনির দশা চলছে কে বলল!

—ওটা কি বলার কথা। এমনিতেই টের পাওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু বললেন—শনির দশা সব মানুষের। মানুষতো অহোরাত্র ভুগছে। ও নিয়ে ভাববেন না। যত ভাববেন তত গণ্ডগোলে পড়ে যাবেন।

পঞ্চানন বলল—আপনি জানেন স্যার হাতের ডগায় পেনি ঝুলিয়ে চোখের ওপর রাখলে যে আড়ালটুকু পাবেন কয়েকশত কোটি নাক্ষত্রিক জগৎ তার আড়ালে হারিয়ে যাবে।

কি কথার ধারা! ডাক্তারবাবু ক্ষেপে গিয়ে বললেন, ছোট মানুষের এত বড় ভাবনা কেন। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। বলেই চলে যাবেন ভাবছিলেন—কিন্তু পঞ্চানন যেতে দিচ্ছে না। সে বলল—স্যার দশটা পয়সা দিয়ে এত হয় জানতাম না।

ডাক্তারবাবু বিরক্তমুখে বললেন—দশটা পয়সার কোনো দাম নেই।

—দাম নেই বলবেন না স্যার। দশটা পয়সা দিতেই অনেকটা হালকা হয়ে গেলাম। শনিঠাকুর খুশি, মালবিকা খুশি, ষণ্ডামতো লোকটা খুশি। বিনিও ভাল হয়ে যাবে। এতটা একসঙ্গে পাওয়া কি কম কথা! আবার দশ পয়সার আড়ালে কয়েক শত মিলিয়ান কোটি নাক্ষত্রিক জগৎ সেকেন্ডে হারিয়ে যায়।

—যখন এত খুশি তখন চলে যান। আর বকর বকর করবেন না।

পঞ্চানন দেখল ডাক্তারবাবু চলে যাচ্ছে। সে দৌড়ে সিঁড়ির মুখে ধরে ফেলল, স্যার বিজ্ঞান যখন এত বড় ধাদুর কাঠি তখন বিনি-বিনির ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত হচ্ছে না কেন।

ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন। অবোধ শিশুর মতো সরল কথাবার্তা। এমন অনেক রুগী তিনি দেখেছেন। প্রবোধ দেবার মতো বললেন—সব হবে। তারপর কেমন মায়া হল তাঁর। বললেন নাক্ষত্রিক জগতটগত নিয়ে এত ভাবনা কেন আপনার।

—ঘিলুর আঁশে জট পাকিয়ে গেছে সব। ছাড়াতে পারছি না।

ডাক্তারবাবু বললেন— মানুষকে এত সব নিয়েই বাঁচতে হয়। তারপরই যেন পঞ্চাননের মাথার ভেতর সেই সব কথা-বার্তা কে আবার আরম্ভ করে দিয়েছে। ...বিজ্ঞান যাদুর কাঠিও নয় বিষ মাখা তীরও নয়। মানুষের ওপর এর কোনো নিরপেক্ষ প্রভাব নেই। এর গভীরতম লক্ষ্য মানুষের উন্নতি ও অস্তিত্বের সাথে একাত্মতা। সংকীর্ণভাবে বলা যায়

শারদীয়ায়—
বিপুল আয়োজন!
বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জেড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• গেমাক
• সাটিং • স্যুটিং
ও ছিট কাপড়

সমাজ তার মেরুদণ্ড বহাল রাখার জন্যই বিজ্ঞান চর্চা করে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্যা দুইয়েরই ভালো অথবা মন্দ করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। মাঝখানে একটা শনিঠাকুর দাঁড় করিয়ে রাখলে খারাপ না। বেশ হাল্কা বোধ করা যায়।

সে নিজেই বাসের জন্য দৌড় (লাগাল। সে এখন একা দৌড়াচ্ছে না।) সঙ্গে শনিঠাকুরের দশ পয়সার আশীর্বাদ আছে। এক লক্ষ পরমাণু বোমা, সেনির আড়ালে নাক্ষত্রিক জগত, হিরোশিমা, নাগাশাকি কত সব দৃশ্যান্তরের ভেতর বাসটা তাকে পাতি-পুকুরের কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধীয় গবেষণা মানুষের জ্ঞান পরিধিকে হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেয়, বছর কিছুর মাঝেই এই জ্ঞানের সহায়তায় যে প্রযুক্তিগত সাফল্য পাওয়া গেল, তার দৌলতে হিরোশিমা আর নাগাশাকি হলো পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। পণ্ডু ভাবল, ঠিক শনির কোপে পড়ে গেছিল শহর দুটো। দশ পয়সার বিনিময়ে সে নিজেকে আরও শক্ত সামর্থ ভাবল। ইচ্ছে করলেই আর কেউ—আর তখনই চোঁয়া ঢেকুর, বুকে জ্বালা, বাড়িতে গিয়ে যে দুটো খাবে, তাও উপায় থাকল না। জিলো-সিল খুঁজে বেড়াল দোকানে। পেল এবং খেল। হালকা আবার হালকা। দশটা পয়সা বেঁচে থাকার পক্ষে কত জরুরী। সে হেঁটে যেতে থাকল। বাসার কাছাকাছি আসতেই মালবিকা বলল, এত রাত তোমার!

—আর বল না! থানে দশটা পয়সা দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

মালবিকা বলল, ভেতরে এস। দেখি। মুখ চোখ আলোতে দেখে বলল, কিছুই হয়নি তা হলে?

—কেন খুব কিছু হবে ভেবেছিলে!

—শনি ছেড়ে গেলে কোপ রেখে যায়।

—টাইফয়েডের মতো বুঝি!

—অ মা, আবার তুমি কি বলছ গো।

—যা মিথ্যে বললাম কোথায়। আমাদের ছেলেবেলায় টাইফয়েড হলে প্রায়ই তোমার মানুষজন মারা যেত। বেঁচে গেলেও কিছু না কিছু যেত। হাত-পা, চোখ, নিদেন একটা কর্ণমূল। এখন টাইফয়েড হলে এসব আর হয় না। শুধু মোক্ষম পেনিসিলিন!

—তুমি কি ডাক্তার হয়ে যাচ্ছ।

—কে পাগল নয় বল? বিনি গুড়ি-গুড়ি তখন মায়ের কাছে হেঁটে আসছে। সব শালা পাগল। পাগল না হলে থান পেতে বসে থাকে, খায়, দোড়ায়, বাসড্রাইভারি করে। ভেতরে সম্বার মঙ্গলের সুতো নড়ে।

বিনিকে তাড়াতাড়ি মানুষটার কাছ থেকে সরিয়ে নিল। কোলে নিয়ে সে বলল, তুমি ঠিক দিয়েছ ত?

—সাক্ষী রাখিনি।

বিনি বলল, বাবা আজি ভাল হয়ে যাব?

পঞ্চানন এবার কি ভাবল। মাথা নিচু করল। নক্ষত্রলোক, অথবা গাছ-পালা মাঠ এবং দারুণ গ্রীষ্ম কিছুই অসত্য নয়। সে বলতে পারল না যখন এসব অস্ত্যাদি তৈরি হচ্ছিল তখন বোমা বহন করার জন্য রকেটের ক্রমোন্নতি শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় মানুষের মহাকাশ বিজয়ে। মানুষ অনেক দূরে পাড়ি দিতে শিখেছে। অথচ একটা সামান্য হাঁচির অসারতার কিছুই করা যাচ্ছে না। সে মিথ্যে জেনেও বলল, মানত দিয়েছি, ঠিক সেরে যাবে। আয়, কোলে আয়।

পঞ্চানন মেয়েকে কোলে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। নিনি পাশে দাঁড়িয়ে মালবিকা বলল, কি দেখছ?

কিছুই না, তারপর বলল, আমরা কত জানি, আবার কত সামান্য কিছু এখনও ঠিক জানি না মালবিকা।

মানুষটা তার এরকমেরই। কখনও শক্ত, কখনও ভারি নরম। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে একটা কাজ করিয়েছে। সে বলল, ঠাকুর ওকে সুমতি দাও।

চারপাশের শহর মানুষজন কত সব দুঃখ-দুর্দশায় ডুবে আছে। নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে পঞ্চাননের এসব মনে পড়ল। কত তুচ্ছ এবং নগণ্য সব কিছু ভাবলে! অথচ এই বিশালতার কেন্দ্রভূমে নিনি মালবিকা এবং বিনি যাদে তার কোনো আর বড় কিছু অস্তিত্ব নেই। গ্রহ সেও একটা মাঝারিগোছের নক্ষত্রের মতো। তাকে কেন্দ্র করে তিনটে গ্রহ পাক খাচ্ছে। অথবা সব মানুষই নক্ষত্র হয়ে যায়, সৌর জগতের মতো বিন্দু বিন্দু ভেঙ্গে গেলে পরমাণুতে নিমজ্জিত হতে পারে। গ্রহ উপগ্রহের মতো সেখানেও ঘুরছে, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কত সব কণিকা ঘুরছে।

এত সব ভাবলে কার মাথা আর ঠিক থাকে! পঞ্চানন সহসা বলে ফেলল, ভারি মজার জীবন। গ্রহ উপগ্রহ, সৌর-জগত, বিশাল বিশ্ব যেখানেই তাকাও দেখতে পাবে কত সব বিস্ময়কর মজা। এরই ভেতর জীবন আসে জীবন যায়, নিনির চিন্তায় ঘুম আসে না, কত সব পঞ্চাননেরা দৌড়ায় মানত দেয়, বিশ্বব বিশ্বব বলে চিৎকার করে, তবু মানুষের পরিত্রাণ নেই মালবিকা।

নিনি বাবার প্যাচাল ত্যাক করে কেঁদে ফেলল।

মালবিকা জানে, লোকটার আজকাল বক্তৃতা দেবার স্বভাবও হয়েছে। সে বলল, এস। অনেক বক্তৃতা হয়েছে। খেয়ে দেয়ে নাও। আমার অত সময় নেই বসে থাকার।

পঞ্চানন দেখল, কেউ ওর কথা শুনতে চায় না। কেবল বিনি এখনও বাবাকে একটু ভালবাসে। বাবার কথা-বার্তা প্যাচাল বলে মনে হয় না। সে যেন বিনিকেই শুনিয়ে বলল, বুঝলি কেউ কারো কথা গ্রাহ্য করে না। যে যার কেন্দ্রভূমিতে দৌড়ায়। তার পক্ষ কি বলবে ভেবে পেল না। কত কিছু যে বলার ছিল। যেমন সে আজ বলতে পারত মানবাত্মার দুর্দশার কারণ শুধু-মাত্র অসাম্যতা নয়। বরং তার জন্য দায়ী সব শনিঠাকুরেরা। দায়ী সমস্যা মোকাবেলার জন্য জীবনে বিজ্ঞান প্রয়োগে যথার্থ ব্যর্থতা। এত সব তো আর বলা যায় না। তবে কান মলে ফের আগামী শনিবারে থানে পাঠাবে মালবিকা। না গেলে সংসার ঠাকুরের কোপে বিনষ্ট হল বলে চিৎকার করবে। এত সব ঝনঝাট এক জীবনে আর কত সহ্য হয়। সে চটপট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল। কারণ অযথা মাথা খারাপ করলে শনিঠাকুর আরও বেশি পেয়ে বসে। তার হাত থেকে নিস্তার মানুষের পক্ষে যথার্থই কঠিন।

অতিপ্রাকৃত

অদ্রীশ বর্ধন

নিয়মের নিগড়ে সুদৃঢ় এই প্রকৃতির রাজ্য। যে নিয়ম আমরা বুঝি না, তাকেই বলি অতিপ্রাকৃত রহস্য। এমনি একটা অতিপ্রাকৃত রহস্য কাহিনী আজ বলব।

আমার বয়স এখন বাষট্টি। ছেলের বয়স পঁচিশ। দিন পনেরো হল ছেলের বউ ঘরে এনেছি। বিয়ের পর ওরা বললে—'বাবা, দীঘা যাব।'

দুজনে দুটি ফুটন্ত ফুলের মত দাঁড়িয়ে রইল সামনে। ছেলে আমার সুদর্শন। চোখ দুটো সত্যিই সুন্দর। পুরুষের মত কপাল। হাল্কা ঢেউ খেলানো চুল। চিবুক, ঠোঁট, নাক ছোটর ওপর খুঁতহীন। বউটিও কম যায় না। যেমন দেবা তেমনি দেবী।

ছেলের সবচেয়ে বড় বন্ধু আমি। বউটিকেও শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে সেইভাবে। শ্বশুরে বলে সাতহাত ঘোমটা টেনে ন্যাকামার পুঁটলিটি হয়ে থাকার মেয়ে সে নয়। খুশী উজ্জ্বল দুই চোখ মেলে তাই অনাড়ষ্টভাবে ও চেয়ে রইল আমার পানে। সত্যিই যেন আমার মেয়ে।

বললাম—বেশ তো, যানা।'

তোমাকেও যেতে হবে।

হেসে বললাম—পাগলা ছেলে। তুই যখন একলা ছিলি, তখন তোকে দীঘা নিয়ে গেছিলাম। এখন তুই দোকলা হয়েছিস, আমারও ছুটি হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলে বললে—না তোমায় যেতে হবে। নইলে কথাটা তোমার মিথ্যে হয়ে যাবে।'

কোন কথাটারে? শুধোলাম সকৌতুকে।

ঢেউ দেখে ভয় পেতাম বলে তুমি বলতে না বুড়ো হলে আমিও তোর মত ভয় পাব—তখন আমি পাড়ে বসে থাকব, আর তুই গভীর জলে গিয়ে ভোল্ট দিবি?

হেসে ফেললাম। ভোল্ট শব্দটা মনে করিয়ে দিল অনেক কিছু। ছেলের বয়স তখন পাঁচ বছরও হয়নি। ভাল করে কথাও বলতে পারত না। ভল্ট-কে বলত ভোলট। খাটে ডিগবাজি খেত, আর বলত, বাবা, দেখছো কি রকম ভোল্ট দিচ্ছি।

তাহলে যাচ্ছো। ছেলে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়েই রইল। মুখ টিপেটিপে হাসতে লাগল বউটা।

বললাম—আমি গেলে তোর আনন্দ হবে?

হ্যাঁ। বেশ টান দিয়েই বলল ছেলে।

তবে যাবো।

নিয়তি আমাকে টেনেছিলেন দীঘায়। গিয়েছিলাম বলেই অলৌকিক, অবিশ্বাস্য এই কাহিনী আজ লিখতে বসেছি।

দীঘার সমুদ্রতটের পূর্বদিকে যেখানে এখনো সহস্রবন্ধুময় লাল পাথর ফেলা হয়নি, সেইখানে দুজনে জলে নেমে গেল। ওদের সঙ্গে এ কাহিনীর আর বিশেষ সম্পর্ক নেই।

আমি পাড়ে বসে রইলাম। শক্ত বালির সৈকত। এককালে এখানে এরোপ্লেন নামত। এখন পাথর ফেলে বাঁধ বাঁধানো হয়েছে তাতে বালি ওড়া বন্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই বন্য সৌন্দর্য আর নেই। লক্ষ ছুঁচের মত বালুর কণা এসে বিঁধত গায়ে। ছুটত পিচের রাস্তা দিয়ে অনেক দূরে পর্যন্ত। সে দৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। ঝাউবনও এখন

পাতলা। পশ্চিমদিকে খানকয়েক এখনো আছে—বাঁচ ওদিকে বাঁধানো হয়নি—ঝাউবনও লুটিয়ে পড়ছে পাড় ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে। সমুদ্রের ফেণা সেখানে থালির ওপর ডেলা ডেলা পড়ে থাকে সাদা আইসক্রীমের মত। সেইখানে গত-কাল ভাটার জল সরে এলে আমি একাই বেড়াতে গিয়েছিলাম। লাঠি ঠুকঠুকিয়ে ভিজে বালির ওপর দিয়ে অনেকখানি গিয়েছিলাম। লাঠির ডগা দিয়ে ভিজে-বালির ওপর লিখেছিলাম দুটি নাম। শম্বর আর সুস্মিত।

ঠিক এইভাবে এই দুটি নাম লিখে-ছিলাম বিশ বছর আগে—ঠিক ঐ জায়-গাটিতেই। তখন আমার পাঁচ বছরের ছেলে ছিল সঙ্গে। শম্বর ওরই নাম। আঙ্গুল দিয়ে ইকড়ি-মিকড়ি অনেক কিছু এঁকেছিল আমার দেখাদেখি। ভিজে বালি খুঁড়ে প্রাসাদ গড়েছিল!

তারপর জোয়ারের জল এসে সব ডুবিয়ে দিয়েছে। গভীর জলে বড় বড় ঢেউ উঠেছে। অবাক চোখে সেইদিকে তাকিয়ে ছেলে শুধিয়েছিল—বাবা, ভাঁট কখন আসবে?

ভাঁট মানে ভাঁটা। শ্রীমানের বচনের ধরনই ছিল ঐ রকম।

যাক সে কথা। বালির ওপর নাম লিখেছিলাম আরও একবার। দীঘার পশ্চিম ভাঁট বেয়ে একটানা হেঁটে গেলে চন্দনেশ্বর সৈকতে পৌঁছানো যায়—সেইখানে—পুরীর সী-বীচে। আজ থেকে সাতাশ বছর আগে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে দুজনে মিলে লিখেছিলাম দুটি নাম। আমার নাম আর সুস্মিতর নাম। একটার পর একটা ঢেউ এসে একসময়ে তা মুছে দিয়েছিল। ঢেউ আসে, ঢেউ যায়। এই তো সংসারের নিয়ম।

কিন্তু তারা যায় কোথায়? তরঙ্গের মতই নিরন্তর মানুষ আসছে, চলেও যাচ্ছে। যায় কোথায়?

হাঁটু জলে চলে গিয়ে হুটোপুটি করছে ছেলে আর ছেলের বউ। আমি হেঁট হয়ে বালির দিকে চেয়ে রইলাম। আশেপাশে অসংখ্য ছোটবড় ফুটো। বালির বুকে কাঁকড়ার গর্ত। এদের রং প্রায় সাদা। পাঁচ বছর বয়েসে ছেলের আমার সখ হয়েছিল লাল কাঁকড়া ধরবে। একটা গামছা নিয়ে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল আরো পশ্চিমে—যেখানে একটা খাঁড়ির মত আছে। লাল-কাঁকড়া লাল কার্পেটের মত সেখানে ছেয়ে রাখে। বালুকাভূমি।

আমি চুপচাপ বসে আছি—সাদা কাঁকড়াগুলো সাহস পেয়ে প্রথমে চোখ বার করল ফুটো থেকে। তারপর গুটি গুটি বেরিয়ে এসে ঘুরতে লাগল আশে-পাশে। আমি চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ ওরা চঞ্চল হল। সাঁৎ সাঁৎ করে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়তে লাগল যে-যার গর্তে। কয়েকটা বাচ্চা কাঁকড়া দিশেহারা হয়ে গর্ত খুঁজে না পেয়ে এলোমেলোভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে পালিয়ে গেল অন্য গর্তের দিকে।

দুটো শুভ্রচরণ দেখলাম। গাঢ়-বেগুনির সঙ্গে মানানসই ঘোর লাল পটি দেওয়া স্লিপার ভারি সুন্দর মানি-য়েছে পা দুটিতে। গাঢ় বেগুনি রঙের নাইলন সাড়ি লুটোচ্ছে পায়ের পাতায়। আস্তে আস্তে পা ফেলে চরণ দুটি এগিয়ে এল আমার দিকে। এতটুকু দ্বিধা না করে স্তব্ধ হল আমার ঠিক পাশটিতে।

অবাক হলাম। পায়ের দিকেই তাকিয়েছিলাম—ওপরে তাকাইনি। তাই লক্ষ্য করলাম, মেমসাহেবদের মতন নিটোল সুন্দর পা দুটি ফিরে আছে আমার দিকে—সমুদ্রের দিকে নয়। পায়ের অধিকারিণী সমুদ্র দেখছে না—আমাকে দেখছে।

মুখ তুললাম।

দেখলাম, সুস্মিত চেয়ে আছে আমার দিকে। মুখে সেই চাপা হাসি। দাঁত দেখিয়ে কখনো হাসত না সামনের দুটো দাঁতের মাঝে ফাঁক ছিল বলে। কিছুতেই দেখাতে চাইত না সুন্দর মুখের ছোট্ট ঐ খুঁটিটুকু—একদিন বাঁ-হাতে জড়িয়ে ধরে ডান হাতের আঙ্গুল জোর করে ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখে নিয়েছিলাম ফাঁকটা কতখানি।

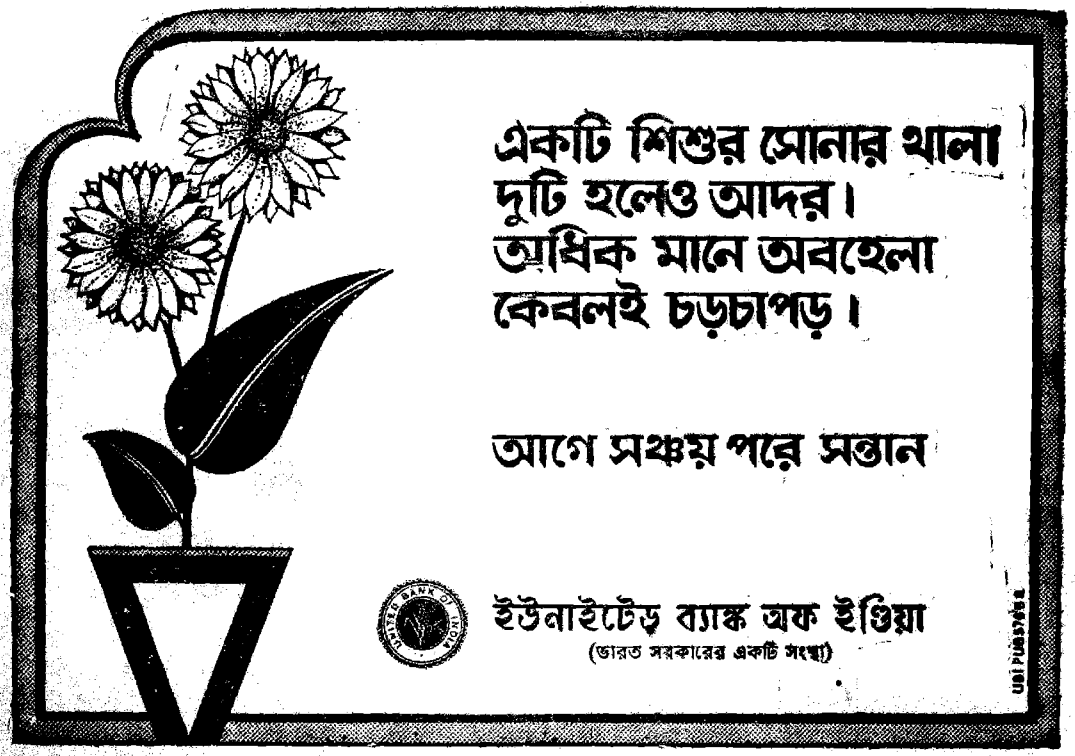

দশভুজার মত বিশালনয়না সেই সুস্মিত গালে টোল ফেলে হাসছে ঠিক সেইভাবে। ঠোঁট বন্ধ। গালের টোল বেশ গভীর। চিবুকের কাটা দাগটি পর্যন্ত স্পষ্ট। বাঁ গালে বসন্তর একটি মাত্র ক্ষত। ডীপ ভায়োলেট সাড়ির সংগে ম্যাচ করা ঘোর লাল ব্লাউজ। কানে ইয়ার রিং। নাকে বিঁধ নেই। গলায় সুতোর মত একগাছি সোনার হার। হাতে বাউটি।

সীমন্ত সাদা। সিঁদুরের দাগ নেই। বিয়ের আগে ঠিক যেভাবে দেখেছিলাম—সেইভাবে। ও রূপ দেখেছিলাম একবারই—নিজের পাত্রী নিজে নির্বাচন করতে গিয়েছিলাম।

সেই সুস্মিত মধ্যিখানে খাঁজকাটা চিবুকে তর্জনী ঠেকিয়ে কৌতুকতরলিত চোখে চেয়ে আছে আমার পানে।

আশ্চর্যের কথা, অবাক হলাম না। চমকেও উঠলাম না। আকাশে সূর্য, সামনে সমুদ্র, পাশে সুস্মিত। সব সত্যি।

বললাম, এত বছর বাদে এলে?

ও বসল বালির ওপর—আমার গা-ঘেঁসে—ঠিক যেভাবে বসেছিল সাতাশ বছর আগে পুরীর সী-বীচে। ফটোতে পোজটা ধরে রেখেছি। অনেক দেখেছি। তবু আশ মেটেনি।

ঠিক সেই পোজে আমার পাশে বসল সুস্মিত। ওর উষ্ণ কোমল শরীরের স্পর্শে সাতাশ বছর আগেকার অনুভূতি ফিরে এল দেহেমনে। ও কিন্তু কথা বলল না। ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে হাসি হাসি চোখে টিপিটিপি ঠোঁটে কেবল চেয়েই রইল।

বললাম—বোবা নাকি?

বেগুনি সাড়ির আঁচলটা দাঁতের ফাঁকে এবার কামড়ে ধরল সুস্মিত। হাওয়ায় উড়তে লাগল লম্বা চুল। দুটো দাঁতের মাঝের ফাঁকটুকু দেখতে পেলাম স্পষ্টই, সুস্মিতই যেন দেখালো—ইচ্ছে করেই।

বলল—চিনতে পেরেছো?

যা হাড় জ্বালিয়েছো, না চিনে আর উপায় কি বল।

শুধু কি তাই : হেসে বলল সুস্মিত—হাড় খেয়েছি, মাস খেয়েছি, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজিয়েছি—তবেই না ফেলে পালিয়েছি।

পালিয়েও তো থাকতে পারলে না—আসতে হলই।

তোমাকে তো বলেই ছিলাম—আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না—ছাসপাতালেও না।

তবুও গিয়েছিলে।

নিয়তি ডাকলে কি করব বল।—যাক সেকথা, ছেলের বউ খুব ভালই এনেছো দেখছি।

পছন্দ হয়েছে?

তোমার পছন্দই আমার পছন্দ।

শুধু আমার পছন্দই নয় গো—তোমার ছেলেরও পছন্দ। সেই তো খুঁজে পেতে ধরে এনেছে।

যেমন বাপ তেমনি ছেলে হবে তো। নিজে কি করেছিলে?

ঐ রকমটি না হলে তোমাকে কি পেতাম?

না পেলেই ভাল হত নাকি? এত অশান্তি এত দুঃখ পেতে না। আমি শনি হয়ে এসেছিলাম তোমার ঘরে। যাক গে সেকথা, আমার গয়নার বাকস ছেলের বউকে ফুলশয্যার দিন দিয়েছিলে তো?

দিয়েছিলাম—বিয়ের চুড়িগুলো বাদে।

কেন?

চুরি হয়ে গেছে—ছেলে মানুষ করার মাশুলও বলতে পার।

মুহূর্তের জন্যে ঠোঁট কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিল সুস্মিত। বলল—যাকগে। বালাজোড়া তু পরেছে।

কখন দেখলে?

কালকে। বেশ মানিয়েছে দুটিতে।

ছেলের চোখদুটো দেখেছো? ঠিক তোমার মত।

দেখেছি। ও হলে পর বলেছিলে, ছেলে আমার মত চোখ না পেলে আঁতুড়ে দূর করে দেবে।

চোখ আমি দিয়েছিলাম—তবুও দূর করে দিলে আমায়।

নিয়তি ডাকলে কি করব বল?

আমারই কথা আমাকে শোনাচ্ছে।—বুড়ো কোথাকার।

সাতাশ বছর আগে ঠিক এমনিভাবেই আমাকে ক্ষেপাতো ও। চোদ্দ বছর বয়েসের তফাৎ ছিল কিনা। আর এখন? তফাৎটা কম করেও বিয়াল্লিশ বছরের।

হঠাৎ উশখুশ করে উঠল শ্রীমতী বলল—আমি চলি। ওরা উঠে আসছে।

হাত ধরে বললাম—না, বসো। কথা বলে যাও।

না গো হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললে সুস্মিত—তুমি যা বুঝেছো ওরা তা বুঝবে না। ভয় পাবে।

বলেই, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। পরক্ষণেই হেঁট হয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললে—অমন করে বালির ওপর আমার নাম আর লিখো না—কি ভাববে ওরা। তাড়াতাড়ি আমি তো ফিরে এসেছি।

তা এসেছো : পূর্ণ যুবতীর চোখে চোখ রেখে বললাম—একজন্ম পরে।

সোনালী

নিমাই ভট্টাচার্য

(উপন্যাস)

— এক —

খোকন ওকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললো, কী আশ্চর্য! তুই শাড়ী পরেছিস!

সোনালী ওকে প্রণাম করে সুটকেশটা হাতে নিয়ে বললো, তুমি কি ভেবেছ আমি চিরকালই ছোট থাকব?

খোকন ড্রইং রুম পার হয়ে ভিতরের দিকে যেতে যেতে বললো, না, না, তুই মস্ত বড় হয়েছিস।

সোনালী সঙ্গে সঙ্গে খোকনের মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমি বড় হইনি বড়মা?

খোকনের মা হাসতে হাসতে বললেন, হয়েছিস বৈকি!

শুনলে ত খোকনদা?

এখন আমি এসে গেছি। এখন আর বড়মা বা জ্যেঠামনিকে তেল দিয়ে লাভ নেই। এখন আমাকেই তেল দে।

সোনালী ঘরের এক পাশে সুটকেশটা রেখে রান্নাঘরের দিকে যেতে নির্বিকার হয়ে বললো, আমি কাউকে তেল দিই না।

বাজে ফড় ফড় না করে চা দে।

সোনালী রান্নাঘরে চলে যেতেই খোকন বললো, দেখ মা, যত দিন যাচ্ছে সোনালীটাকে দেখতে তত সুন্দর হচ্ছে।

ওকে দেখে ত কেউ ভাবতেই পারে না ও আমাদের বাড়ীর মেয়ে না।

খোকন হেসে বললো, তুমি ওকে যা সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখো.....

বাজে বকিস না। ওকে দেখতেই ভাল। একটা সাধারণ শাড়ি-ব্লাউজ পরলেও ওকে দেখতে ভাল লাগে।

খোকন মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি যাই বল মা, তুমি ওকে আদর দিয়ে দিয়েই.....

তুই বাড়ীতে এসেই আমার পিছনে লাগবি না।

সোনালী চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বললো, তোমার স্বভাব আর কোনদিন বদলাবে না খোকনদা।

ঠাকুমা-দিদিমার মত কথা বলবি ত এক থাপ্পড় খাবি।

আমাকে থাপ্পড় মারলে তুমিও বড়মার কাছে থাপ্পড় খাবে।

খোকন চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, সত্যি, বাবা-মা তোকে আদর দিয়ে দিয়ে এমন মাথায় চড়িয়েছেন যে এর পর তোকে সামলানোই দায় হবে।

খোকনের মা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, তোর কলেজ খুলবে কবে?

কলেজ পনেরই জুলাই খুলবে। তবে আমাকে দিন পনের পরেই ফিরে যেতে হবে।

খোকন হাসতে হাসতে বললো, ছুটির মধ্যেই আমাদের টিউটোরিয়াল হবে।

খোকনের মা আর কিছু না বললেও সোনালী বললো, মাত্র পনের দিনের জন্য এত খরচা করে এলে কেন?

তোকে সায়েস্তা করতে।

যত দিন বড়মা জ্যেঠামনি আছেন, ততদিন আমার জন্য তোমাকে কিছুই করতে হবে না।

দ্যাখ সোনালী, আমি এ বাড়ীর একমাত্র ছেলে।

আমিও এ-বাড়ীর একমাত্র মেয়ে।

খোকনের মা হাসতে হাসতে বললেন, তুই ওর সঙ্গে পেরে উঠবি না। সোনালী এখন মাঝে মাঝে আমাকে আর তোর বাবাকে শাসন করে।

সোনালী ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিট পরে এসেই বললো, নাও খোকনদা, এবার চান করতে যাও।

আগে আরেক কাপ চা দে।

আর চা খেতে হবে না।

কবিরাজী না করে যা বলছি শোন।

বড়মার সামনে এই ধরনের কথা বলে?

খোকন হেসে বলে, আচ্ছা আর বলব না। তুই এক কাপ চা খাওয়া।

সোনালী রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েই পিছন ফিরে বললো, বড়মা, তুমি জ্যেঠামনিকে টেলিফোন করবে না? জ্যেঠামনি হয়ত ভাবছেন, খোকনদা এখনও আসেনি।

হ্যাঁ করছি।

খোকন বাথরুম থেকে বেরুতেই ওর মা ডাকলেন, খোকন, খেতে আয়।

খোকন টেবিলে এসে বসতেই সোনালী খেতে দিল।

তুমি খাবে না মা?

তুই খেয়ে নে। আমি আর সোনালী পরে বসব।

পরে বসবে কেন? এখনই বসো।

সোনালী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললো, তোমার মাছ বেছে দিতে দিতে বড়মার খেতে অসুবিধে হয়। তুমি নামেও খোকন, কাজেও খোকন।

দ্যাখ সোনালী, আমি এ বাড়ীর একমাত্র ছোট ছেলে।

তুমি কখনও এ বাড়ীর একমাত্র, কখনও একমাত্র বড় ছেলে, আবার কখনও একমাত্র ছোট ছেলে।

খোকনের মা হেসে উঠলেও খোকন ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে আলু-পটলের তরকারী মাখা ভাত মুখে দিয়েই বললো, তরকারীটা লাভলি হয়েছে।

খোকনের মা বললেন, সব রান্নাই সোনালীর।

ইস! কি নুন হয়েছে!

খোকনের মা হেসে উঠলেও সোনালী গম্ভীর হয়ে বললো, না জেনে প্রশংসা করলে অন্যায় হয় না।

গ্রামের বুড়ীদের মত বেশ ত প্যাঁচ মেরে কথা বলতে শিখেছিস!

সোনালী হেসে বলে, যাই বল বড়মা, খোকনদা না থাকলে বাড়ীতে লোকজন আছে বলেই মনে হয় না।

খোকন জিজ্ঞাসা করল, তুই একলা একলা ঝগড়া করতে পারিস না?

তুমি পারো বুঝি?

আমি কি ঝগড়া করতে জানি নাকি?

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ ছেলের সঙ্গে গল্প করে খোকনের মা শুতে গেলেন। খোকন নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ডাকল, সোনালী, এক গেলাস জল দিয়ে যা।

সোনালী এক গেলাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকতেই খোকন ইসারায় ওকে কাছে ডেকে বললো, দেশলাইটা আনতো।

সোনালী এক গাল হাসি হেসে দুটো আঙুলে ঠোঁটের উপর চেপে ধরে একটা টান দিয়ে বললো, ধরেছ?

বাজে বকিস না। তাড়াতাড়ি আন।

অত ধমকালে আনব না।

আচ্ছা প্লীজ আন।

সোনালী দেশলাই আনতেই খোকন সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করল।

বেশ পাকা ওস্তাদ হয়ে গেছ দেখছি।

আস্তে। মা শুনতে পাবে।

এ্যাসট্রে লাগবে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্লীজ নিয়ে আয়।

সোনালী আঁচল দিয়ে ঢেকে এ্যাসট্রে এনে জিজ্ঞাসা করল, রোজ কটা খাও?

এক প্যাকেটের বেশী না।

সোনালী চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, এক প্যাকেট!

খোকন মৌজ করে টান দিতে দিতে বললে, আমি ত তবু কম খাই।

এক প্যাকেট কম হলো?

হস্টেলের সব ছেলেরাই দু তিন প্যাকেট খায়।

অত সিগারেট খেলে ত টি বি হয়ে যাবে।

ওসব বাজে কথা ছেড়ে দে।

বেশী সিগারেট খাওয়া খারাপ না?

সে রকম ধরতে গেলে ত সব নেশাই খারাপ।

তবে?

তবে আবার কি?

তাহলে জেনে-শুনে নেশা করছ কেন?

আজকালকার যুগে সবাই কিছু না কিছু নেশা করে।

সবাই মোটেও করে না।

সবাই মানে অধিকাংশ লোকই...

জান খোকনদা, সিগারেটের গন্ধটা আমার দারুণ লাগে!

ভাল লাগে?

খুউব।

খোকন হাসে।

সোনালী একটু থেমে বলে, তবে যে যাই বলুক, কলেজের ছেলেরা একটু-আধটু সিগারেট না খেলে বড্ড ক্যাবলা ক্যাবলা লাগে।

খোকন ওর কথা শুনে একটু জোরেই হাসে।

হাসছ কেন?

তোর কথা শুনে।

আমি কি এমন হাসির কথা বললাম?

খোকন ওর কথার জবাব না দিয়ে পর পর দুটো তিনটে টান দিয়ে সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে ফেলে দেয়।

আচ্ছা খোকনদা, আমি কি সত্যিই

বেশ বড় হয়ে গেছি? নিজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে সোনালী প্রশ্ন করে।

খোকন ওর দিকে একবার ভাল করে দেখে বললো, তা একটু হয়েছিস।

তুমি বড়দিনের ছুটিতে যা দেখেছিলে আমি তার থেকে বড় হয়েছি?

নিশ্চয়ই হয়েছিস।

দেখে বোঝা যায়?

শাড়ী পরে তোকে একটু বড় লাগছে।

তুমিও যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেছ।

তাই নাকি?

সত্যি বলছি।

খোকন হাসে।

সোনালী হেসে বলে, সামনের বার হয়ত দেখব তুমি দাঁড়ি কামাতে শুরু করেছ।

খোকন একবার নিজের মুখে হাত বুলিয়ে বললো, সামনের বার না হলেও বছর খানেকের মধ্যে শুরু করতেই হবে।

ভাল কথা খোকনদা, মীরাদির বিয়ে হয়ে গেল।

প্রদীপ আমাকেও একটা কার্ড পাঠিয়েছিল। তোরা গিয়েছিলি?

জেঠামনির অফিসে মিটিং ছিল বলে যেতে পারেন নি। আমি আর বড়মা গিয়েছিলাম।

জামাইবাবু কেমন হলো রে?

খুব সুন্দর।

আজকালের মধ্যেই একবার প্রদীপদের বাড়ী যেতে হবে।

প্রদীপদা বোধহয় আজ বিকেলে আসবে।

ও এসেছিল নাকি?

দু' তিন দিন আগে এসেছিলেন।

ও জানে আমি আজ আসছি?

প্রদীপদা বসে থাকতে থাকতেই তোমার চিঠিটা এলো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আর কেউ আমার খোঁজ নিতে এসেছিল?

একদিন মানসদা এসেছিলেন।

মানস? খোকন একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করল।

মানসদা এসেছিল শুনে তুমি চমকে উঠলে কেন?

ও হতভাগা লিখেছিল বিলেত যাচ্ছে।

এবার সোনালী চমকে ওঠে, তাই নাকি?

ষ্টেশনে নেমেই মাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার কোন বন্ধু-বান্ধব এসেছিল কিনা, মা বললো না কেউ ত আসে নি।

বড়মা অত খেয়াল করেন নি।

তোর মত একটা প্রাইভেট সেক্রেটারী না থাকলে আমি যে কী মুস্কিলেই পড়তাম!

সোনালী হেসে বললো, জেঠামনিও ঠিক একই কথা বলেন।

মা রেগে যায় না?

না। বড়মা বলেন, আমি তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারী হবো কোন দুঃখে?

সত্যি, মা যদি এম এস-সি পাশ করে রিসার্চ বা প্রফেসারী করতেন, তাহলে অনেক উন্নতি করতেন।

বড়মা আমাকে পড়াতে পড়াতে কি বলেন জান?

কি?

বলেন তোর জেঠামনিকে বলে আয় আমার মত মাষ্টার রাখতে হলে মাসে মাসে আড়াই শ' টাকা লাগবে।

বাবা কি বলেন?

জেঠামনি গম্ভীর হয়ে বলেন, বিয়ের সময় লাখ টাকা নগদ না দিলে স্বামীর ঘরে এসে এসব খেসারত দিতে হয়।

খোকন আবার একটা সিগরেট ধরাতেই সোনালী বললো, তুমি আবার সিগরেট খাচ্ছ?

দেখতে পাচ্ছিস না?

এই ত একটু আগে খেলে।

একটু আগে মানে ঘণ্টা খানেকের উপর হয়ে গেছে।

হলেই বা!

গল্প-গুজব করতে গেলেই একটু বেশী সিগরেট খাওয়া হয়। কলেজ ছুটির দিন ত হষ্টেলের ঘরে ঘরে দার্জিলিং-এর মত মেঘ জমে যায়।

ঘৃণা, বিদ্বেষ, ও প্রেমহীনতার ওপর
মানব জীবনের জটীল মনস্তত্ত্বে বাস্তব আলেখ্য।

দ্রুত মুক্তির পথে

বিশ্ব পরিবেশনায় : শ্রীগিরিধারী পিকচার্স, ২০, চাঁদনী চক স্ট্রীট, কলি-৭২

হস্টেলে খুব মজা হয়, তাই না খোকনদা?

অতগুলো বাজার বাঁদর এক জায়গায় থাকলে মজা ত হবেই।

হস্টেলে তোমাদের দেখাশুনোর জন্য কোন প্রফেসর থাকেন না?

থাকেন।

তবে?

খোকন সিগরেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললো, মাঝে মাঝে তাকে আমরা এমন টাইট দিই যে তিনি আর এক জন্মেও আমাদের ধারে-কাছে আসেন না।

প্রফেসারকে তোমরা কী টাইট দেবে?

কত রকম টাইট দিই, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে।

যেমন?

খোকন মুখে টিপে টিপে হাসতে হাসতে সিগরেট শায় কিন্তু কোন কথা বলে না।

সোনালী অধৈর্য হয়ে ওঠে। বলে, বল না খোকনদা, প্লীজ! হস্টেলের গল্প শুনতে আমার খুব ইচ্ছে করে।

না, তোকে বলব না।

কেন?

তুই কখন যে মাকে বলে দিবি, তার কি ঠিক আছে।

না, মা, বলব না।

সত্যি বলছিস?

সত্যি বলছি, কাউকে বলব না।

তুই জোঠামনি আর বড়মার যা ভক্ত। তোকে বলতে সত্যি ভয় হয়।

মা কালীর নামে বলছি কাউকে বলব না।

খোকন সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললো, রোজ সকাল-সন্ধেয় হস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট একবার আমাদের দেখতে আসেন।

কি দেখতে আসেন?

সব ছেলেরা ঘরে আছে কিনা বা পড়তে বসেছে কিনা। তাছাড়া বাইরের কোন ছেলে আছে কিনা তাও চেক করেন।

হস্টেলে বাইরের ছেলে থাকতে পারে?

বাইরের মানে কলেজেরই বন্ধু-বান্ধব। অনেক সময় নাইট শোতে সিনেমা দেখে বাড়ীতে না ফিরে হস্টেলেই কারুর কাছে থেকে যায়।

বুঝেছি।

হতভাগা রোজ ভোর ছ'টায় এসে আমাদের উৎপাত করে। একদিন সবাই মিলে ঠিক হলো, আমরা সবাই দরজা খুলে ন্যাংটা হয়ে শুয়ে থাকব।

শুনেই সোনালী দাঁত দিয়ে জিভ কাটল। লজ্জা আর বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, এ রাম!

অত রাম রাম করলে শুনতে হবে না।

আচ্ছা, আচ্ছা, বল।

মৌজ করে সিগরেটে টান দিয়ে খোকন বললো, পরের দিন ভোরবেলায় হস্টেলের দেড়শ' ছেলেকে ত্রৈলঙ্গস্বামী হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে...

তোমাদের লজ্জা করল না?

হস্টেলে থাকলে লজ্জা, ঘেন্না, ভয় বলে কিছু থাকে না।

একটু চুপ করে থাকার পর সোনালী জিজ্ঞাসা করল, পরে উনি কিছু বকলেন না?

আমরা কি কচি বাচ্চা?

তবুও এই রকম একটা কাণ্ডর পর কিছুই বললেন না?

শুনেছিলাম, সবাইকে ফাইন করা হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরে আর কিছু করেন নি।

তাহলে হস্টেলে বেশ ভালই আছো!

এমনি বেশ মজায় থাকি তবে খাওয়া-দাওয়ায় বড় কষ্ট।

কেন?

কি বিচ্ছিরি রান্না, তুই ভাবতে পারবি না।

তাই নাকি?

হ্যাঁরে। গলা দিয়ে নামতে চায় না।

এক গাদা টাকা নিচ্ছে অথচ...

শালারা চুরি করে।

তাহলে তোমরা কি করে খাও?

কি আর করব? বাধ্য হয়ে ক্ষিদের জ্বালায় সবাই খেয়ে নেয়।

বড়মা তাহলে ঠিকই বলেন।

মা কি বলে?

কালও বাজার করতে গিয়ে তোমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্টের কথা বলছিলেন।

আজ আমি যা খেলাম, হস্টেলে এর সিকি ভাগও খাই না।

আজকের রান্নাগুলো তোমার ভাল লেগেছে?

আমি ভাবতেই পারিনি তুই এত ভাল রান্না শিখেছিস।

আজ-কাল বড়মাকে আমি বিশেষ রান্নাঘরে ঢুকতে দিই না।

সব তুই করিস?

বড়মা বেশীক্ষণ রান্নাঘরে থাকলেই শরীর খারাপ হয়। হঠাৎ এক একদিন এমন মাথা ধরে যে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না।

মা যে কিছুতেই ঠিক মত অষুধ খাবে না।

তুমিও ঠিক জোঠামনির মত কথা বলছ।

খোকন আর শুয়ে থাকে না। উঠে পড়ে। বলে, যাই, এবার একটু মার কাছ শুই।

সোনালী হেসে বললো, তুমি কলেজে পড়লেও এখনো সত্যিকার খোকনই থেকে গেছ।

খোকন ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললো, আমি কি বুড়ো হয়ে গেলেও মার কাছে শুতে পারি না।

সোনালীও উঠল। বললো, স্নান করব কিন্তু একটু পরেই চা করব।

খোকন জড়িয়ে শুতেই উনি বললেন, তুই এলি আর আমার দুপুর-বেলার বিশ্রামের বারোটা বাজল।

তুমি ঘুমোও না।

এমন করে জড়িয়ে থাকলে কেউ ঘুমোতে পারে?

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। আর ঘুমোতে হবে না।

কেন, ক'টা বাজে?

চারটে।

এর মধ্যেই চারটে বেজে গেল?

সময় কি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে?

এই তোর বকবকানি শুরু হল।

সত্যি মা, তোমার কাছে এলেই বক-বক করতে ইচ্ছে করে।

মাকে জ্বালাতন না করে কি তোর শান্তি আছে?

মার কথা শুনে খোকন হাসে।

এতক্ষণ তুই কি করছিলি?

সোনালীকে হস্টেলের গল্প বলছিলাম।

ছুটির মধ্যে তোদের কি টিউটোরিয়াল হবে?

আরে দূর! কে ছুটির মধ্যে টিউটোরিয়াল করবে?

তবে যে বলছিলি দিন পনের পরেই যেতে হবে?

ও সোনালীকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বলছিলাম।

তুই আর্শীব বলে ও আজ ক্ষ্যাপা উঠেছে জানিস?

ক্ষ্যাপা?

পাঁচটারও আগে।

খোকন শুনে হাসে।

ওর মা বললেন, সকাল আটটা থেকে ও আমাকে স্টেশনে যাবার জন্য তাড়া দিতে শুরু করল।

আচ্ছা মা, সোনালীদের বাড়ীর কি খবর?

বিহারীর দোকানটা মোটামুটি ভালই চলছে আর সন্তোষকে ত তোর বাবা ওদেরই অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তুই জানিস না?

শুনলেও মনে নেই।

সোনালী ওদের বাড়ী যায়?

প্রত্যেক মাসেই মায় তবে রাত্তিরে থাকে না।

কেন?

শুধু তুমি আর আমি

মাঝে আমরা হারিয়ে যাই...
জনঅরণ্য, শহরের কোলাহল পেছনে ফেলে।
সোনালী রোদ্দুর মাখা বালিয়াড়ী...
আর প্রকৃতির রঙে রঙ মিলিয়ে আমাদের কাপড়...
সব এক সুরে বাঁধা।

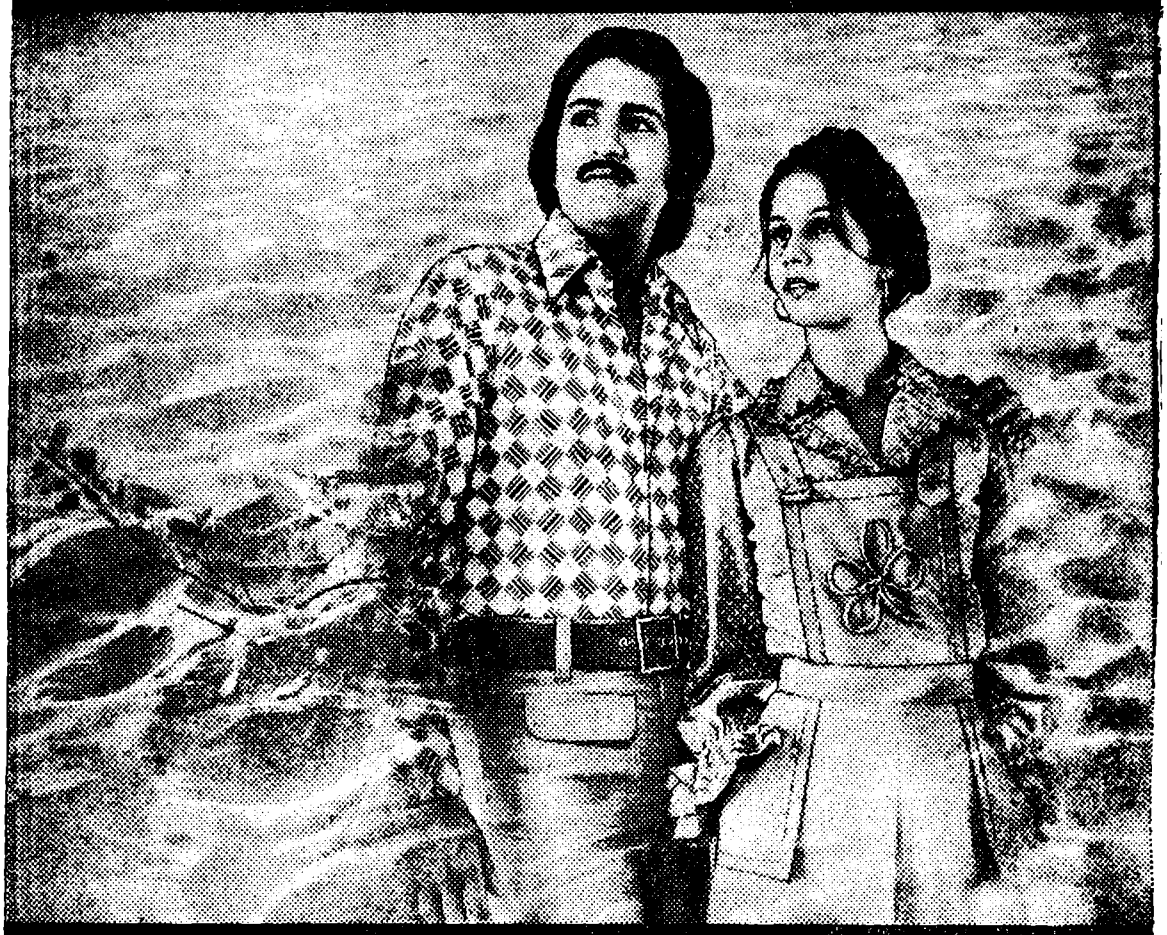

ওদের কাপড়... ঠিক ধরেছেন... মফৎলালের।

MAFATLAL GROUP

মফৎলাল কাপড়ের নানান রূপ
সুটিং • শার্টিং • শাড়ী
• ড্রেস মেটিরিয়াল • শার্ট

everest/465/MS

ও আর আজকাল আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে না।

খোকন আমার হাসে।

ওর মা বলেন, তাছাড়া ও না থাকলে আমাদেরও খুব খারাপ লাগে।

তা ত লাগবেই।

বিশেষ করে তোর বাবার ত এক মিনিট ওকে না হলে চলবে না।

তাই নাকি?

ওর মা হেসে বললেন, সোনালী যেদিন ওর বাবা-মার কাছে যায় সেদিন তোর বাবাকে দেখতে হয়।

কেন? কি করেন?

অফিস থেকে বাড়ী ফিরে মিনিটে মিনিটে আমাকে শোনাবেন, হতভাগী মেয়েটা না থাকলে বাড়ীটা এত ফাঁকা ফাঁকা লাগে যে...

খোকন হেসে বলে, আচ্ছা!

তারপর আটটা বাজতে না বাজতেই নিজে গাড়ী নিয়ে ছুটবেন।...

খোকন একটু জোরেই হাসে।

ওখানেই হাসছিস? আসলে উনি সোনালীকেই আনতে যান কিন্তু ওখানে গিয়ে বলবেন, সোনালী, কাল ভোর-বেলায় চলে আসিস।

সোনালী থাকে?

ও হতভাগীও জানে, জেঠামনি ওকে আনতেই গেছে। ও জেঠামনির গাড়ী চেপে চলে আসে।

সোনালী ট্রেতে তিন কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, জান খোকনদা, বাড়ীতে এসে দেখি বড়মা আমার জন্য রান্না করছেন।

আমি যখন জানি তুই আসবিই তখন তোর রান্না করব না?

খোকন চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই মাকে বলে, যেমন বাবা তেমন তুমি! দুজনেই মেয়েটার মাথা খাচ্ছ।

ওর মা একটু রাগের ভান করে বলেন, তুই চুপ কর।

সোনালী খুশীর হাসি হেসে বললো, ঠিক হয়েছে।

খোকন কটমট করে সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোর জেঠামনি বা বড়মা না। ঠিক একটা থাপ্পড় খাবি।

খোকনের মা এবার সত্যি রেগে বললেন, কথায় কথায় থাপ্পড় মারা কি ধরনের কথা?

বেশ ত শাড়ী-টাড়ী পরছে। এবার কোন একটা ছাবা-কাবা ধরে বিয়ে দাও না।

সোনালী বললো, তোমার কি এমন গরজ পরে গই দিয়েছি যে তুমি আমাকে তাড়াতে চাও?

খোকনের মা সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, দু-এক বছর পর সত্যি তোর বিয়ের কথা ভাবতে হবে।

সোনালী কোন কথা না বলে লজ্জায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

— দুই —

পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

মিঃ সরকার অফিস থেকে বাড়ীতে ফিরেই স্ত্রীকে বললেন, শিবানী একটা খবর আছে।

স্বামীর গলার টাই খুলে দিতে দিতে শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, আবার বদলী নাকি?

না।

তবে আবার কি খবর?

মিঃ সরকার দুহাত দিয়ে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বললেন, যদি বলতে পার তাহলে তোমাকে এক সপ্তাহের জন্য দার্জিলিং ঘুরিয়ে দেব।

এই বর্ষায় আমি দার্জিলিং যাচ্ছি না।

কেন?

আমি কি পাগল যে এই বর্ষায় দার্জিলিং যাব?

বর্ষাতেই ত দার্জিলিং যেতে হয়। শহরে কোন জানাশুনো লোক দেখা হবে না। সারাদিন বেশ ঘরের মধ্যে.....

অসভ্যতা না করে খবরটা বল।

অফিস থেকে গাড়ী কিনতে বলেছে।

গাড়ী কিনতে বলেছে মানে?

মানে গাড়ী কেনার টাকা দেবে; মাসে মাসে আড়াইশ টাকা কেটে নেবে।

কার এ্যালাউন্স ত দেবে?

তা ত দেবেই।

তবে তোমাকে আমি গাড়ী চালাতে দিচ্ছি না।

তোমাকে চালাতে পারছি আর গাড়ী চালাতে পারব না?

স্বামীর জামার বোতাম হাতের কফ লিংক খুলতে খুলতে শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন কবে গাড়ী কিনতে হবে?

এই মাসের মধ্যেই কিনতে হবে।

কি গাড়ী কিনবে?

তুমি বল।

অষ্টিন। ছোটর মধ্যে ভারী সুন্দর গাড়ী।

তোমার দাদার অষ্টিন আছে বলে কি আমাকেও অষ্টিনই কিনতে হবে?

এই পৃথিবীতে যেন আমার দাদাই একমাত্র অষ্টিন চড়েন!

আমিও অষ্টিন কিনব ভেবেছি।

আজে-বাজে রংয়ের গাড়ী নিও না।

তুমি কি রংয়ের চাও?

ষ্টীল গ্রে।

নমস্কার স্যার। আমাকে চৌধুরী সাহেব.....

তোমার নামই কি বিহারীলাল দাস?

হাঁ স্যার।

চৌধুরী ত তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কৃতার্থের হাসি হেসে বিহারী বললো, ওঁদের বাড়ীর সবাই আমাকে খুব স্নেহ করেন।

তাই বলছিল বটে।

আমার বাবা চৌধুরী সাহেবের বাবার গাড়ী চালাতেন। আর চৌধুরী সাহেব ত আমার কাছেই গাড়ী চালান শিখেছেন।

শিবানী বললেন, ওই সাহেবকে ষ্টিয়ারিং ধরতে দেবে না।

বিহারী হাসে।

না না হাসির কথা নয়।

কিন্তু সাহেব যদি বলেন?

সাহেব কান্নাকাটি করলেও দেবে না।

শিবানীর কথায় শুধু বিহারী না, মিঃ সরকারও হাসেন।

হাসি থামলে মিঃ সরকার বিহারীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মাইনে-টাইনে কাজকর্মের ব্যাপারে চৌধুরী সা'ব যা বলেছে তাতে আপত্তি নেই ত?

না স্যার।

সোমবার আমার গাড়ীর ডেলিভারী পাব।

আমি কখন আসব স্যার?

সকাল নটা-সাড়ে নটার মধ্যে এসো।

ঠিক আছে স্যার।

বিহারী দুজনকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

সরকার দম্পতির জীবনে বিহারীলাল দাসের সেই প্রথম আবির্ভাব।

বছর ঘুরে পুজো এলো। শিবানী মিঃ সরকারকে জিজ্ঞাসা করলেন হ্যাগো বিহারীকে একটা ধুতি-পাঞ্জাবি দেবে না?

ও ত অফিস থেকে এক মাসের মাইনে পাবে।

তা পাক। হাজার হোক তোমাকে দাদা বলে ডাকে আমাকে বৌদি বলে। আমাদেরও ত একটা কর্তব্য আছে।

মিঃ সরকার ও কথার কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পুজোয় তুমি আমাকে কি দিচ্ছ?

শিবানী স্বামীর কানে কানে বললো, অনেক অনেক ভালবাসা।

বিহারী সত্যি বড় ভাল মানুষ। সব সময় মুখে হাসি লেগে আছে। কোন সময় কোন কাজে না বলে না। সর্বোপরি অত্যন্ত সৎ লোক।

বৌদি!

কি বিহারী?

একটা অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে?

মিসেস সরকার হেসে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার না আমার?

আপনি কেন অন্যায় করবেন? আমারই অন্যায় হয়েছে।

কি হয়েছে?

শনিবার আপনাদের সিনেমার টিকিট কেটে বাকি পয়সা ফেরৎ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

বিহারী একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা এগিয়ে দিতে গেলেও মিসেস সরকার নিলেন না। বললেন এত বড় অন্যায় যখন করেছ তখন তোমাকে কিছু খেসারত দিতে হবে।

বলুন বৌদি।

আমাকে একটু ঢাকুরিয়া নিয়ে যেতে হবে।

বিহারী এক গাল হাসি হেসে বললো, এ খেসারত দিতে ত আমি সব সময় প্রস্তুত।

মিসেস সরকার ঘরে দাঁড়াতেই বিহারী বললো, বৌদি, পয়সাটা নিলেন না?

না।

ঢাকুরিয়া যাবার পথে বিহারী গাড়ী চালাতে চালাতেই মিসেস সরকারকে বলে, বৌদি, প্রায় তিন বছর গাড়ী কেনা হয়েছে কিন্তু একবারও আপনারা গাড়ী নিয়ে বাইরে কোথাও গেলেন না।

তোমার দাদার বলে সময় হয় না।

সামনের সপ্তাহেই ত দাদার তিন দিন ছুটি।

কেন?

এ্যানুয়াল কনফারেন্সের জন্য বেশী খাটতে হয়েছে বলে সামনের সপ্তাহে দাদার ডিপার্টমেন্টের সব অফিসারদের তিন দিন ছুটি।

ছুটির কথা তোমাকে কে বললো?

অফিসেই শুনেছি।

আজ?

আজ না। কনফারেন্স শেষ হবার দিনই সব অফিসারদের বলে দেওয়া হয়েছে।

অথচ তোমার দাদা আমাকে কিছু জানান নি।

হয়ত ভুলে গিয়েছেন।

তোমার দাদার সব কথা মনে থাকে; শুধু ছুটির কথা বলতেই ভুলে যান!

বিহারী হাসে।

একটু চুপ করে থাকার পর মিসেস সরকার জিজ্ঞাসা করেন, সামনের সপ্তাহে কোন্ তিন দিন ছুটি জান?

বৃহস্পতি - শুক্র - শনি।

তার মানে ত চারদিন ছুটি।

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পর বিহারী বলে, এই বছরে কোম্পানীর অনেক মাল বিক্রী হয়েছে বলে এই ছুটির সময় বাইরে বেড়াবার জন্য বোধহয় কোম্পানী থেকেই খরচ দেবে।

এসব কিছু আমাকে বলে না।

দাদা যেন জানেন না আমি আপনাকে বলেছি।

জানলেই বা কি হবে?

না, না, বৌদি, দাদাকে আমার কথা বলবেন না।

আচ্ছা বলব না।

মিঃ সরকার গাড়ীতে বসতেই বিহারী জিজ্ঞাসা করল, সোজা বাড়ী যাব?

হ্যাঁ।

পার্ক স্ট্রীট ছাড়িয়ে লাউডন স্ট্রীটে ঢুকতেই বিহারী বললো, দাদা, একটা কথা বলব?

কি?

কাল বৌদির জন্মদিন। কিছু কিনবেন না?

দেখেছ! একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

গাড়ী ঘুরিয়ে নেব?

চল গড়িয়াহাট ঘুরে যাই।

গড়িয়াহাটেই যখন যাচ্ছেন তখন ঢাকুরিয়ার দাদা-বৌদিকে কাল আসার কথা বলে আসবেন কি?

মিঃ সরকার একটু হেসে বললেন, বিহারী তুমি ফিয়ারিং না ধরলে যে আমার সংসার করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কি যে বলেন দাদা!

দাখ বিহারী, স্ত্রী-পুত্রকে শুধু অন্নবস্ত্র দিলেই সংসারে শান্তি আসে না। এইরকম ছোটখাট দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করলেই সংসারে শান্তি পাওয়া যায়।

একটু পরে মিঃ সরকার বললেন, ভাল কথা বিহারী, সামনের আঠারই আমাদের চৌধুরীর বাবা-মার বিয়ের ডায়মন্ড জুবিলী। তার আগে তোমার বৌদিকে নিয়ে একটা ভাল ধুতি আর শাড়ী কিনে আনার কথা মনে করিয়ে দিও ত।

দেব।

খোকনের অন্নপ্রাশন হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে চা-জলখাবার খেয়ে সবাই মিলে গল্পগুজব হচ্ছিল। হঠাৎ মিঃ সরকারের মা বললেন, যে যাই বল, বিহারী না থাকলে কাল একটা কেলেঙ্কারী হতো।

শিবানী হাসতে হাসতে বললেন, তোমার আদুরে ছেলে শুধু চাকরি করতে জানে। কোনমতে একদিন টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করেছিল ঠিকই কিন্তু ওকে নিয়ে সংসার করা যে কি দায়, তা আমি আর বিহারী ছাড়া কেউ জানে না।

শিবানীর মা বললেন, এই বয়সের ছেলেরা কোন কালেই সংসারী হয় না। আরো দুটো-একটা ছেলেমেয়ে হোক, তারপর নিশ্চয়ই সংসারী হবে।

শিবানী একটু জোরেই হাসলেন। তারপর বললেন, এই খোকন হবার সময় আমার যা শিক্ষা হয়েছে তাতে আমার আর ছেলেমেয়ে হয়ে কাজ নেই।

মিঃ সরকারের দিদি মীনা বললেন, যাইহোক • শিবানী, আমি এবার বিহারীকে নিয়ে যাচ্ছি। চা বাগানে থাকতে হলে বিহারীর মত একজন অল রাউন্ডার দরকার।

দিদি, তুমি কি আমার এই উপকারটুকু করার জন্যই দার্জিলিং থেকে এসেছ?

আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়—
উত্তরা - পূরবী - উজ্জলায়
শ্রীমা চিত্র পরিবেশক পরিবেশিত

যান্ত্রিক পরিচালিত

সত্য • অনুপ • অরুণ • চিন্ময় • মন্টু
অজিত • দিপ্তা • কানাই • গীতা • সুজা
মিঠু
কাহিনী শ্রীআশুতোষ মুখার্জী • রবীন চ্যাটার্জী
সঙ্গীত

তুই বল শিবানী, ঐ মহাদেব নেশাখোর স্বামীকে নিয়ে চা বাগানে থাকা যায়?

মীনার কথায় সবাই হাসেন।

মীনা বললেন, তোমরা হাসছ কিন্তু যে লোকটা অফিস আর তাসের আড্ডা ছাড়া আর কিছু জানে না, তাকে নিয়ে ...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মিঃ সরকারের ছোট বোন বীণা বললেন, দিদি, বিহারীকে বৌদি ছাড়বে না। তুই বরং আমার বরটাকে নিয়ে যা।

মীনা একবার অজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, অজয় ত একটা ক্লাউন। ওকে নিয়ে কে সংসার করবে?

অজয় সঙ্গে সঙ্গে শিবানীকে বললো, ডার্লিং, এই অপমানের পর এক্ষুনি চারটে রসগোল্লা আর পর পর দু কাপ চা না খেলে আমি আর বাঁচব না।

ইণ্ডিয়া কিং সিগরেট চাই না?

আমি কি সুহাসদার মত নেশাখোর?

তাও ত বটে!

হন্তদন্ত হয়ে বিহারী এসে শিবানীকে বললো, বৌদি, ছ'শ টাকা দিন।

শিবানী রেগেই বললেন, আমি টাকা পাব কোথায়? তোমার দাদার কাছ থেকে নাও।

বিহারী হেসে বললো, কালো হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে এখন দিন। পরে আমি...

দ্যাখ বিহারী, তুমিও তোমার দাদার মত বেশ ওস্তাদ হয়ে গেছ।

এখন দিন। পরে আমি ঠিক দিয়ে দেব।

শিবানী উঠে ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, তোমার দাদা বুঝি ভয়ে এলেন না?

দাদা একটু কাজে বেরিয়েছেন।

বাজে বকো না। এক মিনিট আগে ওর গলা শুনলাম আর.....

অজয় বললেন, ডার্লিং, আমার টাকাটাও এনো।

শিবানী ঘুরে দাঁড়িয়ে অজয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এক লাখ টাকাই আনব?

না, না, হাজার খানেক...

শিবানী মীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, জান দিদি, তোমাদের এই জামাই গতবার কলকাতা এসে কি রকম ফোর-টোয়েন্টি করে আমার...

ডার্লিং, তুমি সে টাকা পাওনি? আমি ত ফিরে গিয়েই তোমাকে চেক পাঠিয়েছিলাম।

ব্যাঙ্ক অফ বে অফ বেঙ্গলের চেক আমার দরকার নেই।

শিবানীর কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

আস্তে আস্তে সবাই চলে গেলেন। সবার চিঠিই সংসার ও এলো। সবাই চিঠিতে বহুবার কথা লিখেছেন।

কদিন পরে শিবানী ওকে বললেন, বিহারী, চিঠিতে সবাই তোমার কথা লিখেছেন। মীনাদি আর অজয় লিখেছে তোমাকে নিয়ে ওদের ওখানে ঘুরে আসতে।

সত্যি বৌদি, একবার ঘুরে এলে হয়।

ওরা এত করে বলেছে যে না গেলে অত্যন্ত অন্যায় হবে।

যাইহোক, খোকনের অন্নপ্রাশনের জন্য আপনাদের সব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল।

তোমাকে ত সবারই খুব ভাল লেগেছে।

ভাল কথা বৌদি, আপনাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে আমার কত আয় হয়েছে জানেন?

আয় হয়েছে নাকি?

তিনশ' দশ টাকা পেয়েছি।

দেড়শ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিও।

না বৌদি, এ টাকা থেকে কিছু ব্যাঙ্কে রাখতে পারব না?

কেন?

সংসারের বইপত্তর কিনতে হবে। তাছাড়া এবার শীতে লেপ-তোষক না করালে...

পুরো টাকাই লাগবে?

হুঁ বৌদি।

ঠিক আছে, আমি তোমাকে একশ টাকা দেব। এই একশ টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেবে।

আপনাদের দয়ায় খেয়ে-পরে বেঁচে আছি। আপনি আবার টাকা দেবেন কেন?

খোকনের অন্নপ্রাশনে এত খাটা-খাটনি করলে...

দাদা ত আমাকে ধুতি-সার্ট কিনে দিয়েছেন। আবার...

এত বড় একটা কাজ তুমি উদ্ধার করে দিলে আর তোমাকে কিছুই দেব না? তাই কি হয়?

দুদিন পরে বিহারী বললো, বৌদি, ব্যাঙ্কে আমার জমেছে জানেন?

কত?

চোদ্দ শ' পঞ্চাশ।

এর একটি পয়সায় তুমি হাত দেবে না।

বিহারী হাসে।

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী খোকনের অন্নপ্রাশনের কথাই আলোচনা করছিলেন।

জান শিবানী, আমি আগে ভীষণ নার্ভাস ছিলাম।

কেন?

এত লোকজন নেমন্তন্ন করে যদি কোন কেলেঙ্কারী হয়, সেই ভেবেই আমি মনে মনে খুব নার্ভাস ছিলাম।

আর আমরা নেমন্তন্ন করতে ত কাউকে বাদ দিই নি।

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, অফিসের লোকজন—এদের বাদ দেওয়া ত যায় না।

যাইহোক, বেশ ভালয় ভালয় সব হয়ে গেল।

তবে হ্যাটস অফ টু চৌধুরী আর বিহারী।

চৌধুরীদা বড় বাড়ীর ছেলে। অনেক কাজকর্মের অভিজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু বিহারী যে এসব কাজেও এত একসপার্ট, তা আমি ভাবতে পারিনি।

আমিও কল্পনা করতে পারি নি।

আমি ওকে একশ টাকা দিয়েছি।

খুব ভাল করেছ। ও ডেকরেটর আর মিষ্টির দোকানের বিল থেকে কত টাকা বাঁচিয়েছে জান?

কত?

দুশ পঁচাত্তর টাকা।

তুমি হলে একটা পয়সাও বাঁচাতে পারতে না।

অসম্ভব।

তাছাড়া বিহারী খোকনকে কি দারুণ ভালবাসে, তোমাকে কি বলব।

হ্যাঁ, খোকন ওর খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। আই মাস্ট ডু সামথিং ফর বিহারী।

কি করবে?

আমাদের অফিসের সব ড্রাইভারের এ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স আছে। অফিসই প্রিমিয়াম দেয়। অফিসারদের ড্রাইভারদের এ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স করলে অফিস থেকে অর্ধেক প্রিমিয়াম দেবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ভাবছি, বাকি অর্ধেক প্রিমিয়াম আমি দিয়ে ওরও একটা .....

খুব ভাল হবে। হাজার হোক কলকাতা শহরে ড্রাইভারী করা! কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।

তা ত বটেই

দেখতে দেখতে খোকন তিন বছরের হলো। বিহারী কদিন আসছে না। খোকনকে রোজ বিকেলে গাড়ীতে বসাতেই হবে। ও স্টিয়ারিং নেড়ে-চেড়ে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দেয়।

সেদিন বিকেলে মিঃ সরকার অফিস থেকে ফিরতেই শিবানী বললেন, জান, একটু আগে বিহারী এসে খবর দিয়ে গেল ওর একটা মেয়ে হয়েছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বিহারী খুব খুশী।

ছেলেটা এত বড় হবার পর মেয়ে হল, খুশী হবারই ত কথা। খোকন আরো একটু বড় হবার পর তোমার একটা মেয়ে হলে আমিও কি কম খুশী হবো?

অত সখ খায় না।

খায় না মানে? আমাদের একটা মেয়ে হবে না?

একটা হবার ঠেলাতেই আমার জান বেরিয়ে গেছে। ন্যাড়া বেলতলায় বার বার যায় না।

তাই বলে.....

ন্যাকামী করো না। ঐ কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারব না।

খুব কষ্ট হয়?

কষ্ট হবে কেন? এত আরাম লাগে যে.....

শিবানী চলে গেলেন।

পরে চা খাবার সময় মিঃ সরকার বললেন, শিবানী, বিহারীর মেয়েকে একদিন দেখে এসো।

তুমি যাবে না?

না, না, আমি গেলে ওর স্ত্রী লজ্জা পাবে।

তা ঠিক।

কদিন পরে বিহারী শিবানীকে বললো, বৌদি, এবার দাদাকে গাড়ী চালান শিখিয়ে দিই?

কেন?

আমি দু'চার দিন না থাকলে দাদার খুব অসুবিধে হয়।

কেন? অফিসের গাড়ীতেই ত যাতায়াত করেন।

অফিস যাতায়াত চলে যায় ঠিকই কিন্তু আর ত কোথাও যেতে পারেন না।

এই বয়সে গাড়ী চালাতে গিয়ে...

দাদার কি এমন বয়স হয়েছে? অফিসের সাতজন ডেপুটি ডিভিশনাল ম্যানেজারের মধ্যে দাদার বয়স সব চাইতে কম।

শেখাবে শেখাও কিন্তু তোমার দায়িত্ব।

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না বৌদি। আমি তিন মাসের মধ্যে দাদাকে এমন গাড়ী চালান শিখিয়ে দেব যে তখন আমি বড় জামাইবাবুদের টি গার্ডেনে চাকরি নিয়ে চলে...

শিবানী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি খোকনকে ছেড়ে যেতে পারবে?

বিহারী জবাব দিতে পারে না। শুধু হাসে।

মাস চারেক পরের কথা।

স্টিয়ারিংএ মিঃ সরকার, পাশে বিহারী, পিছনে শিবানী আর খোকন।

দক্ষিণেশ্বর হয়ে গান্ধীঘাট। সেখান থেকে ঢাকুরিয়া হয়ে বাড়ী।

শিবানী হাসতে হাসতে বললেন, বিহারী, তোমার ছাত্র অনার্স নিয়েই পাশ করলেন।

—তিন—

দিনগুলো বেশ কাটছে। মিঃ সরকার ডিভিশনাল মানেজার হয়েছেন। বোম্বে বদলী হবার কথা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই থেকে গেছেন। মাঝে অবশ্য এক বছরের জন্য পাটনা যেতে হয়েছিল; তবে শিবানী বা খোকনকে নিয়ে যান নি। ওরা পাটনা গেলে খোকনের পড়াশুনোর গন্ডগোল হতো। মিঃ সরকার প্রত্যেক মাসে একবার আসতেন। বিহারী ছিল বলে শিবানীর কোন অসুবিধে হয় নি। তাছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ী মাস ছয়েক ছিলেন।

বিহারীকাকা, শুনে যাও। পড়ার ঘর থেকেই খোকন বিহারীকে ডাকে।

কিরে খোকনা?

কাছে এসো। কানে কানে বলব। খুব প্রাইভেট কথা।

মিঃ সরকার হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বললেন, শিবানী, তোমার ছেলের মাথায় কোন মতলব এসেছে।

শিবানীও হাসেন। বলেন, বিহারী আদর দিয়ে দিয়েই ছেলেটার বারোটা বাজাবে।

বিহারী কোন মতে হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বললো, আমি কি করলাম বৌদি?

না, না, তুমি কি করবে? তুমি কিচ্ছু করনি।

বিহারী কিছু বলার আগেই আবার খোকন ডাকল, কি হলো বিহারীকাকা? এলে না?

মিঃ সরকার খোকনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এখানে এসে বলে যাও না!

আমি যে পড়ছি।

খোকনের জবাব শুনে এরা তিন জনেই হাসেন।

বিহারী আর দেরী না করে খোকনের কাছে যায়। খোকন কানে কানে ফিস ফিস করে বলে। বিহারীও ওর কানে কানে জবাব দেয়।

বিহারী ড্রইংরুমে ফিরে আসতেই ওরা দুজনে ওর দিকে তাকালেন। বিহারী একটু হেসে খুব চাপা গলায় ফিস ফিস করে বললো, আজ গেমস পিরিয়ডে খোকনের কেডস জুতোটা কে ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছে।

শিবানী বললেন, তাই নাকি?

মিঃ সরকার বললেন, এর আগের মাসেই ত.....

যাক্‌গে। ওকে কিছু বলবেন না। বৌদি, আমাকে দশটা টাকা দিন। ওর একজোড়া মোজাও কিনতে হবে।

শিবানী বললেন, ওর কি মাসে মাসেই এক জোড়া জুতো-মোজা লাগবে?

ছেলেরা বাঁদর দুষ্টুমি করে, ও কি করবে? বিহারী এক নিশ্বাসেই বলে, তাছাড়া যে গরু দুধ দেয়, তার চাটিও ভাল লাগে।

মিঃ সরকার হাতের খবরের কাগজ না নামিয়েই বললেন, খোকনের সব ব্যাপারেই বিহারীর ঐ এক যুক্তি।

শিবানী বললেন, ছেলে আমার কি এমন বিদ্যাসাগর হয়েছে যে...

ওকথা বলবেন না বৌদি। খোকনের মত ছেলে ওদের ক্লাশে আর একটাও নেই।

আবার ও ঘর থেকে খোকনের গলা শোনা গেল, বিহারীকাকা, আমার পড়া হয়ে গেল।

এবার শিবানী হাসেন। সোফা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, নতুন জুতো-মোজা কেনার জন্য আর পড়ায় মন বসছে না।

খোকন আরো বড় হয়।

সকাল বেলায় স্কুল যাবার সময় বিহারীকে বলে, বিহারীকাকা, তুমি ঠিক তিনটের মধ্যে বাড়ী চলে এসো। সাড়ে তিনটের মধ্যে মাঠে না পৌঁছলে ভাল জায়গা পাব না।

তুমি স্কুল থেকে বাড়ীতে এসেই একবার ফোন করো।

না, না, আমি বাবাকে ফোন করব না। অফিসে ফোন করলেই বাবা রেগে যায়।

তাহলে বৌদিকে বলো।

মার তখন ঘুমবোর সময়। মাকে ফোন করতে বললে মাও রেগে যাবে। তুমি চলে এসো।

বিহারীকে আসতেই হয়। না এসে পারে না।

সন্ধ্যের পর মাঠ থেকে ফিরে এসেই বিহারী বলে, বৌদি, এক বাটি সরষের তেল দিন।

সরষের তেল কি হবে?

খোকনা আমার কাঁধ-পিঠ মালিশ করবে।

শিবানী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, কেন? কি হয়েছে?

পূজায়—পোষাকের অভিনব সমাবেশ!
বরদীপ
• বেনারসী
• জোড়
• সিল্ক • তাঁত
• মিল বস্ত্র
• পোষাক
• শার্টিং • সুটিং
• ড্রিপ্ট কাগড়
৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

বিহারী একবার খোকনের দিকে তাকিয়ে বলে, এত বড় বুড়ো ধাড়ী ছেলেকে কাঁধে করে খেলা দেখাতে হলে.....

খোকন আর চুপ করে থাকে না। বলে, বিহাইকাকা, অযথা আমাকে দোষ দেবে না।

তবে কাকে দোষ দেব খোকনা?

খোকন এবার মাকে বলে, জান মা, বিহাইকাকাই আমাকে বললো, খোকনা, আমার কাঁধে চড়। তা নয়ত কিছু দেখতে পাবি না।

বেশ চলছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল।

এ্যাকসিডেন্ট!

মিঃ সরকারের টেলিফোন পেয়েই শিবানী প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন, এ্যাকসিডেন্ট! তোমার?

না, না, আমি গাড়ীতে ছিলাম না। বিহারী.....

বিহারী নেই?

আছে আছে। তবে হাসপাতালে....

কোথায় এ্যাকসিডেন্ট হলো?

আমার এক কলিগকে নিয়ে টিটাগড়ের কারখানায় যাবার পথে...

তোমার কোন কলিগ?

মিত্তির। তার কিছু হয় নি।

কিভাবে এ্যাকসিডেন্ট হল?

একটা লরী এ্যাকসিডেন্ট করে পালাবার সময় আমার গাড়ীতে এমন ধাক্কা লাগিয়েছে যে.....

বিহারীর কোথায় লেগেছে?

বোধহয় বুকের দুতিনটে হাঁড় ভেঙ্গেছে আর ডান হাতটা.....

ডান হাত নেই?

আছে তবে বোধহয় কিছু কাটাকুটি করতে হবে।

কি সর্বনাশ!

যাই হোক আমি আবার এক্ষুণি হাসপাতালে যাচ্ছি.....

তুমি একলা?

না, না, অফিসের অনেকেই হাসপাতালে আছে।...

কোন হাসপাতালে?

আর, জি, করএ। যাই হোক খোকনকে কিছু বলো না। ও শুনলে.....

আমি হাসপাতালে আসব?

এখন, গিয়ে কোন লাভ নেই। বিহারীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছে।

দিন পনের পরে খোকনকে রেখেই বিহারী কাঁদতে কাঁদতে বললো, খোকনা, ছুটির ঘন্টা পড়লেও যেতে পারলাম না। তোর জন্য থেকে যেতে হল।

খোকন কাঁদতে কাঁদতে বললো, বিহাইকাকা, আমার আর গাড়ী চালান শেখা হল না।

দাদা দেখাবেন।

না বিহাইকাকা, আমি অন্য কারুর কাছে শিখতে চাইব না।

নারে খোকনা, ঐ আগুনে চাড়িয়ে তোকে আমি নার্সিং হোম থেকে এনেছিলাম। তোকে ঐ গাড়ী চালাতেই হবে।

না বিহাইকাকা, আমি ও গাড়ীর ষ্টিয়ারিং টাচ করব না, কোনদিনও না। তুমি দেখে নিও।

তিনমাস কেটে গেল।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার আগের দিন বিহারী মিঃ সরকার আর শিবানীর দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি বাড়ী গিয়ে কি করব দাদা? বৌদি, কিভাবে আমার সংসার চলবে?

মিঃ সরকার বললেন, অত চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু যার ডান হাতের চারটে আঙুল নেই, সে কি কাজ করবে?

শিবানী বললেন, তোমার দাদা আর চৌধুরীদা যখন আছেন তখন তুমি অত ভাবছ কেন?

এই তিনমাস হাসপাতালে আসা-যাওয়া করার জন্য বিহারীর স্ত্রী মিঃ সরকারের সামনে একটু আধটু কথা-বার্তা বলেন। বলতেই হয়। না বললে চলে না। উনি বিহারীকে বললেন, চৌধুরী সাহেব আর দাদা-বৌদি যখন আছেন তখন আমিই সংসার চালিয়ে নেব, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

আমাকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনতে ওঁরা যা করলেন, তারই কোন তুলনা হয় না। ওঁরা আর কত করবেন?

চৌধুরীদের পুরানো গ্যারেজ আর ড্রাইভারের থাকার ঘর মেরামত হল। সামনের দিকে ছোট্ট মুদিখানা দোকান বিহারীলাল ষ্টোর্স আর পিছনেই ওদের থাকার ব্যবস্থা। বিহারীর ছেলে সন্তোষ ক্লাশ টেন-এ উঠেছে। ও আগের মতই পড়তে লাগল। বিহারী দোকান চালায়। ওর স্ত্রী সংসার চালায় আর স্বামীকে দেখে। বিহারীর মেয়ে কালীকে শিবানী নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

মিঃ সরকার বললেন, যাই বল বিহারী, তোমার মেয়ে এমন কিছু কালো নয় যে ওকে কালী বলে ডাকতে হবে।

দাদা, ও কালো না?

না, ও শ্যামবর্ণ।

বিহারী হেসে বলে, কালী যদি শ্যামবর্ণ হয়। তাহলে আমি ফর্সা।

কালী একটা সোনার টুকরো মেয়ে। তাই আমি ওর নাম দিয়েছি সোনালী।

সোনালী!

হ্যাঁ সোনালী।

স্নেহ বড় বিচিত্র সম্পদ। স্নেহ দিয়ে বনের পশুকেও বশ করা যায়। সোনালীকে ত যাবেই।

সোনালী!

কি জেঠামনি?

বড়মাকে বলে আর আমি পরশুদিন চিড়িয়াখানা যাব। বাড়ীতে ফিরতে.....

তুমি একলা যাবে জেঠামনি?

আর কে যাবে?

আমি আর খোকনদা যাব না?

ওখানে বাঘ-সিংহ আছে। তোমাদের ভয় করবে।

তোমার ভয় করবে না?

করবে তবে অল্প অল্প।

তোমার অল্প ভয় করবে কেন?

আমি যে বড় হয়েছি।

সোনালী একবার নিজেকে আপাদ-মস্তক দেখে বললো, আমিও বড় হয়ে গেছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ জেঠামনি, আমি বড় হয়ে গেছি?

কি করে বুঝলে?

আমাকে মা-বড়মা কেউ কোলে নিতে পারে না।

পারে না?

সোনালী মাথা নেড়ে ছোট্ট দুটো বিনুনি দুলিয়ে বললো, না! পারে না।

তাহলে আমার সোনালী সত্যি বড় হয়েছে।

তাছাড়া আমি ত লুডো খেলাও শিখে গেছি।

সত্যি?

আমি মিথ্যে কথা বলি না। বড়মা বলেছে মিথ্যে কথা বললে জিভে ঘা হয়।

রবিবার সবাই মিলে চিড়িয়াখানা গেলেন। বাড়ী ফেরার পথে বিহারীর ওখানে।

গাড়ী থামতেই সোনালী চিৎকার করল, বাবা, আমি হাতির পিঠে চড়েছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ বাবা।

খোকনা, তুই চড়েছিস?

তুমি এর মধ্যেই ভুলে গেলে বিহাইকাকা? তুমি আমাকে শুঁড় ধরে চড়িয়েছ, মনে নেই?

আজ চড়েছিস?

চড়েছি।

সোনালী দৌড়ে ভিতরে গিয়ে মাকে খবরটা দিয়েই আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। পিছন পিছন ওর মা।

মিঃ সরকার হেসে বললেন, সোনালী বড় হয়ে গেছে। আর আমাদের চিন্তা নেই। ও বাঘ-সিংহ দেখেও ভয় পায় না, তাছাড়া লুডো খেলাও শিখে গেছে।

চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংহ দেখে কেউ আবার ভয় পায় নাকি?

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, সন্তোষ কোথায়?

বৌদি, ও আজকাল এই পাড়ারই একটা ছেলের কাছে পড়তে যায়। সেখানেই গেছে।

দোকান কেমন চলছে?

এক পয়সা ভাড়া ত দিতে হচ্ছে না, আর দাদা টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দেওয়ায় মালপত্তর যোগাড় দিয়েছেন। তিনজনের মোটামুটি চলে যাচ্ছে।

বিহারীর স্ত্রী বললেন, আগের মত এখন আর অত ঘাবড়ে যান না। দোকান ত উনি একলাই চালিয়ে নিচ্ছেন।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর শিবানী বললেন, সোনালী, আজ এখানে থাক। কাল বিকেলে তোর জ্যেঠামনি নিয়ে যাবে।

ঠিক নিয়ে যাবে ত?

মিঃ সরকার হাসতে হাসতে বললেন, তুই না থাকলে এই বুড়োকে কে দেখবে?

তুমি মোটেও বুড়ো হও নি।

রওনা হবার আগে বিহারী একবার গাড়ীটা দেখে, স্টিয়ারিংটা নাড়াচাড়া করে। তারপর বলে, বৌদি, দাদাকে যদি গাড়ী চালান না শেখাতাম তাহলে আজ কত অসুবিধে হতো বলুন ত!

দিন আরো এগিয়ে চলে। সোনালী আরো কাছে আসে, আরো আপন হয়। তারপর একদিন স্কুলে ভর্তি হয়। ভোরবেলায় যায়। দশটায় ছুটি। দুপুরে বড়মার কাছে বসে পরের দিনের পড়াশুনো করে নেয়। কখনও খোকনের সঙ্গে গল্প করে, লুডো খেলে। নয়ত ক্যারাম। খেয়াল হলে ডাইনিং টেবিলে টেবিল টেনিস।

আজ সোনালীর জন্মদিন। আজ স্কুলে যায় নি। ভোরবেলায় উঠে স্নান করে নতুন জামা পরে জেঠামনি, বড়মা, খোকনদাকে প্রণাম করে। আশীর্বাদ নেয়। তারপর অফিস যাবার সময় মিঃ সরকার ওকে বাবা-মার কাছে পৌঁছে দেন। পরের দিন সকালে সন্তোষ পৌঁছে দিয়ে যায়।

দিনগুলো বেশ কেটে যায়। দেখতে দেখতে বছরের পর বছর পার হয়।

জানলায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে মিঃ সরকারের গাড়ী দেখেই সোনালী দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে কেটলি গ্যাসে চড়িয়ে দেয়। তারপর উনি গলিটা পার হয়ে বাড়ীর সামনে গাড়ী থামতে না থামতেই সোনালী গ্যাস বন্ধ করে কেটলির মধ্যে চা ফেলে দেয়। উনি ঘরে বসতে না বসতেই সোনালী ট্রেতে দু কাপ চা আর চারটে বিস্কুট নিয়ে ঢোকে। শিবানী চা-বিস্কুট নামিয়ে সেন্টার টেবিলে রাখতে রাখতে বলেন, আমার মেয়ে তোমাকে কি রকম ভালবাসে?

মিঃ সরকার সোনালীকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুই আমাকে সত্যি ভালবাসিস?

সোনালী একটু হেসে মাথা নাড়ে।

আমি তোকে একটুও ভালবাসি না।

সোনালী বেশ গম্ভীর হয়ে বললো, জেঠামনি, তুমি মিথ্যে কথা বলবে না। মিথ্যে কথা বললে জিভে ঘা হবে আর বড়মা খুব রাগ করবে।

আমি মিথ্যে কথা বলছি না। আমি সত্যি তোকে একটুও ভালবাসি না।

ভাল না বাসলে আমার ছবি অত বড় করে শোবার ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছ কেন?

সোনালীর কথায় ওরা দুজনই হাসেন।

সোনালী ভিতরে চলে যাবার পর শিবানী বললেন, সোনালী সত্যি তোমাকে খুব ভালবাসে। তোমার আসার সময় হলে ও যেভাবে জানলায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তা দেখে আমিই অবাক হয়ে যাই।

মিঃ সরকার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, তা ঠিক। আমার সব-কিছু খুটিনাটি ব্যাপারেও ওর নজর আছে।

শিবানী হেসে বললেন, আজ স্কুল থেকে ফিরে আমাকে কি বলছে জান?

কি?

বলছে, বড়মা, একটা লোকের পায় খুব সুন্দর একটা জুতো দেখলাম। জেঠামনিকে ঐ রকম জুতো কিনে দেবে? ঐ রকম জুতো পরলে জেঠা-মনিকে খুব সুন্দর দেখাবে।

মিঃ সরকার হাসেন।

শিবানী চা খেতে খেতে বলেন, সেদিন ঢাকুরিয়ায় দাদাকে লখনৌ চিকনের পাঞ্জাবি পরতে দেখেই মেয়ে ধরল, বড়মা, জেঠামনিকে ঐ রকম পাঞ্জাবি তৈরী করে দাও।

তাই বুঝি তুমি লখনৌ চিকনের পাঞ্জাবি কিনে আনলে?

সীমান্তের পটভূমিকায় রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে অনাথ আশ্রমের এক সিস্টার ও ৩৭টি শিশু শহীদের মানবিক আবেদন-ভরা মর্মস্পর্শী কাহিনী।

মুক্তি আসন্ন!

বিশ্ব পরিবেশনায় : 'সিস্টার ফিল্মস', 'কমার্স হাউস' রুম নং ৩, ৫ম তল, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৫৯৮৩

কি করব? সোনালী এমন করে ধরল যে না কিনে পারলাম না।

আজকাল আর খোকনের সঙ্গে ঝগড়া করে না?

না, আজকাল আর ঝগড়া হয় না। একটু বেশী তর্ক হলেই আমার কাছে ছুটে আসে।

বাড়ীতে একমাত্র ছেলে বা মেয়ে সব সময় একটু বেশী আদুরে, একটু খামখেয়ালী হয়। সোনালী এসে সেদিক থেকে খোকনের উপকারই হবে।

প্রথম প্রথম খোকনের মধ্যে একটু দ্বিধা ছিল।

দ্বিধা মানে?

মানে, ও ভাবত ড্রাইভার বিহারীর মেয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা চলে গেছে। এখন ওকে ঠিক নিজের বোনের মতই ভালবাসে।

দরজার ওপাশ থেকে সোনালী বললো, জেঠামনি, অফিসের জামা-কাপড় ছাড়বে না?

ওর কথায় ওরা দুজনেই হাসেন।

মিঃ সরকার ওকে ডাকেন, সোনালী, শুনে যা।

সোনালী ঘরে ঢুকে বলে, কী বলছ জেঠামনি?

সোনালীকে কোলে বসিয়ে মিঃ সরকার বললেন, এত খিদে লেগেছে যে উঠতে পারছি না।

আজ লাঞ্চের সময় কিছু খাও নি?

নারে।

কেন?

এত কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে কিছুতেই উঠতে পারলাম না।

তার পরেও কিছু খেতে পারলে না।

মিঃ সরকার ঠোঁট উল্টে বললেন, লাঞ্চের পর কি আর সময় হয়?

তাই বলে না খেয়ে কেউ কাজ করে নাকি? সোনালী উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে টানতে টানতে বলে, আর বক বক না করে এবার উঠে পড়ো।

মিঃ সরকার সোনালীকে কোলে তুলে নিয়েই বলেন, আমাদের সোনালী বেড়াতে যাবে মানালী

করে না হেয়ালি

আছে একটু খামখেয়ালী।

— চার —

মিঃ সরকার বাড়ী ফিরতেই খোকন প্রণাম করল। ছেলেকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, এই ক' মাসে তুই বেশ লম্বা হয়েছিস ত।

শিবানী বললেন, ছেলের পায়ের দিকে তাকালেই বুঝবে কেন এত লম্বা হয়েছে।

মিঃ সরকার ছেলের পায়ের দিকে তাকাতেই সোনালী বললো, হস্টেলে গিয়ে খোকনদার অনেক কায়দা বেড়েছে।

খোকন সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথায় একটা চাঁটি মেরে বললো, আবার ফড় ফড় করছিস?

তোমার কায়দা বেড়েছে বলব না?

কিছু কায়দা বাড়েনি।

তোমার মাথার চুল আর পায়ের জুতো দেখে ত আমি প্রথমে...

আবার?

ড্রইংরুমে চা খেতে খেতে গল্প-গুজব হয়। হঠাৎ মিঃ সরকার বললেন, শিবানী চল আমরা সবাই মিলে সপ্তাহ খানেকের জন্য পুরী ঘুরে আসি।

তুমি ছুটি পাবে?

তা পেয়ে যাব।

খোকন বললো, আগে জানলে আমি পুরী পর্যন্ত কনসেশন নিতে পারতাম।

মিঃ সরকার বললেন, সে আর কি হবে।

শিবানী বললেন, রেল কোম্পানীকে অযথা কতকগুলো টাকা দিতে হতো না।

খোকন হেসে বলে, আমি একবারও বলিনি পুরী টায়ারে সাত না। তবে এবার এসে দেখছি সোনালী বড্ড পাকা পাকা কথা বলছে।

এতক্ষণ পর শিবানী বললেন, তুই ভুল যাস না সোনালী বড় হচ্ছে।

খোকন সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললো, শাড়ী পরেই তোর মাথাটা গেছে।

পরের দিন দুপুরে মিঃ সরকার টেলিফোনে টিকিট হয়ে যাবার খবর দিতেই বাড়ীতে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল।

শিবানী বললেন, সোনালী কাল সুটকেশ-টুটকেশ গুছিয়ে ফেলতে হবে।

আচ্ছা।

দেখ্ সোনালী, বুড়ীদের মত ফালতু উপদেশ দিবিনা...

সোনালী বললো, পুরী ত এক রাত্তিরের জার্নি। আমি আর খোকনদা পুরী টায়ারে চলে যাবো। তোমরা...

খোকন সঙ্গে সঙ্গে সোনালীকে বললো, আবার খোকনদাকে টানছিস কেন?

কেন? তোমার পুরী টায়ারে যেতে লজ্জা করবে? ছাত্রজীবনে বেশী বাবু-গিরি করা ভাল না।

দ্যাখ সোনালী বুড়ীদের মত ফালতু উপদেশ দিবি না।

মিঃ সরকার বললেন, খোকন সোনালী কিছু অন্যায় বলেনি। আমি তোমাদের ফার্স্ট ক্লাশে নিয়ে যেতে পারি ঠিকই কিন্তু দশ-বারো ঘন্টার জার্নির জন্য অযথা এক গাদা টাকা ব্যয় করার কোন দরকার আছে কি?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শিবানী একটু বিশ্রাম নিতে গেলেন। খোকন নিজের ঘরে যেতেই সোনালী এসে জিজ্ঞাসা করল, দেশলাই আনব?

দেশলাই আছে। এ্যাশট্রেটা নিয়ে আয়।

সোনালী ড্রইংরুম থেকে এ্যাশট্রে আনতেই খোকন সিগারেট ধরাল। একটা টান দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, পুরী তোর কেমন লাগে রে?

সমুদ্র বা পাহাড় কারুর খারাপ লাগে নাকি?

পুরী আমার তত ভাল লাগে না।

কেন?

ঐ ভোরবেলায় আর সন্ধেবেলায় ছাড়া ত বেড়াবার উপায় নেই।

মাতৃত্বেই নারীজীবনের পরিপূর্ণতা

সেই সঙ্গে আনে অনেক বেশি দায়িত্ব

নারীকে, স্বামী ও সংসারের প্রতি দৈনন্দিন কর্তব্য ছাড়াও মাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। প্রথম শিশুর আবির্ভাবের পর প্রথম কয়েক বছর, শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্যে একান্তভাবে প্রয়োজন মায়ের আদর যত্ন এবং উপযুক্ত সুসম খাদ্য। কিন্তু এরই মধ্যে যদি আরেকটি শিশু খুব তাড়াতাড়ি আসে, তাহলে কি প্রথমটির প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করা সম্ভব হবে?

এমন কি কোনো উপায় আছে, যার দ্বারা শিশুর জন্ম স্বামী ও স্ত্রীর সুবিধামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়? করার উপায় আছে। সেটা হলো ওর‍্যাল কনট্রাসেপটিভ ট্যাবলেট। জন্মনিয়ন্ত্রণের নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি রূপে ওর‍্যাল কনট্রাসেপটিভ ট্যাবলেট ব্যবহার করা হচ্ছে গত বিশ বছর ধরে। এখন সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ নারী এই পদ্ধতি অনুসরণ করছেন।

অর্গাননের ওর‍্যাল কনট্রাসেপটিভ ট্যাবলেট, লিণ্ডিয়ল ১ মিঃগ্রা, এমনই একটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি যেটা যে কোনো দম্পতির পক্ষেই সুন্দরভাবে গ্রহণযোগ্য।

এই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দৈনিক খরচ মাত্র ষোল পয়সা, এক কাপ চায়ের দামের চেয়েও কম।

যে কোনো ওর‍্যাল কনট্রাসেপটিভ ট্যাবলেট ব্যবহার করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

LYNDIOL 1mg

সহজ নিরাপদ ও অব্যর্থ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

Organon

অর্গানন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
হিমালয় হাউস
৩৮, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

OGC-13 G R BEN

তা ঠিক। রোদ্দুর উঠলে আর সমুদ্রের ধারে যাওয়া যায় না।

তাছাড়া পুরীতে ত আর কোথাও বেড়াবার জায়গা নেই।

জগন্নাথের মন্দির?

মন্দিরে কি লোকে সারাদিন পড়ে থাকবে?

তাহলে অন্য কোথাও যাবার কথা জেঠামণিকে বললে না কেন?

ধারে কাছে আর যাবার জায়গা কোথায়? তাছাড়া বাবা-মার পুরী খুব ভাল লাগে।

পুরী তোমার একেবারেই ভাল লাগে না?

পুরীর সমুদ্রে চান করতে খুব ভাল লাগে।

দু এক মিনিট পরে খোকন জিজ্ঞাসা করল সমুদ্রে চান করতে তোর কেমন লাগে?

ভাল তবে এবার আর করব না।

কেন?

এখন ঐ অত লোকের সামনে চান করা যায়? লজ্জা করবে না?

খোকন সিগারেট টানতে গিয়েও পারে না। হাসে।

হাসছ কেন?

তোর কথা শুনে।

এমন কী হাসির কথা বললাম?

তুই এমনই বড় হয়ে গেছিস যে পুরীর সমুদ্রে আর চান করতেই পারবি না?

গায়ে অত কাপড়-গামছা জড়িয়ে চান করতে বিরক্ত লাগে।

তুই তাহলে সত্যি বড় হয়েছিস।

ভুলে যেও না আমি সামনের বার ছয়ার সেকেণ্ডারী দেব।

খোকন সিগরেট টানতে গিয়েও মাথা নেড়ে জানায় না ভুলে যায়নি।

তাছাড়া জান আমাদের ক্লাশের দুটো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

চোখ দুটো বড় বড় করে খোকন বলে সত্যি?

বড়মাকে জিজ্ঞাসা করো।

তোমাদের ক্লাশের মেয়েরা বিয়ের কি বোঝে?

আমাদের ক্লাশেও অনেক পাকা পাকা মেয়ে আছে। শিউলিটা ত অত্যন্ত বদ হয়ে গেছে।

বদ হয়েছে মানে?

সুকুমার বলে একটা লেফার ছেলের সঙ্গে ওর খুব ভাব। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

তুই কী করে জানলি?

অনেক বন্ধুরা দেখেছে। তাছাড়া দুজন দিদিমণি দেখে ওকে খুব বকাবকি করেছেন।

তাহলে তোর বন্ধুরাও ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।

একটু চুপ করে থাকার পর সোনালী চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললো, আমার এক বন্ধুর তোমাকে খুব ভাল লাগে।

সত্যি?

তুমি বড়মাকে বলো না।

বলব না কিন্তু মেয়েটা কে?

মায়া।

সে আমাকে দেখল কোথায়?

ও ত দু-তিন দিন পর পরই আমার কাছে আসে। আজ সকালেও ত এসেছিল।

ঐ মায়া?

হ্যাঁ।

বিয়ে করবে?

জানি না।

তবে আর কী ভাল লাগল?

সোনালী আবার হেসে বলে, শুধু তোমাকে দেখার জন্যই ও আজ সকালে এসেছিল।

তাই নাকি?

সত্যি বলছি।

আবার কবে আসবে?

তা কি আমাকে বলে গেছে?

দুদিন পর পুরী একসপ্রেস হাওড়া ষ্টেশন ছাড়ার পরই খোকন একটা সিগরেট ধরিয়ে সোনালীকে বললো, বাবা-মার সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাশে না গিয়ে ভালই হয়েছে।

কেন? সিগরেট খেতে পারতে না?

হ্যাঁ। খোকন সিগরেট টান দিয়ে বললো, ট্রেনে উঠেই সিগরেট ধরাতে না পারলে আজকাল একদম ভাল লাগে না।

তবে তখন যে খুব রেগে গিয়েছিলে?

মোটেও রাগি নি।

মিথ্যে কথা বলো না খোকনদা। নিতান্ত জেঠামনি আর বড়মা আমাকে সাপোর্ট করলেন; নয়ত...

দমুখ সোনালী বাবা-মার চাইতে আমি তোকে কম ভালবাসি না।...

তা জানি।

তোর উপর ঠিক রাগ করতে পারি না।

তবে যখন-তখন আমাকে যা তা বলো কেন?

সিগরেটে খুব জোরে একটা টান মেরে খোকন বললো, ও তোকে রাগাবার জন্য।

তুমি বড্ড আমার পিছনে লাগো।

তবে কি বাবা-মার পিছনে লাগব?

সোনালী হাসে।

ট্রেন ছুটে চলেছে। অনেক প্যাসেঞ্জার এর মধ্যেই শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। অন্যেরা কেউ বা খাওয়া-দাওয়া করছেন অথবা গল্পগুজব করছেন।

খোকন আবার সিগরেট জ্বালায়। বলে দ্যাখ সোনালী আজকাল বাবা-মা আমার চাইতে তোকে বেশী ভালবাসেন।

আমি অত বেশী-কম বুঝি না।

তুই কাছে না থাকলে ত বাবার মুখের চেহারাই বদলে যায়।

কি জানি? আমি দেখিনি।

মা একটু চাপা। ঠিক প্রকাশ করতে চান না কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই ধরা পড়ে যান।

তুমি জেঠামনি-বড়মার একমাত্র ছেলে। তোমাকে কি ওরা কম ভালবাসতে পারেন?

কিছুক্ষণ পরে খড়্গপুর আসে। খোকন দুটো কফি কিনে একটা সোনালীকে এগিয়ে দিতেই ও বললো, এখন কফি খেলে ঘুমোব কখন?

একটু অনিয়ম একটু অত্যাচার না করলে বাইরে বেড়াবার আনন্দ কি?

তুমি এই দু বছর হস্টেলে থেকে বেশ বদলে গেছ।

হস্টেলে না গেলেও এই পরিবর্তন হতো।

পরিবর্তন হলেও এতটা হতো না।

এই বয়সটাই পরিবর্তনের বয়স।

তা ঠিক।

এই বয়সে সব ছেলেমেয়েরাই হঠাৎ অদ্ভুতভাবে সব ব্যাপারেই সচেতন হয়ে ওঠে। সবকিছু জানতে চায় বুঝতে চায় একসপেরিমেন্ট করে দেখতে চায়।

সোনালী মুগ্ধ হয়ে খোকনের কথা শোনার পর বলে, তুমি আজকাল কত সুন্দর করে কথা বল।

খোকন হেসে বললো, তাই নাকি?

সত্যি খোকনদা তোমার কথাবার্তার ধরনটা একেবারে বদলে গেছে।

খোকন একটু হাসে। কিছু বলে না।

সোনালী বললো, খোকনদা, পুরীতে গিয়ে আমরা সারা রাত গল্প করব।

আমার সারা রাত আড্ডা দেওয়া অভ্যাস আছে কিন্তু তুই পারবি না।

খুব পারব।

বারোটা-একটার পর তুই ঠিক ঘুমিয়ে পড়বি।

তুমি গল্প করলে আমি কিছুতেই ঘুমোব না।

আর যদিও বা একটা রাত কোনমতে জেগে থাকিস তাহলে তার পরের দিন সকালে ত...

কিচ্ছু হবে না।

আচ্ছা দেখা যাবে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর মিঃ সরকার পরপর দুবার হাই তুলতেই শিবানী বললেন, চল, এবার শুতে যাই। খোকন আর সোনালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যা, তোরাও শুতে যা।

খোকন বললো, এখুনি?

এগারটা বেজে গেছে। আর রাত করিস না।

কিরে সোনালী, তোর ঘুম পেয়েছে নাকি?

সোনালী জবাব দেবার আগেই ওর মা বললেন, ঘুম না পাবার কি হয়েছে? সারা দিন ধরে এত ঘুরাঘুরির পর ঘুম পাবে না।

সবাই উঠে দাঁড়াতেই শিবানী সোনালীকে বললেন, হয় টেবিল লাইট, না হয় বাথরুমের আলোটা জ্বালিয়ে রাখিস।

আচ্ছা।

ঘরে ঢুকেই খোকন জিজ্ঞাসা করল, কিরে সোনালী, ঘুমোবি নাকি?

ঘুমোব না তবে শুয়ে শুয়ে গল্প করব।

কেন?

সারা দিন এত ঘুরাঘুরি করে পা-দুটো বড্ড ব্যথা করছে।

তার মানে তোর ঘুমোনর মতলব।

মোটেও না।

আমি সারা রাত জাগব বলে দশ প্যাকেট সিগরেট কিনে এনেছি।

দশ প্যাকেট!

এক রাত্রেই দশ প্যাকেট লাগবে না তবে চার-পাঁচ প্যাকেট লাগবেই।

খোকনদা, তুমি এত সিগরেট খেও না।

আবার বুড়ীদের মত হিতোপদেশ দিচ্ছিস? হস্টেলে কত ছেলে মদ খায় জানিস?

মদ!

হ্যাঁ মদ। হুইস্কী, রাম।

মদের নাম রাম? সোনালী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

হাসছিস্ কিরে?

মদের নাম রাম শুনেও হাসব না?

সোনালীর বিছানায় পাশাপাশি বসেই ওরা চাপা গলায় কথা বলে। খোকন বললো, আমাদের হস্টেলে মদ খাবার কথা কিভাবে বলা হয় জানিস?

কিভাবে?

বলা হয়, আজ অত নম্বর ঘরে রাম-নাম।

সোনালী শুনে হাসে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তুমি কোনদিন খেয়েছ নাকি?

খাইনি তবে অনেকেই জোর-জুলুম করে।

না, না, তুমি কক্ষনো খাবে না। জেঠামনি-বড়মা জানতে পারলে কেলে-ঙ্কারী হয়ে যাবে।

খাব না ঠিকই কিন্তু খেলেও কি ওরা জানতে পারবে?

একদিন না একদিন ঠিক জানতে পারবে।

খোকন একটা সিগরেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে বললো, দ্যাখ সোনালী, ছেলে-মেয়েরা বড় হবার পর যে কত রাত্রিজল কত বদ হয় তা বাবা-মারা ঠিক আন্দাজ করতে পারে না।

না, পারে আবার না?

সত্যি পারে না। ছেলেমেয়ে সম্পর্কে বাপ-মার এমনই অন্ধ স্নেহ থাকে যে তাদের বেশী খারাপ ভাবতে পারে না।

সোনালী ভাবে।

খোকন সিগরেটে টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছিস?

তোমার কথা।

বেশী দূর যাবার কি দরকার? এই যে আমি আর তুই এখনও গল্প করছি বা আমি একটার পর একটা সিগরেট খাচ্ছি তা কি বাবা-মা পাশের ঘরে থেকেও জানতে পারছেন?

তা ঠিক।

তাহলে ভেবে দেখ, বাড়ীর বাইরে বা হস্টেলে থেকে ছেলেমেয়েরা কি করে, তা বাবা-মা জানবে কি করে?

ঠিক বলেছ। সোনালী আবার কি যেন ভাবে। তারপর খোকনের একটা হাত ধরে বলে, তুমি আমার একটা কথা রাখবে খোকনদা?

কী কথা?

আগে বল রাখবে কিনা।

না জেনে কী করে বলব?

অমৃতাঞ্জন ইনহেলার মুহূর্তে আরাম দেয়—নাক বন্ধ থাকার, নাক দিয়ে অবিরাম জল পড়ার এবং মাথায় সর্দি বসার কষ্ট তাড়াতাড়ি দূর করে। কারণ, সর্দির সঙ্গে যোঝবার ৫টি প্রধান উপাদান এতে আছে, সেজন্য সর্দির হাত থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়া যায়। সর্বদা হাতের কাছে একটি অমৃতাঞ্জন ইনহেলার রাখুন।

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড, ১৪/১৫ লাক চার্চ রোড, মাদ্রাজ ৬০০ ০০৪

অসম্ভব কিছু বলব না।

তাহলে নিশ্চয়ই রাখব।

ঠিক?

আগে এত প্রতিজ্ঞা না করিয়ে কী কথা রাখতে হবে, সেটা ত বল।

তুমি অন্য ছেলেদের মত খারাপ হবে না।

খোকন হেসে বলে, খারাপ হবো না মানে?

মানে এমন কিছু করবে না যাতে তোমাকে কেউ খারাপ বলে।

এ কথার কোন মানেই হল না।

কেন?

সব কাজই একজনের কাছে ভাল, অন্যের কাছে খারাপ।

তবুও মাঝামাঝি একটা কিছু ত আছে।

সেটাও এক এক জনের কাছে এক এক রকম।

সোনালী খোকনকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, তুমি বড্ড তর্ক করো।

খোকন হেসে বলে, আচ্ছা তর্ক করব না কিন্তু তুই কী করতে বারণ করছিস, তা ত বলবি!

বলছি যে তুমি বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কোনদিন মদ-টদ খাবে না।

হুজুগে পড়ে যদি কোনদিন খাই?

হুজুগে পড়েও খাবে না।

কেন খেলে কি হয়েছে? একদিন মদ খেলেই আমি খারাপ হয়ে যাব?

আমি বলছি, তুমি খাবে না।

তুই আমার কে যে তোর কথা আমাকে শুনতে হবে?

সোনালী চমকে উঠল, কী বললে? আমি তোমার কে?

তোর কথা শুনতেই হবে?

না। তুমি শুতে যাও, আমি এবার ঘুমোব।

সারা রাত গল্প করবি না?

না, তুমি শুতে যাও।

হঠাৎ খোকনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে বুঝল, কেউ কাঁদছে। এত রাতে কোথায় কে কাঁদছে, তা ভেবে পেল না। আরো ভাল করে কান পেতে শুনল। খোকন চমকে উঠল, সোনালী কাঁদছে?

তাড়াতাড়ি উঠে ওর কাছে যেতেই কান্নার শব্দ আরো স্পষ্ট হলো।

খোকন ডাকল, সোনালী।

কোন জবাব নেই।

আবার ডাকল, সোনালী, কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?

সোনালী কোন জবাব দেয় না, দিতে পারে না। উপুড় হয়ে শুয়ে আগের মতই কাঁদে।

সোনালী, তোর শরীর খারাপ লাগছে, মাকে ডাকব?

কাঁদতে কাঁদতেই ও জবাব দিল, না। তুমি শুতে যাও।

এবার খোকন ওর পাশে বসে মাথার উপর হাত রেখে বললো, তুই কাঁদছিস আর আমি শুয়ে থাকব?

আমি তোমার কে যে আমার কান্নার জন্য তোমাকে জেগে থাকতে হবে?

এতক্ষণে ওর কান্নার কারণ বুঝতে পেরে খোকন হাসতে হাসতে বললো, হা ভগবান! তুই আমার ঐ কথার জন্য কাঁদছিস?

ছি, ছি, খোকনদা, তুমি ও-কথা বললে কেমন করে? এতকাল পরে তুমি জানতে চাইলে আমি তোমার কে?

খোকন ওর মাথায় পিঠে হাত দিতে দিতে বললো, আমার ঐ সামান্য একটা কথার জন্য...

মিথ্যে কথা বলো না খোকনদা

ওটা তোমার সামান্য কথা হলো?

আচ্ছা আর ও-কথা বলব না। তুই ঠিক হয়ে শো, আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

আমার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি শুতে যাও।

তুই না ঘুমুলে আমি এখান থেকে উঠছি না।

আমি তোমার কে?

খোকন ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের পর মুখ রেখে কানে কানে বললো, তুই আমার সোনা সোনালী!

সোনালী আর পারে না। এক মুহূর্তে কান্না থেমে যায়, অভিমান চলে যায়। হঠাৎ দু-হাত দিয়ে খোকনের কোমর জড়িয়ে ধরে ওর পায়ের উপর মাথা রেখে বলে, যেমন তুমি আমাকে দুঃখ দিয়েছ, তেমন তুমি সারা রাত এইভাবে বসে থাকবে। আমি তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোব।

খোকন একটু অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু বলতে পারে না। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, এইভাবে সারা রাত বসে থাকা যায় পাগলী?

আমি কিছু জানি না।

তুই ঠিক হয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়। আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

সোনালী আরো জোরে ওকে আঁকড়ে ধরে বলে, তোমাকে আমি ছাড়ছি না। ঠিক এইভাবে বসে থাকতে হবে।

খোকন কিছু বলে না। চুপ করে বসে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। বোধহয় আধ-ঘন্টা—পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

সোনালী মুখ তুলে খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললো, কেমন জব্দ!

সোনালী, পা-টা ব্যথা হয়ে গেছে।

হোক।

ওর কথায় খোকন না হেসে পারে না। বলে, সত্যি বড্ড ব্যথা করছে।

তোমার কথায় আমার আরো অনেক বেশী ব্যথা লেগেছিল।

সোনালী, তুই বালিশে মাথা রাখ। আমি একটু হেলান দিয়ে বসি।

তারপর তুমি পালিয়ে যাবে?

সত্যি পালাব না।

ঠিক?

আমি বলছি ত পালাব না।

সোনালী খোকনের হাত দুটো চেপে ধরেছিল। আস্তে আস্তে ওর হাত দুটো আলগা হয়ে গেল। সোনালী ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ সোনালীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। খোকন তখনও ঐভাবে পাশে বসে আছে?

কটা বাজে খোকনদা?

আবছা আলোয় খোকন হাতের ঘড়িটা ভাল করে দেখে বললো, সওয়া চারটে।

এ রাম! তোমাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখলাম! তুমি এখানেই শুয়ে পড়ো, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

আমি আমার বিছানায় যাই।

এখানেই শোও। চিরকাল ত এক বিছানায় শুয়ে মারামারি করেছি। এখন এত লজ্জা কেন?

খোকন শুয়ে পড়ল কিন্তু এতকাল পরে সোনালীর পাশে শুয়েই ওর সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল।

—পাঁচ—

পরের দিন দুপুরে খোকন সোফায় বসে সিগরেট টানছিল। সোনালী বিছানার উপর বসে ভাজা মশলা চিবুতে চিবুতে বললো, কাল রাত্রে তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি, তাই না খোকনদা?

কষ্ট দিয়েছিস নাকি?

এক সেকেণ্ডের মধ্যে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে দেখে আমার এত কষ্ট লাগছিল যে কী বলব।

তুইও ত সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লি।

মোটেও না। আমি আর ঘুমোইনি।

বাজে বকিস না।

সত্যি বলছি আর ঘুম এলো না।

কেন?

সোনালী একটু হেসে বললো, তুমি এমন ক্লান্ত, অসহায় হয়ে আমাকে জড়িয়ে শুয়েছিলে যে আমি তোমাকে ছেড়ে উঠতেও পারলাম না, ঘুমোতেও পারলাম না।

বানিয়ে বানিয়ে আজেবাজে কথা বলবি না।

সত্যি খোকনদা, তুমি ঠিক ছোটবেলার মত...

এই বুড়ো বয়সে ছোটবেলার মত...

আজ্ঞে হ্যাঁ।

খোকন মনে মনে একটু লজ্জা পায়। একটু পরে খোকন জিজ্ঞাসা করল, আমি ঐভাবে শুয়ে ছিলাম বলে তোর রাগ হয়নি?

রাগ হবে কেন? তবে অনেক কাল পরে তুমি আমার পাশে শুয়েছিলে বলে একটু অস্বস্তি লাগছিল।

অস্বস্তি মানে?

তোমার হাত-টাত কত ভারী, কত মোটা হয়ে গেছে।...

খোকন হাসে।

তবে তোমার গায়ে একটা ভারী সুন্দর গন্ধ আছে।

খোকন হেসে জিজ্ঞাসা করে, তাই নাকি?

সত্যি। তোমার গায়ের গন্ধ আমার খুব ভাল লাগে।

সবার গায়েই একটা গন্ধ থাকে। তোরও আছে।

আমার গায়ে গন্ধ?

হ্যাঁ, তোর গায়েও গন্ধ আছে বৈকি!

সোনালী বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বললো, খল্টা আছে।

সোনালী আর কথা বলে না। শুয়ে পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর ঘুম আসে। সামনের সোফায় বসে সিগরেট টানতে টানতে খোকন ওর দিকে তাকায়। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

পাশ ফিরতে গিয়ে হঠাৎ সোনালী চোখ মেলে তাকায়। খোকনকে দেখে। জিজ্ঞাসা করে, তুমি একটু ঘুমোবে না খোকনদা?

না।

রাত্রে ত ঘুম হয়নি। এখন একটু ঘুমোও।

সোনালী আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

বিকেলবেলায় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে মিঃ সরকার সোনালীকে বললেন, এখানে খুব সুন্দর সুন্দর সিল্কের শাড়ী পাওয়া যায়। দামও সস্তা।

তাহলে বড়মাকে একটা ভাল শাড়ী কিনে দাও।

তুই কিনবি না?

আমি সিল্কের শাড়ী দিয়ে কি করব?

আমি ত ভাবছিলাম, শুধু তোর জন্যই একটা শাড়ী কিনব।

কেন?

তোর বড়মার ত অনেক শাড়ী আছে।

তা হোক। তুমি বড়মাকেই কিনে দাও।

খোকন হাসতে হাসতে বললো, সোনালী, তুই বেশ ভালভাবেই জানিস, বাবার মাথায় যখন এসেছে, তখন তোর শাড়ী কিনবেনই কিন্তু বেশ ন্যাকামী করে...

সোনালী আর এক মুহূর্ত দেরী না করে ওর পিঠে দুম করে একটা ঘুষি মেরে বললো, আর আজেবাজে কথা বলবে?

ও ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়।

ওরা তিনজনেই হাসেন।

শিবানী হাসতে হাসতে বললেন, তোদের ছেলেমানুষী আর যাবে না।

পরের দিন সকালে গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়াম থেকে দুটো শাড়ীই কেনা হলো। এম্পোরিয়াম থেকে হোটেলে ফেরার পর শিবানী বললেন, সোনালী, আজ বিকেলে এই শাড়ীটা পরিস।

কলকাতায় গিয়ে পরব।

না না আজ বিকেলেই পরিস।

বিকেলে ঐ শাড়ীটা পরে সোনালী সামনের বারান্দায় আসতেই মিঃ সরকার আর ওঁর স্ত্রী একসঙ্গে বললেন বাঃ! কী সুন্দর দেখাচ্ছে।

সোনালী ওদের দুজনকে প্রণাম করল। খোকন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ভুবনেশ্বর গেছে। খেয়েদেয়ে রাত দশটা-সাড়ে দশটায় ফিরবে। তাই ওকে প্রণাম করতে পারল না।

মিঃ সরকার সোনালীকে একটু আদর করে বললেন, তুই সত্যিই সোনালী।

শিবানী ওর কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, যত দিন যাচ্ছে তুই তত সুন্দরী হচ্ছিস।

ফটো : পিন্টুলাল দে বিশ্বাস

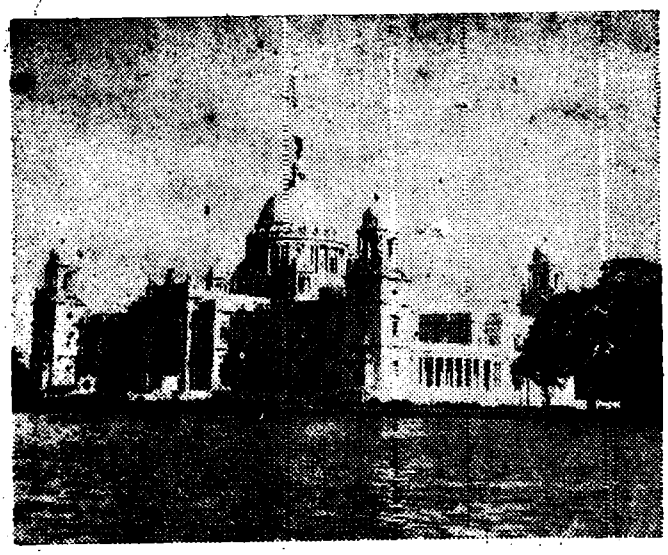

লজ্জায় আর খুশীতে সোনালী মুখ তুলতে পারে না।

সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে সবাই একবার সোনালীর দিকে দেখেন। ও লজ্জায় মুখ তুলে হাঁটতে পারে না। মিঃ সরকার গর্বের সঙ্গে বললেন দেখেছ শিবানী, আজকে কেউ সমুদ্র দেখছে না, সবাই তোমার মেয়েকে দেখছে।

বড়মা জেঠামনি এইসব কথা বললে আমি একদিন হোটেলে ফিরে যাব।

শিবানী বললেন, কালও কত লোক তোকে দেখছিলেন। এতে লজ্জা পাবার কি আছে?

রাত্রে বি এন আর হোটেলের ডাইনিং রুমে মজার কান্ড ঘটল। মধ্য-বয়সী এক দম্পতি মিঃ সরকার আর শিবানীকে বললেন, আপনার এই মেয়েটিকে যে আমি পুত্রবধূ করার লোভ সামলাতে পারছি না।

সোনালী ঐ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ঘরে চলে গেল।

সোনালীর কান্ড দেখে ওরা চারজন একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

দু-এক মিনিটের মধ্যে খোকন ফিরে এসে ওকে এত সেজেগুজে একলা থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, তুই একলা একলা কী করছিস?

এমনি বসে আছি।

বাবা-মা কোথায়?

ডাইনিং রুমে।

তোর খাওয়া হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

ওদের খাওয়া হয়নি?

হয়েছে।

তবে ওঁরা কি করছেন?

এক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছেন।

তা তুই চলে এলি।

সোনালী এতক্ষণ মুখ নীচু করে একটার পর একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। এবার ও খোকনের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললো, জান খোকনদা ঐ ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা কি অসভ্য!

খোকন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন, কি করেছে?

হঠাৎ বড়মা আর জেঠামনিকে এসে বলছে আপনার মেয়েকে পুত্রবধূ করতে ইচ্ছে করছে!

খোকন হো হো করে হেসে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে সোনালী ওর হাতে একটা চড় মেরে বললো তুমিও ভীষণ অসভ্য।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সোনালী খোকনকে প্রণাম করতেই ও জিজ্ঞাসা করল, চড় মেরেই প্রণাম?

নতুন শাড়ী পরেছি না!

খোকন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য অপলক দৃষ্টিতে সোনালীকে দেখে বললে সত্যি আজ তোকে খুব সুন্দর লাগছে।

সকালবেলার প্রথম ঝলক সোনালী রোদের মত ও হঠাৎ মিষ্টি হেসে বললো, সত্যি খোকনদা?

খোকন ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো দারুণ!

এরপর যখন খোকন ছুটিতে এসেছে তখনই কথায় কথায় বলেছে মা, যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে চা না দেয় তাহলে পুরীর ঐ ভদ্রলোকের ছেলে ক্যাবলার সঙ্গেই আমি.....

সোনালী দুম দুম করে খোকনের পিঠে দুটো-তিনটে ঘুষি মেরে বলে, ক্যাবলার বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

বিহাইকাকা বলছিল ক্যাবলা ছেলেটি বেশ ভাল। মল্লিক বাজারে মোটরের চোরাই পার্টস বিক্রী করে বেশ টু পাইস.....

আর কেবলি বুঝি তোমার সঙ্গে আই আই টিতে পড়ে?

তবে ক্যাবলা জামাই হলে বাবা নিশ্চয়ই ওকে অফিসের জমাদার করে নেবেন।

সোনালী বাচ্চাদের মত চিৎকার করে, খোকনদা!

শিবানী আর শুয়ে থাকতে পারেন না। উঠে এসে বলেন, তোদের জ্বালায় কোনদিন দুপুরে আমার বিশ্রাম করার উপায় নেই।

দ্যাখ না বড়মা.....

ওকে এক কাপ চা করে দিলেই ত...

কিন্তু আমাকে যা তা বলছে কেন?

খোকন, তুই বড্ড ওর পিছনে লাগিস।

খোকন ফিরে যাবার আগের দিন সব ঝগড়া হঠাৎ থেমে যায়।

জানিস সোনালী, হস্টেলে এমনি বেশ ভালই থাকি কিন্তু ছুটির পর ফিরে গিয়ে কিছুদিন বড্ড খারাপ লাগে!

সত্যি বলছ নাকি আমাকে খুশী করার জন্য বলছ?

সত্যি বলছি। হস্টেলে পড়াশুনা, ইয়ার্কি-বাদরামী করে দিনগুলো ভালই কাটে তবে এখন ফিরে গিয়ে খাস-খানেক শুধু এখানকার কথা মনে পড়বে।

আমার কথা মনে পড়ে?

খোকন সিগরেট টানতে টানতে শুধু মাথা নাড়ে।

কি মনে হয়?

খোকন দু-এক মিনিট কি যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা বাইরের দিকে ঘুরিয়ে যেন আপন মনেই বলে, তোর কথা খুব বেশী মনে হয়।

কেন?

খোকন যেন ওর কথা শুনতে পায় না। বলে, তোকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবি।

আমাকে নিয়ে এত কী ভাব খোকনদা?

ও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে সে এখন বলতে পারব না।

কেন?

খোকন ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, মানুষ মনে মনে যা কিছু ভাবে তা কি সব সময় বলতে পারে?

আমার কথা আমাকেও বলা যায় না?

খোকন আবার মাথা নাড়ল। বললো না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সোনালী বললো, তুমি চলে গেলে আমারও খুব খারাপ লাগে। মন হয় কেন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতাম, কেন তোমার গা টিপে দিইনি.....

কিছু রঙরূপ এমনও আছে সময় হার মানে যার কাছে!

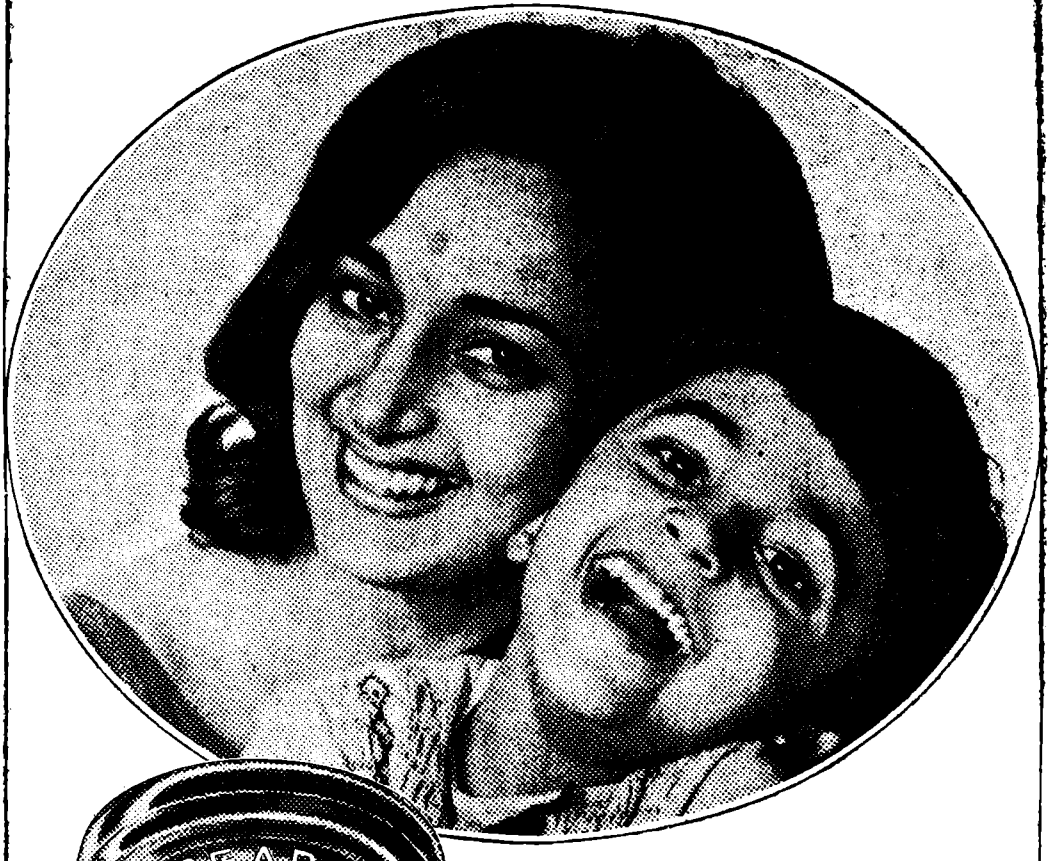

পিয়ার্স—আসল গ্লিসারিন সাবান

আপনার ত্বককে রাখুন পিয়ার্সের কোমল যত্নে। এর প্রত্যেকটি স্বচ্ছ ট্যাবলেট তৈরী হয় সাবান-তৈরীর এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দিয়ে। পিয়ার্স যেমন কোমল, তেমনি খাঁটি—আর খাঁটি বলেই এত স্বচ্ছ।

পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে আপনার ত্বকের গ্লানিহীন তারুণ্য বজায় রাখে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-PS.56-140 BG

আর কি মনে হয়?

বাড়ীটা ভীষণ ফাঁকা লাগে।

তাই নাকি?

হাঁ খোকনদা। লেখাপড়া কাজকর্ম কিছুতেই মন বসাতে পারি না।

কেন?

কেন আবার? শুধু তোমার কথা মনে হয়।

মিঃ সরকার অফিস থেকে এসে বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতেই বললেন, শিবানী, আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম আজই মিঃ ব্যানার্জির মেয়ের বিয়ে।

আজই? শিবানী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার একদম মনে ছিল না। তারপর ঘোষের কাছে শুনেই.....

আজই ত আঠারই। আমারও একদম খেয়াল ছিল না।

চটপট তৈরী হয়ে নাও। একটা শাড়ী কিনতে হবে। তারপর মিত্তিরকে তুলে নিয়ে হাওড়া হয়ে কোনগর যাওয়া।

মিত্তিরের গাড়ী কি হল?

ওর গাড়ী টিউনিং করতে গ্যারেজে দিয়েছে।

তার মানে পাকা সাকাস ঘুরে হাওড়া হয়ে কোনগর?

কি আর করা যাবে? তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

কাল খোকন যাবে আর আজ.....

কিন্তু ব্যানার্জির মেয়ের বিয়েতে না গিয়ে ত উপায় নেই।

তা ঠিক। শিবানী একটু ভেবে বললেন, ফিরতে ফিরতে নিশ্চয় বারোটা-একটা হয়ে যাবে?

মিঃ সরকার একটু হেসে বললেন, এখনই ছটা বাজে। সাতটায় বেরিয়ে শাড়ী কিনে মিত্তিরের বাড়ী পৌঁছতেই আটটা। সোনালীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে বললেন, বিয়ে বাড়ী পৌঁছতেই দশটা বেজে যাবে।

তার মানে ফিরতে ফিরতে দুটো-আড়াইটে।

তবে কাল রবিবার। এই যা ভরসা।

তৈরী হয়ে সোনালীকে সব বুঝিয়ে ওদের বেরুতে বেরুতে সওয়া সাতটা হয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই খোকন সিগরেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বললো, সোনালী, চা কর।

ও হাসতে হাসতে বললো ছোঠামণি বড়মা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি তোমার বাদরামি শুরু হল?

ভাল করে সেবা-যত্ন কর; তা নয়ত আমি চলে যাবার পর মনে মনে আরো কষ্ট পাবি।

অযথা এসব কথা বলে আমার মন খারাপ করে দিও না।

খোকন হঠাৎ দুহাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে কপালের সঙ্গে কপাল ঠেকিয়ে বললো, আমি চলে গেলে সত্যি তোর মন খারাপ হয়?

না হবার কী আছে?

তুই আমাকে ভালবাসিস।

তুমি জান না?

না।

বুঝতে পার না?

খোকন অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়ল।

তাহলে তোমায় জেনে কাজ নেই।

তুই বল না আমাকে ভালবাসিস কিনা।

ভালবাসব না কেন?

কি রকম ভালবাসিস?

সোনালী মাথা দুলিয়ে বললো, আমি অত জানি না।

জানিস না?

না। সোনালী ওর হাত দুটো টেনে বললো, হাত খোলো। চা করব।

চা করতে হবে না।

এক মিনিট আগেই বললে, না কর আবার.....

আগে আমাকে একটু আদর কর!

অসভ্যতা করো না। তুমি হাত খোলো।

আগে আমাকে একটু আদর কর। তা না হলে আমি হাত খুলছি না।

অসভ্যতা করো না খোকনদা। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমার অনেক কাজ আছে।

একটু আদর না করলে আমি ছাড়ছি না।

আমি আদর করতে জানি না।

জানিস না?

না।

আমাকে আদর করতে ইচ্ছে করে না?

বাজে বকবে না। তুমি এই পাঁচ বছর হস্টেলে থেকে অভ্যেস অসভ্য হয়ে গেছ।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি কি ভেবেছ আমি কিছুই বুঝি না? আমিও দুদিন পর বি, এ পরীক্ষা দেব।

আমি কী অসভ্যতা করলাম?

সব কথা বলা যায় না।

এমন অসভ্যতা করেছি যে বলাই যায় না?

তোমাদের মত হস্টেলের ছেলেদের কাছে এসব অসভ্যতা না হলেও.....

কি সব অসভ্যতা?

বলেছি ত আমি সবকিছু খুলে বলতে পারব না। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

খোকন একটু হেসে ওকে ছেড়ে দিল। বললো, তুই ঠাট্টা-ইয়ার্কিও বুঝিস না। সব ব্যাপারেই তুই বড্ড সিরিয়াস।

সোনালী ড্রইংরুম থেকে বেরুতে বেরুতে বললো, এ ধরনের ঠাট্টা-ইয়ার্কি তুমি আমার সঙ্গে করবে না।

আচ্ছা তুই চা কর।

পারব না।

চা খাওয়াবি না?

না।

কাল চলে যাবার পর যখন.....

আমার কিছু মন খারাপ হবে না। তুমি আজই চলে যাও।

কিন্তু আমার যে ভীষণ চা খেতে ইচ্ছে করছে।

শুধু চা কেন, আরো অনেক কিছু খেতেই তোমার ইচ্ছে করছে কিন্তু আমার দ্বারা কিছু হবে না।

চা খাওয়াবি না?

তুমি আমার সঙ্গে বক বক করো না। সোনালী এবার আপনা মনেই বলে, হাজার কাপ চা খাইয়েও তোমার মন ভরবে না। একটু আগেই তোমার যে মূর্তি দেখেছি তাতে আমার কিছু বুঝতে বাকি নেই।

খোকন ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে গেল। প্যান্ট-বুশ সার্ট পরে বেরুবার সময় বললো, আমার ফিরতে রাত হবে।

আমি একলা একলা থাকব?

খোকন চলে গেল।

সোনালী দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ভাবছিল নানাকথা। খোকনদার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ও এমন পাগলামী করে কেন? তাছাড়া আমার সঙ্গে কি এই পাগলামী করার সম্পর্ক?

ঐ খোকনের কথা ভাবতে ভাবতেই রান্নাঘরের কাজ শেষ করল। নিজের ঘরে এলো। বসল। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে খোকনের ঘরে গেল। বোটানিক্যাল

গার্ডেনে তোলা ওদের দুজনের ছবিটার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজতেই সোনালী চমকে উঠল। মনে মনে একটু ভয় পেল। তাছাড়া হঠাৎ খোকনের জন্য মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। না, খোকন আসে না। এক এক মিনিট এক এক ঘন্টা মনে হয়। সোনালী ছটফট করে। ঘড়িতে সাড়ে দশটার ঘন্টা বাজতেই ওর কান্না পায়।

সওয়া এগারটার সময় খোকন আসতেই সোনালী আর চেপে রাখতে পারে না। অঝোরে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, এভাবে আমাকে একলা রেখে যাবার কোন মানে হয়? আমি ভয়, ভাবনায় মরে যাচ্ছিলাম।

খোকন শুধু বললো, কাঁদিস না। আমার ঘরে আয়, কথা আছে।

আমাকে একলা রেখে তুমি এতরাত পর্যন্ত কেন বাইরে ছিলে, আগে সেকথা বলো।

সত্যি অন্যায় হয়েছে। তুই আমাকে ক্ষমা কর।

খোকনের কথা শুনে সোনালী চমকে ওঠে। বলে, তুমি এভাবে কথা বলছ কেন খোকনদা?

খোকন নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, অন্যায় করেছি, ক্ষমা চাইব না?

সোনালী ওর পিছন পিছন ওর ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হয়েছে বলো ত?

কি আবার হবে? কিছু হয় নি।

সোনালী খোকনের কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলল, আমাকেও বলবে না? আমি না তোমার সোনা সোনালী?

খোকন আর চুপ করে থাকতে পারে না। দুহাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে বুকের পর মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললো, সোনালী, তোকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

আমি কি মরে যাচ্ছি যে তুমি একথা বলছ?

না, না, সোনালী, তোকে আমি হারাতে পারব না। কোনদিন না।

সোনালী আঁচল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, আমি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি যে তুমি এমন করে কাঁদছ?

খোকন মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুই আমাকে ভালবাসিস না?

নিশ্চয়ই ভালবাসি।

খুব ভালবাসিস?

মনে ত হয়।

তুই আমাকে বিয়ে করতে.....

সোনালী সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে বলে, খোকনদা!

রেজাল্ট বেরুবার এক মাসের মধ্যেই খোকন ব্যাঙ্গালোর বারো শ টাকা মাইনের চাকরি পেল। সবাই খুশী, সবাই আনন্দিত কিন্তু খোকনকে দেখে খুশী হওয়া ত দূরের কথা, বেশ চিন্তিত মনে হয়।

খোকনের ব্যাঙ্গালোর রওনা হবার আগের রবিবারের কথা। সোনালী বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় গেছে। খোকন ওর বাবা-মার ঘরে ঢুকেই মুখ নীচু করে বললো, একটা কথা বলতাম।

ওর মা একটু হাসতে হাসতে বললেন, তা এমন করে বলছিস কেন?

খোকন মুখ নীচু করেই বললো, আমি সোনালীকে বিয়ে করব।

মিঃ সরকার পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন, নন্‌সেন্স! ভাইবোনে কখনো বিয়ে হয়?

শিবানী তাড়াতাড়ি খোকনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

খোকন জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি মতামত বলবে না?

মিঃ সরকার আবার গর্জে উঠলেন, রাস্‌কেল, গেট আউট। এক্ষুনি বেরিয়ে যা হতভাগা।

শিবানী দুহাত দিয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হাজার হোক সোনালী একটা ড্রাইভারের মেয়ে.....

খোকন পাগলের মত হো হো করে হাসতে হাসতে বললো, মা! ওয়ান্ডারফুল। ওয়ান্ডারফুল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সোনালী বিহারী ড্রাইভারের মেয়ে!

* * *

এগারটা বাজতে না বাজতেই মিঃ সরকার অফিস থেকে ফিরে এসেই বাচ্চা ছেলের মত কাঁদতে কাঁদতে বললেন, শিবানী, খোকন পাগল হয়ে গেছে।

পাগল!

হ্যাঁ।

উঁহু

বুদ্ধদেব গুহ

মিলি অনেকদিন ধরে আমাকে বলছে ওকে নিয়ে যেন একটা গল্প লিখি। একদিন।

সেই একদিন কখনও আসেনি। গল্প লেখাও হয়নি তাই স্বাভাবিক কারণে।

মিলি আমার এক বন্ধুর বোন। বিবাহিতা। দুই ছেলেমেয়ের মা। দেখতে অতি সাধারণ। সাধারণ বললেও বলা হয় না। হয়তো সাধারণের চেয়েও একটু খারাপ। শারীরিক সৌন্দর্যে।

মিলির স্বামী একজন কৃতী অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ভাল পসার। গাড়ি আছে। চেহারা সুন্দর। অত্যন্ত মিষ্টভাষী। কাজ পাগল লোক। সকলেই তার ব্যবহারে ও কথাবার্তায় মুগ্ধ। একমাত্র শখ বলতে জামা-কাপড়ের এবং খাওয়া-দাওয়ার। ওর স্বামীর মিলির জানাশোনা বহু মেয়ে, বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা খুব পছন্দ করে। পছন্দর মাত্রাটা কার পক্ষে কতখানি দীর্ঘ সে বিষয়ে মিলির কোনো কৌতূহল নেই; ছিলো না। অনেকেরই ভালোলাগা ভালোবাসা পাওয়ার মত একজনকে যে সে বিয়ে করেছে এই টানাটুকু নিয়েই মিলিকে পরম নিশ্চিন্ত বলে মনে হয়েছিল।

ওর দাদা হিরণের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। ভবানীপুরে একই রাস্তায় প্রায় পাশাপাশি আমাদের দোকান ছিল। আমার জামাকাপড়ের দোকান আর হিরণের ওষুধের দোকান। ওর দোকানে সকাল সন্ধ্যে যে ডাক্তার

বলতেন, তিনি আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হন। তার মাধ্যমে হঠাৎ একবার একসঙ্গে কলকাতার বাইরে গিয়ে সাত-দিন থাকার পর হিরণের সঙ্গে আমার একটা গভীর সখ্যতা জন্মায়। দুজনের মধ্যে অনেক মিলও চোখে পড়ে। ও খুব সাহিত্য পড়তে ভালবাসে, আমিও তাই। ও তাস খেলা জানে না; আমিও তাই। ও নির্জন পথে একা একা হাঁটতে ভালোবাসে; আমিও তাই। চেহারাটা ভাল না বলে আমাকে কেউ বিয়ে করেনি এবং ওর চেহারাটা এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের অবস্থা ভাল না বলে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে একজন পয়সাওয়ালা কালোয়ারের সঙ্গে চলে গেছে। ইত্যাদি; ইত্যাদি।

যাকগে, কি বলতে বসে কি বলছি।

হিরণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর মনে আছে এক প্রচণ্ড বর্ষার দিনে ওদের বেলতলা রোডের বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। সেদিন বোধহয় রথ কি উল্টোরথের দিন ছিল। মেলা বসেছে পদ্মপুকুরের মোড়ে। আমি ও হিরণ বসে পাঁপড় ভাজা দিয়ে চা খাচ্ছি আর সদ্য বেলোর আধুনিকতম বই নিয়ে আলোচনা করছি এমন সময় দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে একটি মেয়ে হাতে একটি ফুলের টব নিয়ে ঢুকলো। বৃষ্টিতে একেবারে কাক-ভেজা। টবটাকে দুহাতে বুকের কাছে ধরে আছে; টবের মধ্যে একটা জুঁই-এর চারা।

ঐ ভেজা অবস্থাতেও মিলি অপরিচিত আমাকে দেখে একটুও অপ্রতিভ না হয়ে, বরং আমার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করেই উত্তেজিত গলায় বলল, দ্যাখ দাদা, এতদিনে পেয়েছি।

এমনভাবে কথাটা বলল, যেন বিশল্যকরণীই পেয়েছে।

হিরণ বলল, তুই একটা পাগল। শীগগির উপরে যা। নীরুর কাছ থেকে চেয়ে শাড়ি বদলে নে। জ্বরে পড়বি।

মিলি বলল, হোকগে জ্বর! বাবাঃ এতদিনে পেলাম।

হিরণ আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল মিলির।

বলল, এই সেই টিপু—তোদের যার কথা বলেছি অনেক।

মিলি বলল, আপনার দোকানে গলাকাটা দাম নেন। আমার বরের জন্যে একটা বুশশার্ট কিনতে গিয়ে দেখেছি।

তারপর একটু থেমে বলল, কিন্তু কই? আপনি ছিলেন না তো দোকানে?

আমি বললাম, আমার শরীর খারাপ ছিল।

তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই, আসছি, বলে দৌড়ে চলে গেল।

আমাকে গ্রাহ্যই করল না প্রথম থেকে।

এখন এই অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যে পুরুষমানুষের মধ্যে মেয়েদের আকৃষ্ট করার মত রূপ বা গুণ কিছুই থাকে না তাদের মেয়েরা খুব সহজভাবে গ্রহণ করে—যেন কত যুগের চেনা। আর যাদের মধ্যে ভালো লাগার কিছু থাকে তাদের কাছে অদৃষ্ট ও বাধো-বাধো বোধ করে। অবিবাহিত অসফল অবস্থায় জীবনের উনচল্লিশ বছর কাটানোর পর এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি আমি। কেউ কেউ দয়া করে কখনও সখনও, অনুকম্পা করে, ফাই-ফরমাস খাটিয়ে নেয় ভালো-লাগার ভান করে—কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞান নামক বস্তুটি এখনও কিছুমাত্রায় অবশিষ্ট আছে বলে সেই নৈকট্যকে গ্রহণ করতে মন পারেনি কখনও। মেকী ভালবাসা নিয়েও যে কিছুক্ষণের জন্যে এই মেকী সংসারে সুখী হবো এমন প্র্যাকটিক্যাল বোধটুকুও ভগবান দেননি আমাকে।

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাঁপড় খাই মুচমুচিয়ে। আলসেতে পায়রার বকবকম শুনি, শুনি বৃষ্টির শব্দ দেওয়ালে; ভিজে কাকের অস্বস্তিভরা ডাক।

একটু পর মিলির স্বামী ঘরে ঢুকলো। সুপুরুষ লম্বা চওড়া। গায়ের রঙ কালো কিন্তু হিন্দী ফিল্মের ধর্মেন্দ্রর মত চেহারা। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

হিরণ বললে যদু তুমি ভিজলে না, আর মিলিটা ভিজল কি করে?

যদু বলল, তার কি তর সইল? ভাই বোনে যে কিসের কবিত্ব তা আপনারাই জানেন। গাড়ি পার্ক করছি যে তারও তর সইল না, গাড়ি থেকে ছাতা বের করার তর সইল না, একদৌড় দৌড়ে গিয়ে দাদাকে জুঁই গাছ না দেখালেই নয়। এই বৃষ্টিতে-ভেজা ওভার রোমান্টিসজম আমার ভাল লাগে না।

হিরণ যদুকে বসতে বলে আমাকে বলল, যদুরা কিছুদিন হলো মনোহর-পুকুরে চলে এসেছে ওদের বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্যামবাজার থেকে। নতুন সংসার পেতেছে দিনকয় হলো।

যদু বলল, আসবেন দাদা একদিন পায়ের ধুলো দিন একবার। হিরণদার মুখে তো সব সময় আপনার কথা শুনি। শুনি আপনি আণ্ডারওয়্যারও বেচেন আবার গল্পও লেখেন—জিনিয়াস দেখছি।

কথাটার খোঁচা আমার গায়ে লাগল না। জীবনে যারাই অসফল তারাই জানে এমন খোঁচা তাদের কারণে অকারণে অনেক অনেক সহ্য করতে হয়। কিছুদিন পর চামড়া যথেষ্ট মোটা হয়ে যায়। আমার ইচ্ছা করে জানতে আমিও যদি উত্তরপ্রদেশের লটারীর টিকিট কিনে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাই আমিও কি লোকের মনে বিনা কারণে বিনা ঝগড়ায় এমনি করে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পাবো? হয়তো পাবো; জানি না। মানুষ বড় তাড়াতাড়ি নিজেকে বদলে ফেলতে পারে—মানুষ চরিত্র জলের মত—তার বাইরের পাত্রের আকার নিতে এক মুহূর্ত দেরী হয় না মানুষের।

যদু বলল, আমি উঠি দাদা, রিজভির বাড়ি নেমন্তন্ন আছে ছায়ের। মিলি যাবে না। ও ইংরিজী বলতে পারে/ না বলে এমবারাসড ফিল করে। সন্ধ্যের পর এসে তুলে নিয়ে যাবো ওকে।

বলেই যদু উঠল। আমাকে নমস্কার করে বলল, একদিন পায়ের ধুলো দিচ্ছেন তাহলে গরীবের বাড়ি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে অর্থকরী সফলতাকে করজোড়ে নমস্কার জানালাম। ঘাড় নাড়িয়ে বললাম, যাবো।

মনে মনে বললাম, আপনার সঙ্গে আমি কি একাসনে বসার যোগ্য মশাই?

যদু চলে যাওয়ার পরই মিলি এল। আবার! এসেই খাটের অন্য পাশে পা মুড়ে একটা বালিশ কোলে করে বসল।

পরক্ষণেই উঠে যেতে যেতে বলল, এমন অন্ধকার ঘরে কি নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করা যায়—তুই কিরে দাদা বাতিটা তো জ্বালাবি? বলেই, বাতিটা জ্বালল।

আমি বললাম, হিরণ আর আমি দুজনে যেখানে একসঙ্গে থাকি আমাদের মনের মিলের উচ্ছৃঙ্খলতার জায়গাটা আলোকিত হয়ে যায়।

মিলি আমার দিকে তাকাল। ওর মুখে আলো পড়েছিল। একটু আগে বোধহয় ও পান খেয়েছিল। দুপুরে বোধহয় ঘুমিয়েই থাকবে। ওর চোখ-মুখ ফোলা। বেশ খারাপ দেখতে ও। মিলি একবার হাসল। সেই হাসির মধ্যে থেকে বড় সরল নির্মল এক ভাবুক মেয়ে উঁকি মারল। এমন নির্মল, কলুষহীন, উদ্দেশ্যহীন হাসি কখনও দেখেছি বলে মনে হলো না আমার।

মিলি হঠাৎ নরম গলায় বলল, যেন অনেক দূর থেকে বলল, আপনি খুব ভাল কথা বলেন।

তারপরই হিরণের দিকে ফিরে বলল জানালাটা খোল না দাদা। কী যে তোর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতিক।

জানালাটা খুলে দিতেই জানালার সামনে ভেজা নিমগাছ, আরো কি সব গাছ-টাছে চোখ পড়ে চোখ জুড়িয়ে গেল।

মিলি অনেকক্ষণ খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কলকাতার ইট-

"চার্ণকের ভূত"

জব চার্ণক যদি জেগে ওঠেন, তাহলে তাঁর সাধের সুতানুটি বা কলিকাতা বা গোবিন্দপুরের হাল দেখে চমকে উঠে হয়তো 'মাই গড' বলে আবার কবরে ফিরে যাবেন। কলিকাতা গ্রামের মানুষ হঠাৎ মহানগর কলকাতায় এলে 'শক' খাবেন বৈ কি!

তবে কলকাতায় এক ভালবাসার ভূত সবার ঘাড়েই চাপে—জব চার্ণক থেকে আরম্ভ করে সি, এম, ডি, এ-র বর্তমান চেয়ারম্যান ভোলানাথ সেনের ঘাড়ে যেমন, তেমনই কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এমন কি বেকারদের মধ্যেও।

সেই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণককে এখন আর লালদীঘির জল খেতে হবে না—পলতা এখন ১৪ কোটি গ্যালনের জলদাত্রী। হাওড়া আর গার্ডেন-রীচে নতুন পলতা তৈরী হচ্ছে। লটারী করে কলকাতায় রাস্তা বানাতে হবে না—সি, এম, ডি, এ-র চেষ্টায় বহু রাস্তা চওড়া; কোনটা দোতলা আর কোনটা নতুন। যেমন ডায়মণ্ডহারবার রোড। ১৩ লক্ষাধিক বস্তিবাসীর জীবনে জল, রাস্তা, পাকা-পায়খানা আর বিজলী বাতির স্বাচ্ছন্দ্য। আর বর্ষায় জল জমলেও বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না।

শুধু কলকাতা? সেই কল্যাণী থেকে বজবজ পর্যন্ত কাজ আর কাজ। অনেকের মতে অকাজ, এমন কি যাঁরা কলকাতাকে ভালবাসেন, তাঁরাও উত্তপ্ত হয়ে বক্রোক্তি করেন। বলেন 'সি, এম, ডি, এ মানেই হচ্ছে কাটছি মাটি দেখবি আয়'। 'শহরটাকে শেষ করে দিল।'

ভালবাসার শহরকে ভাল করতে আরও কিছু দরকার, অনেক কিছু। ভীড়ের বাসে, মহিলা আর অক্ষমদের সাহায্য এবং সম্মান। যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ আর থুথু ফেলার অভ্যাস বন্ধ হোক। অসময়ে জঞ্জাল রাস্তায় যেখানে-সেখানে ফেলা চলবে না ইত্যাদি।

ধরুন যদি চার্ণক সাহেব আজ হঠাৎ ভোলা সেনের মুখোমুখি হয়ে যান তাহলে তাঁর অভিযোগ কি হবে? তিনি বলবেন 'লুক, ভোলা, কলকাতাকে আমরা লণ্ডন মডেলে গড়তে চেয়েছিলাম, সাহেবদের আলাদা পাড়া রাখতে চেয়েছিলাম; সেই পাড়াটা এমনভাবে সাজাতে চেয়েছিলাম যাতে মনে হয় দ্বিতীয় লণ্ডনে এসে পড়েছি.....কিন্তু তুমি সব নষ্ট করে দিচ্ছ....' ভোলা সেনের জবাব কি হবে, তাও বলে দিতে হবে? তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, 'তোমার স্বপ্ন নিয়ে তুমি নিজের কবরে থাক; এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তোমাকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু শহরটা আমরা এমনভাবে গড়বো যাতে সাদা-কালো, গরীব-বড়লোক ব্যবধানটা না থাকে...পানীয় জল সবার জন্য, রাস্তা সবার জন্য, কলকাতা সবার জন্য। জব চার্ণক যদি প্রশ্ন করেন মানেজ করবে কি করে, তাহলে তারও জবাব আছে। সি, এম, ডি, এ-র জন-সংযোগ দপ্তরে চিঠি লিখলে সেই চেষ্টা করা হবে।

কাঠ কংক্রীটের মধ্যের এই সতেজ জলজেজা সবুজে চোখ ভরে নিল।

তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, জানেন, বিয়ের আগে এ ঘরটা আমার ছিল। এই জানালাটাই আমার সব ছিল। দাদাটা এমন যে জানালাটা মোটে খোলে না।

আমার স্ট্রাইক করল যে, সত্যিই তো এতদিন হিরণের ঘরে আসছি, এ জানালাটা কখনও খোলা দেখিনি।

হিরণ হাসল। বলল, তুই জানিস কেন খুলি না। তাও কেন বারবার এক কথা বলিস?

আমি শুধোলাম কেন খুলিস না রে?

হিরণ চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, ছাড় তো।

মিলি বলল, বৌদি এই জানালার সামনে মোড়া পেতে বসে রোজ বিকেলে চুল আঁচড়াত। আমার বৌদি খুব সুন্দরী ছিল। দাদা কিন্তু বৌদিকে খুব ভালবাসত জানেন টিপুদা। বৌদিটাই বোকা। আমার এমন দাদাকে দাম দিলো না।

থাম তুই। বলে, হিরণ ধমক দিল মিলিকে।

বুঝলাম, হিরণ পুরোনো কথা তুলতে চায় না।

সেই মুহূর্তে প্রথম আমি বুঝতে পারলাম যে আমিও একা হিরণও একা। কিন্তু হিরণের একাকীত্বর দুঃখটা অনেক গভীর। পূর্ণতা কি জিনিস তার স্বাদ ও জীবনে পেয়েছিল বলেই শূন্যতা বোধটা ওকে এমন করে আচ্ছন্ন করে রাখে।

হঠাৎ হিরণের জন্য বড় দুঃখ হলো।

অনেকদিন স্বার্থ ছাড়া কখনও কারো জন্যে দুঃখিত হইনি। এই ভেজা দিনে, হঠাৎ হিরণের জন্য শুধুমাত্র ওরই কারণে দুঃখিত হতে পেরে নিজেকে খুব বড়ো মনে হলো। নিজের দুঃখ ছাড়া অন্য কারো দুঃখ বুঝি এ সংসারে তার অবকাশ কোথায়? অবকাশ যদি-বা হয়, সেই ইচ্ছাই বা কোথায়?

আমরা তিনজন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

হিরণ কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, যদু নেমতন্ন করে গেছে টিপুকে তোদের বাড়ি যাওয়ার জন্যে একদিন। তুই নেমতন্ন করবি না?

মিলি হেসে উঠল জোরে ছেলেমানুষের মতো।

বলল যার বাড়ি সেইই তো করেছে। আমি কে? তবে আমি করলে যদি তোমার বন্ধু খুশী হন তাহলে আমিও আলাদাভাবে করছি। গলবস্ত্র হতে হবে কি না বলুন?

বলেই, আমার দিকে তাকাল।

তারপর বলল যখন খুশী চলে আসবেন টিপুদা। আপনি মানুষটা ভাল। আমি মুখ দেখে বুঝতে পারি।

আমি হাসলাম বললাম আপনি বড় বোকা।

মিলি অবাক হলো। তারপর কি যেন ভাবল একটু বলল, আমারও তাই মনে হয় মাঝে মাঝে, তবে বোকামির মুখটা তো একমাত্র বোকাদেরই। যারা চালাক তারা এই মুখের কি বুঝবে?

হিরণ বলল, তুই কি জানিস যে টিপু গল্প লেখে?

জানি, পড়েছি।

কোথায়? আমি অবাক হয়ে বলি।

কয়েকটাই পড়েছি। লিটল ম্যাগাজিনে।

হিরণ বলল, লিটল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে বলেই বি-লিটল করিস না। টিপু কিন্তু ভাল লেখে।

আমারও তাই মনে হয়েছিল। মিলি বলল।

ভাল লেখার লক্ষণ কি?

আমি হাসতে হাসতে বললাম।

মিলি বলল, দেখুন আমি অতি সাধারণ মেয়ে। বলতে ভয় করলেও বলছি, পাশে নীরু শুনে ফেলে যে আমি শরৎবাবুর লেখারও খুব ভক্ত। আপনিও বা কি ভাববেন হয়ত। আজকাল যারা লেখেন-টেখেন তাঁরা ত শরৎবাবুকে লেখক বলেই মানেন না। তাই না? তারপর একটু থেমে বলল, আমার মনে হয়, অন্যের হৃদয়ের দুঃখ আপনাকে ছোঁয়, অন্যের হৃদয়ের চাবিকাঠি আপনার কাছে আছে। এইটেই বোধহয় আপনার লেখার গুণ।

হিরণ আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল, খাতা আন্, ওরে টিপু খাতা আন্ লিখিয়ে নে মিলিকে দিয়ে—এমন সার্টিফিকেট কেউ দেয়ওনি, দেবেও না।

আমি মুখ নামিয়েছিলাম। আণ্ডার-ওয়ার বিক্রীও করি; লিখিও। আপনি একটা জিনিয়াস। যদুবাবু বলেছিলেন।

মুখ তুলে মিলির মুখে তাকালাম। নাঃ, মিলির মুখের সঙ্গে মনের কোনো অমিল নেই। বড় খাঁটি মেয়ে মিলি।

হঠাৎ মিলি বলল, আচ্ছা! একটা জুঁই গাছ কতদিনে বড় হয় জানেন? মানে কতদিনে ফুল দেবে?

লজ্জিত হয়ে আমি বললাম, জানি না।

হিরণ বলল, তোর অত হিসেবে কাজ কি? যেদিন দেবে, সেদিন দেবে। একদিন তো দেবেই।

মিলি বলল, তুই যে কি বলিস দাদা। সব গাছই কি ফুল দেয়? ফুল দেওয়াটা অত সোজা না। অনেক যত্ন করতে হয় গাছকে, অনেক ভালো করতে হয় এ-জন্যে।

পাগলি!

বলে, হিরণ হাসল।

।। ২ ।।

বৃহস্পতিবার দোকান বন্ধ। দুপুরে বই পড়ে, সামান্য শুয়ে, বিকেলে পর পর দুবার চা খাওয়ার পর যখন অত্যন্ত দুর্ভাবনায় পড়লাম সন্ধেটা কাটবে কিভাবে তখন হঠাৎ মিলির কথা মনে হলো।

মনে হতেই গায়ে পাঞ্জাবীটা চড়িয়ে বড় রাস্তায় এসে ট্রামে চেপে বসলাম।

মিলিদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। যদু ফিরে এসেছে এতক্ষণে নিশ্চয়ই। অবশ্য মনে মনে ভাবছিলাম যে, ও না থাকলেই ভাল। মিলিকে আমার যতখানি ভাল লেগেছে, ওকে লাগেনি। কেন জানি না, মনে হয়েছে ওরা দুজনে সম্পূর্ণ বিপরীত, চরিত্রের দিক থেকে।

মিলি ওর দোতলার একফালি ফাঁকা ছাদের ছোট্ট বাগানে জল দিচ্ছিল।

ঝি-এর পেছন পেছন আমাকে দেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আমাকে দেখে কেউ কখনও এমনভাবে আনন্দিত হয়নি এর আগে। মিলির ছেলে খেলতে গেছিল, তিন বছরের ছোট মেয়ে তখনও ঘুমিয়ে ছিল বিছানাতে উপুড় হয়ে।

মিলি বলল, দেখেছেন, কত বড় করেছি জুঁইটাকে। কবে যে ফুল দেবে জানি না। বর্ষা চলে গেল, যতখানি বড় হওয়া উচিত ছিল হলো না। ভারী অকৃতজ্ঞ জুঁইটা।

আমাকে ঐ বারান্দাতেই মোড়া পেতে বসিয়ে বলল, আমি গা ধুইনি। আপনি পাঁচ মিনিট বসুন। আমি গা ধুয়ে আসছি।

কয়েকদিন বাদেই পুজো। মিষ্টি মিষ্টি ঠান্ডা পড়েছে। আকাশে তারা ফুটে উঠেছে। মিলির বাগানের গাছ-ফুলের মিশ্র গন্ধে নাক ভরে গেছে। একা বসে জুঁই গাছটাকে দেখছিলাম। বেশ বড় হয়ে গেছে গাছটা। জুঁই কখন ফোটে? মনে করার চেষ্টা করছিলাম। বর্ষায় তো? তাহলে তো মিলির আরো বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। বর্ষাতেই ফোটে তো? কি জানি? আমার জীবনে বেলফুল, জুঁইফুল, রজনীগন্ধা কাউকে কিনে দেবার মতো সুযোগ আসেনি কখনো। আসবেও না। ভাবছিলাম, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি?

একটু পর মিলি ফিরে এল। একটা হালকা প্যাস্টেলরঙা ডুরে শাড়ি পরেছে ভাতের। ওর ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাবানের গন্ধ, পাউডারের গন্ধ, ওর পাট-ভাঙা শাড়ির গন্ধের সঙ্গে গাছ-ফুলের গন্ধের গন্ধ মিশে গেল।

মিলি বলল, চিঁড়ে ভাজা ভালবাসেন তো? বাদাম দিয়ে, আদা দিয়ে, ছোলা দিয়ে আমি খুব ভাল ভাজতে জানি।

তারপরই বলল, দই-চিঁড়া খাবেন? এ-পাড়ায় খুব ভাল দোকান আছে একটা।

আমি হাসলাম। বললাম, না। চিঁড়ে ভাজাই যথেষ্ট।

তারপর বললাম, যদুবাবু ফেরেননি? এখন? বলে মিলি হাসল।

তারপর বলল, ফিরেই বা কি করবে? আসলে ওর সঙ্গে আমার ঠিক মেলে না। কাজলেরই বা মেলে বলুন? কিন্তু আসল মিলটা এখন ছেলে-মেয়ের মধ্যে। ওরাই হলো বন্ধন; আসল বন্ধন। দুপক্ষেরই। ওরাই সেতু—দুজনের কাছেই। ওর যা ভাল লাগে, যাদের ভাল লাগে তা নিয়েই ও সুখী। আমার এই বাগান আর বই আছে; আমার বন্ধু। আমিও অনেকদিন ধরে একজন বন্ধু খুঁজছিলাম, মনের বন্ধু, যার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে কথা বলা যায়, যে আমার কথা বোঝে, আমাকে বোঝে, ঠিক কিভাবে বলব জানি না। কিন্তু ভগবান আমাকে পাইয়ে দিয়েছেন আপনাকে। আমি কিন্তু খুব রাগ করেছি। আমি ভেবেছিলাম আপনি তার পরদিনই আসবেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি বড় স্বার্থপর। আমি জানি আপনাকে আমার দেওয়ার কিছুই নেই, শুধু পেতে চাই আমি, একটু বন্ধুত্ব আমাকে একটু বুঝতে পারার ক্ষমতা।

আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। বললাম, আমার কি আছে যা তোমাকে দিয়ে খুশী করতে পারি!

বলেই বললাম, এ মাঃ তুমি বলে ফেললাম।

মিলি বলল, বলুন, যেটা স্বাভাবিকভাবে আসে, সেটাকে বারণ করতে নেই। আমরা সকলে আজকাল বড় অস্বাভাবিক হয়ে গেছি, তাই না? স্বাভাবিকতাটা আজকাল আউট-অফ-ফ্যাশন। আশ্চর্য!

মিলি বলল, জানেন, শ্যামবাজারে আমাদের শ্বশুরের বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারে গত বারো বছর ঘর করলাম। অনেক শাসন ছিল, শাশুড়ী-শ্বশুর, দেওর, ননদ সকলেই আমাকে ভালবাসত তবুও। মানিয়েই ছিলাম। তবু, বোঝেন নিশ্চয়ই, সব মেয়েই একটা আলাদা সংসার চায় যেখানে সে কর্তৃত্ব করবে। তার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে রাজী। আমি যেমন সইছি। ওখানে সারাদিন এমন একা থাকতে হতো না। এখন হয়ে সয়ে গেছে। তবে ওখানেও ছাদের উপর আমার একটা বাগান ছিল এর চেয়ে ছোট। তাতেও বাগান করেছিলাম। সেই বাগানই নিয়ে এসেছি এখানে। কিন্তু জুঁইটা ছিলো না। আমার জীবনে এই জুঁইটা আর আপনি একই দিনে এলেন। মনে থাকবে দিনটা।

মিলি উঠে গেল চিঁড়ে ভাজা আনতে।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম, এই মিলিই যখন তার হ্যান্ডসাম স্বামীর বড় গাড়িতে সামনের বাঁদিকের সীটে বসে বাঁ হাতটা দরজার উপর রেখে নেমন্তন্ন খেতে যাবে তখন বাস স্টপেজে বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা আমার

পূজায়
নিউ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার
• বেনারসী • জোড়
• ফ্যান্সী শাড়ী ও
সর্ব ভারতীয়
তাঁত বস্ত্র
৫৪৫/১, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া।

মতো কত সামান্য মেয়ে পুরুষ তাকে কী দারুণ সুখী বলে ভাববে। পুরো ব্যাপারটা এত গোলমেলে। আসলে বোধহয় আমরা সকলেই একা। চির-দিনই একা। আমরা প্রত্যেকে নড়িচড়ি, শব্দ করি, ছাতে উঠে তাকালে চোখে পড়ে হাজার হাজার ঘরে আলো জ্বলছে। সংসার-সংসার খেলা চলছে ঘরে ঘরে। কত রকম শব্দ উঠছে মুখে মুখে কত অভিব্যক্তি। একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে সকলে—যেন সকলেই যা বোঝাতে চাইছে তা বোঝাতে পারছে—যেন সকলেই একে অন্যকে বুঝেছে, বোঝে। আমার দৃঢ় ধারণা এ শুধু খেলা, শুধু ঠোঁট নাড়া শুধু পাশাপাশি থাকা, শুধু শরীর নিয়ে নাড়াচাড়া, মন নিয়ে মিছি-মিছি বাজানো। আসলে আমরা সত্যি সত্যিই একা, বড়ই একা। প্রত্যেকে।

মাথার উপরের আকাশে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে কত তারা, কত নক্ষত্র, আমাদের পৃথিবীর চেয়ে বহু ছোট, আমাদের পৃথিবী তারাও সকলেই একা। একা একা ঘুরছে অনাদিকাল থেকে। পৃথিবীর বুকে আমরা ছোট ছোট মানুষ, ছোট ছোট কাঙাল হৃদয় নিয়ে তেমনই এক পূর্ব নির্ধারিত কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছি একা একা।

অথচ আশ্চর্য! তবুও সেই কক্ষ-পথে ঘুরতে ঘুরতে হিরণ হিরণের সঙ্গীকে হারাচ্ছে। সত্য হেরে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত মিথ্যার কাছে। মিলি ছেলে-মেয়ের মা হচ্ছে। যখন মা হয়, তখন বোধহয় মা হওয়াটাই সত্যি ছিল। আজকে ছেলে-মেয়েরাই সত্যি — মিলি মিথ্যা হয়ে গেছে নিজের কাছে। নিজের অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে গেছে—ওর মাতৃত্বর মধ্যে ও নিজেকে টবের মধ্যের জুই-এর মতো গুটিয়ে নিয়ে কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জুই গাছটাতেও হয়তো এই নিয়মবশবর্তী সুগন্ধী ফুল একদিন ফুটবে, কিন্তু মিলির ফোটা শেষ। মিলি আর ফুটবে না। এখন শুধু ঘরে থাওয়ার অপেক্ষায় তবুও কক্ষপথে ঘোরা। শুধু ঘুরে ফেরা।

মিলির গলার স্বরে হঠাৎ চমক ভাঙল।

মিলি বলল, কি ভাবছিলেন?

এই-ই সব—এমনিই। মানে নেই কোনো।

কিছুর তো মানে নেই। মিলি বলল।

আমি চিঁড়ে ভাজা খাচ্ছিলাম। মিলি বলল, গাছটাতে ফুল কি ধরবে?

।। ৩ ।।

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই মিলির কক্ষে যেতাম। যদু থাকতে কখনও-সখনও। বেশীর ভাগ সময়ই থাকত না। যখন থাকতও তখনও আমি গেলেই নিশ্চিন্তে হাঁফ ছেড়ে মিলির সঙ্গ-দানের কর্তব্য আমাকে খুশী মনে দিয়ে ঝমককে জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে যেত। ও নোনা জলের মাছ ছিল। আর মিলি ছিল মিষ্টি জলের মাছ। একে অন্যের সাগরে গেলে খাবি খেত।

আমাকে পেয়ে মিলি এমন করত যে, সে বলার নয়। আমার জুলপীর দু-একটা চুলে পাক ধরতে আরম্ভ করে-ছিল। ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্য ও জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে আন্ডার-ওয়ার বিক্রেতার স্ট্যাটাসে পৌঁছেছি। তাতে আমার কোনো খেদ ছিল না। কিন্তু আমাকে মিলি সত্যি সত্যিই এত দামী মনে করত যে ওর কাছে এলে নিজের মূল্যহীনতার জন্যে নিজের কাছে বড় ছোট হয়ে থাকতাম। মিলির জন্যে বড় কষ্ট হতো। যার মধ্যে মিলি ওর মনের মিল খুঁজে পেল সে আমার চেয়ে একটু স্বচ্ছল হতে পারত, সেও নিজের গাড়ি চালিয়ে এসে মিলির ভালবাসার চোখের সামনে নামতে পারত। সেও সুন্দর দেখতে হতে পারত। মাঝে মাঝে মিলিকে যা দিতে ইচ্ছে করে তেমন কোনো উপহার এনে দিতে পারত।

মিলিটার কপালটাই খারাপ।

একদিন দুপুরে বারোটা নাগাদ হিরণ আমার দোকানে দৌড়ে এল। বলল, টিপু, শীগগীর একবার চল। মিলি পাগল হয়ে গেছে। ছোট মেয়েটাকে সিঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। কাপড়-চোপড়ের ঠিক নেই। যদু ডাক্তার ডেকেছিল, ডাক্তার বলেছেন, হেভীকেস।

আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

বললাম, হঠাৎ কি হলো?

হিরণকে বোবা বলে মনে হলো? ও বলল, চল দুজনে মিলে যাই। আমার একা যাওয়ার জোর নেই।

আমরা একটা ট্যাকসি ডেকে মনোহরপুকুরে গিয়ে পৌঁছলাম। বেশ গরম পড়ে গেছে। এতটুকু ট্যাকসিতে আসতেই গরমে চোখ জ্বালা করতে লাগল।

নীচ থেকে মিলির কান্না হাসি চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। কীভাবে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম, তা আমিই জানি।

যদু দরজার সামনে বসেছিল। বাচ্চা দুটো স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে।

ছোট মেয়ের মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মিলি বলল, টিপুদা দেখুন এরা বলছে, আমি পাগল। ঘরে বন্ধ করে রেখেছে আমায়। দেখুন এসে, আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেছে। এত অকৃতজ্ঞ, এত অকৃতজ্ঞ এত করে ভালো-বাসলাম, এত করে যত্ন করলাম, জল দিলাম, তবুও ফুল দিলো না, ফাঁকি দিলো আমায়। দেখুন একে বলেই লাফিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল।

হিরণ বলল, দেখিস টিপু।

আমি হিরণকে ধমক দিয়ে বললাম, ও কি বলছিস, মিলি কি জানোয়ার? ও কি কামড়ে দেবে?

মিলি আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আমাকে ওর বাগানে নিয়ে গেল।

মাথার উপরে দুপুরের সূর্য। জুই গাছটা টবে—শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেছে। বাদামী হয়ে গেছে তার রঙ।

মিলির দু চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল, বলল, দেখেছেন দেখেছেন টিপুদা? শেষ পর্যন্ত এই হলো।

তারপর বলল আমি বলছি আমি পাগল নই, আমি ভাল আছি। ওরা বলছে আমাকে একা রাখবে। আচ্ছা আমি কি একা নই? ওরা বলছে আমাকে কথা বলতে দেবে না।

আমি বললাম, কথা নাই-ই বা বললে। কথা না বললে কি হয়?

মিলি হোঃ হোঃ করে হাসল।

বলল, কথা বলতে দেবে না, যেন যখন কথা বলতাম, তখনও আমাকে কেউ বুঝত, এক আপনি ছাড়া, আপনি ছাড়া—বলেই মিলি জুই ফুলের টবটা তুলে নিয়ে আমাকে মারবে বলে দৌড় এল। দৌড়ে আসতে গিয়ে পড়ে গেল চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে।

আমি হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাত ধরে টেনে তুললাম। টবটা মেঝেয় পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

মিলি হাউ হাউ করে আমার হাত জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, আমি ভেঙে গেলাম টিপুদা, ফুরিয়ে গেলাম।

পিছনে চেয়ে দেখলাম।

হিরণের চোখে জল, যদুর চোখেও জল, আমারও চোখে ভিজে ভিজে লাগল।

আমি জানি যদু ও হিরণ ওকে ভালোবাসত ওদের মতন করে। আমিও মিলিকে ভালোবাসতাম আমার মতন করে।

কিন্তু আমার সেই মুহূর্তে নিজের উপর বড় ঘৃণা হলো আমি লেখক বলে, মিলিকে আমি বুঝতে পেরে-ছিলাম পুরোপুরি অথচ মিলির জন্যে কিছুমাত্র করার সাহস বা ক্ষমতা নিয়ে জন্মাই নি বলে।

শুকনো জুই গাছটা গোড়াতে এক দলা মাটি নিয়ে, টব থেকে আলাদা হয়ে মেঝেতে পড়ে ছিল।

আমি জানি আমার সামনে একটা আয়না থাকলে আমাকেও এই মুহূর্তে অবিকল ঐ জুই গাছটার মতোই দেখাতো। ঐ শুকনো জুই গাছটার মধ্যে মিলির, আমার ও ঐ গাছটারও বিফলতা, করুণ অসহায় পরিণতি-হীনতা যেন অঙ্গাঙ্গী হয়ে, ভূলুণ্ঠিত হয়ে ছিল।

দ্বিরাভিসার

শওকত ওসমান

কৃষ্ণপক্ষেও অন্ধকার প্রতিদিন সমান থাকে না।

এই তারতম্য বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে। মেঘ গাছপালা রাত্রির প্রহর, চোখ অথবা বুক ইত্যাদি।

গ্রামের রাস্তায় নেমেই মাজু তার বুকের উপর তিন-চার সের ওজনের পুঁটলিখানা সযত্নে চেপে ধরেছিল যেন পড়ে না যায়। চাষীর ঘরের মেয়ের কাছে তিন-চার সের ওজনের ভার আবার বোঝা হয় নাকি? কিন্তু বইবার ক্ষমতার উপরই শুধু ভার নির্ভরশীল নয়। বাঁক-ও ঘাড়ে অযথা খামচি দিতে পারে।

মাজুর বার বার মনে হচ্ছিল, এখনই সে মুখ থুবড়ে মাটির উপর পড়ে যাবে। তার সঙ্গী আর একটি মেয়ে। প্রায় একই বয়স। নাম মরিয়ম। সে হঠাৎ কেশে উঠল। মাজু তখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গভীর রাত্রি। পুবে অন্ধকার। একে অপরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। শারীরিক অবস্থিতি এসব আন্দাজের মাপকাঠি।

সঙ্গিনী তখনই ফিসফিস করে উঠল মাড়ার কাশে ধরছে। মাজু, তুই থামলি ক্যান?

অন্য পক্ষ কোন সাড়া দিলে না পা বাড়িয়ে দিলে। রীতিমত সশঙ্কিত সে।

পাশাপাশি দুই জনে। মাজুর কান কিন্তু সদা খাড়া। আশপাশের শব্দ না ঘুলঘুলি খুঁজে পায়।

সামান্য পথ এগিয়ে মাজু আবার থমকে দাঁড়িয়েছিল।

সঙ্গিনী মরিয়ম শুধায় খুব ঘষা গলায়, কি রে অইল কী?"

'আর কদ্দুর যাওন পড়িবো?'

'বেশী দূরে না। আইলাম প্রায়—'।

'তুমি জায়গা ঠিগ চিনছ?'

'আন্ধারে কিছু দেহা যায় না। তবে আন্দাজ ঠিগই আছে।'

অহন মাঠের মদ্দি গেলে অয় না?

'রাস্তা হারাইতে পারি। তুই হাঁটার পারবি না।

নাড়াবন, কাদা, কাঁটা খোঁচা।'

অনাদি কাল থেকে এই গ্রাম-পথের সঙ্গে আকাশের মৈত্রী বাঁধা। ঝোপঝাপ গাছপালা কোথাও ফাঁকা, শূন্য ভিটে, ছিপছিপে-জল ডোবা—এমনই প্রবাহের জের।

তবে এই দুই পথিক ঘন-বসত জনপদ অনেকক্ষণ আগে পেরিয়ে এসেছিল। এখন প্রায় দুপাশে মাঠ। কচিৎ দু একটা কুঁড়ে ঘর পড়ে। তা বোদ্দুরে মজুর চাষী রাখালদের বিশ্রামস্থল।

মাজু হাঁটছিল প্রায় একই ধারার মন্ত্রবশীভূত বা নিশিগ্রস্ত।

দূরে গাঁয়ে গেরস্থর মোরগ ডেকে উঠল।

মরিয়ম চট করে থেমে কান খাড়া করে বলে একটু থামু।

'কান, মরিয়ম বুবু?'

চুপ কর।'

মরিয়ম কী যেন আঁচ করে ফিস ফিসিয়ে বললে, 'কুড়া (মোরগ) ডাহে! বিহান অয় না কি? রাস্তা হারাইয়া ঘুরছি না ত?'

'রাস্তা হারাইছ?'

মাজু আঁৎকে উঠল রীতিমত।

কিন্তু আর কিছু বোঝা হওয়ার পূর্বেই মরিয়ম বললে 'না রে কিছু না।'

মহাপূজার নির্ঘণ্ট

১। প্রতিদিন ঠাকুর দেখতে বেরুনো।
২। বাড়ীতে রান্নার পাট বন্ধ।
৩। খাওয়া - দাওয়া — গ্রেট ইস্টার্ণের রেস্টুরেণ্ট

সপ্তমীতে — শাহেন শাহ্
অষ্টমীতে — চাইনীজ
নবমীতে — ম্যাক্সিম্

এছাড়াও গ্রেট ইস্টার্ণের বিখ্যাত রুটি, কেক, পেস্ট্রিজ আর প্যাটিজ উৎসবে আনন্দে অপরিহার্য্য।

গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল
কলিকাতা
(পঃ বঃ সরকার পরিচালিত সংস্থা)

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীআমিয়নিমাই চরিত
(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)
প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০

কালাচাঁদ গীতা
প্রতি কপি—মূল্য ১-৫০

নরোত্তম চরিত
প্রতি কপি—২-০০

LORD GOURANGA
(vol. 2)
Per Vol. Rs. 6.00

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH
Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান :
পরিদর্শ পাবলিশিং (হিমাদ্রি বিভাগ)
১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

কারো বজ্জাত কুড়া খামখা ডাক দিছে। বিহান অইতে অহনও বহুৎ দেরী।

—আমার ডর করে, মরিয়ম।

—আ রে ডরাস কান? আমি কইলাম তর বিশ্বাস অয় না? অহন হাঁটা দে।

সমগ্র পৃথিবী নিঃশব্দে ঘুমায়।

মাজুরও মনে হয়, পৃথিবী ঘুমায়। যদি পৃথিবী জেগে থাকত? জাগ্রত জন্তুরা চীৎকার দিতেও সক্ষম। তাহলে কী তারা বাইরে পা ফেলতে সাহস করত? হুলোড় অভিসারের সহায়ক নয়। পৃথিবী দয়ার ভাণ্ডার। পৃথিবী ঘুমায়। তখনও তার শব্দ থাকে বৈকি। তা নিশ্চিন্ত জন্তুর দেহাভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের নিঃশব্দ নিনাদের মত। আওয়াজ তোলে কোন ক্ষতির বাসনা বাতিরেকে। এমন ধুক্‌পুক্‌ গতি শুধুই ছন্দ রচনা করে অথবা স্বপ্নের।

ঘুমাক, আরো গভীর ঘুমাক পৃথিবী।

আর এক নৈশ অভিসারের ছবি মাজুর মনে প্রচণ্ড ধাক্কার ধাক্কায় আছড়ে পড়ে মুছে যেতে লাগল অতি দ্রুত।

সেদিনও সংগে লোক ছিল।

কোন মেয়ে নয়।

পুরুষ। সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই ফরীদ। তার হাতে ছিল বন্দুক। পরণে খাকী মিলিটারী পোষাক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এক শ্রেণীর জীবের অভ্যুদয় ঘটেছিল, যাদের বলা হত রাজাকার। মাত্র মাস দেড়েক ফরীদ রাজাকার হয়েছিল। কাটা জোয়ান নয়। ছিপছিপে চেহারা। তাই বোধহয়, লম্বা গোঁফে মোটা ঝোপ বানিয়ে শরীরের সংগে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে নয়—জীবিকার সংগে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল সে। তার দুই চোখ ক্ষুদে মার্বেলের মত। কেমন একটা ধূর্ততামির ছাপ। কিন্তু গাঁয়ে ওদেরই রাজত্ব, যদিও দেশে এহিয়া খানের বাদ্‌শাহী। ওকে দেখে মাজু ভয় পেত, মুখে কিছু বলার সাহস পেত না। ফরীদ প্রস্তাব দিয়েছিল, লড়ায়ের যুগে জীবিকার নানা রাস্তা খুলে যায়। গাঁয়ে আর কাউকে উপোষে মরতে হবে না। মেয়ে মরদ সকলেরই একটা না একটা কাজ আছে। মরদেরা রাজাকার হতে পারে, যুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে। পাকিস্তান না কাফেরদের হাতে চলে যায় সেই উদ্দেশ্যেই লড়াই চলছে। সুতরাং প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কর্তব্য আছে। মেয়েদেরও কর্তব্য আছে বৈকি। ফরীদ রাজাকারের পরামর্শ-মত সেদিন সে রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু রাতে কেন?

—আমার ডর করে, ভাই।

—ডর?

—হ।

—কান?

—আমারে আন্ধার রাইতে কুথা লইয়া যান?

—হে তরে কওয়া লাইগব না। তুই নিজেও বুঝবি।

—কি বুঝমু?

—হাতে দশ ট্যাকার গরম নোট পাইলে তুই নিজে বুঝবি। মাসে তিন শ' ট্যাকা বেতন।

—তিন শ টাকা?

—হ। ডরাস কান?

—আপ্‌নে মিলিটারী—

মাজুর চোখের সামনে মাটিমেশা পরবর্তী দৃশ্যগুলো অন্ধকারেই যেন দ্রুত সাজিয়ে দিতে লাগল। বাংকার-এলাকা। জ্ঞাতিভায়ের পায়ে-পড়ে কান্না। অনুরোধ। দাবড়ি এবং টানা-হেঁচড়া। ফেরৎ-যাত্রায় জ্ঞাতিভাই সংগে ছিল। তার হাতে বন্দুক ছিল না। বস্ত্র বহু জায়গায় ফালা-ফালা। বহু দিনের অভুক্ত জন্তু শিকার এবং ধৈর্যের মর্যাদা রাখতে অনভ্যস্ত।

কয়েক মাস পরে কতকগুলো শব্দ আবার কানে বাড়ি মারতে লাগল, ডরো মাৎ...মুহব্বৎ করতা...মেরি জান্‌...।

ওরে আল্লা রে!

মাজু উচ্চ না হলেও, অনুচ্চ নয়—এমন স্বরে বিধাতাকে ডেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

'তর কী মাথা খারাপ অইছে? এত জোরে রাও (শব্দ) করস।' সাঙ্গিনী মরিয়ম ধমক দিয়ে উঠল।

উচ্চ শব্দের অর্থ নয় শুধু অনর্থও মাজু বোঝে বৈকি। তখন পৃথিবী জেগে উঠবে, যে-পৃথিবী সুপ্ত। গভীর প্রশান্তির মধ্যে হয়ত সুখস্বপ্ন দেখছে। পৃথিবী জেগে উঠলে তার পৃথিবী চুরমার হয়ে যাবে।

—মরিয়ম বুবু, আর কদ্দুর?

এবার সচেতন ফিস্‌ফিস শব্দ আসে সাঙ্গিনীর কাছ থেকে, 'কান খাড়া কইরা শোন্‌?

—কি কমু?

—আর বেশী দূর না। লগেই নদী। ধলেশ্বরীর রাও তর কানে যায় না?

ইষৎ শব্দপতি মাজু কান পেতে শুনলে। বোধ হয় জোয়ার আসছে। জলকল্লোল কানে স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ঘুমন্ত পৃথিবী।

এখানে জনহীন প্রান্তর। আশেপাশে গ্রাম আছে। কিন্তু কিছু দূরে। স্পষ্ট আন্দাজ চলে না। দূর-নিকট এখানে অবান্তর। অন্ধকার নিজের বাহুর তলায় আশ্রয় দিলে স্থান পৃথিবী থেকে মুছে যায়।

ওদের দশ বিশ গজের মধ্যে কোন মনুষ্য-সন্তান না থাকলেই হল। আর কোন ভয় নেই ত। এক মাস পূর্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। খান-সেনা নেই কোথাও। তবু ভয় শুধু মানুষকে।

তারা দুইজনে নদীর ধারে এসে পৌঁছেছিল।

ধলেশ্বরী জোয়ারের হুংস্রোড়ে স্ফীত। নিশীথ গগন কালো ঢাকনির মত জলরেখা মুছে দিয়েছিল দিগন্তে। নিকটে শুধু যেন তারই প্রতিবাদে ঢেউয়েরা গর্জমান।

হঠাৎ পৃথিবী চীৎকার করে উঠল।

মাজুর বক্ষসংলগ্ন পুঁটলি নড়ে উঠল না শুধু, জানান দিলে দু মাসের শিশু-কণ্ঠের শেষ ত্যাগদের সাহায্যে একটা ওয়া--ওয়া-জাতীয় শব্দ-মারফৎ।

চীৎকার ও কান্না যুগপৎ প্রতিযোগী এবং অস্তিত্ব-দর্পী।

মাজু শিশুকে বুকে চেপে নিজের স্তন অনাবৃত করলে। প্রথম সন্তানের জননী স্তোক দেওয়ার ইলেম শিখে ফেলেছে বৈকি।

মরিয়ম বাধা দিতে হাত বাড়ালে এবং বললে, আর মায়া বাড়াস নে। একডু বাঁয়ে সর যা। তারপর ফেইলা দে। বেজম্মা মিলিটারীর ছাওয়ালের লগে আবার মুহব্বৎ!

মাজু সন্তিগনীকে এড়িয়ে যেতে ঈষৎ সরে গেল। তার স্তন তখন শিশুর মুখে। কান পাতলে চুকচুক মৃদু শব্দ শোনা যায়। সে ত আর ধলেশ্বরী নয় যে গর্জনের গায়েন হবে।

মরিয়ম অধীর হয়ে উঠেছিল। তাড়া এলো তার দিক থেকে, 'আর দেরী করিস নে। জোর জোয়ার আছে। কোথায় যে ভাসাইয়া নিবো।'

'আমি পারুম না, বুবু। আপনে ফেইলা দেন।' মিনতিমুখর স্পষ্ট স্বর অপর দিকে। মাজু স্তন থেকে জাতককে ছিনিয়ে নিয়ে মরিয়েমের দিকে এগিয়ে দেয়।

পৃথিবী তখন তুমুল চীৎকার জুড়েছিল।

অন্ধকারে জানা যায় না, গ্রামগুলো কত দূরে বা আশপাশে মানুষ আছে কি না। সুতরাং শব্দ তাদের কাল হতে পারে।

অধীরতা দুই দিকেই চাবুক কষায়।

মাজু কাঁকিয়ে উঠল 'মরিয়ম বুবু, আপনার পায়ে পড়ি। লন আপনে ফেইলা দেন।

'আমি পারমু না।' মরিয়ম সাফ জবাব দিলে।

মাজু পুঁটলি বুকে মাটির উপর বসে পড়ে ডুকরে উঠছিল। কান্না, গোঙানি, কথা তখন একত্রে জড়িত। তবু বোঝা যায়, 'আমারে মাফ করেন। আমি পারুম না। অপনে দেন।'

মানবীর বুকে সকল ভাবনা সঁপে দিয়ে তখন পৃথিবী শান্ত।

মরিয়মের গলা খনখনিয়ে উঠল, 'পোলা করার সময় খেয়াল ছিল না? পোলা করবি তুই আর গুনার (পাপ) ভাগী হমু আমি? আমি অহনই চইলা যামু। তুই যা-হয় কর। বাড়ী গিয়া আর প্যানপ্যানাস নে।'

পৃথিবী ও প্রসূতি তখন নিঃশব্দ।

বোবা স্তব্ধতা দিকচক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত, নদীর দোরাত্ম বাদ দিলে।

মাজু ধীরে ধীরে উঠে পড়ল।

জোয়ারের উচ্ছ্বল তুমুল।

নদীর পাড় এখানে বেশ উঁচু। জল এত এগিয়ে এসেছে নিকটে যে নীচে নামার প্রয়োজন নেই।

জলের প্রহারে ধ্বস নামার পূর্বেই মাজু উপর থেকেই তার পৃথিবী ধ্বসিয়ে দিলে।

শব্দ হয়ত একটা উঠেছিল। কিন্তু ধলেশ্বরীর গর্জনে সব ঢাকা পড়ে গেল।

সুখের অসুখ

সুধাংশু ঘোষ

কাল রাত দশটায় হাওড়ায় ট্রেন উঠেছে ললিতা। ট্রেন থেকে নামল এই মাত্র। বার ঘণ্টার বেশী। প্রচুর ধকল গেছে সন্দেহ নেই। অথচ ললিতাকে দারুণ ঝকঝকে দেখাচ্ছে। সকালে নিশ্চয়ই শাড়ি বদলেছে, প্রসাধন করেছে, তবু সবাইকে রাত ভোর ট্রেনে কাটাবার পর এমন উজ্জ্বল দেখায় না।

ললিতাকে হাত ধরে জীপে উঠতে সাহায্য করে অনিন্দ্য ঘুরে গিয়ে ওপাশ থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠে স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখল। ললিতাকে সাহায্য করবার দরকার ছিল না। নিজেই স্বচ্ছন্দে জীপে উঠে বসতে পারত। অভ্যেস আছে। তবু অনিন্দ্য হাত ধরে একটু সাহায্য করল। ললিতাও যেন তাই চেয়েছিল। আসলে পুরো এক মাস পরে আজ ফিরছে ললিতা। ছোঁয়াছুঁয়ির বাসনা দুজনেরই।

মুন্ডা ছেলেটা অনিন্দ্যর জীপ চেনে। আগেই ললিতার জিনিসগুলো তুলে দিয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফোর-হুইল-ড্রাইভ জীপটা গর্জে উঠল জন্তুর মতন। খনি শহর বড়-বিলের দোকানপাট, মাল বোঝাই লরি, ঘিঞ্জি ঘরবাড়ি পেট্রল পাম্প, ধুলোময়লা, লোকজন পেরিয়ে যেতে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগল না।

একটা মোড় নিতেই খোলামেলা। ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে শালসেগুনে ঢাকা পাহাড় দিয়ে দূরের দিগন্তরেখা তৈরী। তার আগে অনেকটাই সমতল ভূমি। জীপ চলার রাস্তার দুপাশে ফসলের খেত। গাঢ় গেরুয়া রংএর পাথুরে মাটি। এখান থেকেই আন্দাজ করা যায়, দূরের পাহাড়ের বুকের মধ্যে লোহা সঞ্চিত আছে। তুলে নিতে হবে।

বাঁক নেবার সময় অথবা মাল বোঝাই ভারী লরি পাশ দিয়ে গেলে বাঁয়ে সরে গিয়ে জায়গা দেবার সময় ললিতা খুব কাছে চলে আসছিল, প্রায় ঢলে পড়ছিল গায়ের ওপর। ক্লান্তি। সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে না। সিলকের শাড়ির আঁচল, না হলে শ্যাম্পু-করা চুল সুড়সুড়ি দিচ্ছিল অনিন্দ্যর গলায়, কানে। এত-ক্ষণেও একটা সিগারেট ধরায় নি অনিন্দ্য। ধরাবে, তার আগে ললিতার শাড়ির চুলের প্রসাধনের শরীরের মিশ্র গন্ধে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবে খানিক, তারপর সিগারেট ধরাবে।

অনিন্দ্যর জীপ চালাবার কথা নয়। ড্রাইভার আছে। একখানা জীপ ও একজন ড্রাইভার তার জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত কাজে বেরোলে ড্রাইভার নেয় না অনিন্দ্য। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দেয়।

যেমন গতকাল। নিজে এগার মাইল জীপ চালিয়ে কাল সন্ধেয় বড়-বিলের একটা পানশালায় এসেছিল। আড়াই ঘণ্টা পানশালায় কাটিয়ে আবার নিজে স্টিয়ারিংয়ে বসে ফিরে

গিয়েছিল বেসক্যাম্পের কোয়ার্টারে। আজ সকালের মতন কাল সন্ধ্যের প্রয়োজনটাও ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। কাল পানশালায় অনিন্দ্যর জন্য অপেক্ষা করছিল তেজ সিং। বড় কনট্রাকটর ফার্মের সহকারী ম্যানেজার তেজ সিংয়ের সঙ্গে পানশালার টেবিলে অনিন্দ্য বন্ধুর মত সহজ স্বচ্ছন্দ সোচ্চার ছিল আড়াই ঘন্টার বেশীর ভাগ সময়। ফিসফিস কথা হয়েছিল মাত্র কয়েক মিনিট। এবং তখনই কিছু গোপন লেনদেন। কনট্রাকটর ফার্মের তেজ সিং আর লোহার খনি এলাকার কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনীয়ার অনিন্দ্যর মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের একটা অদৃশ্য সুতো আছে। মাঝে মাঝে সেই সুতোর টান মেরে যোগাযোগ করতে হয় ওদের। যেমন কাল সন্ধ্যের ধড়াবিলের পানশালায়।

সমতলেও অবিরাম এঁকেবেঁকে জীপ চালাতে হচ্ছে। রাস্তাটায় অজস্র হাঁ-মুখ। বিরাট বিরাট গর্ত হাঁ করে আছে। রাত্তিরে অন্তত এক-একটি গর্ত এক-একটি মরণফাঁদ। রাস্তাটা বানিয়েছিল তেজ সিংরা। কয়েক মাস আগে একবার মেরামত হয়েছে। এখনই আবার মেরামত করা দরকার।

এগার মাইল পথের মাঝখানে একটা পাহাড়ী নদী। চওড়া না হলেও ভয়ংকর। বর্ষাকালে একেবারে খেপে যায়। সেই নদীর ওপর সেতুটাও বানিয়েছিল তেজ সিংরা। সেতুর গায় মারাত্মক ফাটল ধরেছে। এখনই মেরামত করা দরকার।

দু-একদিনের মধ্যে অনিন্দ্যকে চীফ কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনীয়ারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। রিপোর্টে বলতে হবে, রাস্তার গর্ত আর সেতুর ফাটলের কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মাল-বোঝাই লরির ঘনঘন যাওয়া-আসা। কনট্রাকটর ফার্মের কাজে কোনো গলদ ছিল না। সুতরাং মেরামতের কাজটা আবার তেজ সিংরাই পেতে পারে।

এসবের জন্য কাল সন্ধ্যেয় তেজ সিংয়ের কাছ থেকে একটা ভারী খাম অনিন্দ্যর হাতে চলে আসে। তেজ সিং ফিসফিস করে বলে,—চার হাজার আছে।

টাকার একটা আলাদা গন্ধ আছে। যদিও এখন সেই ভারী খামটা অনিন্দ্যর ভেতর-পকেটে নেই সেটা রয়েছে কোয়ার্টারে, তবু তার গন্ধ শাড়ি-চুল-প্রসাধন-শরীরের গন্ধ ছাপিয়ে উঠল। সিগারেট ধরাল অনিন্দ্য।

স্পীড বাড়িয়ে দিল। আরো তাড়া তাড়ি পৌঁছে যেতে চায় কোয়ার্টারে। শোবার ঘরের সব জানলায় ঘন নীল পর্দা। ঘন নীল জমিতে কুচি কুচি সাদা পাপড়ি। ললিতা নিজে পছন্দ করে কিনেছে। শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে খোলা জানলাগুলোর পর্দা নামিয়ে দিলে ভেতরে আবছায়া! ছায়া খুঁজছিল অনিন্দ্য, অন্ধকার খুঁজছিল। চোখের কোণ দিয়ে ললিতাকে দেখল একবার। ললিতাও মুখ না ফিরিয়ে একইভাবে দেখল অনিন্দ্যকে। ঠোঁট চেপে দুজনেই হাসল। হাসির মানে দুজনেরই জানা।

রাস্তাটা জ্বালাচ্ছে। কিছুতেই আরো জোরে যাওয়া যায় না। কেন যে রাস্তাটা এত তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়, অনিন্দ্য বোঝে। সবই বোঝে সবই দেখতে পায় তবু না-বোঝার না-দেখার ভান। এবারে তেজ সিংকে বলতে হবে একটু বাঁচিয়ে যেন মেরামতের কাজটা করে। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

মাত্র এগার মাইল এবড়োখেবড়ো রাস্তা। তারপর বেসক্যাম্পের সিকি মাইল খাড়াই। এটুকু আসতেই সূর্য সোজা মাথার ওপরে। কোয়ার্টারের গেটের কাছে জীপের শব্দ পেয়েই অনিন্দ্যর কাজের লোকটা হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছিল। দাদাবাবু বউদির অভ্যেস সে সবই জানে। রান্না শেষ এখনই খেতে দিতে পারে। তবু সে জানে আগে একদফা চা হবে। বউদি নিশ্চয়ই ভালো তাজা চা পাতা এনেছেন। জল ফুটলে সেই নতুন চাপাতা ভেজাতে হবে।

বুড়োসুড়ো কাজের লোকটা আরো জানে বউদি যে কমাস থাকবেন সেই কমাস শোবার ঘরের আশপাশে যাওয়া নিষেধ।

চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছে অনিন্দ্য। ললিতা আয়নার সামনে। চুলে হয়ত একটি-দুটি ক্লিপ লাগানো ছিল। এখন দু হাত তুলে খুলছে সেই ক্লিপ। ললিতার এক চিলতে সিলকের কাপড়ের জামা আর কোমরের শাড়ির মাঝখানে অনেকটা জমি খাঁ-খাঁ শূন্য। যেন মোম দিয়ে মাজা চামড়া, যাকে মসৃণ ত্বক বললে সবটুকু বলা হয় না। কোথাও এতটুকু ভাঁজ নেই। শুধু ওপরের এক চিলতে সিলকের কাপড়ের জামার তলা থেকে মারাত্মক ঢেউ নেমে এসেছে নাভি-মূলে। খোলা ছায়াছিন্ন নাভির গভীরতায় ললিতার তৃতীয় নয়ন। সেই চোখ অনিন্দ্যকে দেখছে।

সিগারেটটা ছাইদানিতে চেপে নিভিয়ে অকারণে মুচড়ে দিয়ে অনিন্দ্য এগিয়ে এল। বাড়িয়ে দিল স্টিয়ারিংয়ের ঘষায় কড়াপড়া হাত। ললিতার কোমর জড়িয়ে পাঁচটি অব্যর্থ আঙুলের চাপে ঢেকে দিল নাভিমূলের গভীরতা।

অপরূপ কুটকৌশলে ললিতা পিছলে সরে গেল। —এখন কী হচ্ছে। ছিঃ। আমি আগে স্নান করব ভালো করে। ঘামে সারা গা চিটচিট করছে। চুলের মধ্যে পর্যন্ত বালির গুঁড়ো।

আই.এস.আই. ছাপ
কিনা কোন রেজার ব্লেড
উচ্চমানের হয় না
নিখুঁত তো নয়ই

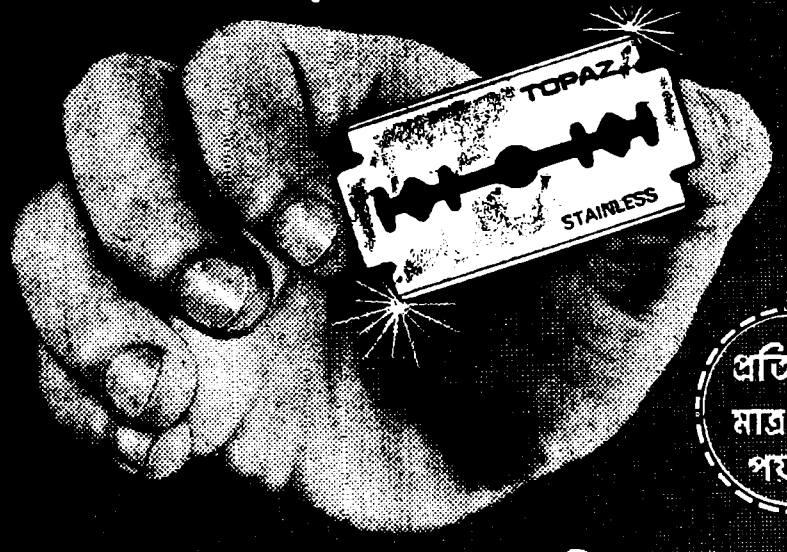

প্রতি ব্লেড
মাত্র ২৫
পয়সা*

টোপাজ স্টেনলেস প্রথম ভারতীয় রেজার ব্লেড যা
IS : 7271
আই.এস.আই. দ্বারা অনুমোদিত

তাই অনেক অনেক দেশের
অনেক অনেক লোক পছন্দ করেন—

টোপাজ

লক্ষ লক্ষ লোকের পছন্দ

* স্থানীয় কর ও শুল্ক আলাদা

CONCEPT-MI-2276-BEN

অনিন্দ্য হেসে ঘর থেকে বারান্দায় চলে এল। ছোট্ট বারান্দায় দুটো বেতের চেয়ারের মাঝখানে নিচু টেবিল। তার ওপর দুটো খালি গ্লাসের কাপ। তুলে নেওয়া হয়নি। না ডাকলে বুড়ো লোকটা এখন এদিকে আসবেই না। একটা চেয়ারে বসে অনিন্দ্য আর একটা সিগারেট ধরাল। আগের সিগারেটটা দু তিনবার মাত্র টেনেই চেপে নিভিয়ে দিয়েছিল।

ললিতা স্নানাগার দেখে শাওয়ার খুলে স্নান করুক। শ্যাম্পু করুক চুলে। বাথরুমে প্রচুর জল আছে। পাইপ বেয়ে নেমে আসছে পাহাড়ী নদী থেকে। সেই জল শীতের সময় উষ্ণ উষ্ণ থাকে, গরমের সময় ঠান্ডা। নগরজীবনের উপকরণের ছিটেফোঁটা জুগিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বেসকাম্পে—অন্তত অনিন্দ্যর মতন অফিসারদের কোয়ার্টারে। তবু এখন তো কেবল বেসক্যাম্প এবং তার সঙ্গে ড্রিলিং ইঞ্জিনীয়ার ও সার্ভেয়রদের একটা প্রসপেক্টিং ক্যাম্প। খনি থেকে সঞ্চিত লোহা খুঁড়ে নেওয়া সত্যি-সত্যি শুরু হলে পাহাড়ের চুড়োয় টুকরো শহর তৈরি হবে।

স্নান-খাওয়া সারা হলে পোষাকঘরের দরজা বন্ধ হল। তিনটে জানলায় ঘননীল পর্দা নাড়িয়ে দিল অনিন্দ্য। আবছায়ায় ভরে গেল ঘর। পাখাটা নিঃশব্দে ঘুরছে। দুজনের বিছানায় পুরো এক মাস একা শুয়েছে অনিন্দ্য। আজ ললিতা ভাঙাভাঙা দুধরং চাদর পেতেছে বিছানায়, বালিশের ওয়াড় বদলেছে। খাওয়া শেষ হওয়ার অল্প পরেই হাই তুলতে তুলতে এসে কাত হয়ে শুয়েছে একপাশে। ললিতার চোখ বোজা, অনিন্দ্যকে দেখতে পাচ্ছে না। এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েনি নিশ্চয়ই। ক্লান্ত হয়ে শুলে মেয়েরা কেমন রহস্যময় হয়ে যায়। যেন অন্যরকম, চেনা যায় না। জানলা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্য একটুক্ষণ ললিতার শরীরের খাড়াই এবং ঢাল দেখল। ছাইদানিটা প্রায় চোখের সামনেই রয়েছে। অথচ ঠিক দেখতে পেল না। শেষটান দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে ফেলল বাইরে। এরকম করা সব সময় নিরাপদ নয়। অন্য সময় এরকম করে না অনিন্দ্য। সিগারেট ছাইদানিতে চেপে নেভায়।

অনিন্দ্যর বালিশের দিকে ফিরেই ললিতা শুয়েছে কাত হয়ে। অনিন্দ্য এমন সাবধানে বিছানায় উঠল যেন ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছে এবং অনিন্দ্য তার ঘুম ভাঙাতে চায় না। অথচ শুয়েই অনিন্দ্য একটা হাত রাখল ললিতার কোমরে। হাতের চাপ, দিল টানল ললিতাকে নিজের দিকে।

ললিতা ঘুম ঘুম গলায় বলল এখন একটু ঘুমোতে দাও। রাত তো পড়ে আছে সামনে।

চোখ খুলল না ললিতা। জানলার দিকে পাশ ফিরল।

প্রথমে একটা শিরশিরানি নেমে গেল অনিন্দ্যর শিরদাঁড়া বেয়ে। সে কি বেশী হ্যাংলামি করে ফেলছে? রাগ হল নিজের ওপর, ললিতার ওপরেও।

একটু পরেই অবশ্য স্নিগ্ধ হল আবার। রাগ রইল না ক্ষোভ না। মনে পড়ল, ললিতা সারা রাত ট্রেনে কাটিয়েছে, এক-আধটু ঘুম হলেও প্রচুর ধকল গেছে নিশ্চয়ই। এই ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে ক্লান্তি স্বাভাবিক। খানিক ঘুমিয়ে নিক ললিতা। ঘুমিয়ে উঠলে বিকেল, তারপর রাত তো পড়েই আছে সামনে। এখন আর ললিতাকে তেমন রহস্যময় অচেনা লাগছিল না। মমতার চোখে দেখছিল অনিন্দ্য।

মনে হল ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্বাস নিচ্ছে ঘুমন্ত মানুষের মতন। দুপুরে অনিন্দ্যর ঘুম আসে না। চেষ্টা করে লাভ নেই। ভাবল ঘুমোতে না পারলেও একটু শান্তে থাকি ললিতার পাশে। চোখ বুজেই রাখল। চিত্ত হয়ে শুয়ে সাদা পাখাটার ঘোরা দেখল কিছুক্ষণ। কতই যেন দেখার জিনিস। জোর হাওয়ায় জঙ্গলের দিকের জানলার পর্দাটা মাঝে মাঝে উড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। জঙ্গলের দিক বলে রোদ আসছিল না ঘরে। ওদিকটায় গাছ-গাছালির ছায়া।

আজ রবিবার। ছুটির দিনে কাজের চাকা বন্ধ। তথাপি থেকে-থেকে ব্যাপ্টিংয়ের শব্দ। ছুটির দিনেও ব্যাপ্টিং চলছে, পাথর ফাটিয়ে রাস্তা বানানো হচ্ছে। পাহাড়ের কোমর জড়িয়ে-জড়িয়ে সেই রাস্তা উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। ক্লাশিং প্ল্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে পাহাড়ের গায়। বছরখানেকের মধ্যে ক্লাশিং প্ল্যান্ট চালু হয়ে যাবে। তখন একটির পর একটি ডাম্পার খুব্লে তোলা লোহা বয়ে নিয়ে গিয়ে ঢেলে দেবে ক্লাশিং প্ল্যান্টের জা-জাশারে। গুঁড়ো-করা লোহা সার সার অপেক্ষমাণ ওয়াগনে বয়ে নিয়ে যাবে কনভয়ের বেল্ট। ওয়াগনগুলো চলে যাবে বিশাখাপত্তনমে। আরো অনেক লোক আসবে এই পাহাড়-জঙ্গলে চাকরি নিয়ে। পাহাড়ের চুড়োয় টুকরো শহর তৈরি হবে। সেখানে দুশো কোয়ার্টার বানানোর বায়না পেয়েছে তেজ সিংরা। তাদের কাজ দেখার দায়িত্ব থাকবে অনিন্দ্যর। সাদার্ণ অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটের দাম শোধ হয়ে যাবে।

এখানে পাখি ডাকে না। ভোরবেলায় না সন্ধেবেলাও না। এখনে কুকুর নেই। ব্যাপ্টিংয়ের শব্দে ভয় পেয়ে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে পাখিরাও সরে গেছে গভীরতর অরণ্যে। বেসক্যাম্পের আশপাশে এখনো রয়ে গেছে খরগোশ এবং নানা রকম চিকন সাপ, কাঁকড়াবিছে ও অঢেল অজস্র পোকামাকড়। তাড়া দিলেই চলে যায়। সুতরাং ব্যাপ্টিংয়ের আওয়াজ ছাড়া ছুটির দিনে অন্য শব্দ নেই। অনেকক্ষণ পরে হাত একবার ললিতার পায়ের। না হলে থম মেরে থাকে এখানকার দুপুর। আজ এখন দুপুরে আরো বেশী স্তব্ধতা। বিকেল হয়ে এসেছে।

দুটো ব্যাপ্টিংয়ের মাঝখানের নিঃশব্দ ভেঙে কারা যেন কথা বলছিল। কোয়ার্টারের পেছন দিক থেকে। অনেকে উত্তেজিত গলায় কথা বলছে। ছোট্টা উড়ে এসে অনিন্দ্যর কানে এই দিচ্ছিল। এরকম চলছিল কিছুক্ষণ ধরে। প্রথমে অনিন্দ্য আমল দেয়নি। এখন মনে হল ব্যাপার কী? কিসের এত উত্তেজনা?

বিছানা থেকে নামল। এলোতাবে নামল যাতে ললিতার ঘুম না ভাঙে। গেটের দিকের জানলার পর্দা তুলে দেখতে পেল গুটো লোক চাপা গলায় তর্ক করছে। একজন তাদের কাজের বুড়ো, অন্যজন গুনিদা। ড্রিলিংমেশিন ধরে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু অনিন্দ্যর অধীনে। ড্রিলিংই যেখানে কাজের গুনিদা তার সুযোগ দেখে ড্রিলিং শিখে নিতে চায়। কিন্তু কাজের বুড়ো দেখা করার অনুমতি দেবে না, কারণ, সাহেববাবু এসে ড্রিলিংয়ের সঙ্গে লোকায় শুয়ে। এই নিয়ে তর্ক।

আচমকা ললিতা ঘুমের ভাঙায় একা অনিন্দ্য। গুনিদার গায়ে গেঞ্জি থাকলেও গায়ে শার্ট নেই শুধু একটা ময়লা জাঙ্গিয়া গোঁজি, পায়ে হাওয়াই চপ্পল। অনিন্দ্যকে দেখতে পেয়ে ভিতরটা উত্তেজিত হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে গেল কাজের বুড়ো।

গুনিদা তার এক সহকর্মীর বিষয়ে খারাপ খবর দিতে এসেছে। লোকটা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলের ঘানি টেনেছে। পড়ে আবার ছাড়া পেয়েছে। অসময় হলেও অনিন্দ্যর এখনই একবার সেখানে যাওয়া দরকার।

লোকটার নাম সমরু। গুনিদার সঙ্গে একই কাজ করে। তবে গুনিদার থেকে সিনিয়র। বরং অনিন্দ্যর চেনা কাজের মানুষ। সিমেন্ট চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

অনিন্দ্য আর গুনিদার ছায়া পড়েছে গেটের পাশে। পুবে দিকে প্রসারিত ছায়া। রোদ্দুরের তেজ কমে এসেছে। দুজনের ছায়ার দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্য

যে ছবি আসছে

নিশ্চয়/শর্মিলা দেবী

শান্ত রক্তের দিনগুলি
সুমিত্রা/শুভেন্দু

প্রণয় পাশা/সুচিত্রা সেন

নবরূপ
রত্না ঘোষাল

লাট্টু
মাঃ প্রিন্স

ভাগ্যলিপি
অঞ্জনা

হাতে রইল তিন

শেষ যাত্রা
মহুয়া

অন্য
সোমা

বনবাসে
সমিত ভঞ্জ

চাঁদের কাছাকাছি
উত্তমকুমার

কিশোর কবি সুকান্ত
অভয় সেনগুপ্ত

প্রতিশ্রুতি
সন্তু মুখার্জি

অমৃতের স্বাদ
সমিত ভঞ্জ

নান্দতা
সৌমিত্র

যে ছবি আসছে

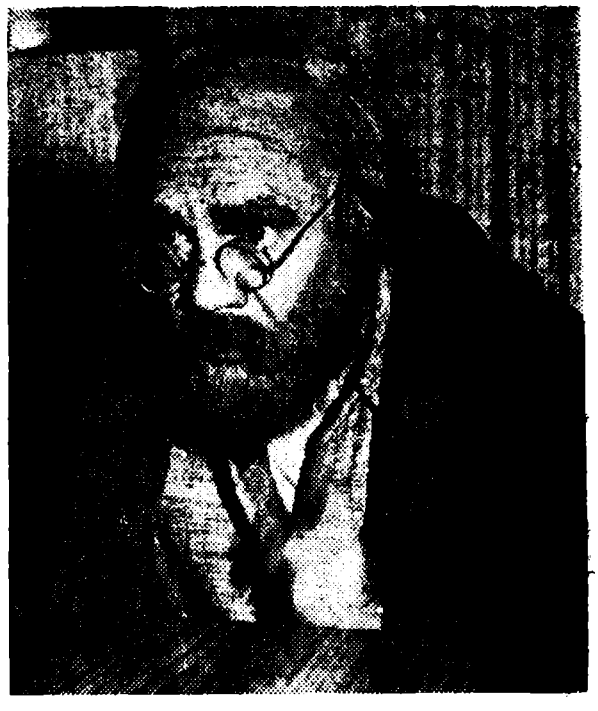

শিবরাত্রি সর্দার
উত্তমকুমার

এক যে ছিল দেশ
সৌমিত্র

পরিচয়
রুমা

বর্ণ বিবর্ণ
ইন্দ্রাণী রায়

অজস্র ধন্যবাদ
অপর্ণা সেন

একটু ভাবল। আসলে ভাববার কিছু নেই। তার যাওয়া দরকার। এরপর ওরা সমরুকে পুলিশ বাড়িতে নিয়ে যাবে। আর কী করবে।

পায়ের শব্দেই অনিন্দ্য গায়ে একটা শার্ট গলিয়ে নিল। জীপ চালিয়ে নিচের দিকে বেশ কিছু পাক ঘুরে জায়গাটায় পৌঁছতে মিনিট পাঁচেক। জন দশেক মানুষ লোকের জটলা। সমরু মাটিতে পড়ে আছে। লাথিটাথি চলছে তখনো। এক-আধটা। কাছেই দু' বস্তা সিমেন্ট। অনিন্দ্য জীপ থেকে নামতেই সবাই একটু সরে দাঁড়াল। সমরু বেহুঁশ হয় নি। জন্তুদের মতন বুকে হেঁটে এগিয়ে হাত বাড়ির অনিন্দ্যর পা ধরতে গেল।

গোঙানি মিশিয়ে বলল, মার জান গেল দিদা!

গুমিদা জীপের পেছনে টেনে তুলল সমরুকে। লোকটা বসে থাকতে পারল না। লম্বা সিটটার ওপর শুইয়ে দিতে হল। অনিন্দ্য গ্রুপ ফটোতোলা করে লোকগুলোকে চলে যেতে বলল। ইনসপেক্টর বন্ডা দুটো দেখে নিশ্চিন্তের হাতানিতে মিশ্র বাবার নিশ্চিন্ত হল। জীপ স্টার্ট করে গলা ছাড়িয়ে এল, পুলিশের হাতে দিতে হবে, আমি যাচ্ছি।

ফিরবার পথে ডাক্তারখানায় গিয়ে ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। জানাই ছিল পাওয়া যাবে না। ছুটির দিন এই সময়ে ডাক্তার দুর্গত সাহেবের কোয়ার্টারে তাস খেলতে যান। কম্পাউণ্ডার সমরুর জন্য দুটো গায়ের ব্যথা কমার বড়ি দিল।

নিশ্চিন্ত হলেও অনিন্দ্যর বেরোনোরের বারান্দায় ভুবনো রোদ্দুর। সমরুকে বসানো হয়েছে বেঞ্চের শোয়াতে হল। কাজের বুড়োর বালিশটা এনে দেওয়া হল মাথার তলায়। খবর দেবার মতন সমরুর ঘরে কেউ নেই। ওর বাপ থাকে দেশে, এখানে একাই। সুতরাং গুমিদার আর কোনো কাজ ছিল না। অনিন্দ্য তাকে চলে যেতে বলল।

ললিতা একটার পর একটা প্রশ্ন করছিল। কাজের বুড়ো বসার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে দাদাবাবুর পায়ের দিকে বসতে দেখে অন্যদিকে সরে পড়ল।

পরের পরেই সমরু জল দিয়ে গিলে ফেলল বড়ি দুটো। গোঙানি ছাড়া মুখে অন্য কথা নেই। উঠে বসতে পারছে না। ললিতা ফিরে এসে প্রথম দিনেই এই সব কাণ্ড দেখে বারবার ভুরু কোঁচকাচ্ছিল।

রাত আরো বাড়ল। সমরুর গোঙানি থামল না। অনিন্দ্য উঠে শোবার ঘরে গেল। জলভরা কাচের জার, গ্লাস এবং ব্রাণ্ডির বোতলটা তুলে নিল। পাশের ছুইস্কির বোতলটার দিকে তাকিয়ে জিভ হঠাৎ শুকনো মনে হল। বসার ঘরে এসে দোতলার তলায় স্যাটুকু ছিল সব গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে উপুড় করে দিল সমরুর গলায়।

খানিক পরে, হয়ত সাহেব একা বসে আছেন দেখে সঙ্গ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে, সমরু কষ্টে উঠে বসল। চোখ দিয়ে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা চাটছিল। দূর থেকে হয়ত বুঝতে পারছিল না বোতলটা খালি। অনিন্দ্য একবার ভাবল, সমরুকে জিজ্ঞেস করে—কেন চুরি করলি? সত্যি কেন চুরি করলি? সত্যি কেন চুরি করল সমরু? খারাপ মাইনে তো পায় না। তেমন অভাব থাকবার কারণ নেই। অনিন্দ্য জানে সমরু নেশা করে, হাড়িয়া খায়, বড়বিবির বিশেষ স্নেহাদেশ পাড়ার বাজা। সুখ খোঁজে, আরো-সুখ! কেন চুরি করল জিজ্ঞেস করার বদলে একটা লাথি মেরে লোকটাকে আবার শুইয়ে দেবার বাসনা হল।

ওসব কিছুই করল না অবশ্য অনিন্দ্য। বরং সমরুর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কী যেন মোচড় দিয়ে গেল তার নিজের বুকের মধ্যে। সমরুকে তো দেখতেই পাচ্ছে, বসে বসে দুলছে আর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে, কাতরানি থেমেছে। সেই মুহূর্তে অনিন্দ্যর নিজেকেও একবার দেখতে ইচ্ছে হল শোবার ঘরের বড় আয়নায়। শোবার ঘরেই এল, তবে আয়নায় দেখল না নিজের মুখ। হুইস্কির বোতলটা এবং অন্য একটা গ্লাস নিয়ে ফিরে গেল বসার ঘরে।

একবারেই অনেকটা ঢেলে নিল গ্লাসে। অল্প পরে গ্লাস খালি হলো আবার। রাত বাড়ছিল, আরো রাত বাড়ছিল। একসময়ে মনে হল, সমরুর দুটো লাল চোখ ছিটকে বেরিয়ে আসবে। একটু আগে লাথি মারতে চেয়েছিল, এখন সমরুর জন্য মমতায় ভরে গেল অনিন্দ্যর বুক। বোতল থেকে খানিক ঢেলে দিল সমরুর গ্লাসে, জার থেকে জল মিশিয়ে দিল। সমরুর পকেটের বিড়ি নিশ্চয়ই গুঁড়ো হয়ে গেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ছুঁড়ে দিল। লুফে নিল সমরু। হাতে ছ্যাঁকা লাগল। আমল দিল না। দুজনের সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল ছোট ঘর। যেন পানশালায় দুই ক্লান্ত। শুধু একজন চেয়ারে, সামনে টেবিল, অন্যজন মেঝেয়। আধ বোতল ছিল, খালি হয়ে গেল এক ঘণ্টায়।

—এসব কী হচ্ছে? ললিতার তীব্র প্রশ্ন। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্য উঠল। উঠেই চট করে ধরে ফেলল দরজার পাল্লাটা। তখনই আবার বুঝতে পারল, কিছু ধরবার দরকার নেই। মোটেই বেশী হয়নি আজ।

খাবার টেবিলে বসে কিন্তু অনিন্দ্য ভালো করে খেতে পারল না। ঠিক নেশা নয়, কী যেন বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে যাচ্ছিল।

খাবার পর দুজন বারান্দায় বসে রইল কিছুক্ষণ। অনিন্দ্য হেসেহেসে বলল, তোমাকে একটা জিন আনতে লিখেছিলাম। আনলে না। তুমি তো হুইস্কি খাবে না। তুমি আজ একটু জিন খেলে খুব মজা হত।

ললিতা কথা বলল না, কেবল ভুরু কোঁচকাল।

আরো পরে সমরুকে খাওয়াবার ভার কাজের বুড়োকে দিয়ে শোবার ঘরে গেল দুজন। ললিতা নিজে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল।

জঙ্গলের দিকের জানলা খেঁষে একটা মোড়ার বসে অনিন্দ্য শোবার আগের শেষ সিগারেট ধরাল। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল ঘন নীল পর্দাটা। বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল অনিন্দ্য অথচ কিছু দেখছিল না। জঙ্গলের অন্ধকার ছাড়া দেখবারও কিছু নেই।

ললিতা শোবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। শাড়ি বদলাল, চুল আঁচড়াল, গায়ে পাউডার ছড়াল, একটু সুগন্ধ স্প্রে করল বুকে। চোখের কোণ দিয়ে অনিন্দ্যকে একবার দেখে নিয়ে জোরালো আলোটা নিভিয়ে মৃদু নীল আলো জেবলে দিল। তারপর পুরো ডিরিশ মিনিট। পরে দুজনে বিছানায় উঠে গিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল অনিন্দ্যর বালিশের দিকে ফিরে।

অনিন্দ্যও উঠে এল বিছানায়। সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজে রইল। মদের গন্ধ পেল ললিতা। অসুবিধে হল না। অভ্যেস আছে।

একটু পরে ললিতার মনে হল, অনিন্দ্য বিড়বিড় করে কিছু বলছে প্রলাপের মতন।

—কী বলছো? বলছো কী তুমি? ললিতা যতটা সম্ভব নরম গলায় বলল।

অনিন্দ্যর সাড়া না পেয়ে ললিতা বিছানায় উঠে বসল। চোখ বোজা অনিন্দ্যর ঠোঁট নড়ছে অস্পষ্ট, বিড়বিড় করে যাচ্ছে একইরকম। এইভাবে কেউ ঘুমিয়ে পড়তে পারে?

ললিতা আলতো করে অনিন্দ্যর কাঁধে নাড়া দিল।—কী বলছো তুমি অমন করে?

সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্য কাঁকিয়ে উঠল—ব্যথা, ভীষণ ব্যথা!

—কীসব বকছো তুমি? ললিতার গলা আর নরম রইল না।

যেন ঘুমের মধ্যে অনিন্দ্য বলে যাচ্ছিল, ওরা ভীষণ মেরেছে আমাকে। হাড় ভেঙে দিয়েছে।

ললিতা দুহাতে অনিন্দ্যর কাঁধ ধরে জোর ঝাঁকানি দিল। যন্ত্রণার কাতরানির সঙ্গে অনিন্দ্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর চোখ খুলে। একটুক্ষণ চোখে পলক পড়ল না। তারপর আস্তে আস্তে স্পষ্ট করে বলল, একই নৌকোয় ভাসছি আমরা দুজন। আমি আর সমরু!

মহাপূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

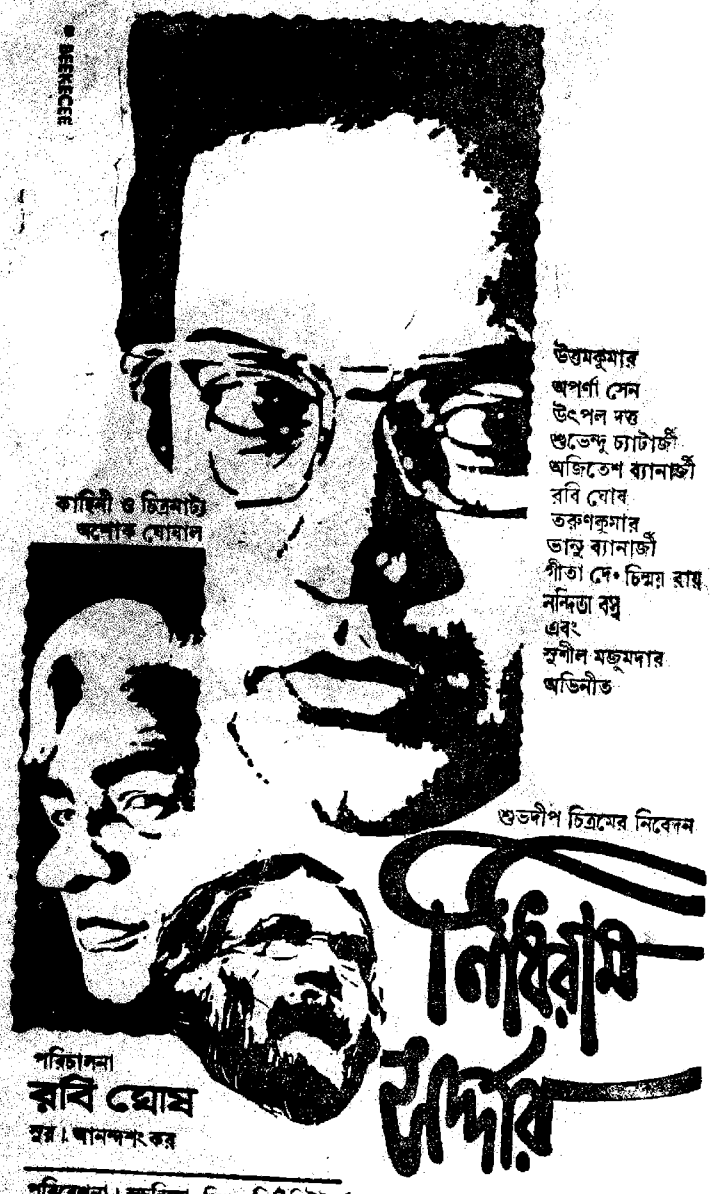

২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে—
উত্তরা ঃ উজ্জ্বলা - পূরবী ও অন্যত্র

'থাকলে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতে না। তোমার জামায় লাল দাগ। নিশ্চয় সিঁদুর বা লিপস্টিক।'

'কালির দাগও হতে পারে।'

'কালির দাগ বুকে লাগে না।'

'হৃদপিণ্ডের রক্ত উপছে পড়তে পারে।'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। ও এসেছিল। কেন এসেছিল?'

'ও আসে না। ও চলে গেছে। অনেক দূরে।'

'মিথ্যে কথা। ও এসেছিল। তোমার বুকে মাথা রেখেছিল—'

'এ কী, তুমি কাঁদছো! বিশ্বাস করো সোনা, যদিও আমার নিজস্ব ডাক না—তোমার সৃজিৎদাই হয়তো এ নামে ডাকার অধিকারী, তবুও বিশ্বাস করো —ও আর আসে না।'

'মদের গন্ধ, সেও কি ভুল?'

'এই দ্যাখ, গন্ধ নেই।'

'একী এ কী করছো! ছি-ছি, দরজা খোলা, যে কেউ এসে পড়তে পারে। মুখের ওপর মুখ চেপে রাখলে কেউ গন্ধ পায় না। তুমি নিষ্ঠুর, তুমি বর্বর। কথা শোন অমর, আঃ কী হচ্ছে! না, না। কী লজ্জা, কী লজ্জা!'

* * *

'অমর।'

'বলো।'

'বৈজ্ঞানিকরা একদিন না একদিন শুধুমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তৈরী করতে পারবে। পারবেই।'

'বিশ্বাস করলাম।'

'সেদিনের সেই মানুষটার হাত পা মাথা সব থাকবে। বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সাহস—সব। শুধু একটা জিনিস থাকবে না।'

'কি?'

'হৃদয়। তার মন বলে কিছু থাকবে না।...'

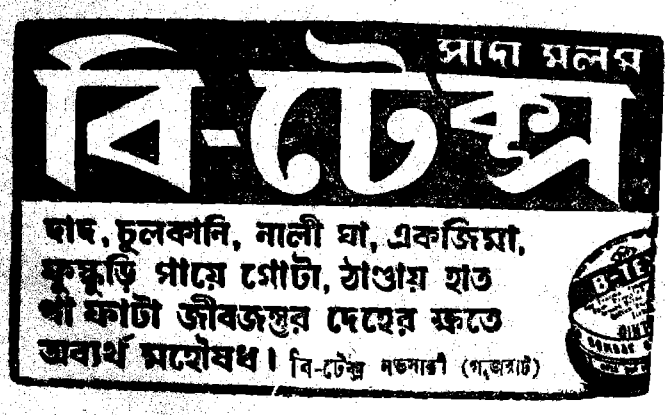

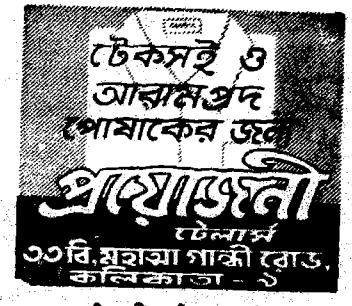

বিনীর টেলার্স
ফোন ঃ ৩৫-০৬৮৮

বেঁচে আছি

তারাপদ রায়

আজ কিছুদিন হলো যাকে বলে শরীরটা ঠিক ভালো যাচ্ছে না। ঠিক কি অসুবিধে কিংবা কি কতটা খারাপ এঞ্জিনের কোন অংশটা গড়বড় করছে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কিন্তু এই সেদিন পর্যন্তও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পথের পাশের তেলেভাজা বিপণির তপ্ত মধুর গন্ধে মন কি রকম উদাসীন হয়ে উঠতো। এই তো গত বছরও সাড়ে বারো ইঞ্চি (একত্রিশ সেন্টিমিটার) বারিবর্ষণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পরমানন্দে ছত্রহীন খালি মাথায় ছয় ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে ময়দানে ফুটবলের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখেছি তারপর বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কটুবাক্য সহযোগে আদা-চা খেয়ে চমৎকার চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।

দুঃখের বিষয় এসবই গত বছরের গত যুগের গত জন্মের ঘটনা। সবাই বলছে অর্থাৎ যাদেরই কাছে দুঃখ করছি 'আগের মত অনাচারে আর উৎসাহ পাচ্ছি না' তারা সবাই বলছে 'বয়েস তো চল্লিশ হয়ে গেলো এবার একটু বুঝেসুঝে চলো সাবধানে থাকবে। ছেলে-বৌ নিয়ে কষ্টের সংসার গোয়ার্তুমি একদম করবে না সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস চিরতার জল খাবে পাতে কাঁচা নুন খাবে না রাতে শোয়ার সময় মাথার কাছের জানলা বন্ধ করে শোবে।'

সকলের সব উপদেশ মেনে চলছি অন্তত চলার চেষ্টা করছি। কিন্তু চিরতা কোথায় পাওয়া যাবে? একজন বললেন—'তরকারির বাজারের পিছন দিকে যেখানে গৃহস্থ বালিকা এবং বিধবারা কাঁচা আনাজ বেচে তাদের কাছে পাওয়া যাবে। গেলাম সেখানে কিন্তু চিরতা কোথায় মধ্য থেকে এক সরল দর্শনা গ্রাম্য কিশোরী আমাকে অপর্যাপ্ত মুখ ধরে নিয়ে একটি বল্লমের মত সুতীক্ষ্ণ এবং সুদীর্ঘ চিচিঙ্গা গছানোর চেষ্টা করলো। চিচিঙ্গা কিনলাম না কিন্তু চিরতাও পেলাম না। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম।

সব শুনে পরদিন অফিসে একজন বললেন—'তুমি চিরতা জানো না তুমি তো একেবারে বুরবক হে চিরতা কি শাক যে কাঁচা তরকারির বাজারে খুঁজতে গিয়েছিলে? বড় দেখে মুদির দোকানে খোঁজ করো সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে।'

গেলাম মুদির দোকানে। সবশুদ্ধ সতেরোটি দোকানে গিয়েছিলাম। সাত-জন দোকানদার কোনো উত্তর দিলেন না 'চিরতা আছে কিনা?' আমার এই স্পষ্ট ও অতি সরল প্রশ্নটির তাঁরা যা করছিলেন অর্থাৎ তেল কিংবা পেঁয়াজ ওজন কিংবা মুখে মুখে একটি বাইশ-পদী জটিল যোগ অঙ্ক তাই করে যেতে লাগলেন আমাকে হাবেভাবে বুঝে নিতে হলো চিরতা নেই।

একজন দোকানদার কেন যেন ধরে নিলেন চিরতা কোনো একটা নতুন বেরোনো সাবান বা বেলেডের নাম। প্রথমে একটি তাকের সমস্ত সাবান-গুলির নাম পাঠ করে পরীক্ষা করে দেখলেন এবং প্রত্যেকবার আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন 'কি নাম বললেন চিরতা?' এবং আমার উত্তর বা ব্যাখ্যার জন্যে অপেক্ষা না করেই পনেরো মিনিট গবেষণা করলেন, সাবান শেষ হয়ে গেলে বেলেড নিয়ে অনুরূপ-ভাবে আরো দশ মিনিট ব্যয় করলেন তারপর দুঃখের সঙ্গে ব্যক্ত করলেন চিরতা নামটা খুব চেনাচেনা মনে হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই জিনিসটাকে লোকেট করতে পারছি না।'

সে যা হোক আর চারজন মুদিওলা আমার চাহিদা বাক্য প্রায় না শুনেই বললেন—'এখন হবে না।' আমার অসুস্থ মুখমন্ডলে কতটা দীনতার ভাব ছিলো ঠিক বলতে পারবো না কিন্তু এঁরা বোধহয় আমাকে ভিখারি-টিখারি কিংবা সাহায্য প্রার্থী বেকার গ্র্যাজুয়েট সম্ভ্রান্তবংশজাত ভদ্রলোক ঠাউরে নিয়ে-ছিলেন। সময় শরীর বা মনের অবস্থা ঠিক কোনোটাই ভালো নয়, তাই আর ঝগড়ার মধ্যে অথবা বাদবিতন্ডার মধ্যে এগোলাম না।

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো অন্য একটা দোকানে। দোকানটা বেশ বড়

দুজন দোকানদার দুজনেই প্রায় একই রকম দেখতে বোধহয় যমজ ভাই। আমি চিরতার কথা বলতেই দুজনে খুব খুশি হয়ে কি আলোচনা করতে লাগলেন আলোচনার ছোট ছোট অংশ অল্প অল্প কানে এলো তাতে বুঝতে পারলাম এদের মামার বাড়ি ময়ূরভঞ্জ না মজঃফরপুর কোথায় যেন সেখানে সুজিকে বলে চিরতা। অনেকদিন পরে মামার বাড়ির দেশের একটা পুরোনো শব্দ শুনে দুজনেই খুবই পুলকিত এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন আমি ওঁদের মামার বাড়ির দেশের লোক কিনা? তদপুরি তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যতটা চাই দুজন হোক চারজন হোক সুজি সংগ্রহ করে দেবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

বহু কষ্টে এই মাতুলালয় বিলাসী ভ্রাতৃযুগলের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু এর পরেও কোনো মুদি দোকানেই চিরতা পেলাম না, সবাই শুষ্ক কণ্ঠে কিংবা মাথা নেড়ে জবাব দিলেন 'না নেই।' সুখের কথা সতেরো-তম মুদি মহোদয় অতি মহানুভব, তিনি বললেন, চিরতা মুদি দোকানে পাবেন না দশকর্মা ভাণ্ডারে খোঁজ করুন।'

অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত দশকর্মা ভাণ্ডারে গেলাম। চিরকাল জানি এই সব ভাণ্ডারে বিয়ে অন্নপ্রাশন বা পুজোর সামগ্রী পাওয়া যায়, চিরতার মত তিক্ত জিনিস ঐ সব মধুর অনুষ্ঠানের সামগ্রীর সঙ্গে কেন বিক্রি হবে এই সব কঠিন প্রশ্ন ভালো করে ভাবার আগেই প্রথম দশকর্মা ভাণ্ডারেই চিরতা পেয়ে গেলাম।

প্রয়োজনীয় কোনো বস্তু পেলে তা যদি তিতেও হয় তবু মানুষ যে কত খুশি হতে পারে আমার চোখ-মুখ-দেখলে সেটা তখন বোঝা যেতো। এক-বারে অনেকটা চিরতা কিনে ফেললাম দোকানদারদের পরামর্শ নিয়ে পুরো ছয় মাসের খোরাক।

কিন্তু বাড়ি ফিরে বিপত্তি হলো। আমাদের প্রাচীনা পরিচারিকা ভুয়োদর্শিনী মহিলা তিনি চিরতার ঠোঙ্গা খুলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে রায় দিলেন এটা চিরতাই বটে কিন্তু আসল চিরতা নয় রামচিরতা এতে ঝাঁঝ তেজ অনেক কম। বাবুকে সরল প্রকৃতির মানুষ দেখে দোকানদাররা ঠকিয়ে দিয়েছে।'

তা ঠকাক ঝাঁঝ-তেজ আমার দরকার নেই চিরতা হলেই হলো সকালবেলা ভিজিয়ে খেতে পারলেই হলো। প্রথমদিন এক গেলাস চিরতার জল খেয়ে ভোর-বেলার লম্বালম্বি কাটা কলাগাছের মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম বমি করতে। এই যদি কম তেজ হয় রাম-চিরতাই যদি এরকম ঝাঁঝালো হয় কে জানে প্রকৃত চিরতা কি রকম? প্রকৃত চিরতা যে রকমই হোক আমার এই রামচিরতার জল এক গেলাস খাওয়ার পরে এক গেলাস নিমের পাতার রস সরবতের মত মনে হবে। প্রথমদিন জ্ঞান ফিরে আসার পর জিবের অসহ্য তিতে ভাব কাটানোর জন্যে একটা কাঁচা উচ্ছে চিবিয়ে খেলাম মনে হলো বাতাসা খাচ্ছি।

এইভাবে সপ্তাহ তিনেক চলে গেলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে এই সাংঘাতিক পানীয় এক গেলাস খেয়ে গুম মেরে পড়ে থাকি। শুভানুধ্যায়ীরা যে যা পরামর্শ দিয়েছিলো সব মেনে চলি, পাতে কাঁচা নুন খাই না, রাতে শোয়ার সময় বহুকালের অভ্যাস পালটিয়ে মাথার কাছের জানলাটা বন্ধ করে শুই। কিন্তু শরীর ও মনে সেই পালিশ করা জুতোর মত ঝকঝকে ভাবটা কিছুতেই ফিরে আসছে না।

এর মধ্যে আমাদের দেশের এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সকালবেলা দেখা করতে এলেন। তিনি আমাদের পরি-বারকে তিন পুরুষ ধরে চেনেন, তিনি যখন এলেন তখন তরল চিরতা পান করে যথারীতি বন্দি হয়ে বসে আছি। আমি বহু কষ্টে তাঁর সম্মুখীন হলাম, সেই স্বদেশী ভদ্রলোক আমার অবস্থা দেখে হায়-হায় করে উঠলেন। প্রথমে তাঁর অহেতুক সন্দেহ হলো আমি বোধহয় গত রাতে খুব নেশা করেছি এই ভয়-

সকালে এখনো সেই ঘোরে আছি। কিন্তু কিছু পরে আমাকে ভালোভাবে অবলোকন করে আমাদের পারিবারিক মাদক বিরোধী ঐতিহ্য স্মরণ করে এবং সর্বোপরি আমার কথা শুনে তিনি বুঝলেন কোনো মাদক নয় ওষুধ পান করেই আমার এ অবস্থা। তার উপরে তিনি যখন শুনলেন আমি খালি পেটে চিরতার জল খাচ্ছি রীতিমত আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন। আমাকে জানালেন আমাদের পরিবারে এ ঘটনা আগেও ঘটেছে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। আশি বছর বয়সে আমার ঠাকুর্দা সে হার্টফেল করে লোকান্তরিত হয়েছিলেন সেও ঐ খালি পেটে চিরতার জল খাওয়ার জন্যে। পরামর্শ দিলেন চিরতার জলে তত আপত্তি নেই তবে খালি পেটে নয় সঙ্গে দু ছটাক মিছরি খেতে হবে।

এখন আর দু ছটাক কোনো জিনিস পাওয়া যায় না দৈনিক একশো গ্রাম করে মিছরি খেতে লাগলাম মানে ষাট পয়সা দিনে মাসে আঠারো টাকা খরচ বেড়ে গেলো।

কিন্তু তেমন কোনো উপকার হলো না সেই চনমনে ঝকঝকে ভাবটা কিছুতেই ফিরে আসছে না। বাল্যকালে পরশুরামের চিকিৎসা সঙ্কট গল্পটা পড়েছিলাম সেটা মনে করে খুব বেশি ডাক্তার বৈদ্যের কাছে যেতেও ভরসা হলো না।

কিন্তু একদিন একটা বোকামি করে বসলাম। কথায় কথায় পুরোনো এক বন্ধুর কাছ খবর পেলাম ভিয়েনা থেকে এক সদ্য প্রত্যাগত ডাক্তার শারীরিক ও মানসিক দুর্দশার চমৎকার আধুনিক চিকিৎসা করেন। পার্ক স্ট্রীটের একটা বড় বাড়িতে ঠিকানা ফি মাত্র কুড়ি টাকা।

পরেরদিন সন্ধ্যায় ঠিকানা খুঁজে খুঁজে পার্ক স্ট্রীটের সেই বাড়িতে পৌঁছলাম। প্রাগৈতিহাসিক বাড়ি বিশাল অন্ধকার অট্টালিকা। সাততলা বাড়ির ছয়তলায় ডাক্তার সাহেব বসেন সিঁড়িতে আলো নেই একটি মোগল আমলের লিফটে কাগজের নোটিশ লাগানো লিফট আউট অফ অর্ডার। এই নোটিশটিও বহুদিনের পুরানো কাগজ মলিন হয়ে গেছে সিপাহী যুদ্ধের বা তারো আগের কালের বলে মনে হয়।

বহু কষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে ছয়তলায় উঠলাম। উঠেই সামনে ডাক্তার সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে, পর্দা তুলে ভিতরে ঢুকে গেলাম, দেখে ঠিক ডাক্তারের ঘর মনে হয় না সেক্রেটারিয়েট টেবিলে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক চশমা চোখে বসে রয়েছেন আমি ঢুকতেই বললেন—'বলুন আপনার কি অসুবিধে?

আমি আমার অসুখের আদ্যোপান্ত বলে গেলাম গড়গড় করে। ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা নামিয়ে কেমন গম্ভীর হয়ে সব শুনলেন। আমার বলা শেষ করে আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম 'আমার কি হয়েছে মনে হয় আপনার?' ভদ্রলোক তাঁর টেবিলের উপর চশমাটা পর পর তিনবার ঠুকলেন তারপর বললেন—'আপনি অত্যন্ত মোটা কংসিত ... দিন হয়েছে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ফকরের মত জিভ বার করে হাঁফাচ্ছেন তাছাড়া আপনার গলার স্বর অতি বদখৎ গাঁজা না খেলে মানুষের এত তেঁড়ে গলায় স্বর হয় না।' তিনি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন আমি হতভম্ব হয়ে প্রতিবাদ করলাম 'আপনি কি রকম ডাক্তার আমি অনেক উন্মাদ মাগী দর্শনার্থে ডাক্তারের কথা শুনেছি কিন্তু একি?' আমার অভিযোগ শেষ হওয়ার আগেই ভদ্রলোক বললেন—'গেট আউট অন্ধ কানা চোখে দেখতে পাও না আমি হলাম ইনকাম ট্যাক্সের উকিল, বোকা বাইরে নেমপ্লেট না দেখে ঢুকে পড়েছো। যাও বেরোও তোমার ডাক্তার ঐ সিঁড়ির শেষ মাথায়' এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বের করতে করতে গজগজ করতে লাগলেন কত কষ্ট করে দুবেলা ছতলায় উঠে বসে থাকি তা মক্কেলের পাত্তা নেই রোগীর পর রোগী। এ এক আচ্ছা ঝামেলা বেধেছে।

অকারণে অপমানিত হয়ে বেরিয়ে এসে একটু এগিয়েই ডাক্তারের ঘর পেলাম। বাইরে স্পষ্ট নেমপ্লেট লাগান রয়েছে, আমারই ভুল হয়েছে প্রথমেই দেখে ঢোকা উচিত ছিল।

যা হোক, ডাক্তারের ঘরে গেলাম। দেখি বেশ কয়েকজন রোগী-রোগিনী বসে। ঘণ্টা দেড়েক পরে আমার ডাক এলো, ডাক্তারসাহেব আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন, নাড়ি দেখলেন, পেট টিপলেন, গলা খাঁকারি দিতে বললেন, অনেক গোপন কথা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর বললেন 'আপনার কিছু হয় নি, রাতে ঘুম একটু হাল্কা হচ্ছে তাই সারা দিন ক্লান্ত লাগছে। রাতে শোয়ার আগে এক গেলাস গরম দুধ আর দুটো বিস্কুট খেয়ে শোবেন, ওষুধ-টষুধ লাগবে বলে মনে হয় না।

কে. এল. কাপুর ফিল্মস প্রযোজিত

তপস্বী
তপন সিংহের ছবি

এক ঝাঁক
দেশ

কাহিনী/পরিচালনা
অভিনয়ে
দীপঙ্কর, সুমিত্রা, অনিল, কালী,
রবি ঘোষ, অরুণ, সুহাস রায়,
গীতা, অরুণ, ছায়া দেবী,
সোমাশ্রী ও প্রেমা নারায়ণ

কে. এল. কাপুর ডিসট্রিবিউটার্স।
ফোন—২৩-৫৫৪০

খুব ভালো মন্দ বাড়ি ফিরে এলাম।

এ সব প্রায় চার মাস আগেকার কথা। ডাক্তারসাহেবের পরামর্শ অনুসরণ করে মোটামুটি ভালই ছিলাম। কিন্তু, আজ কিছু দিন হলো আবার কেমন ক্লান্ত, অবসন্ন বোধ করছি। একদিন হাঁটতে হাঁটতে অফিস ফেরত আবার চলে গেলাম পার্ক স্ট্রীটে সেই ডাক্তার-সাহেবের চেম্বারে। আবার সেই লিফট আউট অফ অর্ডার, আবার পায়ে হেঁটে হাঁফাতে হাঁফাতে ছয়তলা। তবে এবার আর আয়রনের উইকলের কাছে গিয়ে অপমানিত হলাম না, ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না, কারণ দরজায় বিশাল তালা ঝুলছে।

পুজোর

বিশেষ আকর্ষণ!

বেনারসী, ব্রোড়, সিল্ক, তাঁত, প্রিন্টিং, প্লেটিং

ও

রেডিমেড পোষাক

বিচিত্রা

৬৫, জি, টি, রোড (সাউথ), হাওড়া।

সোজা চলে গেলাম ডাক্তারের ঘরে। গিয়ে দেখি সেই ঘর, সেই পরিবেশ, রোগী-রোগিনীও রয়েছে যেমন আগে দেখেছিলাম। আগের বারের মতই ঠিক দেড় ঘণ্টা পরে আমার ডাক পড়লো। কিন্তু চেম্বারের ভিতরে গিয়ে দেখলাম ডাক্তারের আসনে যিনি বসে আছেন তিনি আগের ব্যক্তি নন। আমি দ্বিধা-গ্রস্তভাবে বললাম, 'আমি তো আপনার রোগী নই, আমি যাঁকে দেখিয়েছিলাম তিনি কোথায়?' নতুন ডাক্তারসাহেব জানালেন আগেরজন আবার ভিয়েনায় গিয়েছেন আর উনি সদ্য ভিয়েনা থেকে এসেছেন। উনি যখন যান ইনি আসেন, ইনি যখন যান তখন উনি আসেন। তিন মাস পর পর এই বাঁধাধরা রুটিন। কোনো অসুবিধে নেই উনির মত ইনিও সদ্য ভিয়েনা ফেরত আধুনিক চিকিৎসক, ওঁকে দেখানো আর এঁকে দেখানো আসলে একই কথা।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে এঁকেও আমার বৃত্তান্ত বললাম। ইনিও সব কথা মন দিয়ে শুনলেন, নাড়ি দেখলেন, পেট টিপলেন, গলা খাঁকারি দিতে বললেন, অনেক গোপন কথা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর বললেন, 'আপনার কিছু হয় নি, রাতে ঘুম একটু কম কম হচ্ছে তাই সারা দিনক্লান্ত লাগছে। রাতে শোয়ার আগে দু গেলাস জল খেয়ে শোবেন, ওষুধ-টষুধ লাগবে বলে মনে হয় না।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ঠিক চার মাস আগে আপনার পূর্ব-সূরী, আগের ডাক্তারসাহেব, এক গেলাস গরম দুধ আর দুটো বিস্কুট খেয়ে শুতে বলেছিলেন। আর আপনি বলছেন শুধু দু গেলাস জল খেতে?

আমার কথা শুনে নতুন ডাক্তার-সাহেব একবিন্দুও বিচলিত হলেন না, বললেন, 'জানেন তো, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতি দিন এগোচ্ছে এই চার মাসে আগাগোড়া বদলে গেছে,' বলে একটু মুচকিয়ে হেসে যেন খুব গোপন কথা বলছেন এইভাবে গলা নামিয়ে বললেন, 'এই জন্যেই তো প্রতি তিন মাস অন্তর আমরা বিদেশে গিয়ে নতুন খবর নিয়ে আসি, সেইভাবে চিকিৎসা করি।'

আমি বিশ টাকা ভিজিট দিয়ে আস্তে আস্তে ছয়তলা ভেঙে নিচে এলাম।

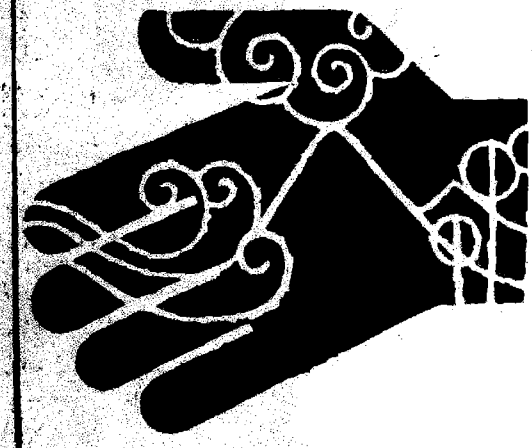

আকাশে শরৎ। মানুষের মন এখন মেঘের সঙ্গী। ছুটতে চায় দূর দিগন্তে যেদিকে নদী, সমুদ্র, পর্বত, যেদিকে সৌন্দর্য এবং সুষমা। আমরা জানি। এবং আমরা প্রস্তুতও। মানুষের আসা-যাওয়ার পথের ধারে আমরা বাড়িয়ে আছি হাত সাহায্যের, সৌজন্যের, সহযোগিতার। বিনিময়ে প্রত্যাশা শুধু একটাই। তার নাম শৃঙ্খলা। জীবনের চলা-হাঁটার পথে শৃঙ্খলাও এক সৌন্দর্য।

পূর্ব রেলওয়ে

নতুন বাসা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

গত রবিবার তোমরা এই বাসায় এসেছ, মলয়, আজ রবিবার, সাত দিন হোল। এই সাত দিনে তোমার স্ত্রী তৃপ্তি দুধের ডিপো, বেশন কার্ড, গ্যাস, জমাদার, কাজের লোক আর খবরের কাগজের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। করে ফেলেছে কেন না তুমি বলেছিলে, এ-সব সামান্য কাজ, কলকাতায় চলা-ফেরায় অভ্যস্ত তুমি, কেন পারবে না?

অথচ তুমি কি জানো না, জানো, কলকাতা একটা মাত্র শহর নয়। অনেক-গুলো আলাদা রকম শহর একত্র করে কলকাতা। যেমন ধরো, মাণিকতলা—তৃপ্তির বাপের বাড়ি যেখানে—আর ভবানীপুর, যেখানে তোমাদের, মানে তোমার বাবা-কাকাদের পৈতৃক বাড়ি, এই দুটো অঞ্চল কি একরকম? কিংবা নিউ আলিপুর, ওর দিদিদের পাড়া, আর এই যোধপুর পার্ক?

মোটেই তা নয়। অন্তত তৃপ্তির কাছে তা নয়। তোমার কাছে হয়তো এক রকম ঠেকবে। তুমি পুরুষমানুষ। সব কিছুই বাইরে থেকে দেখ। মাণিকতলা অঞ্চলের লোকেরা অনেক কাছের মানুষ। নানান জাতের, নানান প্রকৃতির, নানান রকম আর্থিক সঙ্গতির লোক সে অঞ্চলে বাস করে ঠিকই, কিন্তু চোখে চোখ পড়লেই মনে হয় চেনা। অনেক কালের চেনা, পরিচিত, এক পাড়ার লোক। অথচ, হতে পারে, এই প্রথম দেখা হোল।

মলয়, তুমি বলবে, মানুষের ছেলে-বেলা, স্কুল-কলেজের বয়েস যেখানে কাটে, তার প্রতি অন্য রকম টান। বললে কিন্তু তৃপ্তির প্রতি একটু অবিচার করা হবে। কেননা, শুধু মাণিকতলায় নয়, ভবানীপুরেও—শ্বশুরবাড়ির পাড়া, যেখানে বিয়ের পর একটা বছর কাটিয়ে এল তৃপ্তি—এই অন্তরঙ্গ ভাব আছে। আগেকার দিনের লোকেদের মতো কাছা-কাছি স্বভাব। মাণিকতলা বা ভবানীপুরে অঞ্চলের মেয়েরা, মহিলারা, এখনও খোঁজ-খোঁচা, ওল বা কচুর শাক, কি থোঁকার ডালনা রাঁধতে জানে। লুচি-পরে বাজারে যেতে ভদ্রলোকের শরম করে না। গোটা ইলিশ কিনলে কুটিয়ে-লুকিয়ে আনার রীতি প্রচলিত নেই। ল্যাজা-মুড়ো সুতলি দিয়ে বেঁধে হাতে ঝুলিয়েই আনবে। কী দর?—জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথাই বলবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে না, বা চোখ দুটো ফোকাস করবে না আকাশে।

দিদির কাছে শুনেছে তৃপ্তি, নিউ আলিপুরে যেমন বাড়িগুলো হাড়-ছাড়া, তেমনি সম্পর্কেও আঁটা কম। তবে, যাদের সঙ্গে বনবনা হয়ে যায়, বেশ হয়ে যায়। আত্মীয়-কুটুমের মতো। দুপুরে বা সন্ধেবেলা মাঝখানের এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার রীতি আছে। একটা টেলিফোন করলে কেউ বিরক্ত হয় না। পাড়ায় ক্লাব আছে, আলাদা পুজো হয়।

সাতটা দিন তুমি তো সকালে ডিমের পোচ আর কর্ণফ্লেকস খেয়ে কমলারংয়ের ফিয়াটখানি বাজারে বাজারে চলে গেছ, ফিরেছো সন্ধের পর। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও একদিনও আগে ফেরোনি, একদিনও আফিস থেকে টুক করে বেরিয়ে সংসারের একটা কাজ সারোনি। প্রচণ্ড নাকি তোমার কাজের চাপ। বাতানুকূল ঘরে মোটা গদি-মোড়া চেয়ারে বসে সারাটা দিন ফরমাশ করতে করতে নাকি তুমি গলদ-ঘর্ম হয়ে যাও!

আর এদিকে ট্যাং ট্যাং করে রোদের-মধ্যে ছাতা মাথায় তোমার স্ত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছে চরকির মতো। একটা সংসার গুছিয়ে তোলা কি মুখের কথা! এটা আছে তো ওটা নেই, ওটা আনলো তো সেটা ফুরোলো। বাজার দূরে মুদি-মণিহারীর দোকানটা, যেখান থেকে

একটা টেলিফোন করতে পঁচাত্তর পয়সা নেয়, সেটাও পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটাপথ।

মা বলে দিয়েছিল, মোটা কাজের জন্যে একটা ঠিকে ঝি রাখিস। ওপরতলার মাসিমাকে বলে, ঢের সন্ধ্যেসাঝেরা করে প্রমীলাকে পাওয়া গেছে। শুধু বাসন মাজা, কাপড় কাচা আর ঝাড়-পোঁছ—তা-ই পঁচিশ টাকা মাইনে। এর মধ্যে দুদিন কামাই হয়ে গেছে। তা ছাড়া ওর একটু হাভাতে স্বভাব আছে, মনে হয়। হাতে-নাতে ধরা পড়েনি, তবে তৃপ্তির সন্দেহ, আলুটা পিঁয়াজটা সরাচ্ছে প্রমীলা।

শ্বশুরমশাই বলে দিয়েছেন, জোয়ান চাকর রেখো না। সাঙ্ঘাতিক একা থাকবে বাড়িতে, ছোঁড়াছোঁড়ির একটা রেখা, যে রান্নাবান্না জানবে, ঘরদোর আগলে রাখবে জোয়ান চাকরেরা খারাপ, দুটো হয়, তাই ফটিক এসেছে। বোকাটে চেহারা—দেখে মনে হয় পনেরো-ষোলো, আসলে অন্তত বাড়ি বাইশ। তৃপ্তির ধারণা মাকুন্দ। বোকা কিন্তু ফিচেল। তৃপ্তির সন্দেহ, ফটিক রোজ এক কাপ করে দুধ খাচ্ছে, আর সেই পরিমাণ জল মিশিয়ে দিচ্ছে ডেকচিতে। কী জল কে জানে! এ-ও ধরা পড়েনি হাতে-নাতে, তবে ওপরতলার মাসিমা পুজোর ঘর থেকে নিজের চোখে দেখেছেন, পরশু দুপুরে, দই আনতে দিয়েছিল তৃপ্তি—সেই দই ফটিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাটছে। এত বড়ো আস্পর্ধা ওর! পুজো সেরে যখন খবরটা দিতে নিচে, তখন দই-ভাত খাওয়া শেষ তৃপ্তির। জিজ্ঞেস করায় প্রথমে অস্বীকার করলো, তারপর মাসিমা বাঁদর, জামাইবাবু ভূত—এই সব বলে যখন পালাপাল করলেন তখন স্বীকার করলো ফটিক। স্বীকার ঠিক করলো না, বললো: চাকনা খুলে দেখছিলাম ঠিক দই না মিষ্টি দই।

সেদিন সারা দুপুর তৃপ্তির গা গুলিয়েছে।

রাঁধতে জানে না তৃপ্তি, কোনোদিন নিজ-হাতে রাঁধতে হবে ও ভাবে নি, কিন্তু খাবার স্বাদ তো বোঝে। মলয়, তুমি তো তা-ও বোঝো না। তৃপ্তি রোজ খাবার টেবিলে তোমায় বলছে, তরকারিটা ডালটা, মাছ—দেখতে ঠিকঠাক, কিন্তু স্বাদ কেমন কেমন ঠেকছে না? তুমি রোজই বলছো, কই না তো, নুন-ঝাল ঠিকই লাগছে। আসল ব্যাপার ধরা পড়লো কাল—ফটিকের ফোড়ন।

গ্যাসের উনোনটার ওপরে বাঁ দিকটায় সিমেন্ট-বাঁধানো শেলফ। আছে দুটো। নিচের শেলফে কতকগুলো ছোট ছোট কৌটো। তৃপ্তি আবিষ্কার করলো, কৌটোগুলোয় হলুদ, কেলোঞ্জি, মৌরি, মেথি, জিরে, কালোজিরে, সরষে—এই সব মশলা। তারইর বাঁয়ার লম্বা কৌটোয় কী কোন পদ কড়ায় চড়বার আগে ফটিক করছে কি, একটু তেল ঢেলে তার মধ্যে যে কোনো কৌটো থেকে হাতে যা ওঠে, এক চিমটি ফোড়ন ছেড়ে দিচ্ছে প্রথমে। কী দিলে, জিজ্ঞেস করায় ও খুন্তি দিয়ে জিনিশটা তুললো, তারপর চিনলো। ঠিক দিল না ভুল, কী করে জানবে তৃপ্তি? টেলিফোন নেই, যে মাসিমাকে ফোন করে দরকারি ব্যাপারটা জেনে নেবে!

এই সব গুরুতর সমস্যার কথা তুমি জানো না, বলতে পারবে না মলয়। প্রতিদিন রাতে তৃপ্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে তোমায়। এক কথাই বলছ তুমি: কমল সরে যাবে, যে-কোনো জায়গাতেই সেটল করতে একটু সময় লাগে। এমন কি, টেম দিয়ে বলেছ: ছোট পরিবার সুখী পরিবার চেয়েছিলে, এই তো পেয়েছ। এমন নালিশ করছো কেন?

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে তৃপ্তি যে রাত্রে তোমায় রিপোর্ট দিল, বাথরুমে ও দেখেছে, ফটিক ওর ছাড়া ভেতরের জামা শুঁকছিল, তুমি হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলে! বললে, ছোঁড়াটা রসিক আছে তো! তারপর নিজের মতলবে চলে গেলে!

আসল সমস্যা হোল, তোমার টেলিফোন নেই।

মাণিকতলায় বাপের বাড়িতে টেলিফোন ছিল। ছোটবেলা থেকে যন্ত্রটি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে তৃপ্তি। পাঁচ-ছ বছর বয়েস থেকে ও ডায়াল করতে পারে। ছোট্ট আঙুল ঢুকিয়ে ঠিকঠাক ছটা ডিজিট টানতে পারতো, ডাকতো হ্যালো মাসি! তোমাদের বাগ-বাজারে বিষ্টি হচ্ছে? আমাদের মাণিক-তলায় খুব জল। কিংবা হ্যালো পিসে-মণি, শনিবার আমরা কালীঘাটে পুজো দিতে যাবো, তখন তোমাদের বাড়িতে আসবো, রোঁদে খাবো। এই সব। স্কুলে কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা—সে এক বিশেষ ধরনের বিলাস। বড়োরা তো কাজের কথাটুকু বলে রিসিভার নামিয়ে দেয়। ফুরিয়ে যায় ওদের কথা। কিন্তু সে বয়েসে তৃপ্তিদের কথা কিছুতেই ফুরোতো না।

তারপর বিয়ে হয়ে ভবানীপুরে এল। সেখানে তো টেলিফোন ছিলই। বর-কনে বিদেয় হয়ে যাবার আধ ঘণ্টা পরে মা এ বাড়িতে ফোন করছে, 'কীরে, ঠিকমতো পৌঁছেছিস তো? কান্নাকাটি করছিস না? কাল যাবো, তোকে দেখে আসবো।' একটু পরেই আবার তৃপ্তি ফোন করেছে, 'পুরোনো চম্পলটা তোমায়? বাকসে তো আছে।' মা জবাব দিয়েছে, 'ভুল গেছি রে। নিয়ে যাবো কাল। একটা ফিট নতুন জোড়া পরে চালিয়ে নে।' বাপের বাড়ি তো টেলিফোন থাকলে কাছের মানুষ কোনোদিন দূরে যায় না। যাকে দেখতে পাচ্ছো না তাকেও কাছে পেতে পারো।

মলয়, তুমি বলেছিলে, পাড়ায় একটু ভাবসাব করে নিও, যাতে অবরে সবরে টেলিফোন ব্যবহার করতে দেয়। তৃপ্তিকে বলেছিলে দরকার মতো তোমার 'লা ফাম'-টা কাজে লাগিয়ো। কিন্তু তুমি জানো না, 'লা ফাম' দিয়ে এ ব্যাপারে সুবিধে হয় না। পুরুষেরা যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন তো তুমিও আসো। তখন তো গাড়িটাও থাকে। যেখানে খুশি যাওয়াও যায়। যত কাজের কথা মনে পড়ে তখনই, যখন তুমি আপিস, আর তৃপ্তি একা বাসায় বসে পচছে। তখনই খেয়াল হয়, বাবার কাশিটা বেড়েছিল, কেমন আছে জানা দরকার। ছোট ভাইটার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে, কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে জিজ্ঞেস করবে না? শাশুড়ির রক্তচাপ বেশি, কেমন থাকেন না-থাকেন খবর নেওয়া উচিত। ছুটিতে দিদিরা বেড়াতে গিয়েছিল সাউথ ইণ্ডিয়ায়, এতদিন ফিরেছে নিশ্চয়। মিঠু আলিপুরে একবার টেলিফোন করে জানবে না কেমন বেড়ালো ওরা? কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কী কী জিনিস কিনে এনেছে? তাছাড়া তোমাকও তো টেলি-ফোন করতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে হয়, এই দুপুর তিনটেয় কী করছো তুমি আপিসে। কটার সময় বেরুবে। ফেরার পথে পার্ক স্ট্রীট থেকে অমুক জিনিসটা আনতে যেন ভুলো না। এইসব।

অথচ হাত পা একেবারে বাঁধা।

ওপরতলার বাড়িউলীর সঙ্গে মাসিমা-সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে তৃপ্তি প্রথম দিনেই। বুড়ো মানুষ, পুজো-আচা নিয়ে থাকেন, নাতিটিকে নিয়ে সময় কাটান—'মাসিমা' বলে দাঁড়ালে অখুশী হন না। তারপর দুটো-একটা কথা বলার পর হাত ব্যাগ থেকে টুক করে টেলি-ফোন নম্বরের ছোট্ট লাল খাতাটা বার করে বলা—'একটা টেলিফোন—'

তারপর, মাসিমা অন্যমনস্ক থাকলে কোণে দাঁড়িয়ে সুযোগ মতো আরো একটা, আরো একটা, সেরে ফেলতে হয়।

কিন্তু মাসিমার ছেলের আপিস থেকে খরচ দিলেও প্রতিদিন তো একটা-না-একটা ছুতো ধরে যাওয়া যায় না টেলিফোন করতে।

তখন অগত্যা রিকশা চেপে মণি-হারীর দোকান। প্রত্যেকটা কল পঁচাত্তর পয়সা। বেশিক্ষণ টেলিফোন আটকে রাখলে বিরক্ত হয় টেকো লোকটা, তাই জমিয়ে গল্প করা যায় না। কাজের কথা বলেই লাইন রেখে দিতে হয়। তৃপ্তির সন্দেহ হয়, লোকটা কান খাড়া করে সব শোনে, তাই প্রাইভেট কথা একেবারেই বলা যায় না দোকান থেকে। বিশেষ করে, মলয়, তোমাকে: তাড়াতাড়ি বাড়ি

চলে এসো, শুনছ, আমার মন ভালো নেই, তোমায় খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করছে'—এই ধরনের কথা, যা শুনে অবশ্য তোমার কোনো বিকার হয় বলে মনে হয় না। কারণ, তুমি দু-চার কথায়—'আচ্ছা ঠিক আছে' আসবো না না তা তো বটেই—ধরনের কাটা-কাটা উত্তর দিয়ে কাজ সারো। আপিসে গিয়ে পড়লে বাড়ির কথা তোমার একেবারেই মনে থাকে না অস্বীকার করতে পারো মলয়?

ডায়াল করার পর কক করে শব্দ হোল হয়তো। আর অমনি যাকে চাই তার বদলে অন্য দুজন ঢুকে পড়লো লাইনে। অনেক সময় মজার মজার কথা শোনা যায়। মাণিকতলায় ডায়াল করতে গিয়ে সেদিন যেমন :

মেয়ে—এই, চুপ করে গেলে কেন?'

ছেলে—কী বলবো। বলার কিছু নেই।

—রাগ করেছ?

—নাঃ।

—নাঃ টাতো রাগের কথা।

—যার ওপর জোর খাটে, তার ওপরই রাগ করা যায়। তাই না?

—তার মানে আমার ওপর তোমার জোর খাটে না। (ফোঁশ—দীর্ঘশ্বাস)

—খাটে কি?

—(প্রসঙ্গ পরিবর্তন) এই জানো, তোমরা কাল চলে যাবার পর উনি নেমে এসেছিলেন। নাকামি করে জিগেস করলেন, কে এসেছিল রে? মিতা বুঝি?

—উনি কে?

—মা আবার কে? তা আমিও বলেছি, হ্যাঁ মিতা। তখন বলছে, বাপ্টা-ছেলের গলা পেলাম যেন! কী পাজি, বুঝে দেখ!

—কী বললে তুমি?

—বললাম, মিতার সঙ্গে ওর দাদু এসেছিল, তুমি তার গলা শুনেছ ওপর থেকে। বস, চুপ। (হি হি, হি হি হি হি) কেমন দিয়েছি!

—হাঃ হাঃ হাঃ হা, হাঃ হা।.....

'ডিস কানেকশন হয়ে গেছে বুঝি?' পেছন থেকে বলে উঠলো টেকা দোকানদার। মাউথপীসটা চেপে ধরে তৃপ্তি কথা শুনছিল, ঠিক বুঝতে পেরেছে। বলে, 'ডিসকানেক্ট করে দিন। একটু পরে আবার চেষ্টা করবেন। ইনি অপেক্ষা করছেন।' পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, সামনের বাড়ির নিচের তলার ভদ্রমহিলা।

ইন্দ্রাণী ওর নাম। প্রায়ই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে তৃপ্তির। এই কদিনে অন্তত পাঁচ বার। ওপরতলার মাসিমার ওখানে দুবার। পূর্ণিমাদির বাসায় দুবার। এই দোকানেই আগে একবার। ওর চেয়ে বয়েসে একটু বড়ো হবে, তিরিশ-টিরিশ। ভারি সেয়ানা মেয়ে। মাসিমার ছেলের বৌ চাকরি করে কোথাও সকালে যায় আবার খাবার সময় চলে আসে। সেই সুযোগে গিয়ে বউয়ের নিন্দেবান্দা চর্চা করে আসে। মাসিমার মন জোগায়। আসলে সেই ফাঁকে দু-চারটে টেলিফোন!

সুরতীর্থ-তে পূর্ণিমাদির সঙ্গে গান শিখতো তৃপ্তি। বিয়ের আগের ব্যাপার। মোড়টার কাছে হঠাৎ দেখা সেদিন। গাড়ি করে আসছিলেন, গাড়ি থামিয়ে মুখ বাড়ালেন, 'আরে তৃপ্তি না?... এদিকে কোথায়? বাসা নিয়েছ?... কোন্ বাড়ি?... ওমা তাই নাকি?... কাছেই তো?...কতদিন এসেছ?...বিয়ে হয়েছে কতদিন? কী করেন কর্তা?' অনেক কিছু জানলেন পূর্ণিমাদি। শেষকালে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে,থায় যাচ্ছিলে?' তৃপ্তি সত্যি কথা বলেছে।

পূর্ণিমাদি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরোজা খুলে বললেন, 'ভেতরে এসে আমাদের বাড়ি থেকে ফোন করো। কী উদার মন পূর্ণিমাদির!

পূর্ণিমাদির স্বামী খুব বড়ো চাকরি করেন। ড্রাইভার সুদ্ধ গাড়ি পান আপিস থেকে। আপিসের টেলিফোন চাকর, সব। বললেন, 'ফোন করবার দরকার হলে এখান থেকে করো। কোনো সংকোচ করো না।'

ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখে, এই ইন্দ্রাণী ওখানেও ঠিক বসে আছে। পূর্ণিমাদির মেয়ের সঙ্গে বসে হিন্দি-বাংলা মুভি নিয়ে আলোচনা করছে! যার সঙ্গে যে রকম। ওর হাতে একটা সিনেমা-পত্রিকা, নিচয় টেলিফোনের নম্বর। আনমান করতে পারে তৃপ্তি—এই ধরনের রসালো আড্ডার পেছনে ঠান্ডা সুচিন্তিত কয়েকটা ফোন কল অবশ্যই আছে।

না মলয়, তোমার স্ত্রীর পক্ষে এ দীনতা সহ্য করা অসম্ভব। একটা ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে। তৃপ্তির ভরণপোষণের ভার তুমি নিয়েছ, ওকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবে—কথা দিয়েছ বিয়ের সময়। সুতরাং এ-দায়িত্ব তুমি এড়িয়ে থাকতে পারবে না। না না, তৃপ্তি, তোমার চোখ মোছার দরকার নেই। শোনো।

একটা পরামর্শ দিই, মলয়, কিছু মনে কোরো না। তোমাদের যোধপুর পার্কে নতুন একসচেঞ্জ থেকে কানেকশন দিচ্ছে। সাধারণ বর্গে তোমার দরখাস্ত দেওয়া আছে, লাইন পেতে কয়েক বছর লাগবে। তার বদলে যদি তুমি নিজের টেলিফোন কিনে নাও, এক মাসের মধ্যে পেয়ে যাবে লাইন।

হ্যাঁ, জানি, পাঁচ হাজার টাকা লাগবে। তোমার দরখাস্ত বাতিল করে নাও, এক হাজার টাকা ফেরত পাবে কেমন? বাকি চার হাজার? না না তুমি ধার্মো তৃপ্তি হাতের বালা খুলতে হবে না। বিয়ের সময় যৌতুকের টাকায় তোমার শ্বশুর মেয়ের নামে পাঁচ হাজার টাকার ইউনিট কিনে দিয়েছিলেন। সেই ইউনিট ব্যাঙ্কে জমা রেখে তুমি পাঁচ হাজার টাকাই ধার পেতে পারো, কিন্তু তোমার দরকার চার হাজার, তাই নেবে। শোধ করে দেবে আস্তে আস্তে। ধার শোধ হয়ে গেলে তৃপ্তির ইউনিট ফিরে আসবে ঘরে। লাভের অংশ পেতে থাকবে যেমন পাচ্ছে।

কী মলয়? রাজি? হোল তো সমস্যার সমাধান? আর দেরি কোরো না, সোমবারেই দরখাস্ত জমা দিয়ে দিও।

এ কি তৃপ্তি? তোমার মুখে হাসি নেই কেন? এখনও কিসের দুশ্চিন্তা? এ্যাঁ? ইন্দ্রাণী? এ-পাড়ার সব ইন্দ্রাণীর মতো টেলিফোনহীন মহিলারা তোমার বাড়িতে যদি রোজ...সকালে দুপুরে... মুখে তোষামোদের হাসি... হাত ব্যাগের মধ্যে ছোট্ট নোটবই... বিনত অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দৃষ্টি...না, না, ভয় পাওয়ার দরকার নেই। উচিত না। দিও, ওদের দু-একটা ফোন করতে দিও।

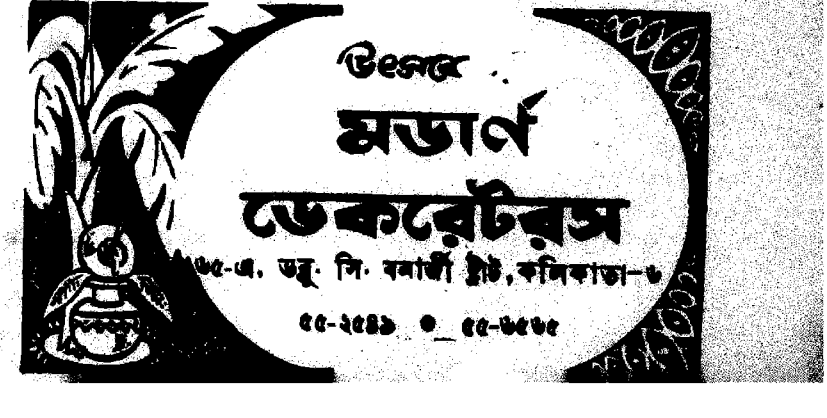

শুধু পলাশের রঙ

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

সকাল থেকেই চাঁপা বিয়ে বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় সেজেগুজে। সেদিন কপালে বড় একটা টিপ পরে। মুখে পাউডার মাখে। বেশ ফাঁপিয়ে খোঁপা বাঁধে। বিয়েবাড়িতে পরবার জন্যে দুটো ভাল কাপড় তুলে রেখেছে চাঁপা। ও দুটোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে। এমনিতে খালি পায়ে ঘোরে। কিন্তু বিয়ের দিন চটি পায়ে দেবে।

এখন এ-বাড়িটার নামই হয়ে গেছে সিং বাড়ি। টালিগঞ্জের রেলব্রিজের গায়েই বাড়িটা। বিয়ের জন্যেই ভাড়া দেয় মালিক। অন্যসময় দেখা শোনা করে ম্যানেজার পরেশবাবু।

এ-বাড়ির উল্টো ফুটপাথে চাঁপার বাবার চায়ের দোকান। ফুটপাথের ওপর একটা ছোট্ট বেঞ্চি পাতা। তারই সামনে তোলা উনুনে কেটলি চাপিয়ে জল ফোটায়। রেঁটে গেলাস আছ খানকয়েক। তাতে করেই খদ্দেরদের চা দেয় পরাণ।

পরাণই পরেশবাবুকে বলে কয়ে বিয়ে বাড়িতে চাঁপার কাজটা ঠিক করে দিয়েছে। বাসন ভাড়া নেয় তাদেরই বলে সারাদিন ফাইফরমাজ খাটবে। অতিথিদের হাতে হাতে চা সরবৎ দেবে। ডেকে ডেকে খেতে বসাবে। খুব ভাল মেয়ে। এক দিয়ে অনেক কাজ পাবেন। শুধু ওকে খেতে দিলেই হবে। আর ইচ্ছে হলে দু' পাঁচ টাকা বকসিস করতে পারেন।

ও বাড়িতে বিয়ে লেগেই আছে। তাই চাঁপারও নেমতন্ন বাঁধা। খাটেও খুব। এমনিতে একটা আলগা চটক আছে চাঁপার চেহারায়। দোহারা গড়ন। হলুদ হলুদ গায়ের রঙ। মাথাভর্তি চুল।

বিয়ে বাড়িতে যাবার দিন সিঁথির সিঁদুর আরও একটু গাঢ় করে লাগায়। প্রথম প্রথম চাঁপার মা আপত্তি করত। বলত তুই আইবুড়ো মেয়ে। সিঁথিতে অত জটা করে সিঁদুর দিস কেন মা। ওটা আর দিস নি।

চাঁপা হাসতে হাসতে বলে, আগে যখন দিতাম তখন তো কিছু বলতে না।

মা তবু বুঝিয়ে বলে, সে যখন দিতিস তখন দিতিস। হাজার হোক তুই কুমারী মেয়ে। শুধু শুধু সিঁথি রাঙ্গাবি কেন।

চাঁপা ঠোঁট চেপে হেসে বলে, কুমারী হয়ে ঘরে বেড়ালে তোমাদের তো দায় বাড়বে। তার থেকে এই ভাল। বিয়ে তো আর হবে না আমার।

এ-কথায় মার চোখে জল এসে যায়। চোখ মুছতে মুছতে বলে, আমায় দুষছিস কেন। সব দোষ তো তোর বাপের। নিজে তো কোনদিন বাঁধাধরা একটা চাকরী করল না। এখন ওই ঠুনকো চায়ের দোকান দেওয়া হয়েছে। মাঝখান থেকে তোর জীবনটা মাটি করল।

চাঁপা মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, থাক থাক আর কথা বাড়িয়ো না। আমি ছাড়াও তোমার আরও পাঁচ-ছটা ছেলেমেয়ে। তাদের কথা ভাবো।

বিয়ে, বৌভাত দুটোতেই ভাড়া খাটে বাড়িটা। বৌভাতে তেমন আনন্দ নেই। মেয়ের বিয়ে হলে বেশি খুশি হয় চাঁপা। সেদিন সকাল থেকেই অনুষ্ঠান। ওদের সঙ্গে চাঁপাও শাঁখ বাজায়, উলু দেয়। চাঁপার হাসিখুশি মুখ দেখে বাড়ির গিন্নীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, বেশ মেয়েটা। এইসব মেয়েই বিয়ে বাড়িতে মানায়। তারপরই চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায় মা?

এর উত্তর দিতেই চাঁপাকে ঢোক গিলতে হয়। অবশ্য বানিয়ে একটা জায়গার নাম বলে দেয় শেষ পর্যন্ত। আর তারপরই কিছুক্ষণের জন্যে চাঁপার মনটা পিছিয়ে যায় বছর তিন-চার আগের দিনগুলোতে।
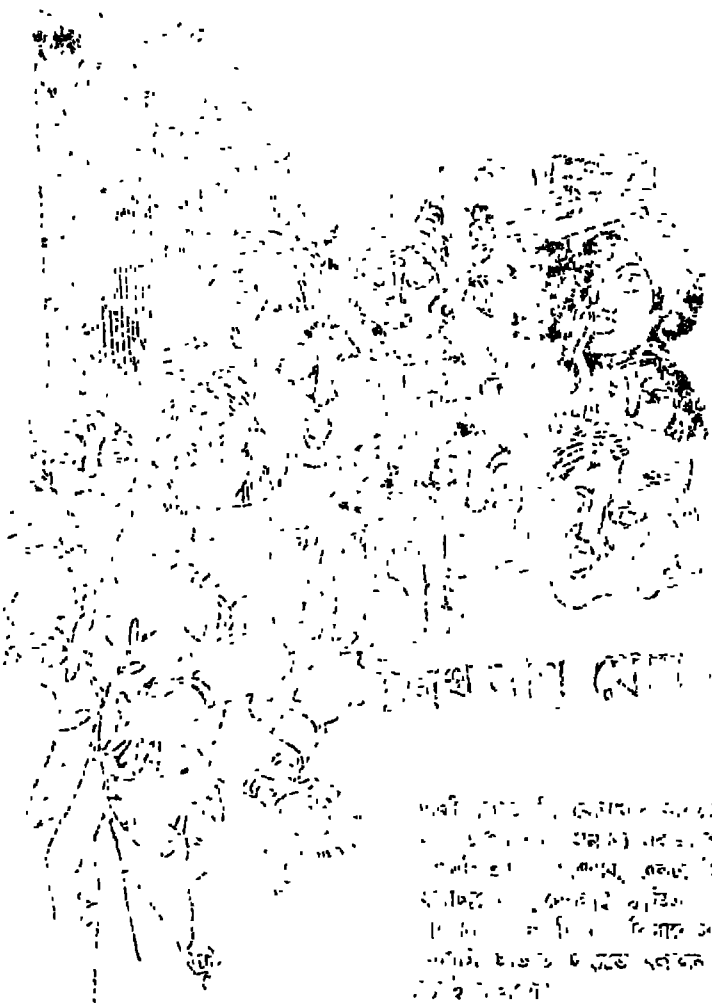
তখন প্রায় রোজই পলাশের বউ সেজে কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে চাঁপা। একেবারে বিয়ের কনে সাজতে হতো চাঁপাকে। টিকলি পরে, ঘোমটা টেনে বরের সঙ্গে যেন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সঙ্গে সুটকেস, টিনের বড় ট্রাংক। সুটকেশ ট্রাংকে কী আছে প্রথম প্রথম জানতো না চাঁপা। পরে সবই জেনেছে। গাঁজা আফিম মদ ঠাসা থাকত ট্রাংক সুটকেশে। ওরা স্বামী স্ত্রী সেজে মাল পাচার করত এখানে ওখানে। অবশ্য এর জন্যে মজুরি পেতো চাঁপা। হাতে টাকাগুলো নেবার সময় বাবা মুখ খুশিতে ভরে উঠত। বাবার এ